রাষ্ট্রবিজ্ঞান

কলকাতা, কল্যাণী, বিদ্যাসাগর, বর্ধমান ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কর্তৃক নির্ধারিত দ্বি-বার্ষিক ডিগ্রী কোর্সের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী লিখিত পাঠ্যপুস্তক

• কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নির্বাচিত •

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

[প্রথম পত্র]

অধ্যাপক সত্যসাধন চক্রবর্তী, এম. এ.
বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
বিদ্যাসাগর কলেজ, কলকাতা

ও

অধ্যাপক নিমাই প্রামাণিক, এম. এ., পিএইচ. ডি.
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন অধ্যাপক, কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ,
হেতমপুর, বীরভূম

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা [একাদশ সংস্করণ]

সহৃদয় অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দ এবং ছাত্র ছাত্রী ভাইবোনদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হওয়ায় 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' (প্রথম পত্র) পুস্তকখানির দশম সংস্করণ মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়েছে। যাঁদের ঐকান্তিক সহযোগিতা ও আনুকূল্যে পুস্তকটি বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে সেই সব অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও ছাত্র ছাত্রী ভাইবোনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। অত্যল্প সময়ের ব্যবধানে একাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হলেও পুস্তকখানির গুণগত উৎকর্ষ বিধানের জন্য আমরা বিশেষ যত্নবান হয়েছি। বর্তমান সংস্করণে আমরা বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসের দিকে লক্ষ্য রেখে পুস্তকখানির মধ্যে বেশ কিছু নতুন অংশ সংযোজন করেছি। তাছাড়া, একাদশ সংস্করণে পুস্তকখানিকে আদ্যন্ত সংশোধন করা হয়েছে। আশা করি, বর্তমান সংস্করণটি পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী সমাদৃত হবে।

বর্তমান সংস্করণ প্রকাশের ব্যাপারে বীরভূম মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রেমপ্রকাশ চক্রবর্তী ও অধ্যাপিকা আরাধনা লাহিড়ী, হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক নীরদবরণ পাল, বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজের অধ্যাপক হিমাংশু ঘোষ প্রমুখ অনেক অধ্যাপক বন্ধুর নিকট আমরা বিশেষভাবে ঋণী। এঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী শ্রীঅরুণ পুরকায়স্থ ও ভাস্কর পুরকায়স্থ, কোম্পানীর কর্মচারীবৃন্দ, শ্রীভূমির কর্মী ধীরেন চক্রবর্তী এবং প্রেসের কর্মী-বন্ধুদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ছাড়া বর্তমান সংস্করণটি এত দ্রুত প্রকাশিত হতে পারত না। সেজন্য এঁদের সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

পুস্তকখানির অধিকতর উৎকর্ষ বিধানের জন্য যে-কোন গঠনমূলক সমালোচনা ও অভিমত সাদরে গৃহীত হবে।

সত্যসাধন চক্রবর্তী
নিমাই প্রামাণিক

ভূমিকা [প্রথম সংস্করণ]

কলকাতা, কল্যাণী, বর্ধমান ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নতুন দ্বি-বার্ষিক ডিগ্রী কোর্সের সিলেবাস অনুসারে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' (প্রথম পত্র) লিখিত হয়েছে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার জন্য অধ্যায়গুলিকে যথাযথভাবে সাজানো হয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সর্বাধুনিক তত্ত্ব ও তথ্যসমূহ যেমন পুস্তকখানির মধ্যে আলোচিত হয়েছে, তেমনি প্রতিটি বিষয় আলোচনার সময় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীকে সমভাবেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কোন একটি বিষয় আলোচনার সময় ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে না পারলে সেই আলোচনা পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না—এই ভেবে আমরা প্রতিটি অধ্যায়কে যতটা সম্ভব পরিপূর্ণতাদানের চেষ্টা করেছি। ফলে আকৃতিতে পুস্তকখানি কিছুটা বৃহৎ হয়েছে, তা অনস্বীকার্য। তবে সহৃদয় অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ এবং ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত সিলেবাসের প্রতি লক্ষ্য রেখে পুস্তকখানি ব্যবহার করেন, সেজন্য তাঁদের সকলকে অনুরোধ জানাই।

এই পুস্তকখানি প্রণয়নে অনেকেই নানাভাবে সাহায্য ও সহায়তা করেছেন। এঁদের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের রীডার ড. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক জগদীশ্বর সান্যাল ও অধ্যাপক মহাদেব চট্টোপাধ্যায়, বোলপুর কলেজের অধ্যাপক অশোক বক্সী, বিদ্যাসাগর কলেজের (কলকাতা) অধ্যাপক অনুপ চক্রবর্তী, অধ্যাপক সুব্রত চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক সত্যব্রত চক্রবর্তী, বিদ্যাসাগর সান্ধ্য কলেজের অধ্যাপক শ্যামাপদ পাল, বিশ্বভারতীর ড. সত্যব্রত দত্ত, আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক অমৃতাভ ব্যানার্জী, বঙ্গবাসী কলেজের (প্রাতঃ) ড. সরল চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের নিকট আমরা বিশেষভাবে ঋণী।

হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের গ্রন্থাগারিক মহম্মদ ঈসা ও গ্রন্থাগারের অন্যান্য কর্মী-বন্ধুগণ, শ্রীউদয় গুপ্ত, শ্রীদেবীদাস খাগ ও শ্রীমতী জবারানী প্রামাণিক আমাদের পুস্তক রচনায় নানাভাবে সাহায্য, সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। এঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী শ্রীঅরুণকুমার পুরকায়স্থ এবং অন্যান্য কর্মী-বন্ধুদের সক্রিয় আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এই পুস্তক এত তাড়াতাড়ি প্রকাশিত হতে পারত না। এজন্য আমরা এঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

যত্নবান্ হওয়া সত্ত্বেও পুস্তকখানির মধ্যে কিছু কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গেছে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত। পুস্তকখানির গুণগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য যে-কোন গঠনমূলক সমালোচনাই সাদরে গৃহীত হবে।

সত্যসাধন চক্রবর্তী
নিমাই প্রামাণিক

SYLLABUS

THE UNIVERSITY OF CALCUTTA
&
THE UNIVERSITY OF KALYANI

Pass Course

Paper I

Political Theory and Institutions

1. Nature and Limits of Political Science—Different approaches to Political Science—The Problem of methods in Political Science.
2. Individual, Society and the State.
3. Stages of Social Development and the State.
   (*a*) Primitive Communal System,
   (*b*) the Slave System,
   (*c*) the Feudal System,
   (*d*) the Capitalist System, and
   (*e*) the Socialist System.
4. Nature of the State—(*a*) Organismic Theory, (*b*) Idealist Theory & (*c*) Marxist Theory.
5. Sovereignty of the State : Origin and Development of Sovereignty—Kinds of Sovereignty—Monistic and Pluralistic theories—General Will & Sovereignty—Theory of Divided Sovereignty—Doctrine of Popular Sovereignty—Theory of Limited Sovereignty—Marxist Approach.
6. Nationalism : Origin of the ideal of Nationalism—Nationalism as a political ideal—Internationalism.
7. Imperialism—Imperialism and national liberation movements —The problems of world peace—The Role of the U. N.
8. Law : The meaning and nature of Law—Analytical, Historical, Sociological and Marxist School—International Law—Its meaning and Nature.

9. Rights : Meaning and Nature—Theories of Rights—Natural, Legal, Idealist and Marxist—Rights in different Social Systems—Right to Private Property in different Social Systems—Right to resistance.
10. Liberty and Equality : Origin and development of the ideas of liberty & equality—Nature of liberty & equality in different social systems.
11. Ends and functions of the State : Theories of state functions : (*a*) the individualist theory, (*b*) the socialist theory, (*c*) the theory of state regulation—The welfare state.
12. Marxism—Materialistic interpretation of history—The Theory of class struggle—Theory of revolution—Lenin's contribution to Marxism.
13. Democratic Socialism.
14. Gandhi's theory of State & Sarvodaya.
15. Classification of political systems—Characteristics of liberal democratic, authoritarian, and socialist system.
16. Unitarism and Federalism—Problems of decentralisation—Modern tendencies.
17. Organs of Government—Legislature & its functions, modern trends—Executive : different types—political & non-political—Their functions—Judiciary : recruitment and independence—Its functions.
18. Democracy and Dictatorship—Origin & development of the ideal of democracy—Liberal democracy & socialist democracy—Attacks upon democracy—Fascism—Dictatorship and its classification.
19. Political Parties and Interest Groups : this functions and role in modern states.
20. Electorate and representation—Functional and territorial—Problems and methods of minority representation—Different theories regarding the nature of representation—Modern instrument of control over the representatives.
21. Public opinion—Its nature and role in different political systems.

VIDYASAGAR UNIVERSITY

Pass Course

Paper I

Political Theory

1. The discipline of Political Science : Nature and scope.
2. Society, Nation and the State : Concepts and inter-relations.
3. The nature of the State : The Liberal view : State as an agency of common interests. The Marxist view—State as an organ of class domination.
4. The State as Sovereign : Austinian theory. The Pluralist view point. Marxist approach to the problem of sovereignty. Sovereignty and the international order.
5. Nature of Law : Different schools of Law—analytical, historical and sociological. Marxist view point.
6. Rights : Meaning and nature. Theories of rights—natural, legal and idealist. Marxist view point.
7. Liberty and Equality : Nature, meaning and inter-relationships. Liberal and Marxist views.
8. Unitarianism and Federalism : Basic features. Recent trends in federalism.
9. The Legislature, the Executive and the Judiciary—Functions and inter-relations.
10. Political Parties—Types and functions : The liberal and Marxist views about party functions.
11. Pressure groups—Nature and functions.
12. Public opinion : Nature and functions of Public opinion in different political systems.
13. Electorate and representation : Functional and territorial representation. Minority representation. Instruments of control over the representatives.
14. Types of state systems : Liberal democratic, socialist states. The authoritarian state : Fascist and Military dictatorships.
15. Political change : The liberal view and the Marxist view.

THE UNIVERSITY OF BURDWAN

B. A. PASS

Paper I—(100 Marks)

Political Theory and Institutions

I. Definition and scope of Political Science. Methods of Political Science. The State and Society.

II. Nature of the State, Organic Theory, The Idealist Theory, Marxist conception of the State.

III. Nature of Sovereignty—Legal and Political Sovereignty—De jure and De facto Sovereignty—Doctrine of Popular Sovereignty—Austinian Theory of Sovereignty—its critical estimate—Theory of Limited Sovereignty. Attacks upon the Monistic Theory of Sovereignty.

IV. Definition and nature of Law: Relation between Law and Morality—Law and Liberty—The Concept of Liberty—Safeguards of Liberty in a Modern State—Concepts of Natural Law and Natural Right—Rights and Equality.

V. Democracy and Dictatorship: The spheres of the State. Individualism and Socialism.

VI. Meaning of Nationality—Essential Elements of Nationality—Right of Self-Determination. Mono-National State vs. Poly National State—Nationalism and Internationalism.

VII. Constitution—Meaning and types—Unitary and Federal—Parliamentary and Presidential Government.

VIII. Political Parties—Public opinion—Electorate—Universal suffrage—Methods of Minority Representation—Direct and indirect Election—Relation between the Representative and his Constituency.

THE UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

B. A. Pass (Paper I)

Political Analysis and Theory

A. Political Analysis :

1. Nature and scope of Political Science—Moves towards inter-disciplinary study—Relation with other Social Sciences like Economics, History, Sociology, Geography.
2. Approaches to the study of Political Science—Normative and Empirical, Philosophical, Institutional, Behavioural and Marxist—Choice of approach.
3. Meaning and Role of Political Theory—Distinction between Political Theory and Political Philosophy.

B. Concepts and Ideologies :

4. Nature of State : Idealist and Marxist Theories : State and Society ; Nationalism—Idea and Impact ; Sovereignty—Monism and Pluralism ; Law—Nature of Law, Schools of Law—Analytical, Historical and Sociological ; Rights—Meaning and forms ; Liberty—Concept ; Equality—Concept and relationship with liberty ; Functions of the State ; Contending theories : Individualistic. Socialistic and Wealfare.
5. Major political ideologies—Democracy, Socialism : Scientific and Democratic—Fascism.

C. Political Forms, Institutions and Structure :

6. Forms of Government : Democracy and Dictatorship—A comparative study—Federal/Unitary/Parliamentary/Presidential.
7. Institutions of Government—Legislature/Executive/Bureaucracy/Judiciary.
8. Contemporary Party System—Interest groups : nature and role.
9. Electoral systems.

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা, প্রকৃতি, সীমানা ও পদ্ধতি ৩-২২

[ভূমিকা—পৃ. ৩ : রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা—পৃ. ৩ : রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি এবং সীমানা—পৃ. ৫ : রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান পদবাচ্য ? —পৃ. ১১ : রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন আলোচনা-পদ্ধতি ও তাদের সমস্যা—পৃ. ১৫]

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক ২৩-৩৬

[আন্তঃ-সমাজবিজ্ঞানকেন্দ্রিক আলোচনার প্রবণতা—পৃ. ২৩ : রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস—পৃ. ২৫ : রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থবিদ্যা বা ধনবিজ্ঞান—পৃ. ২৭ : রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যা—পৃ. ২৯ : রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ভূগোল—পৃ. ৩১ : রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান—পৃ. ৩৩ : রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান—পৃ. ৩৪]

তৃতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ৩৭-৬৯

[বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর শ্রেণী বিভাজন—পৃ. ৩৭ : সনাতন দৃষ্টিভঙ্গী—পৃ. ৩৮ : আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী—পৃ. ৪২ : ব্যবস্থাজ্ঞাপক দৃষ্টিভঙ্গী—পৃ. ৫০ : কাঠামো কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গী—পৃ. ৫৬ : গোষ্ঠী-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী—পৃ. ৬১ : নতুন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী—পৃ. ৬৪ : মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী—পৃ. ৬৫ : মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী বনাম অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গী—পৃ. ৬৮]

চতুর্থ অধ্যায়

রাজনৈতিক তত্ত্ব ও রাজনৈতিক দর্শন ৭০-৭৯

[রাজনৈতিক তত্ত্বের অর্থ, শ্রেণীবিভাগ এবং ভূমিকা—পৃ. ৭০ : রাজনৈতিক দর্শন এবং রাজনৈতিক তত্ত্ব—পৃ. ৭৬]

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র ৮০-৯৮

[মানবের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ—পৃ. ৮০ : মানব-সমাজ ও তার প্রকৃতি —পৃ. ৮১ : সমাজের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ—পৃ. ৮৩ : ব্যক্তি ও সমাজের

বিষয় পৃষ্ঠা

মধ্যে সম্পর্ক—পৃ. ৮৯ : ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক বিষয়ক মতবাদ —পৃ. ৯২ : সামাজিক চুক্তি মতবাদ—পৃ. ৯২ : জৈব মতবাদ —পৃ. ৯৪ : ভাববাদ পৃ. ৯৫ : রাষ্ট্র ও সমাজ—পৃ. ৯৬]

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমাজ-বিকাশের বিভিন্ন স্তর এবং রাষ্ট্র ৯৯-১২৩

[ভূমিকা—পৃ. ৯৯ : আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা—পৃ. ৯৯ : দাস সমাজব্যবস্থা—পৃ. ১০১ : বিভিন্ন দেশে দাসব্যবস্থা—পৃ. ১০৫ : সামন্ততান্ত্রিক সমাজ—পৃ. ১০৮ : বিভিন্ন দেশে সামন্ততন্ত্র—পৃ. ১১০ : পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা—পৃ. ১১২ : সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা —পৃ. ১১৫ : সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা—পৃ. ১২১]

সপ্তম অধ্যায়

রাষ্ট্রের প্রকৃতি ১২৪-১৪৩

[জৈব মতবাদ—পৃ. ১২৪ : আদর্শবাদ বা ভাববাদ—পৃ. ১২৯ : উদারনৈতিক মতবাদ—পৃ. ১৩৪ : মার্কসীয় মতবাদ—পৃ. ১৩৯]

অষ্টম অধ্যায়

রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা ১৪৪-১৮৬

[সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি—পৃ. ১৪৪ : সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য—পৃ. ১৪৬ : সার্বভৌমিকতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ—পৃ. ১৪৯ : সার্বভৌমিকতার বিভিন্ন রূপ—পৃ. ১৫২ : নামসর্বস্ব সার্বভৌমিকতা এবং প্রকৃত সার্বভৌমিকতা—পৃ. ১৫২ : আইনানুমোদিত সার্বভৌমিকতা এবং বাস্তব সার্বভৌমিকতা—পৃ. ১৫২ : আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতা এবং রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা—পৃ. ১৫৩ : জনগণের সার্বভৌমিকতা—পৃ. ১৫৫ : একত্ববাদ—পৃ. ১৫৭ : সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে অস্টিনের মতবাদ—পৃ. ১৫৯ : বহুত্ববাদ—পৃ. ১৬৪ : সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্ণয়—পৃ. ১৭০ : সীমাবদ্ধ সার্বভৌমিকতা তত্ত্ব পৃ. ১৭২ : সার্বভৌমিকতার ক্ষমতা তত্ত্ব—পৃ. ১৭৫ : সার্বভৌমিকতার মার্কসীয় তত্ত্ব—পৃ. ১৭৭ : সাধারণ ইচ্ছা ও সার্বভৌমিকতা —পৃ. ১৮১ : সার্বভৌমিকতা এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা—পৃ. ১৮৩]

নবম অধ্যায়

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা ১৮৭-২১১

[জনসমাজ, জাতীয় জনসমাজ ও জাতি—পৃ. ১৮৭ : জাতীয় জনসমাজের উপাদান—পৃ. ১৮৯ : জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি—পৃ. ১৯২ :

বিষয় পৃষ্ঠা

রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে জাতীয়তাবাদ—পৃ. ১৯৫ ঃ জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার—পৃ. ১৯৯ ঃ আন্তর্জাতিকতা—পৃ. ২০৪ ঃ জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা—পৃ. ২০৬ ঃ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা—পৃ. ২০৯]

দশম অধ্যায়

সাম্রাজ্যবাদ ২১২-২৪৩

[সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা—পৃ. ২১২ ঃ সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি—পৃ. ২১২ ঃ নয়া-উপনিবেশবাদ—পৃ. ২১৭ ঃ সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টির উপাদানসমূহ—পৃ. ২২২ ঃ সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন—পৃ. ২২৪ ঃ বিশ্ব-শান্তির সমস্যা—পৃ. ২৩০ ঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমিকা—পৃ. ২৩৬]

একাদশ অধ্যায়

আইন ২৪৪-২৭৫

[আইনের অর্থ ও প্রকৃতি—পৃ. ২৪৪ ঃ প্রাকৃতিক আইনের ধারণা—পৃ. ২৪৬ ঃ সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ হিসেবে আইন—পৃ. ২৪৮ ঃ আইন সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ—পৃ. ২৫০ ঃ বিশ্লেষণমূলক মতবাদ—পৃ. ২৫০ ঃ ঐতিহাসিক মতবাদ—পৃ. ২৫২ ঃ দার্শনিক মতবাদ—পৃ. ২৫৪ ঃ তুলনামূলক মতবাদ—পৃ. ২৫৬ ঃ সমাজবিজ্ঞানমূলক মতবাদ—পৃ. ২৫৬ ঃ মার্কসীয় মতবাদ—পৃ. ২৫৭ ঃ আইনের শ্রেণী-বিভাগ—পৃ. ২৫৯ ঃ আইনের উৎস—পৃ. ২৬২ ঃ আইন মান্য করার কারণ—পৃ. ২৬৪ ঃ আইন ও নৈতিক বিধি—পৃ. ২৬৫ ঃ আন্তর্জাতিক আইনের সংজ্ঞা—পৃ. ২৬৮ ঃ আন্তর্জাতিক আইনের শ্রেণীবিভাগ—পৃ. ২৬৯ ঃ আন্তর্জাতিক আইনের শ্রেণীচরিত্র—পৃ. ২৬৯ ঃ আন্তর্জাতিক আইনের উৎস—পৃ. ২৭১ ঃ আন্তর্জাতিক আইনের প্রকৃতি ঃ আন্তর্জাতিক আইন কি আইন ?—পৃ. ২৭১ ঃ আন্তর্জাতিক আইনের পথে প্রতি-বন্ধকতা—পৃ. ২৭৪]

দ্বাদশ অধ্যায়

অধিকার ২৭৬-৩০৯

[অধিকারের অর্থ ও প্রকৃতি—পৃ. ২৭৬ ঃ অধিকারের প্রকারভেদ—পৃ. ২৭৮ ঃ পৌর অধিকারসমূহ—পৃ. ২৭৮ ঃ রাজনৈতিক অধিকার-সমূহ—পৃ. ২৮০ ঃ সামাজিক অধিকার—পৃ. ২৮১ ঃ অর্থনৈতিক অধিকার—পৃ. ২৮২ ঃ অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ—পৃ. ২৮৪ ঃ স্বাভাবিক অধিকার সম্বন্ধে মতবাদ—পৃ. ২৮৫ ঃ অধিকার সম্বন্ধে আইনগত মতবাদ—পৃ. ২৮৮ ঃ অধিকার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মতবাদ—পৃ. ২৮৯ ঃ অধিকার সম্বন্ধে আদর্শবাদী তত্ত্ব—পৃ. ২৯০ ঃ অধিকারের

বিষয় পৃষ্ঠা

মার্কসীয় তত্ত্ব—পৃ. ২৯১ ঃ বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় অধিকার পৃ. ২৯৩ ঃ সম্পত্তির অধিকার—পৃ. ২৯৭ ঃ বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার—পৃ. ২৯৭ ঃ ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের সপক্ষে বিপক্ষে যুক্তি—পৃ. ৩০০ ঃ রাষ্ট্রের বিরোধিতা করার অধিকার—পৃ. ৩০২ ঃ নাগরিকের কর্তব্য—পৃ. ৩০৫ ঃ রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের কর্তব্য—পৃ. ৩০৬ ঃ অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক—পৃ. ৩০৭]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

স্বাধীনতা ও সাম্য ৩১০-৩৩

[স্বাধীনতার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি—পৃ. ৩১০ ঃ স্বাধীনতার ধারণার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ—পৃ. ৩১২ ঃ স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ—পৃ. ৩১৪ ঃ আইনসঙ্গত স্বাধীনতার প্রকারভেদ—পৃ. ৩১৫ ঃ স্বাধীনতা সম্পর্কে বুর্জোয়া ধারণা—পৃ. ৩১৭ ঃ স্বাধীনতা সম্পর্কে মার্কসবাদী তত্ত্ব—পৃ. ৩২০ ঃ স্বাধীনতার রক্ষাকবচ—পৃ. ৩২১ ঃ আইন ও স্বাধীনতা—পৃ. ৩২৫ ঃ বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থায় স্বাধীনতার প্রকৃতি—পৃ. ৩২৬ ঃ সাম্যের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি—পৃ. ৩৩০ ঃ সাম্য ও স্বাধীনতা সম্পর্ক—পৃ. ৩৩১ ঃ সাম্যের ধারণার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ—পৃ. ৩৩২ ঃ সাম্যের বিভিন্ন রূপ—পৃ. ৩৩৩ ঃ বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থায় সাম্যের প্রকৃতি—পৃ. ৩৩৫]

চতুর্দশ অধ্যায়

রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও কার্যাবলী ৩৩৮-৩৭২

[রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য—পৃ. ৩৩৮ ঃ বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্রের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—পৃ. ৩৪০ ঃ রাষ্ট্রের কার্যাবলী—পৃ. ৩৪২ ঃ রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ—পৃ. ৩৪৪ ঃ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ—পৃ. ৩৪৪ ঃ সমাজতন্ত্রবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ—৩৫১ ঃ সমাজতন্ত্রবাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়—পৃ. ৩৫৩ ঃ সমাজতন্ত্রবাদেব সপক্ষে যুক্তি—পৃ. ৩৫৫ ঃ সমাজতন্ত্রবাদের মূল্যায়ন—পৃ. ৩৫৬ ঃ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণবাদ—পৃ. ৩৬১ ঃ জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের সংজ্ঞা—পৃ. ৩৬১ ঃ উৎপত্তি ও বিকাশ—পৃ. ৩৬২ ঃ জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য—পৃ. ৩৬৩ ঃ জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের কার্যাবলী—পৃ. ৩৬৪ ঃ সমালোচনা—পৃ. ৩৬৫ ঃ গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক—পৃ. ৩৬৬ ঃ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদের সম্পর্ক—পৃ. ৩৬৮ ঃ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের সীমারেখা—পৃ. ৩৬৯]

বিষয় | পৃষ্ঠা

পঞ্চদশ অধ্যায়

মার্কসবাদ ... ৩৭৩-৪১৬

[ভূমিকা—পৃ. ৩৭৩ : মার্কসীয় চিন্তাধারার উৎস—পৃ. ৩৭৪ : মার্কসবাদের কয়েকটি দিক—পৃ. ৩৭৫ : দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ—পৃ. ৩৭৫ : ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা—পৃ. ৩৮২ : শ্রেণী ও শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব—পৃ. ৩৮৮ : উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব—পৃ. ৩৯৪ : বিপ্লবের উদারনৈতিক তত্ত্ব—পৃ. ৩৯৫ : বিপ্লবের মার্কসীয় তত্ত্ব—পৃ. ৪০০ : সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বনাম অ-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব—পৃ. ৪০৬ : মার্কসবাদে লেনিনের অবদান—পৃ. ৪১০]

ষোড়শ অধ্যায়

গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ৪১৭-৪২৩

[গণতান্ত্রিক সমাজবাদ—পৃ. ৪১৭ : মার্কসবাদ বনাম গণতান্ত্রিক সমাজবাদ—পৃ. ৪২২]

সপ্তদশ অধ্যায়

রাষ্ট্র ও সর্বোদয় সম্পর্কে গান্ধী-তত্ত্ব ... ৪২৪-৪৩৪

[ভূমিকা—পৃ. ৪২৪ : রাষ্ট্র সম্পর্কে গান্ধী-তত্ত্ব—পৃ. ৪২৫ : রাষ্ট্র সম্পর্কে গান্ধীবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য—পৃ. ৪৩০ : সর্বোদয় সম্পর্কে গান্ধী-তত্ত্ব—পৃ. ৪৩১]

অষ্টাদশ অধ্যায়

সংবিধান বা শাসনতন্ত্র ৪৩৫-৪৪৮

[সংবিধানের সংজ্ঞা—পৃ. ৪৩৫ : সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ—পৃ. ৪৩৭ : লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের পার্থক্য—পৃ. ৪৩৯ : লিখিত সংবিধানের গুণাগুণ—পৃ. ৪৪১ : অলিখিত সংবিধানের গুণাগুণ—পৃ. ৪৪২ : সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের মধ্যে পার্থক্য—পৃ. ৪৪৪ : সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের গুণাগুণ—পৃ. ৪৪৫ : দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের গুণাগুণ—পৃ. ৪৪৬]

ঊনবিংশ অধ্যায়

সরকার ও তার বিভিন্ন রূপ ... ৪৪৯-৪৮৮

[সরকারের শ্রেণীবিভাগ ও তার সমস্যা—পৃ. ৪৪৯ : এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা—পৃ. ৪৫১ : এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য—পৃ. ৪৫২ : এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার গুণাগুণ—পৃ. ৪৫৩ : যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা—পৃ. ৪৫৫ : যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য—পৃ. ৪৫৫ : যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয় শর্তাবলী—পৃ. ৪৫৭ : যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-সমবায়—পৃ. ৪৫৯ : এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে

বিষয় পৃষ্ঠা

পার্থক্য—পৃ. ৪৬১ : যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার গুণাগুণ—পৃ. ৪৬৩ : যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সাফল্যের শর্তাবলী—পৃ. ৪৬৬ : ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণ—পৃ. ৪৬৮ : আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রপ্রবণতা—পৃ. ৪৭২ : যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ—পৃ. ৪৭৫ : রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার—পৃ. ৪৭৬ : রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের গুণাগুণ—পৃ. ৪৭৭ : সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ-পরিচালিত সরকার—পৃ. ৪৮০ : সংসদ-চালিত সরকারের সুবিধা ও অসুবিধা—পৃ. ৪৮২ : সংসদীয় সরকারের সাফল্যের শর্তাবলী—পৃ. ৪৮৫ : মন্ত্রিপরিষদ-পরিচালিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের পার্থক্য—পৃ. ৪৮৬]

বিংশ অধ্যায়

রাজনৈতিক ব্যবস্থা ৪৮৯-৫০৯

[রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাজন—পৃ. ৪৮৯ : উদারনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা—পৃ. ৪৯১ : স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা—পৃ. ৪৯৩ : ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থা—পৃ. ৪৯৪ : সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা—পৃ. ৪৯৬ : উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বনাম স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা—পৃ. ৪৯৮ : উদারনৈতিক ব্যবস্থা বনাম ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা—পৃ. ৪৯৯ : উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বনাম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা—পৃ. ৫০১ : স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা বনাম ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা—পৃ. ৫০৩ : স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা বনাম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা—পৃ. ৫০৫ : ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা বনাম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা—পৃ. ৫০৭]

একবিংশ অধ্যায়

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ৫১০-৫৪৫

[আইনসভার কার্যাবলী—পৃ. ৫১০ : আইনসভার সংগঠন—পৃ. ৫১৪ : দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি—পৃ. ৫১৫ : আধুনিক প্রবণতা : আইনসভার ক্ষমতার অবসান—পৃ. ৫২০ : আইনসভার বর্তমান অবস্থা—পৃ. ৫২২ : শাসন বিভাগের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ—পৃ. ৫২৩ : শাসন বিভাগের কার্যাবলী—পৃ. ৫২৬ : আমলাতন্ত্রের অর্থ—পৃ. ৫২৮ : আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য—পৃ. ৫২৯ : আমলাতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ—পৃ. ৫৩০ : আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব পৃ. ৫৩১ : আমলাতন্ত্রের কার্যাবলী—পৃ. ৫৩২ : আমলাতন্ত্রের ত্রুটি—পৃ. ৫৩৫ : আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ—পৃ. ৫৩৬ : বিচার বিভাগ—পৃ. ৫৩৭ : বিচারপতিদের নিয়োগ এবং স্বাধীনতা—পৃ. ৫৩৮ : বিচার-বিভাগের কার্যাবলী ও ভূমিকা—পৃ. ৫৪২]

বিষয় পৃষ্ঠা

দ্বাবিংশ অধ্যায়

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র ৫৪৬-৫৯৪

[গণতান্ত্রিক আদর্শের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ—পৃ. ৫৪৬ ঃ গণতন্ত্রের অর্থ ও প্রকৃতি—পৃ. ৫৪৭ ঃ গণতন্ত্রের প্রকারভেদ—পৃ. ৫৪৮ ঃ শাসনব্যবস্থা বা সরকারের একটি রূপ হিসেবে গণতন্ত্র—পৃ. ৫৫১ ঃ একটি 'জীবনাদর্শ' বা আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র—পৃ. ৫৫৩ ঃ আদর্শ গণতন্ত্র বা প্রকৃত গণতন্ত্র—পৃ. ৫৫৬ ঃ উদারনৈতিক গণতন্ত্র—পৃ. ৫৫৬ ঃ উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি—পৃ. ৫৬৪ ঃ আজকের দিনে বুর্জোয়া গণতন্ত্র—পৃ. ৫৬৯ ঃ উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তাবলী—পৃ. ৫৭৩ ঃ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র—পৃ. ৫৭৬ ঃ গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ—পৃ. ৫৭৮ ঃ একনায়কতন্ত্র—পৃ. ৫৮০ ঃ একনায়কতন্ত্রের উদ্ভবের কারণ—পৃ. ৫৮০ ঃ একনায়কতন্ত্রের প্রকারভেদ—পৃ. ৫৮১ ঃ একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য—পৃ. ৫৮২ ঃ একনায়কতন্ত্রের গুণাগুণ—পৃ. ৫৮৪ ঃ উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য—পৃ. ৫৮৬ ঃ ফ্যাসিবাদ—পৃ. ৫৮৯]

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

রাজনৈতিক দল এবং স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ৫৯৫-৬৩৩

[রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য—পৃ. ৫৯৫ ঃ উদারনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উদ্ভবের কারণ—পৃ. ৫৯৭ ঃ উদারনৈতিক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী এবং ভূমিকা—পৃ. ৫৯৮ ঃ রাজনৈতিক দলের গুণাগুণ—পৃ. ৬০১ ঃ দলীয় ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাজন—পৃ. ৬০৬ ঃ রাজনৈতিক দলের প্রকৃতি ও কার্যাবলী সম্পর্কে মার্কসবাদীদের অভিমত—পৃ. ৬০৭ ঃ একদলীয় ব্যবস্থা—পৃ. ৬১২ ঃ প্রভুত্বকারী দলীয় ব্যবস্থা—পৃ. ৬১৩ ঃ দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা—পৃ. ৬১৪ ঃ বহুদলীয় ব্যবস্থা—পৃ. ৬১৫ ঃ একদলীয় ব্যবস্থার গুণাগুণ—পৃ. ৬১৬ ঃ দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার গুণাগুণ—পৃ. ৬১৮ ঃ বহুদলীয় ব্যবস্থার গুণাগুণ—পৃ. ৬২০ ঃ একদলীয় ব্যবস্থা ও গণতন্ত্র—পৃ. ৬২২ ঃ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী—পৃ. ৬২৪ ঃ শ্রেণীবিভাজন—পৃ. ৬২৫ ঃ সরকারী সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার বিভিন্ন পদ্ধতি—পৃ. ৬২৬ ঃ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর কার্য-নির্ধারক বিষয়সমূহ—পৃ. ৬২৮ ঃ রাজনৈতিক দল এবং স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর পার্থক্য—পৃ. ৬৩১]

চতুর্বিংশ অধ্যায়

নির্বাচকমণ্ডলী এবং প্রতিনিধিত্ব ... ৬৩৪-৬৭৪

[প্রতিনিধিত্বের ইতিহাস—পৃ. ৬৩৪ ঃ সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার পৃ. ৬৩৫ ঃ সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারে সপক্ষে যুক্তি—

বিষয় পৃষ্ঠা

পৃ.—৬৩৫ : সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের বিপক্ষে যুক্তি—পৃ. ৬৩৭ : স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার—পৃ. ৬৩৯ : বিপক্ষে যুক্তি—পৃ. ৬৪০ : সপক্ষে যুক্তি—পৃ. ৬৪১ : নির্বাচন পদ্ধতি—পৃ. ৬৪৩ : প্রত্যক্ষ নির্বাচনের সুবিধা ও অসুবিধা—পৃ. ৬৪৪ : পরোক্ষ নির্বাচনের সুবিধা ও অসুবিধা—পৃ. ৬৪৫ : ভোটদান পদ্ধতি—পৃ. ৬৪৭ : প্রকাশ্য বনাম গোপন পদ্ধতি—পৃ. ৬৪৭ : প্রতিনিধিত্বের আধুনিক তত্ত্ব—পৃ. ৬৫০ : প্রতিনিধিত্বের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক তত্ত্ব—পৃ. ৬৫২ : সমষ্টিবাচক প্রতিনিধিত্বের তত্ত্ব—পৃ. ৬৫৪ : ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব এবং পেশাগত বা বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্ব—পৃ. ৬৫৬ : পেশাগত বা বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্বের গুণ ও দোষ—পৃ. ৬৫৮ : সংখ্যা-লঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব—পৃ. ৬৫৯ : সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের বিভিন্ন পদ্ধতি—পৃ. ৬৬০ : সীমাবদ্ধ ভোট-পদ্ধতি—পৃ. ৬৬০ : দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতি—পৃ. ৬৬১ : স্তূপীকৃত ভোট-পদ্ধতি—পৃ. ৬৬১ : সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব—পৃ. ৬৬২ : সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব—পৃ. ৬৬২ : প্রতিনিধি ও নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে সম্পর্ক—পৃ. ৬৬৭ : নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক প্রতিনিধি নিয়ন্ত্রণের আধুনিক উপায়—পৃ. ৬৭০ : প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের গুণাগুণ—পৃ. ৬৭২]

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

জনমত ৬৭৫-৬৮৮

[জনমতের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি—পৃ. ৬৭৫ : বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনমতের প্রকৃতি ও ভূমিকা—পৃ. ৬৭৮ : উদারনৈতিক গণ-তান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতের প্রকৃতি ও ভূমিকা—পৃ. ৬৭৮ : সমাজ-তান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনমতের প্রকৃতি ও ভূমিকা—পৃ. ৬৮০ : স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতের প্রকৃতি ও ভূমিকা—পৃ. ৬৮১ : ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থায় জনমতের প্রকৃতি ও ভূমিকা—পৃ. ৬৮২ : প্রকৃত জনমত গঠনের শর্তাবলী—পৃ. ৬৮২ : জনমত গঠন ও প্রকাশের বিভিন্ন মাধ্যম—পৃ. ৬৮৪]

গ্রন্থ-নির্দেশিকা One-Six

অনুশীলনী : রচনাত্মক প্রশ্নাবলী i-xix

অনুশীলনী : সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী xx-xxxiv

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রাবলী a-x

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

[প্রথম পত্র]

প্রথম অধ্যায়

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা, প্রকৃতি, সীমানা ও পদ্ধতি

[Definition, Nature, Limits and Methods of Political Science]

১। ভূমিকা (Introduction)

সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম শাখা হোল রাষ্ট্রবিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি, বিশ্বের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তনশীলতা ; আন্তঃসমাজবিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান সহযোগিতার দাবি ; নিত্যনতুন পদ্ধতির সংযোজন ইত্যাদি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও আলোচনাক্ষেত্রের পরিধিকে পরিব্যাপ্ত ও জটিল করে তুলেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও আলোচনাক্ষেত্রের সীমানা নির্ধারণের প্রশ্নে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় তার ভূমিকা ও প্রকৃতির সর্বজনস্বীকৃত মূল্যায়ন করা অদ্যাবধি সম্ভব হয়নি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হলেন মানুষ, আর মানুষ হোল তার পরিবেশের দাস। পরিবেশের প্রভাব তার চিন্তাধারা ও রাজনৈতিক মতাদর্শকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের পক্ষে তাঁদের নিজ নিজ পরিবেশের প্রভাবমুক্ত হয়ে নিরপেক্ষভাবে রাজনৈতিক গবেষণা চালানো খুবই কঠিন কাজ। অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রচলিত ধ্যানধারণার মানদণ্ডে তাঁরা রাজনৈতিক জীবন, প্রতিষ্ঠান, মতাদর্শ ইত্যাদিকে বিচারবিশ্লেষণ করে থাকেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় ভিন্নতা আসে। ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু, প্রকৃতি ইত্যাদি আলোচনার সময় তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্ব-ধারণার (pre-conviction) দ্বারা পরিচালিত হন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের প্রথমেই যে সমস্যাটির সম্মুখীন হতে হয় তা হোল তার সর্বজনগ্রাহ্য নামকরণের (nomenclature) সমস্যা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন, যেমন—'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' (Political Science), 'রাজনীতি' (Politics), 'সাধারণ প্রশাসন' (Public Administration), 'তুলনামূলক সরকার' (Comparative Governments) ইত্যাদি। এর ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিষয়বস্তু নিয়ে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়। তবে আমরা মোটামুটিভাবে আমাদের আলোচ্য বিষয়কে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' নামেই অভিহিত করব।

২। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা (Definition of Political Science)

সনাতন ধারণা অনুসারে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলিতে সেই বিষয়টিকে বোঝায়, যা সমাজবদ্ধ মানুষের রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক জীবন নিয়ে আলোচনা করে। অন্যভাবে বলা যায়, রাষ্ট্রের উৎপত্তি, প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, কার্যাবলী প্রভৃতি যে বিষয়ের মধ্যে আলোচিত হয়, তাকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে অভিহিত করা হয়। অধ্যাপক গেটেল (Gettell)-এর মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান হোল রাষ্ট্র কি ছিল তার ঐতিহাসিক অনুসন্ধান, বর্তমান রাষ্ট্র সম্পর্কে

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সনাতন সংজ্ঞা

একটি বিশ্লেষণমূলক এবং ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে একটি রাষ্ট্রনৈতিক ও নীতিশাস্ত্রসম্মত আলোচনা।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। অধ্যাপক গার্নার (Garner) প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলতে সেই বিষয়টির কথা উল্লেখ করেছেন, যা কেবলমাত্র রাষ্ট্রকে নিয়ে আলোচনা করে। র‍্যাফেল প্রমুখ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অনেকেই এই অভিমত পোষণ করেন যে, যা রাষ্ট্রকে স্পর্শ করে তা-ই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত—এই পূর্বতন মতবাদ এখনও গ্রহণযোগ্য। আবার পল জাঁনে (Paul Janet)-র মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান হোল সমাজবিজ্ঞানের সেই অংশ, যা রাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তি এবং সরকারের নীতিসমূহ নিয়ে আলোচনা করে। বার্জেস (Burges)-এর মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান হোল স্বাধীনতা ও সার্বভৌমিকতার বিজ্ঞান। কিন্তু রবসন (Robson), লাসওয়েল (Lasswell), অ্যালান বল (Alan R. Ball) প্রমুখ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপরি-উক্ত সংজ্ঞাগুলিকে সংকীর্ণতা-দোষে দুষ্ট বলে অভিযোগ করেন। ম্যাকেঞ্জি রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আলোচনার ধারাকে অত্যধিক 'আইনমুখী' (legalistic), 'কৃত্রিম' (artificial) এবং 'খামখেয়ালীপূর্ণ' (arbitrary) বলে বর্ণনা করেন। কোনও ঘটনাকে রাজনৈতিক উৎকর্ষমণ্ডিত করতে পারে এমন সব উপাদানের উপর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আলোচনা কোন আলোকপাত করতে পারে না বলে ডেভিড ইস্টন (David Easton) এরূপ আলোচনার ধারাকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আলোচনার মধ্যে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আচরণের কোন স্থান নেই বলে আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ একে মেনে নিতে সম্মত নন। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান কেবলমাত্র রাষ্ট্রকে নিয়েই আলোচনা করে না, সেই সঙ্গে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল, কোন গোষ্ঠী বা ব্যক্তির রাজনৈতিক আচার-আচরণ, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী প্রভৃতি নিয়েও আলোচনা করে। লাসওয়েলের মতে, সমাজের প্রভাব ও প্রভাবশালীদের সম্পর্কে আলোচনা ও বিশ্লেষণের নামই হোল রাষ্ট্রবিজ্ঞান। রবার্ট ডাল (Robert Dalh)-কে অনুসরণ করে বলা যায়, যখন সমাজস্থ কোন ব্যক্তি নিজ ইচ্ছানুযায়ী অন্য কোন ব্যক্তিকে দিয়ে কোন কাজ করিয়ে নেয়, তখন পূর্বোক্ত ব্যক্তিকে 'প্রভাবশালী' এবং তার ক্ষমতাকে 'প্রভাব' বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। বিভিন্ন ব্যক্তির প্রভাবের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা ছাড়া রাজনৈতিক জীবনের পর্যালোচনা করা সম্ভব নয় বলে রবার্ট ডাল মনে করেন। আবার ডালের মতো অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী 'ক্ষমতা' (power)-কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বলে বর্ণনা করেছেন। 'ক্ষমতা, শাসন বা কর্তৃত্ব' (power, rule or authority)-কে রবার্ট ডাল রাজনৈতিক আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু বলে মনে করেন। অ্যালান বল, অস্টিন রেনি, মিলার প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ বিরোধ ও অনৈক্যকে (conflict and disagreement) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী। অ্যালান বল এই অভিমত পোষণ করেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান হোল সেই বিষয়, যা সমাজস্থ মানুষের বিরোধ এবং বিরোধের মীমাংসা নিয়ে আলোচনা করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আধুনিক সংজ্ঞা নিয়ে মতবিরোধ

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মার্কসীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুও হোল বিরোধ বা দ্বন্দ্বের ধারণা (the notion of conflict)। কিন্তু অ-মার্কসীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের বিরোধ সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে মার্কসবাদীদের বিরোধ সম্পর্কিত ধারণার মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অ-মার্কসীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সমস্যার মধ্যেই বিরোধের বীজ নিহিত থাকে বলে মনে করেন। তাই সমস্যার সমাধান হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিরোধের অবসান ঘটবে বলে তাঁদের ধারণা। বলা বাহুল্য, আপস-মীমাংসার মাধ্যমে বিরোধের নিষ্পত্তি সম্ভব বলে তাঁরা প্রচার করেন। কিন্তু মার্কসবাদীরা বিরোধ বা দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব অনেক গভীরে নিহিত আছে বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, প্রভুত্ব ও অধীনতার ব্যবস্থার (a state of domination and subjection) মধ্যেই বিরোধের মূল কারণ লুকিয়ে থাকে। আপস-মীমাংসার দ্বারা এর নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। যে-সব কারণে এই ব্যবস্থার উৎপত্তি ঘটেছে তাদের সম্পূর্ণ রূপান্তর (total transformation) ছাড়া বিরোধের অবসান ঘটবে না। অন্যভাবে বলা যায়, শ্রেণীসংগ্রামই হোল মার্কসীয় রাজনীতির মূল কথা এবং সাম্যবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত শ্রেণীসংগ্রাম বা শ্রেণীবৈরিতার অবসান ঘটবে না বলে মার্কসবাদীরা মনে করেন। ডেভিড ইস্টনের মতে, রাষ্ট্র কিংবা ক্ষমতা কোনটাই রাষ্ট্রনৈতিক অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু নয়। তাঁর মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান হোল মূল্যের কর্তৃত্বসম্পন্ন বরাদ্দের (authoritative allocation of values) পাঠ, কারণ তা ক্ষমতার বণ্টন ও প্রয়োগের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। কোন মূল্যবান বস্তুর বন্টন নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ বাধলে প্রচলিত প্রথার ভিত্তিতে যখন সেইসব বিরোধের মীমাংসা সম্ভব হয় না, তখন সামাজিক কর্তৃত্বের সাহায্যে একটি নীতি প্রণয়ন করা হয়। এই নীতি বা সিদ্ধান্তকে 'কর্তৃত্ব-সম্পন্ন' বলে বর্ণনা করা হয়। প্রয়োজন হলে সামাজিক কর্তৃত্ব বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নিজের সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করে থাকে। ই. সি. স্মিথ্ এবং এ. জে. জার্চার রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম শাখা হিসেবে বর্ণনা করে রাষ্ট্রের তত্ত্ব, সংগঠন, সরকার ও বাস্তব অবস্থাকে এর আলোচ্য বিষয়সূচীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বস্তুতঃ বিংশ শতাব্দীর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটের বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হওয়ার ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কর্মক্ষেত্রের পরিধি ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। এই নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি রেখে আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মোটামুটি সন্তোষজনক একটি সংজ্ঞা নির্দেশ করতে পারি : রাষ্ট্রবিজ্ঞান হোল সমাজবিজ্ঞানের সেই শাখা, যা বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের তত্ত্ব, সংগঠন, শাসনপ্রণালী ও তার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ, আন্তর্জাতিক আইন, সংগঠন ইত্যাদি সম্পর্কে এবং বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা ও মূল্যায়ন করে।

একটি সন্তোষজনক সংজ্ঞা

৩। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি এবং সীমানা (Nature and Limits of Political Science)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র তথা বিষয়বস্তুর পরিধি বা সীমানা নির্ধারণ করা সহজ নয়। কারণ—১. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে

সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে গিয়ে রাজনৈতিক জীবনের সমস্যা ও জটিলতা দুই-ই অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ; তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তুকে সুনির্দিষ্ট সীমানা বা গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করা সম্ভব নয়। আর তা করা হলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গতিশীল চরিত্র বিনষ্ট হবে। ২. বর্তমানে কোন সমাজবিজ্ঞানই এককভাবে চলতে পারে না। রাষ্ট্রবিজ্ঞান যেহেতু সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা, সেহেতু তার পক্ষেও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞান-নিরপেক্ষ হয়ে চলা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বর্তমান জনকল্যাণকামী ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের কাজ কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রকৃতিসম্পন্নই নয়, সেই সঙ্গে অর্থনৈতিকও বটে। তাই ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ, কর বসানো, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ ইত্যাদি কাজ রাষ্ট্রকেই সম্পাদন করতে হয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নিশ্চিতভাবেই অর্থবিদ্যার দ্বারস্থ হতে হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সীমানা নির্ধারণের সমস্যা

বস্তুতঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সীমানা বা আলোচনাক্ষেত্রের পরিধির ব্যাপকতা নিয়ে সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। এতদিন পর্যন্ত গার্নার, ব্লুন্টস্‌লি প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ কেবলমাত্র রাষ্ট্রকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বলে বর্ণনা করেছিলেন। গার্নারের ভাষায়, "রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সূচনা ও সমাপ্তি রাষ্ট্রকে নিয়েই।" কিন্তু সিলী (Seeley), স্টিফেন লীকক (Stephen Leacock) প্রমুখের মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান কেবলমাত্র সরকারকে নিয়েই আলোচনা করে। এই দুই পরস্পর বিরোধী মতের সমন্বয়সাধন করে অধ্যাপক ল্যাস্কি (Laski), গেটেল, গিলক্রিস্ট (Gilchrist) প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ বলেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান কেবলমাত্র রাষ্ট্র কিংবা কেবলমাত্র সরকারকে নিয়ে আলোচনা করে না ; রাষ্ট্র এবং সরকার উভয়ই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে যদি রাষ্ট্র সম্পর্কে তত্ত্বগত ও বাস্তব—উভয় দিককেই স্থান দেওয়া না হয়, তাহলে বিষয়বস্তুর পরিপূর্ণতা আসবে না। তাই বর্তমানে রাষ্ট্র ও সরকার উভয়কেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সীমানার প্রশ্নে মতবিরোধ

কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আলোচনার ধারাকে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ সংকীর্ণতাদোষে দুষ্ট বলে মনে করেন। ম্যাকেঞ্জি এরূপ ধারাকে অত্যধিক 'আইনমুখী', 'কৃত্রিম' এবং 'খামখেয়ালীপূর্ণ' বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি প্রধানতঃ চারটি দিক থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আলোচনাধারার সমালোচনা করেন ঃ

রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আলোচনাধারা-সমালোচনা

প্রথমতঃ, বিশ্বের নতুন রাষ্ট্রগুলির প্রকৃতি ভালভাবে অনুধাবন করলে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, অধিকাংশ রাষ্ট্রই এমন সব সমাজের অন্তর্ভুক্ত যেখানে পাশ্চাত্যের মত রাষ্ট্রব্যবস্থা দেশের ভেতর থেকে গড়ে উঠেনি ; বরং তাকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, নয়তো বাছাই করা হয়েছে। ঐসব দেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের মধ্যেকার সম্পর্ক অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক।

দ্বিতীয়তঃ, পাশ্চাত্যের রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে সম্পর্কের পরিবর্তন সাধিত হওয়ার ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পুরোনো ধারণা পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হয়ে

পড়েছে। বর্তমানে তাই রাষ্ট্র ও নাগরিক সংগঠনগুলির মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা নির্ধারণ করা যথেষ্ট কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তৃতীয়তঃ, সমাজবিজ্ঞানগুলির ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও পারস্পরিক সহযোগিতা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সীমানা সম্পর্কে পুরোনো ধারণার উপর কঠিন আঘাত হেনেছে। আধুনিক সমাজবিদ্যা, সামাজিক নৃতত্ত্ব, সামাজিক মনস্তত্ত্ব ইত্যাদির আবির্ভাবের ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর আইনশাস্ত্রের প্রভাব ক্ষুন্ন হয়েছে। বস্তুতঃ বর্তমানে সমস্ত সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান কোন-না-কোন ভাবে গ্রহণ করেছে। ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকেনি ; তার ব্যাপকতা অনেক বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে।

চতুর্থতঃ, বর্তমানে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার সময় সামাজিক মনস্তত্ত্ব (Social Psychology), ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজতত্ত্ব (Micro-Sociology), সামাজিক ভাষাতত্ত্ব (Social Linguistic) ও সামাজিক নৃতত্ত্বের গবেষণা-পদ্ধতি অনুসরণ করতে শুরু করেছেন। এইভাবে গতানুগতিকতার বন্ধন কাটিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজের বৃহত্তর আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে শুরু করেছে। ম্যাকেঞ্জির মতো ডেভিড ইস্টনও মন্তব্য করেছেন, যেসব উপাদান কোনো ঘটনাকে রাজনৈতিক উৎকর্ষ প্রদান করে, রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আলোচনা তা বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

রবসন, লাসওয়েল, অ্যালান বল প্রমুখ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অনেকেই এই অভিমত পোষণ করেন যে. রাষ্ট্রবিজ্ঞান কেবলমাত্র রাষ্ট্রকে নিয়েই আলোচনা করে না,

সাম্প্রতিক অভিমত

সেই সঙ্গে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল, কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও আচার-আচরণ, চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী প্রভৃতিকে নিয়েও আলোচনা করে। লাসওয়েল এবং রবার্ট ডাল মনে করেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজের প্রভাব ও প্রভাবশালীদের নিয়ে আলোচনা করে। কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আবার 'ক্ষমতা'কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী। অ্যালান বল, অস্টিন রেনি, মিলার প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী 'বিরোধ ও অনৈক্য'কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ই. সি. স্মিথ এবং এ. জে. জার্চার রাষ্ট্রের তত্ত্ব, সংগঠন, সরকার ও বাস্তব অবস্থাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়সূচীর অন্তর্ভুক্ত করার সপক্ষে অভিমত পোষণ করেন।

কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অভিমতগুলি সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয় যাঁরা রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আলোচনার

আধুনিক মতের সমালোচনা

পক্ষপাতী তাঁরা আসল বস্তুকে বাদ দিয়ে উপলক্ষ্যকে নিয়ে মাতামাতি করেন বলে সমালোচনা করা যেতে পারে। র‍্যাফেলের মতে, যাবতীয় রাজনৈতিক আচার-আচরণের ধারা সমাজের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণকারী সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। তাই সরকার ও রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন আলোচনাই পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে যাঁরা সমাজের প্রভাব ও প্রভাবশালীদের সম্পর্কে

আলোচনা বলে অভিমত পোষণ করেন, তাঁরা 'প্রভাব' শব্দটিকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করার পক্ষপাতী। কিন্তু সমাজের সব রকম প্রভাবকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়-বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন নয়। কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রভাবই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর মধ্যে পড়ে। এইভাবে পুত্রের উপর পিতার প্রভাব প্রকৃতিগতভাবে রাজনৈতিক না হওয়ায় এরূপ প্রভাবকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অঙ্গীভূত করা উচিত নয়। কিন্তু কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই ধরনের প্রভাবকেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়-বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। আবার যাঁরা সমাজের সর্ব-প্রকার বিরোধকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন তাঁদের সমালোচনা করে বলা যায়, যে-কোন ধরনের বিরোধকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। একটি পুতুল নিয়ে ভাই-বোনের মধ্যে যে বিরোধ বাধে তাকে কোনক্রমেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। সর্বোপরি, রাষ্ট্রবিহীন রাষ্ট্রবিজ্ঞান গঠনের প্রবক্তাগণ বুর্জোয়া রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি বিশেষভাবে আসক্ত বলে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের শ্রেণী-চরিত্রকে আড়াল করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আলোচনাকে পরিহার করার কথা প্রচার করেন। আবার ইস্টনের মতো আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ তাঁদের প্রচারিত তত্ত্বের মাধ্যমে প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিপদ কোন্ দিক থেকে আসতে পারে তার ইঙ্গিত দিয়ে পুঁজিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বজায় রাখার প্রয়াস পেয়েছেন। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী যে প্রকৃতিগতভাবে বিশেষ রক্ষণশীল তা বলাই বাহুল্য। এইভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছে তার কোন সুষ্ঠু সমাধান করা অদ্যাবধি সম্ভব হয়নি।

উল্লেখ যোগ্য যে, আধুনিক রাষ্ট্র ও সরকার সম্পর্কিত কোন আলোচনাই পূর্ণতা লাভ করবে না যদি আমরা তাদের সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করতে না পারি। এই বিশ্লেষণমূলক আলোচনা চালাতে হলে ইতিহাসের সাহায্য নিয়ে রাষ্ট্র ও সরকার সম্পর্কে অতীত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে। এই অতীতকে আলোচনা করে আমরা জানতে পারি কিভাবে রাষ্ট্র ও সরকার দীর্ঘ ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। কিন্তু রাষ্ট্র ও সরকারের অতীত ও বর্তমান সম্বন্ধে ধারণা লাভ করে আমাদের কখনই সন্তুষ্ট থাকা সমীচীন নয়। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের সাহায্যে অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে যে জ্ঞান অর্জন করা যায় তারই আলোকে আগামী দিনের রাষ্ট্রের একটি বাস্তবভিত্তিক চিত্রও তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সরকারের অতীত ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটি তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে আমরা সহজেই ভাবীকালের জন্য একটি আদর্শ রাষ্ট্র ও সরকারের চিত্র অঙ্কন করতে পারি। এই আদর্শ রাষ্ট্র ও সরকার আমাদের উত্তরসূরীদের জীবনকে সুন্দর ও সুখসমৃদ্ধ করে তুলতে পারবে—এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা আগামী দিনের রাষ্ট্র ও সরকারের রূপরেখা তৈরি করি। সে দিক থেকে বিচার করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে একটি 'উদ্দেশ্যমূলক বিজ্ঞান' বলে অভিহিত করা হয়। এ বিষয়ে অধ্যাপক গেটেলের অভিমত বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য। তাঁর মতে রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও মতবাদসমূহের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে

রাষ্ট্রবিজ্ঞান উদ্দেশ্য-মূলক ও বাস্তব বিশ্লেষণমূলক বিজ্ঞান

আলোচনা করাই হোল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এইভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে একদিকে উদ্দেশ্যমূলক বিজ্ঞান এবং অন্যদিকে বাস্তব বিশ্লেষণমূলক বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

সিউজ্জক (Sidgwick), জেলিনেক (Jellinek), পোলক (Pollock) প্রমুখ রাষ্ট্রনীতিবিদ্গণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে দুভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন। এই দুটি ভাগ হোল—ক. তত্ত্বগত রাষ্ট্রনীতি (Theoretical Politics) এবং খ. ফলিত বা ব্যবহারিক রাষ্ট্রনীতি (Applied Politics)। রাষ্ট্রের উৎপত্তি, প্রকৃতি, আইন, স্বাধীনতা প্রভৃতি হোল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তত্ত্বগত আলোচনার দিক এবং সরকারের বিভিন্ন রূপ, তাদের কার্যাবলী, আইন প্রণয়ন, কূটনীতি, বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক চুক্তি প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর ব্যবহারিক দিক। এইভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান 'রাজনীতি' (Politics) ও 'রাষ্ট্রদর্শন' (Political Philosophy)-এর সমন্বয়সাধন করেছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়-বস্তুর শ্রেণীবিভাজন

১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্যারিসে অনুষ্ঠিত 'আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মেলন' (The International Political Science Conference)-এ গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু তথা আলোচনাক্ষেত্র নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। বিষয়গুলি হোল: ১. রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব ও তাদের ইতিহাস, ২. রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, সংবিধান, সরকারী পরিচালন-ব্যবস্থা, বিভিন্ন রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা, ৩. রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী ও জনমত এবং ৪. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক আইন ও সংগঠন। এইভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সীমানা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে রাষ্ট্রের উৎপত্তি, আকৃতি, প্রকৃতি ও কার্যাবলী ছাড়াও কিভাবে রাষ্ট্রনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহ সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়, কোন্ কোন্ বিষয় সরকারী সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে প্রভৃতি রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হয়। বস্তুতঃ সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে মানুষের কেবল রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক আলোচনা ও বিশ্লেষণ করাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ নয়, সেই সঙ্গে সমাজস্থ অন্যান্য সম্পর্ক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়সূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক সম্পর্কও বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়সূচীর এক অপরিহার্য অঙ্গ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রের সীমানার ব্যাপকতা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে মাইকেল কারটিস (Michael Cartis) বলেছেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত রাষ্ট্রনৈতিক সংবিধানসমূহকে নিয়ে আলোচনা করে না; সেই সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত নয় এমন সংগঠনসমূহ, রাজনৈতিক দল, চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, ভোট সম্পর্কিত ব্যবহার, বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের ভূমিকা, সামাজিক ব্যবহার, অভ্যাস ও প্রথা, সমাজের সাধারণ সংস্কৃতি ও শিক্ষাগত ধরন, যোগাযোগ ও প্রভাব বিস্তারের উপায়সমূহ, সমাজের অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত ও জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন অবস্থার বিচারবিশ্লেষণ করে।"

আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞান সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব

কিন্তু মার্কসবাদীরা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁদের মতে, যেহেতু শ্রেণীবিভক্ত সমাজে রাষ্ট্রের সহায়তায়

অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রভুত্বকারী শ্রেণী নিজেদের শ্রেণীশাসন ও শ্রেণীশোষণকে অব্যাহত রাখার জন্য সচেষ্ট হয় সেহেতু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাই হোল রাজনীতির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। কারণ, এরূপ সমাজে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীদ্বন্দ্ব বা শ্রেণীসংঘর্ষ নিরন্তর চলতে থাকে। এই দ্বন্দ্বশীল সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ ও উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য শ্রেণীগুলি যে-সব পদ্ধতি অবলম্বন করে রাজনীতির মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটে। তাই লেনিন বলেছেন, বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গে রাষ্ট্র ও সরকারের সম্পর্ক এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কই হোল রাজনীতি। তবে একথা সত্য যে, মার্কসবাদীদের মতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা রাজনীতির প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হলেও তা জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ককে নিয়েও আলোচনা করে। তাছাড়া, বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত বলে মার্কসবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন। সুতরাং বলা যায়, মার্কসীয় দৃষ্টিতে রাষ্ট্রীয় কার্যে অংশগ্রহণ, রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রীয় কার্যের বিভিন্নরূপ, লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু নির্ধারণকেই রাজনীতি বলা হয়। তবে রাজনীতির তাত্ত্বিক মূল কথাগুলি জানাই যথেষ্ট নয়, রাজনীতিকে তার ক্রিয়ার মধ্যে দেখা এবং তার লক্ষ্য ও ফলাফল দেখতে পারাকেও মার্কসবাদীরা অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করেন। উল্লেখযোগ্য যে, সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে যেহেতু সমাজের বুক থেকে রাষ্ট্র অপ্রয়োজনীয় বলে নিজেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে, সেহেতু এরূপ সমাজে রাজনীতির প্রকৃতি ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও স্বাভাবিক পরিবর্তন সূচিত হবে।

মার্কসবাদীদের অভিমত

বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সহযোগিতা বৃদ্ধির ফলে তার সীমানা নির্ধারণের প্রচেষ্টা জটিল আকার ধারণ করেছে। তবে বিষয়বস্তুর সীমাবদ্ধকরণ না হলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার সময় রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে পালহীন নাবিকের মতো বিভ্রান্তির সাগরে তলিয়ে যেতে হবে। তাই ম্যাকেঞ্জি বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির মাধ্যমে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সীমানা নির্ধারণ করা সম্ভব বলে মনে করেন। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর বিশেষীকরণের প্রভাব যথেষ্টভাবে পড়েছে। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর শ্রেণীবিভাজনকে বিশেষীকরণের প্রত্যক্ষ ফল বলে মনে করা হয়। তার বিভিন্ন দিকের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ও গবেষণা তাদের একটা নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে। বস্তুতঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি এতই ব্যাপক যে তাকে শ্রেণীবিন্যস্ত করা না হলে সুষ্ঠুভাবে বিচারবিশ্লেষণ করা যায় না। তাই সাধারণভাবে নিম্নলিখিত উপায়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর শ্রেণীবিভাজন করা হয়ঃ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর আধুনিক শ্রেণীবিভাজন

১. রাজনৈতিক তত্ত্ব, দর্শন, আদর্শ ইত্যাদি অর্থাৎ তাত্ত্বিক দিক ; ২. রাজনৈতিক দল, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, জনমত ইত্যাদি, যা সরকার ও রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ; ৩. সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক আইন ; ৪. নাগরিক প্রশাসন ; ৫. আন্তর্জাতিক আইন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান

ইত্যাদি ; ৬. বিভিন্ন সরকারের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা এবং ৭. স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকার। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগকে অনেকে প্রধানতঃ দূরকল্পনাগত (Speculative) এবং প্রতিষ্ঠানগত (Institutional)—এই দুভাগে বিভক্ত করেন। রাজনৈতিক তত্ত্ব, দর্শন, আদর্শ ইত্যাদিকে প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং অন্যান্যগুলিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়।

৪। রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান পদবাচ্য ? (Is Political Science a Science ?)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান পদবাচ্য কিনা তা নিয়ে রাষ্ট্রনীতিবিদদের মধ্যে যথেষ্ট মত-বিরোধ রয়েছে। এই মতবিরোধকে আমরা দুভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করতে পারি।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান-পদবাচ্য কিনা তা নিয়ে মতবিরোধ

কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান পদবাচ্য বলে মনে করেন। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে 'শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান' (Master Science) বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন মন্তেস্কু, হবস, ব্লুন্টস্‌লি, লর্ড ব্রাইস, পোলক প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং আধুনিক আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ (Behaviouralists)। কিন্তু ব্যাক্‌ল, কোঁত (Comte), মেটল্যান্ড (Maitland) প্রমুখরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে কোনমতেই বিজ্ঞান বলে স্বীকার করে নিতে সম্মত নন। মেটল্যান্ড একবার বলেছিলেন, "যখন আমি কোন পরীক্ষায় এমন প্রশ্নপত্র দেখি যার শিরোনাম 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান,' তখন আমার দুঃখ হয় শিরোনামটির জন্য, প্রশ্নগুলির জন্য নয়।"

রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে স্বীকার না করার যুক্তি

যাঁরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে স্বীকার করে নিতে অসম্মত তাঁরা নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করেন :

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়-বস্তুর ব্যাপকতা

১. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ব্যাপক, জটিল এবং অনিশ্চিত। যেমন পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান প্রভৃতির ক্ষেত্রে যেরূপ বিষয়বস্তুর যথাযথ পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং শ্রেণীবিন্যাস করে আলোচনা করা সম্ভব সেরূপ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-সমূহ কার্যকরী হয় না

২. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুসন্ধান ও পরীক্ষামূলক পদ্ধতি কখনই সঠিকভাবে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। কারণ মানুষ এবং মনুষ্য সমাজই হোল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। প্রকৃতিবিজ্ঞানীর মতো রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নিজের প্রয়োজনে গবেষণাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে নিতে পারেন না। তাঁদের নির্ভর করতে হয় বাহ্যিক পরিবেশের ওপর। এই বাহ্যিক পরিবেশ পরিবর্তনশীল বলেই তা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর আয়ত্তের বাইরে। তাই বহু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে অনুমানের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। ফলে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ অনেক সময় তর্কের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব নয় ; আর সম্ভব হলেও তা বিপজ্জনক। সর্বোপরি, কোনও ঘটনা বা সামাজিক বিষয়ের সঙ্গে একাধিক উপাদান

ও কারণ জড়িত থাকে। ঐসব উপাদান ও কারণের মধ্যে কোন্‌টি মুখ্য এবং কোন্‌টি গৌণ তা বিশেষ কোন গবেষণাগারে পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ণয় করা যায় না। তাই বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তাঁর সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী সে সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং সেটিকে তত্ত্বের আকারে প্রচার করেন। এইভাবে পুঁজিবাদের সমর্থক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা পুঁজিবাদী সমাজে অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য দায়ী করেন শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধিকে। কিন্তু পুঁজিবাদ-বিরোধী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকে পুঁজিবাদের স্বাভাবিক ফল বলে মনে করেন।

৩. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়সমূহ সম্পর্কে গবেষণা চালাবার কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই। বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণের কথা বলেছেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসৃত পদ্ধতি ও নীতিসমূহ নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা একমত নন

ফলে অনেকগুলি পদ্ধতির অস্তিত্ব চোখে পড়ে, যথা—পর্যবেক্ষণ-মূলক পদ্ধতি, পরীক্ষামূলক পদ্ধতি, সমাজবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি, তুলনামূলক পদ্ধতি, ঐতিহাসিক পদ্ধতি, দার্শনিক পদ্ধতি, ইত্যাদি। অনুরূপভাবে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নীতি ও তত্ত্বসমূহের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য তা নিয়েও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, রাষ্ট্রের প্রকৃতি, কার্যাবলী প্রভৃতি নিয়ে যেমন মতভেদ রয়েছে, তেমনি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র প্রভৃতির ব্যাখ্যা নিয়েও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কিন্তু ভৌতবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন বিরোধ দেখা যায় না।

৪. বস্তুজগৎ যেমন প্রাকৃতিক নিয়ম (Natural Laws) অনুসারে চলে, রাষ্ট্র-

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়

বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সেইরূপ কোন নিয়ম অনুসারে চলে না। তাই কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কোন একটি রাজনৈতিক বিষয় সম্বন্ধে সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন না।

৫. একজন বিজ্ঞানী নিরপেক্ষভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা চালান। এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে তাঁর কোন পূর্বধারণা থাকে না। কিন্তু একজন রাষ্ট্র-

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মূল্য-মান-নিরপেক্ষ নন

বিজ্ঞানী কখনই নিরপেক্ষভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা চালাতে পারেন না। কারণ তাঁর সামাজিক অবস্থান তাঁর চিন্তাভাবনাকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করে। তাই তিনি সমাজের অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রভুত্বকারী শ্রেণীর সপক্ষে কিংবা বিপক্ষে থাকেন বলে তাঁর পক্ষে শ্রেণীনিরপেক্ষ-ভাবে কোন রাজনৈতিক পর্যালোচনা চালানো সম্ভব হয় না। ফলে কোন্‌টি উচিত, কোন্‌টি উচিত নয়, কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ—সে সম্পর্কে তিনি মতামত জ্ঞাপন করে ফেলেন।

৬. প্রকৃতিবিজ্ঞান বা ভৌতবিজ্ঞান বস্তুজগতের যে-কোন অংশ, এমন কি অণু-পরমাণুকেও তার আলোচনা ও গবেষণার মধ্যে স্থান দেয়। কিন্তু ব্যক্তি-মানুষের

ব্যক্তি-মানুষের আলোচনা রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে সম্ভব নয়

কোন চিন্তা, কার্যকলাপ প্রভৃতিকে সমাজবিজ্ঞান তার গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে না। কেবলমাত্র মানুষের সামাজিক সম্পর্ককে নিয়ে তা আলোচনা করে। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে কার্ল মার্কস বলেছেন, এরূপ ক্ষেত্রে অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা রাসায়নিক বিকারক (reagent) কোন কাজেই লাগে না। উভয়ের স্থান গ্রহণ

করে নির্বিশেষ চিন্তাশক্তি। মরিস কর্নফোর্থও মন্তব্য করেছেন যে, মানুষের সামাজিক সম্পর্ককে যেমন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করা যায় না, তেমনি তাকে পৃথক করে নিয়ে কোন রাসায়নিক বিকারের সাহায্যে তার প্রকৃতিও আবিষ্কার করা যায় না। তাই মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞানীরা ব্যক্তিবিশেষকে নিয়ে আলোচনার পরিবর্তে মানুষের সামাজিক সম্পর্ককে নিয়ে আলোচনা করেন। ব্যক্তিগতভাবে কোন্ শ্রমিক খারাপ এবং কোন্ মালিক ভাল তা আলোচনা না করে তাঁরা সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীকে শোষিত ও মালিকশ্রেণীকে শোষক হিসেবে আলোচনা করার পক্ষপাতী। রাষ্ট্রবিজ্ঞান যেহেতু সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা, সেহেতু এর সম্পর্কেও পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমভাবেই প্রযুক্ত হতে পারে। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে কোনমতেই প্রকৃতিবিজ্ঞানের পদবাচ্য বলে বর্ণনা করা যায় না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলার যুক্তি

কিন্তু স্যার ফ্রেডারিক পোলকের মতে, যাঁরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান পদবাচ্য বলতে অনিচ্ছুক, তাঁরা বিজ্ঞান বলতে কি বোঝায় তা জানেন না। বস্তুতঃ বিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান পদবাচ্য কিনা—এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদান করা সহজসাধ্য হয়ে যায়। বিজ্ঞান হোল পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত কতকগুলি সমস্যা সম্পর্কে সুসংবদ্ধ জ্ঞান। এই জ্ঞান পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও অভিজ্ঞতা দ্বারা নির্ণীত হয়। এই জ্ঞান থেকে কতকগুলি সাধারণ সূত্র অতি সহজেই নির্ধারণ করা যায়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান পদবাচ্য বলার যুক্তি

উপরি-উক্ত অর্থে অনেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান পদবাচ্য বলে মনে করেন। তাঁদের যুক্তি হোল: (ক) অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা, শ্রেণী-বিভক্তিকরণ প্রভৃতি পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটিয়ে রাষ্ট্রের উৎপত্তি, প্রকৃতি, নাগরিকদের আচার-আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা সুসংবদ্ধ জ্ঞানলাভ করতে পারি।

(খ) এই সুসংবদ্ধ জ্ঞান থেকে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম বা সূত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সেই নিয়ম বা সূত্রগুলি রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার সমাধানে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাছাড়া, মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক আচরণের মধ্যেও একটি সুসংবদ্ধ শৃঙ্খলা লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে লর্ড ব্রাইস্ বলেছেন, মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক আচার-আচরণ জটিল হলেও তার মধ্যে সুসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায় এবং এই সামঞ্জস্যই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিত্তি। বিজ্ঞানের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আছে বলেই তাকে বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা চলে। এ বিষয়ে অধ্যাপক গেটেলের উক্তিটি স্মরণযোগ্য। তাঁর মতে, বিজ্ঞান বলতে যদি সুসংবদ্ধ পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতালব্ধ কোন নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও আলোচনা এবং বিশ্লেষণ ও পৃথকীকরণ বোঝায়, তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান যুক্তিসংগতভাবেই বিজ্ঞান বলে নিজেকে দাবি করতে পারে।

সাম্প্রতিককালে আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, গণিত ও পরিসংখ্যানের প্রয়োগ প্রভৃতির মাধ্যমে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পূর্ণ মূল্যমান-নিরপেক্ষ ও বিষয়মুখী আলোচনা সম্ভব বলে মনে করেন। তাঁরা সনাতন উপায়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের

প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক আলোচনার পরিবর্তে ব্যক্তির আচার-আচরণ, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ, রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে ব্যাপক তথ্য সংগ্রহ এবং সেগুলিকে ব্যাখ্যার মাধ্যমে একটি বিশ্লেষণাত্মক ধারণা কাঠামো (a conceptual framework) গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। এইভাবে প্রাকৃতিক বা ভৌতবিজ্ঞানের অনুসৃত পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল্যমান-নিরপেক্ষ পর্যালোচনা সম্ভব বলে তাঁরা দাবি করেন। কিন্তু কেবলমাত্র উপাত্ত (data) সংগ্রহ, রেখাচিত্র অঙ্কন, তালিকা প্রণয়ন প্রভৃতির মাধ্যমে রাজনৈতিক জীবনের বাস্তব ব্যাখ্যা অসম্ভব। তাছাড়া, কেবলমাত্র গণিতের ব্যবহার এবং পরিসংখ্যান পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের রাজনৈতিক জীবনের পরিপূর্ণ ও প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায় না। সর্বোপরি, আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা নিজেদের আলোচনাকে মূল্যমান-নিরপেক্ষ বলে ঘোষণা করলেও কার্যক্ষেত্রে তাঁরা বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে কাম্য ব্যবস্থা বলে ধরে নিয়েই আলোচনার সূত্রপাত করেন। তাই যে-কোন রাজনৈতিক সমস্যা ও সঙ্কটের মূলে যে সামাজিক-অর্থনৈতিক (socio-economic) কারণ নিহিত থাকে তাকে খুঁজে বের করার জন্য তাঁরা সচেষ্ট হন না। সেইসব সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করার পরিবর্তে তাঁরা নিজেদের মূল্যবোধ, সমাজবিশ্বাস প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত হন। বস্তুতঃ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কিছু কিছু পদ্ধতির প্রয়োগ করলেই পদ্ধতিকে বিজ্ঞানসম্মত বলা যায় না। সামাজিক বাস্তবতাকে বিশ্বস্তভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ তুলে ধরতে পারছেন কিনা তার উপর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সার্থকতা নির্ভর করে। আচরণবাদী পদ্ধতি সামাজিক বাস্তবতাকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে বলে তাঁদের অনুসৃত পদ্ধতিকেও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলে মনে করা হয়। কেবলমাত্র ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে সামাজিক বাস্তবতাকে যথার্থভাবে তুলে ধরা সম্ভব। কারণ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ মানুষকে বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা করার পরিবর্তে তার সামাজিক অবস্থান ও সম্পর্কের ভিত্তিকে পর্যালোচনা করে। ইতিহাসের মতো ঘটনাপ্রবাহকে বর্ণনা করা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের কাজ নয়; তার কাজ হোল মানবজীবনের যথার্থ বিকাশের সাধারণ নীতি আবিষ্কার করা। ভাববাদ ও যান্ত্রিক বস্তুবাদকে খণ্ডন করে "ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সমাজ বিকাশের মৌল নিয়ামক শক্তি হিসেবে বিষয়গত অবস্থা এবং বিষয়ীগত উপাদান উভয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।"

আচরণবাদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান

পরিশেষে বলা যায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে অনেকে বিজ্ঞান পদবাচ্য বলে মনে করলেও পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা প্রভৃতি ভৌতবিজ্ঞানের সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। প্রথমতঃ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী তাঁর বিষয়বস্তুকে অপরিবর্তিত রেখে তার প্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে পারেন। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর গবেষণাগার হোল সমগ্র সমাজ এবং গবেষণার বিষয়বস্তু হোল মানুষ। উভয়ই পরিবর্তনশীল। ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত অনেক সময় ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হতে পারে। তাছাড়া, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে অনেক ক্ষেত্রে অনুমানের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। সেই সিদ্ধান্তসমূহ যে সর্বক্ষেত্রে অভ্রান্ত হবে এমন কোন কথা নেই। সর্বোপরি,

রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের সূত্রগুলি সর্বত্রই এক এবং অভিন্ন। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সূত্রগুলি সর্বত্র একইভাবে গৃহীত না-ও হতে পারে। এইসব ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য লর্ড ব্রাইস রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আবহবিদ্যা (Meteorology)-র ন্যায় অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন। তবে একথা সত্য যে, মানুষের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অভিজ্ঞতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে মানুষের সমাজ-জীবন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের পক্ষে সহজতর হয়েছে। তাই লর্ড ব্রাইস্ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে 'একটি প্রগতিশীল বিজ্ঞান' বলে অভিহিত করেছেন। আবার অনেকের মতে, সামগ্রিকভাবে সমাজ ও সমাজের বিকাশ কতকগুলি বস্তুনিষ্ঠ নিয়মের অধীন। এই নিয়মগুলি জেনে সমাজের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে কতকগুলি সাধারণ সূত্র নির্ধারণ করা সম্ভব। রাষ্ট্র যেহেতু সমাজের অংশ সেহেতু রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও কতকগুলি সাধারণ সূত্র নির্ধারণ ও ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব।

৫। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন আলোচনা-পদ্ধতি ও তাদের সমস্যা (Different Methods of Political Science and their problems)

প্লেটোর সময় থেকে শুরু করে অদ্যাবধি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা-পদ্ধতি নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা-পদ্ধতি সম্পর্কিত আলোচনা বিশেষ ব্যাপকতা লাভ করে। কোঁত, জন স্টুয়ার্ট মিল, লর্ড ব্রাইস প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর উদ্যোগে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা-পদ্ধতির যে সূত্রপাত হয় ডারউইনের 'বিবর্তনবাদ', মার্কসের 'আর্থিক তত্ত্ব', সমাজতত্ত্বের সুসংবদ্ধ আলোচনার প্রসার এবং বর্তমানে ভৌতবিজ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগের চেষ্টার ফলে তার বিশেষ পরিবর্তন সূচিত হয়। সাম্প্রতিককালে পদ্ধতিগত বিতর্কের ধারা মূলতঃ সংখ্যায়নের দাবি সম্বলিত পদ্ধতি ও মূল্যবোধযুক্ত বর্ণনাত্মক অনুসন্ধান-পদ্ধতির মধ্যে কেন্দ্রীভূত। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার জন্য মোটামুটিভাবে যেসব পদ্ধতির অনুসরণ করা হয় সেগুলির মধ্যে, ১. দার্শনিক পদ্ধতি, ২. ঐতিহাসিক পদ্ধতি, ৩ আইনগত পদ্ধতি, ৪ তুলনামূলক পদ্ধতি, ৫. পরীক্ষামূলক পদ্ধতি, ৬. পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি, ৭. মনোবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি, ৮. সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি, ৯. জীববিদ্যামূলক পদ্ধতি এবং ১০ অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার বিভিন্ন পদ্ধতি

[১] **দার্শনিক পদ্ধতি (Philosophical Method):** দার্শনিক পদ্ধতি প্রধানতঃ কোন বস্তুনিরপেক্ষ বা স্বতঃসিদ্ধকে স্বীকার করে নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করে। অন্যভাবে বলা যায়, এই পদ্ধতির প্রচারকগণ বাস্তব রাজনৈতিক জগৎ থেকে অভিজ্ঞতা আহরণ না করে পূর্বপরিকল্পিত সিদ্ধান্তের দ্বারা পরিচালিত হয়ে রাষ্ট্রের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতেন। তাঁদের অনুসৃত পদ্ধতিকে অবরোহ পদ্ধতি (Deductive Method) বলে অভিহিত করা হয়। রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক জীবনের

দার্শনিক পদ্ধতির মূল বক্তব্য

সর্বজনীন মূল্যবোধ নির্ণয় করা এবং সেই মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র ও সমাজ, নাগরিক আইন, নাগরিক অধিকারের নীতি ইত্যাদি প্রণয়ন করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। তাঁদের আলোচনায় ঔচিত্য ও অনৌচিত্যের প্রশ্ন সংযুক্ত থাকত। তাই তাঁদের ভাববাদী দার্শনিক বলে চিহ্নিত করা হয়। প্লেটো, রুশো, হেগেল, কান্ট, ব্লুন্টস্‌লি, টমাস ম্যুর, গ্রীন, বোসাংকোয়েত প্রমুখ দার্শনিক এই পদ্ধতি প্রচার করেন।

দার্শনিক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতাকে কোনমতেই উপেক্ষা করা যায় না। প্রথমতঃ, রাজনৈতিক জীবনের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত না করে ঐসব দার্শনিক কাল্পনিক জীবনের চিত্র অঙ্কিত করেছেন এবং রাজনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য তাঁরা অবাস্তব পন্থার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, আদর্শ (Ideal) এবং বাস্তব (Real) নীতির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের ক্ষেত্রে তাঁরা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। অনেক সময় তাঁরা মানুষের চরিত্র চিত্রণ করতে গিয়ে অতি-সরলীকরণের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। ফলে, মনুষ্য-চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ রূপ তাঁরা অঙ্কিত করতে পারেননি। তবে অ্যালান বলের মতে, তাঁরা অতীত ও বর্তমানের রাজনৈতিক চিন্তার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তাছাড়া, তাঁদের চিন্তার কাঠামো দুর্বল হলেও তাঁরাই যে সর্বপ্রকার তুলনামূলক সরকারের আলোচনার সূত্রপাত করেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে বর্তমানে বস্তুতান্ত্রিক চিন্তার প্রসার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভূতপূর্ব উন্নতি, সমাজতান্ত্রিক আদর্শের অগ্রগমন ইত্যাদি কারণে দার্শনিক পদ্ধতির উপযোগিতা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে।

দার্শনিক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা

[২] ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method): ঐতিহাসিক পদ্ধতি সনাতন পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হলেও তা দার্শনিক পদ্ধতির বিপরীত। ঐতিহাসিক পদ্ধতির লক্ষ্য হোল সংগৃহীত তথ্য-প্রমাণাদির ভিত্তিতে অতীতের ঘটনাবলীকে বিশ্লেষণ এবং সাম্প্রতিককালের রাজনৈতিক কার্যাবলীর কোনো কোনো দিক সম্পর্কে পরীক্ষামূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের স্বরূপ বুঝতে হলে তাদের উদ্ভব ও ক্রমবিবর্তনের ধারা সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত থাকতে হবে। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে বর্তমানে কর্মসূচীর নির্ধারণ এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করা সম্ভব। তাই পোলক (Pollock) বলেছেন, ঐতিহাসিক পদ্ধতি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে। অতীতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি কেমন ছিল এবং কিভাবে তারা বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে তা ব্যাখ্যা করার জন্য ঐতিহাসিক তথ্যাদি সংগ্রহ করতেই হবে। অধ্যাপক গিলক্রিস্ট (Gilchrist) বলেন যে, ইতিহাস কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণই করে না, ভবিষ্যতের নির্দেশক হিসেবে কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে আমাদের সাহায্য করে। প্লেটো, অ্যারিস্টটল, দান্তে, ম্যাকিয়াভেলি, মন্তেস্কু, মিল প্রমুখ ঐতিহাসিক পদ্ধতির সমর্থক।

ঐতিহাসিক পদ্ধতির প্রতিপাদ্য বিষয়

ঐতিহাসিক পদ্ধতি পরিপূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি না হলেও রাজনৈতিক,

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর বর্ণনাত্মক বিশ্লেষণে তা বিশেষ উপযোগী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঐতিহাসিকগণ তাঁদের পুরাতন পদ্ধতি পরিত্যাগ করে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সহযোগিতায় ইতিহাস বর্ণনার চেষ্টা করেছেন। এ ব্যাপারে ব্যারিংটন ম্যুর, উডওয়ার্ড ও রবার্ট পামারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক পদ্ধতির লক্ষ্য আলোচনা প্রসঙ্গে ফ্রেডারিক পোলক মন্তব্য করেন যে, প্রতিষ্ঠানের চরিত্র কি, তাদের গতি কোন্ দিকে, তারা কি অবস্থায় ছিল, কেমন করেই বা তারা বর্তমান অবস্থায় এল তার ব্যাখ্যা করাই ঐতিহাসিক পদ্ধতির লক্ষ্য ; তাঁরা যে-অবস্থায় আছে, তার বিশ্লেষণ করা এই পদ্ধতির লক্ষ্য নয়।

তবে ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসারে অনুসন্ধান করতে হলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে কতকগুলি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। এই পদ্ধতি অনুসরণের সময় ব্যক্তিগত ধারণা, ব্যক্তিগত অনুভূতি ইত্যাদির প্রভাব রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর আলোচনাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। তাই এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয়তঃ, বাহ্য-সাদৃশ্যকে অনেক সময় অভিন্ন বলে মনে হতে পারে। এরূপ মনে করলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বলে প্রতিপন্ন হতে বাধ্য। তাই লর্ড ব্রাইস বলেছেন, ঐতিহাসিক পদ্ধতি উৎসাহব্যঞ্জক হলেও অনেক সময় বিভ্রান্তির সূত্রপাত করে।

ঐতিহাসিক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা।

[৩] **আইনগত পদ্ধতি (Juristic Method) :** জার্মান, ফরাসী ও ইংরেজ দার্শনিকদের অনেকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার সময় আইনগত পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। এই পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রকে একটি রাজনৈতিক বা সামাজিক সংস্থা বলে মনে না করে একে প্রধানতঃ একটি আইনগত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধরা হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে, রাষ্ট্রের প্রধান কাজ হোল আইন প্রণয়ন করা এবং প্রণীত আইনকে বাস্তবে কার্যকরী করা। সুতরাং এই পদ্ধতি রাজনৈতিক জীবনের সর্বপ্রকার সম্পর্ককে আইনগত দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিচারবিশ্লেষণ করে। কিন্তু এই পদ্ধতির সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি হোল এই যে, কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিশদ বিবরণ ও মূল্যায়ন কেবলমাত্র আইনগত দিক থেকে করা যায় না। তাই গার্নার মন্তব্য করেছেন, যে-পদ্ধতি রাষ্ট্রকে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখে না, তা সঙ্কীর্ণতাদোষে দুষ্ট।

আইনগত পদ্ধতির মূল বক্তব্য ও সীমাবদ্ধতা

[৪] **তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method) :** রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা পদ্ধতিগুলির মধ্যে অন্যতম প্রাচীন পদ্ধতি হোল তুলনামূলক পদ্ধতি। অ্যারিস্টটল, হেরোডোটাস, বোঁদা, মন্তেস্কু প্রমুখের নাম এই পদ্ধতির সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। অ্যারিস্টটল ১৫৮টি রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে তাঁর 'রাষ্ট্রনীতি'র সিদ্ধান্তগুলি স্থির করেন। এই পদ্ধতিকে ঐতিহাসিক পদ্ধতির পরিপূরক বলা যেতে পারে। এই পদ্ধতি অনুসারে কোন কিছু রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য অতীতের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে বর্তমানের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির তুলনামূলক বিচারবিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই পদ্ধতি অনুসরণের ফলে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি সহজেই ধরা পড়ে। আধুনিককালে

তুলনামূলক পদ্ধতির প্রতিপাদ্য বিষয়

লর্ড ব্রাইস তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্যে উপাদান সংগ্রহ করে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আধুনিক গণতন্ত্র' (Modern Democracies) প্রণয়ন করেন।

তবে তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসরণের সময় কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। প্রথমতঃ, রাজনৈতিক বিশ্লেষকের সামনে প্রচুর তথ্য থাকলেও তার মধ্য থেকে বিশ্বস্ত তথ্যগুলি বেছে নিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, সংগৃহীত তথ্যাবলীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে আলোচনার উপযোগী করে তুলতে হবে। তৃতীয়তঃ, প্রতিটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। তাই সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যথাযথভাবে আলোচনা করতে হলে বৃহত্তর রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটেই তাকে আলোচনা করতে হবে; অন্যথায় আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। চতুর্থতঃ, এই পদ্ধতিকে কেবলমাত্র ইউরোপের বিভিন্ন উন্নত দেশের রাজনৈতিক পর্যালোচনার কাজে ব্যবহার না করে সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির রাজনৈতিক কাঠামোকে বিশ্লেষণের কাজে নিয়োগ করা উচিত। পঞ্চমতঃ, তুলনামূলক আলোচনার সময় সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে জীবন ও কাঠামোকে আলোচনা করতে হবে। জেলিনেক্ তাই বলেছেন, একই প্রকার ঐতিহাসিক ভিত্তি এবং একই প্রকার ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান-সমৃদ্ধ সমসাময়িক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিকে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা যেতে পারে। সাম্প্রতিককালে অ্যালমন্ড, পাওয়েল, কোলম্যান, আপ্টার প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগে নতুন কৌশল অবলম্বন করেছেন। অ্যালমন্ড কেবলমাত্র সরকার বা তার কোন একটি অংশকে তুলনার মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ না করে সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থাকেই তুলনায় একক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তুলনামূলক পদ্ধতির আধুনিক প্রবক্তাগণ তুলনামূলক আলোচনাকে পাশ্চাত্যের সঙ্কীর্ণ গন্ডিতে আবদ্ধ না রেখে এশিয়া ও আফ্রিকার রাজনৈতিক ব্যবস্থার দিকে পরিব্যাপ্ত করার চেষ্টা করেছেন।

তুলনামূলক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা

[৫] **পরীক্ষামূলক পদ্ধতি (Experimental Method):** পরীক্ষামূলক পদ্ধতি মূলতঃ প্রাকৃতিক বা ভৌতবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়। অনেকের মতে, এই পদ্ধতি রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদির ক্ষেত্রে যেভাবে প্রয়োগ করা যায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সেভাবে প্রয়োগ করা অসম্ভব। কারণ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীর মত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট গবেষণাগার নেই। সমগ্র মানবসমাজই হোল রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর গবেষণাগার। তাছাড়া, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীর গবেষণার বিষয়বস্তু সদাপরিবর্তনশীল নয়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে যেহেতু মানুষকে নিয়েই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হয়, সেহেতু তাদের মধ্যে সমজাতীয়তার একান্ত অভাব রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর অনুসন্ধানকে ব্যর্থ করে দেয়। সর্বোপরি, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র ইত্যাদির ক্ষেত্রে বারংবার পরীক্ষার দ্বারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না কারণ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী পরিবেশকে নিজের খেয়ালখুশিমতো পরিবর্তন করতে পারেন না।

পরীক্ষামূলক পদ্ধতির স্বরূপ

তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি একেবারেই অচল তা বলা যায় না। মানুষের রাজনৈতিক জীবনে প্রতিনিয়তই পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে। এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলেই নতুন নতুন আইন, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সৃষ্টি হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পদ্ধতিকে বাস্তবমুখী করে গড়ে তোলার জন্য নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। বস্তুতঃ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো পরীক্ষামূলক পদ্ধতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত না হলেও বর্তমানে সংখ্যায়ন ও পরিসংখ্যানের দ্বারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে ভৌতবিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করার প্রচেষ্টা চলছে।

পরীক্ষামূলক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা

[৬] **পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি (Observational Method) :** লর্ড ব্রাইস, লাওয়েল প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতিকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনুসন্ধানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বলে মনে করেন। এই পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অনুসৃত নীতি ও কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থা, কার্যকলাপ, আইনব্যবস্থা ইত্যাদিকে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে বিশ্লেষণ করতে হবে। এই পর্যবেক্ষণের সাহায্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কতকগুলি সাধারণ যুক্তিযুক্ত সূত্র নির্ধারণ করা সম্ভব। তবে পর্যবেক্ষণের সময় রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের বাহ্য-সাদৃশ্য এবং সাধারণীকরণ (generalisation) যথাসম্ভব পরিহার করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে সূত্র নির্ধারণ করতে হবে। লাওয়েলের মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান পর্যবেক্ষণমূলক বিজ্ঞান—পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান নয়।

পরীক্ষামূলক পদ্ধতি ও তার ত্রুটি

[৭] **মনোবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (Psychological Method) :** মনোবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। ম্যাকডুগাল (MacDougall), লেবঁ (Lebon), গ্রাহাম ওয়ালেস (Graham Walles), টার্ডে (Tarde) প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানিগণ এই পদ্ধতির প্রবক্তা। এই পদ্ধতি মানুষের রাজনৈতিক আচার-আচরণ, দলগঠন প্রণালী, জনমত ইত্যাদির পর্যালোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন। মানুষের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পশ্চাতে যেসব উদ্দেশ্য থাকে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করার জন্য মনোবিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করতেই হয়। ম্যাকডুগালের মতে, রাজনীতিকে বাস্তবধর্মী করে গড়ে তোলার জন্য মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজন। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে রাজনৈতিক কার্যাবলী-সহ অন্যান্য সর্বপ্রকার কার্যের কারণ নিহিত থাকে বলে তিনি মনে করেন। তাই মানুষের রাজনৈতিক কার্যাবলী ব্যাখ্যার জন্য তার সহজাত প্রবৃত্তি, অনুভূতি, চিন্তা, ভাবাবেগ ইত্যাদির বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। বর্তমানে ঠান্ডা লড়াই-জনিত উৎকন্ঠা, বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে অস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতা, আণবিক যুদ্ধের প্রস্তুতি ইত্যাদি বিশ্লেষণ করতে হলে মনোবিজ্ঞানের সাহায্য নিতেই হবে। বর্তমান বিশ্বে গণতান্ত্রিক আদর্শের স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে জনগণের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা অবিশ্বাস্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ গণতান্ত্রিক সরকার জনমতের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। তাই জনমতের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করার জন্য

মনোবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতির স্বরূপ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে হয়। আধুনিক সৈন্যবাহিনী গঠনে, সরকারী কর্মচারী নিয়োগে এবং বিচারালয়ে সরকারকে মনস্তত্ত্বের সাহায্য নিতে হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর মনোবিজ্ঞানের এই সর্বব্যাপী প্রভাব লক্ষ্য করে লর্ড ব্রাইস মন্তব্য করেছেন, "মনোবিজ্ঞানের মধ্যেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিকড় রয়েছে।"

কিন্তু গার্নারের মতে, মনোবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপযুক্ত অনুসন্ধান পদ্ধতি নয়। কারণ তা প্রধানতঃ বাহ্য-সাদৃশ্য বর্ণনার উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া, মানুষ যুক্তির দ্বারা পরিচালিত না হয়ে ভাবাবেগ, অনুভূতি ইত্যাদির দ্বারা অন্ধভাবে পরিচালিত হয়—এরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক। সর্বোপরি, এই পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা কি ঘটছে তা নিয়েই আলোচনা করেন : কি ঘটা উচিত তা নিয়ে আলোচনা করেন না। তাই এই পদ্ধতিটিকে অবিবেচনাপ্রসূত ও অবৈজ্ঞানিক বলে সমালোচনা করা হয়।

মনোবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা

তবে বর্তমানে নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি, সংখ্যাগত পদ্ধতি, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর মনস্তত্ত্বের প্রভাব আলোচনার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিপ্লব, সামরিক অভ্যুত্থান ইত্যাদি ব্যাখ্যার জন্য এলউড (Ellwood)-এর মনস্তাত্ত্বিক প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে সাফল্যের দাবি করতে পারে। তাছাড়া আলপোর্ট (Allport), গনসেল (Gonse'l), প্রিটচেট্ (Pritchett), ট্রুমান (Truman) প্রমুখ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন।

[৮] **সমাজতত্ত্বমূলক পদ্ধতি (Sociological Method) :** বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হোল সমাজতত্ত্বমূলক পদ্ধতি। এই পদ্ধতি রাষ্ট্রকে সমাজদেহ হিসেবে কল্পনা করে। সমাজদেহের কোষ হোল ব্যক্তি। দেহের কোষগুলির গুণাগুণের উপর যেমন সমগ্র দেহের গুণাগুণ নির্ভর করে, তেমনিভাবে নাগরিকদের গুণাগুণের উপর সমগ্র রাষ্ট্রের উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ভর করে। সমাজজীবনের বিভিন্ন পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া রাষ্ট্রজীবনে প্রতিফলিত হয়। তাই ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক পরিবেশ, শ্রেণীবৈষম্য, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদি নিয়ে সমগ্র সমাজ গঠিত হয় এবং সেগুলির পটভূমিতেই রাজনৈতিক জীবন আলোচনা করাই হোল এই পদ্ধতির লক্ষ্য। কার্ল মার্কস সমাজতত্ত্বের পটভূমিকায় রাষ্ট্রের ব্যাখ্যা করেছেন। কোঁৎ ও স্পেনসার অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রাষ্ট্রকে বিচারবিশ্লেষণ করেছেন। তাই গিডিংস মন্তব্য করেছেন, "যাঁরা সমাজতত্ত্বের মূল সূত্রগুলি সম্পর্কে অজ্ঞ তাঁদের রাষ্ট্র সম্বন্ধে তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া নিউটনের গতিবিষয়ক সূত্র সম্বন্ধে ধারণারহিত ব্যক্তিকে জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার মতই।" সুতরাং মানুষের রাজনৈতিক আচার-আচরণ বিশ্লেষণ করতে হলে সমাজতত্ত্বের তথা সমাজতত্ত্বমূলক পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করতেই হবে।

সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতির স্বরূপ

অধ্যাপক গার্নার সমাজতত্ত্বমূলক পদ্ধতিকে জীববিজ্ঞানমূলক পদ্ধতির মতোই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধানের অ[illegible] পদ্ধতি বলে [illegible] করেছেন। কারণ এই পদ্ধতি কতকগুলি বাহ্য-সাদৃশ্য [illegible]র্ণনার উপর নির্ভর [illegible]রে অভিন্নতা, প্রমাণের

চেষ্টা করে। কিন্তু এইভাবে অভিন্নতা প্রমাণ করা যায় না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সমাজতত্ত্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ কোন নতুন ঘটনা নয়। কার্ল মার্কস, টনিজ (Tonnies), মস্কা (Mosca), প্যারেটো (Pareto) প্রমুখ রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের যে ধারা প্রয়োগ করেছিলেন বর্তমানে তার ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়। সাম্প্রতিককালে কর্নহাউসার (Kornhouser), লিপসেট, হিবারলি (Heberle), ডহ্‌রেনডর্‌ফ (Dahrendorf) প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীরা এই ধারাকে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন উপকরণ (input) নিয়ে আলোচনা করলেও রাজনৈতিক দল, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, রাজনৈতিক মতামত ও সংযোগ সাধন ইত্যাদির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করেছে।

সীমাবদ্ধতা

[৯] **জীববিদ্যামূলক পদ্ধতি (Biological Method) :** জীববিদ্যামূলক পদ্ধতি রাষ্ট্রকে একটি জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করে। রাষ্ট্র ও জীবদেহের মধ্যে সাদৃশ্য বর্ণনা করে এই পদ্ধতি বিবর্তনবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের পরিবর্তনশীলতাকে ক্রমবিকাশ বলে প্রচার করে। রাষ্ট্রের সঙ্গে জীবদেহের কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও বাহ্য-সাদৃশ্যের দ্বারা রাজনৈতিক জীবনের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তাই অনেক সময় বিকৃত ব্যাখ্যার ফলে ভ্রান্ত মতবাদের সৃষ্টি হতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নীট্‌সে, ট্রিট্‌সকে প্রমুখ জার্মান দার্শনিকগণ জীববিজ্ঞানের যোগ্যতমের উদ্বর্তন তত্ত্বটিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে কার্যতঃ সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দিয়েছিলেন। তাই বর্তমানে এই পদ্ধতিটি বিশেষ গ্রহণযোগ্য নয় বলে বিবেচিত হয়।

জীববিদ্যামূলক পদ্ধতি ও তার সীমাবদ্ধতা

[১০] **অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতি (Empirical Method) :** রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার সনাতন পদ্ধতিগুলির ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য সেগুলিকে প্রত্যাখ্যান করে প্রাকৃতিক বা ভৌতবিজ্ঞানের কলাকৌশলের মাধ্যমে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে পর্যালোচনা করার প্রচেষ্টা হিসেবে অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতির আবির্ভাব ঘটে। আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতি অনুসরণের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন। বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষানিরীক্ষার ভিত্তিতে তাঁরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আলোচনা করার পক্ষপাতী। এইসব রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এবং তত্ত্ব ও গবেষণার মধ্যে সংহতি রক্ষার জন্য পরিমাপ ও সংখ্যায়নের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অন্যভাবে বলা যায়, এরূপ পদ্ধতির প্রচারকরা পরীক্ষামূলক, পরিসংখ্যানমূলক ও পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাছাড়া, অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাকে মূল্যমান-নিরপেক্ষ (value-free) করে গড়ে তুলতেও বিশেষভাবে আগ্রহী। সর্বোপরি, সমাজবিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের উপর এই পদ্ধতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতির স্বরূপ

কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতির ত্রুটিবিচ্যুতিগুলিকে একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। প্রথমতঃ, এরূপ পদ্ধতির সমর্থকগণ বিশেষ 'কোন নির্দিষ্ট নির্ণায়ক মান' (criteria of relevance) ছাড়াই কেবলমাত্র অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের প্রচারে ব্রতী

হন। ফলে তাঁদের পরীক্ষানিরীক্ষা কার্যক্ষেত্রে দিক্‌দর্শনহীন সমুদ্রযানের মতো উদ্দেশ্যহীনভাবে পরিচালিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, রবার্ট ডাল প্রমুখের মতে, এরূপ পদ্ধতির সমর্থকগণ তথাকথিত নিরপেক্ষতা ও বাস্তবতাবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কার্যক্ষেত্রে কতকগুলি নতুন, জটিল, এমনকি হাস্যকর ধারণার (new, complicated and even ridiculous jargon) জন্ম দেন। তৃতীয়তঃ, মূল্যবোধকে অস্বীকার করে এরূপ পদ্ধতি সমাজকে একটি কৃত্রিম গবেষণাগারে পরিণত করেছে বলেও অনেকের অভিযোগ। চতুর্থতঃ, এরূপ পদ্ধতির সমর্থক ও প্রচারকেরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে আদর্শ ব্যবস্থা বলে প্রচার করে কার্যতঃ রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তাই অনেকে এরূপ পদ্ধতিকে প্রগতিবিরোধী একটি অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলে সমালোচনা করেন।

সমালোচনা

উপরি-উক্ত পদ্ধতিগুলির মধ্যে কোন পদ্ধতিই এককভাবে সম্পূর্ণ নয়। রাষ্ট্র-বিজ্ঞান আলোচনার পদ্ধতিগুলিকে আমরা মোটামুটিভাবে অবরোহ (deductive) এবং আরোহ (inductive)—এই দু ভাগে বিভক্ত করতে পারি। এই দুটি পদ্ধতির কোন্‌টি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঠিক আলোচনা পদ্ধতি তা নিয়েও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। অধ্যাপক গার্নার, গিডিংস প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানমূলক, জীববিদ্যামূলক ও মনোবিদ্যামূলক পদ্ধতি তিনটিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার অনুপযুক্ত বলে মনে করেন। কেউ কেউ আবার পরীক্ষামূলক ও আইনগত পদ্ধতিকে সংকীর্ণ বলে অভিহিত করেন। সুতরাং দার্শনিক পদ্ধতি, ঐতিহাসিক পদ্ধতি, তুলনামূলক পদ্ধতি, পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি ও পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতিকে মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু এগুলির মধ্যে কোনও একটিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার একমাত্র পদ্ধতিরূপে বর্ণনা করা যায় না। লিপসন প্রমুখের মতে, অবরোহ এবং আরোহ পদ্ধতির সমন্বয়-সাধনের মাধ্যমে যে পদ্ধতির সৃষ্টি হয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনায় তা-ই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। বস্তুতঃ যথার্থভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা করতে হলে একাধিক পদ্ধতির সমন্বয়সাধন আবশ্যক।

উপসংহার

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক*
[Relation of Political Science with other Social Sciences]

১। আন্তঃ-সমাজবিজ্ঞানকেন্দ্রিক আলোচনার প্রবণতা
(Move towards inter- disciplinary Study of Social Sciences)

মানবজীবন ও মানবসমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাকে সমাজবিজ্ঞান (Social Science) বা মানবীয় বিজ্ঞান (Human Science) বলে অভিহিত করা হয়। ইতিহাস, অর্থবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি হোল সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা। বিংশ শতাব্দীর পূর্বেই সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেও তাদের কোনটিকেই অন্যান্য শাখা নিরপেক্ষ করে এককভাবে গড়ে তোলা কোনদিনই সম্ভব হয়নি। অন্যভাবে বলা যায়, সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিশেষীকরণ (specialisation) ঘটলেও কোন শাখাই স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে গড়ে উঠতে পারেনি ; একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্ক কোন-না-কোনভাবে বিদ্যমান ছিল এবং বর্তমানে সেই সম্পর্ক পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী সম্প্রসারিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে সিজউইক বলেছেন, কোন শাস্ত্র সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে হলে অন্যান্য শাস্ত্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক অনুধাবন করা প্রয়োজন।

সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কোন একটি বিশেষ মানবিক সমস্যাকে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করে বলে স্বাভাবিক কারণেই ঐ সব শাখার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আধুনিক আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ রাজনৈতিক আচরণ, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক মনোভাব ইত্যাদি আলোচনার সময় সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, যেমন—সমাজবিদ্যা, অর্থবিদ্যা, যোগাযোগ বিজ্ঞান ইত্যাদির মতো অঙ্কশাস্ত্র ও পরিসংখ্যান তত্ত্বেরও সাহায্যগ্রহণ করেন। তাঁরা একথা মনে করেন যে, রাজনৈতিক আচরণ ব্যক্তি-আচরণের একটি অংশ হলেও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গভীর সম্পর্কের কষ্টিপাথরেই তাকে বিচারবিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। মার্কসবাদীরাও সমগ্র সমাজকে একটি অবিভাজ্য সামগ্রিক সত্তা হিসেবে গ্রহণ করে সামগ্রিকভাবে সমাজবিজ্ঞানের পর্যালোচনা করেন। অন্যভাবে বলা যায়, রাজনীতির মতো সমাজের কোন বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে মার্কসবাদীরা যখন গবেষণা করেন, তখন সমগ্র সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁরা তার পর্যালোচনা করেন। উল্লেখযোগ্য যে, আচরণবাদীদের মতো মার্কসবাদীরাও সমাজকে বিভিন্ন অংশযুক্ত একটি সামগ্রিক

উদাহরণ

* কেবলমাত্র উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য।

সত্তা বলে মনে করলেও উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আচরণবাদীরা সমাজের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে পৃথকভাবে গবেষণা করার পর সেগুলিকে এক সূত্রে গ্রথিত করে সম্পূর্ণ সমাজের একটি চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করেন। কিন্তু মার্কসবাদীরা তা করেন না। সুতরাং আন্তঃসমাজ-বিজ্ঞানকেন্দ্রিক আলোচনার প্রবণতা বর্তমানে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মন্তব্য করা যেতে পারে। বস্তুতঃ সমাজ-ইতিহাসের ধারার সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে তাদের কোন একটির পক্ষে এককভাবে সেই ধারাকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় না। তাই একের সঙ্গে অপরের গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

আন্তঃ-সমাজবিজ্ঞান-কেন্দ্রিক আলোচনার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা

১৯২০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'সমাজবিজ্ঞান গবেষণা পর্ষদ' (Social Science Research Council) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে আন্তঃ-সমাজবিজ্ঞানকেন্দ্রিক আলোচনার প্রবণতা বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হয়। এ বিষয়ে চার্লস মেরিয়াম, হ্যারল্ড লাসওয়েল, ক্যাপল্যান, রবার্ট মার্টন, ট্যালকট পারসন্স, বুচানন, ডেভিস প্রমুখের প্রচেষ্টার কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আধুনিক তত্ত্বগুলি, যেমন, —ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্ব, কাঠামো-কার্যগত তত্ত্ব, যোগাযোগ তত্ত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কিত তত্ত্ব (Decision-making theory) প্রভৃতিকে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সহযোগিতার ফসল বলে মনে করা যেতে পারে। রডি, অ্যান্ডারসন ও ক্রিস্টল প্রমুখ মনে করেন যে, বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ডেভিড ইস্টনও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্ব (empirical theory)-এর প্রসার এবং 'একটি সাধারণ তত্ত্ব গড়ে তোলার প্রয়াস' (construction of a general theory) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সীমারেখাকে ধ্বংস করে দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করেছে।

২। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক
(Relation of Political Science with other Social Sciences)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান হোল সমাজবিজ্ঞানের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। জন্মের প্রথম লগ্ন থেকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। ১৯০০ সালের পূর্বে প্লেটো, কান্ট, হেগেল, ব্রাইস প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ প্রধানতঃ দর্শন, ইতিহাস ও আইনশাস্ত্রের সাহায্যে রাজনৈতিক বিচারবিশ্লেষণে ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে আচরণবাদী বিপ্লবের পর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজবিদ্যা, অর্থবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, ভূবিদ্যা প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানের মত অঙ্কশাস্ত্র, জীববিদ্যা ইত্যাদির গভীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজ সমাজবিজ্ঞানের কোন শাখার পক্ষে এককভাবে পথ চলা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

[ক] রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস (Political Science and History) :

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস দুটি শাস্ত্রই সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্গত। উভয়েই মনুষ্য-জীবন ও মনুষ্যসমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে। স্বাভাবিকভাবেই

উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে জন্ সিলী (John Seely) বলেছেন, "ইতিহাস ছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান ভিত্তিহীন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ছাড়া ইতিহাসের আলোচনা নিষ্ফল।" উক্তিটির মধ্যে অতিরঞ্জন থাকলেও এর মধ্যে যে সত্য লুকিয়ে আছে সে বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করার কোন অবকাশ নেই।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—সিলীর অভিমত

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হোল আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে ইতিহাসের দ্বারস্থ হতে হয়। কারণ অতীতের উপর ভিত্তি করে বর্তমান সমাজ দাঁড়িয়ে আছে। আর বর্তমানকে ভিত্তি করে গড়ে উঠবে আগামী দিনের সমাজ ও রাষ্ট্র। ইতিহাস অতীত সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি দিক আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক জীবন ও প্রতিষ্ঠান-সমূহ নিয়েও আলোচনা করে। রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রের আলোচনা পরিপূর্ণতা লাভ করবে যদি তার উৎপত্তি, প্রকৃতি প্রভৃতির ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস আমাদের জানা থাকে। ইতিহাস-প্রদত্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ বর্তমান সমাজব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতি অতি সহজেই নির্ণয় করতে পারেন। ফলে তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে মতামত জ্ঞাপন করা তাঁদের সহজসাধ্য হয়ে যায়। এই সকল ঐতিহাসিক তথ্য যত বেশী পরিমাণে সংগৃহীত হবে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাও তত বেশী গভীরতা লাভ করবে। বার্নস্ (Burns)-এর মতে, ঐতিহাসিক তথ্যাদি বর্তমানকে সমালোচনার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ গঠনের পথ প্রশস্ত করে। উইলোবি (Willoughby) বলেছেন, "ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গভীরত্ব যোগান দেয়।"

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাসের উপর নির্ভরশীল

ইতিহাস ছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান যেমন পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না, তেমনি ইতিহাসও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে ইতিহাসের উদ্দেশ্য হোল আদর্শ সমাজজীবনের প্রতিষ্ঠা। তাই রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসের আলোচনা করা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, ঐতিহাসিকেরা রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ফলাফল এবং সমাজের উপর সেগুলির প্রতিক্রিয়া ইতিহাসের মধ্যে আলোচনা করেন। তা না করা হলে ইতিহাস অতীতের শুষ্ক ঘটনাবলীর কেবলমাত্র সংকলন বলে আদৌ হৃদয়গ্রাহী হতে পারে না। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে, জাতীয়তাবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ প্রভৃতিকে বাদ দিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় ইতিহাস কখনই পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না বা হৃদয়গ্রাহী হতে পারে না। বস্তুতঃ ইতিহাসের অট্টালিকার একটি সুদৃঢ় স্তম্ভ হোল রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

ইতিহাস যথেষ্ট পরিমাণে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাছে ঋণী

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক থাকলেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। (১) এই পার্থক্যের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে গার্নার মন্তব্য করেছেন, ইতিহাসের সমস্তটাই প্রাচীন রাষ্ট্রনীতি নয়, অথবা রাষ্ট্রনীতি বলতে কখনই বর্তমান ইতিহাসকে বোঝায় না। কারণ,

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্য

ইতিহাস কেবল মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন নিয়ে আলোচনা করে না, সেই সঙ্গে কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন প্রভৃতি নিয়েও আলোচনা করে। এই দিক থেকে বিচার করে ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়কে নিঃসন্দেহে ব্যাপক বলা যেতে পারে। বস্তুতঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান কেবলমাত্র ইতিহাস থেকে সেইসব তথ্যাদি গ্রহণ করে যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

ইতিহাসের বিষয়বস্তু অধিকতর ব্যাপক

(২) আবার সমগ্র রাষ্ট্রবিজ্ঞান কখনই বর্তমান দিনের ইতিহাস বলে পরিগণিত হতে পারে না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনেক অংশই কল্পনাপ্রসূত। ইতিহাসের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। তাই বার্কার (Barker) বলেছেন, ইতিহাসভিত্তিক নয় এমন কতকগুলি সার্থক মতবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ প্লেটো (Plato)-কল্পিত 'সমভোগবাদের' (Communism) কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনেক অংশ ইতিহাসভিত্তিক নয়

(৩) ইতিহাস ঘটনাবলীকে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করে। ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ঐতিহাসিকগণ কখনই নৈতিক মতামত জ্ঞাপন করেন না অর্থাৎ উচিত-অনুচিতের কোন স্থান ইতিহাসে নেই। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ নীতিশাস্ত্রবিদদের মতই কোনটি নীতিসংগত, কোনটি নীতি সংগত নয় সে বিষয়ে মতামত জ্ঞাপন করেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, রাষ্ট্র কি ছিল তা ইতিহাসের বিষয়বস্তু। কিন্তু রাষ্ট্র অতীতে কি ছিল, বর্তমানে কি আছে তা আলোচনা করেই রাষ্ট্রবিজ্ঞান ক্ষান্ত হয় না : রাষ্ট্র কেমন হওয়া উচিত (What ought to be) তা নিয়েও আলোচনা করে।

ঐতিহাসিকগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতো নৈতিক মতামত জ্ঞাপন করেন না

(৪) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের মধ্যে পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে পার্থক্য বিদ্যমান। ইতিহাস প্রধানতঃ বর্ণনাত্মক (narrative)। তাই এর মধ্যে আমরা ধারাবাহিকভাবে ঘটনাবলীর সন্নিবেশ প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান ধারাবাহিকভাবে ঘটনাবলীর আলোচনা অপেক্ষা রাজনৈতিক বিবর্তনের সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলী নিয়েই আলোচনা করতে অধিক আগ্রহী। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাসের ভান্ডার থেকে সংগৃহীত তথ্যাদির সাহায্যে সাধারণ তত্ত্ব গড়ে তোলার চেষ্টা করে। এদিক থেকে বিচার করে অনেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে পর্যবেক্ষণমূলক ও পরীক্ষামূলক শাস্ত্র বলে অভিহিত করার পক্ষপাতী।

পদ্ধতিগত পার্থক্য

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। গেটেলের ভাষায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস একে অপরের সাহায্যকারী (Contributory) ও পরিপূরক (Complementary)। তাই বার্জেস (Burgess) মন্তব্য করেছেন, ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে একটি পঙ্গু হয়ে পড়বে—এমনকি শবদেহেও পরিণত হতে পারে এবং অপরটি আলেয়ায় রূপান্তরিত হবে। সুতরাং বলা যায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ইতিহাস একে অপরের পরিপূরক।

মন্তব্য : উভয়ে পরস্পরের পরিপূরক

[খ] রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থবিদ্যা বা ধনবিজ্ঞান (Political Science and Economics) :

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের যুগ থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অর্থবিদ্যা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংশ বলে বিবেচিত হোত। ভারতবর্ষে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। সমাজবদ্ধ মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আলোচনা করাই হোল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ। আবার রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করাই হোল অর্থবিদ্যার উদ্দেশ্য। এই দিক থেকে বিচার করে অর্থবিদ্যাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংশমাত্র বলে প্রাচীন রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ চিহ্নিত করতেন। এই ব্যবস্থাকে গ্রীক-দার্শনিকরা 'রাষ্ট্রনৈতিক অর্থব্যবস্থা' (Political Economy) বলে অভিহিত করতেন।

অর্থবিদ্যা বা ধনবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংশমাত্র

কিন্তু শিল্প-বিপ্লবোত্তর বিশ্বে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর ভিত্তিশীল পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার বিকাশের জন্য ব্যক্তির অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করা হতে লাগল। এর ফলে একদিকে যেমন পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার দ্রুত অগ্রগতি সাধিত হোল, অন্যদিকে তেমনি একটি পৃথক শাস্ত্র হিসেবে অর্থবিদ্যাকে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা শুরু হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রখ্যাত ইংরেজ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) তাঁর 'ওয়েলথ অব নেশনস্' (Wealth of Nations) নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম অর্থবিদ্যাকে সম্পূর্ণ পৃথক শাস্ত্রের মর্যাদা দেন। পরবর্তী সময়ে রিকার্ডো (Ricardo), মার্শাল (Marshall) প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্‌গণ অর্থবিদ্যাকে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে অধিকতর সমৃদ্ধ করেন। মার্শাল অর্থবিদ্যার সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেন, যে শাস্ত্র মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অর্থসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ নিয়ে আলোচনা করে, তাকে অর্থবিদ্যা বলে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অ্যাডাম্ স্মিথ (Adam Smith) সর্বপ্রথম অর্থবিদ্যাকে সম্পূর্ণ পৃথক শাস্ত্রের মর্যাদা দেন। আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণ অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুর পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক বলে মত প্রকাশ করেন। বাস্তবিক পক্ষে, বর্তমানে অর্থবিদ্যা কেবলমাত্র রাজস্ব সংগ্রহ নিয়েই আলোচনা করে না, সেইসঙ্গে ধনের উৎপাদন, ভোগ, বিনিময়, বন্টন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করে। এইসব কারণে বর্তমানে অর্থবিদ্যা একটি সম্পূর্ণ পৃথক শাস্ত্র বলে বিবেচিত হয়।

কিন্তু অর্থবিদ্যা বর্তমানে পৃথকশাস্ত্র বলে স্বীকৃত

অর্থবিদ্যাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে আলোচনা করা হলেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান এবং দিনে দিনে এই ঘনিষ্ঠতা গভীরতর হচ্ছে।

অর্থবিদ্যা পৃথক শাস্ত্র হলেও উভয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ

বর্তমান বিশ্বে প্রধানত তিন ধরনের অর্থ-ব্যবস্থার অবস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায়, যথা—১. পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা, ২. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা এবং ৩. মিশ্র অর্থব্যবস্থা (Mixed Economic System)। উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার নীতির উপর ভিত্তি করে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ভিত্তি হোল উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর

সামাজিক মালিকানার প্রতিষ্ঠা। আর এই দু'ধরনের অর্থব্যবস্থার মধ্যবর্তী স্থানে মিশ্র অর্থব্যবস্থার অবস্থান। রাষ্ট্রের কাঠামো ও চরিত্র অনেকাংশে নির্ভর করে সেই দেশের অর্থনৈতিক উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার উপর। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন, কোন একটি রাষ্ট্রের আইনের প্রকৃতি নির্ভর করে সেই রাষ্ট্রের নাগরিকদের শক্তিশালী দাবি পূরণের উপর এবং কাদের দাবি শক্তিশালী হবে সেটা নির্ভর করে সেই সমাজের অর্থনৈতিক ক্ষমতা বন্টনের উপর। বলা বাহুল্য, পুঁজিবাদী সমাজে ধনিক সম্প্রদায় নিজেদের দাবিকে যেহেতু শক্তিশালী করতে সমর্থ, সেহেতু অতি সহজেই তারা রাষ্ট্রকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে। ফলে সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ধনশালীরা দরিদ্রদের চরমভাবে শোষণ করতে থাকে। সুদীর্ঘকাল শোষিত হওয়ার ফলে দরিদ্র জনসাধারণ একদিন বিপ্লবের পথে পা বাড়ায়; আঘাত হানে প্রচলিত রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোর উপর। সর্বোপরি, এমন কতকগুলি রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ রয়েছে যাদের ভিত্তিভূমি হোল অর্থনীতি, যেমন—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ ইত্যাদি। এইভাবে বর্তমানে অর্থবিদ্যা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে বলা যেতে পারে।

অর্থবিদ্যা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর প্রভাব বিস্তার করে

আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানও অর্থবিদ্যাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন হয়। সঠিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান করা যায় না। সমস্ত অর্থনৈতিক কার্যই সম্পাদিত হয় রাষ্ট্র-প্রণীত আইনের সাহায্যে। রাষ্ট্রের কার্য সম্পর্কে মতবাদ অর্থনৈতিক কাজকর্মের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উৎপাদন, বন্টন, বিনিয়োগ, শ্রমনীতি, করনীতি, শুল্কনীতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। তাছাড়া, বর্তমানে অধিকাংশ উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমাজকল্যাণকর নীতি অনুসরণ করার ফলে রাষ্ট্রীয় আইন মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার সঙ্গে সঙ্গে তার অর্থনৈতিক জীবনকেও নিয়ন্ত্রণ করে। তাই খাদ্য সমস্যা, বেকার সমস্যা প্রভৃতির সমাধান, মুদ্রামান নির্ণয়, দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ, মুদ্রাস্ফীতি রোধ প্রভৃতি অর্থনৈতিক কার্যাবলী সরকার কর্তৃক সম্পাদিত হয়। বস্তুতঃ বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে ব্যাপক রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিও অর্থনৈতিক সংকট এড়াবার জন্য রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার পথ গ্রহণ করেছে।

অর্থবিদ্যার উপর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভাব

সাম্প্রতিককালে ডাউনস্, মাসগ্রেভ, রথেনবার্গ, বুকানন প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় অর্থনৈতিক তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটিয়ে দুটি শাস্ত্রের সম্পর্ককে নিবিড়তর করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাছাড়া, মার্কসবাদীরা অর্থনৈতিক আলোচনাকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা অসম্ভব বলে মনে করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিদ্যা দুটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হলেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। বর্তমান শতাব্দীতে একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে যথাযথভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়।

একে অপরের পরিপূরক মাত্র

[গ] রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যা (Political Science and Sociology) :

সমাজ-বিজ্ঞানের (Social Science) সর্বকনিষ্ঠ সন্তান হোল সমাজবিদ্যা (Sociology)। এর সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে ফেয়ারচাইল্ড (Fairchild) বলেছেন, সমাজবিদ্যা হোল মানুষ ও তার মানবীয় পরিবেশের (man and his human environment) মধ্যেকার সম্পর্ক বিষয়ক আলোচনা। ওয়ার্ড (Ward) সমাজবিদ্যাকে সমাজ বা সামাজিক ক্রিয়াকলাপের (society or social phenomena) বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন। সমাজবদ্ধ মানুষের সামাজিক জীবনধারার সর্বতোমুখী আলোচনা যে শাস্ত্রে করা হয় তাকে সমাজবিদ্যা বলে। গোষ্ঠী, পরিবার, জাতি, রাষ্ট্র প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রথা, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়েও সমাজবিদ্যা আলোচনা করে। অন্যভাবে বলা যায়, সমাজবিদ্যায় মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি সমস্ত দিকের আলোচনা করা হয়। তাই সমাজবিদ্যাকে মানবীয় বিজ্ঞানগুলির মধ্যে মৌলিক ও পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান বলা হয়ে থাকে।

সমাজবিদ্যার আলোচ্য বিষয়

রাষ্ট্রবিজ্ঞান যেহেতু সমাজবিদ্যার একটি শাখা সেহেতু সমাজবিদ্যার সাহায্য ছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা কখনই পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু হোল রাষ্ট্র। সমাজবিবর্তনের একটি বিশেষ স্তরে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের ফলে বলপ্রয়োগের যন্ত্র হিসেবে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, রাষ্ট্র এবং তার বিভিন্ন দিকের সম্পর্কে যথাযথ আলোচনা করতে হলে মানুষ ও তার সামাজিক জীবনকে ভালভাবে জানতে হবে। আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রের নাগরিকরা জাত পাতের ধারণা কিংবা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মানসিকতার শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা থাকে বলে ভোটদানের সময় অনেকক্ষেত্রে তাদের এই সংকীর্ণ মানসিকতা রাজনৈতিক মতাদর্শের উপর প্রাধান্য লাভ করে। এরূপ ক্ষেত্রে ভোটদাতাদের ভোটদান সম্পর্কে আচার আচরণ (voting behaviour) সম্বন্ধে ঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হলে আমাদের অতি-অবশ্যই ভোটদাতাদের সামাজিক অবস্থান, সামাজিক আচার আচরণ প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে হবে। বলা বাহুল্য, এ সব জানতে হলে আমাদের অতি অবশ্যই সমাজবিদ্যার দ্বারস্থ হতে হয়। আধুনিক আচরণবাদী বিজ্ঞানীরা তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার সময় সমাজবিদ্যা থেকে মালমশলা সংগ্রহের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। বস্তুতঃ সমাজবিদ্যার উপর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নির্ভরশীলতা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বর্তমানে 'রাজনৈতিক সমাজ-বিদ্যা' (Political Sociology) নামে একটি নতুন শাস্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছে।

সমাজবিদ্যা ছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না

রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিজের পরিপূর্ণতার জন্য যেমন সমাজবিদ্যার উপর নির্ভরশীল, তেমনি সমাজবিদ্যাও অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন, রাষ্ট্র-নৈতিক প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রনৈতিক আনুগত্য প্রভৃতি নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে। তাই মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন সম্পর্কে পরিপূর্ণ আলোচনার জন্য সমাজবিদ্যাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। গিডিংস, মরগ্যান

সমাজবিদ্যাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাছে ঋণী

(Morgan), বটোমোর (Bottomore), জিনসবার্গ (Ginsberg) প্রমুখ প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদেরা তাঁদের সমাজবিদ্যার নানান্ বিষয় আলোচনার সময় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যা একে অপরের পরিপূরক বলা যেতে পারে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজবিদ্যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করে অনেকে মনে করেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু অধ্যাপক গিডিংস (Giddings) বিপরীত মত পোষণ করে বলেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র সমাজবিদ্যার আলোচনাক্ষেত্রের সঙ্গে একেবারে মিশে যায়নি। উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা বর্তমানে সম্ভব। বলা বাহুল্য, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ উভয় শাস্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যেও কতকগুলি পার্থক্য অতি সহজেই নিরূপণ করতে সমর্থ হয়েছেন।

উভয়ের পার্থক্য

(১) সমাজের সামগ্রিক কল্যাণসাধনই সমাজবিদ্যার লক্ষ্য। তাই সমাজবিদ্যা মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি জীবন নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান কেবলমাত্র মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন নিয়েই আলোচনা করে। এদিক থেকে বিচার করে সমাজবিদ্যার আলোচনাক্ষেত্রের ব্যাপকতা বিশেষ লক্ষণীয়। এ-প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে গিলক্রাইস্ট বলেছেন, সমাজবিদ্যা হোল সমাজের বিজ্ঞান; কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান হোল রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক জীবনের বিজ্ঞান। গার্নারের মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান কেবলমাত্র একটি মানবিক সংস্থাকে অর্থাৎ রাষ্ট্রকে নিয়ে আলোচনা করে। অপরদিকে সমাজজীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সর্বপ্রকার সংগঠন নিয়ে আলোচনা করাই হোল সমাজবিদ্যার কাজ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা বা সংকীর্ণতা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সমাজবিদ্যা থেকে পৃথক করেছে।

সমাজবিদ্যা ব্যাপক: কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান সংকীর্ণ

(২) সমাজ গঠিত হওয়ার অনেক পরে রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ জন্মগ্রহণ করে। তাই অধ্যাপক ডানিং (Dunning) বলেন, প্রাক্-রাজনৈতিক মানুষের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের আলোচনা সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রাক্-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে উদাসীন।

সমাজবিদ্যা প্রাক্-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করে কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান তা করে না

(৩) সমাজবিদ্যা মানুষকে সামাজিক জীব বলে ধরে নিয়ে তার সম্বন্ধে আলোচনা করে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষকে রাষ্ট্রনৈতিক জীব হিসেবে তার বিষয়বস্তুর মধ্যে স্থান দিয়েছে। কিভাবে সামাজিক মানুষ রাষ্ট্রনৈতিক জীবে রূপান্তরিত হোল তা নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিদ্যার মত ব্যাপকভাবে আলোচনা করে না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষকে রাষ্ট্রনৈতিক জীব এবং সমাজবিদ্যা সামাজিক জীব বলে গ্রহণ করে

(৪) রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজে অবস্থিত নানারকম প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কেবলমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রকে নিয়ে আলোচনা করে। ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মাথা ঘামান না; কিন্তু সমাজবিদ্যা সমাজস্থ সর্বপ্রকার প্রতিষ্ঠানকে সমান গুরুত্ব দিয়ে তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান কেবল রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে এবং সমাজবিদ্যা সব প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করে

পূর্বোক্ত পার্থক্যগুলি আছে বলে সমাজবিদ্যার সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই—এ কথা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। বস্তুতঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিদ্যার একটি অংশ হওয়ার জন্য উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক শুধু পরিলক্ষিত হয় না, একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির আলোচনা কখনই পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। অধ্যাপক গিডিংস মন্তব্য করেছেন, "যারা সমাজবিদ্যার মূল সূত্রগুলি সম্পর্কে অজ্ঞ তাঁদের রাষ্ট্র সম্বন্ধে তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া নিউটনের গতিবিষয়ক সূত্র সম্বন্ধে ধারণারহিত ব্যক্তিকে জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার মতই।"

মন্তব্য : উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

[ঘ] রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ভূগোল (Political Science and Geography) :

অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের মত ভূগোলের সঙ্গেও রাষ্ট্রবিজ্ঞান ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবে রাজনৈতিক ধ্যানধারণা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় বলে সাধারণভাব মনে করা হয়। কোন দেশের সরকারের প্রকৃতি সংশ্লিষ্ট দেশের জলবায়ুর উপর বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল বলে রুশো প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করতেন। গ্রীষ্মপ্রধান ও শীতপ্রধান অঞ্চলে অবস্থিত রাষ্ট্রগুলিতে কখনই সুস্থ ও স্বাভাবিক সরকার গড়ে উঠতে পারে না বলে রুশো অভিমত পোষণ করেন। কেবলমাত্র নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত দেশসমূহে এরূপ সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এই বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য না হলেও সরকারের কর্মধারার গতিপ্রকৃতি যে ভৌগোলিক পরিবেশের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয় তা অস্বীকার করা যায় না। মন্তেস্কুও মনে করতেন যে, কোন একটি দেশের জনসাধারণ স্বাধীনতাকামী হবে কিনা তা প্রাথমিকভাবে সেই দেশের ভৌগোলিক পরিবেশের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। কারণ জনসাধারণের স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষা নির্ভর করে তাদের মানসিক গঠনের উপর ; আর মানসিক গঠন ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু মন্তেস্কুর এরূপ চিন্তাধারাও সঠিক নয়। কারণ মানুষের মানসিক গঠনের উপর ভৌগোলিক পরিবেশের কিছুটা প্রভাব থাকলেও স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এর বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই বলে অনেকের ধারণা। তবে একথাও সত্য যে, ঔপনিবেশিকদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষা সৃষ্টির পশ্চাতে ভৌগোলিক পরিবেশ অন্যভাবে কাজ করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সাম্রাজ্যবাদী দেশ ব্রিটেনের সঙ্গে আমেরিকার ভৌগোলিক দূরত্বই ঔপনিবেশিকদের মনে স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণা জুগিয়েছিল। তবে কেবলমাত্র ভৌগোলিক দূরত্বই তাদের স্বাধীনতাকামী করে তুলেছিল এরূপ চিন্তা করা অযৌক্তিক।

রাজনৈতিক ধ্যানধারণা ও প্রতিষ্ঠানের উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব

জাতীয়তাবাদের সম্প্রসারণেও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়। কোন একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে জনসমষ্টি যদি সুদীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করে তবে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং ভাবের আদানপ্রদান চলতে থাকে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনসমাজের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ঐক্য গড়ে উঠে। কিন্তু ভৌগোলিক সান্নিধ্যকে জাতীয় জনসমাজ গঠনের একান্ত অপরিহার্য উপাদান

জাতীয়তাবাদের সম্প্রসারণে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব

বলে মনে করা সমীচীন নয়। প্যালেস্টাইন সৃষ্টির পূর্বে ইহুদি জাতি পৃথিবীর সর্বত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকলেও তাদের নিজেদের মধ্যে ঐক্যবোধের কোন অভাব ছিল না। অবশ্য লর্ড ব্রাইস প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কোন দেশের জনসমাজের জাতিগত চরিত্রের উপর সেই দেশের শাসনব্যবস্থা এবং রাজনীতি অনেকাংশে নির্ভরশীল বলে মনে করেন। বলা বাহুল্য, জনসমাজের জাতীয় চরিত্র বহুলাংশে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবে প্রভাবিত হয়। তবে মার্কসবাদী রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবকে অস্বীকার না করলেও এত গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী নন। তাঁদের মতে, অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, এই ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে। এদের শ্রেণী-চরিত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এশিয়া মহাদেশের প্রায় সমান ভৌগোলিক জলবায়ু থাকা সত্ত্বেও চীনে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠলেও পাকিস্তানে কিংবা ভারতে ভিন্ন ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পররাষ্ট্র নীতি ও জাতীয় নীতি নির্ধারণে ভৌগোলিক পরিবেশের ভূমিকা

কোন রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে বিদ্যমান বলে কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন। একটি দেশের ভৌগোলিক সীমানা ও অবস্থিতির উপর সেই দেশের পররাষ্ট্র নীতির প্রকৃতি কেমন হবে তা অনেকাংশে নির্ভর করে। কোন একটি দেশের ভৌগোলিক আকৃতি, জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য, অর্থনৈতিক কাঠামো ইত্যাদি হোল সেই দেশের পররাষ্ট্র নীতির নির্ধারক উপাদান। কোন রাষ্ট্রের আকৃতি যদি ক্ষুদ্র হয়, প্রাকৃতিক সম্পদ যদি অপ্রচুর হয়, জনসংখ্যা যদি স্বল্প হয় তাহলে সেই রাষ্ট্র কখনই স্বাধীনভাবে বলিষ্ঠ পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণ ও অনুসরণ করতে পারে না। পররাষ্ট্র-নীতির মত কোন রাষ্ট্রের জাতীয় নীতিও বহুল পরিমাণে ভৌগোলিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়। মেরিয়াম ও বার্নেস (Merriam and Barnes) বলেছেন, নাগরিকদের পরস্পরবিরোধী স্বার্থের (conflicting interests) সমন্বয় সাধক ও নিয়ন্ত্রক হোল রাষ্ট্র। ভৌগোলিক পরিবেশের উপর সেই সব স্বার্থের প্রকৃতি, তাদের শক্তি (strength) এবং সংগ্রামের গভীরতা (intensity of the struggle) বহুলাংশে নির্ভরশীল।

সাম্প্রতিককালে ব্যক্তির চরিত্র এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারের উপর জলবায়ু ও ভৌগোলিক উপাদানসমূহের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা নতুনভাবে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। এর ফলশ্রুতি হিসেবে 'ভূকেন্দ্রী রাজনীতি' (Geo-politics)-এর তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটেছে। এই তত্ত্ব ভৌগোলিক উপাদানসমূহের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে কোন একটি দেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণে সহায়তা করে। এই তত্ত্বের সমর্থকেরা ভৌগোলিক উপাদানসমূহের বিচারবিশ্লেষণ করে তার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের পক্ষপাতী। কিন্তু কোন কোন রাষ্ট্রনীতিবিদ্, বিশেষতঃ জার্মান রাষ্ট্র-নীতিবিদেরা এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ভূখণ্ডের সম্প্রসারণশীলতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে কার্যতঃ সাম্রাজ্যবাদের সপক্ষে ওকালতি করতে শুরু করেন।

ভূকেন্দ্রী রাজনীতির উদ্ভব

সুতরাং বলা যেতে পারে যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান তার বিষয়বস্তুর আলোচনার সময় কোন-না-কোনভাবে ভূগোলের দ্বারস্থ হয়, তবে তার অর্থ এই নয় যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে ভূগোলের উপর নির্ভরশীল। বরং বলা যায়, উভয় শাস্ত্রই কিছু পরিমাণে একে অপরের উপর নির্ভরশীল।

[ঙ] রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিদ্যা (Political Science and Psychology)

মনোবিজ্ঞান বলতে কি বোঝায়

"মনোবিজ্ঞান জীবের আচরণ সম্বন্ধীয় বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান, যা জীবের আচরণের ভিত্তিতে মানসিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ, শ্রেণীবিভাগ, গতিপ্রকৃতি, নিয়ম, কারণ ও পরিমাণ নির্ণয় ও ব্যাখ্যা করে এবং মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত যে দেহগত প্রক্রিয়া সেগুলি বর্ণনা করে।"

মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে রাষ্ট্রনীতি ব্যাখ্যার প্রবণতা

বেজট (Bagehot)-এর সময় থেকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মনোবিজ্ঞান-প্রবণতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাই বার্কার বলেছেন, "মনোবিজ্ঞানের সমাধানসমূহ ব্যবহার করে রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাগুলির ব্যাখ্যা করা যেন বর্তমানে রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।" টার্ডে (Tarde), লেবঁ (Lebon), ম্যাকডুগ্যাল (Macdougall), ওয়ালাস্ (Wallas), হারবার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer), বল্ডুইন (Baldwin) প্রমুখরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে মনোবিজ্ঞাননির্ভর করে গড়ে তুলেছেন। ম্যাকডুগাল রাজনীতিকে বাস্তবমুখী করে গড়ে তোলার জন্য মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ অপরিহার্য বলে মনে করতেন। ওয়াল্টার লিপম্যানের মতে, মনোবিজ্ঞান ছাড়া রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা করা হলে তা রাজনৈতিক চিন্তার সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি বলে বিবেচিত হবে।

রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের প্রভাব

মানুষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব হলেও অনেক সময় সে তার সহজাত প্রবৃত্তি, ভাবাবেগ ও উত্তেজনার দ্বারা পরিচালিত হয়। মনোবিজ্ঞান মানুষের এই অযৌক্তিক কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করে। অপরদিকে মানুষের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। কিন্তু মানুষের রাজনৈতিক কার্যাবলী অনেক সময় অযৌক্তিক ভাবাবেগ বা উত্তেজনার দ্বারা পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর এর বিরূপ প্রতিফলন দেখা যায়। তাই গণমানসের বিশ্লেষণ ও তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর কাজ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা যদি তা না করেন তবে অনেক সময় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতের স্বরূপ বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন

বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা অবিশ্বাস্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ, গণতান্ত্রিক সরকার জনমতের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় অর্থাৎ জনমতের উপর গণতান্ত্রিক সরকারের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। জনমতের বিরোধিতা করে কোন সরকারের পক্ষে ক্ষমতাসীন থাকা সম্ভব নয়। যখন দেশের মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠে তখন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কর্তব্য এই অসন্তোষের কারণ অনুসন্ধান করা। বলা বাহুল্য, এই কারণ যথাযথভাবে অনুসন্ধান

করতে হলে জনগণের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব তথা সরকারের জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে মনোবিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়।

তা ছাড়া, বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা সমাধানের সূত্রও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলে যে সব সমস্যার উদ্ভব হয় সেগুলি মূলতঃ ভাবপ্রবণতা, ধর্মীয় বিশ্বাস, ঐতিহ্যের প্রতি আসক্তি প্রভৃতি থেকে সৃষ্ট। এই সমস্যার সমাধানের জন্য মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন। এমন কি বর্তমানে সৈন্যবাহিনী গঠন, সরকারী কর্মচারী নিয়োগ এবং বিচারালয়ে সরকারকে মনস্তত্ত্বের সাহায্য নিতে হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর মনোবিজ্ঞানের এই সর্বব্যাপী প্রভাব লক্ষ্য করে লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) মন্তব্য করেছেন, "মনোবিজ্ঞানের মধ্যেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিকড় রয়েছে।"

রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাবলীর সূত্রও মনোবিজ্ঞানে পাওয়া যায়

কিন্তু তাই বলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই— এ কথা ঠিক নয়। উভয় শাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্যগুলি নিম্নে আলোচিত হল।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের পার্থক্য

(১) মনোবিজ্ঞানীরা অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন। অর্থাৎ যা ঘটে তা নিয়ে আলোচনা করেন। কি ঘটা উচিত তা নিয়ে কখনই আলোচনা করেন না। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা তা নিয়েও আলোচনা করেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় মনোবিজ্ঞানীরা নৈতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত হওয়ার ফলে তাঁদের আলোচ্য বিষয়বস্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের আলোচ্য বিষয়বস্তুর মত ব্যাপকতা লাভ করে না।

মনোবিজ্ঞান নৈতিক প্রশ্ন আলোচনা করে না; কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান করে

(২) কেটলিনের মতে, মনোবিজ্ঞান আধুনিক সভ্য সমাজের রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাসমূহকে বন্য প্রবৃত্তির কষ্টিপাথরে বিচার করে। তাই একে অযৌক্তিক বলাই সমীচীন। অপরদিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান উক্ত ত্রুটি থেকে মুক্ত।

রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাসমূহকে মনোবিজ্ঞান বন্য প্রবৃত্তির কষ্টিপাথরে বিচার করে ভুল করেছে

(৩) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সমগ্র বিষয়বস্তু কখনই মনোবিজ্ঞানের গণ্ডিভুক্ত নয়। "মনোবিজ্ঞানের মধ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিকড় রয়েছে'—কথাগুলিকে অতিশয়োক্তি বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সমগ্র বিষয়বস্তু মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নয়

মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কতকগুলি সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয় শাস্ত্রের মধ্যে যে কিছুটা সম্পর্ক আছে তা অস্বীকার করা যায় না।

[চ] রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান (Political Science and Ethics)

নীতিবিজ্ঞান হোল আচার-আচরণের ভালমন্দ সম্পর্কিত ধারণার আলোচনা। মানুষের নীতিবোধ, ভালমন্দের ধারণা, তার ব্যক্তিগত জীবনে আচার-আচরণের ঔচিত্য-অনৌচিত্য সম্পর্কিত বিষয়গুলি হোল নীতিশাস্ত্রের আলোচনাক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত।

নীতিবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

প্রাচীনকালে গ্রীক দার্শনিকগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নীতিবিজ্ঞানের অংশ বলে মনে

করতেন। প্লেটো তাঁর 'গণরাজ্য' (The Republic) এবং অ্যারিস্টটল তাঁর 'রাষ্ট্রনীতি' (The Politics) নামক পুস্তকে রাষ্ট্রের ও আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনায় নৈতিক আদর্শের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রাচীন ভারতে রাজার কর্তব্য, রাজা-প্রজার পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতি নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে আলোচনা করা হোত। এইভাবে গ্রীক রাষ্ট্রনীতিবিদদের অনুসরণ করে প্রাচীন বিশ্বে নৈতিকতার কষ্টিপাথরে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও আচার-আচরণকে বিচার করা হোত ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত।

প্রাচীনকালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নীতিবিজ্ঞানের অংশ বলে মনে করা হোত

কিন্তু বিখ্যাত ইটালীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মেকিয়াভেলি (Machiavelli) সর্বপ্রথম নীতিবিজ্ঞানের প্রভাব থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে মুক্ত করেন। এর ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি পৃথক শাস্ত্রের মর্যাদা লাভ করে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলপ্রয়োগ মতবাদ ও সামাজিক চুক্তি মতবাদ প্রচারিত হয় এই নতুন আদর্শের ভিত্তিতে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নীতিবিজ্ঞান থেকে পৃথকীকরণ

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অনেকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞানের মধ্যে অনেকগুলি পার্থক্য নিরূপণ করতে সমর্থ হয়েছেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞানের পার্থক্য

(১) বিষয়বস্তুর দিক থেকে উভয় শাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য অতি সহজেই চোখে পড়ে। নীতিশাস্ত্র মনের চিন্তা ও বাহ্যিক আচরণ উভয়ই আলোচনা করে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়েই আলোচনা করে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মানুষের সকল প্রকার বাহ্যিক আচরণ কখনই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান কেবলমাত্র মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন ও আচরণ নিয়েই আলোচনা করে। এইভাবে নীতিশাস্ত্রের আলোচনাক্ষেত্রের ব্যাপকতা এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণতা উভয় শাস্ত্রকে পৃথক করেছে।

নীতিবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র ব্যাপক ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্কীর্ণ

(২) ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রেখে নীতিবিজ্ঞানের নির্দেশ রচিত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের নির্দেশ বা আইন রচিত হয় জনগণের সুবিধা-অসুবিধার উপর ভিত্তি করে। ফলে যে কাজ বে-আইনী তা দুর্নীতিমূলক নাও হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ভারতবর্ষে রাস্তার বাম দিক দিয়ে গাড়ী না চালালে আইনতঃ শাস্তি পেতে হয়। কিন্তু কোন ব্যক্তি এই নিয়ম অমান্য করলে নৈতিক বিচারে তার আচরণ দোষণীয় বলে বিবেচিত হয় না।

যা বে-আইনী তা নীতিশাস্ত্রবিরোধী নাও হতে পারে ; কিংবা যা নীতিশাস্ত্র বিরোধী তা বে-আইনী নাও হতে পারে

(৩) রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ প্রতিটি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলতে বাধ্য। এরূপ আইন অমান্য করা হলে আইনভঙ্গকারীকে দৈহিক শাস্তি পেতে হয়। কিন্তু নৈতিক আইনের প্রকৃতি ঠিক এর বিপরীত অর্থাৎ নৈতিক আইন অমান্য করলে সমাজের ধিক্কার কিংবা বিবেকের দংশন ছাড়া কোনরূপ দৈহিক শাস্তি কাউকে পেতে হয় না। বার্ধক্যে উপনীত পিতামাতার যত্ন করা প্রতিটি সন্তানের নৈতিক কর্তব্য।

উভয় প্রকার আইনের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য

কিন্তু কেউ যদি নিজে এই নৈতিক কর্তব্য পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করে তাহলে রাষ্ট্র বা অন্য কেউ তাকে দৈহিক শাস্তি দিতে পারে না।

(৪) একই প্রকার সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেসব দেশে প্রবর্তিত থাকে সেই সব দেশের নীতিশাস্ত্রের বিধানগুলি মোটামুটি একই ধরনের হয়ে থাকে। কিন্তু একই প্রকার রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকলেও বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়।

নৈতিক বিধানগুলির সাদৃশ্য এবং রাষ্ট্রীয় আইনের বৈসাদৃশ্য

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং নীতিবিজ্ঞানের মধ্যে উপরি-উক্ত পার্থক্যগুলি থাকা সত্ত্বেও উভয় শাস্ত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। উদ্দেশ্যের দিক থেকে বিচার করলে এই সম্পর্ক অধিকতর সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। উভয় শাস্ত্রেরই উদ্দেশ্য হোল আদর্শ মানবসমাজের প্রতিষ্ঠা। মানবসমাজকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য কোন্‌টি ন্যায়, কোন্‌টি অন্যায়, কোন্‌টি গ্রহণীয়, কোন্‌টি বর্জনীয় প্রভৃতি নীতিবিজ্ঞানে আলোচিত হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানও নাগরিকদের কোন্‌টি করণীয়, কোন্‌টি করণীয় নয়—সে সম্পর্কে আলোচনা করে। অনেক সময় রাষ্ট্রীয় আইনের সাহায্যে সমাজে নীতিবিগর্হিত প্রথা, লোকাচার প্রভৃতির বিলোপ সাধন করে মানুষের পুরাতন নৈতিক ধ্যানধারণার পরিবর্তন সাধন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ভারতবর্ষে একদা-প্রচলিত সতীদাহ প্রথার কথা উল্লেখ করা যায়। এই প্রথা তদানীন্তন সমাজে নীতিশাস্ত্রবিরোধী বলে বিবেচিত হোত না। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এই নীতিবিগর্হিত প্রথাটির বিলোপ সাধন করা হলে সাময়িকভাবে সতীদাহ প্রথা বিলোপ আইনটির বিরোধিতা পরিলক্ষিত হলেও শেষ পর্যন্ত জনগণ আইনটির যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে পারে। এইভাবে আইন দুর্নীতি বা কুনীতির পরিবর্তে সুনীতিকে আহ্বান করে সমাজের কল্যাণবিধান করে। নীতির দিক থেকে যা অন্যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দিক থেকে তা কখনই ন্যায় বলে বিবেচিত হতে পারে না। উভয় শাস্ত্রের নিবিড় সম্পর্কের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে আইভর ব্রাউন (Ivor Brown) মন্তব্য করেছেন, নীতিশাস্ত্রের ধারণা প্রতিফলিত না হলে রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ অর্থহীন এবং রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ ছাড়া নৈতিক মতবাদ অসম্পূর্ণ। নৈতিক দিক থেকে নিন্দনীয় কোন কিছু রাজনৈতিক দিক থেকে কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয় বলে গান্ধীজীও মনে করতেন। তাঁর ভাষায় রাজনীতি কখনই ধর্মবিবর্জিত হতে পারে না।

উভয় শাস্ত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নৈতিক ধ্যানধারণাও সমাজ এবং রাষ্ট্র-নির্ভর। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক ধারণা এবং নৈতিক আদর্শের পরিবর্তন ঘটে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নৈতিক ভিত্তি হোল স্বার্থপরতা, লোভ, সম্পত্তি অর্জন, অবাধ ও নির্মম প্রতিযোগিতা প্রভৃতি। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নৈতিক ভিত্তি হোল সমাজের জন্য কাজ করা, ব্যক্তি-স্বার্থের ঊর্ধ্বে সামাজিক স্বার্থকে স্থান দেওয়া, পারস্পরিক সহযোগিতা প্রভৃতি।

তৃতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী

[Different Approaches to the study to Political Science]

১। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর শ্রেণী-বিভাজন (Classification of Different Approaches)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মতবিরোধ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান হোল সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা। সমাজবিজ্ঞানের প্রতিটি শাখাকে আলোচনা ও বিশ্লেষণের জন্য সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী অনুসৃত হয়। কিন্তু সমাজ গতিশীল—স্থিতিশীল নয়, অর্থাৎ সমাজ এক জায়গায় স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে না, ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মেই তার পরিবর্তন ঘটে। বলা বাহুল্য, সমাজের পরিবর্তন সাধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আলোচ্য বিষয়-সূচী এবং আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় এবং পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গী অপেক্ষা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী অধিক পরিমাণে গুরুত্ব লাভ করে। কোন্ দৃষ্টিভঙ্গীতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আলোচনা করা হবে তা নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরে মতবিরোধ চলে আসছে। কেউ কেউ রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গীগুলিকে আদর্শ-স্থাপনকারী দৃষ্টিভঙ্গী (Normative Approach) এবং অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী (Empirical Approach)—এই দু'ভাগে বিভক্ত করার পক্ষপাতী। অনেকে আবার দৃষ্টিভঙ্গীগুলিকে দার্শনিক (Philosophical), প্রতিষ্ঠানিক (Institutional), আচরণবাদী (Behavioural) এবং মার্কসবাদী—এই চার ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেন। অ্যালান বল দৃষ্টিভঙ্গীসমূহকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা—সনাতন দৃষ্টিভঙ্গী (Traditional Approaches) এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গীসমূহ (New Approaches)। তিনি দর্শনিক, ঐতিহাসিক ও আইনগত দৃষ্টিভঙ্গীকে সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীব এবং মনস্তাত্ত্বিক, ক্ষমতাকেন্দ্রিক, গোষ্ঠী-কেন্দ্রিক, ব্যবস্থাপক, কাঠামো-কার্যগত, যোগাযোগ তত্ত্বভিত্তিক ও নয়া রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনা করেছেন। তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীকে তিনি সনাতন দৃষ্টিভঙ্গী এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর অন্যতম যোগসূত্র (the link) হিসেবে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত তিন প্রকার শ্রেণীবিভাজনের মধ্যে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীর উপর কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। অথচ একথা সর্বজনবিদিত যে, কেবলমাত্র মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারেই গতিশীল সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রাজনীতিকে আলোচনা করা সম্ভব। তাই জন পামেনাজ (John Palmenatz) প্রমুখ মার্কসীয় তত্ত্বকে সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক তত্ত্বগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ (the most important of all systematic political theories) বলে বর্ণনা করেছেন।

আমরা মোটামুটিভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করতে পারি, যথা—১. সনাতন দৃষ্টিভঙ্গী, ২. আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী (Behavioural Approach) এবং ৩. মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী (Marxist Approach)। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী ও আইনগত দৃষ্টিভঙ্গীকে সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীর এবং মনস্তাত্ত্বিক, ক্ষমতাকেন্দ্রিক, গোষ্ঠীকেন্দ্রিক, ব্যবস্থা-জ্ঞাপক, কাঠামো-কার্যগত, যোগাযোগ তত্ত্বভিত্তিক ও নয়া রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। নিম্নলিখিত রেখাচিত্রের সাহায্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর শ্রেণী-বিভাজনকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করা যায় ঃ

বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর একটি গ্রহণযোগ্য শ্রেণী-বিভাজন
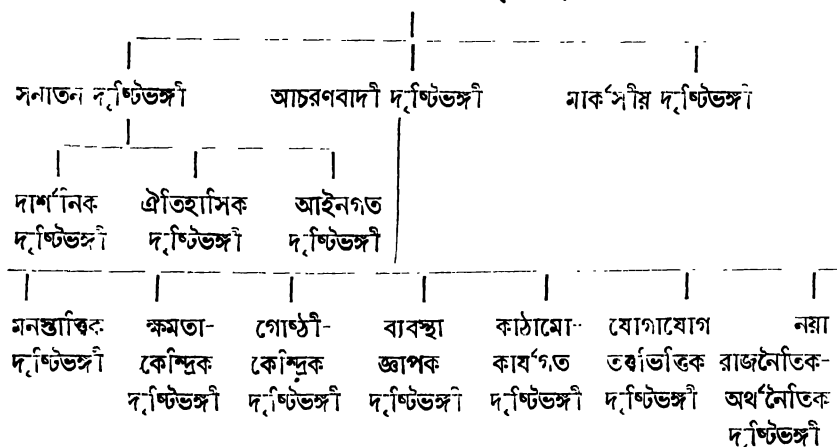
২। সনাতন দৃষ্টিভঙ্গী (Traditional Approaches)

দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও আইনগত দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আলোচনা করার যে দৃষ্টিভঙ্গী তাকে অ্যালান বল সনাতন দৃষ্টিভঙ্গী বলে বর্ণনা করেছেন। ১৯০০ সালের পূর্বে দর্শন, ইতিহাস ও আইনের সাহায্যে রাজনীতিকে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করার একটি বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

[ক] **দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী** (Philosophical Approach) ঃ প্লেটো (Plato), কান্ট (Kant), হেগেল (Hegel), গ্রীন (Green) প্রমুখ প্রাচীন রাজনৈতিক চিন্তাবিদ্‌গণ রাজনৈতিক তত্ত্ব (Political Theory) এবং রাজনৈতিক দর্শনকে (Political Philosophy) অভিন্ন বলে মনে করতেন। তাঁরা রাষ্ট্রের বাস্তব অবস্থার পর্যালোচনা অপেক্ষা কতকগুলি পূর্ব-সিদ্ধান্তের দ্বারা পরিচালিত হয়ে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক জীবনকে ব্যাখ্যা করতেন। ঐ সব দার্শনিক বাস্তব তথ্যাদি কিংবা ঘটনা অপেক্ষা অনেক বেশী নির্ভর

দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর মূল বক্তব্য

করতেন আত্মসমীক্ষা (introspection)-র উপর। অন্যভাবে বলা যায়, ঐসব ভাববাদী দার্শনিক অবরোহ পদ্ধতি (deductive method)-র সাহায্যে আদর্শ রাষ্ট্র ও সুন্দর জীবনের প্রতিষ্ঠাকে তাঁদের পবিত্র কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থকগণ অলৌকিক ও ভাববাদী আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছুকেই বিচারবিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেতেন। ফলে আলোচনার সময় ভালমন্দ, উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই প্রাধান্যলাভ করত। তাছাড়া, ঐসব দার্শনিক রাষ্ট্র তথা রাজনৈতিক জীবনের অনুসন্ধান কার্য চালাবার সময় বাস্তব ঘটনা ও তথ্যাদি সংগ্রহের উপর গুরুত্ব আরোপ না করে পূর্ব-নির্ধারিত অনুমানের ভিত্তিতে সর্বজনীন সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন এবং সেই সিদ্ধান্তকে স্বতঃসিদ্ধ বলে প্রচার করতেন। বস্তুতঃ, রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক জীবনের সর্বজনীন মূল্যবোধ নির্ণয় করে তার ভিত্তিতে রাষ্ট্র, আইন, নাগরিক অধিকার প্রভৃতি সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করাই ছিল ভাববাদী দার্শনিকদের প্রধান লক্ষ্য। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্লেটো তাঁর 'আদর্শ রাষ্ট্র' (ideal state) প্রতিষ্ঠার জন্য 'দার্শনিক রাজা'র (philosophical king) অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অনুরূপভাবে আদর্শ সমাজ (ideal community)-এর প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে রুশো (Rousseau) নাগরিকদের সর্বপ্রধান নিয়ন্ত্রণকর্তা হিসেবে 'সাধারণের ইচ্ছা' (General Will)-র সার্বভৌমত্বের কথা ঘোষণা করেছিলেন। হেগেল, গ্রীন, ব্র্যাডলীও আদর্শ রাষ্ট্রের অনুসন্ধানের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

রাজনৈতিক দর্শন সমাজনিরপেক্ষ নয়

তবে অ্যালান বল এই অভিমত পোষণ করেছেন যে, ঐসব দার্শনিক কেবলমাত্র পূর্ব-ধারণার দ্বারা পরিচালিত হতেন না; তাঁরা বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। উদাহরণস্বরূপ হবস, লক, রুশো, কিংবা ম্যাকিয়াভেলির কথা উল্লেখ করা যায়। হবসের 'লেভিয়াথানে'র ধারণা সমকালীন রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। লকের রাজনৈতিক তত্ত্ব তদানীন্তন ইংল্যাণ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবি প্রতিষ্ঠার দলিলমাত্র। রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদের মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী সমাজজীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। ম্যাকিয়াভেলির রাজনৈতিক দর্শন গড়ে উঠেছিল তাঁর সরকারী কাজে নিযুক্ত থাকার অভিজ্ঞতা থেকে। সুতরাং বলা যায়, কোন রাজনৈতিক দর্শনই সমাজ-নিরপেক্ষভাবে গড়ে উঠতে পারে না।

[খ] **ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী (Historical Approach) :** ঐতিহাসিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর সাহায্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পর্যালোচনা করাকে অ্যালান বল অন্যতম সনাতন দৃষ্টিভঙ্গী বলে বর্ণনা করেছেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী বলতে সংগৃহীত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে অতীত ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ এবং সাম্প্রতিককালের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সম্ভাব্য অনুসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকে বোঝায়। ঐতিহাসিকরা প্রধানতঃ বর্ণনাত্মক (descriptive) পদ্ধতিতে ইতিহাসের বিচারবিশ্লেষণ করেন। তাঁরা প্রধানতঃ জীবনস্মৃতি, সাংবাদিকগণ কর্তৃক বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনাবলী প্রভৃতি থেকে ঐতিহাসিক পর্যালোচনার

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর মূল বক্তব্য

মালমসলা সংগ্রহ করেন। অ্যালান বলের মতে, ঐতিহাসিকরা সমন্বয়-সাধকের কার্য সম্পাদন করেন। নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা ও সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে তাঁরা তথ্যাদি সংগ্রহ করে তার মধ্য থেকে মৌলিক বিষয়সমূহকে খুঁজে বের করেন এবং সেগুলির সুসংহত রূপদান করেন। তবে রাজনৈতিক ইতিহাস অনেক সময় সমগ্র দেশ বা জাতির রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে যথার্থভাবে উপস্থাপিত করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আইভর জেনিংস ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও সংসদীয় শাসনব্যবস্থার যে ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করেছেন তার মধ্যে ইংরেজ জাতির সমগ্র রাজনৈতিক জীবনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পাওয়া যায় না। সুতরাং রাজনৈতিক জীবনের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পটভূমিকে অস্বীকার করা না গেলেও ঐতিহাসিকের সংগৃহীত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতাকে ভালভাবে পরীক্ষা করে নেওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলে বিভ্রান্তির সূত্রপাত ঘটার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। বস্তুতঃ, সনাতনপন্থী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে যেভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আলোচনা করেছেন তাকে কতখানি ইতিহাসভিত্তিক আলোচনা বলা যায় তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ রয়েছে। কারণ, কোন ঘটনার ধারাবাহিক সংকলনকে ইতিহাস বলে স্বীকার করে নেওয়া যায় না। ঘটনার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ-সমূহকে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করার উপযোগী একটি সুনির্দিষ্ট আলোচনা-পদ্ধতির কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। কিন্তু সনাতনপন্থী রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ এরূপ কোন কাঠামো গড়ে তুলতে পারেন নি। তাছাড়া, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা নিজেদের ধ্যান-ধারণাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য কিংবা বিশেষ কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য ইতিহাসকে ব্যবহার করেছেন। বলা বাহুল্য, তা করতে গিয়ে অনেক সময় তাঁরা তথ্যের বিকৃতিসাধন করেছেন। সুতরাং বলা যায়, ইতিহাসের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও বর্ণনাত্মক আলোচনা এবং সেই আলোচনার উপর পূর্বধারণার প্রভাব তাঁদের আলোচনাকে আদর্শস্থাপনকারী (normative) দৃষ্টিভঙ্গীর গন্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ করে রেখেছিল।

[গ] **আইনগত দৃষ্টিভঙ্গী (Juristic Approach):** ১৯০৯ সালের পূর্বে ইউরোপীয় রাজনীতি পর্যালোচনার অপরিহার্য অঙ্গ ছিল আইনগত দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসরণ। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার সময় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং তাদের আইনগত দিকের পর্যালোচনা করা ঐ সময় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হোত। ১৮৮৫ সালে ডাইসির 'শাসনতন্ত্রের আইন' (Law of the Constitution) প্রকাশিত হওয়ার পর আইনগত দৃষ্টিভঙ্গীতে রাজনীতিকে আলোচনা করার প্রবণতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। প্রধানতঃ দেশের শাসনতন্ত্র, আইনগত সার্বভৌমিকতা, আইনের অনুশাসন, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের আইনগত কাঠামো ও কার্যাবলী প্রভৃতির মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থকেরা তাঁদের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষপাতী। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গীর সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি হল—সব সময় কেবলমাত্র আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারবিশ্লেষণ করে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না এবং তার সার্বিক মূল্যায়ন করাও সম্ভব হয় না। রাষ্ট্রের আইন, শাসনতন্ত্র, সরকার ইত্যাদি যে সামাজিক ও আর্থিক

আইনগত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রধান বিবেচ্য বিষয়

শক্তিবিন্যাসের উপর নির্ভরশীল, আইনগত দৃষ্টিভঙ্গী তা মেনে নিতে অস্বীকার করে। তাই এরূপ দৃষ্টিভঙ্গীকে অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী বলে সমালোচনা করা হয়।

সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীর সীমাবদ্ধতা (Limitations of the Traditional Approaches) : রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীকে নানা দিক থেকে সমালোচনা করা যেতে পারে। ক. এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী প্রধানতঃ বর্ণনাত্মক (descriptive) ও প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক (institutional) আলোচনার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখে বলে তা বিশেষভাবে ত্রুটিপূর্ণ। কারণ সমাজের মধ্যেকার সামাজিক ও আর্থিক শক্তিকে উপেক্ষা করে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থকেরা রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি নির্ধারণের প্রয়াস পান। ফলে তাঁদের আলোচনা ও বিশ্লেষণ কখনই বৈজ্ঞানিক আলোচনার রূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি।

বিভিন্ন প্রকার সীমাবদ্ধতা

খ. সনাতদ দৃষ্টিভঙ্গী রাজনৈতিক দল, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, ভোট সম্পর্কিত ব্যবহার (voting behaviour), জনমত, রাজনৈতিক সংস্কৃতি (political culture) প্রভৃতি সম্পর্কে কোন প্রকার আলোচনার বিরোধী। তাই তাঁদের আলোচনা যে কেবলমাত্র অসম্পূর্ণতা দোষে দুষ্ট তা-ই নয়, সেই সঙ্গে তা আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গতিপ্রকৃতি ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে মনে করা হয়।

গ. সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীর অন্যতম প্রধান ত্রুটি হোল—তা আন্তঃ-সমাজবিজ্ঞানকেন্দ্রিক আলোচনায় আগ্রহী নয়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাকে পরিপূর্ণতাদানের জন্য ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজতত্ত্ব, অর্থশাস্ত্র, যোগাযোগ তত্ত্ব, সংখ্যাতত্ত্ব, এমন কি অঙ্কশাস্ত্রের সঙ্গেও সংযোগ স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন।

ঘ. সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থকেরা কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক আলোচনায় নিজেদের ব্যাপৃত রাখতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁরা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আচার-আচরণকে বিচারবিশ্লেষণ করার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করতেন না। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসরণকে কেবলমাত্র অপ্রতুল বলেই মনে করেন না, সেই সঙ্গে অবৈজ্ঞানিক বলেও অভিহিত করেন।

ঙ. সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থকগণ প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক আলোচনা করতে গিয়ে কেবলমাত্র উন্নত রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়েই আলোচনা করেছেন। তাঁদের আলোচনায় অনুন্নত দেশসমূহের আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির কোন স্থান ছিল না।

চ. সর্বোপরি, সনাতন দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পর্যালোচনার সময় আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও প্রতিষ্ঠানের আলোচনার উপর কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করা হোত না। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসরণকারিগণ আনুষ্ঠানিক জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সংকীর্ণ আলোচনার মধ্যে নিজেদের আলোচনার গন্ডীকে সীমাবদ্ধ রাখতেন।

বিভিন্ন দিক থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করা হলেও উক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর গুরুত্ব ও প্রভাবকে কোনমতেই উপেক্ষা করা যায় না। অ্যালান বলের মতে, বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর

অবস্থিতি সত্ত্বেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মূলতঃ 'বর্ণনাত্মক ও প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী'র (descriptive and institutional approaches) সাহায্যে শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ, রাষ্ট্রকৃত্যক, বিচার বিভাগ ও স্থানীয় শাসনব্যবস্থার মতো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে তাঁদের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখেন। এই ধরনের আলোচনার মাধ্যমে তাঁরা ঐসব প্রতিষ্ঠানের সংগঠন সম্পর্কে মূল্যবান ইঙ্গিত প্রদান করেন এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের ব্যাপারেও সুপারিশ করতে পারেন। তবে একথা সত্য যে, সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিচারবিশ্লেষণ করে তার ভিত্তিতে কোন ব্যাপক তত্ত্ব (wide-reaching theories) গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। এ ব্যাপারে ক্রীক-প্রণীত 'পার্লামেন্টের সংস্কার' (Reform of Parliament) কিংবা স্যামুয়েলের 'কর্মরত কংগ্রেস' (Congress at Work)-এর কথা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। এই দুটি পুস্তকে যথাক্রমে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও আমেরিকার কংগ্রেসের কার্যাবলীকে বর্ণনাত্মক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করার পর তাদের দোষত্রুটি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু ঐ দুটি পুস্তকে কোন রকম সাধারণ তত্ত্ব (general theory) তুলে ধরা হয়নি। উপরি-উক্ত কারণে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অনেকেই সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীকে অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী বলে বর্ণনা করেন এবং এরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীর গুরুত্ব

৩। আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী (Behavioural Approach)

[ক] আচরণবাদের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (Origin and Development of Behaviouralism) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে আচরণবাদ বিশেষভাবে ব্যাপকতা লাভ করলেও বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে তার উৎপত্তি ঘটে। ১৯০৮ সালে প্রকাশিত গ্রাহাম ওয়ালেসের 'রাজনীতিতে মনুষ্য প্রকৃতি' (Human Nature in Politics) এবং আর্থার বেন্টলের 'সরকারের ক্রমাগ্রসরণ' (The Process of Government) নামক গ্রন্থে মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি প্রয়োগ করে সর্বপ্রথম রাজনীতিকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়। তাঁরা সনাতন দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী দার্শনিক, প্রতিষ্ঠানিক ও বর্ণনাত্মক পদ্ধতি অনুসারে রাজনৈতিক আলোচনার তীব্র সমালোচনা করে তথ্য, পরিসংখ্যান ও সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আর্থার বেন্টলে রাজনৈতিক আচরণের বিচারবিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর কার্যাবলী পর্যালোচনার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করার কথা ঘোষণা করেন। এর পর বিশ ও ত্রিশের দশকে চার্লস মেরিয়াম, জর্জ ক্যাটলিন, স্টুয়ার্ট রাইস, ফ্রাঙ্ক কেন্ট, হ্যারল্ড লাসওয়েল প্রমুখ আচরণবাদকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হন। মেরিয়ামের 'রাজনীতির নতুন ধারা' (১৯২৫) [New Aspects of Politics], ক্যাটলিনের 'রাজনীতিতে বিজ্ঞান এবং পদ্ধতি' (১৯২৭) [The Science and Method in Politics], রাইসের 'রাজনীতিতে সংখ্যায়ন পদ্ধতি' (১৯২৮) [Quantitative

বিংশ শতাব্দীর প্রথমে আচরণবাদের আবির্ভাব

Methods in Politics], কেন্টের 'রাজনৈতিক আচরণ: ইতিপূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুসৃত অলিখিত আইন, প্রথা এবং রাজনীতির নীতিসমূহ' (১৯২৮) [Political Behaviour: The Heretofore Unwritten Laws, Customs, and Principles of Politics as Practised in the United States) এবং লাসওয়েলের 'মনস্তাত্ত্বিক-বিকারবিদ্যা ও রাজনীতি' (১৯৩০) [Psycho-pathology and Politics] প্রভৃতি গ্রন্থ আচরণবাদের বিকাশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, রাজনীতি আলোচনায় আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণের উপর মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী চার্লস মেরিয়ামকেই আচরণবাদের জনক বলে অনেকে মনে করেন। তিনি চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ছাত্রছাত্রী এবং সহকর্মীদের মধ্যে এই নতুন চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটাতে সমর্থ হন। ১৯২৫ সালে মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞান সংগঠনের (The American Political Science Association) সভায় সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, "আগামী দিনে আমরা হয়তো আনুষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তে অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে পারি এবং আমাদের অনুসন্ধান কার্যের অপরিহার্য বিষয় হিসেবে রাজনৈতিক আচরণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে।" তাঁর চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যাঁরা আচরণবাদকে সমৃদ্ধ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ভি. ও. কী, ডেভিড বি. ট্রুম্যান, হার্বার্ট সাইমন এবং গেব্রিয়েল এ. অ্যালমন্ডের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা 'চিকাগো গোষ্ঠী' (Chicago School) নামে পরিচিতি লাভ করেন। বিশের দশকে ইউরোপের কয়েকজন ছাত্র ফ্রয়েড প্রমুখ মনোবিজ্ঞানী এবং ম্যাক্সওয়েবার প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিকের চিন্তাধারা বহন করে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। এর ফলে ফ্র্যাঞ্জ নিউম্যান, হ্যানস গার্থ, রেনহার্ড বেনডিক্স প্রমুখ প্রথিতযশা মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে মনোবিদ্যা ও সমাজবিদ্যার নিবিড় সম্পর্কের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন।

মেরিয়ামের অবদান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাজনৈতিক আচরণবাদ মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের হাতে চরমভাবে বিকশিত হয়। ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ একথা উপলব্ধি করতে পারলেন যে, তাত্ত্বিকতার গজদন্ত-মিনারে (ivory towers of theory) অবস্থান করার পরিবর্তে, বাস্তব জগতের আলোকে রাজনীতিকে বিচারবিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে পালো অ্যাল্টো এবং মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি উন্নতমান পাঠকেন্দ্র (advanced study centres) প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী আলোচনা করার জন্য স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীর পুনর্বিন্যাস করা হয়। ১৯৬২ সালে ওয়ারেন মিলারের নেতৃত্বে 'রাজনৈতিক গবেষণার জন্য আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় মিলন সঙ্ঘ' (Inter-University Consortium for Political Research) প্রতিষ্ঠিত হয়। 'পরিমাপ গবেষণা কেন্দ্রে'র

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আচরণবাদের বিকাশ

(Survey Research Centre) নির্বাচন সংক্রান্ত উপাত্তকে (data) ব্যবহার করাই ছিল এই সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। পরবর্তী সময়ে ডেভিড ইস্টন, মাইরন ওয়েনার, সিডনী ভারবা, কার্ল ডয়েশ্চ, এডওয়ার্ড শীলস, জি. বি. পাওয়েল, রবার্ট ডাল, ডেভিড আপ্টার প্রমুখের দ্বারা আচরণবাদ বিশেষ সমৃদ্ধ হয়ে উঠে।

আচরণবাদের উদ্ভবের প্রকৃত কারণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আচরণবাদের উদ্ভবের পশ্চাতে সর্বপ্রধান কারণ হোল—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হয় এবং মার্কসীয় মতবাদের বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তাই মার্কসবাদের বিকাশকে রোধ করার জন্য মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আচরণবাদের জন্ম দেন বলে সাধারণভাবে মনে করা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, আচরণবাদের অস্ত্র দিয়ে মার্কসবাদকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্য নিয়েই মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আচরণবাদের জন্ম দেন। তাই আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ নিজেদের আলোচনাকে বিজ্ঞানভিত্তিক, অভিজ্ঞতাবাদী ও মূল্যমান-নিরপেক্ষভাবে গড়ে তোলার কথা প্রচার করলেও শেষ বিচারে দেখা যায়, মুমূর্ষু ধনতন্ত্রবাদকে টিকিয়ে রাখার জন্য তাঁরা স্থিতাবস্থা রক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

[খ] আচরণবাদের অর্থ (Meaing of Behaviouralism): রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীর নানা প্রকার সীমাবদ্ধতার জন্য বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে আচরণবাদের উদ্ভব ঘটে। প্রধানতঃ আদর্শস্থাপনকারী (normative) দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক আলোচনার পরিবর্তে আন্তঃসমাজবিজ্ঞানের সহযোগিতায় ব্যাপক অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্ব (empirical theory) গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণের কথা প্রচারিত হয়। কিন্তু আচরণবাদ বলতে কি বোঝায় তা সংক্ষেপে এবং সুনির্দিষ্টভাবে বলা যথেষ্ট কঠিন। আর্নল্ড ব্রেখট আচরণবাদকে 'রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে একটি অভিজ্ঞতাবাদী এবং চিরস্থায়ী তত্ত্ব' (an empirical and enduring theory about political life) গড়ে তোলার প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করেছেন। গিল্ড ও পামারের মতে, আচরণবাদ হোল যে-কোন ঘটনার 'সুসংবদ্ধ, অভিজ্ঞতাবাদী এবং হেতু-সংক্রান্ত ব্যাখ্যা' (a systematic, empirical, causal explanation of certain phenomena)। রবার্ট ডাল আচরণবাদকে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে একটি প্রতিবাদ আন্দোলন' (a protest movement within Political Science) বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও বর্ণনাত্মক-প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক (descriptive institutional) দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পর্যালোচনায় সনাতন পদ্ধতি পরিত্যাগ করে ব্যক্তির পর্যবেক্ষিত ও পর্যবেক্ষণশীল (observed and observable) আচার-আচরণের মাধ্যমে রাজনীতিকে ব্যাখ্যার যেমন চেষ্টা করেন, তেমনি আধুনিক মনোবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, অর্থবিদ্যা ও নৃতত্ত্বের সাহায্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অভিজ্ঞতালব্ধ অংশকে (the empirical component of Political Science) অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত করে গড়ে তোলার পক্ষপাতী। ডাল আচরণবাদকে 'আচরণবাদী ক্রিয়াভাব' (behavioural

আচরণবাদ বলতে কি বোঝায়

mood) কিংবা 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী' (scientific outlook) নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর এরূপ চিন্তাধারার উপর ডেভিড ট্রুম্যানের চিন্তাধারার প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। ১৯৫১ সালে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত একটি আলোচনা-চক্রে ট্রুম্যান এই অভিমত পোষণ করেছিলেন যে, মোটামুটিভাবে দেশশাসনের পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ বা গোষ্ঠিসমূহের ক্রিয়া ও মিথষ্ক্রিয়াকে (actions and interactions) রাজনৈতিক আচরণ (political behaviour) বলা হয়। তাঁর মতে, রাজনৈতিক আচরণবাদের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যথা—ক. সুসংবদ্ধ গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ এবং খ. অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ-করণ। তিনি এই অভিমত পোষণ করেছেন যে, তত্ত্বের দ্বারা পরিচালিত না হলে অভিজ্ঞতাবাদ যেমন বন্ধ্যা হয়ে যাবে, তেমনি কোন অনুমানকে (speculation) অভিজ্ঞতার নিরিখে যাচাই করা না হলে তা অর্থহীন হয়ে পড়বে। রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করাকে রাজনৈতিক আচরণবাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য (ultimate goal) বলে তিনি বর্ণনা করেছেন।

[গ] **আচরণবাদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য (Nature and characteristics of Behaviouralism)**: রাজনৈতিক আচরণবাদ ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর আচরণকে পর্যালোচনার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে। তাই সনাতন দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক আলোচনার মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ না রেখে আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর রাজনৈতিক আচরণকে রাষ্ট্রনীতির আচরণ ব্যাখ্যার কেন্দ্রীয় এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতাবাদী তথ্য হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষপাতী। তাঁদের মতে, রাজনৈতিক আচরণ ব্যক্তি-আচরণের একটি অংশ হলেও তাকে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গভীর সম্পর্কের কষ্টিপাথরে বিচারবিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। আচরণবাদী পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তত্ত্ব ও গবেষণার মধ্যে সংহতি রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন বলে আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন। পরিমাপ ও সংখ্যায়নের মাধ্যমে এরূপ সংহতি রক্ষা করা সম্ভব বলে আচরণবাদীদের ধারণা। আচরণবাদীরা তাঁদের রাজনৈতিক আলোচনাকে সম্পূর্ণভাবে মূল্যমান-নিরপেক্ষ (value-free) করে গড়ে তোলার কথা প্রচার করেন। মূল্যমান-নিরপেক্ষতা হোল বৈজ্ঞানিক আলোচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আচরণবাদীরাও তাঁদের রাজনৈতিক আলোচনার মধ্যে উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ ইত্যাদি প্রশ্নকে স্থান দিতে রাজী নন। ভৌতবিজ্ঞানীদের মতো তাঁরাও গবেষণা এবং তাত্ত্বিক আলোচনার সময় কোনরকম রাজনৈতিক পছন্দ (political preference) ও আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গীকে স্থান না দিয়ে আলোচনাকে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার পর্যায়ে উন্নীত করার প্রয়াস পান।

আচরণবাদের প্রকৃতি

হিঞ্জ ইউলাউ (Heinz Eulau) আচরণবাদের বৈশিষ্ট্যগুলিকে চার ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন, যথা—ক. আচরণবাদ ঘটনা, কাঠামো, প্রতিষ্ঠান বা আদর্শকে তাত্ত্বিক ও অভিজ্ঞতাবাদী বিশ্লেষণের একক (unit) হিসেবে গণ্য করার পরিবর্তে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আচরণকে আলোচনা করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। অন্যভাবে বলা হয়, আচরণবাদ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আচরণ যে কাঠামোর

মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে তার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে পর্যালোচনা করে। খ. আচরণবাদ মনে করে যে, সামাজিক জীব হিসেবে ব্যক্তির রাজনৈতিক আচরণ তার সমগ্র আচরণের একটি অংশমাত্র। তাই তার রাজনৈতিক আচরণকে বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়। আচরণবাদী পদ্ধতির দৃষ্টি রাজনৈতিক ভূমিকা (Political Roles) এবং রাজনৈতিক লক্ষ্যে (Political Goals)-র প্রতি নিবদ্ধ থাকলেও আচরণবাদীরা রাজনৈতিক আচরণকে ব্যক্তিত্ব, সামাজিক সংগঠন ও সমাজের প্রকাশ বলে মনে করেন। গ. আচরণবাদ তত্ত্ব ও গবেষণার পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর যেমন গুরুত্ব আরোপ করে, তেমনি অভিজ্ঞতাবাদী (empirical) গবেষণার লক্ষ্য পূরণের জন্য তাত্ত্বিক প্রশ্নকে কার্যকরী শব্দের (operational term) মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করে। আচরণবাদ নিছক ঘটনাকে (brute facts) আলোচনা করে না; আত্মসচেতন-ভাবেই তা তত্ত্বকেন্দ্রিক। ঘ. পরীক্ষামূলক অনুসিদ্ধান্ত, কার্যকরী সংজ্ঞা, পরীক্ষামূলক নমুনা, কার্যপদ্ধতির বিশ্বাসযোগ্যতা, যথার্থ বিচারের মাপকাঠি ইত্যাদির মাধ্যমে আচরণবাদ একটি কঠোর গবেষণা পদ্ধতি গড়ে তোলার চেষ্টা করে। ই. কার্কপেট্রিক আচরণবাদী আন্দোলনের চারটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ঐ চারটি বৈশিষ্ট্য হল: ১. রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির পরিবর্তে ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর আচরণকে মৌলিক ধারণার একক (the basic conceptual unit) হিসেবে গ্রহণ, ২. আন্তঃ-সমাজবিজ্ঞানকেন্দ্রিক আলোচনার প্রবর্তন, ৩. সুস্পষ্টতা, পরিমাপ ও পরিমাণ সংক্রান্ত কৌশলের (precision, measurement and quantitative techniques) উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান, এবং ৪. সুসংবদ্ধ অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্বের বিকাশ সাধন। ডেভিড ইস্টন আচরণবাদের আটটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, যথা—ক. নিয়মমাফিকতা (regularities), খ. সত্যতা প্রমাণ (verifications), গ. কৌশল উদ্ভাবন (techniques), ঘ. সংখ্যায়ন (quantification), ঙ. মূল্যমান নিরপেক্ষতা, চ. সুসংহতকরণ (systematization), ছ. বিশুদ্ধ বিজ্ঞান (pure science) এবং জ. সংহতি-সাধন (integration)। তিনি এই-সব বৈশিষ্ট্যকে 'রাজনৈতিক আচরণবাদের বুদ্ধিগত ভিত্তি' (intellectual foundations of political behaviouralism) বলে অভিহিত করেছেন।

ইউলাউ, কার্কপেট্রিক ও ইস্টনের মতে আচরণবাদের বৈশিষ্ট্য

উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা আচরণবাদের নিম্ন-লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করতে পারি:

আচরণবাদের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

১. আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ ঘটনা (events), কাঠামো (structures), প্রতিষ্ঠান (institutions) কিংবা মতাদর্শের (ideologies) পরিবর্তে ব্যক্তি ও সামাজিক গোষ্ঠীর আচরণকে তাত্ত্বিক ও অভিজ্ঞতাবাদী বিশ্লেষণের একক (unit) বা লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেন।

২. আচরণবাদ রাজনৈতিক তত্ত্ব ও গবেষণার গন্ডীকে সমাজ-মনোবিদ্যা (social psychology), সমাজবিদ্যা ও সংস্কৃতিগত নৃতত্ত্ব (cultural anthropology) পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার পক্ষপাতী। যদিও রাজনৈতিক ভূমিকা (political roles)

ও রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে এরূপ করা হয়, তথাপি আচরণবাদীরা রাজনৈতিক আচরণকে ব্যক্তিত্ব, সামাজিক সংগঠন (social organisation) ও সমাজের একটি কার্য (a function) বলে মনে করেন।

৩. রাজনৈতিক আচরণবাদ তত্ত্ব ও গবেষণার পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। অভিজ্ঞতাবাদী গবেষণার লক্ষ্য পূরণের জন্য তা তাত্ত্বিক প্রশ্নকে কার্যকরী শব্দের মাধ্যমে তুলে ধরার জন্য সচেষ্ট হয়। আবার অভিজ্ঞতালব্ধ সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক তত্ত্বের বিকাশ সাধনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে বলে আচরণবাদীদের ধারণা। অন্যভাবে বলা যায়, আচরণবাদ পূর্বেকার বর্ণনাত্মক অভিজ্ঞতাবাদের মতো নিছক ঘটনাকে নিয়ে আলোচনা করে না ; আত্মসচেতনভাবেই তা তত্ত্বকেন্দ্রিক।

৪. সাধারণভাবে আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক আলোচনার বিরোধী। তাঁরা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের বিভিন্ন মাধ্যম প্রভৃতিকে সরকারের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান (formal institutions) বলে মনে করেন না। আচরণবাদীরা ক্ষমতা প্রয়োগ (use of power)-এর সঙ্গে সংযুক্ত যে-কোন কার্যকেই রাজনৈতিক কার্য বলে বর্ণনা করে তাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী।

৫. আচরণবাদীদের মতে, একটি সুসংবদ্ধ অভিজ্ঞতাবাদী রাজনৈতিক তত্ত্ব গঠন করাই হোল প্রতিটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর চরম উদ্দেশ্য। তা করতে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যাখ্যার সনাতন পদ্ধতিকে তাঁরা যেমন সমালোচনা করেন, তেমনি মূল্যের (values) পরিবর্তে তাঁরা কেবলমাত্র 'ঘটনা' (facts)-র উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। এইভাবে তাঁরা তাঁদের আলোচনাকে 'মূল্যমান-নিরপেক্ষ' করে গড়ে তোলার পক্ষপাতী।

৬. আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী সমাজবিজ্ঞানগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ একথা মনে করেন যে, বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানের সীমানা নির্ধারিত হয় ব্যক্তির ভূমিকাকে কেন্দ্র করে। এইভাবে একজন পিতা, একজন ভোক্তা, একজন ভোটদাতা ইত্যাদি হিসেবে ব্যক্তির ভূমিকাকে কেন্দ্র করে সমাজবিদ্যা, অর্থবিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি গড়ে উঠেছে। সমাজবিজ্ঞানের এইসব শাখার মধ্যে সংযোগ সাধন ছাড়া ব্যক্তির ভূমিকাকে যথার্থভাবে পর্যালোচনা করা সম্ভব নয় বলে তাঁদের ধারণা।

৭. রাজনৈতিক আচরণগত সমস্যাসমূহের (political behavour problems) বিশ্লেষণ ছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের গবেষণা পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না বলে আচরণবাদিগণ মনে করেন। তাই তাঁরা বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এখানেই সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর অন্যতম মৌলিক পার্থক্য।

[ঘ] **সমালোচনা (Criticism) :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার অন্যতম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর দাবি নিয়ে আচরণবাদের আবির্ভাব ঘটলেও নানা দিক থেকে এর সমালোচনা করা যেতে পারে।

১ আচরণবাদের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ হোল—এর প্রচারকেরা 'রাজনীতি'র

(politics) একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্ধারণের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হতে পারেননি। তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী 'রাজনীতি'র সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। এইভাবে ডেভিড ইস্টন যখন 'রাজনীতি'কে 'মূল্যের কর্তৃত্বসম্পন্ন বরাদ্দ' (authoritative allocation of values) বলে বর্ণনা করেছেন, তখন হ্যারল্ড লাসওয়েল তাকে 'প্রভাব ও প্রভাবশালী'দের (influence and the influentials) সম্পর্ক বলে চিত্রিত করেছেন। ফলে আচরণবাদী রাজনৈতিক তত্ত্বের একজন পাঠক 'রাজনৈতিক আচরণ' বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বোঝায় তা সহজে উপলব্ধি করতে পারেন না। তাছাড়া, ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্পর্কে কোন আলোচনা না করে কেবলমাত্র তাদের আচরণের ভিত্তিতে 'রাজনৈতিক' কথাটির যথার্থ সংজ্ঞা প্রদান করা সম্ভব কিনা সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করার অবকাশ আছে।

রাজনীতির সংজ্ঞা নির্ধারণে ঐকমত্যের অভাব

২. আচরণবাদীরা সংখ্যায়ন (quantification) ও পরিমাপের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁরা সংখ্যায়ন ও পরিমাপ-বহির্ভূত কোন সমস্যা বা বিষয়কে তাঁদের আলোচনার মধ্যে স্থান দিতে রাজী নন। তাই অনেকে আচরণবাদী আলোচনাকে সংখ্যাতত্ত্বের নামান্তর বলে সমালোচনা করেন।

আচরণবাদী আলোচনা সংখ্যাতত্ত্বের নামান্তর মাত্র

৩. মূল্যবোধকে অস্বীকার করে কেবলমাত্র উপাত্ত (data) সংগ্রহ, তালিকা প্রণয়ন, রেখাচিত্র অঙ্কন ইত্যাদির মাধ্যমে রাজনৈতিক জীবনের যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করা অসম্ভব বলে সমালোচকরা মনে করেন। লিও স্ট্রসের মতে, মূল্যবোধ ছাড়া সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনার আলোচনা সম্ভব নয়। অ্যালফ্রেড কোবানও মনে করেন যে, রাজনৈতিক তাত্ত্বিকের কোন আলোচনাই মূল্যমান-নিরপেক্ষ হতে পারে না। কিন্তু আচরণবাদী রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীরা মূল্যবোধকে অস্বীকার করে কার্যতঃ সমাজকে একটি কৃত্রিম গবেষণাগারে পরিণত করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ডেভিড ইস্টনের মতো আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরাও পরবর্তী সময়ে একথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, মূল্যবোধের ধারণাযুক্ত আদর্শস্থাপনকারী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মূল্যমান-নিরপেক্ষ অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয় সাধনের মাধ্যমেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সঠিকভাবে আলোচনা করা সম্ভব।

মূল্যবোধকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়

৪. আচরণবাদ হোল একটি চরম রক্ষণশীল মতবাদ। প্রচলিত বুর্জোয়া সমাজের স্থিতাবস্থা (*status quo*) বজায় রাখাই হোল আচরণবাদীদের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য। তাই তাঁরা সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ, সমাজ পরিবর্তনের শক্তিসমূহ কিংবা সমাজবিপ্লবের নীতি নিয়ে আলোচনা করার পরিবর্তে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ এবং সেগুলিকে বিশ্লেষণ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। বস্তুতঃ রাষ্ট্রহীন আলোচনাধারার প্রবর্তন ঘটিয়ে তাঁরা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শোষণমূলক চরিত্রটিকে আড়াল করার প্রয়াস পেয়েছেন বলে মনে করা হয়।

রক্ষণশীল মতবাদ

৫ তাছাড়া, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্ধভাবে প্রয়োগ করার যে প্রবণতা আচরণবাদীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায় সেই প্রবণতাকে আদো স্বাগত জানানো সমীচীন নয় বলে সমালোচকদের অভিমত। কারণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি প্রয়োগ করলেই যে আলোচনা-পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত হবে এমন কোন কথা নেই। বরং বলা যায়, সামাজিক বাস্তবতাকে বিশ্বস্তভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ তুলে ধরতে পারছেন কিনা তার উপর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সার্থকতা নির্ভর করে। কিন্তু আচরণবাদীদের অনুসৃত পদ্ধতি সামাজিক বাস্তবতাকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আচরণবাদী আলোচনাকে সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা বলে মেনে নেওয়া যায় না।

অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব

৬ সমালোচকদের মতে, আচরণবাদীরা নিজেদের আলোচনাকে মূল্যমান-নিরপেক্ষভাবে গড়ে তোলার কথা যতই প্রচার করুন না কেন, কার্যক্ষেত্রে তাঁদের আলোচনা ও গবেষণা যে কতখানি মূল্যমান-নিরপেক্ষ থাকে সে বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করার যথেষ্ট অবকাশ আছে। আচরণ-বাদীরা বিশেষ একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত বলে লিও স্ট্রস অভিযোগ করেছেন। এর কারণ হোল আচরণবাদের প্রধান প্রবক্তা মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে কাম্য ব্যবস্থা বলে ধরে নিয়েই তাঁদের আলোচনা ও গবেষণার সূত্রপাত করেছেন। এইভাবে রাজনৈতিক মতাদর্শকে বর্জন করার নামে কার্যতঃ আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ পুঁজিবাদী দর্শনের মাহাত্ম্য প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছেন।

আলোচনা মূল্যমান নিরপেক্ষ নয়

৭ অনেকের মতে, আচরণবাদীরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সমাজবিদ্যা, মনোবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, যোগাযোগ তত্ত্ব, অঙ্কশাস্ত্র, পরিসংখ্যান, তত্ত্ব প্রভৃতির উপর এত বেশী নির্ভরশীল করে তুলেছেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে নিজের অস্তিত্ব হারাতে বসেছে। কিন্তু আচরণবাদীরা এই অভিযোগ অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাকে বিজ্ঞানভিত্তিক করে গড়ে তোলার জন্য এবং সেই আলোচনাকে পরিপূর্ণতা দানের উদ্দেশ্যে তাঁরা আন্তঃ-সমাজবিজ্ঞানকেন্দ্রিক আলোচনার পক্ষপাতী।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট হওয়ার পথে

নানা প্রকার ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য আচরণবাদী বিপ্লব দীর্ঘস্থায়ী রূপ ধারণ করতে পারেনি। এমন কি ক্রমবর্ধমান সঙ্কটের হাত থেকে মার্কিন সমাজকে রক্ষা করার যে প্রয়াস আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ পেয়েছিলেন তা বহুল পরিমাণে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার ফলে আচরণবাদের প্রতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মোহভঙ্গ হতে শুরু করেছে। তাই ইস্টনের মতো আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সঙ্কটকালীন অবস্থার মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী-সহ সব বুদ্ধিজীবীকে সামাজিক দায়দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনের জন্য আহ্বান জানিয়ে একটি নতুন প্রতিবাদ আন্দোলনের সূত্রপাত করেছেন। এই আন্দোলনকে আচরণবাদোত্তর বিপ্লব (Post-behavioural Revolution) বলে অভিহিত করা হয়। ইস্টন এই বিপ্লবকে 'একটি আন্দোলন' (a movement) এবং 'একটি বুদ্ধিগত প্রবণতা' (an intellectual tendency) বলে বর্ণনা করেছেন। আচরণবাদোত্তর বিপ্লব আদর্শ-

উপসংহার

স্থাপনকারী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করেছে বলে অনেকে অভিমত পোষণ করেন। আচরণবাদীদের মতো আচরণবাদোত্তর বিপ্লবের প্রবক্তাগণ বিষয়বস্তুর পরিবর্তে গবেষণার পদ্ধতি বা কলাকৌশলের উপর কেবলমাত্র গুরুত্ব আরোপ করেননি। বরং বলা যায়, তাঁরা সামাজিক দিক থেকে প্রাসঙ্গিক, মূল্যবান ও অর্থবহ গবেষণার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করার পক্ষপাতী। অবশ্য তাঁদের এই প্রচেষ্টার ভিত্তিমূলেও যে বুর্জোয়া সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে রক্ষা করার ঐকান্তিক প্রয়াস লুকিয়ে আছে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

৪। ব্যবস্থাজ্ঞাপক দৃষ্টিভঙ্গী (System Approach)

ডেভিড ইস্টন ও ব্যবস্থাজ্ঞাপক দৃষ্টিভঙ্গী

ব্যবস্থাজ্ঞাপক দৃষ্টিভঙ্গী রাজনৈতিক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত করেছে। ১৯৫৩ সালে ডেভিড ইস্টন তাঁর 'রাজনৈতিক ব্যবস্থা' (The Political System) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে ব্যবস্থাপক তত্ত্ব প্রচার করেন। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত 'রাজনৈতিক বিশ্লেষণের একটি কাঠামো' (A Framework for Political Analysis) এবং 'রাজনৈতিক জীবনের একটি পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ' (A System Analysis of Political Life) নামক দুটি গ্রন্থে ইস্টন ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করার জন্য এমন একটি কাঠামো রচনা করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, যার সাহায্যে বিশেষ কোন রাজনৈতিক আচার-আচরণকে চিহ্নিত করে একটি বিশ্লেষণাত্মক ব্যবস্থা (analytical system) বা তত্ত্ব গড়ে তোলা সম্ভব হয়। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তিনি অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতি (empirical method)-র আশ্রয় গ্রহণ করেন। অন্যান্য সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ধারণার সাহায্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার পদ্ধতিকে অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত করে গড়ে তোলা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। রাজনৈতিক জীবনকে সফলভাবে অনুধাবন করার জন্য তিনি বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ইস্টনের মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় দু'টি প্রধান সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। সংকটের মধ্যে রাজনৈতিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব রক্ষা করা হোল প্রথম সমস্যা এবং দ্বিতীয় সমস্যা হোল এমন একটি তাত্ত্বিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যার সাহায্যে রাজনৈতিক জীবন-প্রবাহকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অন্যভাবে বলা যায়, বিভিন্ন প্রকার চাপের মধ্যে থেকেও কিভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে তা আলোচনা করাই রাজনীতিবিদদের প্রধান কর্তব্য বলে ইস্টন মনে করেন।

ইস্টনের মতে, রাজনৈতিক ব্যবস্থা হোল কোন সমাজের সেই সব পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের ব্যবস্থা (system of interactions in any society), যার মাধ্যমে বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্তসমূহ (binding or authoritative allocations) গৃহীত ও প্রযুক্ত হয়। সমাজের সর্বপ্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপ এবং আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের গঠন, চরিত্র ও ক্রিয়াকলাপের সমন্বয়ে রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠে। ইস্টন 'পারস্পরিক ঘাতপ্রতিঘাত বা প্রতিক্রিয়া' (interaction)-কে ব্যবস্থার 'একক' (unit) হিসেবে ধরে রাজনৈতিক ব্যবস্থার আলোচনা শুরু করেন।

তিনি রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে 'স্ব-নিয়ন্ত্রিত' (self-regulating) এবং 'প্রতিবেদনশীল' (responding) ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করেন। কারণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে সক্ষম। পরিবেশের পরিবর্তন সাধিত হলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর তার প্রতিফলন বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি সমাজে রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছাড়াও অন্যান্য ব্যবস্থা থাকে, যেমন—জৈবিক ব্যবস্থা (biological system), বাস্তু সংস্থানগত ব্যবস্থা (ecological system), সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা (cultural system), অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (economic system) ইত্যাদি। তিনি এগুলিকে 'উপব্যবস্থা' (sub-system) বলে অভিহিত করেছেন। এই সব উপব্যবস্থাকে নিয়ে রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবেশ গড়ে উঠে। অন্যভাবে বলা যায়, ইস্টন পরিবেশ বলতে সামাজিক এবং ভৌত (physical)—উভয় ধরনের পরিবেশকেই বোঝাতে চেয়েছেন। রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর পরিবেশের প্রভাব বলতে ঐ সব সামাজিক ও ভৌত পরিবেশের প্রভাবকেই বোঝায়। তিনি পরিবেশকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা—সমাজ-অভ্যন্তরস্থ পরিবেশ (intra-societal environment) এবং বাহ্য-সামাজিক পরিবেশ (extra-societal environment)। কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থা যে-সমাজের মধ্যে অবস্থিত সেই সমাজের মধ্যস্থিত অন্যান্য সামাজিক উপব্যবস্থার সমন্বয়ে যে পরিবেশ গড়ে উঠে, তাকে সমাজ-অভ্যন্তরস্থ পরিবেশ বলা হয়। বাহ্য-সামাজিক পরিবেশ বলতে সংশ্লিষ্ট সমাজের বাইরে অর্থাৎ অন্য কোন সমাজের উপব্যবস্থাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত পরিবেশকে বোঝায়। এই উভয় প্রকার পরিবেশের সঙ্গেই রাজনৈতিক ব্যবস্থার ঘাতপ্রতিঘাত ঘটে এবং পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে রাজনৈতিক ব্যবস্থাও পরিবর্তিত হয়।

ইস্টন এই অভিমত পোষণ করেন যে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপকরণ (inputs) এবং উপপাদের (outputs) মধ্যে সমতা রক্ষিত হলে তার স্থায়িত্ব বজায় থাকে।

উপকরণ-কাঠামো চাহিদা ও সমর্থনকে নিয়ে গঠিত হয়

রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের নিকট যে-সব দাবি (demand) উপস্থিত করা হয় তার সঙ্গে ব্যবস্থার নিজস্ব সমর্থন (support) সংযুক্ত হলেই উপকরণ-কাঠামো (inputs structure) গঠিত হয়। রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ দাবিদাওয়া পেশকারীদের অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন—এই অভিপ্রায় নিয়েই দাবি উত্থাপন ও পেশ করা হয়। সমর্থন বলতে সেই সব কাজ বা মনোভাবকে বুঝায়, যা সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থা কিংবা দাবি ও দাবিসম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতিকে (process) সমর্থন করে। এইভাবে দাবি ও সমর্থনকে নিয়েই উপকরণ-কাঠামো গড়ে উঠে। উপকরণ সমাজের মধ্য থেকে কিংবা আন্তর্জাতিক পরিবেশ থেকে উদ্ভূত হতে পারে। দাবি যেদিক থেকেই আসুক না কেন, তার প্রধান উদ্দেশ্য হোল রাজনৈতিক ব্যবস্থার লক্ষ্য বা সিদ্ধান্তসমূহকে প্রভাবিত করা। আর সমর্থন এই লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক উপাদানগুলিকে যোগান দেয়। অ্যালমন্ডকে অনুসরণ করে দাবি ও সমর্থনের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে:

দাবি: (১) বেতন, শিক্ষা ইত্যাদির মতো বস্তু ও সেবার দাবি;

(২) শ্রম সম্পর্কের মতো আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য দাবি;

(৩) ভোটাধিকারের মতো রাজনীতিতে অংশগ্রহণের দাবি, ইত্যাদি।

সমর্থন ঃ (ক) বৈষয়িক সমর্থন, যেমন—কর প্রদান ;
(খ) আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ;
(গ) অংশগ্রহণ, যেমন—ভোটদান ;
(ঘ) রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি।

ইস্টনের মতে, সমর্থন তিন দিক থেকে আসতে পারে, যথা—ক. রাজনৈতিক সম্প্রদায় (the political community), খ. শাসন-প্রণালী (the regime) এবং গ. রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ (the authorities)। রাজনৈতিক সম্প্রদায় হোল এমন একটি জনগোষ্ঠী যা শান্তিপূর্ণ উপায়ে দাবিপূরণের পক্ষপাতী। এরূপ জনগোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যবোধ ও ঐকমত্য (consensus) বিশেষভাবে বর্তমান থাকে। শাসন প্রণালী বলতে শাসনতান্ত্রিক কাঠামো, আইন-কানুন, ধ্যানধারণা, নৈতিক মূল্যবোধ ইত্যাদি বোঝায়। রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যরা এগুলির প্রতি বিশেষভাবে শ্রদ্ধাশীল থাকেন। রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ বলতে সরকারকে বোঝায়। এই সরকারই বিভিন্ন দাবিদাওয়া সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকারী।

সমর্থন তিন দিক থেকে আসতে পারে

ইস্টনের মতে, উপপাদ হোল মূল্যের কর্তৃত্বসম্পন্ন বরাদ্দ (authoritative allocation of values) অর্থাৎ সিদ্ধান্ত ও কাজ। অন্যভাবে বলা যায়, যখন রাজনৈতিক ব্যবস্থা উপকরণগুলিকে বাধ্যতামূলক রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে রূপান্তরিত করে, তখন সেই সিদ্ধান্তকে উপপাদ (out-puts) বলা হয়। চাহিদার দ্বারাই উপপাদ নির্ধারিত হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর দাবির চাপ এলেই নতুন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। 'তথ্য ও অভিজ্ঞতা প্রেরকপথ' (feedback mechanism)-এর সাহায্যে উপকরণ ও উপপাদের মধ্যে সমতা বজায় রাখা হয়। 'তথ্য ও অভিজ্ঞতা প্রেরকপথ' বা 'ফিডব্যাক ম্যাকানিজম' বলতে সেই ব্যবস্থাকে বোঝায়, যার সাহায্যে ভবিষ্যতের ব্যবহারকে অতীতের কার্যকলাপের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা হয়। তথ্য ও অভিজ্ঞতা প্রেরকপথ সাধারণতঃ তথ্যসংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলাফল সম্পর্কে তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী স্থির করতে পারে। এছাড়া, অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেও রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ গৃহীত সিদ্ধান্তের পুনর্মূল্যায়ন করতে পারে। তথ্য ও অভিজ্ঞতা প্রেরকপথের মাধ্যমেই রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে এবং অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

উপপাদ

তথ্য ও অভিজ্ঞতা প্রেরকপথের ভূমিকা

একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে ইস্টনের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সুন্দরভাবে আলোচনা করা যেতে পারে (রেখাচিত্র পৃ. ৫৩)।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার অঙ্কিত রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, পরিবেশের প্রভাব রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার কাঠামো ও পদ্ধতির মাধ্যমে এসব প্রভাবকে গ্রহণ করে তাদের উপপাদে পরিণত করে। উপপাদ আবার তথ্য ও অভিজ্ঞতা প্রেরকপথের মাধ্যমে পরিবেশে পৌঁছে তাকে পরিবর্তিত ও প্রভাবিত

করে। পরিবেশও আবার রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। এইভাবে পরিবেশের উপকরণ রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপপাদে পরিণত হয়। উপপাদ আবার তথ্য ও অভিজ্ঞতা প্রেরকপথের মাধ্যমে নতুন উপকরণ হয়ে দাঁড়ায়। এইভাবে চক্রাকারে উপকরণ উপপাদে পরিণত হয় এবং উপপাদ উপকরণে রূপান্তরিত হয়।

ইস্টন বলেছেন, রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংকট ব্যবস্থার মধ্যে থেকে আসতে পারে কিংবা পরিবেশ থেকে আসতে পারে। অনেক সময় দাবি এবং সমর্থন উভয়ের জন্যও সংকট সৃষ্টি হতে পারে। দাবি দু'ভাবে সংকট সৃষ্টি করতে পারে। প্রথমতঃ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ যদি অধিকাংশ লোকের, বিশেষতঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাবশালীদের দাবি পূরণ করতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ হয় তা হলে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংকট সৃষ্টি করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের নিকট অসংখ্য দাবি পেশ করার ফলে কোন্ কোন্ দাবি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে তা নির্ধারণ করতে অনেক সময় লাগে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে এই বিলম্ব হওয়ার জন্যও অনেক সময় সংকট দেখা দিতে পারে। অবশ্য প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দাবির বাড়তি-বোঝা (overload of demands) হ্রাসের জন্য কতকগুলি নিয়ন্ত্রণমুখী
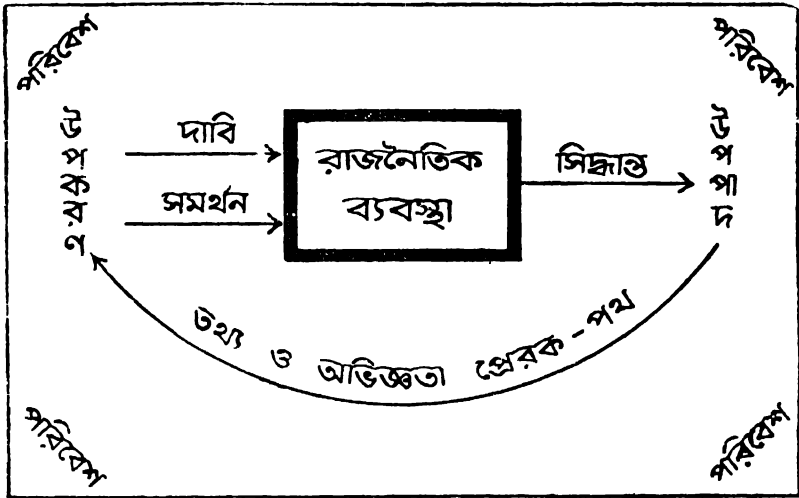
ব্যবস্থা (regulatory mechanism) গ্রহণ করা হয়। প্রথমতঃ কাঠামোগত ব্যবস্থার (structural mechanism) সাহায্যে দাবিদাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অন্যভাবে বলা যায়, আধুনিক সমাজে রাজনৈতিক দল, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী, জনমত গঠনকারী নেতৃবৃন্দ প্রমুখের সাহায্যে দাবিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কারণ এরা দাবিপ্রবাহের গতিপ্রকৃতির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মানুষকে বহুবিধ সাংস্কৃতিক নিষেধাজ্ঞা (cultural inhibitions) মেনে চলতে হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কোন্ কোন্ দাবি রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থিত করা হবে এই সব নিষেধাজ্ঞা তা নির্ধারণ করে দেয়। তৃতীয়তঃ বিভিন্ন দাবি সম্বন্ধে পর্যালোচনার সময় রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ, যেমন—আইন বিভাগ ও শাসন

বিভাগ (রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ) অনেক দাবির সমন্বয়-সাধন করে তাদের সংখ্যা কমিয়ে আনে এবং দাবিসমূহকে উপপাদে পরিণত করার সময় সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। চতুর্থতঃ যোগাযোগ স্থাপনের উপায়সমূহকে (communication channels) সম্প্রসারিত করার মাধ্যমে দাবির সংখ্যা হ্রাস করা যায়।

চাহিদার মতো সমর্থনও অনেক সময় রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংকট সৃষ্টি করতে পারে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি সদস্যদের সমর্থন হ্রাস পেলেই সংকটের সূচনা হয়। সমর্থনের অভাবে যাতে সংকট সৃষ্টি হতে না পারে সেজন্য কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ দাবিপূরণ করা সম্ভব হলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি সদস্যদের সমর্থনের অভাব হয় না। কিন্তু সব দাবি পূরণ করা রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই নানা উপায়ে দাবিকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালানো হয়। দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ যখন রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংকট দেখা দেয়, তখন তার কাঠামো ও পদ্ধতির পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে অর্থাৎ আত্মরূপান্তরের (self-transformation) মাধ্যমে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়। তৃতীয়তঃ শাসনতান্ত্রিক আইনকানুনের প্রতি বিরোধিতার জন্য সংকট দেখা দিলে সংবিধান পরিবর্তনের মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সংকট থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে। চতুর্থতঃ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ (political socialisation)-এর মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সদস্যদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব গড়ে তোলা সম্ভব। এরূপ করা সম্ভব হলে কাঠামো, পদ্ধতি ইত্যাদির পরিবর্তন সাধন না করেও রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে।

সমালোচনা (Criticism) ঃ ইস্টনের ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্ব রাজনৈতিক চিন্তাজগতে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করলেও নানা দিক থেকে এর সমালোচনা করা হয়।

অভিনব তত্ত্ব নয়

প্রথমতঃ লিপসন বলেছেন, পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ (system analysis) নতুন কিছু নয়। প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বহু পূর্বেই এই তত্ত্বের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। জৈব মতবাদীরাও এরূপ তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন। সুতরাং ইস্টনের ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্বকে কোন অভিনব তত্ত্ব বলে অভিহিত করা সমীচীন নয় বলে সমালোচকরা মনে করেন।

সব রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমস্যা একই ধরনের হয় না

দ্বিতীয়তঃ ইস্টনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি তত্ত্ব গড়ে তোলা যার সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাধারণ সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। কিন্তু তিনি তাঁর ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হতে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ যে-কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমস্যা যেহেতু তার সামাজিক ও আর্থিক কাঠামোর উপর নির্ভরশীল, সেহেতু সব রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাধারণ সমস্যার আকৃতি ও প্রকৃতি কখনই এক ধরনের হতে পারে না।

রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যায় ব্যর্থতা

তৃতীয়তঃ ইস্টনের তত্ত্ব রাজনৈতিক পরিবর্তনের মৌলিক কারণ ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্কটের কথা আলোচনা করলেও সঙ্কট উৎপত্তির কারণ কিংবা সেই সঙ্কট দূর করার জন্য কি কি সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন সে ব্যাপারে তিনি কোন আলোকপাত করতে পারেননি।

চতুর্থতঃ সমালোচকদের মতে, ইস্টন তাঁর ক্ষমতাজ্ঞাপক তত্ত্বে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে অন্যান্য ব্যবস্থার পার্থক্য নিরূপণ না করে ভুল করেছেন। তিনি রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে কোন সমাজের সেই সব পারস্পরিক ঘাতপ্রতিঘাতের ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন, যার মাধ্যমে বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত ও প্রযুক্ত হয়। অর্থাৎ বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রয়োগকে কেবলমাত্র রাজনীতির বিষয়বস্তু বলে তিনি প্রচার করেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছাড়াও পরিবার, ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল প্রভৃতি ব্যবস্থাও বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কিংবা রাজনৈতিক দল যখন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন তা বাধ্যতামূলক প্রকৃতিসম্পন্ন হয়। এমন কি, পরিবারের উপর পরিবার-প্রধানের যে-কোন সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলকভাবেই প্রযুক্ত হয়।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে অন্যান্য ব্যবস্থার পার্থক্য নিরূপণে ব্যর্থতা

পঞ্চমতঃ ইস্টনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল একটি ধারণার কাঠামো (conceptual framework) তৈরি করে তার সাহায্যে একটি সাধারণ তত্ত্ব (a general theory) গড়ে তোলা। বলা বাহুল্য, তিনি আদর্শ স্থাপনকারী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তে অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সমালোচকদের মতে, তাঁর এই প্রচেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। কারণ তিনি যে-রাজনৈতিক ব্যবস্থার ধারণা-কাঠামো গড়ে তুলেছেন তা কার্যতঃ অবাস্তবতা ও বিমূর্ততার সঙ্কীর্ণ বেড়াজাল অতিক্রম করতে পারেনি।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার অবাস্তব ও বিমূর্ত ধারণা

ষষ্ঠতঃ রাজনৈতিক পর্যালোচনাকে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার পর্যায়ে উন্নীত করতে গিয়ে তিনি পরিমাপ ও পরিসংখ্যানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, ভৌতবিজ্ঞানে অনুসৃত পদ্ধতির সাহায্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে কখনই পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞান হোল অন্যতম সমাজ বিজ্ঞান। একে বিশ্লেষণ করতে গেলে অনেকগুলি পদ্ধতির প্রয়োজন। এই সব পদ্ধতির মধ্যে ঐতিহাসিক পদ্ধতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। কিন্তু ইস্টন ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসরণ করার বিরোধী। তাই তার অনুসৃত পদ্ধতিকে অনৈতিহাসিক পদ্ধতি বলে সমালোচনা করা হয়।

ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসরণের বিরোধিতা

সপ্তমতঃ সমালোচকদের মতে, ইস্টনের ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্ব একটি রক্ষণশীল তত্ত্বমাত্র। এই তত্ত্বের প্রধান লক্ষ্য হোল প্রচলিত বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সংরক্ষণ করা। প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিপদ কোন্ দিক থেকে আসতে পারে তার ইঙ্গিত দিয়ে ইস্টন রক্ষণশীল ও পরিবর্তন-বিরোধী মনোভাবাপন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হিসেবে সমালোচিত হয়েছেন।

রক্ষণশীল ও পরিবর্তন-বিরোধী তত্ত্ব

পরিশেষে বলা যায়, ইস্টন উপকরণ ও উপপাদের আলোচনায় এত বেশী আত্মনিয়োগ করেছিলেন যে, তিনি রাজনৈতিক কাঠামো ও তার সমস্যা-সম্পর্কিত আলোচনায় মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা

আলোচনার সঙ্কীর্ণ পরিধি

উপলব্ধি করেননি। ফলে তাঁর আলোচনা সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল বলে অনেকে মনে করেন।

৫। কাঠামো-কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গী (Structural-Functional Approach)

ডেভিড ইস্টনের উপকরণ-উপপাদ বিশ্লেষণের (input-output analysis) মতো কাঠামো-কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গী সাধারণ ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্বগুলির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। নৃতত্ত্ববিদ র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন (Radcliffe Brown) এবং বি. ম্যালিনোস্কি (B. Malinowski) বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে নৃতত্ত্ব আলোচনার সময় কাঠামো-কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ করেন। ১৯৫০ সালের পর থেকে সমাজবিদ্যা (Sociology) ও রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব (Political Sociology) আলোচনার সময় এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগের প্রবণতা বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে ম্যারিয়ন লেভি (Marion Levy), রবার্ট মার্টন (Robert Merton), ট্যালকট পারসনস (Talcott Parsons) প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে কাঠামো-কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ ঘটান মিচেল (Mitchell), আপটার (Apter), অ্যালমন্ড (G. A. Almond) প্রমুখ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ।

'কাঠামো' ও 'কার্য' বলতে কি বোঝায়

কাঠামো-কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গী দুটি প্রধান ধারণা (concept)-কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, যথা—'কাঠামো' (structures) এবং 'কার্য' (functions)। তাই এই দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে 'কাঠামো' এবং 'কার্য' বলতে কি বোঝায় তা আলোচনা করা প্রয়োজন। ওরেন ইয়ং (Oran R. Young)-কে অনুসরণ করে বলা যায়, কোনও নির্দিষ্ট সামাজিক বা রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংগঠিত বিশেষ কোন কার্যকলাপের (a pattern of action) বস্তুব বা দৃশ্য ফলাফলকেই (the objective consequences) সাধারণভাবে 'কার্য' বলা হয়। মার্টন বলেছেন, 'কার্যাবলী' হোল সেই সব 'লক্ষণীয় ফলাফল' (observed consequences) যেগুলি একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থাতে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে (the adaptation or readjustment) সাহায্য করে। 'কাঠামো' বলতে কোনও ব্যবস্থার অন্তর্গত সেই সব ব্যবস্থাদিকে (arrangements) বোঝায়, যেগুলি কর্তৃক কার্যাবলী সম্পাদিত হয়। এদিক থেকে বিচার করে আইনসভাকে 'কাঠামো' এবং আইন প্রণয়নকে 'কার্য' বলে অভিহিত করা যায়। উল্লেখযোগ্য যে, একই কাঠামো বিভিন্ন প্রকার কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারে, আবার এই কার্য বিভিন্ন কাঠামো কর্তৃক সম্পাদিত হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, রাজনৈতিক দল, চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, সরকারী বিভাগ-সমূহ ইত্যাদি হোল কোনও একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামো। একটি রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি কাঠামো হওয়া সত্ত্বেও তাকে নির্বাচকদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সম্বন্ধে সরকারকে অবহিত করানো, গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে নির্বাচকদের সরকারী সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সচেতন করা প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করতে হয়। আবার সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কিংবা সরকারের

আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলিও (formal institution of government) সেই সব কার্য সম্পাদন করে।

কাঠামো কার্যগত তত্ত্বের প্রবক্তাগণ সমাজকে পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করেন, যার বিভিন্ন অংশ সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করে। এই ব্যবস্থার উপাদানসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া তার স্থিতাবস্থা বা ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। অন্যভাবে বলা যায়, সমাজ হোল পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন অংশের ব্যবস্থা মাত্র। সমাজের মধ্যে বিচ্যুতি, আতঙ্ক ইত্যাদি থাকলেও তা বিদূরিত হয়ে পুনরায় স্থিতাবস্থা ফিরে আসে। এই তত্ত্বের সমর্থকরা বৈপ্লবিক উপায়ে সমাজের পরিবর্তন সংঘটিত হতে পারে বলে বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে, সমাজের যে-কোন পরিবর্তন ধীরে ধীরে আসে এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে সমাজ তার ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে। সামাজিক সংহতির জন্য মৌলিক সম্পর্কের মতৈক্যকেই এই তত্ত্বের সমর্থকেরা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে মনে করেন। কোন সমাজব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মধ্যে নীতি ও লক্ষ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক সম্মতি থাকলে সমাজ ও সংস্কৃতির কাঠামো শক্তিশালী হয়। সুতরাং বলা যায়, কাঠামো-কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবক্তাদের কাছে সমাজব্যবস্থার সংহতি রক্ষা করাই হলো সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই সমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রকৃতিবিশ্লেষণে তারা আগ্রহী নন। সমাজের ভারসাম্য তথা অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কোন্ কোন্ কার্য সম্পাদন করা অত্যাবশ্যক এবং সেই সব কার্য কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সুষ্ঠু ও সফল ভাবে সম্পাদিত হতে পারে তা অনুসন্ধান করাই কাঠামো-কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। ট্যাল্‌কট পার্‌সনসের মতে, সমাজের ভারসাম্য বা স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে হলে ব্যবস্থাকে সমাজের প্রধান প্রধান কতকগুলি কার্যের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (institutional structure) অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে।

কাঠামো-কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়

অ্যালমন্ড, পাওয়েল, মিচেল প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সমাজবিদ্যার কাঠামো-কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গীকে তুলনামূলক রাজনীতি (comparative politics) আলোচনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। অ্যালমন্ড রাজনীতিকে সমাজের এমন সব সংহতিমূলক (integrative) এবং সংগতিরক্ষণ সংক্রান্ত (adaptive) কার্য বলে বর্ণনা করেছেন, যা মোটামুটিভাবে 'বৈধ দৈহিক বলপ্রয়োগে' (legitimate physical coercion)-র উপর ভিত্তিশীল। তিনি রাজনৈতিক এবং অন্যান্য ব্যবস্থাকে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল বলে মনে করেন। অ্যালমন্ডের দৃষ্টিতে কাঠামো-কার্যগত বিশ্লেষণ হোল একটি সুসংবদ্ধ বিশ্লেষণ, যা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে এমন একটি সুসংগত রূপ (coherent wholes) হিসেবে দেখে, যে নিজে পরিবেশকে প্রভাবিত করে এবং পরিবেশ কর্তৃক প্রভাবিত হয়। তিনি দৃঢ়ভাবে এই অভিমত পোষণ করেন যে, সর্বপ্রকার রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কতকগুলি কার্য অবশ্যই সম্পাদন করতে হয়। এই সব কার্য কেবলমাত্র রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামোসমূহই সম্পাদন করতে পারে। উল্লেখযোগ্য যে, 'কার্য' ও 'প্রতিষ্ঠান' এই দুটি শব্দ

অ্যালমণ্ডের চোখে কাঠামো ও কার্যের স্বরূপ

আনুষ্ঠানিক নিয়ম এবং আইনের সঙ্গে জড়িত বলে তিনি এ দু'টি শব্দের পরিবর্তে 'ভূমিকা' ও 'কাঠামো' শব্দ দু'টি ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে, কোন ব্যক্তির কাজের যে অংশ রাজনৈতিক পদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাকেই 'ভূমিকা' (role) বলা হয় এবং যে সব লক্ষণীয় কার্যকলাপকে নিয়ে রাজনৈতিক ব্যবস্থা গঠিত হয়েছে সেগুলিকে তিনি 'কাঠামো' (structure) বলে বর্ণনা করেছেন। অন্যভাবে বলা যায়, পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত নির্দিষ্ট ভূমিকাসমূহের সমন্বয়কেই তিনি 'কাঠামো' বলেছেন। সুতরাং বলা যায়, তাঁর দৃষ্টিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থা হোল পরস্পরের উপর ক্রিয়াশীল কতকগুলি উপব্যবস্থা (sub-system)-র সুসংবদ্ধ রূপ মাত্র। আইনসভা, আদালত, নির্বাচকমন্ডলী, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, রাজনৈতিক দল প্রভৃতি হোল উপব্যবস্থার উদাহরণ।

অ্যালমন্ডের মতে, প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তিন ধরনের কার্য সম্পাদন একান্ত প্রয়োজন। এই তিন ধরনের কার্য হোল—১. রূপান্তর সংক্রান্ত কার্য (conversion functions), ২. ব্যবস্থার সংরক্ষণ ও সংগতি বজায় রাখা সম্পর্কিত কার্য (system maintenance and adaptation functions) এবং ৩. ব্যবস্থার সামর্থ্য সম্পর্কিত কার্য (system's capabilities)।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কার্য

[১] রূপান্তর সংক্রান্ত কার্য বলতে রাজনৈতিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরে উপকরণকে উপপাদে পরিণত করা সংক্রান্ত কার্যকে বোঝায় অ্যালমন্ড রূপান্তর সংক্রান্ত কার্যকে ছয় ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা—ক. স্বার্থের গ্রন্থিকরণ (interest articulation) অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার দাবিকে সংগঠিত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে আনয়ন করা ; খ. স্বার্থের সমষ্টিকরণ (interest aggregation) অর্থাৎ বিভিন্ন দাবিকে সুসমন্বিত করে বিকল্প কর্মপন্থা বা সাধারণ নীতিতে পরিণত করা ; গ. রাজনৈতিক যোগাযোগ সাধন (political communication) অর্থাৎ রাজনৈতিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরে এবং তার পরিবেশের মধ্যে রাজনৈতিক সংবাদাদি পৌঁছে দেওয়া ; ঘ. নিয়মকানুন বা আইন তৈরি করা (rule-making) ; ঙ. নিয়মকানুনন বা আইন প্রয়োগ করা (rule application) এবং চ. ঐ সব নিয়মকানুন বা আইনের সাহায্যে বিভিন্ন ব্যক্তিগত মামলার বিচারকার্য সম্পাদন করা (rule-adjudication)। প্রথম তিনটি কার্য উপকরণ-কাঠামো কর্তৃক সম্পাদিত হয় এবং শেষোক্ত তিন ধরনের কার্য উপপাদ-কাঠামো কর্তৃক সম্পাদিত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, রাজনৈতিক দল, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ প্রভৃতি স্বার্থের গ্রন্থিকরণ, সমষ্টিকরণ ও রাজনৈতিক যোগাযোগ সাধনের কার্য সম্পাদন করে এবং আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করে, শাসন বিভাগ আইনের প্রয়োগ করে ও বিচার বিভাগ ঐ সব আইন অনুযায়ী বিচারকার্য সম্পাদন করে।

রূপান্তর সংক্রান্ত কার্য এবং তার শ্রেণীবিভাগ

[২] রাজনৈতিক ব্যবস্থার দ্বিতীয় কার্য হোল ব্যবস্থার সংরক্ষণ ও সংগতি বজায় রাখা। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ (political socialisation) এবং রাজনৈতিক ভূমিকায় বিভিন্ন ব্যক্তিকে নিয়োগের (political recruitment) মাধ্যমে রাজনৈতিক

ব্যবস্থা এই কার্য সম্পাদন করে। অন্যভাবে বলা যায়, প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন ভূমিকা পালনের জন্য অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার কার্য সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন লোককে নিয়োগ করা হয়। তারা কিভাবে ঐ সবভূমিকা পালন করবে তাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী সমাজিকীকরণের মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যদের মধ্যে এমন একটি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি করা হয় যাতে প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে সর্বোৎকৃষ্ট বলে গ্রহণ করতে শিখে।

ব্যবস্থার সংরক্ষণ ও সঙ্গতি বজায় রাখার কার্য

[৩] রাজনৈতিক ব্যবস্থার তৃতীয় কার্য হোল ব্যবস্থার সামর্থ্য সম্পর্কিত কার্য। সামর্থ্য সম্পর্কিত কার্য বলতে রাজনৈতিক ব্যবস্থা উপকরণ ও উপপাদের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে অর্থাৎ ভারসাম্য রক্ষা করতে কতখানি সমর্থ তাকে বোঝায়। এই কার্য সম্পাদনের উপর রাজনৈতিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব বহুলাংশে নির্ভরশীল। সামর্থ্য সম্পর্কিত কার্যাবলীর মধ্যে, ক. সম্পদ সংগ্রহের সামর্থ্য (extractive capability) ; খ. সম্পদ বন্টনের সামর্থ্য (distributive capability) ; গ. পতাকা, সামরিক অনুষ্ঠান, রাজনৈতিক নেতাদের নীতি সম্পর্কিত বিবৃতিদান ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যবস্থার সদস্যদের কাছ থেকে আনুগত্য লাভের সামর্থ্য ; ঘ. ব্যক্তি বা বিভিন্ন গোষ্ঠীর দাবিকে নিয়ন্ত্রিত করার সামর্থ্য (regulative capability) এবং ঙ. দাবিসমূহের প্রতি রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের সাড়া দেওয়ার সামর্থ্য (responsive capability) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সব কার্য মূলতঃ উপপাদ-কাঠামো কর্তৃক সম্পাদিত হয়। এই সব কার্য সম্পাদনে অসামর্থ্য দেখা দিলে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংকট দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ব্যবস্থার সামর্থ্য সম্পর্কিত কার্য

রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন কাঠামোর কার্যাবলী প্রকৃতিগতভাবে দু'ধরনের হতে পারে, যথা—পরিস্ফুট কার্য (manifest functions) এবং অপরিস্ফুট বা নিহিত কার্য (latent functions)। সেই সব কার্যকে পরিস্ফুট কার্য বলা হয় যেগুলি কাঠামো কর্তৃক ইচ্ছাকৃত ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে সম্পাদিত হয়। কিন্তু নিহিত কার্যাবলী হোল সেইসব কার্য যেগুলি সম্পাদনের পশ্চাতে কাঠামোর কোন পরিকল্পিত লক্ষ্য থাকে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আইনের ব্যাখ্যা প্রদান বিচার বিভাগের পরিস্ফুট কার্য বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু আইনের ব্যাখ্যার ফলে জনসাধারণের মধ্যে যে শিক্ষাবিস্তার ঘটে তা হোল বিচার বিভাগের নিহিত কার্য। কারণ এই কার্য বিচার বিভাগ ইচ্ছাকৃত ভাবে সম্পাদন করে না। এইভাবে অ্যালমন্ড কাঠামো ও কার্যের সম্পর্ক নির্ধারণের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করা সম্ভব বলে মনে করেন। তিনি কাঠামোর পৃথকীকরণ মাত্রাকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষপাতী।

পরিস্ফুট কার্য ও নিহিত কার্য

সমালোচনা (Criticism) ঃ কাঠামো-কার্যগত তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হোল এই যে, এই তত্ত্বের মাধ্যমে কেবলমাত্র বর্তমানকেই ব্যাখ্যা করা যায়, ভবিষ্যতের সম্পর্কে কোনরূপ ইঙ্গিত প্রদান করা এই তত্ত্বের উদ্দেশ্য নয়। যেহেতু এই তত্ত্ব

ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে আস্থাশীল নয়, সেহেতু সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক বাস্তবতাকে এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে অক্ষম। সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিরোধের কারণ কি, কিভাবে তা বিদূরিত করা যায়, সামাজিক পরিবর্তন কিভাবে আসে ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর এই তত্ত্বে পাওয়া যায় না। তা ছাড়া, এই তত্ত্বের প্রবক্তারা আধুনিকীকৃত (modernised) পশ্চিমী দুনিয়ার রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলিকে আদর্শ বলে ধরে নিয়েই অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। কিন্তু এরূপ করা সংগত নয়। কারণ ঐসব উন্নত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যতখানি মতৈক্য পরিলক্ষিত হয় তৃতীয় দুনিয়ার অনুন্নত বা অর্ধোন্নত দেশগুলিতে তা পরিলক্ষিত হয় না। এই সব দেশে জাতি, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে যেমন বিরোধ বা দ্বন্দ্ব রয়েছে তেমনি শ্রেণীদ্বন্দ্বও বিশেষভাবে বর্তমান। কাঠামো-কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে ঐ সব দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

তত্ত্বের অসম্পূর্ণতা

দ্বিতীয়তঃ, কাঠামো-কার্যগত তত্ত্ব প্রকৃতিগতভাবে রক্ষণশীল। কারণ এই তত্ত্বের প্রবক্তারা ব্যাপক বা বৈপ্লবিক সামাজিক পরিবর্তনের কোন প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। প্রচলিত বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার স্থিতাবস্থা বজায় রাখাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য।

রক্ষণশীল তত্ত্ব

তৃতীয়তঃ, মানুষের সামাজিক অবস্থান সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল—এই সূত্রটিকে কাঠামো-কার্যগত তত্ত্ব উপেক্ষা করেছে। তাই এই তত্ত্বটিকে অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বলে সমালোচনা করা হয়।

অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব

চতুর্থতঃ, পশ্চিমী রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ এই দৃষ্টিভঙ্গীকে আদর্শ দৃষ্টিভঙ্গী বলে মনে করলেও এর সাহায্যে রাজনৈতিক জীবনের সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। তাই এই তত্ত্বকে সাধারণ তত্ত্ব (general theory) হিসেবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

সাধারণ রাজনৈতিক তত্ত্ব নয়

বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের অনেকেই আবার কাঠামো-কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করেছেন। বটমোরের মতে, এটি কোন তত্ত্ব নয়, বর্ণনা মাত্র। রানসিমান (Runciman) এই অভিমত পোষণ করেছেন যে, কোন একটি কার্য একটি সমাজব্যবস্থার মধ্যে কোনও একটি ভূমিকা পালন করে বলেই যে তা তার স্থায়িত্ব রক্ষার সহায়ক হবে—একথা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই।

বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের সমালোচনা

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঙ্গে পুঁজিবাদের মতাদর্শগত সংগ্রাম শুরু হওয়ার ফলে কাঠামো-কার্যগত তত্ত্বের সমর্থক ও প্রচারকরা আজ সমাজ-পরিবর্তনের প্রশ্নটিকে উপেক্ষা করতে পারছেন না। তাছাড়া, বর্তমান যুগে সমাজ-পরিবর্তনের নানা ঘটনা ঘটে যাওয়ায় এবং জনমনে সমাজ-পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় কাঠামো-কার্যগত তত্ত্বের অনেক প্রবক্তাই সমাজ-পরিবর্তনের বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ ব্যাপারে রবার্ট মার্টনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কাঠামো-কার্যগত তত্ত্বের সাম্প্রতিক বিকাশ

তিনি কাঠামো-কার্যগত তত্ত্বের সঙ্গে সামাজিক সংঘাতের উপসর্গকে যুক্ত করার জন্য 'বিপরীত' বা 'বিরোধী কার্যে'র (dysfunction) ধারণা আমদানি করেছেন। তাঁর মতে, 'বিপরীত' বা 'বিরোধী কার্য' বলতে 'সমাজ-কাঠামোগত পর্যায়ে এমন সব চাপ, অভিঘাত ও টেনশন'কে বোঝায়, যা চলমান জীবনের পরিবর্তন সূচিত করে। মার্টন মনে করেন যে, এই বিরোধী কার্যের ফলে সমাজের স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়; দেখা দেয় এক ধরনের 'অরাজকতা' এবং বিদ্রোহ হোল এই অবস্থার ফলশ্রুতি। বিদ্রোহ যখন ব্যাপকতা লাভ করবে এবং সমাজের বৃহৎ অংশ যখন তাতে জড়িয়ে পড়বে, তখন সৃষ্টি হবে বিপ্লবের সম্ভাব্য ভিত্তি। তারপর ঘটবে ভাবগত ও সামাজিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস। কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চালমার্স জনসনও বিপ্লবের বিষয়গত কারণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে 'বিরোধী কার্যে'র পূর্বোক্ত ধারণাটিকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি দৃঢ়ভাবে এই অভিমত পোষণ করেছেন, যে-অবস্থার প্রতিকার না হলে সমাজের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়, সেই অবস্থাকেই 'বিরোধী কার্য' বলা হয়। ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী যদি পরিবর্তনকে বাধা দেয় এবং 'বিরোধী কার্য' যদি সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ক্ষমতার স্তরকে ছাড়িয়ে যায়, তখন পরিবর্তন বিপ্লবের আকার ধারণ করে। কাঠামো-কার্যগত তত্ত্বের মধ্যে 'বিরোধী কার্য' সংক্রান্ত ধারণা সন্নিবিষ্ট হওয়ার ফলে এই তত্ত্ব বিপ্লবের বিষয়গত কারণ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম বলে কোন কোন বুর্জোয়া তাত্ত্বিক দাবি করেন। কিন্তু তাঁদের এই দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ "পুঁজিবাদী সমাজের প্রকৃত দ্বন্দ্ব কোথায়, বিপরীতধর্মী কর্মের উৎস কি, তা যেমন এ ধারণা থেকে নির্ণয় করা যায় না, তেমনি পুঁজিবাদী সমাজ যে অনিবার্যভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়েই রূপান্তরিত হবে তারও কোন সূত্র" কাঠামো-কার্যগত তত্ত্বে পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে য়ুরি ক্রাসিন তাঁর 'বিপ্লবের সমাজতত্ত্ব—একটি মার্কসীয় পর্যালোচনা' নামক গ্রন্থে বলেছেন, এসব ব্যাখ্যার দ্বারা সমাজবিপ্লবের ঐতিহাসিক কারণকে ব্যাখ্যা করা যায় না। বিরোধী কার্য বা সংঘাতের মূল উৎস কি—তাও এখানে উহ্য থেকে যাচ্ছে। একটি নির্দিষ্ট সমাজের মধ্যে যেসব বিরোধী কার্য বা সংঘাত ঘটে, তাদের মধ্যে কি কোনও পার্থক্য নেই? তাদের মধ্যে কোন্‌গুলি বিপ্লব সৃষ্টি করে আর কোন্‌গুলি করে না—সেটাও এই তত্ত্বে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়নি। বস্তুতঃ "পরিবর্তনের পক্ষে সমাজব্যবস্থারই অন্তর্নিহিত কোন নিয়ামক শক্তির বিকাশ সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিতে অসমর্থ হয়ে মার্টন প্রমুখ বুর্জোয়া সমাজবিজ্ঞানী কৃত্রিমভাবে বিরোধী ক্রিয়ার (dysfunction) ধারণা নিয়ে এসেছেন। এ বিরোধী ক্রিয়া সমাজব্যবস্থারই অন্তর্নিহিত এমন কোন মৌলিক শক্তি নয় যা সমাজের বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে বা তার ভবিষ্যৎ পরিণতির ইঙ্গিত দেয়। মার্কসীয় তত্ত্বের দ্বন্দ্বমূলক বিকাশের সঙ্গে এই বিরোধী শক্তির কোন সাদৃশ্য নেই।"

৬। গোষ্ঠীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী (Group Approach)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী হোল গোষ্ঠী-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী (Group Approach)। ১৯০৮ সালে প্রকাশিত 'সরকারের ক্রমাগ্রসরণ' (The Process of Government) নামক গ্রন্থে আর্থার বেন্টলি

(Arthur Bentley) সর্বপ্রথম এই পদ্ধতি প্রচার করেন। তাছাড়া, ডেভিড ট্রুম্যান, ভি. ও. কী (V. O. Key) প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গোষ্ঠীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষ সমর্থক। গোষ্ঠীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর কেন্দ্রবিন্দু হোল 'গোষ্ঠী' (group)। তাই গোষ্ঠী বলতে কি বোঝায় তা প্রথমেই আলোচনা করা দরকার। আর্থার বেন্টলির চোখে গোষ্ঠী হোল স্বার্থের (interest) দ্বারা পরিচালিত কতকগুলি কার্যকলাপের সমষ্টিমাত্র। তিনি এই অভিমত পোষণ করেন যে স্বার্থকে কেন্দ্র করেই গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে এবং সমাজে এমন কোন স্বার্থ নেই যা কোন-না-কোন গোষ্ঠীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে না। অর্থাৎ সমাজের মধ্যে অবস্থিত প্রতিটি স্বার্থই গোষ্ঠীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। ডেভিড ট্রুম্যানের মতে, গোষ্ঠী হোল সমাজের এমন বহুসংখ্যক ব্যক্তির সমষ্টি যারা এক বা একাধিক অংশীদারী মনোবৃত্তির (one or more share attitudes) দ্বারা পরিচালিত হয়ে উক্ত মনোবৃত্তির মধ্যে নিহিত আচার-আচরণের প্রতিষ্ঠা, সংরক্ষণ ও পরিবর্ধনের জন্য (for the establishment, maintenance or enhancement of forms of behaviour) অন্যান্য গোষ্ঠীর সম্মুখে কতকগুলি দাবি উপস্থিত করে। এরূপ অংশীদারী মনোবৃত্তিই স্বার্থের জন্ম দেয়।

গোষ্ঠী বলতে কি বোঝায় ?

গোষ্ঠীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রচারক ও সমর্থকেরা সমাজের অস্তিত্ব ও ভারসাম্য অর্থাৎ স্থিতিশীলতা রক্ষায় বিশেষ আগ্রহী। তাঁরা একথা মনে করেন যে, সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীতে রাজনৈতিক কার্যকলাপকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কারণ এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানিক (institutional) আলোচনার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখে। গোষ্ঠীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবক্তারা তথ্য ও পরিমাপের (measurement) সাহায্যে রাজনৈতিক কার্যকলাপকে বিশ্লেষণ করার পক্ষপাতী। বেন্টলি মনে করতেন যে, এই পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে দার্শনিক ও বর্ণনাত্মক আনুষ্ঠানিকতার (formalism) সংকীর্ণ বেড়াজাল থেকে মুক্ত করা সম্ভব। তিনি গোষ্ঠীকেন্দ্রিক পর্যালোচনার সময় সংখ্যায়নের (quantification) উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিবাদ হিসেবে এই দৃষ্টিভঙ্গীর আবির্ভাব

গোষ্ঠীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবক্তাগণ একথা প্রচার করেন যে, সরকার যে অবস্থার মধ্যে নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করে তার স্বরূপ যথার্থভাবে উপলব্ধি করার জন্য বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী, বিশেষতঃ স্বার্থান্বেষী বা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। গোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে কোন রাজনৈতিক আলোচনা কখনই ফলপ্রসূ হতে পারে না বলে তাঁরা মনে করেন। বেন্টলির মতে "গোষ্ঠীকে যথার্থভাবে বিশ্লেষণ করা হলে সব কিছুকেই বিশ্লেষণ করা হয়ে যায়।" কারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার মালমসলা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায় না। তিনি সমাজ, জাতি, সরকার, আইন প্রণয়ন, প্রশাসন, রাজনীতি প্রভৃতিকে বিভিন্ন গোষ্ঠীর কার্যকলাপ বা প্রতিক্রিয়ার ফল বলে বর্ণনা করেন। প্রতিটি গোষ্ঠী অন্যান্য গোষ্ঠীর প্রকৃত ও প্রত্যাশিত (actual and anticipated) কার্যের ভিত্তিতে নিজ নিজ নীতি

গোষ্ঠীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়

ও কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করে এবং এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর উপর স্বার্থগত চাপ সৃষ্টি করে। এইভাবে সমাজের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর নিরন্তর বিরোধ চলতে থাকে। লাথাম (Bertran Latham)-এর মতে, এই গোষ্ঠী-বিরোধ ও প্রতিরোধের মাধ্যমে সমাজের অগ্রগতি বজায় থাকে। এরূপ বিরোধে সরকার মধ্যস্থ হিসেবে কাজ করে। লাথাম মনে করেন যে, আইনসভা গোষ্ঠী-বিরোধের ক্ষেত্রে রেফারী হিসেবে কাজ করে এবং সকল গোষ্ঠী-জোটের জয়লাভকে অনুমোদন করে অর্থাৎ বিজয়ী গোষ্ঠীসমূহের দাবিকে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। এইভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠীর ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার ফলে সমাজের ভারসাম্যও রক্ষিত হয়। বেন্টলি এরূপ ভারসাম্যকে 'গোষ্ঠী-চাপের ভারসাম্য' (balance of the group pressures) বলে অভিহিত করেছেন। গোষ্ঠীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবক্তাগণ বিশ্বাস করেন যে, পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীগুলি যদি সফল ভূমিকা পালন করতে না পারে কিংবা বিভিন্ন গোষ্ঠী-বিরোধের মধ্যস্থতায় সরকার যদি ব্যর্থ হয়, তা হলে ভারসাম্য রক্ষার জন্য নতুন গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটবে। ডেভিড ট্রুম্যান মনে করেন যে, একই ব্যক্তি একই সঙ্গে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে থাকার ফলে বিশেষ কোন গোষ্ঠী শক্তিশালী হয়ে তাদের স্বার্থ নষ্ট করবে—বিভিন্ন গোষ্ঠীর সদস্যরাই এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে দেয় না। অন্যভাবে বলা যায়, একই ব্যক্তি একই সঙ্গে বহু গোষ্ঠীর সদস্য হওয়ার ফলে বিভিন্ন গোষ্ঠী-স্বার্থের দ্বন্দ্বকে তীব্র আকার ধারণ করতে দেয় না। ফলে সমাজের ভারসাম্যও বিনষ্ট হতে পারে না। তাছাড়া, বিভিন্ন গোষ্ঠী পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার (interaction) সময় আচার-আচরণে একটি নির্দিষ্ট মানদন্ড মেনে চলে। তাই সমাজের ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

সমালোচনা (Criticism) : গোষ্ঠীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর নানা প্রকার ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েছে। প্রথমতঃ এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবক্তারা রাজনীতির গোষ্ঠীকেন্দ্রিক পর্যালোচনা করলেও 'গোষ্ঠী' এবং 'গোষ্ঠী-স্বার্থ' সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে অনেকে মনে করেন।

দ্বিতীয়তঃ এই দৃষ্টিভঙ্গী সংকীর্ণতা-দোষে বিশেষভাবে দুষ্ট বলে সমালোচনা করা হয়। কারণ কেবলমাত্র গোষ্ঠীকেন্দ্রিক আলোচনার মাধ্যমে সমগ্র রাজনৈতিক জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া সম্ভব নয়। সর্বপ্রকার রাজনৈতিক ঘাতপ্রতিঘাত বা ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াকে গোষ্ঠীপ্রতিক্রিয়া বলে বর্ণনা করাও সমীচীন নয়। তা ছাড়া, নেতৃত্ব, ভূমিকা (role), জনমত প্রভৃতির আলোচনা এই দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশেষভাবে উপেক্ষিত হয়েছে।

তৃতীয়তঃ যে সমাজে পরস্পর-বিরোধী স্বার্থ-গোষ্ঠী নেই সেই সমাজের পর্যালোচনা করা এই দৃষ্টিভঙ্গীর পক্ষে সম্ভব নয়।

চতুর্থতঃ গোষ্ঠীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবক্তারা প্রচলিত বুর্জোয়া সমাজের ভারসাম্য রক্ষার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে নিজেদের তত্ত্বকে রক্ষণশীল তত্ত্বে পরিণত করেছেন। তাই অনেকে এই পদ্ধতিকে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে রাষ্ট্রের শ্রেণীশোষণমূলক ব্যবস্থাকে আড়াল করে রাখার একটি কৌশল বলে বর্ণনা করেন।

৭। নতুন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী (New Political-Economic Approach)

অতি-সাম্প্রতিককালে রাজনৈতিক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক তত্ত্ব প্রয়োগ করার প্রচেষ্টার ফলে নতুন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পদ্ধতির আবির্ভাব ঘটে। অ্যান্টনি ডাউনস্ (Anthony Downs), রাইকার (Riker), বুকানন (Buchanan), লীন্ডব্লুম (Lindbloom), ডেভিস্ (Davis), ব্ল্যাক (Black), টুলোক (Tullock) প্রমুখ অর্থনীতিবিদরা এই পদ্ধতির প্রবক্তা। বুকানন এবং টুলোক রাজনৈতিক পদ্ধতিকে বিনিময় পদ্ধতি বলে বর্ণনা করেছেন। এই নতুন তত্ত্ব অনুসারে, প্রত্যেক ব্যক্তি এবং সংগঠন তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নিজেদের মধ্যে এবং সরকার ও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি তাঁদের স্বার্থরক্ষার জন্য সহযোগিতা এবং প্রতিযোগিতামূলক কাজে অংশগ্রহণ করে। প্রত্যেকেই আপন আপন দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অন্যকে স্বপক্ষে টানার চেষ্টা করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের দরকষাকষির শর্তাবলী নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয়। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির কাজ ও পছন্দকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলা যায় না। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির কাজ ও পছন্দ নির্ভর করে অন্যদের কাজ ও পছন্দের উপর। মিচেলের মতে, বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক উদ্দেশ্যের মধ্যে ব্যক্তি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ সম্পদের বন্টন বিষয়ে কিভাবে তাদের পছন্দকে প্রয়োগ করে তা রাষ্ট্রতত্ত্বের আলোচনার বিষয়বস্তু হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুতরাং নতুন তত্ত্ব সামাজিক সম্পদের বন্টনের মধ্যে তার আলোচনাকে সীমাবদ্ধ না রেখে ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাকে বণ্টিত করে কিভাবে সামাজিক কল্যাণ হতে পারে তা নিয়েও আলোচনা করে। এ ছাড়াও আয়, আর্থিক বোঝার বন্টন, শ্রমিকদের রাজনৈতিক বিভাগ, মর্যাদা ও সুযোগের বন্টন ইত্যাদি নিয়েও এই তত্ত্ব আলোচনা করে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক তত্ত্ব সরকারী বাজেট, সরকারী দ্রব্য ও সেবা, জাতীয় আয় ইত্যাদি কিভাবে বণ্টিত হবে তা নিয়ে আলোচনা করে।

রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়

কিন্তু মিচেলের মতে, এই তত্ত্বের সমর্থকেরা কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক রাজনীতি নিয়েই আলোচনা করেছেন; অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তা প্রযুক্ত কিনা সে সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করেননি। তা ছাড়া, এই আলোচনার ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তুর একটি বিরাট অংশকে অর্থনীতি গ্রাস করেছেন। তার ফলে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। সর্বোপরি, অর্থবিদ্যার পদ্ধতিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব নয় বলেও অনেকে অভিমত পোষণ করেন। উপরি-উক্ত কারণে অ্যালান বল, ম্যাকেঞ্জি প্রমুখ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ নতুন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আলোচনা করা সমীচীন নয় বলে মনে করেন।

সমালোচনা

৮। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী (Marxist Approach)

মার্কসবাদ-বিরোধী বুর্জোয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা প্রায়শই অভিযোগ করেন যে, মার্কসবাদ রাজনৈতিক বিশ্লেষণের গুরুত্বকে অস্বীকার করে বলে মার্কসবাদীরা রাজনৈতিক সমস্যার বিশ্লেষণের কাজে আত্মনিয়োগ করতে অনীহা প্রকাশ করেন। কিন্তু মার্কসবাদীরা এই অভিযোগ মেনে নিতে সম্মত নন। তাঁদের মতে, মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন প্রমুখ প্রচলিত অর্থে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেননি কিংবা রাজনৈতিক বিশ্লেষণের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি সত্য, কিন্তু তাঁরা রাজনীতি বা রাজনৈতিক বিশ্লেষণের গুরুত্ব অস্বীকার করেছেন একথা কোনমতেই মেনে নেওয়া যায় না। মার্কসবাদ হোল একটি বিশ্ববীক্ষা। তাই তা সমাজের বিশেষ কোন অংশকে নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা করে না। সামাজিক জীবনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অংশকে পৃথক করার প্রবণতাকে মার্কসবাদ কৃত্রিম ও খামখেয়ালীপূর্ণ বলে মনে করে। অন্যভাবে বলা যায়, আধুনিক বুর্জোয়া সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সমাজকে যেরূপ কৃত্রিমভাবে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেন, মার্কসবাদীরা সেরূপ বিভাজনকে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক বলে বর্ণনা করেন। সমগ্র সমাজকে একটি অবিভাজ্য সামগ্রিক সত্তা বলে মনে করেন বলে তাঁরা সমগ্র সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই রাজনীতির মতো সমাজের যে-কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা বা গবেষণা করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আচরণবাদীরাও সমাজকে বিভিন্ন অংশযুক্ত একটি অবিচ্ছেদ্য সামগ্রিক সত্তা বলে মনে করেন। কিন্তু মার্কসবাদীদের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য হোল—তাঁরা প্রথমে সমাজের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে পৃথকভাবে গবেষণা করেন। তারপর ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলিকে একত্রিত করে সমাজের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়ার জন্য সচেষ্ট হন। তাই তাঁদের অনুসৃত পদ্ধতির মার্কসবাদী পদ্ধতির ঠিক বিপরীত।

মার্কসবাদ ও রাজনীতি

রাজনীতি তথা রাজনৈতিক সমস্যার স্বরূপ বিশ্লেষণের জন্য মার্কসবাদ যে-দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে তা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। মার্কসবাদ অনুসারে জ্ঞানলাভের পদ্ধতি নির্ভর করে প্রকৃতি এবং সমাজের বিষয়গত নিয়মের উপর। মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকেই কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী বলা হয়, কারণ তা প্রকৃতি কিংবা সমাজ তথা বস্তুজগতে নিয়মগুলিকে সঠিকভাবে নির্ণয় করে এবং তার মাধ্যমে বাস্তব সম্পর্কে জ্ঞানলাভের সহায়তা করে। "মার্কসীয় পদ্ধতিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় বাস্তবের জটিল বিষয়সমূহের বিকাশ এবং তার অন্তর্নিহিত জীবন-প্রতিক্রিয়ার উপর। ক্যাপিটাল গ্রন্থে মার্কস জটিল সামাজিক বিষয় অনুসন্ধানে তাঁর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন।" ব্লাউবেয়ার্গ, সাডভস্কি ও ইউদিন বলেছেন, পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির 'কোষ' হিসেবে পণ্যের ধারণার মধ্যে মানুষ ও প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়ার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য অন্তর্নিহিত রয়েছে এবং তারই প্রকৃতি ব. রূপের দ্বারা মানুষের মধ্যেকার সম্পর্কগুলিও নির্ধারিত হয়। "মার্কস-এর বিশ্লেষণে অনুসন্ধান-ফল পাওয়া যায় বিমূর্ত থেকে মূর্ত বা বাস্তবে রূপান্তর করার পদ্ধতিতে বিষয়ের কাঠামোকে ক্রমবর্ধমানভাবে সর্বাঙ্গীন পুনর্গঠনের মাধ্যমে।" সমাজবিজ্ঞানের তথা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সেই

দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

দৃষ্টিভঙ্গীই সঠিক যা বাস্তব রাজনীতির প্রকৃতি যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে আমাদের সাহায্য করে।

মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে বাস্তব রাজনীতির স্বরূপ যথার্থভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব বলেই এরূপ দৃষ্টিভঙ্গীকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী বলা হয়। এ প্রসঙ্গে এঙ্গেলসের উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, মার্কসের সমগ্র বিশ্ববীক্ষা একটা বন্ধ ধারণা নয়, এটি হোল একটি পদ্ধতি; কতকগুলি অনড় সিদ্ধান্তের সমষ্টি নয়, তা হোল অনুসন্ধানের প্রারম্ভিক বিন্দু এবং পূর্ণতর অনুসন্ধানের ভিত্তি। তাই বলা যায়, একমাত্র ঐতিহাসিক বস্তুবাদই হোল সমাজবিজ্ঞানের সব শাখারই অনুসন্ধান-পদ্ধতির ভিত্তি।

আধুনিক বুর্জোয়া সমাজবিজ্ঞানে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিচারবিশ্লেষণের কোন সাধারণ নিয়ম বা তত্ত্ব নেই। তাই বুর্জোয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানিগণ একথা মনে করেন যে, সমাজ ও সামাজিক পরিবর্তনের নির্ধারক হোল আইন, রাজনীতি ইত্যাদি। কিন্তু মার্কস ও এঙ্গেলস ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সাহায্যে সমাজ-পরিবর্তনের ধারাকে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রধান লক্ষ্য হোল সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করা। মার্কসবাদীদের মতে, উৎপাদন পদ্ধতির উপর সমাজের বৈষয়িক জীবনযাত্রা নির্ভর করে। মার্কস মানব-ইতিহাস পর্যালোচনা করে প্রমাণ করেছেন যে, মানুষের প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন এবং উৎপাদন পদ্ধতির প্রভাবে মানবসমাজের মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অর্থনীতি হোল সমাজের ভিত্ এবং সেই ভিতের উপর দাঁড়িয়ে থাকে আইনব্যবস্থা, কলা, ধর্ম, সাহিত্য, রাজনীতি ইত্যাদি। এগুলির সমন্বয়ে সমাজের উপরি-কাঠামো গড়ে উঠে। সমাজে উপরি-কাঠামো (super-structure) এই অর্থনৈতিক ভিত্তির দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত হয়। মার্কসবাদীদের মতে, উৎপাদন পদ্ধতিই হোল সব কিছুর মূল এবং এর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠে সমাজ ও শ্রেণী-সম্পর্ক (class-relations)। মানুষের সচেতনতা তাদের অস্তিত্বকে নির্ধারণ করে না; বরং তাদের সামাজিক অবস্থিতিই তাদের সচেতনাকে নির্ধারণ করে। এইভাবে দাসসমাজের রাজনৈতিক, আইনগত, ধর্মীয় ইত্যাদি ধ্যানধারণার সঙ্গে সামন্তসমাজের রাজনৈতিক, আইনগত ইত্যাদি ধ্যানধারণার পার্থক্য চোখে পড়ে।

সমাজের ক্রমবিবর্তনে অর্থনীতির ভূমিকা

সমাজের ঐতিহাসিক পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মার্কসবাদীরা ইতিহাসকে কেবলমাত্র রাজার সঙ্গে রাজার যুদ্ধের কাহিনী বলে বর্ণনা করতে সম্মত নন। অর্থাৎ ইতিহাসকে ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণ করে না। সমাজের বিকাশ কতকগুলি সামাজিক নিয়মের উপর নির্ভরশীল। মার্কসবাদীদের মতে, সমাজের ক্রমবিবর্তনের একটি স্তরে উৎপাদনশক্তির সঙ্গে প্রচলিত উৎপাদন-সম্পর্কের বিরোধ বাধলে সামাজিক বিপ্লবের সূচনা ঘটে। এই বিপ্লব সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তিতে পরিবর্তন আনে এবং তার ফলে উপরি-কাঠামোতেও অর্থাৎ প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থা, আইন ব্যবস্থা, আদর্শ, নৈতিকতা ইত্যাদি সব কিছুতেই পরিবর্তন সাধিত হয়। এইভাবে একের পর এক দাস-ব্যবস্থা, সামন্ত ব্যবস্থা ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এই

সমাজ-পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রতিটি সমাজেই গড়ে উঠে সেই সমাজের নিজস্ব রাষ্ট্রব্যবস্থা। আদিম সাম্যবাদী সমাজ ও আধুনিক সমাজতান্ত্রিক সমাজের মধ্যবর্তী সব সমাজেই রাষ্ট্রব্যবস্থা, আইনব্যবস্থা ইত্যাদি এমনভাবে গড়ে উঠেছিল যাতে করে সমাজের সম্পত্তিবান শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষিত হয়। আবার সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সমাজের উপরি-কাঠামো এমনভাবে গঠিত হয় যাতে সমাজ থেকে সর্বপ্রকার শোষণের অবসান ঘটে।

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে তার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার সময় সমাজের অর্থনৈতিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাজনৈতিক, আইনগত ইত্যাদি জীবন নিয়ে আলোচনা করলে সেই আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোন একটি রাষ্ট্রের সংবিধানকে কখনই রাজনৈতিকভাবে বিশ্লেষণ করা যাবে না যদি তার শ্রেণীচরিত্র আলোচনা না করা হয়। অর্থাৎ প্রতিটি সংবিধানই একটি রাষ্ট্রের শ্রেণীস্বার্থের সংরক্ষণকারী মৌলিক আইন মাত্র। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার সময়, তথা মানুষের ও সমাজের রাজনৈতিক জীবনের যথার্থ পর্যালোচনা করার সময় অর্থনীতির কষ্টিপাথরে তাকে বিচার করতে হবে। মার্কসবাদীদের মতে, অর্থনীতি-নিরপেক্ষ যে-কোন আলোচনা অবৈজ্ঞানিক হতে বাধ্য।

অর্থনীতি-নিরপেক্ষ রাজনৈতিক আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য

অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, মার্কসবাদীরা রাজনীতির গুরুত্বকে অস্বীকার করেন। বরং তাদের মতে, রাজনীতি যদিও অর্থনীতির গাঢ় অভিব্যক্তি ও সম্পূর্ণতা বলে বিবেচিত হয়, তথাপি রাজনীতি অর্থনীতির উপর প্রভাব বিস্তারের যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে। তবে অর্থনীতির গাঢ় অভিব্যক্তি হওয়ায় রাজনীতি ব্যবস্থার সমর্থন ও সংরক্ষণের মাধ্যমে অর্থ-নীতির সেবা করে। যে রাষ্ট্রের হাতে বাধ্যকরণের যন্ত্র, প্রশাসনের যন্ত্র প্রভৃতি থাকে তার সাহায্যে বিদ্যমান ব্যবস্থার সংরক্ষণ ও পরিপোষণ করা হয়। এর অর্থ অর্থনৈতিক বনিয়াদ থেকে উদ্ভূত উপরি-কাঠামোর কোন অংশই নিষ্ক্রিয় নয়, বরং তারা ভিত্ বা বনিয়াদকে প্রভাবিত করতে সক্ষম। তাই লেনিন সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য রাজনৈতিক শ্রেণীসংগ্রামকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীসংগ্রাম হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কারণ শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা হোল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েম করার পূর্ব-শর্ত। সুতরাং বনিয়াদ ও উপরি-কাঠামো যৌথভাবে প্রতিটি সমাজব্যবস্থার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে ব্যক্ত করে। বনিয়াদে প্রকাশ পায় ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং উপরি-কাঠামোতে প্রকাশ পায় তার রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত রূপ। যেমন সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রে আধিপত্য করত অভিজাত, জমিদার ও সামন্তরা। সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র সাধারণ-ভাবে রাজতান্ত্রিক হোত। সমাজ বিভক্ত থাকত অধিকারভোগী ও অধিকারহীন শ্রেণীতে। প্রতিটি শ্রেণীর অধিকার ছিল কঠোরভাবে সুনির্দিষ্ট। বুর্জোয়া সমাজে আইনের কাছে সব নাগরিকের আনুষ্ঠানিক সমতার কথা ঘোষণা করা হলেও

রাজনীতির গুরুত্ব সম্পর্কে মার্কসবাদীরা

ধনসম্পদের ভিত্তিতে মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য নির্ধারণ করা হতে লাগল। সুতরাং প্রতিটি সমাজ বা সামাজিক ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর ভিত্তিতে অন্য সমাজ বা সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে তার পার্থক্য নিরূপণ করা হয়। সামন্ত সমাজে ধর্মের প্রাধান্য থাকলেও বুর্জোয়া সমাজে ধর্মের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হয়। এই সমাজে ধর্মের স্থান অধিকার করে রাজনৈতিক ও আইনী ভাবাদর্শ। এইভাবে একটি সমাজব্যবস্থা থেকে অন্য একটিতে উত্তরণের সময় যেমন বনিয়াদে, তেমনি উপরিকাঠামোতেও পরিবর্তন সূচিত হয় এবং এই পরিবর্তন নতুন সমাজের জন্মগ্রহণের কথা ঘোষণা করে।

উল্লেখযোগ্য যে, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য অর্থনৈতিক উপাদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেও মার্কসবাদীরা জনগণ, শ্রেণী, আদর্শ, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ইত্যাদির ভূমিকাকে অস্বীকার করেননি। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে এঙ্গেলস্ বলেছেন, অর্থনৈতিক অবস্থাই হোল সমাজের ভিত্তি; কিন্তু উপরি কাঠামোর বিভিন্ন উপাদান, যেমন—শ্রেণীসংগ্রামের বিভিন্ন ধরন ও তার ফলাফল, যুদ্ধে বিজয়ী শ্রেণী কর্তৃক নিজস্ব সংবিধান প্রবর্তন ইত্যাদিও ইতিহাসের গতিপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। জনগণ, বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী, রাজনৈতিক দল ইত্যাদির ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেনিন সামাজিক অগ্রগতির বিষয়ীগত (Subjective) এবং বিষয়গত (Objective) উপাদানের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাই ফিওডোর বুরলাট্স্কি (F. Burlatsky) বলেছেন, রাজনৈতিক বিশ্লেষণের সময় মার্কসবাদীরা ভিত্তি ও উপরি-কাঠামো; রাষ্ট্রের বৈষয়িক জীবনে উৎপাদন প্রণালীর প্রভাব; অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের উপর রাষ্ট্র, আইন ও রাজনীতির পারস্পরিক প্রভাব; সমাজবিকাশের মূলে শ্রেণীসংগ্রামের ভূমিকা; বিপ্লবের মাধ্যমে সর্বহারা শ্রেণী কর্তৃক বুর্জোয়া রাষ্ট্র ও বুর্জোয়া রাজনীতির ধ্বংসসাধন এবং সাম্যবাদী সমাজে রাষ্ট্র ও রাজনীতির অবসানের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন।

মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান

এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে কে. সেশাদ্রি (K. Seshadri) বলেছেন, মার্কসীয় রাজনৈতিক তত্ত্বে প্রধানতঃ শ্রেণীশক্তির পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের প্রকৃতি, সমাজের প্রধান প্রধান শ্রেণী ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, সমাজের প্রভুত্বকারী শ্রেণী কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের পদ্ধতি, রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাধিকার এবং কোন্ অবস্থায় কি ধরনের শ্রেণী-কাঠামোয় কিভাবে সেই স্বাধিকার প্রযুক্ত হয়, বলপ্রয়োগের হাতিয়ার হিসেবে কিভাবে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বিলোপ সাধিত হয় ইত্যাদি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

৯। মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী বনাম অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গী (Marxist Approach vs. Other Approaches)

মার্কসবাদীরা রাজনীতিকে সমাজের উপরি-কাঠামো (super-structure)-র এমন একটি অঙ্গ বলে মনে করেন যা রাষ্ট্র, তার বিভিন্ন সংগঠন, তার কার্যপ্রণালী প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত। সুতরাং একজন মার্কসবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্র, পুলিস, আমলাতন্ত্র, রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী (interest group), জনমত,

আন্দোলন, নেতৃত্ব (leadership), বিপ্লব, বিপ্লবী হিংসা প্রভৃতিকে অবশ্য-পাঠ্য বলে মনে করেন। এক্ষেত্রে অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, তা'হলে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীর (traditional approach) পার্থক্য কোথায়? একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলেই এই পার্থক্য প্রতীয়মান হয়। একথা সর্বপ্রথম মনেরাখা প্রয়োজন যে, মার্কসবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ে গবেষণা করেন কেবলমাত্র জ্ঞান অর্জনের জন্যই নয়; তাঁর মূল উদ্দেশ্য হলো বর্তমান সমাজ-কাঠামোর পরিবর্তন সাধন (transformation of the society)। এখানেই তাঁদের সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর প্রথম ও প্রধান পার্থক্য। দ্বিতীয়তঃ, অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গীর মতো মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী রাজনৈতিক অবস্থাকে কতকগুলি রাজনৈতিক বা সামাজিক কারণের দ্বারাই ব্যাখ্যা করে না। এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী সমাজের সর্বস্তরে রাজনীতি জড়িত। মানবজীবনের কোন অংশই রাজনীতিমুক্ত নয়। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতে হলে শুধু রাষ্ট্রটিকে আলোচনা করলেই চলবে না; আলোচনা করতে হবে তার অর্থনৈতিক ভিত্তিটিকে এবং সেইসঙ্গে উপরি-কাঠামোর অন্যান্য অঙ্গগুলিকেও অর্থাৎ সমগ্র সমাজকে। এই অর্থে মানুষের সমগ্র সামাজিক অস্তিত্বই (total social existence) রাজনীতির অঙ্গীভূত। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, এইভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়ন করা যথেষ্ট কঠিন। কারণ, এই দৃষ্টিভঙ্গী জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং সমাজজীবন নিজেই অত্যন্ত জটিল।

মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সনাতন দৃষ্টি-ভঙ্গীর পার্থক্য

আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর কয়েকটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। প্রথমতঃ, আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ সমাজের মধ্যস্থিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আচার-আচরণ পর্যালোচনার মধ্যেই তাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখেন। কিন্তু মার্কসবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এরূপ সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর বেড়াজাল অতিক্রম করে সমগ্র সমাজজীবনকে নিয়ে আলোচনা করেন। সামাজিক অগ্রগতির বিষয়ীগত ও বস্তুগত উপাদানের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের উপর তাঁরা অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন।

মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য

দ্বিতীয়তঃ, আচরণবাদী তত্ত্বে ধারণার (concepts) প্রাবল্য অতিমাত্রায় বিদ্যমান। এরূপ তত্ত্ব নিছক ঘটনাকে নিয়ে আলোচনা করে না। আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ রাজনীতি পর্যালোচনার সময় ইতিহাসের প্রভাবকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেন। কিন্তু মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ইতিহাসের কষ্টিপাথরে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ-নীতি প্রভৃতিকে ব্যাখ্যা করার পক্ষপাতী। তাঁরা দৃঢ়ভাবে এই অভিমত পোষণ করেন যে, ব্যক্তি ইতিহাসের গতিপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না; সমাজবিকাশের ইতিহাস কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়মের দ্বারা রচিত ও পরিচালিত হয়।

তৃতীয়তঃ, আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে কাম্য বলে ধরে নিয়েই কার্যতঃ তাঁদের আলোচনার সূত্রপাত করেন। তাই এরূপ মতবাদ রক্ষণশীল মতবাদ হিসেবে পরিগণিত হয়। কিন্তু মার্কসবাদ সমাজবিপ্লবের মাধ্যমে প্রচলিত বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের পক্ষপাতী, তাই একে প্রগতিশীল মতবাদ বলে অভিহিত করা হয়। সমাজের সবকিছু দ্বন্দ্বের মূলে যে অর্থনৈতিক স্বার্থ রয়েছে এই সত্যটিকে আচরণবাদ অস্বীকার করলেও মার্কসবাদ তাকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে।

চতুর্থ অধ্যায়

রাজনৈতিক তত্ত্ব ও রাজনৈতিক দর্শন*

[Political Theory and Political Philosophy]

১। রাজনৈতিক তত্ত্বের অর্থ, শ্রেণীবিভাগ এবং ভূমিকা

(Meaning, Classification and Role of Political Theory)

রাজনৈতিক তত্ত্ব (Political theory) হোল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রকৃতি ও ভূমিকা সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ঐকমত্যে উপনীত হতে পারেননি। কারণ বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক মতাদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক তত্ত্বের অবতারণা করেন।

রাজনৈতিক তত্ত্ব বলতে কি বোঝায়

কিন্তু প্রশ্ন হোল রাজনৈতিক তত্ত্ব বলতে কি বোঝায়? সাধারণভাবে বলা যায়, রাজনৈতিক তত্ত্ব হোল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সেই অংশ যার প্রধান কাজ হোল রাজনৈতিক বিষয়ে কতকগুলি সাধারণ নীতিকে (general principles) সূত্রবদ্ধ করা। রাজনৈতিক তত্ত্ব কেবলমাত্র রাষ্ট্রের উৎপত্তি, প্রকৃতি, বিকাশ ও লক্ষ্যকে নিয়েই আলোচনা করে না, সেই সঙ্গে তা ব্যাপক দৃষ্টিতে রাজনৈতিক জীব হিসেবে মানুষ এবং রাজনৈতিক প্রণালীসমূহকে (political processes) নিয়ে আলোচনা করে। কোকার (Coker) বলেছেন, রাজনৈতিক সরকার এবং তার বিভিন্ন রূপ (forms) ও কার্যাবলীকে সাময়িক ফলাফলের ভিত্তিতে কেবলমাত্র বর্ণনা, তুলনা ও পর্যালোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে যখন মানুষের নিরন্তন প্রয়োজন, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মতামত অনুধাবন ও মূল্যায়নের তথ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তখন রাজনৈতিক তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। সুতরাং বলা যায়, রাজনৈতিক তত্ত্ব একই সঙ্গে আদর্শ স্থাপনকারী (normative) এবং অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্ব হিসেবে কাজ করে। যখন রাজনৈতিক তত্ত্ব মূল্যমানযুক্ত হয়ে কাজ করে তখন তা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ (political action)-এর তত্ত্বগত কাঠামো (theoretical framework) নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্ব হিসেবে তা রাজনৈতিক ব্যবস্থার বাস্তব কার্যক্রমের (political system in action) দিকটি পর্যালোচনা করে। এদিক থেকে বিচার করে বলা যায়, রাজনৈতিক তত্ত্ব হোল রাজনীতির মৌলিক ধারণা এবং প্রধান প্রধান আলোচ্য বিষয়ের পাঠমাত্র (a study of basic concepts and major issues in politics)। তাই রাজনৈতিক তত্ত্বের আলোচ্য বিষয়সূচীর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার মতাদর্শ (creed or isms) যেমন থাকে, তেমনি রাজনৈতিক সংস্কৃতি (political culture), সামাজিক কাঠামো, রাজনৈতিক নিয়োগ (political recruitment), রাজনৈতিক অংশগ্রহণ (political participation) প্রভৃতিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে

---

* কেবলমাত্র উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য।

গিয়ে প্লামেনাজ (Plamenatz) বলেছেন, রাজনৈতিক তত্ত্ব হোল এক ধরনের বাস্তব দর্শন (practical philosophy), কারণ তা বিশেষভাবে সরকারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

ডেভিড ইস্টন রাজনৈতিক তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একে দুভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা—মূল্যবোধযুক্ত তত্ত্ব (value theory) এবং সাময়িক তত্ত্ব (casual theory)। প্রচলিত ধ্যানধারণা অনুযায়ী রাজনৈতিক দর্শনের আলোচনাকেই রাজনৈতিক তত্ত্ব বলে মনে করা হয়। এরূপ আলোচনার সঙ্গে রাজনৈতিক মূল্যবোধ ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। প্রধানতঃ সনাতন রাজনৈতিক তত্ত্বগুলি (Traditional political theories) তাদের রাজনৈতিক আলোচনাকে মূল্যবোধযুক্ত করে গড়ে তোলে। কিন্তু যে সব রাজনৈতিক তত্ত্ব কেবলমাত্র বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক ঘটনাবলীর মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে তাকে ইস্টন সাময়িক তত্ত্ব বলে অভিহিত করেছেন।

রাজনৈতিক তত্ত্বের শ্রেণীবিভাগ

রোল্যান্ড পেনক রাজনৈতিক তত্ত্বকে প্রধানতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা— ১. নৈতিক তত্ত্ব (ethical theory), ২. কাল্পনিক তত্ত্ব (speculative theory), ৩. সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব (sociological theory), ৪. আইনগত তত্ত্ব (legal theory) এবং ৫. বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব (scientific theory)।

১. নৈতিক-রাজনৈতিক তত্ত্ব আলোচনার সময় রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা অবরোহ পদ্ধতি অনুসরণ করেন। রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক জীবনের সর্বজনীন মূল্যবোধ নির্ণয় করা এবং সেই মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র ও সমাজ, নাগরিক-আইন, নাগরিক-অধিকারের নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে সুসংবদ্ধ তত্ত্ব প্রণয়ন করাই তাঁদের উদ্দেশ্য। তাই স্বাভাবিকভাবে তাঁদের তাত্ত্বিক আলোচনায় ঔচিত্য ও অনৌচিত্যের প্রশ্ন সংযুক্ত থাকে। প্রধানতঃ ভাববাদী দার্শনিকরা নৈতিক-রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রবক্তা হিসেবে পরিচিত। প্লেটো, হেগেল, কান্ট, ব্লুন্টস্‌লি, গ্রীন, বোসাংকোয়েত প্রমুখ এরূপ রাজনৈতিক তত্ত্বের সমর্থক ও প্রচারক।

২. কাল্পনিক রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রচারকেরা কল্পনার সাহায্যে আদর্শ সমাজ এবং আদর্শ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। উদাহরণ হিসেবে প্লেটোর সমভোগবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত তত্ত্বের কথা উল্লেখ করা যায়।

৩. সমাজতাত্ত্বিক রাজনৈতিক তত্ত্ব অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রকে একটি সামাজিক সংগঠন হিসেবে ধরে নিয়েই সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক আলোচনা করে।

৪. কিন্তু আইনগত রাজনৈতিক তত্ত্ব রাজনৈতিক জীবনের সর্বপ্রকার সম্পর্ককে আইনগত দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচারবিশ্লেষণ করে। এই তত্ত্বের প্রচারকেরা রাষ্ট্রকে একটি রাজনৈতিক বা সামাজিক সংস্থা বলে মনে না করে একে প্রধানতঃ একটি আইনগত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধরে নিয়েই আলোচনার সূত্রপাত করেন। এই তত্ত্বের পরিধি প্রধানতঃ শাসনতন্ত্র, আইন, সার্বভৌমিকতা ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

৫. কিন্তু বৈজ্ঞানিক রাজনৈতিক তত্ত্ব পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ইত্যাদি পদ্ধতির সাহায্যে এবং সংগৃহীত তথ্য ও পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে সাধারণ সিদ্ধান্ত, বিধি ইত্যাদি

প্রণয়নের চেষ্টা করে। ম্যাক্‌ডুগাল, লেবঁ, গ্রাহাম ওয়ালস প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানিগণ এরূপ রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা।

মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা রাজনৈতিক তত্ত্বকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি, যথা—১. ভাববাদী রাজনৈতিক তত্ত্ব, ২. বুর্জোয়া রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং ৩. মার্কসীয় রাজনৈতিক তত্ত্ব। ভাববাদী রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রবক্তাগণ রাষ্ট্রকে একটি ভাব বা আদর্শের প্রকাশ হিসেবে চিত্রিত করেছেন। তাঁরা রাষ্ট্রকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ লক্ষ্য বলে মনে করেন। এরূপ রাজনৈতিক তত্ত্ব রাষ্ট্রকে সমাজ-বিবর্তনের সর্বোচ্চ স্তর বলে চিহ্নিত করেছে।

মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণীবিভাজন

২. বুর্জোয়া যুগের শুরুতে বুর্জোয়া সমাজের উদ্ভবের ঐতিহাসিক পটভূমিতে বুর্জোয়া দার্শনিকেরা রাজনৈতিক দর্শন রচনা করেছিলেন। বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তার গণতান্ত্রিক ও উদারনৈতিক প্রকৃতি নিয়ে রাজনৈতিক তত্ত্ব গড়ে উঠে। বুর্জোয়া রাজনৈতিক তত্ত্বে একদিকে যেমন ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে বর্জন করা হয়, অন্যদিকে তেমনি রাষ্ট্রকে মানুষের কল্যাণে নিযুক্ত একটি মানবীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিত্রিত করা হয়। রাষ্ট্রের চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত না হলেও মানুষের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই যে রাষ্ট্রের অবস্থিতি তা সবাই একবাক্যে স্বীকার করে নেন। বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা রাষ্ট্রকে নিরপেক্ষ ও শ্রেণীস্বার্থের ঊর্ধ্বে অবস্থিত একটি জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে বর্ণনা করেন। বুর্জোয়া তত্ত্ব একথাও প্রচার করে যে রাষ্ট্র কর্তৃত্ব কার স্বার্থে পরিচালিত হবে তা নির্ভর করে শাসনব্যবস্থার রূপ বা ধরনের উপর। রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব একজন বা কয়েকজন ব্যক্তির দ্বারা প্রযুক্ত হলে তাকে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন বলা হবে। কিন্তু এই কর্তৃত্ব যখন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ ইত্যাদি নির্বিশেষে সকলের স্বার্থে সকলের দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন তাকে গণতন্ত্র বলা হবে। বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য তাঁদের তত্ত্ব খাড়া করেন। তাঁরা একথাও বলেন যে, রাষ্ট্র যেহেতু নিরপেক্ষ চরিত্রবিশিষ্ট সেহেতু বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার সংরক্ষণে কিংবা তার পরিবর্তনসাধনে রাষ্ট্রের নিজস্ব কোন ভূমিকা থাকতে পারে না। বুর্জোয়া রাজনৈতিক তাত্ত্বিকেরা প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অপরিবর্তিত রেখে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সরকারের পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে সমাজব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তর সাধন সম্ভব বলে মনে করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ (Democratic Socialism), ফেবিয়ান সমাজতন্ত্র প্রভৃতি তত্ত্বকে আপাতদৃষ্টিতে বুর্জোয়া-শাসনের বিরোধী বলে মনে হলেও কার্যক্ষেত্রে এগুলি বুর্জোয়া রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকেই পরোক্ষভাবে সমর্থন জানিয়েছে।

বুর্জোয়া রাজনৈতিক তত্ত্ব

৩. মার্কসীয় রাজনৈতিক তত্ত্ব ভাববাদী ও বুর্জোয়া রাজনৈতিক তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিরোধী। "বৈপ্লবিক কর্মে শোষিত মানুষের অভিজ্ঞতা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব।" মার্কসীয় তত্ত্বে রাষ্ট্রকে শ্রেণী-শোষণের হাতিয়ার হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। তাই মার্কসবাদী তাত্ত্বিকদের দৃষ্টিতে অর্থনীতির গাঢ় অভিব্যক্তি

হওয়ায় রাজনীতি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমর্থন ও সংরক্ষণের কাজে আত্মনিয়োগ করে। যে-কোন রাষ্ট্রের হাতে বাধ্যকরণের যন্ত্র, প্রশাসনের যন্ত্র ইত্যাদি থাকে আর সেগুলির সাহায্যে তা বিদ্যমান ব্যবস্থাটিকে রক্ষা করে। অর্থনৈতিক বনিয়াদ থেকে উদ্ভূত উপরি-কাঠামোর এক একটি অংশ আদৌ নিষ্ক্রিয় নয়; বরং তারা সক্রিয়ভাবে বনিয়াদকে প্রভাবিত করে। এইভাবে মার্কসবাদী তাত্ত্বিকেরা রাষ্ট্রকে শ্রেণী-নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান বলে মনে করেন না। মার্কসীয় তত্ত্ব সংখ্যালঘু শ্রেণীর শোষণভিত্তিক কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়ে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার সপক্ষে জোরালো বক্তব্য উপস্থিত করে। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অসারতা প্রমাণ করে এই তত্ত্ব সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলে। শেষ পর্যন্ত শ্রেণীহীন-শোষণহীন-রাষ্ট্রহীন এক মুক্ত সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকে মার্কসীয় রাজনৈতিক তত্ত্ব অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করে। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচারবিশ্লেষণ করে একথা বলা যেতে পারে যে, ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্ব, কাঠামো-কার্যগত তত্ত্ব, যোগাযোগ তত্ত্ব, ক্ষমতা তত্ত্ব প্রভৃতি পশ্চিমী দুনিয়ার তত্ত্বগুলি প্রচলিত বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই প্রচারিত হয়েছে। তাই এগুলিকে আমরা মার্কসীয় রাজনৈতিক তত্ত্বের বিপরীতে স্থাপন করতে পারি।

মার্কসীয় রাজনৈতিক তত্ত্ব

রাজনৈতিক তত্ত্বের ভূমিকা সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা একমত হতে না পারলেও এ সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের বক্তব্যকে প্রধানতঃ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত রাজনৈতিক দর্শন এবং রাজনৈতিক তত্ত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য নিরূপণ করা হোত না। তাই তখন রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং রাজনৈতিক দর্শনের ভূমিকা ছিল এক ও অভিন্ন। প্লেটো, কান্ট, হেগেল, গ্রীন প্রমুখ চিন্তাবিদ্‌গণ রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং রাজনৈতিক দর্শনকে অভিন্ন ভাবতেন বলে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক জীবনকে ব্যাখ্যা করার সময় তাঁরা বাস্তব অবস্থার পর্যালোচনা অপেক্ষা কতকগুলি পূর্বসিদ্ধান্তের দ্বারা পরিচালিত হতেন। আদর্শ রাষ্ট্র ও সুন্দর জীবনের প্রতিষ্ঠা তাই ছিল ঐসব রাজনৈতিক দার্শনিকদের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য। ঐসব ভাববাদী দার্শনিক রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক জীবনের সর্বজনীন মূল্যবোধ নির্ণয় করতেন এবং সেই মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র, নাগরিক অধিকার, আইন প্রভৃতি সম্পর্কে ভাববাদী তত্ত্ব খাড়া করতেন। প্লেটো তাঁর কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য দার্শনিক রাজার তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। অনুরূপভাবে অ্যারিস্টটলের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল মূলতঃ আদর্শ সমাজ ও আদর্শ রাষ্ট্র সম্পর্কিত তত্ত্বের মধ্যে।

রাজনৈতিক তত্ত্বের ভূমিকা

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শুরুতে আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের আবির্ভাবের ফলে রাজনৈতিক চিন্তাজগতে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয় বলে অনেকে দাবি করেন। আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ তত্ত্ব ও গবেষণার পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর যেমন গুরুত্ব আরোপ করেন, তেমনি অভিজ্ঞতাবাদী গবেষণার লক্ষ্য পূরণের জন্য তাত্ত্বিক প্রশ্নকে কার্যকরী শব্দের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তাঁরা রাজনৈতিক তত্ত্বের আলোচনাকে মূল্যমান-নিরপেক্ষ করে গড়ে তোলার পক্ষপাতী। তাঁদের মতে,

আচরণবাদ ও রাজনৈতিক তত্ত্ব

রাজনৈতিক তাত্ত্বিককে নিরপেক্ষভাবে রাজনৈতিক জীবন ও ঘটনাবলীর পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করতে হবে। আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রধান কাজ হোল বিশ্বাসযোগ্য রাজনৈতিক জ্ঞান (reliable political knowledge) যোগান দেওয়া। ডেভিড ইস্টনের মতে, একটি সাধারণ তত্ত্ব ছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিজ্ঞানসম্মত পর্যালোচনা অসম্ভব। অর্থাৎ তাঁর মতে, রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রধান কাজ হোল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর বিজ্ঞানসম্মত পর্যালোচনা করা। তিনি এই অভিমত পোষণ করেন যে, মূল্যবোধকে চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে ধরে নিলেই শুধু চলবে না, সেইসঙ্গে সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অন্বেষণ করতে হবে। সাময়িক তত্ত্বের মাধ্যমে সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে, রাজনৈতিক গবেষককে একটি তাত্ত্বিক অনুমানের ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। তাই তথ্য এবং তত্ত্ব একে অপরের উপর নির্ভরশীল। তথ্য ছাড়া তত্ত্ব যেমন অবাস্তব বলে প্রতিপন্ন হয়, তেমনি আবার তাত্ত্বিক ভিত্তি ছাড়া তথ্যগুলিও নিছক ঘটনাবলীর সংকলন হয়ে দাঁড়ায়। তাই বলা যায়, জ্ঞানকে নির্ভরশীল ও বিশ্বাসযোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য তাকে সুসংবদ্ধ সাধারণ মতামত (systematic generalised statement) হিসেবে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হয়। ইস্টন দৃঢ়ভাবে এই অভিমত পোষণ করেন যে, রাজনৈতিক আচার-আচরণসমূহকে বিশ্লেষণ করে কেবলমাত্র রাজনৈতিক তত্ত্ব ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অভিমত প্রদান করতে পারে।

উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে রাজনৈতিক তত্ত্বের ভূমিকাকে তিনটি দিক থেকে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির সাহায্যে রাজনৈতিক গবেষক রাজনৈতিক পরিবর্তনীয় উপাদানসমূহের (variables) পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করতে পারেন এবং কেবলমাত্র তাত্ত্বিক আলোচনার ভিত্তিতে তথ্য বিন্যাসের সাহায্যে তিনি তাঁর আলোচনাকে বিশ্বাসযোগ্য করে গড়ে তুলতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ, রাজনৈতিক তত্ত্ব কেবলমাত্র রাজনৈতিক গবেষণার তুলনামূলক পর্যালোচনার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে না ; সেইসঙ্গে তা কোন্ কোন্ নতুন বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন তা-ও বলে দেয়।

তৃতীয়তঃ, রাজনৈতিক তত্ত্বের অন্যতম কাজ হোল সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে এবং তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা। উল্লেখযোগ্য যে, ইস্টন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে ব্যাখ্যা করার জন্য বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক তত্ত্ব গড়ে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্ব তাঁর এই চিন্তাধারারই ফসল মাত্র। তিনি রাজনৈতিক ব্যবস্থার তত্ত্বগত অবস্থা অনুধাবনের জন্য তার সীমানা, পরিবেশ এবং অস্তিত্ব রক্ষা করার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

ডেভিড ইস্টন, অ্যালফ্রেড কোব্যান প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ মনে করেন যে, রাজনৈতিক দর্শনকেন্দ্রিক সনাতন রাজনৈতিক তত্ত্বের গুরুত্ব যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে।

রাজনৈতিক তত্ত্বের এই গুরুত্ব হ্রাস বা অবনয়নের পশ্চাতে প্রধানতঃ চারটি কারণ রয়েছে বলে ইস্টনের ধারণা। এই চারটি কারণ হোল—

রাজনৈতিক তত্ত্বের গুরুত্ব হ্রাসের কারণ

১. ঈতিহাসাশ্রয়ী আলোচনা (historicism), ২. নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ (moral relativism), ৩. বিজ্ঞান ও তত্ত্বের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে বিভ্রান্তি (confusion between science and theory) এবং ৪. ঘটনার প্রতি অত্যধিক প্রবণতা (hyper factualism)।

১. ইস্টনের অভিযোগ হোল—আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা প্রাচীন চিন্তাবিদদের ধ্যানধারণার আলোচনায় অত্যধিক পরিমাণে আত্মনিয়োগ করার ফলে সমকালীন রাজনৈতিক আচার-আচরণ ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত তত্ত্বের উদ্ভব ঘটছে না। ঐসব রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নতুন রাজনৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী নন।

২. রাজনৈতিক তত্ত্বের গুরুত্ব হ্রাসের অন্যতম কারণ হিসেবে ইস্টন 'নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ'কে দায়ী করেছেন। নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদীরা যে-কোন রাজনৈতিক ঘটনার বিশ্লেষণের সময় মূল্যবোধকে পরিহার করার পক্ষপাতী। অন্যভাবে বলা যায়, তাঁরা তাদের রাজনৈতিক গবেষণাকে সম্পূর্ণভাবে মূল্যমান-নিরপেক্ষ করে গড়ে তুলতে চান। কিন্তু ইস্টন মূল্যবোধ সম্পর্কিত আলোচনার বিরোধী নন। তিনি একথা মনে করেন যে, সমাজের মৌলিক সমস্যাগুলির প্রতি সংবেদনশীল হওয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মাত্রেরই কর্তব্য। তাঁদের একটি মূল্যবোধের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। তবেই রাজনৈতিক তত্ত্ব অবনয়নের হাত থেকে মুক্তিলাভ করতে সক্ষম হবে।

৩. বিজ্ঞান ও তত্ত্বের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে বিভ্রান্তির ফলে রাজনৈতিক তত্ত্বের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে বলে ইস্টন মনে করেন। সুদীর্ঘকাল ধরে বিজ্ঞান ও তত্ত্বকে অভিন্ন বলে মনে করা হোত। কিন্তু, কোনও বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটানো এবং গবেষণার মাধ্যমে তত্ত্ব গড়ে তোলা—এক কথা নয়। আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা কোনও ঘটনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করলেও সংশ্লিষ্ট ঘটনার পশ্চাতে যে-সব কারণ রয়েছে সেগুলিকে ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই ইস্টন একটি তাত্ত্বিক অনুমানের ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

৪. ঘটনা ও তথ্যের প্রতি অত্যধিক ঝোঁককে ইস্টন রাজনৈতিক তত্ত্বের গুরুত্ব হ্রাসের অন্যতম কারণ বলে মনে করেন। বর্তমান শতাব্দীর আচরণবাদী গবেষক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করলেও সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নতুন কোন রাজনৈতিক তত্ত্বের সৃষ্টিতে বিশেষ কোন অবদান রাখতে পারেননি। অথচ রাজনৈতিক তত্ত্ব ছাড়া অন্য কিছুর সাহায্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মতামত জ্ঞাপন করা সম্ভব নয়।

অ্যালফ্রেড কোব্যান রাজনৈতিক তত্ত্বের গুরুত্ব হ্রাস বা অবনয়নের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে এই অভিমত পোষণ করেছেন যে, অতীতের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা বর্তমান রাজনীতির ক্ষেত্রে কতখানি প্রয়োগযোগ্য সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ

রয়েছে। বর্তমানে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধির সম্প্রসারণ, আমলাতন্ত্রের অস্বাভাবিক গুরুত্ব বৃদ্ধি, সামরিক বাহিনীর ভূমিকা বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে রাজনীতির গন্ডি অত্যন্ত সম্প্রসারিত হয়ে পড়েছে। এর ফলে রাজনৈতিক তত্ত্বের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া, রাষ্ট্রচিন্তার ধারার বিভিন্নতা এবং পরস্পর-বিরোধী মতের প্রকাশ রাজনৈতিক তত্ত্বের অবনয়নের অন্যতম কারণ বলে তিনি মনে করেন। অনেকে আবার রাজনৈতিক তত্ত্বের গুরুত্ব হ্রাসের কারণ হিসেবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্যহীনতাকে দায়ী করেন।

উপসংহার

তবে রাজনৈতিক তত্ত্বের গুরুত্ব হ্রাসের পশ্চাতে উপরি-উক্ত কারণগুলি রয়েছে বলে সাধারণভাবে মনে করা হলেও রাজনৈতিক তত্ত্বের অবসান ঘটেছে একথা আদৌ বলা যায় না। বরং বলা যায়, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য-বিধান করেই রাজনৈতিক তত্ত্ব এগিয়ে চলেছে। আপাতদৃষ্টিতে এই গতিকে রাজনৈতিক তত্ত্বের অবনয়ন বা গুরুত্ব হ্রাস বলে মনে হলেও অনেকে একে রাজনৈতিক তত্ত্বের কাঠামোগত পরিবর্তন হিসেবে চিহ্নিত করার পক্ষপাতী।

২। রাজনৈতিক দর্শন এবং রাজনৈতিক তত্ত্ব (Political Philosophy and Political Theory)

যে বিষয় রাষ্ট্রের প্রকৃতি, নাগরিকতা, অধিকার ও কর্তব্য, রাজনৈতিক আদর্শ ইত্যাদি সম্পর্কিত মৌলিক সমস্যাগুলির মূল্যবোধযুক্ত উদ্দেশ্যমূলক আলোচনা করে তাকেই রাজনৈতিক দর্শন বলে অভিহিত করা যেতে পারে। কোন রাজনৈতিক দর্শনই সমাজ-নিরপেক্ষভাবে গড়ে উঠতে পারে না।

রাজনৈতিক দর্শনের উদ্দেশ্য

কারণ রাজনৈতিক দর্শনের উৎস হোল সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গেই থাকে তার নাড়ীর যোগ। বিদ্যমান সমাজব্যবস্থাকে সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যেই যুগে যুগে রাজনৈতিক দর্শন কাজ করে চলেছে। প্রতিটি যুগেই দার্শনিকরা বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার গন্ডীর মধ্যে থেকে সমকালীন সমাজের যাবতীয় সমস্যার সমাধানের পথ অন্বেষণ করেছেন। অধিকাংশ দার্শনিকই বিদ্যমান সমাজকে স্বতঃসিদ্ধ ও কল্যাণকর বলে ধরে নিয়েই তার যাথার্থ্য প্রমাণের জন্য রাজনৈতিক দর্শন রচনা করেছিলেন। তাই বুর্জোয়া যুগ পর্যন্ত সব দর্শনের মধ্যে রাষ্ট্রের যথার্থ প্রকৃতি অর্থাৎ রাষ্ট্রের শ্রেণী-চরিত্রটিকে আড়াল করে রাখা হয়েছে। তবে একথাও সত্য যে, বুর্জোয়া দর্শন বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতিগুলিকে জনসমক্ষে তুলে ধরেছিল। "যে বুর্জোয়া দর্শন মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের দর্শনকে অপসারিত করে মতাদর্শের ক্ষেত্রে নিজ প্রাধান্য স্থাপন করেছে তা যেমন ছিল পূর্বেকার দর্শনের তুলনায় অধিকতর বস্তুনিষ্ঠ তেমনি ছিল ইতিহাসের বিচারে প্রগতিশীল।" অনুরূপভাবে শ্রমিকশ্রেণীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে যে মার্কসীয় দর্শন বুর্জোয়া দর্শনের বিরোধিতা করছে তা নিঃসন্দেহে পূর্বোক্ত দর্শন অপেক্ষা অনেক বেশী বস্তুনিষ্ঠ ও প্রগতিশীল। কারণ বুর্জোয়া দার্শনিকরা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রশক্তির শোষণ ও পীড়নমূলক চরিত্রটিকে কখনও জনসমক্ষে তুলে ধরতে আগ্রহী

নন। কিন্তু "শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্রদর্শনে শক্তি প্রয়োগের উদ্দেশ্য গোপন করার প্রয়োজন হয়নি বলে এ দর্শনে রাষ্ট্রের চরিত্র সম্পূর্ণভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।"

সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীর (traditional approaches) সমর্থক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং রাজনৈতিক দর্শনকে সমার্থক বলে মনে করতেন। তাঁরা রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক জীবনের বাস্তব অবস্থার পর্যালোচনা অপেক্ষা কতকগুলি পূর্বসিদ্ধান্তের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সেগুলিকে ব্যাখ্যা করতেন। তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক জীবনের একটি সাধারণ বা সর্বজনীন মূল্যবোধ নির্ণয় করা এবং সেই মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র, আইন, নাগরিক অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করা। তাই রাজনৈতিক দর্শনকে অনেকে আদর্শ স্থাপনকারী (normative) এবং আদর্শগত (ideological) বিষয় বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু র‍্যাফেল রাজনৈতিক দর্শনকে আদর্শবাদ বলে অভিহিত করার পক্ষপাতী নন। তিনি রাজনৈতিক দর্শনকে সমাজদর্শনের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে রাজনৈতিক দর্শনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যেতে পারে, যথা—১. রাজনৈতিক দর্শন প্রধানতঃ অবরোহ পদ্ধতি (deductive method) অনুসারে বিশেষ একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়; ২. রাজনৈতিক দর্শন আদর্শ স্থাপনকারী (normative) দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক জীবনের বিচার-বিশ্লেষণ করে এবং ৩. কিছু পরিমাণে হলেও রাজনৈতিক দর্শন রাজনীতির প্রকৃতি (nature of politics) ও মনুষ্যজীবনে তার স্থান নিয়ে আলোচনা করে। এর ফলে রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও ধ্যানধারণার (ideas) ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দর্শনের অবদানকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। র‍্যাফেলের মতে, 'বিশ্বাসের সমালোচনামূলক মূল্যায়ন' (critical evaluation of beliefs) এবং 'ধারণার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান' (classification of concepts) হোল দর্শনের দুটি প্রধান উদ্দেশ্য। বিশ্বাসের সমালোচনামূলক মূল্যায়ন বলতে বিশ্বাসকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের যুক্তিবাদী ভিত্তি প্রদানের চেষ্টাকে বোঝায়। 'ধারণার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান' বলতে তিনটি জিনিসকে বোঝায়, যথা—ক. ধারণার বিশ্লেষণ (analysis), খ. বিভিন্ন ধারণার মধ্যে সমন্বয়-সাধন (synthesis) এবং গ. ধারণার উন্নতিবিধান (improvement)। র‍্যাফেল ধারণার বিশ্লেষণকে সনাতন দর্শনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি রাজনৈতিক দর্শনকে নিছক আদর্শবাদ বলে মেনে নিতে সম্মত নন। যেহেতু মানুষের রাজনৈতিক জীবন সমাজ-জীবনেরই একটি অংশ, সেহেতু রাজনৈতিক দর্শনকে তিনি সমাজদর্শনের অঙ্গীভূত বলে মনে করেন।

রাজনৈতিক দর্শনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

রাজনৈতিক দর্শন ও রাজনৈতিক তত্ত্বকে অনেকে সমার্থক বলে মনে করলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা টেনে দেওয়া সম্ভব বলে র‍্যাফেল মনে করেন। প্রধানত তিনটি দিক থেকে রাজনৈতিক দর্শন ও রাজনৈতিক তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা যেতে পারে, যথা—১. বিষয়বস্তুর দিক থেকে, ২. উদ্দেশ্যের দিক থেকে এবং ৩. বৈধতা বিচারের মাপকাঠি (criteria of validity)-র দিক থেকে।

পার্থক্য

(১) রাজনৈতিক দর্শন কেবলমাত্র লক্ষ্য নিয়েই আলোচনা করে না, সেইসঙ্গে কিভাবে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় সে বিষয়েও আলোচনা করে। অন্যভাবে

বিষয়বস্তুগত পার্থক্য

বলা যায়, রাজনৈতিক দর্শনের [illegible] একটি আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা। কিন্তু তা করতে গিয়ে রাজনৈতিক দার্শনিকরা কিভাবে সেই রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব সে সম্পর্কেও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্লেটো তাঁর কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য দার্শনিক রাজার অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অনুরূপভাবে রুশো তাঁর 'আদর্শ-সমাজ' প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বশক্তিমান 'সাধারণ ইচ্ছা' (General Will)-কে খুঁজে বের করেছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক তাত্ত্বিকেরা ইতিহাস ও সমসাময়িক ঘটনাবলী থেকে মালমসলা সংগ্রহ করে বিশ্লেষণাত্মক পরিকল্পনা (analytical scheme)-র মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন। রাজনৈতিক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ ঘটানোর ফলে রাজনৈতিক তাত্ত্বিকের পক্ষে এরূপ করা সম্ভব হয়।

(২) রাজনৈতিক দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য হোল রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে একটি সাধারণ বা সর্বজনীন তত্ত্ব খাড়া করা। কিন্তু রাজনৈতিক তত্ত্বের উদ্দেশ্য হোল কোন

উদ্দেশ্যগত পার্থক্য

কিছুর কারণ অনুসন্ধান করা। এই কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাঁরা অভিজ্ঞতাবাদী গবেষণার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আধুনিক আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ কেবলমাত্র নিছক ঘটনাবলীকে নিয়েই আলোচনা করেন না, সেই সঙ্গে পরীক্ষাযোগ্য অনুসিদ্ধান্ত কার্যপদ্ধতির বিশ্বাসযোগ্যতা ইত্যাদির সাহায্যে আত্মসচেতনভাবেই তত্ত্ব গড়ে তোলার পক্ষপাতী।

(৩) বৈধতা বিচারের মাপকাঠির দিক থেকে বিচারবিশ্লেষণ করে রাজনৈতিক দর্শন ও রাজনৈতিক তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা সম্ভব বলে অনেকে মনে করেন।

বৈধতা বিচার সংক্রান্ত পার্থক্য

সাধারণভাবে যার বৈধতা (validity) বিচার করা সম্ভব তাকে বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু যার বৈধতা বিচার করা যায় না অর্থাৎ যা বৈধতা বিচারের ঊর্ধ্বে তাকে দর্শন বলা হয়। যেহেতু রাজনৈতিক তত্ত্বের বৈধতা বিচার করা সম্ভব এবং রাজনৈতিক দর্শনের বৈধতা বিচার করা যায় না, সেহেতু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান বলে একস্টেইন প্রমুখ মনে করেন।

রাজনৈতিক দর্শন ও রাজনৈতিক তত্ত্বের মধ্যে উপরি-উক্ত পার্থক্য নিরূপণ করা হলেও উভয়ের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান সে সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ

উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

নেই। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজনৈতিক তত্ত্ব ও রাজনৈতিক দর্শনের মধ্যে কোন পার্থক্য নিরূপণ করা হোত না। কিন্তু দৃষ্টবাদের (positivism) আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে রাজনৈতিক তত্ত্বের পার্থক্য নির্ধারণের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এর পর বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাজনৈতিক আলোচনাকে মূল্যমাননিরপেক্ষ ও দর্শনবর্জিত করে গড়ে তোলার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা সঙ্কুচিত করে তাঁরা দর্শনবর্জিত বাস্তব রাজনৈতিক তত্ত্ব গড়ে তোলার প্রয়াস পান। কিন্তু আপাতঃদৃষ্টিতে তাঁদের অলোচনা দর্শনবর্জিত বলে মনে হলেও রাজনৈতিক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে তথাকথিত নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর আড়ালে বুর্জোয়া সমাজের স্থিতাবস্থা বজায় রাখার এক অভিনব প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। তাই তাঁদের সৃষ্ট রাজনৈতিক তত্ত্ব কার্যতঃ বুর্জোয়া দর্শনের দ্বারা পরিচালিত বলে মনে করা হয়। লিও স্ট্রাউজ প্রমুখ চিন্তাবিদগণ রাজনৈতিক দর্শন ও রাজনৈতিক তত্ত্বের মধ্যে কৃত্রিম পার্থক্য নিরূপণের সম্পূর্ণ বিরোধী। স্ট্রাউজ রাজনৈতিক তত্ত্ব ও রাজনৈতিক দর্শনকে রাষ্ট্রচিন্তার (Political thought) অংশ বলে বর্ণনা করে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। রাজনৈতিক দর্শন-নিরপেক্ষভাবে কোন রাজনৈতিক তত্ত্ব গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কারণ প্রত্যেক রাজনৈতিক গবেষকই তার নিজস্ব রাজনৈতিক ধ্যানধারণা ও মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হন। ঐ সব মতাদর্শের প্রভাবমুক্ত হয়ে তথাকথিত নিরপেক্ষভাবে কোন রাজনৈতিক তত্ত্ব গড়ে তোলা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র

[Individual, Society and the State]

১। মানবের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (Origin and development of Man)

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের মধ্যেই তার জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু ঘটে। তাই সমাজকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিমানুষের কথা কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু বর্তমানে আমরা যেভাবে ব্যক্তি ও সমাজকে দেখি সেভাবে তারা অতীতে ছিল না। তাই আমাদের অনুসন্ধিৎসু মনে প্রশ্ন জাগে—মানুষ কোত্থেকে এল। কি করেই বা মানুষ পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করল ?

এ প্রশ্ন দীর্ঘদিনের। কিন্তু এর উত্তর দিতে গিয়ে নানান কথা বলা হয়। মানুষের জন্ম সম্পর্কে ধর্মগ্রন্থগুলিতে বলা হয় যে, মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব। কিন্তু বিজ্ঞানীরা মানুষের উদ্ভব সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এ বিষয়ে চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্বটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত তাঁর 'Origin of Species by Natural Selection' নামক গ্রন্থে তিনি একথা প্রচার করেন যে, মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্ট নয়। জীবজগতের ক্রমবিবর্তনের ফলেই মানুষের সৃষ্টি। কোটি কোটি বৎসরের বিবর্তনের ফলে প্রকৃতির মধ্যেই প্রাণের উদ্ভব ঘটেছিল। মানুষ এবং অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণী সেই প্রাণেরই ক্রমবিবর্তনের ফল। ডারউইনের মতে, 'এপ্' (Ape) নামক বিশেষ একপ্রকার বানরের ক্রমবিবর্তনের ফলে মানুষের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু ডারউইন ও তাঁর সমর্থক প্রকৃতিবিজ্ঞানীরাও ভাববাদে প্রভাবিত হয়েছিলেন বলেই মানবের উৎপত্তি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করতে অক্ষম। কারণ "ভাববাদী মতবাদের প্রভাবে পড়ে তাঁরা মানবের উৎপত্তিতে শ্রমের ভূমিকাকে স্বীকার করেন না।"

মানবের উৎপত্তি সম্পর্কে ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক ধারণা

মার্কস ও এঙ্গেলস্ মানুষের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁদের মতে, মানুষের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের কোন পর্যায়েই ঈশ্বর বা অন্য কোন অতিপ্রাকৃত শক্তির কোনরূপ হাত ছিল না। 'এপ' নামক বিশেষ ধরনের বানর থেকেই মানুষের উৎপত্তি। এমন এক সময় এল যখন ঐসব বানর চরম খাদ্য-সংকটের মধ্যে পড়ল। বাধ্য হয়ে তারা গাছ থেকে নেমে এল সমতলভূমিতে। কিন্তু চার পায়ে গাছে গাছে ঘুরে বেড়ানো যত সহজ, সমতল ভূমিতে দ্রুত ঘোরাফেরা করা তত সহজ ছিল না। তাই তারা সামনের পা দুটিতে ভর দিয়ে না দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র পেছনের পা দুটিতে ভর দিয়ে দাঁড়াবার জন্য চেষ্টা বা শ্রম করতে শুরু করল। এই শ্রমের ফলে তাদের সামনের পা দুটি হাতে রূপান্তরিত হোল। তারা সোজা হয়ে চলবার এবং দাঁড়াবার ভঙ্গী রপ্ত করে ফেলল। এঙ্গেলসের মতে, "বানর থেকে মানুষে উত্তরণে এই হল চূড়ান্ত পদক্ষেপ।" অবশ্য এইটুকু সামান্য পরিবর্তনের জন্য সময় লেগেছিল অনেক।

সৃষ্টির আদিপর্বে মানুষ কিন্তু ছিল অত্যন্ত অসহায় এবং দুর্বল। তাকে দু'রকম প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করতে হোত। এ দুটি প্রতিকূল পরিবেশ হোল, ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ (Physical Environment)। এবং খ. অর্থনৈতিক পরিবেশ (Economic Environment)।

শ্রমের ভূমিকা

মানুষ শ্রমের দ্বারা সমস্ত প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে শুধু নিজের অস্তিত্বই রক্ষা করেনি, সেইসঙ্গে প্রকৃতির উপর নিজের প্রাধান্যও বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। আজ ক্রম-বিকাশের ফলে মানুষ যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে তা সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র তাদের শ্রমের ভূমিকার জন্য। আর পশুর সঙ্গে মানুষের পার্থক্যও এখানেই। এঙ্গেলসের মতে, 'সংক্ষেপে বলতে গেলে, পশুরা তাদের বহিঃ-প্রকৃতিকে কেবল ব্যবহারই করে থাকে এবং কেবলমাত্র নিজেদের উপস্থিতি দ্বারাই তাতে পরিবর্তন আনতে পারে। মানুষ কিন্তু নিজের চেষ্টায় প্রকৃতিতে পরিবর্তন এনে তাকে তার নিজের কাজে লাগায়, অর্থাৎ প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করে। এটাই হোল মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে একটি চূড়ান্ত ও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য। আবার শ্রমই এই পার্থক্য ঘটিয়েছে।" শ্রমকে কাজে লাগাবার সঙ্গে মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তিকেও কাজে লাগিয়েছে। ফলে শুরু হয়েছে মানুষের বিজয় অভিযান, যা এখনও চূড়ান্ত পরিণতিলাভের দিকে এগিয়ে চলেছে। সুতরাং মার্কস ও এঙ্গেলসের মতে, ১. মানবের উদ্ভব ও বিকাশে কোন ঈশ্বর বা অতিপ্রাকৃত শক্তির হাত নেই। ২. মানবের উদ্ভব ও বিকাশের সর্বস্তরে শ্রমের ভূমিকাই ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ৩. মানবের বিকাশ সব সময় ধীরে ধীরে না হয়ে বিভিন্ন যুগসন্ধিক্ষণে তা বৈপ্লবিক গতিতে সম্পাদিত হয়েছে এবং ৪. মানুষ শ্রমের দ্বারা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে নিজের সেবায় তাকে নিযুক্ত করতে পেরেছে।

২। মানবসমাজ ও তার প্রকৃতি (Human Society and its Nature)

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজ ছাড়া সে বাঁচতে পারে না। সমাজের মধ্যেই সংঘবদ্ধভাবে মানুষ বাস করে। অন্যান্য ইতর প্রাণীরাও সংঘবদ্ধভাবে সমাজে বাস করে কিন্তু মানুষের সঙ্গে তাদের পার্থক্য এই যে, মানুষের মত তারা নিজেদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারে না এবং ঐক্যবদ্ধ শ্রমের দ্বারা প্রকৃতিকে বশীভূত করতে পারে না।

মনুষ্য সমাজ ও পশু সমাজের পার্থক্য

সামাজিক সম্পর্ক বলতে পারস্পরিক প্রয়োজনীয়তার দ্বারা নির্ধারিত সম্পর্ককে বোঝায়। এই সম্পর্ক সচেতন সম্পর্ক। অন্যভাবে বলা যায়, সংঘবদ্ধ জীব হিসেবে মানুষ যখন পরস্পরের প্রতি বিশেষ বিশেষ ধরনের আচার-আচরণে অভ্যস্ত হয়, তখনই গড়ে উঠে সামাজিক সম্পর্ক। ইতর প্রাণীগুলির মধ্যে যে চেতনা তা অত্যন্ত সংকীর্ণ। যৌন আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধন এবং খাদ্য সংগ্রহ ও আত্মরক্ষার জন্য পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এ ছাড়াও উন্নত জীবন প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা তাদের সামাজিক সম্পর্ককে ব্যাপকতর ও জটিলতর করে তুলেছে। তাই ম্যাকআইভার ও পেজ (MacIver and Page) বলেছেন, বিভিন্ন কারণে পারস্পরিক স্বেচ্ছাসম্পর্ক স্থাপন করে মানুষ সমাজ গঠন করে।

কিন্তু সমাজের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানিগণ ঐকমত্যে উপনীত হতে পারেননি। গিডিংস (Giddings)-এর মতে কিছু সংখ্যক সম-মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি যখন নিজেদের ঐক্য সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং ঐক্যবদ্ধ-ভাবে সাধারণ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করে, তখনই সমাজ গঠিত হয়। জিনস্বার্গ (Ginsberg) বলেছেন, সমাজ হোল মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংগঠিত বা অসংগঠিত, সচেতন বা অচেতন এবং সহযোগিতামূলক বা বৈরিতামূলক সম্পর্ক। ইয়ং ও ম্যাক (Young and Mack)-এর মতে, সমাজ হোল মানুষের এমন একটি ব্যাপক সমষ্টি যা সমজাতীয় অভ্যাস, ধ্যানধারণা ও মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়, যারা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করে এবং নিজেদের একটি সামাজিক গোষ্ঠী (a social unit)-র অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে। গ্রীন বলেছেন, সমাজ হোল অপেক্ষাকৃত স্থায়ী এমন একটি বৃহত্তম গোষ্ঠী, যার সদস্যরা অভিন্ন স্বার্থ, এক ভূখণ্ড ও একই ধরনের জীবনযাত্রার অংশীদার। ম্যাকআইভার ও পেজ (MacIver and Page)-এর মতে, 'সমাজ হোল আচার ও কার্যপ্রণালী, কর্তৃত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতা, নানাপ্রকার সমবায় ও বিভাগ, মানুষের আচার-আচরণের নিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতার সমন্বয়ে গঠিত প্রথা। এই সদা-পরিবর্তনশীল জটিল প্রথাকেই সমাজ বলে অভিহিত করা হয়।"

সমাজের বিভিন্ন প্রকার সংজ্ঞা

সমাজের বিভিন্ন প্রকার সংজ্ঞাগুলি থেকে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের পারস্পরিক মেলামেশার ভিত্তিতে গঠিত সামাজিক সম্বন্ধই সমাজগঠনের মূল ভিত্তি। পারস্পরিক সচেতনতা, ঐক্যানুভূতি ও সহযোগিতাই সামাজিক সম্বন্ধের মূল কথা। জিনস্বার্গ সমাজের ভিত্তি হিসেবে পারস্পরিক সচেতনতা ও সমস্বার্থের অনুভূতিকে সমাজের সংকীর্ণ ব্যাখ্যা বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, সমাজের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করার সময় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, সচেতন বা অচেতন ইত্যাদি সর্বপ্রকার মানবিক সম্পর্ককে যুক্ত করা সমীচীন। এদিক থেকে বিচার করে মানবসমাজের মতো প্রাণিসমাজকেও সমাজ বলে অভিহিত করা যায়। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় যেহেতু মনুষ্য-সমাজ, সেহেতু প্রাণীসমাজকে নিয়ে বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করাই যুক্তিযুক্ত। ম্যাকআইভার ও পেজ বলেছেন, দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে পরস্পরের মধ্যে সাদৃশ্য এবং সাদৃশ্য সম্পর্কে সচেতনতা ছাড়া কখনই সমাজ সৃষ্টি হতে পারে না। অবশ্য সাদৃশ্য সম্পর্কে সচেনতার সঙ্গে সঙ্গে বৈসাদৃশ্য বা বৈচিত্র্য সম্পর্কেও আমাদের সচেতন থাকতে হবে। অন্যথায় সামাজিক সম্বন্ধ সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়বে। সুতরাং সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য, সহযোগিতা ও বিরোধিতা এবং মতৈক্য ও মতপার্থক্যের বৈচিত্র্যপূর্ণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই সমাজজীবনের কেন্দ্রবিন্দু। তবে এক্ষেত্রে সাদৃশ্য ও সহযোগিতাকে অন্যান্য সবকিছুর উপরে স্থান দিতে হবে বলে জিসবার্ট (Gisbert) মন্তব্য করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিই সামাজিক সম্পর্ক ও সমাজের অস্তিত্বকে বজায় রেখেছে। তাই ঐক্য, বন্ধুত্ব, স্থায়িত্ব ও সম্প্রদায়গত চেতনাকেই সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে অভিহিত করা যায়।

সামাজিক সম্বন্ধের ভিত্তি

সমাজের বৈশিষ্ট্য

মার্কসবাদীরা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেন। সমাজের লক্ষণ বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁরা বলেন, "…আপন আপন ক্রিয়া দ্বারা পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তারকারী মানুষের বিস্তৃত সংগঠনের নাম সমাজ।… পরস্পরের উপর প্রভাবকারী সর্বপ্রকার ব্যৈক্তিক ক্রিয়াই সমাজের উপর স্থায়ী ছাপ রেখে যায়। …সমাজ প্রকৃতপক্ষে মানুষের পরিশ্রম অর্থাৎ ক্রিয়ার পারস্পরিক সম্পর্কের উপর স্থাপিত।" সৃষ্টির প্রথম থেকেই নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যই মানুষ সংগঠিত থাকতে বাধ্য হয়েছে। মানুষের এই সংগঠন-সম্মিলন তার সমাজজীবনের প্রয়োজনীয় বস্তু সামগ্রীর উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে। বস্তুতঃ সমাজ হোল ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র। এখানে প্রতিনিয়তই একে অন্যকে প্রভাবিত করছে। তবে একথা সত্য যে সমাজকে কেবলমাত্র ব্যক্তির সমষ্টি বললে ভুল করা হবে। সমাজ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হলেও সমন্বিত হওয়ার পর তার গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রতিটি ব্যক্তি পৃথকভাবে যেরূপ কাজ বা চিন্তা করে সামাজিক পরিবেশে এসে তা ঠিক সেইরূপ থাকে না। কারণ তার চিন্তাভাবনা, ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি সবকিছুই সমাজের দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুতরাং বলা যায়, ঘড়ির যন্ত্রপাতির যোগফল থেকে প্রকৃত ঘড়িটি যেমন গুণগত দিক থেকে অনেক বেশী উৎকর্ষ-সমন্বিত, তেমনি সমাজও কেবলমাত্র ব্যক্তির সমষ্টিমাত্রই নয়, তাও ব্যক্তির যোগফল অপেক্ষা গুণগতভাবে অনেক বেশী উৎকর্ষ-সমন্বিত। তাই সমাজ = মানুষ + মানুষ নয়, সমাজ = মানুষ × মানুষ। ব্যক্তিগত ক্রিয়াকর্মের প্রভাব সমাজের উপর কিছুটা পরিবর্তিত রূপে পড়ে। যে-সমাজ আকৃতিগতভাবে ক্ষুদ্র হয় সেই সমাজের উপর কম সময়ে বেশী পরিমাণে ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপের প্রভাব পড়ে। কারণ এরূপ সমাজে ব্যক্তি পরস্পরের কাছাকাছি আসতে পারে এবং তাদের ভাববিনিময় সহজে হতে পারে। তবে ব্যক্তি এককভাবে সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না; তারা সংঘবদ্ধভাবে তা করতে পারে। "ভাষা, রীতিনীতি, কলা, বিজ্ঞান, এমনকি ফ্যাশন, রীতি-রেওয়াজ পর্যন্ত সমাজের উপজ।" ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ, তাদের পারস্পরিক প্রভাব এবং এই প্রভাবের নিরন্তন সঙ্গীতর মধ্য দিয়ে এসবের সৃষ্টি। সমাজে মানুষের জীবনও বহু ব্যক্তির চিন্তাভাবনার যোগফলমাত্র নয়, তাও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের ফল এবং তা ব্যৈক্তিক চিন্তা থেকে বহুলাংশে পরিবর্তিত।

মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে সমাজ

৩। সমাজের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (Origin and Development of Society)

মানুষের শ্রমশক্তি বিকশিত হওয়ার পর প্রকৃতির উপর তার প্রভুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। সে শ্রমের হাতিয়ার হিসেবে যখন তার হাতকে পরিপূর্ণ-ভাবে ব্যবহার করতে শেখে তখন তার সামনে প্রগতির পথ খুলে যায়। শ্রমের সাহায্যে প্রাকৃতিক বস্তুকে ব্যবহার করার কলাকৌশল সে আয়ত্ত করতে পারে। শ্রমবিকাশের প্রধান প্রেরণা ছিল বৈষয়িক দ্রব্যাদির উৎপাদন। শ্রমের সাহায্যে মানুষ পাথর ও কাঠ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করে শিকার করতে শুরু করে এবং বন্যজন্তুর বিরুদ্ধে

শ্রম ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা সমাজ সৃষ্টি করেছে

আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়। নিহত বন্যজন্তুকে আদিম মানুষ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। তার চামড়া থেকে পোশাক-পরিচ্ছদ নির্মাণ করতে শুরু করে। এইভাবে একদিকে যেমন তারা শ্রমের দ্বারা তাদের উদরপূর্তি করতে সক্ষম হয়, অন্যদিকে তেমনি প্রচন্ড শীতের হাত থেকেও আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়। কিন্তু বস্তুর অধিকতর অর্জন ও ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন পারস্পরিক সহযোগিতার। শ্রমের ক্ষেত্রে এই সহযোগিতা সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধি তাকে নতুন নতুন কাজে উৎসাহিত করেছিল। তারা ক্রমে ক্রমে এই সহযোগিতার ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করার কাজে আত্মনিয়োগ করে। সুতরাং বলা যেতে পারে, ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য একদিকে যেমন মানুষকে শ্রম করতে হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি আত্মরক্ষার জন্য তাকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। এই শ্রম ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা মানুষের মনে সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা এনেছিল। সুতরাং মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রম এবং শ্রমের হাতিয়ার হিসেবে তার হাত মানবসমাজ সৃষ্টির সর্বপ্রধান উৎস।

সমাজবিকাশে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব

মানবসমাজের বিকাশে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব অনস্বীকার্য। অনুকূল পরিবেশে অর্থাৎ যেখানে নদী, উপত্যকা, বনজঙ্গল ইত্যাদি বর্তমান ছিল সেখানে দ্রুত সমাজের বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে সমাজের বিকাশ যথেষ্ট ব্যাহত হয়েছিল। তবে একথা সত্য যে, মানবসমাজ সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ যখন প্রকৃতির উপর অত্যন্ত বেশী নির্ভরশীল ছিল তখন ভৌগোলিক পরিবেশ মানবসমাজের বিকাশে যতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, প্রকৃতির উপর মানুষের প্রাধান্য বিস্তারের পর তার সেই প্রভাব বহু পরিমাণে হ্রাস পায়। উৎপাদনের অগ্রগতি সামগ্রিকভাবে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবকে কমিয়ে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে স্তালিন বলেন, "ভৌগোলিক পরিবেশ নিঃসন্দেহে সমাজবিকাশের পক্ষে সর্বকালেই অত্যাবশ্যক এবং নিশ্চয়ই তা সমাজবিকাশকে প্রভাবিত করে।...কিন্তু এই প্রভাব নিয়ন্তা প্রভাব নয়, কারণ সমাজের পরিবর্তন ও বিকাশের গতির সঙ্গে তার তুলনাই চলে না। তিন হাজার বছরের মধ্যে ইউরোপে পর পর তিন রকম সমাজব্যবস্থা বাতিল হয়ে গেছে—আদিম যৌথ সমাজব্যবস্থা, দাসপ্রথা এবং সামন্ত প্রথা।...তবুও এই তিন হাজার বছরে ইউরোপের ভৌগোলিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি, কিংবা এতই সামান্য পরিবর্তন হয়েছে যে ভূগোল তাকে আমলেই আনে না।...সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সমাজবিকাশে ভৌগোলিক পরিবেশ প্রধান বা নিয়ন্তা কারণ নয়।"

সমাজবকাশে জনসংখ্যার ভূমিকা

সমাজবিকাশের অন্যতম প্রধান উপাদান হোল জনসংখ্যা। যে অঞ্চলে জনবসতি কম সেখানে সামাজিক অগ্রগতিও মন্থর। কারণ, স্বল্প সংখ্যক মানুষের শ্রমের সাহায্যে প্রকৃতিকে বশ মানিয়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ বা উৎপাদন করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু জনবহুল অঞ্চলের মানুষেরা ঐক্যবদ্ধভাবে শ্রমশক্তিকে কাজে লাগিয়ে অতি সহজেই প্রকৃতিকে নিজেদের উপযোগী করে কাজে লাগাতে পারত। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমাজবিকাশের ধারাকে প্রভাবিত করলেও তাকে প্রধান শক্তি বা নিয়ন্তা বলে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, "একটি সমাজব্যবস্থা বাতিল হয়ে যাবার পর আর একটি

বিশেষ ব্যবস্থার সৃষ্টি কেন হয় এবং অপর কোন ব্যবস্থা কেন হয় না—এ প্রশ্নের সমাধান আমরা জনসংখ্যার নিছক হ্রাসবৃদ্ধির সাহায্যে করতে পারি না। কেন আদিম যৌথ সমাজব্যবস্থাকে বাতিল করে ঠিক দাসপ্রথাই দেখা দিল, কেন দাসপ্রথাকে বাতিল করে সামন্ত প্রথাই কায়েম হল,…তার উত্তর আমরা জনসংখ্যাবিষয়ক তথ্য থেকে পাই না।…জনসংখ্যাই যদি সমাজবিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করত, তা হলে অপেক্ষাকৃত জনাকীর্ণ দেশগুলিতে সেই অনুযায়ী উচ্চতর সমাজব্যবস্থা দেখা যেত। প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়।"

সুতরাং মানবসমাজের উৎপত্তি ও বিকাশের ভিত্তি হোল বৈষয়িক দ্রব্যাদির উৎপাদন (Production of material values)। বলা বাহুল্য, তা লাভ করার জন্য মানুষের শ্রমই ছিল মূল হাতিয়ার। শ্রমের হাতিয়ারকে উন্নত থেকে উন্নতর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ফলেই সমাজের বিকাশ সম্ভব হয়। তার ফলে মানুষ প্রকৃতির উপর আপন প্রভুত্ব বিস্তারে সক্ষম হয়। শ্রমের ফলে যেমন সমাজের উৎপত্তি, তেমনি আবার সমাজের দান হোল ভাষা। সমাজবদ্ধ হওয়ার পর মানুষ নিজের মনের ভাব অপরের নিকট ব্যক্ত করতে চাইল। ফলে উচ্চারিত ধ্বনির সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেতে থাকল, তেমনি আবার ধ্বনিযন্ত্রেরও পরিবর্তন সাধিত হোল। তাছাড়া শ্রমের ফলেই মানুষের মস্তিষ্কের বিকাশ সাধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে সমাজবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং মানুষের হাত, ভাষা ও মস্তিষ্ক—এই তিনটির সহযোগিতায় মানুষ জটিলতর কাজে উপযুক্ত হয়ে উঠে। সেই সঙ্গে সমাজও গড়ে উঠে এবং শ্রমের সাহায্যে তা ক্রমশঃ বিকশিত হতে থাকে।

শ্রম ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক

এঙ্গেলসকে অনুসরণ করে আমরা মানবসমাজের ক্রমবিকাশকে তিনটি যুগে বিভক্ত করতে পারি, যথা—১. বন্য যুগ. ২. বর্বর যুগ এবং ৩. সভ্য যুগ। নেঅন্ডর্থল, গ্রিমালদি. ক্রোমেঘ্নন প্রভৃতি মানুষের সমগ্র জীবন বন্য যুগের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। পৃথিবীতে মোট চার বার হিমযুগ নেমে এসেছিল। চতুর্থ তথা শেষ হিমযুগের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর পূর্বে। ঐ সময় থেকে অদ্যাবধি যে মানবজাতি নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছে তাকে 'সেপিয়ান মানব' বলে অভিহিত করা হয়। আজকের সুসভ্য মানুষ আদি অবস্থায় বন্য জীবন যাপন করত। তারা ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাকতো এবং অমসৃণ পাথরের অস্ত্র দিয়ে জীবজন্তু শিকার করে তার দ্বারা নিজেদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করত। কিন্তু জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র কিংবা কলাকৌশল কিছুই তাদের ছিল না। তাই নিজেদের প্রয়োজন মিটানোর তাগিদেই তারা ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভরশীল ছিল। সংগৃহীত ও সঞ্চিত দ্রব্যসামগ্রীর উপর সকলের সম্মিলিত অধিকার থাকত। কারণ ঐ সব সম্পত্তি সকলের সম্মিলিত চেষ্টা তথা শ্রমের দ্বারাই সংগৃহীত হোত। এই সমাজব্যবস্থাকে আদিম সমভোগবাদী সমাজব্যবস্থা বলে অভিহিত করা হয়। বন্য যুগে সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক সমাজ অর্থাৎ সমাজে নারী জাতির প্রাধান্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হোত। এই সমাজে বিবাহ অর্থাৎ পতিপত্নীর সম্পর্কের কোন অস্তিত্ব ছিল না। এঙ্গেলস এই যুগের বিবাহকে 'যূথবিবাহ' বলে বর্ণনা করেছেন।

বন্যযুগ ও তার বৈশিষ্ট্য

তখন সমগ্র পরিবারকে সম্মিলিতভাবে জীবিকা নির্বাহের জন্য শ্রম করতে এবং শত্রুর মুখোমুখি হতে হোত। কাষ্ঠ, প্রস্তর ও অস্থিনির্মিত অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে বন্য সমাজের মানুষ খাদ্যসংগ্রহ ও আত্মরক্ষা করত।

বর্বর যুগের আবির্ভাব

এঙ্গেলস বলেছেন, "বন্য মানবসমাজে পরিবারগুলি কেবলমাত্র নিজেদের ব্যবহারের জন্য জিনিসপত্র তৈরি করত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে উৎপাদন ও বন্টনের এই স্বয়ংসম্পূর্ণ অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হলে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে বিনিময় এবং ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে মানুষ পণ্যসামগ্রী উৎপাদনে মনোনিবেশ করে। ফলে আদিম কমিউন বা 'পরিবার সমবায়' (Commune) ব্যবস্থার অবসান ঘটে। শুরু হয় বর্বর যুগ। এই যুগকে এঙ্গেলস 'জনযুগ' বলে অভিহিত করেছেন। উল্লেখযোগ্য যে, তিনি 'জন' বলতে 'এক বংশগত মনুষ্য সম্প্রদায়'কে বোঝাতে চেয়েছেন, মনুষ্য জাতিকে নয়।

জনযুগ ও তার বৈশিষ্ট্য

জনযুগের প্রাথমিক অবস্থায় সমাজের মধ্যে মাতৃকর্তৃত্ব প্রচলিত ছিল। তখন সম্পত্তির অধিকাংশ ছিল সাংঘিক সম্পত্তি। পারিবারিক সম্পত্তি যেটুকু থাকত তাতে শুধু কন্যার অধিকারই বর্তাতো। জনযুগের মানুষ তার আদিম অমসৃণ প্রস্তরনির্মিত অস্ত্রের পরিবর্তে ক্রমে ক্রমে মসৃণ, তীক্ষ্ণ ও উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করতে শিখল। ঐ সময় প্রাচীন ধরনের নিক্ষেপাস্ত্র ছাড়াও কাঠের হাতল দেওয়া পাথরের কুঠার এবং তীরধনুকের প্রচলন ছিল। তখনও পর্যন্ত মানুষ তামা, পিতল, লোহা প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার জানত না, তবে জনযুগে মানুষ সীবন (সেলাই) ও বয়নের ক্ষেত্রে পারদর্শিতা অর্জন করতে শুরু করে। পশুর শিং, চামড়া, শুকনো ফলমূল প্রভৃতি ঐ যুগে সম্পত্তি বলে বিবেচিত হোত। প্রয়োজনবোধে দ্রব্যসামগ্রীর সঙ্গে ঐ সব সম্পত্তির বিনিময়ও তখন চলত। ঐ সময় শিকার ও ফলমূল সংগ্রহের নানা অসুবিধার জন্য মানুষ পশুপালন ও পশুচারণ করতে শুরু করে। কিন্তু বাড়িঘর, চর ইত্যাদির মত পশুও মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না; সেগুলি ছিল সাংঘিক সম্পত্তি অর্থাৎ সংঘের সম্পত্তি। জনযুগের মানুষ আদিম মানুষের মত কাঁচা মাংস খেত না; তারা মাংসকে পুড়িয়ে খেতে শিখেছিল। তারা অরণ্য বা পর্বতের স্বাভাবিক সীমার মধ্যে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাস করত। বসতির স্থায়িত্ব না থাকলেও প্রতিটি গোষ্ঠীর জন্য নির্দিষ্ট বিচরণভূমি ছিল। প্রতিটি জনগোষ্ঠীর বিবাদ-সম্বাদের মীমাংসা করার জন্য পঞ্চায়েত ছিল। অন্য কোন জনগোষ্ঠীর উপর প্রতিশোধ গ্রহণ কিংবা নিজেদের ভূমিরক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ যুদ্ধ করতে অগ্রসর হোত। প্রতি 'জন' বা জনগোষ্ঠীর শাসনতন্ত্র বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা ছাড়াও শীতের 'পোষাক, জ্বালানি ও ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আহার্য সংগ্রহে'র দায়িত্ব পালন করত। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করাও তার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব বলে বিবেচিত হোত। তবে এ সবের জন্য বর্তমান দিনের মত আইন, আদালত, পুলিস প্রভৃতি কিছুই ছিল না, সে সবের কোন প্রয়োজনীয়তাও তখন ছিল না। এঙ্গেলস বলেছেন, সরলতা ও স্বাভাবিকতার দিক থেকে এই জনসংস্থা আশ্চর্যজনক

ছিল। এতে সৈন্য, সিপাই, পুলিস, সর্দার, রাজা, উপরাজা, ম্যাজিস্ট্রেট, জজ, কিছুই ছিল না। জনসংস্থার কোন জেলও ছিল না; দেওয়ানী মোকদ্দমার নাম তখনও লোকে শোনেনি। তবু সব কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হোত। জন, জনতা বা গোষ্ঠী নিজেদের বিবাদবিসম্বাদের মীমাংসা নিজেরাই করত। সংঘের ঘরে তখন বহু পরিবারের ব্যক্তি একসঙ্গে বসবাস করত। তখন ভূমিও সমগ্র গোষ্ঠীর হাতে থাকত। জন, গোষ্ঠী এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য সংস্থা ব্যক্তির নিকট পবিত্র বলে বিবেচিত হোত। সংঘের অনুশাসন ছিল অলঙ্ঘনীয়। প্রাকৃতিক শক্তি, যেমন—সূর্য, আগুন, বিদ্যুৎ, বর্ষা প্রভৃতি মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করত। বর্তমান যুগে সভ্য সমাজে ধর্ম বলতে যা বোঝায় তখন সেরকম কোন বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না। তবে ধর্মের জন্য আবশ্যক ভূমি অর্থাৎ অজ্ঞানতা এবং ভীতি উভয়েই সেই সমাজে বিদ্যমান ছিল।

ক্রমে ক্রমে জনযুগের পরিবর্তে পিতৃসত্তার যুগ আসে। কিন্তু জনসমাজের সাম্যবাদ যে কবে পরিবর্তিত হয়ে পিতৃসত্তা বা পুরুষপ্রধান যুগে উত্তীর্ণ হয় তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে একথা সত্য যে, পিতৃসত্তা যুগের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জনযুগের পরিপূর্ণ অবসান ঘটেনি। এর প্রভাবে ধীরে ধীরে সমাজের রূপান্তর সাধিত হলে জনযুগের পরিসমাপ্তি ঘটে। পিতৃসত্তা যুগের আবির্ভাব সম্পর্কে এঙ্গেলস বলেছেন, "যে নতুন সমাজ এখন জনের স্থান অধিকার করল তা কিন্তু জনের সাহায্য-সহায়তা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে। জনের বাঁচার জন্য এক বা বহু জনের মিলিত সমগোষ্ঠিক সমাজের প্রয়োজন ছিল। উপরন্তু অন্যের অধিকারবর্জিত ভূমি এবং সেই ভূমির উপর জনের একাধিপত্যেরও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কালক্রমে তা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সর্বত্রই এক জনের নির্দিষ্ট ভূমির মধ্যে অন্য জন বা জনসংঘের ব্যক্তিরা এসে বসতি স্থাপন করে। তখনও পর্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহে একটি জন অপর একটি জনকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে; কোন কোন ক্ষেত্রে নরভক্ষণ প্রচলিত থাকায় শত্রুকে শুধু সংহার নয়, একেবারে খেয়েও ফেলেছে; কিন্তু মানুষকে বন্দী করার প্রথা তখনও সৃষ্টি হয়নি। পরবর্তী সময়ে পিতৃসত্তার যুগে দাসত্বের সূত্রপাত হয়, তখন থেকেই শত্রুকে শেষ না করে দাস করা অধিক লাভজনক বলে বিবেচিত হতে থাকে। এর ফলে জনের এক-বংশিকতা আরও নষ্ট হয়ে যায়।"

পিতৃসত্তা যুগ ও তার বৈশিষ্ট্য

পিতৃসত্তা যুগে গৃহশিল্প, পশুপালন, বিনিময় ও কৃষিকার্যের সঙ্গে সঙ্গে ধাতু-শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। এই সময় মানুষ পশুর বহুমুখী উপযোগিতা উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়। এই যুগে পশুপালন শুরু হওয়ার ফলে তা জীবিকার প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। পশুপালন ও পশুচারণের দায়িত্ব পুরুষই বহন করতে হোত বলে গৃহপালিত পশুগুলি তার সম্পত্তিতে পরিণত হয়। তা ছাড়া, পশুর বিনিময়ে প্রাপ্ত জিনিসপত্র, এমন কি দাসদাসীর উপরও পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পুরুষের অধিকৃত হাতিয়ারের সাহায্যে যে দ্রব্যসামগ্রী তৈরি হোত সেগুলির জন্য ব্যয়ের পর উদ্বৃত্ত তথা সঞ্চিত দ্রব্যসামগ্রীও তার দখলে চলে যায়। এইভাবে সব কিছুর উপর,

পিতৃসত্তা যুগে শ্রেণীভেদের উৎপত্তি

এমনকি স্ত্রীলোকের উপরও পুরুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। পিতৃসত্তা যুগে জনসত্তা বিনষ্ট হওয়ার ফলে তদানীন্তন সময়ের সাংঘিক আচার-আচরণগুলি বিলুপ্ত হয়। গোষ্ঠীপিতা সমাজের একক নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এই যুগে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যেমন—পশু, ক্ষেত ও সম্পত্তি অর্জনের অন্যান্য উপাদানসমূহের অধিকাংশই গোষ্ঠীপিতাদের হাতে চলে যায়। সমাজের ভূমিহীন ও পশুহীন মানুষদের তারা অন্নবস্ত্রের বিনিময়ে কাজ করিয়ে নিত। তবে শ্রমের ফল ঐ সব গোষ্ঠীপিতারাই ভোগ করত। এবং ঐ সব শ্রমকে তারা নিজেদের সম্পত্তি বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত করত। শ্রমের উপযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অধিক পরিমাণে শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাই যুদ্ধবন্দীকে পূর্বের মত হত্যা না করে তাদের দাস হিসাবে কাজে লাগানো হয়। এইভাবে বর্বর মানবসমাজের শেষ লগ্নে দাস প্রথার উৎপত্তি ঘটে। ঐ সমাজের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হোল শ্রমের উপজ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি যথেষ্ট পরিমাণে সম্প্রসারিত হওয়ায় সমাজের মধ্যে এক নতুন আমীরশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। তারা আর্থিক শক্তির সাহায্যে রাজনৈতিক শক্তিকে করায়ত্ত করে তাকে বংশগত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে। এইভাবে সমাজে শ্রেণীভেদ সৃষ্টি হওয়ার ফলে নতুন শাসকগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের শ্রেণীশত্রুর মোকাবিলা করতে শুরু করে। সমাজে শ্রেণীভেদ প্রবর্তিত হওয়ার ফলে গোষ্ঠীপিতারা কায়িক শ্রমের পরিবর্তে 'সঙ্গীত-সাহিত্যকলা'য় আত্মনিয়োগ করতে শুরু করে। কিন্তু উৎপাদন শ্রমের দায়মুক্ত সমস্ত ব্যক্তিই যে আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করত তা নয়; বরং তাদের অধিকাংশই অন্যের শ্রমসৃষ্ট জীবিকা ভোগ করে একটি শ্রমবিমুখ সুবিধা-ভোগী শ্রেণীতে পরিণত হয়।

মানবসমাজের ক্রমবিবর্তনের তৃতীয় তথা শেষ স্তর হোল সভ্য সমাজ। সভ্য সমাজ বলতে কোন স্বার্থশূন্য মানবসমাজকে বোঝায় না; বরং এই সমাজে ব্যক্তিস্বার্থ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি মানুষের একটিমাত্র লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে এবং সমাজের সামগ্রিক স্বার্থ উপেক্ষিত হয়েছে। এই সমাজকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা—দাস যুগ, সামন্ত যুগ এবং পুঁজিবাদী যুগ।[1] সভ্য সমাজের পরিবার, রাজনীতি এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে এঙ্গেলস বলেছেন, "সভ্যতার যুগে পরিবারের যে গতি পরিলক্ষিত হয় তাতে একবিবাহ, স্ত্রীর উপর পুরুষের শাসন এবং পূর্বেকার সামূহিক সম্পত্তি বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে বন্টনই হোল এর অন্যতম বিশেষত্ব। সভ্যতাযুগের সমাজে ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের সূত্র হোল রাজ্য এবং তা সব সময় ও সব অবস্থাতেই ছিল বণিক শ্রেণীর রাজ্য—নিপীড়িত ও শোষিতদের আয়ত্তে রাখার জন্য তা একটি যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সভ্যতার অন্য দুটি বৈশিষ্ট্য হোল সামাজিক শ্রমবিভাগের আধারের উপর শহর ও গ্রামের বিরোধ স্থাপন করা এবং সমস্ত সম্পত্তিকে হস্তান্তরিত করার অর্থাৎ অন্যের অধিকারে যাওয়ার ব্যবস্থা করা। এর ফলে সম্পত্তির মূল মালিকের মৃত্যুর পরও তার প্রদত্ত অধিকার বিনষ্ট হয় না। কিন্তু এই অধিকারের

সভ্য সমাজ ও তার বৈশিষ্ট্য

---

1. 'সমাজবিকাশের বিভিন্ন স্তর' নামক অধ্যায়ের 'দাস সমাজব্যবস্থা', 'সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা' এবং 'পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা' শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

স্বীকৃতি জনসংস্থার উপর প্রচন্ড ও প্রত্যক্ষভাবেই আঘাত করে। এথেন্সে সোলোমনের সময় পর্যন্তও এরূপ কোন অধিকার ছিল না ; রোম ও জার্মানিতে এর প্রথম প্রবর্তন ঘটেছিল। ভক্ত জার্মানরা যাতে বিনা বাধায় তাদের সম্পত্তি মঠে দান করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে পুরোহিতরা তা প্রবর্তন করেছিল।"

৪। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Individual and Society)

ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রশ্নে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীনকাল থেকে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রচেষ্টা চলছে। এই প্রচেষ্টার মধ্যে সমকালীন সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে দার্শনিকদের চিন্তা-ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ সমাজের মধ্যেই বসবাস করে। তাই অ্যারিস্টটল মানুষকে 'সামাজিক জীব' বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, সমাজ-বহির্ভূত ব্যক্তি হয় ভগবান, নয় পশু। "মানুষের প্রকৃতি তাকে সামাজিক জীবে পরিণত করেছে। মানুষের মঙ্গল কামনা, তার বৈষয়িক, জৈবিক, আধ্যাত্মিক চাহিদার পরিতৃপ্তি কেবল সমাজজীবনেই সম্ভব। পূর্ণতর জীবনের প্রয়োজনে পরিবার থেকে গ্রাম এবং গ্রাম থেকে নগর-রাষ্ট্রের উদ্ভব। নগর-রাষ্ট্রে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়।" কিন্তু পুঁজিবাদের অবাধ প্রতিযোগিতার যুগে বুর্জোয়া দার্শনিকরা সমাজকে পৃথক ও সম্পর্কহীন ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। হবস্ ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বৈরিতাকে স্বাভাবিক বলে মনে করেছেন। জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছেন, "মানুষ সমাজবদ্ধ জীব হলে অন্য কোন ধাতুতে রূপান্তরিত হয় না।" অর্থাৎ তাঁর মতে সামাজিক জীবন ব্যক্তির মধ্যে কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। এইভাবে বুর্জোয়া তত্ত্বের মধ্যে সামাজিক জীবনে ডারউইনদের 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' (survival of the fittest) ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। বলা বাহুল্য, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দর্শনে ব্যক্তিকে সমাজ-নিরপেক্ষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কের বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন অভিমত

কিন্তু বর্তমান যুগের বুর্জোয়া তাত্ত্বিক ও দার্শনিকরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দর্শনকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারছেন না। তাঁরা সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির নিবিড় সম্পর্কের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সমাজ-বিচ্ছিন্ন মানুষকে তাঁরা এক বিশেষ ধরনের প্রাণী বলে অভিহিত করার পক্ষপাতী। তাঁরা মনে করেন, মানুষের পরিচয় সমাজের মধ্যে থেকেই। ব্যক্তিগতভাবে ব্যক্তির পরিচয় যাই হোক্ না কেন, সমাজবদ্ধ মানুষ হিসেবেই তার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজ-নিরপেক্ষ মানুষের ব্যক্তি হিসেবে কোন স্বতন্ত্র পরিচয় থাকতে পারে না। সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষ রবিনসন ক্রুশো ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের সমাজবহির্ভূত নিঃসঙ্গ জীবন কল্পলোকের বিষয়মাত্র। তাই জার্মান দার্শনিক ফিক্‌টে (Fichte) বলেছেন, সমাজে মানুষের সংস্পর্শে এসে একটি মানুষ 'মানুষে' পরিণত হয়। ম্যাকআইভার ও পেজের মতে, মানুষের চিন্তার উপাদান,

ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক

স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, এমনকি দেহ ও মনের নানা প্রকার ব্যাধির জন্যও মানুষকে সমাজের উপর নির্ভর করতে হয়। সমাজের মধ্যে মানুষের জন্মগ্রহণ সমাজের চরম প্রয়োজনীয়তাকে প্রকাশ করে। জোড (Joad) বলেছেন, মানুষ এমন একটি জীব যে কেবলমাত্র সমাজের মধ্যে থেকে তার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করে না, সে চিরদিনই কোন-না-কোন ধরনের সমাজের মধ্যে বাস করেছে, যদিও তার প্রাথমিক সামাজিক ঐক্যের প্রকাশ ঘটেছে পরিবারের মধ্যে। সুতরাং বলা যেতে পারে সমাজবহির্ভূত মানুষের কাহিনীর কাব্যিক মূল্য থাকলেও ঐতিহাসিক দিক থেকে তার কোন মূল্য নেই। তবে একথা সত্য যে, সমাজ ছাড়া ব্যক্তির কথা যেমন কল্পনা করা যায় না, তেমনি আবার ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমাজের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। মানুষকে নিয়েই সমাজ আর সমাজকে নিয়েই মানুষ।

সমাজ ব্যক্তিজীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। সমাজই মানুষকে সামাজিকীকরণের (socialisation) মাধ্যমে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন করে তোলে অর্থাৎ তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়। ১৯২০ সালে একটি নেকড়ে বাঘের গুহা থেকে অমলা-কমলাকে উদ্ধার করা হয়। এর কিছু দিনের মধ্যেই অমলার মৃত্যু ঘটে। কমলা অবশ্য বেশ কয়েক বছর বেঁচে ছিল। কিন্তু দেখা গেল সে চার পায়ে হাঁটত, বাঘের মত ডাকতো, এমন কি মানুষ দেখলে ভয়ও পেত। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে মানবসন্তান হলেও সামাজিক পরিবেশের অভাবে তার মধ্যে মনুষ্য গুণাবলী বিকশিত হতে পারেনি। অনুরূপভাবে কাস্পার হসারকে ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত নুরেমবুর্গের জঙ্গলে লালন-পালন করা হয়। ১৯২৮ সালে যখন সে শহরের পরিবেশে এল তখন দেখা গেল যে, তার মানসিক গঠন তখনও শিশুর মতই রয়ে গেছে। সে ভালভাবে কথা বলতে পারে না ; এমন কি জড় পদার্থ ও সচেতন জীবের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতেও পারে না। এ সব প্রমাণ করে যে, সমাজ তথা সামাজিক পরিবেশ ছাড়া মানুষ কখনই মানুষ হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পারে না।

কয়েকটি উদাহরণ

তবে সেই সঙ্গে একথাও সত্য যে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয় তার আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। ব্যক্তি তার নিজের প্রয়োজন অনুসারে সামাজিক পরিবেশকে পরিবর্তিত করে নেয়। সামাজিক দিক থেকে ব্যক্তিকে কেবলমাত্র জীবন্ত রক্তমাংসের পিণ্ড বলে ধরে নেওয়া সঙ্গত নয়। কারণ তার একটা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য আছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি সমাজের আর দশজনের মত আচরণ করে না। অবশ্য সে তার ব্যক্তিত্বের দ্বারা অনুমোদিত কর্মপন্থাই অনুসরণ করে। অন্ধের মতো সবকিছুকে অনুসরণ করা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। তাই জিনস্‌বার্গ বলেছেন, যা মানুষকে সামাজিক মর্যাদার উচ্চশিখরে স্থান দিয়েছে তা হোল সমাজের সঙ্গে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সংমিশ্রণ। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অবশ্য সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট হয়। ব্যক্তি যে-সব সহজাত প্রবণতা ও গুণাবলী নিয়ে জন্মগ্রহণ করে সমাজের অনুকূল পরিবেশে থাকলে সেগুলি যথাযথভাবে বিকশিত হতে পারে। ধনবৈষম্যমূলক সমাজে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ-সুবিধা একরকম থাকে না বললেই

সমাজের প্রকৃতি অনুসারে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ

চলে ; থাকলেও তা মুষ্টিমেয়ের জন্য থাকে। সাম্যভিত্তিক সমাজেই ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ-সুবিধা পরিপূর্ণভাবে থাকে। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অংশত সমাজেরই সৃষ্টি। সমাজ যেহেতু পরিবর্তনশীল সেহেতু ব্যক্তির ব্যক্তিত্বও পরিবর্তনশীল। সমাজ সামাজিক বাধানিষেধ আরোপ করে ব্যক্তিকে সঠিক পথে চলতে বাধ্য করে। সুতরাং সমাজই মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনে এবং সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশে সহায়তা করে।

মার্কসবাদে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক

ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ককে কেন্দ্র করে একদিকে মার্কসবাদ এবং অন্যদিকে বুর্জোয়া মতবাদগুলির মধ্যে তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রাম চলছে। মনুষ্য-সংক্রান্ত সমস্যায় মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীর মর্মবস্তুকে বিকৃত করে বুর্জোয়া মতাদর্শবাদীরা বলেন যে, মার্কসবাদ ব্যক্তিমানুষকে অবহেলা করে। কিন্তু এই অভিযোগ আদৌ সত্য নয়। কারণ মানুষ 'সামাজিক সম্পর্কের সমষ্টি' একথা বলে মার্কস জীববিজ্ঞানগত সত্তা হিসেবে মানুষকে অগ্রাহ্য করেননি। মার্কসবাদীরা যা বলেন তা হোল—মানুষের সভ্যতার ইতিহাস ব্যক্তি-মানুষের আকৃতিগত বা প্রকৃতিগত পরিবর্তনের ইতিহাস নয়। মানুষের অগ্রগতি বলতে তাঁরা মনুষ্যত্ব বিকাশের অনুকূল সামাজিক সম্পর্কের অগ্রগতিকে বোঝাতে চেয়েছেন। তবে মার্কস ও মার্কসবাদীরা ফয়েরবাখের নির্বিশেষ মানুষ সম্পর্কিত ধারণাটিকে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁরা মানুষকে আলোচনা করেছেন সমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কষ্টিপাথরে। মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সামাজিক উপাদান-সমূহের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে মার্কস বলেছেন, "মানবতার মর্ম প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিত্বে অন্তর্নিহিত কোন নির্দিষ্ট বস্তু নয় ; এটি হোল সামাজিক সম্পর্কসমূহ থেকে উৎপন্ন সত্তা মাত্র।" মানুষের মধ্যে নানা প্রকার ব্যক্তিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি কিংবা অসাধারণত্বকে স্বীকার করে নিয়েও মার্কসবাদীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ব্যক্তির প্রকৃতি সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবেশ এবং সামাজিক সম্পর্কের দ্বারাই মূলতঃ নির্ধারিত হয়। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে মার্কস বলেছেন, মানুষের প্রকৃতি যেহেতু তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে রূপ পরিগ্রহ করে, সেহেতু এই পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে মানবিকতার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। কোন কোন দার্শনিক মানুষের বিচারক্ষমতা, তার বিশুদ্ধ আদর্শবাদ বা ধর্মকে মানুষের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে গ্রহণ করলেও মার্কসবাদীরা এসবকিছুকেই সমাজ-নির্ভর বলে মনে করেন। সুতরাং বলা যায়, মার্কসবাদের দৃষ্টিতে মানুষের ব্যক্তিত্বের কোন নির্বিশেষ রূপ নেই ; বিশেষ সমাজব্যবস্থার মধ্যেই তা রূপ পরিগ্রহ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পূর্বে স্ত্রীলোকদের ব্যক্তিত্ব নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা কোনরূপ আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করতেন না। কিন্তু বর্তমানে স্ত্রীলোকদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করার কোন অবকাশই নেই। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মার্কসবাদীরা মানুষকে যেমন সামাজিক পরিবেশের মধ্যে রেখে আলোচনার পক্ষপাতী, তেমনি সমাজ থেকে পৃথক করে তার প্রয়োজন, তার যোগ্যতা, তার অভিরুচি, তার ব্যক্তিত্ব ইত্যাদিকেও বিশ্লেষণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ প্রসঙ্গে মার্কসের উক্তিটি স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, মানুষ কেবলমাত্র

সামাজিক প্রাণী নয়. সেই সঙ্গে সে এমন একটি প্রাণী সমাজের মধ্যেই যার স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত সত্তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

৫। ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক বিষয়ক মতবাদ (Theories relating to the relation between Individual and Society)

ব্যক্তি ও সমাজ এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে যুগে যুগে যে আলোচনা হয়েছে তাতে সমকালীন সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে দার্শনিকদের চিন্তাভাবনা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অ্যারিস্টট্ল মনে করতেন যে, মানুষের প্রকৃতি তাকে সামাজিক জীবে রূপান্তরিত করেছে। মানুষের বৈষয়িক, জৈবিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি চাহিদার পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি কেবলমাত্র সমাজজীবনের মধ্যেই সম্ভব। তাই পূর্ণতর জীবনের প্রয়োজনে পরিবার থেকে গ্রাম এবং গ্রাম থেকে নগর-রাষ্ট্রের (City-States) উদ্ভব ঘটেছে। এই ধরনের রাষ্ট্রে মানুষের পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন। লক্ষণীয় বিষয় হোল—"অ্যারিস্টট্লের দর্শনে ব্যক্তিমানুষ সমাজজীবনের সৃষ্টি নয়। ব্যক্তিমানুষের চিন্তা ও চাহিদা সমাজ-নিরপেক্ষ ভাবে তার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য। এ-বৈশিষ্ট্য আছে বলে সমাজজীবনে তার প্রয়োজন। মানুষ সামাজিক জীব, সমাজসৃষ্ট জীব নয়। ব্যক্তি-মানুষের প্রয়োজনে সমাজের উদ্ভব।"

ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক বিষয়ে তিনটি প্রধান মতবাদ প্রচলিত আছে, যথা—ক. সামাজিক চুক্তি মতবাদ (Social Contract Theory), খ. জৈব মতবাদ (Organic Theory) এবং গ. ভাববাদ (Idealism)।

[ক] **সামাজিক চুক্তি মতবাদ** (Social Contract Theory): ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্বন্ধ সম্পর্কিত মতবাদগুলির মধ্যে সামাজিক চুক্তি মতবাদ হোল অন্যতম প্রধান মতবাদ। অনেকে এই মতবাদকে যান্ত্রিক মতবাদ (Mechanistic Theory) বলেও অভিহিত করেন। এই মতবাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হোল—মানুষ স্বেচ্ছায় সমাজ স্থাপন করেছে। তাই ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক সম্পূর্ণ কৃত্রিম বা যান্ত্রিক। খ্রীষ্টজন্মের পূর্ব থেকেই চীন এবং গ্রীসের দার্শনিকগণ সমাজকে কৃত্রিম সংগঠন বলে বর্ণনা করেছেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে চুক্তিবাদী দার্শনিকদের হাতে এই মতবাদ পরিপূর্ণতা লাভ করে।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়

১৬৫১ সালে প্রকাশিত 'লেভিয়াথান' (Leviathan) নামক পুস্তকে হব্‌স বলেন যে, আদিম অবস্থায় কোন সমাজ ছিল না। এই অবস্থায় মানুষ ছিল চরিত্রগতভাবে স্বার্থপর, ক্ষমতালিপ্সু ও আত্মকেন্দ্রিক। স্বাধীনতা-প্রবণতা ও নিজ স্বার্থ সাধন এবং ক্ষমতালিপ্সার জন্য আদিম মানুষের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধবিগ্রহ, কলহবিবাদ, লুঠতরাজ, হত্যা প্রভৃতি লেগেই থাকত। এই প্রাকৃতিক অবস্থায় কোনরূপ আইনকানুন না থাকায় মানুষের জীবন হয়ে উঠেছিল অনিয়ন্ত্রিত—স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর মাত্র। হব্‌সের ভাষায়, প্রাকৃতিক অবস্থায় মনুষ্যজীবন ছিল "নিঃসঙ্গ, দরিদ্র, ঘৃণ্য, পাশবিক এবং স্বল্প স্থায়ী।" আদিম

হব্‌সের অভিমত

মানুষ এইরূপে জীবন থেকে মুক্তিলাভের জন্য নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে সমাজ গঠন করে এবং সমস্ত ক্ষমতা কোনো একজন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের হস্তে অর্পণ করে।

জন্ লকের অভিমত

১৬৯০ সালে প্রকাশিত 'টু ট্রিটিজ অন্ সিভিল গভর্নমেন্ট' নামক গ্রন্থে জন লক্ প্রচার করেন যে, প্রাকৃতিক অবস্থায় সমাজজীবনের অস্তিত্ব ছিল এবং এই অবস্থায় জীবন পরিচালিত হোত যুক্তি ও বিবেকের দ্বারা। প্রাকৃতিক অবস্থায় ব্যক্তি জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতার অধিকার ভোগ করত। কিন্তু মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য যেসব প্রাকৃতিক আইনের অস্তিত্ব ছিল সেগুলি অস্পষ্ট থাকায় এবং সেগুলিকে ব্যাখ্যা ও বলবৎ করার কোনো কর্তৃপক্ষ না থাকায় মানুষ চুক্তির মাধ্যমে সমাজের প্রতিষ্ঠা করল। লকের মতে, চুক্তি হয়েছিল দুটি। একটি চুক্তি জনগণ নিজেদের মধ্যে সম্পাদন করেছিল এবং অপরটি সম্পাদিত হয়েছিল জনগণের সঙ্গে রাজার। প্রথম চুক্তির ফলে সৃষ্ট হয়েছিল প্রকৃত সমাজ এবং দ্বিতীয় চুক্তির ফলে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

রুশোর অভিমত

১৭৬২ সালে প্রকাশিত 'সামাজিক চুক্তি' (Social Contract) নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে রুশো প্রচার করেন যে, আদিম মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বাস করত। তখন মানুষ পরিচালিত হোত তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির দ্বারা; কিন্তু এই প্রবৃত্তি কখনই পাশবিক প্রবৃত্তি ছিল না। রুশোর চিত্রিত প্রকৃতির রাজ্য ছিল মর্ত্যের স্বর্গরূপ। কিন্তু উত্তরোত্তর জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উদ্ভবের ফলে মর্ত্যের স্বর্গ নরকে পরিণত হয়। এই অবস্থায় ধনী-দরিদ্রের মধ্যে সংঘাত, নরহত্যা, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি মানুষের জীবনকে বিষময় করে তোলে। এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতিলাভের জন্য আদিম মানুষেরা চুক্তির মধ্য দিয়ে তাদের সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করল 'সাধারণ ইচ্ছা' (General Will)-র হাতে। এই ভাবে চুক্তির মাধ্যমে সমাজ সৃষ্ট হোল।

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে একটি বিষয় দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সামাজিক চুক্তি মতবাদে প্রকৃতির রাজ্যের যে-ধারণা পাওয়া যায় তাতে ব্যক্তি-মানুষের একটি প্রাক্-সামাজিক বা সমাজ-নিরপেক্ষ জীবনের অবস্থিতির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এই মতবাদে একথাও প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছে যে, বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই মানুষ চুক্তির মাধ্যমে সামাজিক জীবনের সৃষ্টি করেছিল।

সমালোচনা : বর্তমানে নানাদিক থেকে সামাজিক চুক্তি মতবাদটির সমালোচনা করা হয়।

অনৈতিহাসিক মতবাদ

(ক) আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানিগণ সামাজিক চুক্তি মতবাদটিকে অনৈতিহাসিক মতবাদ বলে সমালোচনা করেন। কারণ চুক্তির মাধ্যমে সমাজের সৃষ্টি —একথা ইতিহাস স্বীকার করে না। বস্তুতঃ সমাজ সম্পর্কে চেতনাশূন্য আদিম মানুষ আকস্মিকভাবে কি করে একদিন সমাজ ও রাষ্ট্রের সৃষ্টি করল তা যুক্তিবাদী মানুষের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন।

(খ) তাছাড়া, সমাজবহির্ভূত ব্যক্তির স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনযাপনের কথা কল্পনা করে সামাজিক চুক্তি মতবাদ অযৌক্তিক ও অবাস্তব মতবাদ বলে সমালোচিত হয়। এ

প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে মার্কস বলেছিলেন, মানুষকে সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ করার জন্য চুক্তির প্রয়োজন হয়েছিল—এরূপ ধারণা কাল্পনিক ও অবাস্তব। বস্তুতঃ সমাজজীবনের পূর্বে সামাজিক চুক্তির কল্পনা করা আর ঘোড়ার সামনে গাড়িকে জুড়ে দেওয়া একই ব্যাপার।

অবাস্তব মতবাদ

(গ) এই মতবাদ অনুসারে চুক্তির ফলে সমাজের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু হেনরি মেইন প্রাচীন আইনব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, তদানীন্তন সমাজে মানুষের পদমর্যাদা স্থিরীকৃত হোত জন্মগত অধিকারের ভিত্তিতে—চুক্তি বা প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে নয়। এই অবস্থার বিবর্তনের ক্রম-পরিণতি চুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থা। সুতরাং চুক্তি হোল সামাজিক অগ্রগতির একটি নিদর্শন; সমাজের গোড়াপত্তনের নিদর্শন নয়।

হেনরি মেইনের সমালোচনা

বস্তুতঃ সামাজিক চুক্তি মতবাদ মানুষের প্রকৃতি, বিবর্তনবাদ ইত্যাদির বিরোধী। বিবর্তনবাদ অনুসারে মানুষ ক্রমে ক্রমে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর সমাজগঠন করেছে। এই বিবর্তনের এক অধ্যায়ে সে নিজেকে ব্যক্তি হিসেবে চিন্তা করতে শিখেছে আর তখনই ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সে সমাজগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। কিন্তু এরূপ ধারণা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সংঘবদ্ধতা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। ব্যক্তি ও সমাজ কেউ কারও পূর্ববর্তী বা পরবর্তী নয়। তাই ম্যাকআইভার বলেছেন, আগে সমাজ, না আগে ব্যক্তি—এ প্রশ্ন অবান্তর। কারণ সমাজ ছাড়া ব্যক্তির ধারণা যেমন অবাস্তব, তেমনি ব্যক্তি ছাড়া সমাজের কল্পনাও অবাস্তব। সমাজ ও ব্যক্তি একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

[খ] জৈব মতবাদ (Organic Theory): ব্যক্তি ও সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয়ের বিষয়ে জৈব মতবাদ অন্যতম উল্লেখযোগ্য মতবাদ হিসেবে পরিচিত। এই মতবাদ সমাজ-নিরপেক্ষ ব্যক্তিত্বের ধারণার ঠিক বিপরীত। কোঁত, স্পেনসার, স্পেংগলার, ব্লুন্টস্‌লি প্রমুখ হলেন এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা। জৈব মতবাদ সমাজকে জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করে। এই মতবাদের সমর্থকগণ প্রচার করেন যে, জীবদেহের সঙ্গে তার বিভিন্ন অংশের যে সম্পর্ক, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিরও তেমনি সম্পর্ক। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের এই সম্পর্ক হোল আঙ্গিক সম্পর্ক। জীবদেহ যেমন কতকগুলি কোষের সমবায়ে গঠিত, তেমনি ব্যক্তি হোল সমাজদেহের কোষ। জীবদেহের বিভিন্ন অংশের যেমন কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকতে পারে না, তেমনি সমাজকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিরও কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। জীবদেহ থেকে কোনো একটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা একটি কোষকে বিচ্ছিন্ন করলে যেমন তার মৃত্যু ঘটে, তেমনি সমাজ থেকে ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করলে তারও মৃত্যু ঘটবে। স্পেংগলার মন্তব্য করেন, সমাজদেহের জন্ম, বিকাশ ও ধ্বংসকে প্রাণিদেহের জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করা যায়। ব্লুন্টস্‌লি জীবদেহ এবং সমাজদেহের মধ্যে অভিন্নত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে সামাজিক সংগঠনের মধ্যেও লিঙ্গগত পার্থক্য আছে বলে তিনি মনে করতেন। তিনি 'রাষ্ট্রকে পুরুষ প্রকৃতিসম্পন্ন' এবং 'গীর্জাকে স্ত্রী প্রকৃতিসম্পন্ন' সংগঠন বলে বর্ণনা করেছেন। স্পেনসারের মতে, প্রাথমিক পর্যায়ে মানবদেহ এবং সমাজ উভয়েরই ক্রিয়াকলাপ ছিল খুবই সহজ ও সরল। কিন্তু

জৈব মতবাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়

পরবর্তী পর্যায়ে উভয়ের কার্যই জটিল আকার ধারণ করে। উভয় ক্ষেত্রেই অংশগুলি স্বাধীনভাবে কাজ করে। মানবদেহের অংশ, যেমন—হাত, পা, কান ইত্যাদি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হলেও প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে কাজ করে, অনুরূপভাবে সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও ব্যক্তি নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করে থাকে। জীবদেহের সুস্থতা যেমন সমস্ত অংশের সন্তোষজনক ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে, তেমনি সমাজ-দেহেরও সুস্থতা নির্ভর করে ব্যক্তিবর্গের সন্তোষজনক ক্রিয়াকলাপের উপর।

সমালোচনা ঃ কিন্তু এই মতবাদের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েছে, যথা ঃ

সমাজের সঙ্গে জীবদেহের কিছুদূর পর্যন্ত তুলনা করা গেলেও পুরোপুরি তুলনা করা যায় না। কারণ—১. ব্যক্তি চেতনশীল জীব। তার স্বাধীন ইচ্ছা এবং স্বতন্ত্র সত্তা আছে। কিন্তু সমাজের নিজস্ব কোনো চেতনা বা স্বতন্ত্র সত্তা নেই। ২. জীবদেহ থেকে জীবকোষকে বা কোন একটি অঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করা হলে তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু সমাজদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে না। সুতরাং জীবদেহকে কখনই সমাজদেহের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। ৩. জীবদেহের জন্ম যেমন আছে তেমনি মৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী। জন্মগ্রহণ করলেই জীবদেহকে মৃত্যুমুখে পতিত হতেই হবে। কিন্তু সমাজের মৃত্যু নেই ; আছে পরিবর্তনশীলতা। ৪. একটি জীবের দেহ থেকে অন্য একটি জীবদেহের উৎপত্তি ঘটে। কিন্তু একটি সমাজের গর্ভ থেকে নতুন সমাজের সৃষ্টি নাও ঘটতে পারে। ৫. একটি ব্যক্তি একটি সমাজ ত্যাগ করে অন্য একটি সমাজে স্বেচ্ছায় আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু একটি দেহের কোনো একটি অঙ্গ স্বেচ্ছায় অন্য একটি দেহের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। ৬. অনেক সময় ব্যক্তির স্বার্থ এবং সমাজের স্বার্থ অভিন্ন না-ও হতে পারে। কিন্তু জীবদেহের কোনো একটি অঙ্গের স্বার্থ সমগ্র দেহের স্বার্থবিরোধী হতে পারে না। ৭. সর্বোপরি, এই তত্ত্বে সমাজের উপর ব্যক্তির নির্ভরশীলতাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যাতে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। সমাজের মধ্যে থেকেই মানুষ যে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে স্বীয় ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করতে পারে এবং বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সচেতনভাবে সমাজের পরিবর্তন ঘটাতে পারে—এ সত্যটিকে জৈব মতবাদে অস্বীকার করা হয়েছে।

জীবদেহ ও সমাজদেহ অভিন্ন নয়

তথাপি জৈব মতবাদকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার বা উপেক্ষা করা যায় না। কারণ এই মতবাদে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কথা প্রচার করা হয়। তবে এই সাদৃশ্য খুব বেশী দূর পর্যন্ত টানা যায় না। তাই ম্যাকআইভার ও পেজ বলেছেন, সমাজের সঙ্গে জীবদেহের কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও একমাত্র সেই সাদৃশ্যের ভিত্তিতে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণ করা সমীচীন হবে না।

গুরুত্ব

[গ] **ভাববাদ (Idealism) ঃ** ভাববাদকে অনেকে গোষ্ঠী-চেতনাবাদ (Group-mind Theory) বলেও অভিহিত করেন। ম্যাকডুগাল (McDugall), এস্‌পিনোস (Espinos), ডুর্কহেইম (Durkheim) প্রমুখ মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীগণ

এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা। ভাববাদ বা গোষ্ঠী-চেতনাবাদ অনুসারে, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবেই আধ্যাত্মিক। ভাববাদীরা সমাজকে একটি মন বা বৃহত্তর চেতনারূপে কল্পনা করেন। তাঁদের মতে, সমাজ হোল একটি বৃহত্তর মন। সমাজের সভ্যবৃন্দের মন ছাড়াও সমাজের নিজস্ব একটি অতিরিক্ত মন আছে, যা ব্যক্তিমনের নিছক সমষ্টিমাত্র নয়। ডুর্কহেইমের মতে, সমাজ তার অংশের সমষ্টির তুলনায় বৃহত্তর এবং ব্যক্তিমন ছাড়াও একটি স্বতন্ত্র সামাজিক মনের অধিকারী।

ভাববাদের মূল বক্তব্য

সমালোচনা ঃ ভাববাদের সমর্থক ও প্রচারকেরা ব্যক্তিমন ছাড়াও সমাজের একটি নিজস্ব মন আছে বলে মনে করেন। এই মনকে তারা সামাজিক মন, গোষ্ঠীমন ইত্যাদি নামে অভিহিত করেন। কিন্তু ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমাজের কোন অস্তিত্বই থাকতে পারে না। তাই লিওপোল্ড ভিজে (Leopold Wiese) মন্তব্য করেছেন, কাউকে যখন আমরা ব্যক্তি বলে অভিহিত করি, তখন তাকে 'একক' প্রাণী হিসেবে ধরে নিই। সমাজের ক্ষেত্রেও অনুরূপ কথা প্রযোজ্য। সমাজকে ব্যক্তির সমষ্টি ছাড়া আর কিছু স্বতন্ত্র বলে ধরে নেওয়া ভুল। বস্তুতঃ আলোর সঙ্গে ছায়ার যে সম্পর্ক, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির তেমনি সম্পর্ক। তাই এই মতবাদটিকে ভ্রান্ত মতবাদ বলে অভিহিত করা হয়।

সমালোচনা

ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণের প্রশ্নে পরস্পর-বিরোধী যে তিনটি মতবাদ আলোচনা করা হোল তার কোনটিই এককভাবে ত্রুটিমুক্ত নয়; তাই তা গ্রহণযোগ্যও নয়। প্রথম দু'টি মতের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমেই ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্কের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। অন্যভাবে বলা যায়, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের যে সম্পর্ক তা আঙ্গিক সম্পর্কও নয়, কিংবা যান্ত্রিক সম্পর্কও নয়। ব্যক্তি সমাজের অংশ হলেও জীবদেহের মতো তা সমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নয়। মানুষ স্বেচ্ছায় সচেতনভাবে সমাজগঠন করেনি সত্য; কিন্তু সমাজকে নিজেদের ধ্যানধারণা অনুসারে গড়ে নিয়েছে এবং প্রয়োজনবোধে পরিবর্তিতও করছে। তাই মানুষকে সামাজিক জীব বলে অভিহিত করা হয়।

উপসংহার

৬। রাষ্ট্র ও সমাজ (State and Society)

প্রাচীনকালে রাষ্ট্র ছিল নগর-রাষ্ট্র। তখন সমাজ ও রাষ্ট্রকে অভিন্ন বলে মনে করা হোত। কিন্তু ঐ নগর-রাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে এতটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেনি। আধুনিককালে রাষ্ট্র ও সমাজের ধারণার অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বর্তমানে রাষ্ট্র ও সমাজকে অভিন্ন বলে মনে করা হয় না। সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে বর্তমানে যেসব পার্থক্য নিরূপণ করা হয় তা হোল ঃ

(১) সমাজের পরিধি রাষ্ট্রের পরিধি অপেক্ষা বেশী ব্যাপক। সমাজ কর্তৃক মানুষের সামগ্রিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু মানুষের সমগ্র জীবন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। রাষ্ট্র সমাজের অন্তর্গত অনেকগুলি সংঘের মধ্যে একটি সংঘমাত্র।

পরিধিগত পার্থক্য

(২) জন্মের দিক থেকেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয়।

জন্মগত পার্থক্য

সৃষ্টির বহু পূর্ব থেকেই সমাজের অস্তিত্ব ছিল। সমাজবিবর্তনের বিশেষ একটি স্তরে সমাজের গর্ভ থেকেই রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

(৩) রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলির মধ্যে সরকার হোল অন্যতম। সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যসমূহ কার্যকর হয়। কিন্তু সমাজের এরূপ কোন সরকার বা শাসনযন্ত্র নেই।

সরকার সংক্রান্ত পার্থক্য

নির্দিষ্ট ভূখণ্ড সংক্রান্ত পার্থক্য

(৪) নির্দিষ্ট ভূখন্ড রাষ্ট্রের অন্যতম উপাদান। নির্দিষ্ট ভূখন্ড ছাড়া রাষ্ট্রের কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু এরূপ নির্দিষ্ট কোন ভূখন্ড না থাকলেও সমাজ গড়ে উঠতে পারে।

(৫) সার্বভৌমিকতা হোল রাষ্ট্রের উপাদানগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সার্বভৌমিকতা ছাড়া রাষ্ট্রকে রাষ্ট্র বলে অভিহিত করা যায় না। কিন্তু সার্বভৌমিকতা ছাড়াই সমাজের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

সার্বভৌমিকতা সংক্রান্ত পার্থক্য

(৬) সমাজ হোল মানুষের স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত সংগঠনসমূহের সমষ্টি। কিন্তু রাষ্ট্র হোল বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আবশ্যিক সংগঠন। সমাজের রীতিনীতি বা প্রথাসমূহকে উপেক্ষা করলে সমাজের ধিক্কার বা নিন্দা ছাড়া কোনরূপ দৈহিক শাস্তি পেতে হয় না। কিন্তু রাষ্ট্রের আইন অমান্য বা উপেক্ষা করলে দৈহিক শাস্তি পেতে হয়।

সামাজিক রীতিনীতি ও আইনের মধ্যে পার্থক্য

(৭) রাষ্ট্র কেবলমাত্র মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণকেই নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু সমাজ মানুষের বাহ্যিক, নৈতিক, মানসিক, ধর্মীয় ইত্যাদি সামগ্রিক জীবনকেই নিয়ন্ত্রিত করে। তাই ম্যাকআইভার বলেছেন, রাষ্ট্রকে সমাজ এবং সমাজকে রাষ্ট্র বলে গ্রহণ করলে ভুল করা হবে। বার্কারের মতে, সমাজ ও রাষ্ট্র পারস্পরিক সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ সন্দেহ নেই, কিন্তু এরা একই কাজ একইভাবে এবং একসঙ্গে করে না। বস্তুতঃ গঠন, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতিগত দিক থেকে রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তাই ল্যাস্কি মন্তব্য করেছেন, রাষ্ট্র সমাজজীবনের মূল সূত্র নির্ধারণ করে দিলেও রাষ্ট্র এবং সমাজজীবন এক নয়।

কর্মগত ভিন্নতা

কিন্তু একথাও সত্য যে, রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আমরা তিনদিক থেকে এই সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি।

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

[ক] সমাজের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে রাষ্ট্র অন্যতম প্রতিষ্ঠান হলেও একমাত্র রাষ্ট্রই সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী। এই কর্তৃত্ব অন্য কোন সামাজিক সংগঠনের নেই। তবে সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি ইত্যাদিকে উপেক্ষা করে রাষ্ট্র নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না। মানুষের রাজনৈতিক জীবনের উপর প্রচলিত সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি ইত্যাদির প্রভাবও কম নয়। এদিক থেকে বিচার করে বলা যায় যে, সমাজ যেমন রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে তেমনি আবার রাষ্ট্রও সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বর্তমান।

উভয়ে উভয়কে নিয়ন্ত্রণ করে

[খ] উদ্দেশ্যগত দিক থেকে রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র মানুষের কল্যাণময় জীবনের প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে ব্যক্তিজীবনের উপর বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করে। অন্যায় ও অসামাজিক ক্রিয়াকলাপকে নিবারণ করার জন্য রাষ্ট্রকর্তৃত্ব প্রযুক্ত হয়। অনুরূপভাবে সমাজের লক্ষ্যও মানুষের জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলা। তাই সমাজ কতকগুলি সামাজিক বিধি বা নিয়ম সৃষ্টি করে সমাজবদ্ধ মানুষের আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্যের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দেশ্যগত ক্ষেত্রে সাদৃশ্য

[গ] রাষ্ট্রীয় আইন সাধারণভাবে সমাজের ন্যায়নীতিবোধের বিরোধী হতে পারে না। সুদীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় আইন প্রণীত হয়। রাষ্ট্রীয় আইন যদি সামাজিক স্বার্থের বিরোধী হয় তাহলে সমাজ রাষ্ট্রকে চাপ দিয়ে সেই আইন পরিবর্তনে বাধ্য করে। অনুরূপভাবে আইনও অকল্যাণকর সামাজিক প্রথাগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করে ন্যায়নীতিবোধের প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এদিক থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান বলে মন্তব্য করা যেতে পারে।

আইন ও নীতির সম্পর্ক

যদিও রাষ্ট্রের মাধ্যমে সমাজের সঠিক রূপ প্রতিফলিত হয় না, তথাপি একথা সত্য যে, রাষ্ট্রের মাধ্যমে সামাজিক শক্তির প্রতিফলন দেখা যায়। সমাজের উপর ভিত্তি করেই রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। তাই সমাজের প্রকৃতি নিশ্চিতভাবেই রাষ্ট্রীয় প্রকৃতিকে নির্ধারিত করে। দাসসমাজে রাষ্ট্র দাসমালিকদের, সামন্তসমাজে রাষ্ট্র সামন্তদের, বুর্জোয়া সমাজে রাষ্ট্র পুঁজিপতিদের এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্র সর্বহারাশ্রেণীর স্বার্থে কাজ করে। সুতরাং রাষ্ট্র কখনই এবং কোনভাবেই সমাজনিরপেক্ষ হতে পারে না।

উপসংহার

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমাজবিকাশের বিভিন্ন স্তর এবং রাষ্ট্র

[Stages of Social Development and the State]

১। ভূমিকা (Introduction)

সমাজবিকাশের ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট পর্যায়কে সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে অভিহিত করা যায়। সমাজবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করলে মূলতঃ পাঁচ প্রকার সমাজব্যবস্থার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করা যায়, যথা—ক. আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা, খ. দাস-সমাজব্যবস্থা, গ. সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, ঘ. পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা এবং ঙ. সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। প্রতিটি জনগোষ্ঠী তার অস্তিত্বের নির্দিষ্ট পর্বটিতে সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের মাত্রা অনুসারে এর কোন-না-কোন ব্যবস্থার অন্তর্গত। সমাজ-বিকাশের যে-কোন পর্যায়ে মানবিক সমাজজীবনের ভিত্তি হোল বৈষয়িক সম্পদের উৎপাদন। উৎপাদন ব্যবস্থাকে বলা হয় সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদ। অন্যভাবে বলা যায়, বনিয়াদ হোল বিকাশের নির্দিষ্ট স্তরে সমাজের অর্থনৈতিক গঠন। বনিয়াদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে উপরি-কাঠামো (Super-structure)। সৈন্যবাহিনী, আদালত, কারাগার রূপে বলপ্রয়োগের সবকিছু হাতিয়ার সমেত রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক, আইনগত, নৈতিক, নান্দনিক, ধর্মীয় ও দার্শনিক প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে অভিব্যক্ত বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠীর ভাবাদর্শ এই উপরি-কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত। বনিয়াদ ও উপরি-কাঠামো সম্মিলিতভাবে প্রতিটি সমাজব্যবস্থায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত করে। বনিয়াদে প্রকাশ পায় ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভিত্তি, আর উপরি-কাঠামোতে প্রকাশিত হয় তার রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত রূপ। সুতরাং সামাজিক ব্যবস্থাগুলির মধ্যে ভিন্নতা আসে তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর ভিন্নতা থেকে। একটি সমাজব্যবস্থা থেকে অন্য একটি সমাজব্যবস্থার উত্তরণের সময় বনিয়াদ ও উপরি-কাঠামোতে পরিবর্তন সূচিত হয়, পুরাতন সমাজের গর্ভ থেকেই নতুন সমাজব্যবস্থা জন্মগ্রহণ করে। স্তালিন (Stalin)-এর মতে "যুগের পরিবর্তনকে বিচার করতে হবে সেই যুগের উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব দিয়ে।"

বনিয়াদ ও উপরি-কাঠামোর সমন্বয়ে সামগ্রিক সমাজ গড়ে উঠে

২। আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা (Primitive Communal System)

মার্কসীয় তত্ত্ব অনুসারে, সমাজবিকাশের ইতিহাসে প্রথম সমাজব্যবস্থাকে আদিম সাম্যবাদী সমাজ (Primitive Communal Society) বলে অভিহিত করা হয়। মাতার রক্তের সম্বন্ধের ভিত্তিতে আদিম বন্য মানুষ দলবদ্ধভাবে সংগঠিত হওয়ার ফলে গোষ্ঠী প্রথার উদ্ভব হয়। মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন নানা প্রকার দ্রব্যের, যেমন—খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদি। মানুষ নিজের শ্রমের দ্বারা সে সবই সংগ্রহ করত। প্রকৃতির

আদিম সাম্যবাদী সমাজের প্রকৃতি

কাছ থেকে শ্রমের দ্বারা সে সংগ্রহ করত ফলমূল, মাছমাংস ইত্যাদি যা তার ক্ষুন্নিবৃত্তি করত। আবার শ্রমশক্তিকে কাজে লাগিয়ে সে ডাল, লতাপাতা ইত্যাদি সংগ্রহ করে নিরাপদ আশ্রয় তৈরি করত, শ্রম করে পাথর সংগ্রহ করে তা থেকে আত্মরক্ষার উপযোগী অস্ত্র নির্মাণ করত। সেই পাথরনির্মিত অস্ত্র দিয়ে শিকার করে সে আহার সংগ্রহ করতে থাকে। এই সমাজে স্বাভাবিক শ্রমবিভাগ ছিল। প্রকৃতিগতভাবে পুরুষদের অপেক্ষা দুর্বল হওয়ায় স্ত্রীলোকদের গৃহস্থালির কাজ, সন্তান লালনপালন ইত্যাদি কম-শ্রমসাধ্য কাজ করতে হোত। কিন্তু শ্রমসাধ্য কাজগুলি সম্পাদন করতে হোত পুরুষদের। সুতরাং আদিম অবস্থায় প্রাকৃতিক বস্তু ও শক্তির উপর শ্রম প্রয়োগ করে মানুষ তার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করত। এই প্রক্রিয়ার নাম উৎপাদন (Production)। এই অবস্থায় প্রকৃতি এবং শ্রমশক্তি ছিল উৎপাদনের প্রধান উপাদান (Factors of Production)। কিন্তু শুধু শ্রম করলেই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগৃহীত হোত না। প্রাকৃতিক বস্তু ও শক্তির উপর সার্থকভাবে শ্রম প্রয়োগ করার মত জ্ঞানেরও প্রয়োজন ছিল। এই শ্রমশক্তি এবং প্রকৃতির উপর তাকে প্রয়োগ করার কলাকৌশল ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির মিলিত শক্তিকেই উৎপাদন-শক্তি (Productive-force) বলা হয়। প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধি, উপাদানের কলাকৌশলগত উন্নতি এবং যন্ত্রপাতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন-শক্তির যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। মানুষ একা উৎপাদন করতে পারে না। তারা সমাজবদ্ধভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে থাকে। মানুষের এই উৎপাদনভিত্তিক সম্পর্ককে উৎপাদন-সম্পর্ক (Production-relation) বলা হয়। আবার উৎপাদন-সম্পর্ক স্থিরীকৃত হয় উৎপাদনের উপাদানসমূহের মালিকানার ভিত্তিতে। উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তনের ফলেই সমাজ বিকশিত হয়েছে।

আদিম সাম্যবাদী সমাজে উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতির স্বরূপ

আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় উৎপাদন-শক্তি ছিল অত্যন্ত অনুন্নত। প্রাকৃতিক বস্তু ও শক্তিগুলি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এই অনুন্নত উৎপাদন-শক্তির সাহায্যেই মানুষ জীবনযাপনের উপযোগী দ্রব্যাদি সংগ্রহ করত। উৎপাদন-শক্তি অনুন্নত থাকায় কখনই আদিম মানুষ নিজেদের প্রয়োজনমত দ্রব্যাদি উৎপাদন করতে পারত না। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করতেই তাদের সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হোত। এই অবস্থায় উদ্বৃত্ত উৎপাদনের প্রশ্ন ছিল অবান্তর। মার্কসের মতে, আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় উৎপাদন-সম্পর্কের মূল ভিত্তি ছিল—উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর সমগ্র সমাজের মালিকানা। এটা মূলতঃ সেই আমলের উৎপাদন-শক্তির চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। পাথরের হাতিয়ার এবং পরবর্তীকালে তীরধনুক নিয়ে একাকী ব্যক্তিগতভাবে প্রাকৃতিক শক্তি ও হিংস্র প্রাণীদের মোকাবিলা করা অসম্ভব ছিল। বন্য ফল সংগ্রহ করতে, মাছ ধরতে, যে-কোন প্রকার বাসস্থান তৈরি করতে মানুষ একসঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করতে বাধ্য ছিল। তা না হলে তাকে অনাহারে মরতে হোত কিংবা হিংস্র বন্য পশু বা প্রতিবেশী গোষ্ঠীর শিকার হতে হোত। এক সঙ্গে শ্রম করা, উৎপাদনের উপাদানের যৌথ মালিকানা—ইত্যাদি উৎপন্ন দ্রব্যে যৌথ মালিকানাই নির্দেশ করে। উৎপাদনের উপাদানে ব্যক্তিগত

মালিকানার রীতি তখনও প্রচলিত হয়নি। হিংস্র পশুর আক্রমণ থেকে তৎক্ষণাৎ নিজেকে রক্ষা করার জন্য কয়েকটি মাত্র হাতিয়ার প্রত্যেকের থাকত। সেখানে কোন শ্রেণীবিভেদ ছিল না ; ছিল না কোন শোষণের অস্তিত্ব। বলা বাহুল্য, সেই সমাজে শ্রেণীশাসন এবং শ্রেণীশোষণ না থাকায় শ্রেণীশাসনের হাতিয়ার হিসেবে রাষ্ট্রেরও কোন অস্তিত্ব ছিল না। গোষ্ঠীপ্রধান এবং নারীদের কর্তৃত্ব ও মর্যাদাই ছিল সমাজের অনুশাসন। সমাজে শান্তিশৃংখলা রক্ষা করা এবং উৎপাদনব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার দায়িত্ব তাদেরই হাতে ন্যস্ত ছিল। গোষ্ঠীর প্রত্যেকেই সশস্ত্র থাকত—তাই তখন পৃথক কোন সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা ছিল না।

আদিম সাম্যবাদী সমাজের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হোল :

আদিম সাম্যবাদী সমাজের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

(১) তখন উৎপাদন-শক্তি ছিল অত্যন্ত অনুন্নত। উৎপাদনের হাতিয়ারগুলি মূলতঃ পাথর কিংবা কাঠের দ্বারা নির্মিত হোত।

(২) উৎপাদনের উপাদানগুলির মালিকানা বিশেষ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে না থেকে তা সামগ্রিকভাবে সমাজের হাতে থাকত। সবাই এক সঙ্গে শ্রম করত এবং শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত খাদ্যসামগ্রী সকলেই ভাগ করে খেত।

(৩) সমাজের মধ্যে শ্রেণীভেদ না থাকায় কোন প্রকার শ্রেণীশোষণ ও শ্রেণীশাসনের অস্তিত্ব ছিল না।

(৪) সমাজে স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সবাই সমমর্যাদার অধিকারী ছিল। স্ত্রীলোকের উপর পুরুষের কর্তৃত্ব বা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল না।

(৫) শ্রেণীদ্বন্দ্ব না থাকায় এই সমাজে শ্রেণীশাসনের হাতিয়ার হিসেবে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না। প্রতিটি গোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্য সশস্ত্র থাকায় কোন পৃথক সৈন্য-বাহিনীর প্রয়োজনীয়তাও ছিল না।

৩। দাস-সমাজব্যবস্থা (The Slave System)

সমাজবিকাশের পরবর্তী পর্যায়ে মানুষের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আসে। এশিয়াতে বসবাসকারী আদিম মানুষ ক্রমে ক্রমে বন্য পশুকে পোষ মানিয়ে নিজেদের প্রয়োজনে লাগাতে সক্ষম হয়। মার্কসের ভাষায়, "বন্য পশু পোষ মানানো এবং পরে গবাদি পশু প্রজনন ও প্রতিপালন—এগুলি আর্য, সেমেটিক ও সম্ভবতঃ তুরানীদের মূল পেশা হয়ে দাঁড়াল। পশুপালক-উপজাতিগুলি সাধারণ বর্বরদের থেকে পৃথক হয়ে পড়ল। এইটিই হচ্ছে প্রথম বিরাট সামাজিক শ্রমবিভাগ।" পশুপালক-উপজাতিগুলি ক্রমান্বয়ে পশুর চামড়া ও লোম থেকে পোশাক-পরিচ্ছদ, তাঁবু ইত্যাদি তৈরি করতে সক্ষম হোল। এমন কি তারা ধাতু আবিষ্কার করল এবং ধাতুনির্মিত অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্মাণ করতে সমর্থ হোল। এই সব উপজাতি নিজেদের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করতে থাকল। লক্ষণীয় বিষয় হোল—পশুপালনকারী উপজাতিগুলির উৎপাদন ব্যবস্থার পাশাপাশি কিন্তু পশুপালনহীন অনুন্নত উপজাতিগুলির উৎপাদন ব্যবস্থা চলতে থাকে। শিকারের উপর নির্ভরশীল অনুন্নত উপজাতিগুলি

দাস-সমাজব্যবস্থার উৎপত্তি

পশুপালনকারী উপজাতিগুলির উদ্বৃত্ত ভোগ্যদ্রব্যাদি নিজেদের শিকার করা মাংস, পশুচর্ম ইত্যাদির বিনিময়ে সংগ্রহ করত। এইভাবে সমাজে বিনিময় প্রথা চালু হয়। তবে কোন কিছু দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য কোন দ্রব্য গ্রহণের এই ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত অনিয়মিত এবং বিনিময় ব্যবস্থা চলত গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে। কিন্তু কালক্রমে প্রতিটি গোষ্ঠীর যৌথ সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্কসের মতে, "গোষ্ঠীর সাধারণ সম্পত্তি থেকে পশুদলগুলি কখন ও কিভাবে প্রতিটি পরিবারের কর্তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে গেল, আজ পর্যন্ত তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু তা প্রধানতঃ এই স্তরেই হয়েছিল। পশুদল এবং অন্যান্য নতুন নতুন সম্পদের অধিকার পরিবারগুলিতে এক বিপ্লবের সূচনা করল।" গোষ্ঠীর যৌথ সম্পত্তির পরিবর্তে পরিবারের ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ঘটায় বিনিময়-ব্যবস্থার মধ্যেও পরিবর্তন সূচিত হোল। যৌথ বিনিময়ের পরিবর্তে ব্যক্তিগত বিনিময়-ব্যবস্থা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হোল।

ইতিমধ্যে মানুষ কৃষিচারণ যুগে গিয়ে উপনীত হয়। শুরু হোল নিয়মিত চাষবাস। সেইসঙ্গে মানুষ সোনা, রুপা, তামা প্রভৃতি ধাতুনির্মিত যন্ত্র, অস্ত্র, অলঙ্কার ইত্যাদির ব্যবহার করতে শিখেছে। প্রকৃতিকে কাজে লাগিয়ে সে উৎপাদনের ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন সাধন করতে সমর্থ হয়েছে। "পশুপালন, কৃষি, গার্হস্থ্য শিল্প প্রভৃতি উৎপাদনের সমস্ত শাখায় উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে মানুষের শ্রমশক্তি তার অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনের চেয়ে বেশী উৎপাদন করতে লাগল। আবার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গোষ্ঠী, গোত্র বা একক পরিবারের প্রতিটি সভ্যের দৈনিক কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল। ফলে, আরো অধিক শ্রমশক্তির প্রয়োজন দেখা দিল।" কিভাবে এই শ্রমশক্তি পাওয়া যায় তা নিয়ে মানুষ ভাবতে শুরু করল। একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তির সমান মর্যাদা থাকার ফলে সেই গোষ্ঠীর কাউকে দিয়ে অতিরিক্ত কাজ করিয়ে নেওয়া তখন সম্ভব ছিল না; অথচ প্রচলিত উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল।

শেষ পর্যন্ত মানুষ স্থির করল যে, একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর যুদ্ধবিগ্রহের সময় যুদ্ধবন্দীদের কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে। পূর্বে যুদ্ধবন্দীদের বিনিময় করা হোত কিংবা বিতাড়ন করা বা হত্যা করা হোত। এইভাবে বিজয়ীদের স্বার্থে উৎপাদনের কাজে বিজিতদের নিয়োগ করার নিয়ম সমাজে স্বীকৃতিলাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ভব হয় দাস-প্রথার। স্তালিনের মতে, "সাধারণ ঐতিহাসিক অবস্থায় প্রথম বিরাট সামাজিক শ্রমবিভাগ শ্রমের উৎপাদন-শক্তি বাড়িয়ে তুলল অর্থাৎ সম্পদ বৃদ্ধি করল। আর সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে অনিবার্যভাবে দাসপ্রথাকে তার পিছু পিছু টেনে নিয়ে এল। এই প্রথম বিরাট সামাজিক শ্রমবিভাগ থেকেই সূচনা হল প্রথম বিরাট সমাজবিভাগ। সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ল দুটি শ্রেণীতে: দাস-মালিক ও দাস—শোষক ও শোষিত।" ইতিমধ্যে হস্তশিল্প, কৃষি ইত্যাদির উৎপাদনে লোহার ব্যবহার উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপ্লব আনল। কিন্তু উৎপাদনের সব শাখার উপর ব্যক্তির পক্ষে এককভাবে লক্ষ্য রাখা সম্ভব ছিল না। তাই নতুন করে

দাস সমাজব্যবস্থায় শ্রেণীশোষণের সূত্রপাত

শ্রমবিভাগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এই শ্রমবিভাগের ফলে কিছু সংখ্যক মানুষ কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করল। অবশিষ্টরা শিল্পজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনে মনোনিবেশ করল। স্তালিন বলেছেন, "উৎপাদন-ব্যবস্থা কৃষি ও হস্তশিল্প —এই দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ায় বিনিময়ের জন্য উৎপাদন অর্থাৎ পণ্য উৎপাদন শুরু হল। এর সঙ্গে সঙ্গে এল ব্যবসাবাণিজ্য আর তা শুধু নিজেদের দেশে এবং গোষ্ঠীর সীমানার মধ্যেই নয়, বিদেশেও। অবশ্য এইসব তখন ছিল অপরিণত অবস্থায়।" এতদিন পর্যন্ত দাসরা উৎপাদনের সাহায্যকারী হিসেবেই কাজ করত। কিন্তু এরপর তাদের প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন কার্যে নিয়োগ করা হোল। দাস-মালিকদের খামারে দাসদের সারাদিন কাজ করতে হোত। বিনিময়ে তারা খেতে পেত। এই ব্যবস্থায় দাসদের অমানুষিক পরিশ্রম করতে হোত; কিন্তু দাস-মালিকদের শ্রম করতে হোত না। এইভাবে দাস ব্যবস্থায় পরশ্রমভোগী দাস-মালিকরা বিলাসব্যসনে দিন কাটাত। তারা হোল শোষক শ্রেণী আর দাসরা হোল শোষিত শ্রেণী। ইতিহাসে দাস ব্যবস্থায় সর্বপ্রথম শ্রেণীশোষণের সূত্রপাত হয়।

দাস-সমাজব্যবস্থায় উৎপাদন-সম্পর্কের ভিত্তি ছিল—দাস-মালিক উৎপাদনের সমস্ত উপাদানের মালিক, এমন কি উৎপাদনকারী অর্থাৎ দাসদেরও মালিক। "এইরূপ উৎপাদন-সম্পর্ক সে যুগের উৎপাদন-শক্তির প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। পাথরের হাতিয়ারের পরিবর্তে এখন ধাতুনির্মিত হাতিয়ার রয়েছে। পশুপালন ও চাষবাসে অনভিজ্ঞ শিকারী মানুষের নগণ্য ও আদিম গৃহস্থালীর পরিবর্তে প্রচলিত রয়েছে পশুপালন, চাষবাস ও হস্তশিল্প। আবার, এই সব উৎপাদন ব্যবস্থায় দেখা দিয়েছে শ্রমবিভাগ। বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে বিনিময় এবং তার ফলে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে সম্পদ সঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। উৎপাদন কাজে সমাজের সব সভ্যকে একযোগে ও স্বাধীনভাবে কাজ করতে এই যুগে আর দেখা যায় না। কর্মবিমুখ দাস-মালিক কর্তৃক শোষিত দাসদের দিয়ে জোর করে কাজ করিয়ে নেওয়াই ঐ সময় প্রচলিত ছিল। সুতরাং এখানে উৎপাদনের উপাদান ও উৎপন্ন দ্রব্যের উপর আর যৌথ মালিকানা নেই। ব্যক্তিগত মালিকানা তার স্থান দখল করেছে। দাস মালিকই প্রকৃত অর্থে প্রথম ও প্রধান সম্পত্তিবান।" দাস-মালিকেরা গরু-বাছুর-ছাগল-ভেড়ার মতই দাসদের ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য হিসেবে ব্যবহার করত। এমন কি গবাদি পশুর সঙ্গেও তাদের বিনিময় করা হোত। দাস-মালিকরা খুশীমতো দাসদের নৃশংসভাবে হত্যা পর্যন্ত করতে পারত। অনেক সময় বলদের পরিবর্তে দাসদের লাঙ্গল টানতে, বোঝা বহন করতে বাধ্য করা হোত। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাদের অমানুষিক পরিশ্রম করতে হোত। বিনিময়ে দিনান্তে একবারও তাদের পেট ভরে খাবার দেওয়া হোত না। একজন মালিকের থাকত বহুসংখ্যক দাস। তাদের পরিচালনা করার জন্য দাস-মালিকরা সশস্ত্র পাইক-বন্দুকদাজ নিয়োগ করত। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হোত। তারপর যাতে তারা পালিয়ে যেতে না পারে সেজন্য তাদের দড়ি দিয়ে বেঁধে কর্মক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হোত। সেখানে মাটি কাটা, লাঙল টানা বা পাথর ভাঙা, পাথর বহন, জল তোলা ইত্যাদি কঠিন

দাস-ব্যবস্থায় উৎপাদন-সম্পর্কের ভিত্তি

পরিশ্রম করতে হোত। বিন্দুমাত্র বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ তাদের দেওয়া হোত না। পরিশ্রান্ত হলে এক মুহূর্ত বিশ্রাম গ্রহণের শাস্তি হিসেবে বেত্রাঘাত ছিল তাদের সর্বনিম্ন পাওনা। এরূপ অমানুষিক অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পালিয়ে গিয়েও দাসরা রেহাই পেত না। কারণ তাদের প্রত্যেকের গলায় ঝুলত মালিকের নাম লেখা ফলক। পাইক, বরকন্দাজরা পলাতক দাসদের জোর করে ধরে এনে পুনরায় তার মালিকের হাতে অর্পণ করত। পলায়নের অপরাধে তাদের অধিকতর কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হোত। অনেক সময় এই অপরাধে তাদের মৃত্যুদন্ডও প্রদান করা হোত।

দাসসমাজে শ্রেণীসংগ্রাম

সুদীর্ঘকাল ধরে দাসরা এই অত্যাচার নীরবে সহ্য করতে পারেনি। তাই কখনও কখনও তারা এককভাবে, কখনও বা সম্মিলিতভাবে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। এমনকি অনেক সময় সমবেতভাবে তারা সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বেছে নিয়েছে। স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে রোমে দাস-বিদ্রোহের ইতিহাস বর্তমানে সকলেরই জানা। তাছাড়াও সিসিলি, স্পেন, ম্যাসিডন, গ্রীস প্রভৃতি দেশে প্রায় একই সময়ে দাস-বিদ্রোহ শুরু হয়। তারপর খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী থেকে রোম সাম্রাজ্যের সমগ্র পশ্চিমাংশে বাগাউদে-আন্দোলন (the movement of the Bagaudae) এবং উত্তর আফ্রিকার ডোনাটিস্ট আন্দোলন (the Donatist movement) দাস-বিদ্রোহের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ঐসব বিদ্রোহ রোম সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল। অবশ্য এই সশস্ত্র বিদ্রোহকে অত্যাচারের স্টীম-রোলার চালিয়ে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে দাস-সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্ব ক্রমশঃ চরম আকার ধারণ করে।

শোষণের হাতিয়ার হিসেবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি

মার্কসের ভাষায়, "ধনী ও দরিদ্র, শোষক ও শোষিত, সম্পূর্ণ অধিকারসম্পন্ন ও অধিকারহীন এবং তাদের মধ্যে কঠিন শ্রেণীদ্বন্দ্ব—এই হোল দাস-ব্যবস্থার চিত্র।" দাস-মালিকরা তাদের শ্রেণীশাসন ও শ্রেণীশোষণ অব্যাহতভাবে চালাবার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করে। সুতরাং বলা যায়, দাস-সমাজে সর্বপ্রথম সমাজের প্রয়োজনে সমাজের মধ্য থেকেই শোষণের হাতিয়ার হিসেবে রাষ্ট্রযন্ত্রের জন্ম হয়। প্রচলিত উৎপাদন-সম্পর্ককে রক্ষা করা ছাড়া রাষ্ট্রের অন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্য নেই। শোষক দাস-মালিকরা নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে রাষ্ট্রক্ষমতাকে রেখে সংখ্যাগরিষ্ঠ দাসদের নির্মমভাবে শোষণ করতে থাকে।

সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস ও শ্রেণীশোষণের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পরিবারের প্রকৃতিও পরিবর্তিত হোল। স্তালিনের মতে, "বন্য যোদ্ধা ও শিকারী পুরুষ গৃহে নারীর প্রাধান্য মেনে নিয়ে সেখানে দ্বিতীয় স্থান দখল করেই সন্তুষ্ট থাকত। 'নম্রতর স্বভাবের' পশুপালক সম্পদের অধিকারের স্পর্ধায় নিজেই প্রথম স্থান দখল করে নিল। নারীকে ঠেলে দিল দ্বিতীয় স্থানে; কিন্তু নারী প্রতিবাদ করতে পারেনি। আগে পরিবারের মধ্যকার শ্রমবিভাগ দিয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে সম্পদের অংশ স্থির হোত। সেই শ্রমবিভাগ ঠিকই রয়ে গেল; অথচ পরিবারের বাইরের শ্রমবিভাগের পরিবর্তন পারিবারিক সম্পর্ককে ওলট-পালট করে দিল।" দাস-ব্যবস্থাতেই সর্বপ্রথম নারীর উপর পুরুষের প্রাধান্য বিস্তার শুরু হয়।

দাস-সমাজব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলিকে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে : (ক) দাস-সমাজব্যবস্থাতেই দাস-মালিক ও দাস অর্থাৎ শোষক ও শোষিতের ভিত্তিতে সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হয়ে পড়ে। শ্রেণীশোষণের সূত্রপাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রেণীদ্বন্দ্ব শুরু হয়।

দাস-সমাজব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

(খ) "এই ব্যবস্থাতেই সর্বপ্রথম পরশ্রমভোগী বিলাসী কর্মবিমুখ শোষকশ্রেণীর জন্ম হয়। সেই শ্রেণী হোল দাস-মালিক।"

(গ) এই সমাজব্যবস্থাতে দাস-মালিকরা উৎপাদনের উপাদানগুলির, এমনকি উৎপাদনকারী দাসদের মালিক হয়ে উঠে। সর্বপ্রকার উৎপাদিত সামগ্রীর উপর কেবলমাত্র দাস-মালিকদের অধিকার স্বীকৃতিলাভ করে।

(ঘ) "এই ব্যবস্থাতেই শ্রেণীশাসন ও শ্রেণীশোষণ বজায় রাখার যন্ত্র হিসেবে রাষ্ট্রের জন্ম হয়। রাষ্ট্র তার কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য সৃষ্টি করে এক শ্রেণীর সশস্ত্র বাহিনী।"

(ঙ) "নারী ও পুরুষের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য দেখা দেয়। শুরু হয় নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য।"

[**বিভিন্ন দেশে দাস-ব্যবস্থা** (Slave System in Different Countries) *

খ্রীষ্টপূর্ব ৩,০০০-২,৮০০ শতাব্দীতে প্রাচীন ইজিপ্টের টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদের উপত্যকায় সর্বপ্রথম দাস-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইজিপ্টের ফারাওরা (Pharaohs) দাস-মালিকশ্রেণীর স্বার্থে অধিক পরিমাণে দাস, সম্পদ প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য ক্রমাগত যুদ্ধযাত্রা করত। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দাস-মালিককের শাসনকে স্থায়িত্ব প্রদান করা। তখন রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রীভূত। ইজিপ্টের মত প্রাচীন ভারতবর্ষ এবং চীনেও ব্যাপকভাবে দাস-ব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল। ভারতবর্ষে চার বর্ণের মানুষের মধ্যে 'চতুর্থ' বর্ণের লোকেরা অর্থাৎ শূদ্ররা ছিল মূলতঃ দাস-শ্রেণীভুক্ত। তদানীন্তন ভারতীয় শাসকবর্গকে অর্থাৎ রাজাদের ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করা হোত। চীনে খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'শ্যাং' (the Shang) বা 'ইং' (Yin) নামে পরিচিত চীনে প্রথম দাস-রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটে। তারপর খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম-৩য় শতাব্দীতে চীনে দাস-ব্যবস্থা বিশেষভাবে সমৃদ্ধিলাভ করে। ব্যক্তিগত মালিক এবং রাষ্ট্র উভয়ের অধীনেই দাসদের থাকতে হোত। প্রথমতঃ যুদ্ধবন্দীদের দাস করা হোত। ঐ সময় চীনে অ-চীনাদের নিয়ে দাস-ব্যবসায়ও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। তদানীন্তন চীনে ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা স্থিরীকৃত হোত কোন্ দাস-মালিকের অধীনে কত দাস আছে সেই সংখ্যার ভিত্তিতে।

এশিয়া ও আফ্রিকার দাস-ব্যবস্থা

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্র বৎসরের (the last millennium B. C.) প্রথম ট্রান্স-ককেসিয়া এবং আর্মেনিয়ার মালভূমিতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাস-রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। এগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম যে দাস-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তার নাম উরারটু (Urartu), যা খ্রীষ্টপূর্ব ৯ম-৮ম শতাব্দীতে বিশেষভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে। উরারটু দাস-রাষ্ট্র

* জিজ্ঞাসু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই অংশটি সংযোজিত হয়েছে।

হলেও আদিম-সাম্যবাদী সমাজের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য সেখানে বর্তমান ছিল। ব্যক্তিগত মালিক এবং কমিউন—উভয়ের অধীনেই দাসদের থাকতে হোত।

এশিয়ার খোরেজম (Khorezm) এবং অন্যান্য রাষ্ট্রে দাস-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সেগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে শক্তিশালী কুশান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তী সময়ে এই সাম্রাজ্য উত্তর ভারত এবং সিংকিয়াং পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তাছাড়া, ইয়েমেন, পশ্চিম হাদ্রামাউথ (West Hadramaut) এবং আরব উপদ্বীপের রেড সী কোস্ট (Red Sea Coast)-কে নিয়ে গঠিত প্রাচীন মিনায়ান সাম্রাজ্যে (Minaean Kingdom) দাস-প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। আদিম সাম্যবাদী সমাজের কিছু কিছু অবশিষ্টাংশ বর্তমান থাকলেও সেখানে দাস-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। তাছাড়া, সাবায়ান সাম্রাজ্যে (the Sabaean Kingdom) অতি উন্নত কৃষি পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে দাস-ব্যবস্থা অপরিহার্য হয়ে উঠে। ঐ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সুবিখ্যাত 'মারিব বাঁধ' (the Marib dam) দাসদের দ্বারা তৈরি হয়েছিল।

আধুনিক যুগের প্রথম দিকে আমেরিকার ইউকাটান উপদ্বীপ এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মায়া উপজাতি (the Mayan tribes) যে উন্নত সভ্যতা গড়ে তুলেছিল সেখানে দাস-ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। যুদ্ধ, দাস-ব্যবসায় এবং ঋণশোধে অপারগ ব্যক্তিদের দাসে পরিণত করার মাধ্যমে সেখানে দাসের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আমেরিকায় দাস ব্যবস্থা

প্রাচীন চীনের মত সেখানেও অপরাধীদের শাস্তি হিসেবে দাসে রূপান্তরিত করা হোত। কৃষি ছিল মায়া উপজাতির অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি। তাছাড়া, ফল, তুলো, কোকো প্রভৃতি উৎপাদনের দিকেও তারা বিশেষ মনোযোগী ছিল। ঐ সব কার্য চালাবার জন্য দাস-প্রথা প্রবর্তনের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া, ইউকাটানের উত্তরে কয়েক শতাব্দী ধরে অন্য একটি ভারতীয় দাস-রাষ্ট্রের অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। মেক্সিকা বা এজটিক উপজাতি (the Mexica or Aztec tribe) এই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে। এজটিক উপজাতির লোকেরা যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর বিজিত যুদ্ধবন্দীদের একটি অংশকে তাদের দেবতার নিকট উপহার দিত (অর্থাৎ হত্যা করত) এবং অন্যদের দাসে পরিণত করত। সেখানে দাস ব্যবসায় এবং অধমর্ণদের দাসে রূপান্তরিত করার ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল। আমেরিকার অন্যান্য যে সব দেশে দাস-ব্যবস্থা বর্তমান ছিল সেগুলি হোল চিবচা (Chibcha), তিয়াহুয়ানাকো (Tiahuanaco) ইত্যাদি। তিয়াহুয়ানাকো-ই (অনেক সময় ভুলক্রমে অনেকে এটিকে ইনকা সাম্রাজ্য বলে বর্ণনা করেন) ছিল আমেরিকার বৃহত্তম দাস-রাষ্ট্র। বর্তমান দিনের পেরু ও ইকুয়েডর এবং বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা ও চিলি এই রাষ্ট্রকে পরিবেষ্টন করে ছিল। ইনকা (Inca) উপজাতি নিজেদের সূর্য এবং চন্দ্রের বংশসম্ভূত বলে মনে করত। তারাই ছিল তিয়াহুয়ানাকোর শাসক-উপজাতি। তারা একজন সাপা ইনকা (the Sapa Inca) বা চরম কর্তৃত্বসম্পন্ন শাসকের অধীনে ছিল। তিনি দাস-মালিকশ্রেণীর সংরক্ষক ছিলেন। ইনকারা সব সময়ই যুদ্ধ করত এবং পার্শ্ববর্তী ভারতীয় উপজাতির লোকদের পরাজিত করে দাসে পরিণত করত। কথিত আছে, সাপা ইনকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অপরাধে সর্বপ্রথম ছ'হাজার

ভারতীয়কে দাসে রূপান্তরিত করা হয়। দাসদের সন্তানসন্ততিরা দাসত্বের শৃংখল নিয়েই জন্মগ্রহণ করত।

এশিয়া ও আফ্রিকার দাস-ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কেন্দ্রীভূত স্বৈরশাসনের (centralised despotism) অবস্থিতি। কিন্তু প্রাচীন গ্রীসে তা ছিল না। এখানে নগর-রাষ্ট্র বা 'পোলিস্' (polis) কর্তৃক দাস-মালিকানা সমর্থিত ও সংরক্ষিত হোত। এখানে প্রতিটি নগর-রাষ্ট্রকে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রাখা হোত। প্রাচীরের পার্শ্ববর্তী নদী-উপত্যকা বা দ্বীপগুলির লোকদেরও সংশ্লিষ্ট নগর-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হোত। 'পোলিস'-গুলির আকৃতি ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র। কোরিন্থ (Corinth) এবং স্পার্টার (বৃহত্তম গ্রীক নগর-রাষ্ট্র) আয়তন ছিল যথাক্রমে ৮৮০ স্কোয়ার-কিলোমিটার এবং ৮,৪০০ স্কোয়ার-কিলোমিটার। গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলি দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। প্রথম ধরনের নগর-রাষ্ট্রগুলিতে সামগ্রিকভাবে দাস-মালিকদের শাসন কায়েম ছিল এবং অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিতে রাষ্ট্রের প্রশাসন মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত থাকত। দ্বিতীয় শ্রেণীর নগর-রাষ্ট্রগুলিকে 'মুখ্যতান্ত্রিক নগর-রাষ্ট্র' (Oligarchic polis) বলা হয়। এরূপ রাষ্ট্রে জমির মালিকানার ভিত্তিতে নাগরিক-অধিকার প্রদান করা হোত। প্রথম শ্রেণীর উদাহরণ হোল এথেন্স এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হোল স্পার্টা। এথেন্স প্রধানতঃ দুটি শ্রেণী ছিল, যথা—দাস এবং স্বাধীন নাগরিক। পূর্বোক্ত শ্রেণী সমাজের প্রধান উৎপাদক শ্রেণী হলেও তাদের সর্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হোত এবং তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন করা হোত। কিন্তু স্পার্টার সমাজ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। সর্বনিম্ন শ্রেণী হেট্সস্ প্রধানতঃ দাসদের নিয়ে গঠিত হোত। সর্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ এই শ্রেণী স্পার্টান সম্প্রদায়ের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছিল। জমি-জায়গার মালিকানাও ছিল এই স্পার্টান শ্রেণীর হস্তে। এই দুই শ্রেণীর মধ্যবর্তী স্তরে 'পেরিওকোই' (Periokoi) নামে পরিচিত যে শ্রেণীটি ছিল তাদের কিছু পরিমাণে সামাজিক অধিকার থাকলেও সর্বপ্রকার রাজনৈতিক অধিকার থেকে তারা ছিল বঞ্চিত।

প্রাচীন গ্রীসে দাস-ব্যবস্থা

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে রোম উত্তর আফ্রিকার সর্ববৃহৎ দাস-রাষ্ট্র (slave-owning state) কার্থেজের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৬ অব্দে কার্থেজকে ধ্বংস করে রোমানরা পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়। এই সময় তারা বল্কান, পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, এশিয়া-মাইনর প্রভৃতি স্থান জয় করে বৃহৎ রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। রোম সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল দাস-প্রথা। এই সব যুদ্ধজয়ের ফলে দাসরা পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী সহজলভ্য হয়। সার্ডিনিয়া জয়ের পর ৮০,০০০ মানুষকে দাসে পরিণত করা হয়। অনুরূপভাবে খ্রীষ্টপূর্বে ১৮৭ অব্দে গ্রীসের এইপার (Aepir)-এর পতন ঘটলে ১৫০,০০০ জনেরও বেশী লোককে দাস হিসেবে বিক্রয় করা হয়। রোমক সমাজে প্রধানতঃ প্যাট্রিসিয়ান (Patrician) এবং প্লেবিয়ান (Plebian)—এই দুই শ্রেণীর নাগরিক ছিল।

প্রাচীন রোমে দাস-ব্যবস্থা

প্যাট্রিসিয়ান বা অভিজাত জমিদার শ্রেণীর লোকেরা সংখ্যালঘু হলেও তারাই ছিল সমাজের একমাত্র সুবিধাভোগী শ্রেণী এবং প্লেবিয়ানরা সর্বপ্রকার অধিকার ও সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকত। সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে দাসদের অবস্থান ছিল। খ্রীষ্ট-পূর্ব ২য় অব্দ থেকে রোমে দাস-প্রথা চরম আকার ধারণ করলে রোমের দাসতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় দাসরা উৎপাদনের প্রধান স্তম্ভে পরিণত হয়। তাছাড়া, দাসব্যবসায় রোমের অর্থনৈতিক অগ্রগতির অন্যতম প্রধান উৎস বলে বিবেচিত হয়। এইভাবে বিশ্বের প্রায় সর্বত্র এক সময় দাস-সমাজব্যবস্থা সুদৃঢ়ভাবে প্রবর্তিত ছিল।

৪। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ (The Feudal System)

স্তালিন বলেছেন, দাস-ব্যবস্থার শেষ পর্যায়ে "নতুন শ্রম-বিভাগের ফলে সমাজে এক নতুন শ্রেণীভেদ দেখা দিল—মুক্ত মানুষ দাসের বিভেদের সঙ্গে এখন ধনী ও দরিদ্রের বিভেদ এসে যুক্ত হল। বিভিন্ন পরিবারের কর্তাদের মধ্যে সম্পদের তারতম্যের ফলে আদিম যৌথ-ব্যবস্থার যে অবশেষ তখনও পর্যন্ত কোথাও কোথাও বজায় ছিল তাও ভেঙে পড়ল। তার ফলে সমাজের জন্য যৌথভাবে ভূমিচাষের রীতির অবসান হোল। প্রথমদিকে কয়েকটি করে পরিবারকে চাষযোগ্য জমি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দেওয়া হোত; পরে তা স্থায়ীভাবে দেওয়া হতে লাগল। জোড়-বাঁধা পরিবার থেকে এক-পতিপত্নীত্বের পরিবারে রূপান্তরের পাশাপাশি ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মালিকানার রীতি প্রতিষ্ঠিত হল। আর, এক একটি পরিবার সমাজের অর্থনৈতিক এককে পরিণত হল।"

সমাজে লোহার আবিষ্কার এবং কৃষি ও হস্তশিল্পে তার ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের ফলে উৎপাদন-শক্তি অভূতপূর্বভাবে বিকশিত হয়। কিন্তু দাস-ব্যবস্থায় উৎপাদন-শক্তির মূল অংশ দাসরা ছিল পরাধীন এবং অত্যাচার-জর্জরিত। স্বাভাবিকভাবেই কাজকর্মে তাদের কোন উৎসাহ ছিল না। তাই দাস-ব্যবস্থার উৎপাদন-সম্পর্কই উৎপাদন-শক্তির বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থায় উৎপাদন-সম্পর্ক তথা সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা একান্তভাবে অনুভূত হয়। কিন্তু দাস-মালিকরা নিজেদের স্বার্থে যে-কোন ধরনের পরিবর্তনের বিরোধিতা করতে থাকে। রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্যে সর্বপ্রকার পরিবর্তনের প্রচেষ্টাকে কঠোর হস্তে তারা দমন করতে থাকে। তাই তাদের হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকারের মাধ্যমেই কেবলমাত্র সমাজ-ব্যবস্থার কাম্য পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল। দাস-মালিক ও দাসের মধ্যে শ্রেণীদ্বন্দ্বই সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত করেছিল। সমাজের মধ্যেকার এই শ্রেণীদ্বন্দ্বই হোল সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের চাহিদার রাজনৈতিক দিক। এইভাবে সমাজব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের ফলে দাসব্যবস্থা একসময় তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ল। গড়ে উঠল সামন্ততান্ত্রিক সমাজ।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজের উদ্ভবের পূর্ববর্তী অবস্থা

সামন্ততান্ত্রিক সমাজে দাসরা মুক্তির স্বাদ পেল ঠিকই কিন্তু সমাজে শ্রেণীবিভেদ থেকেই গেল। এই সমাজে দাসরা পরিণত হোল ভূমিদাসে। তারা হোল শোষিত শ্রেণী। আর দাস-মালিকদের স্থান অধিকার করল সামন্ত জমিদারগণ। এরা হোল

শোষক। "সামন্ততান্ত্রিক প্রথায় উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তি হোল—সামন্তপ্রভু উৎপাদনের উপাদানের মালিক ; কিন্তু উৎপাদন শ্রমিক অর্থাৎ ভূমিদাসের সম্পূর্ণ মালিক সে নয়। ভূমিদাসকে সে ক্রয় করতে পারে, বিক্রয় করতে পারে, কিন্তু হত্যা করতে পারে না। সামন্ত মালিকানার পাশাপাশি রয়েছে চাষী ও হস্ত শিল্পীদের ব্যক্তিগত মালিকানা। তাদের সম্পত্তি হোল উৎপাদনের জন্য তাদের নিজস্ব যন্ত্রপাতি এবং ব্যক্তিগত শ্রমের উপর নির্ভরশীল তাদের নিজেদের কর্মশালা। ঐ আমলের উৎপাদন-শক্তির প্রকৃতির সঙ্গে এইরূপ উৎপাদন-সম্পর্ক মূলতঃ সঙ্গতিপূর্ণ ছিল।" এঙ্গেলস (Engels)-এর মতে, "সামন্ততান্ত্রিক সমাজে কৃষক ছিল জমির সঙ্গে আষ্ঠেপৃষ্ঠে বাঁধা। ভূমিদাসত্বের মূল চিহ্ন হোল—কৃষকদের মাটির সঙ্গে বাঁধা বলে মনে করা হোত। ভূমিদাসত্বের ধারণাটা এসেছে এর থেকেই। সামন্তপ্রভু কৃষককে যে জমি দিত সেখানে সে নিজের জন্য নির্দিষ্ট কয়েকদিন কাজ করতে পারত। বাকী দিনগুলি কৃষক ভূমিদাসকে খাটতে হোত তার মালিকের জন্য। উৎপাদিত সামগ্রীর উপর তার আংশিক অধিকার স্বীকৃত ছিল বলে ভূমিদাসরা উৎপাদনে উদ্যোগ ও উৎসাহ প্রদর্শন করত। তবে একথা সত্য যে, এই ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় সামন্তপ্রভুদের হস্তে জমি কেন্দ্রীভূত থাকায় তারা সহজেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূমিদাসকে শোষণ করতে পারত।"

সামন্তসমাজে উৎপাদন ব্যবস্থার স্বরূপ

এঙ্গেলস্ বলেছেন, "এখানে শোষণ প্রায় দাসপ্রথার মতোই রয়ে গেছে,—সামান্য একটু লঘু হয়েছে মাত্র। শোষক ও শোষিতের মধ্যে শ্রেণীদ্বন্দ্ব এটাই হোল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য।" হুকুম তামিল করা ছাড়াও সামন্তপ্রভুদের জমিতে ভূমিদাসদের বেগার খাটতে হোত। এই ব্যবস্থায় হস্তশিল্পীরাও সামন্তপ্রভুদের নির্দেশমত তাদের বিলাস-ব্যসনের দ্রব্যাদি তৈরি করতে বাধ্য থাকত। প্রভুদের নির্দেশমত কাজ না করার জন্য ভূমিদাসদের কঠোর শাস্তি পেতে হোত।

সামন্তসমাজে শোষণের রূপ

সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বণিকশ্রেণী বিদেশ থেকে নানা প্রকার মূল্যবান বিলাসদ্রব্যাদি আমদানি করত। সেই সব বিলাসসামগ্রী ক্রয়ের জন্য সামন্তপ্রভুদের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হোত। বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন মিটাবার জন্য তারা শোষণের মাত্রা তীব্রতর করে তুলল ; সামন্ত ব্যবস্থার প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে ভূমিদাসদের বাঁচিয়ে রাখত সামন্তপ্রভুরা। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে উৎপাদিত সামগ্রীর নির্দিষ্ট অংশে খাজনা দেওয়ার রীতি প্রচলিত হওয়ার ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফল ভোগ করতে হোত ভূমিদাসদের। সামন্ত ব্যবস্থার সর্বশেষ স্তরে সামন্তপ্রভুরা যখন শহরাঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করে তখন থেকেই মুদ্রায় খাজনা দেওয়ার রীতি শুরু হয়। এর ফলে উৎপাদনের উপর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সমূহ দায়দায়িত্ব গিয়ে পড়ল ভূমিদাসদের উপর।

এই ব্যবস্থায় বিনিময়ের বিস্তার, মুদ্রার ব্যবহার, সুদে অর্থ ধার দেওয়ার রীতি, সম্পদ হিসেবে জমি ও জমি বন্ধকী কারবারের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে সম্পদ অল্পসংখ্যক লোকের হাতে দ্রুত কেন্দ্রীভূত হতে লাগল, অপরদিকে সম্পদহীন লোকের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেতে লাগল। সেই সঙ্গে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত রীতি প্রবর্তিত

হওয়ার ফলে সমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতা খর্বিত হোল। এঙ্গেলসের ভাষায়, "জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধকী প্রথা তেমনিভাবে দৃঢ় হয়েছিল, যেমনভাবে এক পতিপত্নীর প্রথার পেছনে পেছনে এসেছিল হেটায়ারিজম ও বেশ্যাবৃত্তি।" সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সমাজ শ্রেণী-বিন্যস্ত থাকায় সমাজে সুতীব্র শ্রেণীদ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সামন্তপ্রভুরা রাষ্ট্রক্ষমতাকে নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে রেখে অতি সহজে ভূমিদাস শ্রেণীর উপর শোষণ অব্যাহতভাবে চালাতে থাকে। কিন্তু শোষিত ভূমিদাস শ্রেণী তাদের জীবনযাত্রার সাধারণ অবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্য অনেক সময় ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। ১৮৩১ সালে ইংল্যান্ডে জন বল্ এবং ওয়াট টাইলারের নেতৃত্বে যে কৃষক বিদ্রোহ হয় তা ভূমিদাসের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জ্বলন্ত উদাহরণ। ভূমিদাস বিদ্রোহ ইংল্যান্ড ছাড়াও জার্মানি, রাশিয়া, চীন, ভারতবর্ষ, জাপান প্রভৃতি দেশেও ব্যাপক আকার ধারণ করে। আর্নেস্ট ম্যান্ডেল (Earnest Mandle) বলেছেন, ১৬০৩ সাল থেকে ১৮৫৩ সালের মধ্যে কম করে হলেও এরূপ ১,১০০-টির বেশী বিদ্রোহ ঘটতে দেখা গেছে। সংঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম করা ছাড়াও ভূমিদাসরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছোটখাট সংঘর্ষে প্রায়ই লিপ্ত থাকত।

সামন্তসমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্ব এবং রাষ্ট্রের প্রকৃতি

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হোল ঃ

(ক) দাস-সমাজব্যবস্থার মতো সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাতেও শ্রেণীভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে এই ব্যবস্থায় শ্রেণীশোষণের রূপ পাল্টেছিল মাত্র। এখানে সামন্তপ্রভুরা শোষক শ্রেণী আর ভূমিদাসরা হোল শোষিত শ্রেণী। সমাজ শ্রেণীবিন্যস্ত হওয়ায় সমাজের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই শ্রেণীদ্বন্দ্ব ছিল।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

(খ) "সামন্তপ্রভুরা হোল পরশ্রমভোগী বিলাসী শোষক" মাত্র।

(গ) এই ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিক হোল সামন্তপ্রভুরা। কিন্তু ভূমিদাসরা তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে পরিগণিত হোত না।

(ঘ) "ভূমিদাসদের উপর সামন্তপ্রভুদের আধিপত্য বজায় রাখা ও শোষণ কায়েম রাখার যন্ত্র হিসেবে রাষ্ট্র বর্তমান" ছিল।

(ঙ) দাসব্যবস্থা অপেক্ষা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্ত্রী-স্বাধীনতাকে অনেক বেশী খর্ব করা হয়েছে।

[**বিভিন্ন দেশে সামন্ততন্ত্র** (Feudalism in different countries)*

এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা তাদের নিজ নিজ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে উঠে এবং বিবর্তিত হয়। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে কিংবা তারও পূর্বে প্রাচীন হ্যান সাম্রাজ্যের পর চীন সাম্রাজ্যের (the Chin Empire) অধীনে দেশ পুনর্গঠিত হওয়ার পর সেখানে সামন্তব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। দেশের জমি, জলসম্পদ ইত্যাদির উপর সামন্তশ্রেণীর একচেটিয়া মালিকানার (monopoly ownership)

এশিয়া ও আফ্রিকাতে সামন্ততন্ত্র

* জিজ্ঞাসু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই অংশটি সংযোজিত হয়েছে।

প্রতিষ্ঠাই ছিল চীনা সামন্তসমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে ঐসব সম্পত্তির মালিক কোন ব্যক্তি ছিল না; রাষ্ট্রই ছিল সেগুলির মালিক। কিন্তু চীন্-বংশের প্রথম সম্রাট সী হুয়াং-তি (Shih Huang-ti)-র রাজত্বকালে একটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে কৃষকদের জমি প্রদান করা হয়। প্রতিটি জমিকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হোত। তার এক ভাগের উৎপাদন সে নিজে পেত এবং অপর ভাগের সমগ্র উৎপাদন রাষ্ট্রকে প্রদান করতে হোত। এর পর অষ্টম শতাব্দীতে ত্যাং (Tang) বংশের রাজত্বকালে চীনে সামন্ততন্ত্রের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়। ঐ সময় জমির উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা ব্যবস্থার (the system of state-owned lands) পরিবর্তে সামন্ত প্রভুদের 'এস্টেট' (estate) গড়ে উঠতে থাকে। ঐসব এস্টেটে কর্মরত কৃষকরা উৎপাদিত ফসলের অর্ধেকের বেশী সামন্তপ্রভুদের দিতে বাধ্য থাকত। চীনের মতো জাপান এবং ইন্দো-চীনেও সামন্তব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল। জাপানে চতুর্থ শতাব্দীতে সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট একটি ইস্তাহার (the Emperor's Manifesto) জারী করে সেখানে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে জমির ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেন। জমি চাষের বিনিময়ে কৃষকদের খাজনা দিতে হোত। রাষ্ট্র এবং কৃষকদের মধ্যবর্তী জমি-মালিকরা (land-owners) তখন থেকে জমির মালিকানার আইনসঙ্গত স্বীকৃতি লাভ করে। তবে এর বিনিময়ে তারা সামরিক কার্যে রাষ্ট্রকে সাহায্য করতে বাধ্য থাকত। এইভাবে জমি চাষ না করেও ঐ শ্রেণী জমির মালিক হয়ে উঠে।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ইন্দোচীনের লিন বা চম্পা (Lin or Champa) এবং ফাউনান (Founan) নামে দুটি রাষ্ট্রেও সামন্তব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। নবম শতাব্দীতে ইন্দোচীনের খের রাজত্বে (Khmer Kingdom) সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীসম্পর্ক প্রবর্তিত হয়। ইতিহাসে এই রাজত্ব 'আংকোর অধ্যায়' (the Angkor period) নামে পরিচিত। খ্রীষ্টীয় ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে সামন্ত-সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ৭ম শতাব্দীর মধ্যে তা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠে। এখানে সামন্ত-সম্পত্তি (the feudal estates) দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল সামন্তপ্রভুদের সম্পত্তি। এইসব সামন্তপ্রভু মহারাজাদের প্রয়োজনের সময় সামরিক সাহায্য প্রদান করতে বাধ্য থাকত। ঐ সব সামন্তসম্পত্তির উপর উত্তরাধিকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়া, কিছু কিছু সামন্তপ্রভুকে বিনা শর্তে জমির মালিকানা প্রদান করা হোত। স্বয়ং মহারাজাদেরও বিপুল সম্পত্তি থাকত। বর্ণগত ভিত্তিতে সমাজকে চারটি ভাগে বিভক্ত করে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণরা শোষণব্যবস্থা কায়েম করতে সমর্থ হয়েছিল। আরব উপদ্বীপের খলিফাশাসিত দেশগুলির অধিকাংশই ছিল সামন্ততান্ত্রিক। ঐ সব দেশে বেশ কিছু জমি খলিফা ও তাদের পরিবারের হস্তে থাকত এবং বাকী জমি ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে প্রদান করা হোত। আরব রাষ্ট্র-গুলিতে সামরিক আনুগত্যের বিনিময়ে সামন্ত-প্রভুদের সাময়িক বা স্থায়ীভাবে জমির মালিকানা প্রদান করা হোত। তা ছাড়া, বহু মুসলিম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান জমির উপর অখন্ড মালিকানা লাভ করেছিল। এশিয়ার মত আফ্রিকার বহুদেশ, যেমন—মালি, কঙ্গো, অ্যাঙ্গোলা, মোনোমোটাপা (Monomotapa), বেনিন (Benin)-এ সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

মধ্যযুগীয় ইউরোপের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তদানীন্তন সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সমাজ ছিল কৃষির উপর নির্ভরশীল। সমাজ প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, যথা—সামন্ত, মোহান্ত এবং কৃষক। এদের মধ্যে সামন্তরা শাসক, সেনানায়ক ও জমির মালিক ছিল। মোহান্তরা সামন্তবাদের অন্যতম প্রধান শক্তি ছিল। তারা সামন্তদের অধীন থাকলেও মঠের সম্পত্তি কুক্ষিগত করে অনেক সময় তারা নিজেরাই সামন্ত হয়ে বসত। কৃষকদের অবস্থা ছিল দুর্বিষহ। নিজেদের কায়িক শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রী তাদের প্রভু, সামন্ত ও মোহান্তদের প্রদান করতে হোত। রাশিয়া, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানি প্রভৃতি দেশে সামন্ততন্ত্র বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল।]

মধ্যযুগীয় ইউরোপে সামন্ততন্ত্র

৫। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা (The Capitalist System)

সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় কৃষি ও হস্তশিল্পে নতুন নতুন যন্ত্রের প্রয়োগ উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিপ্লবের সূচনা করল। উৎপাদন-শক্তির বিকাশ অত্যন্ত দ্রুতলয়ে সম্পাদিত হতে থাকে। কৃষি ও হস্তশিল্প পৃথক হয়ে যাওয়ার ফলে বিনিময় প্রথা সাধারণ রীতিতে পর্যবসিত হয়। হস্তশিল্পীরা তাদের উৎপাদিত সামগ্রীর বিনিময়ে কৃষকের কাছ থেকে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করত। এই সময় গ্রামের পাশাপাশি শহর গড়ে উঠায় বিনিময়ের পরিধিও স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। এইভাবে ক্রমে ক্রমে গ্রাম্য বাজারে চাহিদার সঙ্গে শহর ও বিদেশের বাজারের চাহিদা সংযুক্ত হওয়ার ফলে ব্যবসাবাণিজ্য শুরু হয়। এর ফলে সমাজে বণিকশ্রেণী নামে নতুন একটি শ্রেণীর জন্ম হয়। এই বণিকশ্রেণী উৎপাদন-ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করত না কিংবা উৎপাদিত সামগ্রী নিজেরা ভোগ করত না। তাদের প্রধান কাজ ছিল উৎপাদনকারীর কাছ থেকে স্বল্পমূল্যে উৎপাদিত সামগ্রী ক্রয় করে ভোগকারীদের নিকট উচ্চমূল্যে সেইসব সামগ্রী বিক্রয় করা। এইভাবে তারা উৎপাদনকারী ও ভোগকারীদের ঠকিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থসম্পদের মালিক হয়ে উঠতে থাকে। ব্যবসাবাণিজ্য করা ছাড়াও তারা সুদে টাকা ধার দিত। এর ফলে তাদের অর্থসম্পদ আরো বৃদ্ধি পেল। এই বণিকশ্রেণীই হোল বুর্জোয়াশ্রেণীর পূর্বসূরী।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উৎপত্তির পটভূমি

এই সময় নতুন নতুন দেশ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে বণিকশ্রেণী সেইসব দেশের সম্পদ লুট করে আনতে লাগল। সদ্য-আবিষ্কৃত দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য শুরু হওয়ার ফলে বিনিময়যোগ্য পণ্যের চাহিদা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। বণিকশ্রেণী কৃষক ও হস্তশিল্পীদের প্রচুর টাকা ঋণ দিয়ে উৎপাদনে উৎসাহ সৃষ্টির জন্য সচেষ্ট হয়। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকায় হস্তশিল্প ও গার্হস্থ্যশিল্পের পক্ষে ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা সম্ভব ছিল না। তাই স্বল্প সময়ে অধিক পরিমাণে পণ্যদ্রব্য উৎপাদিত হতে পারে এমন একটি উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

লেনিনের মতে, "পুঁজিবাদের উদ্ভবের জন্য দুটি ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত প্রয়োজন। প্রথমতঃ কিছু ব্যক্তিবিশেষের হাতে বেশ কিছু অর্থসম্পদ জমতে হবে, এবং তা জমতে

হবে এমন এক সময়ে যখন সাধারণভাবে পণ্য উৎপাদন-ব্যবস্থা বিকাশের এক উচ্চস্তরে রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, এমন এক শ্রমিকশ্রেণী থাকতে হবে যারা দুটি অর্থে স্বাধীন,—শ্রমিক তার শ্রমশক্তি বিক্রয় করার ব্যাপারে সমস্ত বাধানিষেধ থেকে মুক্ত, আবার, সে জমি ও উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের মালিকানা থেকে মুক্ত, অর্থাৎ সে একজন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ শ্রমিক, একজন সর্বহারা, এবং সে তার শ্রমশক্তি বিক্রয় না করলে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না।" সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার শেষদিকে বণিকদের হাতে প্রচুর অর্থসম্পদ কেন্দ্রীভূত থাকলেও ভূমিদাসরা স্বাধীন ছিল না। তারা জমির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা ছিল। তাছাড়া, হস্ত ও ক্ষুদ্রশিল্প পুঁজিবাদের বিকাশের পথে পদে পদে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছিল। সর্বোপরি, সামন্তপ্রভুদের কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলে ব্যবসাবাণিজ্য করার জন্য বণিকদের নানা প্রকার চুঙ্গিকর প্রদান করতে হোত। এই সব কর প্রদান করার পর স্থানীয় উৎপাদকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা তাদের পক্ষে আদৌ সহজসাধ্য ছিল না। তাই শেষপর্যন্ত বিকাশমান বুর্জোয়া উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের বিরোধ অনিবার্য হয়ে উঠে। বণিকশ্রেণী কর্তৃক আমদানিকৃত বিলাস পণ্যের জন্য সামন্তপ্রভুদের বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় করতে হোত। সেই অর্থ যোগাতে হোত ভূমিদাস ও সামন্তপ্রজাদের। এইভাবে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় শোষণের মাত্রা যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে ততই ভূমিদাসরা ঋণের দায়ে সুদখোর মহাজনদের জালে জড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত সুদসহ ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় তাদের জমিজায়গা, ঘরবাড়ি ইত্যাদি মহাজনরা গ্রাস করে নেয়। ভূমিদাস ও সামন্তপ্রজারা প্রকৃত সর্বহারা শ্রেণীতে পরিণত হয়। একইভাবে মহাজনরা দরিদ্র হস্তশিল্পীদের ঋণের দায়ে তাদের কর্মশালাগুলি দখল করে নেয়। সেই সব কর্মশালায় নতুন নতুন যন্ত্রপাতি বসিয়ে সেগুলিকে বণিকরা কারখানায় রূপান্তরিত করে এবং পূর্বতন হস্তশিল্পীরা ও ছোট ছোট মালিকরা সেই সব কারখানায় মজুরি শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হয়। এইভাবে তারাও সর্বহারায় পরিণত হয়।

পুঁজিবাদের উদ্ভবের পূর্বশর্ত

পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ ছাড়া পুঁজিবাদী শ্রেণীর বিকাশ অসম্ভব। তাই তারা প্রথমে আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে সামন্তপ্রভুদের প্রাধান্য খর্ব করার চেষ্টা করে। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি সামন্তপ্রভুদের হাতে থাকায় যে-কোন বিরোধিতাকে তারা কঠোর হস্তে দমন করতে সক্ষম হয়। শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়ে বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বেছে নেয়। তারা সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার রাজনৈতিক শ্লোগান তুলে সামন্ত-তন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনায় জনসমর্থন লাভের চেষ্টা করে। ভূমিদাস, হস্ত-শিল্পী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা অতি সহজেই বুর্জোয়াদের সমর্থনে এগিয়ে আসে। শুরু হয় মুক্তির জন্য রক্তঝরা সংগ্রাম। এই সংগ্রামে সামন্তশ্রেণী পরাজিত হয়—উদ্ভব ঘটে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উদ্ভব

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্তালিন বলেছেন, "পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন-সম্পর্কের ভিত্তি হোল—পুঁজিপতি উৎপাদনের উপাদানের মালিক,

কিন্তু উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিক, অর্থাৎ মজুরি-শ্রমিকের মালিক সে নয়। যেহেতু শ্রমিক ব্যক্তিগতভাবে মুক্ত ও স্বাধীন, পুঁজিপতি তাকে হত্যা করতে পারে না, বা বেচতে পারে না। কিন্তু, তারা উৎপাদনের সর্বপ্রকার উপাদান থেকে বঞ্চিত। তাই, অনাহারে মৃত্যু এড়াতে তারা পুঁজিপতিদের নিকট তাদের শ্রমশক্তি বেচতে বাধ্য হয় এবং শোষণের জোয়াল কাঁধে নেয়। পুঁজিপতিদের সম্পদের পাশাপাশি প্রথম দিকে কৃষক ও হস্তশিল্পীদের উৎপাদনের উপাদান হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যক্তিগত সম্পদ ছিল। কারণ এখন এই সকল কৃষক ও হস্তশিল্পী আর ভূমিদাস নয়। আর তাদের এই সম্পদের ভিত্তি হোল ব্যক্তিগত শ্রম। হস্তশিল্পীদের ছোট ছোট কর্মশালা ও উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তে এখন দেখা দিল বড় বড় যন্ত্রপাতিসহ বিরাট বিরাট মিল ও ফ্যাক্টরী। জমিদারের খাস জমিতে চাষীর আদিকালের হাতিয়ার দিয়ে চাষের পরিবর্তে এখন বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ও চাষের যন্ত্রপাতিসহ বিশাল পুঁজিপতি খামারের উদ্ভব হোল।"

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন-সম্পর্কের ভিত্তি

"নতুন উৎপাদন-শক্তির জন্য প্রয়োজন ছিল নির্যাতিত ও অশিক্ষিত ভূমিদাসদের অপেক্ষা অধিকতর শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান শ্রমিকের। তাদের যেন যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে এবং তারা যেন উপযুক্তভাবে তা ব্যবহার করতে জানে। সুতরাং ভূমিদাস প্রথা থেকে মুক্ত এবং যন্ত্রপাতি ঠিকমতো পরিচালনা করার পক্ষে যথেষ্ট শিক্ষিত মজুরি-শ্রমিকদের সঙ্গে কারবার করতে পুঁজিপতিরা বেশী পছন্দ করে।" কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে মজুরি-শ্রমিকরা ক্রীতদাস বা ভূমিদাসদের অপেক্ষা অনেক বেশী স্বাধীন হলেও কার্যক্ষেত্রে তারা ছিল পরাধীন। কারণ উৎপাদনের উপাদানের মালিক তারা নয়, এমনকি বাসস্থানও তাদের ছিল না। তাদের সহায়সম্বল বলতে নিজেদের শ্রমশক্তি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাই পুঁজিপতিদের নিকট সে শ্রমশক্তি বিক্রি করে নিজেদের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করত। যে শ্রমশক্তি বিক্রি করত না তাকে অনাহারে মৃত্যু-বরণ করতে হোত। মজুরি-শ্রমিকদের এই অসহায়তার সুযোগ গ্রহণ করে পুঁজিপতিরা নামমাত্র মজুরি দিয়ে শ্রমিককে কাজ করতে বাধ্য করত। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় কিভাবে শ্রেণীশোষণ চলে তা বর্ণনা করতে গিয়ে স্তালিন বলেছেন, "মজুরশ্রমিক জমি, কারখানা ও শ্রমযন্ত্রের মালিকদের নিজের শ্রমশক্তি বিক্রয় করে। দৈনিক শ্রমসময়ের এক অংশ শ্রমিক নিজের ও তার পরিবারের ভরণপোষণের ব্যয় সংগ্রহ করার জন্য ব্যবহার করে। অপর অংশ কোন মজুরি না পেয়েও সে পুঁজিপতিদের জন্য উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টির কাজে ব্যয় করতে বাধ্য হয়। উদ্বৃত্ত মূল্যই হোল পুঁজিপতিশ্রেণীর মুনাফার উৎস, পুঁজিপতিদের সম্পদের উৎস।" পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত-মূল্য (surplus value) মুদ্রারূপে আদায় করা হয়। এই মুদ্রাই আবার পুঁজিরূপে অধিকতর উদ্বৃত্ত মূল্য আদায়ের কাজে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং অধিক পরিমাণে উদ্বৃত্ত-মূল্য-সংগ্রহের লোভে পুঁজিপতিরা শোষণের সীমা ছাড়িয়ে যায়। পুঁজিবাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফল হল যুদ্ধ। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে ব্যবসা-সঙ্কট শুরু হলে নিজেদের দেশে পণ্য বিক্রী করে মুনাফা অর্জন করা পুঁজিপতিদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই তাদের বিদেশী বাজার খোঁজ করতে হয়। বিভিন্ন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের পুঁজিপতিরা নিজের নিজের

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রেণীশোষণ

পণ্য বিদেশী বাজারে বিক্রি করার জন্য পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। আবার ওইসব বিদেশী রাষ্ট্রের সরকারকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনার জন্য পুঁজিপতিরা সচেষ্ট হয়। এইভাবে বিদেশী বাজার দখলের জন্য বিভিন্ন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। উপনিবেশ দখলের জন্য যে যুদ্ধ তার ব্যয়ভার কিন্তু বহন করতে হয় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের দরিদ্র জনসাধারণকে। ফলে ঐ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হতে থাকে। এমতাবস্থায় উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে পুঁজিবাদী সমাজের উৎপাদন-সম্পর্কের অসামঞ্জস্যতা বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। সমাজ সুস্পষ্টভাবে শোষক এবং শোষিত—এই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমাজ সুস্পষ্টভাবে শ্রেণী-বিভক্ত থাকায় শ্রেণীসংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। নিজেদের শোষণভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সংরক্ষণের জন্য পুঁজিপতিরা রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করে। শ্রমিকদের ধূমায়িত অসন্তোষকে ধ্বংস করার জন্য পুঁজিপতিরা তথাকথিত গণতান্ত্রিক সংবিধান, নিরপেক্ষ আইন, আদালত, পুলিস, সৈন্যবাহিনী ইত্যাদির ব্যবস্থা অধিকতর জোরদার করে শোষণব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে।

পুঁজিবাদী সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্ব

পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি হোল সংক্ষিপ্তভাবে নিম্ন প্রকার :

পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

(ক) পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমাজ সুস্পষ্টভাবে দুটি পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই দুটি শ্রেণী হোল বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত—শোষক ও শোষিত। সমাজে শ্রেণীভেদ থাকায় স্বাভাবিকভাবেই শ্রেণীদ্বন্দ্ব প্রকট আকার ধারণ করে।

(খ) পুঁজিপতি শ্রেণী উৎপাদনের সর্বপ্রকার উপাদানের মালিক এবং সর্বহারা শ্রেণী উৎপাদনের প্রধান শক্তি হলেও উৎপাদিত সামগ্রীর উপর সর্বহারাদের কোন মালিকানা থাকে না। শ্রমশক্তি বিক্রয়ের মাধ্যমেই সে কেবলমাত্র জীবিকানির্বাহ করতে পারে।

(গ) শ্রমিকদের শ্রমশক্তি যে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন করে তা হোল পুঁজিপতিদের মুনাফার উৎসস্থল। পুঁজিপতিরা এইভাবে পরশ্রমভোগী হিসেবে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে দিনাতিপাত করে। কিন্তু শোষিত হওয়ার ফলে শ্রমিকদের জীবন ক্রমান্বয়ে দুর্বিষহ হয়ে উঠে।

(ঘ) সর্বহারা শ্রেণীকে শোষণ করার কাজে রাষ্ট্র পুঁজিপতিদের প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে।

(ঙ) অর্থনৈতিক দিক থেকে পরাধীন হওয়ায় স্ত্রীলোকদের উপর পুরুষদের একাধিপত্য বিস্তৃত হয়।

৬। সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা (The Socialist System)

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে বাষ্প ও বিদ্যুৎ শক্তিকে উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করা সম্ভব হয়। ফলে কৃষি ও শিল্পোৎপাদনের অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়। কৃষিতে যন্ত্র ও রাসায়নিক সারের প্রয়োগ

কৃষি-উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপ্লব আনল। স্থাপিত হোল বিরাট বিরাট খামার, যার মালিকানা পুঁজিপতিদের হাতে রইল। এইভাবে কলকারখানায় হাজার হাজার শ্রমিক একসঙ্গে কাজ করতে লাগল। কিন্তু সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেও তারা তাদের পরিবার-পরিজনের ন্যূনতম ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে পারত না। পুঁজিপতিদের শোষণে তাদের জীবন দুঃসহ হয়ে উঠল। ক্রমশঃ তারা একথা যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারল যে, সংঘবদ্ধ আন্দোলন ছাড়া তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়। তাই তারা গড়ে তুলল ট্রেড ইউনিয়ন, যার মাধ্যমে শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য দাবিদাওয়া পেশ করত পুঁজিপতিদের কাছে। ক্রমে ক্রমে শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিপতিদের শোষণের ধারা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। তারা বুঝতে পারে যে, পুঁজিপতিরা মুদ্রা বা পুঁজি দিয়ে পণ্য ক্রয় করে, এবং পরবর্তী সময়ে সেই পণ্যকে আবার পুঁজিতে রূপান্তরিত করে। কিন্তু পুঁজিপতিরা যে পরিমাণ মুদ্রার বিনিময়ে পণ্য ক্রয় করে, সেই পণ্য বিক্রয় করে অনেক বেশী পরিমাণ পুঁজি বা মুদ্রা তারা সংগ্রহ করে। এই উদ্বৃত্ত মূল্যই হোল পুঁজিপতিদের মুনাফার প্রধান উৎসস্থল।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভবের ঐতিহাসিক পটভূমি

পুঁজিপতিরা প্রথমে তাদের পুঁজি দিয়ে কলকারখানা স্থাপন করে, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি সংগ্রহ করে। পরে মজুরির বিনিময়ে তারা শ্রমিকদের শ্রমশক্তিকে ক্রয় করে উৎপাদনের কাজে লাগায়। কিন্তু উৎপাদনের উপকরণগুলির, যথা—জমি, শ্রমিক, মূলধন ও সংগঠনের মধ্যে একমাত্র শ্রমশক্তি ছাড়া অন্য কোন উপাদান থেকে তারা উদ্বৃত্ত-মূল্য সংগ্রহ করতে পারে না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদিত সামগ্রীর উৎপাদনের খরচের ভিত্তিতে জিনিসপত্রের মূল্য নির্ধারিত হয়। শ্রমিকের মজুরি হোল শ্রমশক্তির মূল্য। শ্রমিকের মজুরি নির্ধারিত হয় শ্রমশক্তির উৎপাদনের খরচের মাধ্যমে। শ্রমশক্তির উৎপাদন খরচ বলতে বুঝায় শ্রমিক ও তার পরিবার-পরিজনের জীবনধারণের উপযোগী দ্রব্যাদি ও বাসস্থানের খরচ। পুঁজিপতিরা প্রধানতঃ দুটি কারণে শ্রমশক্তির যোগান অব্যাহত রাখার জন্য শ্রমিকদের মজুরি দেয়। প্রথমতঃ চুক্তি অনুযায়ী শ্রমিককে নির্দিষ্ট শ্রম-সময়ের জন্য নিয়মিতভাবে কাজ করার জন্য সক্ষম রাখতে হবে। দ্বিতীয়তঃ কর্মে অক্ষম হয়ে পড়লে শ্রমিকের পরিবার থেকে যাতে নতুন শ্রমিক পাওয়া যায় সেজন্য তার পরিবার-পরিজনকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। কিন্তু শ্রমিক নির্দিষ্ট শ্রম-সময়ের জন্য যে মজুরি পায় তার থেকে অনেক বেশী মূলের দ্রব্যাদি সে উৎপাদন করে। তাই শ্রমিককে মজুরি দিয়েও পুঁজিপতিদের হাতে যথেষ্ট উদ্বৃত্ত মূল্য থাকে। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে লেনিন বলেছেন, "শ্রমিক তার শ্রম-সময়ের এক অংশ নিজের ও তার পরিবারের ভরণপোষণের ব্যয় সংগ্রহ করার জন্য খরচ করে। অপর অংশ সে কোন মজুরি না পেয়েও কাজ করতে বাধ্য হয় পুঁজিপতির জন্য উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করতে। এই উদ্বৃত্ত-মূল্যই পুঁজিপতিশ্রেণীর মুনাফার উৎস, পুঁজিপতিদের সম্পদের উৎস।" কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না এই উদ্বৃত্ত-মূল্য মুদ্রায় রূপান্তরিত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত মুনাফালাভের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় না। পুঁজিপতিরা দাসমালিক

পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার স্বরূপ

উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব

ও সামন্ত প্রভুদের মত উদ্বৃত্ত-মূল্য নিজেদের ভোগের জন্য সংগ্রহ করে না ; সংগ্রহ করে মুনাফা লুটের জন্য। এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতিদের মুনাফা লুটের বল্গাহীন প্রচেষ্টা মজুরি-শ্রমিকদের চরম অর্থনৈতিক কৃচ্ছ্রতার মধ্যে ঠেলে দেয়। অধিক পরিমাণে মুনাফা লাভের জন্য পুঁজিপতিরা শ্রম-সময়ের বৃদ্ধি সাধন করে এবং আনুপাতিক হারে মজুরি কমিয়ে দেয়। ফলে মজুরি-শ্রমিকেরা শোষণের শেষ ধাপে গিয়ে পৌঁছায়। কিন্তু সুদীর্ঘকাল মুখ বুজে শোষিত শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিপতিদের অত্যাচার সহ্য করতে চায় না। সর্বপ্রকার শোষণের বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় পুঁজিপতিশ্রেণী তাঁদের শোষণের কৌশল পরিবর্তন করে। কলকারখানায় উন্নততর যন্ত্রপাতি প্রবর্তিত হয়। এই যন্ত্রের সঙ্গে তাল রেখে শ্রমিককে কাজ করতে হয়। এর ফলে শ্রমিকদের শ্রম-সময় অপরিবর্তিত রেখে পুঁজিপতিশ্রেণী পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে উদ্বৃত্ত-মূল্য বা মুনাফা লাভ করতে সমর্থ হয়।

শ্রমিকদের শ্রেণী-সচেতনতা বৃদ্ধি

কিন্তু সচেতন এবং সুসংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী মজুরি হ্রাস, স্বয়ংক্রিয় দ্রুতগতি-সম্পন্ন যন্ত্রপাতি প্রবর্তন ইত্যাদিতে ঐক্যবদ্ধভাবে বাধা দেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রমিকরা নিজ নিজ মালিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করতে শুরু করে। কিন্তু একসময় তারা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারে যে সমগ্র পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাই তাদের দুঃখদুর্দশার কারণ। তাই তারা সমগ্র পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

পুঁজিবাদী সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্বের তীব্রতা

একদিকে যখন পুঁজিপতিশ্রেণীর সঙ্গে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠে, অন্যদিকে তখন পুঁজিপতিদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা পুঁজিবাদী-ব্যবস্থার ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। পুঁজিবাদী-ব্যবস্থায় প্রতিটি পুঁজিপতি স্বতন্ত্রভাবে পণ্য উৎপাদন করে। বাজার দখল করার জন্য পুঁজিপতিরা পারস্পরিকভাবে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। ফলে তাদের নিজেদের মধ্যে প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। এঙ্গেলসের মতে, "উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে সমা ..নের অযোগ্য এই সব বিরোধ সাময়িকভাবে অতি-উৎপাদন (over-production)-এর সংকটরূপে দেখা দেয়। পুঁজিপতির কাজের ফলে জনসাধারণের সর্ববৃহত্তম অংশ সর্বস্বান্ত হওয়ায় উৎপন্ন দ্রব্যের কোন কার্যকরী চাহিদা থাকে না। তাই তারা তাদের উৎপন্ন দ্রব্য পুড়িয়ে ফেলতে, তৈরি মাল ধ্বংস করতে, উৎপাদন বন্ধ রাখতে এবং উৎপাদন-শক্তি নষ্ট করে ফেলতে বাধ্য হয়। আর তা করে এমন এক সময় যখন লক্ষ লক্ষ লোক বেকারী ও অনাহারে কষ্ট পাচ্ছে। জনগণের এই কষ্ট কিন্তু যথেষ্ট দ্রব্যসামগ্রী নেই বলে নয়, বরং দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বেশী হয়ে গেছে বলেই তাদের এই কষ্ট।" তাঁর মতে, "এর অর্থ এই যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক উৎপাদন-শক্তির চলতি অবস্থার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না ; তাই তাদের মধ্যে মিটমাটে অযোগ্য এক বিরোধ ঘটেছে। এর অর্থ এই যে, পুঁজিবাদ বিপ্লবকে জন্ম দেওয়ার জন্য তাকে নিজের গর্ভে ধারণ করে আছে। আর এই বিপ্লবের উদ্দেশ্য হল উৎপাদনের উপাদানের উপর থেকে পুঁজিবাদী মালিকানা উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা।"

বলা বাহুল্য, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করার জন্য সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীকেই

নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হয়। কারণ এই ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীই একমাত্র শ্রেণীসচেতন প্রগতিশীল শক্তি। এঙ্গেলসের ভাষায়, "আজকের দিনে বুর্জোয়াদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে যে সকল শ্রেণী তার মধ্যে একমাত্র সর্বহারাশ্রেণীই কার্যতঃ বিপ্লবী শ্রেণী। অন্যান্য শ্রেণীরা ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং অবশেষে বর্তমান শিল্পব্যবস্থার ধাক্কায় তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অথচ, সর্বহারাশ্রেণী হ'ল এই শিল্পব্যবস্থারই বিশিষ্ট ও প্রয়োজনীয় ফসল।" তাঁর মতে, "যে সময়ে বুর্জোয়াশ্রেণী কৃষক ও পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণীকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করছে, তাদের ছত্রভঙ্গ করছে, ঠিক সেই সময়ে তারা নিজেরাই সর্বহারাশ্রেণীকে একত্রে জড়ো করে সুসংহত ও সংগঠিত করছে। বৃহৎ শিল্পে নিজের অবস্থানের জোরে সর্বহারাশ্রেণী সমস্ত খেটে খাওয়া শোষিত মানুষের নেতৃত্ব করতে সক্ষম। এই খেটে-খাওয়া শোষিত মানুষ হ'ল তারাই যাদের বুর্জোয়াশ্রেণী সর্বহারার চেয়েও বেশীমাত্রায় বঞ্চিত করে, শোষণ করে এবং নিষ্পেষিত করে; অথচ, নিজেদের মুক্তির জন্য আলাদাভাবে সংগ্রাম করার ক্ষমতা এদের নেই।" তাই তারা স্বাভাবিকভাবেই শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত শ্রমিকশ্রেণীরই সমর্থনে এগিয়ে আসে। শুরু হয় রাজনৈতিক ক্ষমতা-দখলের জন্য জীবনমরণ সংগ্রাম। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রাষ্ট্রযন্ত্র যেহেতু বুর্জোয়া শোষকদের হাতে থাকে, সেহেতু তারা জনগণের সম্মিলিত এবং ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে ধ্বংস করার জন্য সশস্ত্র পুলিস, মিলিটারী ইত্যাদি নিয়োগ করে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ ও ঐক্যবদ্ধ গণশক্তির কাছে মুষ্টিমেয় শোষকশ্রেণীর পরাজয় ঘটে। রাষ্ট্রক্ষমতা সর্বহারাশ্রেণীর করায়ত্ত হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব।

সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা

কিন্তু সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কমিউনিজম বা সাম্যবাদ আসে না কিংবা সমাজ থেকেও শ্রেণীসংগ্রামের অবসান ঘটে না। লেনিন বলেছেন, শ্রেণী-বিলোপ সম্পূর্ণ করার জন্য কেবলমাত্র শোষকশ্রেণীকে উচ্ছেদ কিংবা মালিকানায় তাদের অধিকার বিলোপ করলেই চলবে না; সেই সঙ্গে উৎপাদনব্যবস্থার সকল ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ সাধন করতে হবে, শহর ও গ্রামের মধ্যেকার পার্থক্য দূর করতে হবে এবং দৈহিক ও মানসিক শ্রমের পার্থক্য সম্পূর্ণভাবে তুলে দিতে হবে। অবশ্য এসবের জন্য সুদীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। বস্তুতঃ পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা থেকে সাম্যবাদী সমাজে সোজাসুজিভাবে উত্তরণ করা যায় না। এই উত্তরণের জন্য একটি মধ্যবর্তী স্তরের প্রয়োজন। এই স্তর হোল সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বাধীনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যুগ, যাকে কমিউনিস্ট সমাজের 'প্রথম' বা 'নিম্নতর স্তর' বলে বর্ণনা করা হয়। এই স্তরকে 'বৈপ্লবিক পরিবর্তনের যুগ' বলে মার্কসবাদীরা অভিহিত করেন।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ হোল বৈপ্লবিক পরিবর্তনের যুগ

লেনিন বলেছেন, কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজে যাবতীয় কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রধানতঃ হিসাব রক্ষা করা ও নিয়ন্ত্রণ করা একান্ত প্রয়োজন। সমস্ত নাগরিক সশস্ত্র শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রের বেতনভুক কর্মচারীতে রূপান্তরিত হয়। দেশের সব নাগরিকই সমগ্র দেশব্যাপী একটিমাত্র

রাষ্ট্র 'সিন্ডিকেটের' কর্মচারী ও মজুরে পরিণত হয়। তখন যা বিশেষভাবে প্রয়োজন তা হোল—এরা সমানভাবে কাজ করবে, নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবে এবং সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাবে। এর জন্য হিসাব রাখা ও নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষ প্রয়োজন। জনগণের অধিকাংশই যখন স্বাধীনভাবে সর্বত্র এই হিসাব রাখতে শুরু করবে, তখন এই নিয়ন্ত্রণ সর্বজনীন জাতীয় নিয়ন্ত্রণে পরিণত হবে, তখন কেউ কোনমতেই এই নিয়ন্ত্রণ এড়াতে পারবে না। সমগ্র সমাজই তখন একটিমাত্র অফিস ও একটিমাত্র কারখানায় পরিণত হবে। সেখানে সমান কাজের জন্য সমান বেতন প্রদান করা হবে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে সর্বজনীন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা

পুঁজিপতিদের পরাজিত ও শোষকদের উৎখাত করার পর শ্রমিকশ্রেণী সমগ্র সমাজের মধ্যে 'কারখানা'র শৃঙ্খলা প্রবর্তন করবে। কিন্তু কারখানার শৃঙ্খলা কখনই সমাজতান্ত্রিক সমাজের চরম লক্ষ্য বলে বিবেচিত হবে না। পুঁজিবাদী শোষণের যাবতীয় বীভৎসতা ও কদর্যতা সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত করে সমাজকে পরিশুদ্ধ করে তোলার জন্য এবং কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আর একধাপ অগ্রসর হওয়ার জন্য কারখানার শৃঙ্খলাকে একটি পদক্ষেপ বলে গণ্য করা হয়।

কলকারখানায় শৃঙ্খলার প্রবর্তন

লেনিন বলেছেন, "সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন-সম্পর্কের ভিত্তি হোল উৎপাদনের উপাদানের উপর সামাজিক মালিকানার প্রতিষ্ঠা। এখানে এখন আর শোষক ও শোষিত থাকে না। যে যেমন কাজ করে, উৎপন্ন দ্রব্যের সে তেমন ভাগ পায়। এই নীতির মূল কথা হোল—'যে কাজ করবে না, সে খেতেও পাবে না।' এখানে উৎপাদন-ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক হোল বন্ধুসুলভ সহযোগিতা এবং শোষণমুক্ত শ্রমিকদের পারস্পরিক সমাজতান্ত্রিক সহযোগিতা। এখানকার উৎপাদন-শক্তির চরিত্রের সঙ্গে এই উৎপাদন-সম্পর্ক সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। কারণ উৎপাদনের উপাদানে সামাজিক মালিকানা উৎপাদন ব্যবস্থার সামাজিক চরিত্রকে শক্তিশালীই করে।"

সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন-সম্পর্কের ভিত্তি

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বুর্জোয়া অধিকার সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয় না; তা আংশিকভাবে বিলুপ্ত হয় মাত্র। কারণ তখনও পর্যন্ত অর্থনৈতিক রূপান্তর যতটুকু সম্পাদিত হয় শুধুমাত্র সেই অনুপাতে অর্থাৎ কেবলমাত্র উৎপাদনের উপায়গুলির উপরই বুর্জোয়া অধিকার লোপ পায়। যেহেতু প্রত্যেকের নিকট থেকে সমাজ যে পরিমাণ শ্রম পায় সেই অনুপাতে ভোগের দ্রব্যসামগ্রী প্রত্যেককে বণ্টন করে, সেহেতু তখনও বণ্টন ব্যবস্থায় যথেষ্ট অসাম্য বিদ্যমান থাকে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়া অধিকারের অবস্থিতি

সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে শোষকশ্রেণী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতা হারিয়ে সমাজের অ-প্রধান শ্রেণীতে পরিণত হয়। অন্যদিকে এতদিন ধরে বুর্জোয়া সমাজে যে শ্রমিকশ্রেণী শোষিত ও নির্যাতিত হোত সেই শ্রেণী শাসক-

শ্রেণীদ্বন্দ্বের অবস্থিতি

শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয় এবং সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর সংগঠক ও নির্দেশক হিসেবে সমাজের সর্বপ্রধান শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু এই সমাজে শোষকশ্রেণীর অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত না হওয়ায় তারা সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের প্রতি পদক্ষেপে শ্রমিকশ্রেণীর বিরোধিতা করতে এবং বাধা দিতে থাকে। অনেক সময় রাজনৈতিক ক্ষমতাচ্যুত এই বুর্জোয়ারা তাদের আন্তর্জাতিক মিত্রদের সহায়তায় পুনরায় রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখে এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা চালাতে কৃতসংকল্প হয়। এমতাবস্থায় শোষকশ্রেণীর যে-কোন ধরনের চক্রান্ত ও প্রতিরোধকে চূর্ণ করে দিয়ে সমাজতন্ত্রের সুদৃঢ়করণে শ্রমিকশ্রেণীকে কঠোরভাবে আত্মনিয়োগ করতে হয়। মাও সে-তুঙ যথার্থই বলেছিলেন, সমাজতান্ত্রিক সমাজ বেশ দীর্ঘ একটি ঐতিহাসিক অধ্যায় জুড়ে পরিব্যাপ্ত। এই অধ্যায়ে শ্রেণীসমূহ, শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও শ্রেণীসংগ্রাম থেকে যায়; থেকে যায় সমাজতান্ত্রিক পথ ও পুঁজিবাদের পথের মধ্যেকার সংগ্রাম এবং পুঁজিবাদের পুনরুজ্জীবনের বিপদ। তাই এই পর্যায়ে নিরবছিন্নভাবে শ্রমিকশ্রেণীকে বিপ্লব চালাতে হয়।

রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা

সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য হোল সমাজ-তন্ত্রবিরোধী সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের পথকে সুগম করা। এরূপ সমাজে তাই রাষ্ট্রযন্ত্রের একান্ত প্রয়োজন। লেনিন বলেছেন, "শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র হোল শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক বুর্জোয়াশ্রেণীকে দমন করার একটি যন্ত্রমাত্র।...এই দমনকার্য আবশ্যক, কারণ বুর্জোয়াশ্রেণী তার অধিকারচ্যুতির বিরুদ্ধে সর্বদাই ভীষণভাবে রুখে দাঁড়ায়।" সুতরাং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকেও শ্রেণীরাষ্ট্র বলে অভিহিত করা যায়। তবে শোষণমূলক সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্র যেমন শতকরা ১০ ভাগের স্বার্থে ৯০ ভাগের বিরুদ্ধে কাজ করত, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তা করে না। এই রাষ্ট্র শতকরা ৯০ জনের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে শতকরা ১০ জনকে দমন করে। এইভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়তায় শ্রমিকশ্রেণী একের পর এক বৃহৎ শিল্প, ব্যাঙ্ক, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতির উপর যেমন সামাজিক মালিকানার প্রতিষ্ঠা করবে, অন্যদিকে তেমনি কৃষকদের জন্য 'উৎপাদক সমবায়' (Producer Co-operatives) স্থাপন করবে এবং শিল্প থেকে পুঁজিবাদী উপাদানগুলিকে সরিয়ে দিয়ে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করবে। সেইসঙ্গে ক্রমে ক্রমে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শহর ও গ্রামের ক্ষুদ্র উৎপাদন ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করে সমস্ত ধরনের সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন করে এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণায় উদ্বুদ্ধ করে সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের পথকে প্রশস্ত করতে হবে। তবে এ কাজ সম্পাদন করা যথেষ্ট কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ।

সাম্যবাদী সমাজ-গঠনের অন্যান্য শর্ত

নতুন সমাজের গঠন ও বিকাশ তখনই সুনিশ্চিত হবে যখন সমাজের অধিকাংশ মানুষ সচেতনভাবে সমাজ-পুনর্গঠনের কাজে এগিয়ে আসবে। বলা বাহুল্য, শ্রমিকদের সঙ্গে কৃষক ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষের ব্যাপক মৈত্রীবন্ধনই সমাজতন্ত্রের অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করে ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সমাজতান্ত্রিক সব অংশ ও শ্রেণীর স্বার্থকে

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এমন এক অভিন্ন কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যার ফলে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র-বহির্ভূত সংস্থাগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হোল :

সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

(ক) সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শ্রেণীশোষণ না থাকলেও অধিকারচ্যুত বুর্জোয়া সম্প্রদায় সাময়িকভাবে এই ব্যবস্থার সাফল্যের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

(খ) উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। 'যে কাজ করবে না, সে খেতেও পাবে না'—এই নীতির উপর ভিত্তি করে সমাজ পরিচালিত হয়।

(গ) দাসব্যবস্থা, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মত এই ব্যবস্থায় কোন পরশ্রমভোগী শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকে না।

(ঘ) সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে সহায়তা করা এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে দমন করার জন্য সর্বহারাশ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

(ঙ) সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য ও স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে স্ত্রীলোকের উপর পুরুষের কর্তৃত্বের অবসান ঘটে। স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সম-মর্যাদা লাভ করে।

৭। সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা (Communist Society)

সাম্যবাদী সমাজের পূর্বশর্ত

রাষ্ট্রবিপ্লবের মাধ্যমে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শ্রমিকশ্রেণী মহান কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এবং সর্বহারা শ্রেণীর রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়তায় আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সর্বপ্রকার চক্রান্তকে ধ্বংস করে দিয়ে নতুন সমাজ গঠনের কাজে হাত দেয়। উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করার পর উপাদানকে উন্নত স্তরে উন্নীত করার জন্য পরিকল্পিত উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করবে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে উৎপাদন-বৃদ্ধির ফলে এমন এক সময় আসবে যখন সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী প্রদান করা সম্ভব হবে, লোকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করবে। সমাজতন্ত্রের এই বিকশিত পর্যায়ে প্রয়োজনের ভিত্তিতে বন্টনব্যবস্থা পরিচালিত হওয়ার ফলে সমাজে যথার্থ সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

গ্রাম ও শহর, কায়িক ও মানসিক শ্রমের মধ্যে পার্থক্য বিলোপ

কৃষিতে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলের প্রয়োগ, যৌথ খামারের সৃষ্টি ইত্যাদির ফলে গ্রামগুলির উন্নতি সাধিত হতে থাকে। কৃষকদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপক প্রসার তাদের মুক্তমনা করে তোলে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে কৃষকেরা শ্রমিকশ্রেণীর পাশে এসে দাঁড়াতে সমর্থ হয়। ফলে শহর ও গ্রামের এবং কায়িক ও মানসিক শ্রমের মধ্যেকার পার্থক্য বিদূরিত হতে থাকে। মানুষকে তখন আর কৃত্রিম শ্রমবিভাগের দাস হয়ে থাকতে হয় না। এরূপ সমাজে শ্রম মানুষের কাছে বোঝা হয়ে দেখা দেয় না। মানুষ সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যাণে শ্রম করার

জন্য এগিয়ে আসে। অবশ্য সমাজতান্ত্রিক সমাজের এরূপ বিকাশের জন্য জনগণের মানসিকতার আমূল পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন। এই পরিবর্তন আনার জন্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাংস্কৃতিক বিপ্লব একান্তভাবেই অপরিহার্য। এইভাবে সমাজতন্ত্র তার প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করে উচ্চতর পর্যায়ে উপনীত হলেই সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। এরূপ সমাজে কোনরূপ স্বার্থদ্বন্দ্ব বা শ্রেণীদ্বন্দ্ব না থাকায় শ্রেণী-শাসনের হাতিয়ার হিসেবে রাষ্ট্রও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। শেষ পর্যন্ত অপ্রয়োজনীয় বলেই তা আপনা-আপনি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তবে এরূপ সমাজেও দ্বন্দ্ব থাকবে। কিন্তু সেই দ্বন্দ্ব মানুষের সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব নয়; প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব। অন্যভাবে বলা যায়, প্রকৃতিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য মানুষ তার সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে।

মার্কস ও লেনিনের অভিমত

সাম্যবাদী বা কমিউনিস্ট-সমাজের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে মার্কস বলেছিলেন, "কমিউনিস্ট-সমাজের উচ্চতর পর্যায়ে শ্রমবিভাগের অধীনে ব্যক্তির দাসত্ব যখন লোপ পেয়েছে এবং সেইসঙ্গে মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে বিরোধও অন্তর্হিত হয়েছে, শ্রম যখন জীবনধারণের একটি উপায়ই শুধু নয়, জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজন হয়ে উঠেছে, ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদিকা-শক্তিও যখন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সমবায়ী ধনসম্পদের সকল উৎসই যখন প্রবলতর ধারায় বইতে থাকে, কেবল তখনই বুর্জোয়া অধিকারের সংকীর্ণ চক্রজাল সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করে যাওয়া যেতে পারে। তখন সমাজ এই নীতি ঘোষণা করতে পারে যে, প্রত্যেকের নিকট থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী নেওয়া হবে এবং প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী দেওয়া হবে।" লেনিনও সাম্যবাদী সমাজের অনুরূপ চিত্র অঙ্কন করেছেন। তাঁর ভাষায়, "কমিউনিস্ট সমাজের উচ্চতর পর্যায়ে একসময় মানুষের উপর থেকে শ্রমবিভাগজনিত দাসত্ব এবং সেই সঙ্গে মানসিক ও শারীরিক শ্রমের পার্থক্য দূর হয়ে যাবে। তখন শ্রম আর শুধু জীবনধারণের উপায় হিসেবে গণ্য না হয়ে জীবনধারণের প্রয়োজন হিসেবে গণ্য হবে। সেই সময়ে প্রতিটি মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ফলে উৎপাদন-শক্তির প্রভূত বিকাশ হবে এবং সম্মিলিত সম্পদের সমস্ত উৎসগুলি থেকে অপর্যাপ্ত সম্পদের যোগান আসবে। তখনই সংকীর্ণ বুর্জোয়া রীতিকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে সমাজ তার পতাকায় লিখতে পারবে—' "প্রত্যেকের নিকট থেকে তার সামর্থ্য মত এবং প্রত্যেককে তার প্রয়োজন মত'।"

সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সমাজের পার্থক্য

সুতরাং বলা যায়, সমাজতান্ত্রিক সমাজ এবং সাম্যবাদী সমাজ অভিন্ন নয়; উভয়-প্রকার সমাজের মধ্যে কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। লেনিনের ভাষায় বলা যায়, "সমাজতান্ত্রিক সমাজ হোল সেই সমাজ যা সরাসরি ধনতন্ত্রের জঠর থেকে জন্মলাভ করে; নতুন সমাজের প্রথম রূপ হোল এই সমাজতান্ত্রিক সমাজ। পক্ষান্তরে, সাম্যবাদী সমাজ হোল সমাজের এক উন্নততর রূপ। সমাজতান্ত্রিক সমাজ দৃঢ়-ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করার পরেই কেবল এই সমাজের বিকাশ সম্ভব হয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজ বলতে সেই সমাজকে বোঝায় যেখানে পুঁজিপতিদের সাহায্য ছাড়াই কার্য-

নির্বাহ হয়, শ্রম যেখানে সামাজিক হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সংগঠিত অগ্রগামী বাহিনী অর্থাৎ শ্রমজীবীদের সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী অংশ যেখানে কড়াকড়িভাবে সমস্ত কিছু হিসাব রাখে, নিয়ন্ত্রণ ও তদারক করে। অধিকন্তু, সমাজতান্ত্রিক সমাজ বলতে এও বোঝায় যে, শ্রমের মান ও শ্রমের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে ; নির্ধারণ করতে হবে এই কারণে যে, সমস্ত কৃষিপ্রধান দেশে অসমন্বিত শ্রম, সামাজিক আর্থিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসের অভাব, ছোট উৎপাদকের পুরানো অভ্যাসের মতো পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের জের ও অভ্যাস থেকে যায়। এই সবকিছুই প্রকৃত সাম্যবাদী অর্থনীতির বিরোধী। পক্ষান্তরে, সাম্যবাদী সমাজ বলতে আমরা সেই সমাজকে বুঝি যেখানে মানুষ লোকহিতকর কর্তব্য সম্পাদনে স্বতঃই অভ্যস্ত হয়ে উঠবে এবং তাকে এই কাজে বাধ্য করার জন্য কোনও বিশেষ যন্ত্রের প্রয়োজন হবে না এবং যেখানে বিনা পারিশ্রমিকে সাধারণের হিতকর কাজ করা একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।”

সুতরাং সমাজবিকাশের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। প্রতিটি সমাজব্যবস্থার উৎপাদন-ধারার অগ্রগতি বজায় রাখতে হলে বিকশিত উৎপাদক-শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। ফলে প্রচলিত উৎপাদন-সম্পর্কের স্থান গ্রহণ করে নতুন উৎপাদন-সম্পর্ক। মার্কস তাঁর ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মাধ্যমে চমৎকারভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই সত্যটি প্রমাণ করেছেন।

উপসংহার

সপ্তম অধ্যায়

রাষ্ট্রের প্রকৃতি

[Nature of the State]

রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। মতাদর্শগত ভিন্নতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যহেতু রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে পরস্পর-বিরোধী নানা প্রকার মতবাদের সৃষ্টি হয়। এই মতবাদগুলির মধ্যে জৈব মতবাদ, আদর্শবাদ বা ভাববাদ, উদারনৈতিক মতবাদ এবং মার্কসীয় মতবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উদারনৈতিক মতবাদ ও মার্কসীয় মতবাদকে আধুনিক মতবাদ বলে অভিহিত করা যায়। আবার পূর্বোক্ত চার ধরনের মতবাদের মধ্যে কেবলমাত্র মার্কসীয় মতবাদকে 'বৈজ্ঞানিক মতবাদ' (scientific theory) বলা হয়।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ

১। জৈব মতবাদ (Organic or Organismic Theory)

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাচীন মতবাদগুলির মধ্যে জৈব মতবাদ অন্যতম। এই মতবাদের সমর্থক ও প্রচারকেরা জীববিজ্ঞানের সূত্র ধরেই রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের সময় থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত অনেক দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী জৈব মতবাদের সমর্থনে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। তবে একথা সত্য যে, রুশোর সময় পর্যন্ত এই মতবাদের সমর্থকগণ রাষ্ট্রকে জীবদেহের সঙ্গে কেবলমাত্র বাহ্য-সাদৃশ্যের ভিত্তিতেই তুলনা করেছেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর পর থেকে রাষ্ট্র ও জীবদেহকে অভিন্ন বলে আখ্যা দান করে রাষ্ট্রকে স্বাধীন সত্তা-বিশিষ্ট 'একটি জীবন্ত প্রাণী' (a living organism) বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্লুন্টস্‌লি প্রমুখ দার্শনিকগণ এরূপ চরম অভিমত পোষণ করেন।

ভূমিকা

জৈব মতবাদের মূল বক্তব্যকে দু'ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমতঃ প্লেটো, অ্যারিস্টটল, সিসেরা (Cicero), সেন্ট পল (St. Paul), মারসিগলিও (Marsiglio of Padua), হবস্‌, রুশো প্রমুখ দার্শনিকগণ সাদৃশ্যমূলক যুক্তির ভিত্তিতে জীবদেহের সঙ্গে রাষ্ট্রকে তুলনা করেছেন। দ্বিতীয়তঃ ব্লুন্টস্‌লি প্রমুখ দার্শনিকগণ রাষ্ট্রকে স্বাধীন সত্তাবিশিষ্ট একটি সামাজিক জীব অর্থাৎ 'মানবের প্রতিমূর্তি" (image of the human organism) বলে বর্ণনা করেছেন।

মতবাদের মূল বক্তব্য

রাষ্ট্র এবং জীবদেহের মধ্যে সাদৃশ্য প্রমাণ করার জন্য জৈব মতবাদিগণ সাধারণতঃ নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করেন:

রাষ্ট্র ও জীবদেহের মধ্যে সাদৃশ্য

(ক) জীবদেহ বা প্রাণিদেহের মত রাষ্ট্রেরও একটি নিজস্ব স্বাধীন সত্তা রয়েছে। জীবদেহ যেমন অনেকগুলি জীবকোষের সমন্বয়ে গঠিত হয়, রাষ্ট্রও তেমনি গঠিত হয় অনেকগুলি ব্যক্তির সমন্বয়ে।

(খ) জীবদেহের কোষগুলি যেমন পরস্পর পরস্পরের উপর এবং সামগ্রিকভাবে জীবদেহের উপর নির্ভরশীল, তেমনি রাষ্ট্রের অন্তর্গত ব্যক্তিরাও একে অপরের উপর এবং সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে ব্যক্তির কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না। স্পেনসার (Spencer)-এর ভাষায় বলা যায়, হস্ত যেমন বাহুর উপর নির্ভরশীল এবং বাহু যেমন শরীর ও মস্তিষ্কের উপর নির্ভরশীল, সমাজদেহের বিভিন্ন অংশও তেমনি একে অপরের উপর নির্ভরশীল। জীবদেহ থেকে কোন একটি অঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করলে সেই অঙ্গটি যেমন অকেজো এবং অর্থহীন হয়ে যায় অনুরূপভাবে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে ব্যক্তিও নিজের স্বাধীন সত্তা হারিয়ে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে লীকক (Leacock) বলেন, মানুষের হস্তের সঙ্গে তার শরীরের যেমন সম্পর্ক কিংবা বৃক্ষের সঙ্গে বৃক্ষপত্রের যেমন সম্পর্ক, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজেরও অনুরূপ সম্পর্ক।

(গ) জীবদেহের মত রাষ্ট্রেরও স্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটে। জন্ম-মৃত্যু, ক্ষয়-বৃদ্ধি ইত্যাদি জীবদেহে যেমন স্বাভাবিকভাবে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই ঘটে, তেমনি রাষ্ট্রেরও জন্ম-মৃত্যু, ক্ষয়-বৃদ্ধি প্রভৃতি অনিবার্য।

(ঘ) জীবদেহ এবং রাষ্ট্র উভয়েই জন্মের আদি-লগ্নে অতি ক্ষুদ্র জীবাণু হিসেবে জীবন শুরু করে। কিন্তু ক্রমবিবর্তনের ফলে তাদের গঠন একইভাবে জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে। এই অবস্থায় তাদের সাদৃশ্যের ক্ষেত্রেও জটিলতা আসে। বিবর্তনের প্রতিটি স্তরেই জীবদেহ ও সমাজদেহের প্রতিটি অংশই একে অপরের উপর নির্ভরশীল থেকেই কাজ করে।

(ঙ) জীবদেহের পরিচালন ব্যবস্থাকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা— ১. সংরক্ষণকারী ব্যবস্থা (Sustaining System), ২. সংযোগ রক্ষাকারী ব্যবস্থা (Distributory System) এবং ৩. নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থা (Regulatory System)। রাষ্ট্রের পরিচালন ব্যবস্থাকেও অনুরূপ তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায় বলে স্পেনসার অভিমত পোষণ করেন। খাদ্যনালী, পাকস্থলী প্রভৃতি যেমন জীবদেহের সংরক্ষণকারী ব্যবস্থা, তেমনি, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি হোল রাষ্ট্রের সংরক্ষণকারী ব্যবস্থা। জীবদেহের শিরা-উপশিরা প্রভৃতির মাধ্যমে যেমন যোগাযোগ রক্ষিত হয়, তেমনি রেলপথ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতার ইত্যাদি রাষ্ট্রের সংযোগ-সাধনকারী ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে। মস্তিষ্কের নির্দেশে প্রতিটি জীবদেহ যেমন পরিচালিত হয়, সরকারের নির্দেশে অনুরূপ-ভাবে রাষ্ট্রও পরিচালিত হয়। এসব দিক থেকে বিচার করে রাষ্ট্রকে একটি প্রাণিদেহের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। জীবের মত রাষ্ট্র এবং সমাজেরও একটি সামগ্রিক সত্তা আছে। রাষ্ট্রের এই সামগ্রিক সত্তার অংশ হোল ব্যক্তি। সমগ্রকে বাদ দিয়ে যেমন অংশের কথা কল্পনা করা যায় না, তেমনি রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে ব্যক্তির কোন অস্তিত্বই থাকতে পারে না বলে জৈব মতবাদের সমর্থকগণ মনে করেন। এইসব যুক্তির অবতারণা করে তাঁরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে ত্রুটিপূর্ণ বলে বর্ণনা করেছেন।

ব্লুন্টস্‌লির হাতে জৈব মতবাদ চরম আকার ধারণ করে। তিনি রাষ্ট্রকে স্বাধীন সত্তাবিশিষ্ট একটি সামাজিক জীব অর্থাৎ 'মানবের প্রতিমূর্তি" (image of the human organism) বলে বর্ণনা করেছেন। অন্যভাবে বলা যায়, তিনি রাষ্ট্র ও

মানবদেহের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য আছে বলে স্বীকার করতে সম্মত নন। উভয়ের প্রকৃতি এবং কার্যকলাপ অভিন্ন বলে তিনি প্রচার করেন। তাঁর মতে, একখানি তৈলচিত্র যেমন কয়েক বিন্দু তৈলের সমষ্টি ছাড়া আরও কিছু, একটি মর্মর মূর্তি যেমন কয়েক টুকরো মর্মর প্রস্তরের সমষ্টি ছাড়া আরও কিছু, একটি মানুষ যেমন কিছু সংখ্যক কোষ ও রক্তকণিকার সমষ্টি ছাড়া আরও কিছু, তেমনি জাতি বা রাষ্ট্রও কতিপয় বাহ্য-নিয়ন্ত্রণের সমষ্টি ছাড়া আরও কিছু। এমনকি, তিনি রাষ্ট্রকে পুরুষ এবং চার্চকে নারী-প্রকৃতিসম্পন্ন বলে বর্ণনা করেছেন।

রাষ্ট্রই জীবন্ত প্রাণী

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, হার্বার্ট স্পেনসার, অ্যালবার্ট শাফল্ প্রমুখ জৈব মতবাদকে সমর্থন করলেও তাঁরা ব্লুন্টস্‌লির মত চরম অভিমত প্রদান করেননি। স্পেনসারের মতে, রাষ্ট্র ও জীবদেহ উভয়ের জীবনের সূত্রপাত হয় ক্ষুদ্র জীবাণুরূপে। কিন্তু ক্রমাবিবর্তনের ফলে একইভাবে তাদের গঠনপ্রকৃতি জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে। এই অবস্থায় তাদের সাদৃশ্যের ক্ষেত্রেও জটিলতা আসে। তবে তাদের মধ্যে সাদৃশ্যগুলি খুঁজে বের করা আদৌ কষ্ঠসাধ্য নয়। এই বিবর্তনের প্রতিটি স্তরেই জীবদেহ ও সমাজদেহের প্রতিটি অংশই একে অপরের উপর নির্ভরশীল। স্পেনসার জীবদেহ এবং সমাজদেহের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন, জীবদেহের কোষগুলি জীবদেহের অভ্যন্তরে সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত থাকে। কিন্তু সমাজদেহের কোষগুলি অর্থাৎ মানুষ পরস্পরের সঙ্গে সেরূপ সুদৃঢ়ভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকে না। তাছাড়া, মানবদেহের একটি ক্ষুদ্র অংশে তার সমগ্র চেতনা কেন্দ্রীভূত থাকে। কিন্তু রাজনৈতিক চেতনা রাষ্ট্রের কোন বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেনি। জীবদেহের সঙ্গে সমাজদেহের এরূপ অসামঞ্জস্য তুলে ধরে স্পেনসার রাষ্ট্রের উপর মানুষের নির্ভরশীলতার পরিবর্তে ব্যক্তির পৃথক সত্তা ও স্বাতন্ত্র্যের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকেই প্রচার করতে চেয়েছেন। অবশ্য একথা সত্য যে, স্পেনসার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সঙ্গে জৈব মতবাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করলেও উভয় মতবাদের মধ্যে যে মূলগত পার্থক্য রয়েছে তা কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বার্কার বলেন, তাঁর দর্শন স্বাভাবিক অধিকার এবং জৈবিক তুলনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

স্পেনসারের অভিমত

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টট্ল এবং রোমান দার্শনিক সিসেরো প্রমুখ প্রাচীন যুগের দার্শনিকগণ রাষ্ট্রকে জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। সেন্ট পলও চার্চকে যীশুখ্রীষ্টের 'জীবন্ত দেহে'র সঙ্গে তুলনীয় বলে প্রচার করেছিলেন। মধ্যযুগে সলস্‌বেরির জন (John of Salisbury), মারসিগ্‌লিও প্রমুখ দার্শনিকগণ জীবদেহের সঙ্গে রাষ্ট্রের সাদৃশ্য আছে বলে মনে করতেন। এমন কি হবস্, রুশো প্রমুখ আধুনিক যুগের প্রথম পর্যায়ের দার্শনিকগণও অনুরূপ মত পোষণ করতেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ডারউইন (Darwin)-এর বিবর্তনবাদ (Evolutionary Theory) প্রচারিত হওয়ার পর জৈব মতবাদ নতুন ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করে। এই পর্যায়ে জৈব মতবাদের

জৈব মতবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

প্রধান প্রবক্তা ছিলেন ইংরেজ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসার, জার্মান দার্শনিক ব্লুন্টস্‌লি, ফিক্‌টে (Fichte), অস্ট্রীয় সমাজবিজ্ঞানী অ্যালবার্ট শাফল, পোলিশ দার্শনিক গামপ্লাউইট্‌স প্রমুখ। তবে ব্লুন্টসলির হাতেই জৈব মতবাদ পরিপূর্ণ এবং চরম রূপ পরিগ্রহ করে।

সমালোচনা ঃ জৈব মতবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে গার্নারের অভিমত হোল, এই মতবাদ যদি একথা স্বীকার করে যে, রাষ্ট্র হোল এমন একটি সমাজ যার সদস্যরা সমগ্র সমাজের উপর নির্ভরশীল এবং সমাজও অনুরূপভাবে তার অংশ ব্যক্তিসমূহের উপর নির্ভরশীল, তাহলে জৈব মতবাদের বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ কোন অভিযোগ আনয়ন করা যায় না। কিন্তু যেহেতু এই মতবাদ রাষ্ট্রকেই প্রধান বলে ঘোষণা করেছে এবং ব্যক্তির ঊর্ধ্বে তাকে স্থান দিয়েছে, সেহেতু মতবাদটি নিঃসন্দেহে ত্রুটিপূর্ণ। বস্তুতঃ রাষ্ট্রের প্রতি অখন্ড আনুগত্য প্রদর্শন করাকে স্বাধীনতা বলে বর্ণনা করে জৈব মতবাদ কার্যতঃ ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী ও হন্তারক ফ্যাসীবাদ এবং নাৎসীবাদকেই সমর্থন করেছে। তাই গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের যুগে এরূপ এক অগণতান্ত্রিক মতবাদকে যুক্তিবাদী কোন ব্যক্তিই সমর্থন করতে পারেন না।

অগণতান্ত্রিক মতবাদ

দ্বিতীয়তঃ আপাতদৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও জীবদেহের মধ্যে নানা প্রকার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেলেও উভয়ে অভিন্ন নয়। এই সাদৃশ্য বাহ্য-সাদৃশ্য মাত্র। বস্তুতঃ জীবদেহ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বৈসাদৃশ্যগুলি হোল ঃ

রাষ্ট্র ও জীবদেহের তুলনা ভ্রান্ত

(১) কতকগুলি জীবকোষের সমবায়ে জীবদেহ গঠিত হয়। এই জীবকোষগুলি পরস্পরের সঙ্গে সুসংবদ্ধ অবস্থায় থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রের অন্তর্গত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান-সমূহ জীবকোষের মত আদৌ সুসংবদ্ধ নয়।

(২) জীবকোষগুলির কোন স্বাধীন সত্তা নেই। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে কোন জীবকোষই বাঁচতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান স্বাধীন সত্তা-বিশিষ্ট। তাদের নিজস্ব ইচ্ছা, নিজস্ব চেতনা প্রভৃতি সব কিছুই আছে। তাই রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও তাদের মৃত্যু ঘটে না।

(৩) কোন একটি জীবদেহের বিশেষ কোন একটি জীবকোষ একই সঙ্গে একাধিক দেহে অবস্থান করতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট্রের অন্তর্গত যে-কোন ব্যক্তি একই সঙ্গে রাষ্ট্র ছাড়াও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ গ্রহণ করতে পারে।

(৪) প্রতিটি জীবদেহ পূর্ববর্তী কোন একটি জীবদেহ থেকে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু রাষ্ট্র আপনা থেকেই জন্ম গ্রহণ করতে পারে। জেলিনেক (Jelinek) ঐতিহাসিক-ভাবে প্রমাণ করেছেন যে, জীবের জন্ম-পদ্ধতি অনুকরণের পরিবর্তে কেবলমাত্র তরবারির সাহায্যেই অনেক রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে।

(৫) জন্ম-মৃত্যু, ক্ষয়-বৃদ্ধি প্রভৃতি জীবদেহের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। জন্মগ্রহণ করার পর জীবদেহের স্বাভাবিক পরিণতি হোল মৃত্যু। কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষয় বা মৃত্যু জীবদেহের মত অনিবার্য নয়।

(৬) জীবদেহের বৃদ্ধিসাধন পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করে তার পরিবেশ এবং

প্রাকৃতিক জৈবিক নিয়মের উপর। কিন্তু গার্নারের মতে, রাষ্ট্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, পরিবর্তিত হয় মাত্র।

(৭) জীবদেহের একটি ক্ষুদ্র অংশে তার সমগ্র চেতনা কেন্দ্রীভূত থাকে। কিন্তু রাজনৈতিক চেতনা বিশেষ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে না।

অসম্পূর্ণ মতবাদ

তৃতীয়তঃ জৈব মতবাদ রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ কোন ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারে না। বস্তুতঃ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নিজেদের বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করবার জন্য জীবদেহের সঙ্গে রাষ্ট্রের সাদৃশ্য বর্ণনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, স্পেনসার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থনে জৈব মতবাদকে ব্যবহার করেছেন। আবার ব্লুন্টস্‌লি, ফিক্‌টে প্রমুখ জার্মান দার্শনিকগণ সর্বাত্মক রাষ্ট্রব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য জৈব মতবাদকে সমর্থন করেছেন।

শ্রেণী-সমন্বয়ের অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব

চতুর্থতঃ হার্বার্ট স্পেনসারের মতো জৈব মতবাদিগণ রাষ্ট্রের বিকাশকে জীবদেহের বিকাশের সঙ্গে তুলনা করে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে বলে মনে করেন। এরূপ তত্ত্ব থেকে তাঁরা এই অনুসিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সমাজদেহ যেহেতু জীবদেহের অনুরূপ সেহেতু সমাজের শ্রেণীবিভাজন স্বাভাবিক এবং সমাজের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম ও রাষ্ট্রের মৌলিক পরিবর্তনের প্রচেষ্টা অস্বাভাবিক। এইভাবে জৈব মতবাদ কার্যক্ষেত্রে শ্রেণী সমন্বয়ের কথা প্রচার করে অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে সমালোচিত হয়েছে। মার্কস ও এঙ্গেলস ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সাহায্যে একথা প্রমাণ করেছেন যে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি স্বাভাবিক হোল শ্রেণীসংগ্রামের অবস্থিতি।

জৈব মতবাদের এইসব ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য অধ্যাপক গেটেল মন্তব্য করেছেন, এই মতবাদ রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে যেমন কোনরূপ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারে না, তেমনি রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধেও কোনরূপ নির্ভরযোগ্য নির্দেশ দিতে পারে না।

জৈব মতবাদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার সমালোচনা করা হলেও এর তাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক মূল্যকে কোনভাবে অস্বীকার করা যায় না। যেমন ঃ

গুরুত্ব

(ক) জৈব মতবাদের তত্ত্বগত মূল্য হোল, রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এই মতবাদ রাষ্ট্রের সামগ্রিক ঐক্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

(খ) ঐতিহাসিক দিক থেকে এই মতবাদের গুরুত্ব অপরিসীম। বিবর্তনের ফলে রাষ্ট্র সৃষ্ট হয়েছে বলে ঘোষণা করে এই মতবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের তীব্র বিরোধিতা করেছে। রাষ্ট্রকে মানুষের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৃষ্ট কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান বলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের বর্ণনার ফলে ব্যক্তিগত স্বার্থসর্বস্ব সমাজ দ্রুত ভাঙ্গনের পথে ধাবিত হয়। সেই সময় জৈব মতবাদ পারস্পরিক সহযোগিতার কথা প্রচার করে সমাজের এরূপ ভাঙ্গন রোধ করতে সমর্থ হয়েছিল। বস্তুতঃ ব্যক্তির পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, রাষ্ট্রের সামগ্রিক ঐক্য এবং বিবর্তনের ফলে রাষ্ট্র সৃষ্ট—এ সব ঘোষণা করে জৈব মতবাদ রাষ্ট্রতত্ত্বে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে সমর্থ হয়েছে।

তবে ব্লুন্টস্‌লি প্রমুখ জার্মান দার্শনিকদের হস্তে মতবাদটি চরম আকার ধারণ করার ফলে তা সমালোচনার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। বর্তমানে জৈব মতবাদের প্রভাব নেই বললেই চলে। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে কোকার (Cocker) বলেছেন, বর্তমানে একমাত্র হেগেলীয় দর্শন ছাড়া অন্য কোথাও এই মতবাদের সন্ধান পাওয়া যায় না।

২। আদর্শবাদ বা ভাববাদ (Idealist Theory)

রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিষয়ক প্রাচীন মতবাদগুলির অন্যতম হোল আদর্শবাদ। অনেকে এই মতবাদকে ভাববাদ, আধ্যাত্মিক মতবাদ (Metaphysical Theory), অলৌকিক মতবাদ (Mystical Theory), চরম মতবাদ (Absolute Theory) প্রভৃতি নামে অভিহিত করলেও 'আদর্শবাদ' নামটি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়। কোন কিছুকে কল্পনার সাহায্যে ব্যাখ্যা করে তার বিমূর্ত ধারণাকে পূর্ণতা দান করাকে আদর্শবাদ বলা হয়।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

জোড (Joad)-এর মতে, রাষ্ট্র ও মনুষ্য-প্রকৃতি সম্বন্ধে প্লেটো এবং অ্যারিস্টট্‌ল প্রমুখ প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের ধারণার মধ্যেই আদর্শবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। প্লেটো তাঁর 'গণরাজ্য' (Republic) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সর্বাঙ্গ-সুন্দর আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করেছেন। অ্যারিস্টট্‌লের চিত্রিত রাষ্ট্র হোল পরিপূর্ণ সুন্দর জীবনের (good life) প্রতীক। তাঁর মতে, মানুষ যেহেতু প্রকৃতিগতভাবে রাজনৈতিক জীব সেহেতু কেবলমাত্র রাজনৈতিক সমাজের মধ্যেই সে তার জীবনকে পরিপূর্ণ ও সুন্দরভাবে বিকশিত করতে পারে। উল্লেখযোগ্য যে, এই দুজন গ্রীক দার্শনিক সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নির্দেশ করেননি। প্রাচীন গ্রীক রাষ্ট্রদর্শনে আদর্শবাদের সন্ধান পাওয়া গেলেও কান্ট (Kant), হেগেল (Hegel), ফিক্‌টে (Fichte), ট্রিট্‌স্‌কে (Treitchke), বার্নহার্ডি (Bernhardi) প্রমুখ জার্মান দার্শনিকদের হাতে এই মতবাদ পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়। সেদিক থেকে বিচার করে কান্টকে আদর্শবাদের জনক বলে অভিহিত করা হয়। কান্ট এবং হেগেল সর্বাত্মক ও ঐশ্বরিক কর্তৃত্বসম্পন্ন অতি-মানবীয় নৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রের কল্পনা করলেও ট্রিট্‌স্‌কে, বার্নহার্ডি প্রমুখের মতো তাঁরা রাষ্ট্রের চরম প্রকাশে যুদ্ধকে অপরিহার্য বলে মনে করতেন না। ট্রিট্‌স্‌কে রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতাকে তার পাপের প্রতীক বলে বর্ণনা করে আদর্শবাদকে কার্যতঃ 'সাম্রাজ্যবাদ' (imperialism) ও 'যুদ্ধবাদ' (militarism)-এ রূপান্তরিত করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে ফরাসী দার্শনিক রুশো এবং গ্রীন (T. H. Green), ব্রেড্‌লে (Bradley), বোসাংকোয়েত (Bosanquet) প্রমুখ ইংরেজ দার্শনিক আদর্শবাদের সমর্থনে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। রুশোর "সাধারণ ইচ্ছা' (General Will)-র ধারণা রাষ্ট্রকে চরম কর্তৃত্বসম্পন্ন একটি নৈতিক সত্তায় পর্যবসিত করেছে। গ্রীনের মতে, আত্মসচেতন মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজন। তবে তিনি হেগেলের মতো ব্যক্তিস্বাধীনতাকে রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। রাষ্ট্র ভুল করলে তার মঙ্গলের জন্যই তাকে বাধা দেওয়া

ব্যক্তির 'কর্তব্য' (duty) বলে তিনি অভিমত পোষণ করেন। বোসাংকোয়েত মনে করতেন যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতাগুলি বিদূরিত করাই হোল রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য। রাজনৈতিক ব্যাখ্যায় ব্রেড্‌লে কান্ট অপেক্ষা হেগেলীয় দর্শনের দ্বারা এবং গ্রীন হেগেল অপেক্ষা কান্টের দ্বারা অধিক পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

মূল বক্তব্য

আদর্শবাদের মূল বক্তব্যকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে।

রাষ্ট্র একটি নৈতিক প্রতিষ্ঠান

(১) আদর্শবাদীদের দৃষ্টি হোল একটি নৈতিক প্রতিষ্ঠান (ethical institution)। তাই রাষ্ট্রকে মান্য করার অর্থ নিজেকে মান্য করা। ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। সেই অভিন্ন লক্ষ্য হোল সুন্দর অথচ পরিপূর্ণ নৈতিক জীবনের প্রতিষ্ঠা। আদর্শবাদ ব্যক্তির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকদের পরিপূর্ণ নৈতিক জীবন প্রতিষ্ঠার সহায়ক অবস্থা সৃষ্টিকেও রাষ্ট্রের লক্ষ্য বলে মনে করত। হেগেলের মতে, সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠার জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের জৈব সম্পর্ক

(২) আদর্শবাদী দার্শনিকগণ মানুষকে সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীব বলে বর্ণনা করেছেন। রাজনৈতিক জীব বলেই সে কেবলমাত্র রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত সমাজের মধ্যে থেকে এবং তার সদস্য হিসেবে পরিপূর্ণভাবে আত্মোপলব্ধি করতে পারে। রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে ব্যক্তি তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা কল্পনাই করতে পারে না। অ্যারিস্টট্‌লের ভাষায়, রাষ্ট্র-বহির্ভূত ব্যক্তি কখনই ব্যক্তি-পদবাচ্য হতে পারে না ; হয় সে ঈশ্বর, নয় তো পশু। এভাবে আদর্শবাদ ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ককে জৈব মতবাদের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছে।

রাষ্ট্র একটি আত্ম-সচেতন সত্তা এবং আত্মোপলব্ধিকারী ব্যক্তি

(৩) আদর্শবাদীরা রাষ্ট্রকে প্রাণবন্ত, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং স্ব-ইচ্ছাবিশিষ্ট বলে বর্ণনা করেছেন। এইরূপ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রের ধারণা হেগেলীয় দর্শনে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় বলে বার্কার অভিমত পোষণ করেন। হেগেল রাষ্ট্রকে একটি আত্মসচেতন নৈতিক সত্তা এবং নিজের সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন ও নিজেকে উপলব্ধি করার ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ব্যক্তি (a self-conscious ethical substance and a self-knowing and self-actualizing individual) বলে বর্ণনা করেছেন।

আইনের প্রকৃতি

(৪) প্লেটো এবং অ্যারিস্টট্‌লের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অধিকাংশ আদর্শবাদী দার্শনিক আইনকে কেবলমাত্র 'সার্বভৌম কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তির আদেশ' না বলে 'আবেগহীন যুক্তির প্রকাশ' (the expression of passionless reason) বলে বর্ণনা করেছেন। এরূপ আইনকে অমান্য করার কোন অধিকার নাগরিকদের থাকতে পারে না। রাষ্ট্রের আইন মান্য করাকেই স্বাধীনতা বলে আদর্শবাদীগণ প্রচার করেছেন।

(৫) আদর্শবাদ রাষ্ট্রকে মানুষের স্বভাবজ, অপরিহার্য এবং চূড়ান্ত সংগঠন বলে বর্ণনা করেছে। হেগেল রাষ্ট্রকে 'সর্বদোষমুক্ত বুদ্ধিময়তা' (perfected rationality)

এবং 'চেতনার বস্তুগত রূপ বা নৈতিক শক্তি' (objective reason or spirit) বলে অভিহিত করেছেন। এমন কি তিনি রাষ্ট্রকে 'মর্ত্যভূমিতে ঈশ্বরের পদক্ষেপ' (the march of God on earth) বলে বর্ণনা করেছেন। রাষ্ট্রকে মান্য করার অর্থ ঈশ্বরকে মান্য করা ; রাষ্ট্রের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের অর্থ ঈশ্বরের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। ঈশ্বরের ক্ষমতার মতোই রাষ্ট্রের ক্ষমতা অসীম, চরম, সর্বব্যাপী এবং সঠিক। রাষ্ট্রের ইচ্ছা যেহেতু 'সাধারণ ইচ্ছা'র নামান্তর, সেহেতু রাষ্ট্র কোন ভুল বা অন্যায় করতে পারে না। কোন ব্যক্তি যদি রাষ্ট্রের নির্দেশকে তার ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী বলে মনে করে তাহলে ধরে নিতে হবে যে সেই ব্যক্তি যথার্থ বিচারশক্তি হারিয়ে ফেলেছে এবং সে তার 'অপ্রকৃত ইচ্ছা'র (unreal will) দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বলপ্রয়োগের দ্বারা আইন মান্য করতে বাধ্য করবে। তা করা হলে ব্যক্তি তার প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে। অন্যভাবে বলা যায়, আদর্শবাদীদের মতে, রাষ্ট্র যেহেতু 'প্রকৃত ইচ্ছা'র প্রকাশস্থল, সেহেতু কেবলমাত্র রাষ্ট্রের প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমেই ব্যক্তি তার স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। হেগেলের ভাষায়, রাষ্ট্র হোল 'স্বাধীনতাব মূর্ত প্রতীক' (actualization of freedom)। এইভাবে হেগেল প্রমুখ জার্মান দার্শনিকগণ রাষ্ট্রকে একটি অতি-মানবীয়, চরম ও সর্বাত্মক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেছেন। গার্নার তাই বলেছেন, আদর্শবাদ রাষ্ট্রকে সু-উচ্চ বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করে রাষ্ট্রাধীন সব ব্যক্তিকে সেই বেদীমূলে প্রণাম করতে এবং বেদীতে অধিষ্ঠিত দেবতাকে পূজা করতে নির্দেশ দিয়েছে।

অতি-মানবীয় সর্বাত্মক রাষ্ট্রের কল্পনা

(৬) আদর্শবাদীদের অনেকেই জনগণের ইচ্ছাকে রাষ্ট্রের ভিত্তি বলে বর্ণনা করেছেন। গ্রীন বলেছেন, রাষ্ট্রের ভিত্তি হোল জনগণের সম্মতি—আসুরিক বা পাশবিক বল নয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, রাষ্ট্র আদৌ কোনরূপ বলপ্রয়োগ বা শক্তিপ্রয়োগ করবে না। অবশ্য ফিক্‌টে, ট্রিটস্‌কে প্রমুখ আদর্শবাদিগণ যুদ্ধকে অপরিহার্য বলে মনে করতেন। এমন কি যুদ্ধকে 'অশুভ' (evil) বলে বর্ণনা করলেও তার নৈতিক প্রয়োজনীয়তাকে হেগেল একেবারেই অস্বীকার করেননি।

রাষ্ট্রের ভিত্তি ও যুদ্ধ সম্পর্কে ধারণা

(৭) পরিশেষে বলা যায়, আদর্শবাদ সমাজ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নিরূপণ করেনি। তা ছাড়া, সমাজবিবর্তনের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ স্তরে রাষ্ট্রের জন্ম বলে আদর্শবাদীরা অভিমত পোষণ করেন।

অন্যান্য অভিমত

সমালোচনা : নানাদিক থেকে আদর্শবাদের সমালোচনা করা হয় :

(ক) রাষ্ট্রকে মানুষের নৈতিক ইচ্ছা ও কল্যাণকর প্রকৃত ইচ্ছার প্রকাশ বলে বর্ণনা করে আদর্শবাদিগণ বাস্তব এবং জগৎ অপেক্ষা কল্পলোকের জগতে অধিক বিচরণ করেছেন বলে সমালোচনা করা হয়। রাষ্ট্র যে শ্রেণী-শাসনের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে আদর্শবাদ সেই বাস্তব সত্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে অবাস্তব মতবাদে পরিণত হয়েছে। ১৯৪৯ সালের পূর্বে চীন, কিংবা ১৯১৭ সালের পূর্বে জারশাসিত রাশিয়ায় রাষ্ট্রের মাধ্যমে কল্যাণকর

অবাস্তব মতবাদ

প্রকৃত ইচ্ছার আদৌ কোন প্রকাশ ঘটেনি অর্থাৎ সেই সব রাষ্ট্র সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশস্থল হিসেবে কাজ করেনি—সম্ভবতঃ এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করার কোন অবকাশ নেই। তাই অধ্যাপক বার্কারের ভাষায় বলা যায়, আদর্শবাদ যে রাষ্ট্রের কথা কল্পনা করেছে তা কল্পিত স্বর্গরাজ্যের রাষ্ট্রমাত্র। মাটির পৃথিবীতে কখনই এরূপ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়নি।

(খ) আদর্শবাদী দার্শনিকগণ রাষ্ট্রকে একটি আত্মসচেতন নৈতিক বস্তু এবং আত্মোপলব্ধিকারী ব্যক্তি বলে কল্পনা করে ভুল করেছেন। কিছুদূর পর্যন্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে জীবদেহের সাদৃশ্য নিরূপণ করা গেলেও জৈব মতবাদীদের মত রাষ্ট্রকে কখনই জীবদেহ বলে বর্ণনা করা যায় না। জীবদেহের সঙ্গে রাষ্ট্রের কতগুলি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

রাষ্ট্রের সঙ্গে জীবদেহের তুলনা ভ্রান্ত

(গ) আদর্শবাদ রাষ্ট্র ও সমাজকে অভিন্ন বলে বর্ণনা করে সত্যের অপলাপ করেছে। কারণ সমাজের গণ্ডি রাষ্ট্রের গণ্ডি অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যাপক। রাষ্ট্র হোল সমাজের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছাড়াও সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি নানাবিধ প্রতিষ্ঠান আছে। মানবজীবনের উপর এইসব প্রতিষ্ঠানের প্রভাব কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

রাষ্ট্র ও সমাজ অভিন্ন নয়

(ঘ) অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে, 'ইচ্ছার' প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আদর্শবাদী দার্শনিকগণ যে সব যুক্তির অবতারণা করেন মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে তা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। 'প্রকৃত ইচ্ছা' (Real will) ও 'অপ্রকৃত ইচ্ছা' (Unreal will)-এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে কার্যতঃ তাঁরা ব্যক্তিত্বকে দ্বি-খণ্ডিত করেছেন।

ব্যক্তিত্বের দ্বিখণ্ডীকরণ

(ঙ) আদর্শবাদ আইন মান্য করাকে স্বাধীনতা বলে বর্ণনা করে স্বাধীনতার প্রকৃতি সম্বন্ধে বিকৃত এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করেছে। আইন ও স্বাধীনতা কখনই অভিন্ন নয়। আইন হোল মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক সমর্থিত সাধারণ নিয়ম। কিন্তু স্বাধীনতা বলতে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি বোঝায় যেখানে প্রতিটি মানুষ তার নিজের ব্যক্তিসত্তাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করতে পারে।

আইন ও স্বাধীনতা অভিন্ন নয়

(চ) বার্কারের মতে, আদর্শবাদের সমর্থকবৃন্দ ব্যক্তির 'সচেতন ইচ্ছা' (conscious will) এবং 'যুক্তিবাদী মন'-এর উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মানুষের আচার-আচরণের পশ্চাতে যেমন তার বিচারবুদ্ধি ও যুক্তিবাদী মন কাজ করে, তেমনি আবেগ, সহজাত প্রবৃত্তি ইত্যাদিও সমভাবে কাজ করে। আদর্শবাদ মানবচরিত্রের এই সব স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে উপেক্ষা করে ভুল করেছে বলে সমালোচনা করা হয়।

মানব-প্রবৃত্তিকে উপেক্ষা

(ছ) জোডের মতে, আদর্শবাদ ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী। রাষ্ট্র কোন ভুল করতে পারে না, রাষ্ট্র নিজেই নিজের চরম লক্ষ্য (end in itself) ইত্যাদি যুক্তির

অবতারণা করে আদর্শবাদী দার্শনিকগণ কার্যক্ষেত্রে চরম ও সর্বাত্মক রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছেন। এরূপ রাষ্ট্রের নির্দেশ অবনতমস্তকে মান্য করাকেই আদর্শবাদ স্বাধীনতা বলে অভিহিত করেছে। কিন্তু হবহাউস (Hobhouse)-এর মতে, আদর্শবাদীরা যাকে প্রকৃত স্বাধীনতা বলে বর্ণনা করেছেন কার্যতঃ তা স্বাধীনতার অস্বীকার মাত্র।

ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী মতবাদ

(জ) ড্যুগুই (Duguit) প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ মনে করেন যে রাষ্ট্রের উপর দেবত্ব আরোপ করে আদর্শবাদ প্রকৃতপক্ষে ফ্যাসীবাদী ও নাৎসীবাদী সর্বাত্মক ও স্বৈরাচারী রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। ম্যাকআইভার (MacIver)-এর মতে, আদর্শবাদ স্বৈরতন্ত্রকে সমর্থন করার একটি অভিনব কৌশল মাত্র (a new way of justifying absolutism)।

স্বৈরাচারিতাকে সমর্থন

(ঝ) হেগেল যুদ্ধের নৈতিক উপযোগিতার কথা স্বীকার করেছেন। ফিকটে, ট্রিটস্‌কে প্রমুখ রাষ্ট্রের সীমারেখার পরিব্যাপ্তি সাধনে যুদ্ধকে অপরিহার্য বলে বর্ণনা করে এক বিপজ্জনক মতবাদের জন্ম দিয়েছেন। সামরিকতন্ত্র ও যুদ্ধবাদের সপক্ষে বক্তব্য উপস্থাপিত করে আদর্শবাদী দার্শনিকদের অনেকেই মানবতার শত্রু হিসেবে নিন্দিত হয়েছেন। যুদ্ধের পরিণতি যে কতখানি ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে বর্তমান শতাব্দীর বিগত দুটি বিশ্বযুদ্ধ তার প্রমাণ।

বিপজ্জনক মতবাদ

(ঞ) আদর্শবাদ আদর্শ প্রতিষ্ঠার নামে কার্যক্ষেত্রে চরম রক্ষণশীলতাকে সমর্থন করেছে। অ্যারিস্টট্‌ল ক্রীতদাস প্রথাকে, গ্রীন ধনতন্ত্রবাদকে এবং হেগেল প্রাশিয়ার স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে আদর্শ বলে প্রচার করে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে অস্বীকার করেছেন।

রক্ষণশীলতাকে সমর্থন

(ট) আদর্শবাদ রাষ্ট্রকে সমাজবিবর্তনের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ স্তর হিসেবে চিহ্নিত করে ভুল করেছে বলে মার্কসবাদীরা মনে করেন। কারণ সমাজবিবর্তনের একটি বিশেষ স্তরে শ্রেণীশোষণের হাতিয়ার হিসেবে রাষ্ট্র জন্মলাভ করে। যখন শ্রেণীদ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে অর্থাৎ যখন সাম্যবাদী সমাজ প্রবর্তিত হবে তখন অপ্রয়োজনীয় বলেই রাষ্ট্র আপনা থেকেই বিলুপ্ত হবে (withering away of the State)। সুতরাং মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বলা যায় যে, রাষ্ট্রকে সমাজবিবর্তনের সর্বশেষ স্তর বলে বর্ণনা করে আদর্শবাদীরা ইতিহাসের গতিপ্রকৃতিকে অস্বীকার করেছেন।

রাষ্ট্র সমাজবিবর্তনের শেষ স্তর নয়

আদর্শবাদের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হলেও তার গুরুত্বকে একেবারেই অস্বীকার করা যায় না। রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির আবশ্যিক আনুগত্য প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দিয়ে, রাষ্ট্রকে সমস্ত শক্তির আধার হিসেবে চিত্রিত করে এবং সমষ্টিগত স্বার্থে ব্যষ্টিস্বার্থকে পরিত্যাগ করার আহ্বান জানিয়ে আদর্শবাদ গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করেছে। তা ছাড়া, রাষ্ট্রকে আইনের উৎস বলে বর্ণনা করে এবং আইন বলবৎকরণে বলপ্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়ে এই মতবাদ অভ্রান্ত সত্যের প্রতি অঙ্গুলি-সংকেত করেছে। সর্বোপরি, নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণ

গুরুত্ব

করেই রাষ্ট্র তাদের কাছ থেকে আনুগত্য দাবি করতে পারে—কোন কোন আদর্শবাদীর এই যুক্তি অভ্রান্ত। অবশ্য একথাও সত্য যে, ফিকটে, ট্রিটস্কে প্রমুখ জার্মান দার্শনিকদের হাতে আদর্শবাদ বিকৃত রূপ (perverted form) ধারণ করায় অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে এই মতবাদের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

৩। উদারনৈতিক মতবাদ (The Liberal Theory)

রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও কার্যাবলী সম্বন্ধে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ হোল উদারনৈতিক মতবাদ (liberal theory)। উদারনৈতিক মতবাদকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা—ক. সনাতন উদারনীতিবাদ এবং খ. আধুনিক উদারনীতিবাদ। জন স্টুয়ার্ট মিলের পূর্ববর্তী উদারনীতিবাদিগণ কর্তৃক প্রচারিত মতবাদ সনাতন উদারনীতিবাদ এবং মিলের পরবর্তী সময়ের উদারনীতিবাদকে আধুনিক উদারনীতিবাদ বলে অভিহিত করা হয়। সামন্ততন্ত্র ও অভিজাত শ্রেণীর শাসন এবং যাজক সম্প্রদায়ের ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করতে গিয়ে সনাতন উদারনীতিবাদীরা তাঁদের তত্ত্ব খাড়া করেছিলেন। তাঁদের প্রচারিত তত্ত্ব শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে রূপান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পর থেকে, বিশেষতঃ বিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এর পর ধনতন্ত্রের বিশ্বব্যাপী সংকট শুরু হলে সনাতন উদারনীতিবাদ জনকল্যাণ সাধনে যে ব্যর্থ তা সমাজতন্ত্রবাদীরা সহজেই জনসাধারণের কাছে প্রমাণ করতে সক্ষম হলেন। এমন কি, উদারনীতিবাদীদের অনেকেই সনাতন উদারনীতিবাদের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেন। এমতাবস্থায় উদারনীতিবাদ একদিকে যেমন জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের কথা প্রচার করতে শুরু করে, অন্যদিকে তেমনি কিছু কিছু সমাজতান্ত্রিক নীতি গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করে। হবহাউস থেকে শুরু করে হ্যারল্ড ল্যাস্কি পর্যন্ত বর্তমান শতাব্দীর প্রখ্যাত উদারনীতিবাদীরা ইতিবাচক রাষ্ট্র (positive state) প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণাগুলিকে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

উদারনৈতিক মতবাদের শ্রেণীবিভাজন

সনাতন উদারনীতিবাদীদের মতে, জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকারের মতো ব্যক্তির প্রাকৃতিক অধিকারসমূহের (natural rights) সংরক্ষণের জন্য চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেছিল। তাই ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক হোল সম্পূর্ণভাবে চুক্তিগত (contractual) সম্পর্ক। স্বাভাবিকভাবে রাষ্ট্র চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদন না করলে তার বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহ করার এবং নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা করার অধিকার আছে। এইভাবে সনাতন উদারনীতিবাদীরা রাষ্ট্র মানুষের সৃষ্ট এবং নির্দিষ্ট কতকগুলি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তার অবস্থিতি বলে প্রচার করেন। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে সনাতন উদারনীতিবাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায় জন লকের (১৬৩২-১৭০৪) চিন্তাধারার মধ্যে। তাঁর মতে, ১. রাষ্ট্র-গঠনকারী জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রয়েছে ; ২. জনগণের সম্মতিই

সনাতন উদারনীতিবাদীদের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের প্রকৃতি

(consent) হোল রাষ্ট্রের ভিত্তি ; ৩. আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র তার কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে এবং আইনের অনুশাসনের (rule of law) উপর ভিত্তি করে যে-সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তাকেই সাংবিধানিক সরকার (constitutional government) বলা হয়। ৪. প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক আইনের প্রকাশ হিসেবে দেওয়ানী আইনের (civil laws) দ্বারাই কেবলমাত্র রাষ্ট্রের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। যেহেতু প্রাকৃতিক অধিকারসমূহের পশ্চাতে প্রাকৃতিক আইনের সমর্থন থাকে, সেহেতু এইসব অধিকার অলঙ্ঘনীয় (inviolable) ; ৫. বিভিন্ন ধরনের মতামত প্রকাশে রাষ্ট্র কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে না ; ৬. রাষ্ট্রের কার্যাবলী হোল প্রধানতঃ নেতিবাচক (negative)। নিজের ইচ্ছামত জীবনকে পরিচালিত করার স্বাধীনতা প্রতিটি ব্যক্তির রয়েছে ; তাতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাষ্ট্রের নেই। তবে ব্যক্তিস্বাধীনতার পথে প্রতিবন্ধকতাগুলিকে দূর করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের হস্তে অর্পণ করা হয়েছে ; এবং ৭. রাষ্ট্র মানুষের স্বার্থপরতার পরিবর্তে জনকল্যাণকামী মানসিকতা বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট থাকবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বেন্থাম (Jeremy Bentham) প্রমুখ উপযোগিতাবাদিগণ (utilitarians) এবং অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) প্রমুখ অর্থনীতিবিদরা রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। বেন্থামের মতে, রাষ্ট্রের লক্ষ্য হোল সর্বাধিক ব্যক্তির সর্বাধিক পরিমাণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা (greatest happiness of the greatest number)। তিনি রাষ্ট্রকে সর্বপ্রকার অধিকারের উৎসস্থল বলে বর্ণনা করেন। মানুষ তার পরিপূর্ণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং অধিকার ও স্বাধীনতার বাস্তব রূপায়ণের জন্য রাষ্ট্রকেই আশ্রয়স্থল বলে মনে করতে পারে। অ্যাডাম স্মিথ ছিলেন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 'অবাধ নীতি'র (laissez-faire) প্রধান প্রবক্তা। তাঁর মতে, রাষ্ট্র বিশেষ বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে। এইসব ক্ষেত্র হোল : ক. বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করে দেশের জনগণের স্বাধীনতা রক্ষা করাই হোল রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য। খ. সর্বপ্রকার অন্যায় ও অত্যাচারের হাত থেকে নাগরিকদের রক্ষা করার দায়িত্বও রাষ্ট্রের। গ. রাস্তাঘাট নির্মাণ, খাল খনন ও পোতাশ্রয় তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করাও রাষ্ট্রের কর্তব্য। ঘ. রাষ্ট্র জনগণকে ক্ষুধার হাত থেকে রক্ষা করবে। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করবে। উপরি-উক্ত কার্যাবলীর বাইরে রাষ্ট্র কোন কাজ করতে পারবে না।

উনবিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্র

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে সনাতন উদারনীতিবাদ সাধারণ মানুষের কাছে তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। একদিকে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হস্তে সম্পদের কেন্দ্রীভবন, অন্যদিকে জনসাধারণের ব্যাপক অংশের মধ্যে দুঃখ-দারিদ্র্য সনাতন উদারনীতিবাদের দুর্বলতা প্রকাশ করে দেয়। এমতাবস্থায় এরূপ উদারনীতিবাদকে নস্যাৎ করে দিয়ে মার্কসের প্রচারিত তত্ত্ব জনমনে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে থাকে। তাই উদারনীতিবাদকে তার সঙ্কট থেকে বাঁচবার জন্য জন স্টুয়ার্ট মিল, টি. এইচ. গ্রীন, আর. এম. ম্যাকাইভার, হ্যারল্ড ল্যাস্কি প্রমুখ এগিয়ে আসেন। তাঁরা উদারনীতিবাদকে সংশোধন

ইতিবাচক উদার নীতিবাদীদের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র

করে জনসমর্থন অর্জনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মিলের রচনাবলীর মধ্যে এতদিনকার প্রচলিত নেতিবাচক রাষ্ট্রের ধারণার পরিবর্তে ইতিবাচক রাষ্ট্রের কথা বলা হয়। তিনি এই অভিমত পোষণ করেন যে, রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ছাড়া সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আসতে পারে না। স্বল্প সংখ্যক মানুষের হাতে দেশের জমিজায়গা, কল-কারখানা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দায়িত্ব কেন্দ্রীভূত থাকলে কখনই সামাজিক কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। এমতাবস্থায় রাষ্ট্র কেবলমাত্র ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতাগুলিকেই বিদূরিত করবে না, সেই সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। 'ইতিবাচক পদক্ষেপ' বলতে তিনি আবশ্যিক শিক্ষার প্রবর্তন, সম্পত্তির উত্তরাধিকারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ, শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় কারখানা আইন প্রণয়ন, একচেটিয়া কারবারের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রতিষ্ঠা, কার্যের সময়সীমা নির্ধারণ ইত্যাদি বুঝিয়েছেন। তবে তিনি সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার বিরোধী ছিলেন।

রাষ্ট্র সম্পর্কে গ্রীন ও ম্যাকাইভারের অভিমত

গ্রীন মনে করতেন যে, সর্বপ্রকার আশীর্বাদের (blessings) মধ্যে স্বাধীনতাই হোল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতার সম্যক উপলব্ধিকে নাগরিকদের প্রকৃত লক্ষ্য (true end) বলে তিনি বর্ণনা করেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্র নিজেই নিজের লক্ষ্য নয়; তা হোল রাষ্ট্র-গঠনকারী ব্যক্তিবর্গের পরিপূর্ণ নৈতিক বিকাশের হাতিয়ার মাত্র। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ আইনকে অমান্য করার মাধ্যমে জনস্বার্থ রক্ষিত হতে পারে বলে তিনি মনে করতেন। রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্পর্কে গ্রীনের অভিমত তাঁর সাধারণ-ইচ্ছার (general will) ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। সাধারণ ইচ্ছা তথা সদিচ্ছা (good will) প্রতিষ্ঠার জন্যই স্বাধীনতার প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন। রাষ্ট্র এরূপ সদিচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করবে না; বরং এর পথে যে-সব প্রতিবন্ধকতা থাকবে সেগুলিকে অপসারিত করাই হবে তার কাজ। এদিক থেকে বিচার করে অনেকে গ্রীনকে নেতিবাচক রাষ্ট্রের সমর্থক বলে প্রচার করলেও বার্কার তাঁকে ইতিবাচক রাষ্ট্রের সমর্থক বলে বর্ণনা করেছেন। কারণ সনাতন উদারপন্থীরা রাষ্ট্রকে যেরূপ সন্দেহের চোখে দেখতেন গ্রীন কিন্তু রাষ্ট্রকে সেভাবে দেখতেন না। তিনি রাষ্ট্রকে গ্রহণ করেছিলেন এমন 'একটি ইতিবাচক এজেন্সী' হিসেবে, যা ইতিবাচক স্বাধীনতার রক্ষক হিসেবে কাজ করে। রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা সম্পর্কে গ্রীনের অভিমত হোল—রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষা ছাড়া অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে নাগরিকরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না। তবে স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধাচরণ করাকে তিনি অধিকার বলে স্বীকার না করলেও 'কর্তব্য' (duty) হিসেবে স্বীকার করেছেন। অন্যভাবে বলা যায়, রাষ্ট্র যদি নাগরিকের নৈতিক চরিত্র বিকাশের উপযোগী অধিকার স্বীকার করে নেয়, তাহলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণের কোন অধিকার নাগরিকদের থাকতে পারে না।

ম্যাকাইভারের মতে, রাষ্ট্র হোল একটি প্রতিষ্ঠান (association)। রাষ্ট্র জনগণের সেবা করে বলেই তার নির্দেশদানের ক্ষমতা রয়েছে। সমাজের 'এজেন্ট' হিসেবে রাষ্ট্র জনগণের অধিকারসমূহ সৃষ্টি করে। তাই ভৃত্য যেমন প্রভু অপেক্ষা

শ্রেষ্ঠ হতে পারে না, তেমনি রাষ্ট্র সমাজের জনগণ অপেক্ষা কখনই শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারে না। নাগরিক-অধিকারসমূহকে রক্ষা করার জন্য যতটুকু ক্ষমতা রাষ্ট্রের থাকা উচিত তার বেশী ক্ষমতা রাষ্ট্রের নেই। ম্যাকাইভার রাষ্ট্রের হস্তে অসীম ক্ষমতা প্রদানের বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্রকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রকার কার্যই সম্পাদন করতে হয়। তিনি এই অভিমত পোষণ করতেন যে, মানুষের এমন কতকগুলি কাজ রয়েছে যার উপর রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তির স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার খর্ব করতে রাষ্ট্র পারে না। তবে তিনি একথাও বলেছিলেন, যে-মত প্রচলিত আইনকে অস্বীকার করতে কিংবা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করতে জনসাধারণকে ইন্ধন যোগায় তাকে দমন করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। তিনি ধর্ম, নৈতিকতা, প্রথা, সংস্কৃতি প্রভৃতির উপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন। রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্পর্কে ম্যাকাইভার এই অভিমত পোষণ করতেন যে, রাষ্ট্রকে প্রধানতঃ তিন ধরনের কার্য সম্পাদন করতে হবে, যথা—১. আইন-শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা; ২. জীবন ও সম্পত্তির সংরক্ষণ, ন্যায় ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা, ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান রক্ষার ব্যবস্থা ও সামাজিক বিনাশ (social wreckage) রোধ; এবং ৩. প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও যথাযথ সদ্ব্যবহার, শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ, সমাজের উন্নতির জন্য কৃষি ও শিল্পের বিকাশসাধন।

রাষ্ট্র সম্পর্কে ম্যাকাইভারের অভিমত

ল্যাস্কি রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের একত্ববাদী ধারণার তীব্র বিরোধী। আবার সমাজ ও রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ না করার জন্য তিনি ভাববাদীদেরও সমালোচনা করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধ্যানধারণার পরিবর্তন সাধন করেন। ১৯৩৫ সালে রচিত 'তত্ত্ব ও বাস্তবে রাষ্ট্র' (The State in Theory and Practice) নামক গ্রন্থে তিনি রাষ্ট্রকে এমন একটি জাতীয় সমাজ (a national society) বলে বর্ণনা করেন, যা সমাজের অঙ্গীভূত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর আইন-সংগতভাবে বলপ্রয়োগ করার অধিকারী। রাষ্ট্রের এই বলপ্রয়োগের ক্ষমতাই হোল তার সার্বভৌমিকতা (sovereignty)। এই সার্বভৌম ক্ষমতাই রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য নিরূপণের প্রধান মানদণ্ড। জনগণের ব্যাপক অংশের সর্বাধিক পরিমাণ সামাজিক কল্যাণ সাধন করাই হোল রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। অন্যভাবে বলা যায়, সমাজের মধ্যে নাগরিকদের স্বার্থরক্ষা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। ল্যাস্কির মতে, রাষ্ট্র দরিদ্রদের জন্য এমন সব সমাজ-কল্যাণকর কাজ করবে, যা ধনীরা নিজেরাই নিজেদের জন্য করতে সক্ষম। অধ্যাপক ল্যাস্কি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকে শেষ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার পক্ষপাতী। তাঁর মতে, যখন সাংবিধানিক উপায়ে জনগণের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার বিধানের চেষ্টা ব্যর্থ হবে এবং যখন প্রতিরোধ-কারীরা একথা উপলব্ধি করতে পারবে যে, শক্তির ভারসাম্য তাদেরই দিকে, তখনই কেবলমাত্র তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ল্যাস্কি প্রথম দিকে আধুনিক উদারনীতিবাদকে সমর্থন করলেও শেষ পর্যন্ত তিনি কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে ল্যাস্কির অভিমত

কিন্তু উদারনীতিবাদ সমাজের কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধন করতে না পারায় এবং জনজীবন থেকে দুঃখ-দারিদ্র্য, বেকারত্ব, হতাশা প্রভৃতি দূর করতে না পারায় তা বিশেষ সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। অপরদিকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শ্রেণীহীন-শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজের মৌলিক পরিবর্তন সাধনের যে-কথা প্রচার করত ১৯১৭ সালে রুশ-বিপ্লবের পরবর্তী রাশিয়ায় তা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করার ফলে সাধারণ মানুষ উদারনীতিবাদ অপেক্ষা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি অনেক বেশী আকৃষ্ট হতে লাগল। এমতাবস্থায় আধুনিক উদারনীতিবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদরা সঙ্কটের হাত থেকে উদারনীতিবাদকে রক্ষার উদ্দেশ্যে নতুন করে উপায় অন্বেষণ করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের তত্ত্ব প্রচার করেন। পূর্ণ সমাজতন্ত্র এবং পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মধ্যবর্তী স্থানে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের অবস্থান। এরূপ রাষ্ট্র উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত বলে তা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা, নাগরিকদের রাজনৈতিক ও পৌর অধিকারসমূহের স্বীকৃতি প্রদান, একাধিক রাজনৈতিক দলের অবস্থিতি, শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক উপায়ে সরকারের পরিবর্তন, সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রবর্তন, ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা, নিরপেক্ষ আদালতের অবস্থিতি প্রভৃতিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের প্রবক্তাগণ মিশ্র-অর্থব্যবস্থা (Mixed economy) প্রবর্তনের মাধ্যমে জনকল্যাণ সাধন সম্ভব বলে প্রচার করেন। তাছাড়া, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য-বৈষম্য দূর করার জন্য গতিশীল কর ব্যবস্থার প্রবর্তন, শিল্প-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণ, কিছু কিছু শিল্প-বাণিজ্যের জাতীয়করণ প্রভৃতির দায়িত্ব রাষ্ট্রের হস্তে অর্পণ করলে ব্যাপকভাবে জনকল্যাণ সাধিত হবে বলে তাঁদের ধারণা। অন্যভাবে বলা যায়, রাষ্ট্রকে জনকল্যাণ সাধনের হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তোলাই ছিল জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের প্রবক্তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। দেশের মধ্যে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখা, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা ; ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তির সংরক্ষণ করা ; নাগরিকদের পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা ; উৎপাদক, শ্রমিক, ভোক্তা প্রমুখের স্বার্থ রক্ষা করা ; উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা ; জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, শিক্ষার বিস্তার, বেকার সমস্যার সমাধান প্রভৃতি উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা ; জাতীয় মুদ্রা ও ঋণ ব্যবস্থার পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করা প্রভৃতি জনহিতকর কার্য রাষ্ট্রকে সম্পাদন করতে হয়।

জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও কার্যাবলী

কিন্তু মার্কসবাদীরা জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণাকে একটি বুর্জোয়া ধারণা এবং জনকল্যাণকর রাষ্ট্রকে একটি বুর্জোয়া রাষ্ট্র বলে বর্ণনা করেন। কারণ, কোন রাষ্ট্রই শ্রেণী-স্বার্থের ঊর্ধ্বে অবস্থান করে না। সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভুত্বকারী শ্রেণী নিজেদের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে। পুঁজিবাদের বিশ্বব্যাপী সঙ্কটের যুগে, মুমূর্ষু পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রাখার জন্য বুর্জোয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদরা জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের তত্ত্ব খাড়া করেন। জনকল্যাণ সাধনের উচ্চ পরাকাষ্ঠা দেখানো হলেও কার্যত এই সব রাষ্ট্র বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত

মার্কসবাদীগণ কর্তৃক সমালোচনা

হয় বলে এখানে জনসাধারণের কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয় না। বস্তুতঃ উৎপাদন, বন্টন ও বিনিয়োগ ব্যবস্থার উপর বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্য পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকায় এরূপ রাষ্ট্রে জনকল্যাণ সাধনের কথা মিথ্যা পরিহাসে পরিণত হয়। এ. আর. দেশাই তাই মন্তব্য করেছেন যে, অনিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদের ক্ষয়ক্ষতি ও অদক্ষতাকে এড়াবার জন্য এবং শ্রেণীসংগ্রাম যাতে বিদ্রোহের আকার ধারণ করতে না পারে সেজন্য একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণী এরূপ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে সর্বাপেক্ষা উন্নত পুঁজিবাদী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো তথাকথিত জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে জনগণের একটি বিরাট অংশ দারিদ্র্য-সীমার নীচে বাস করে এবং সেখানে বেকার সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংক্ষেপে বলা যায়, মার্কসবাদীরা আধুনিক জনকল্যাণকর রাষ্ট্রকে একচেটিয়া পুঁজিবাদের 'কার্য-নির্বাহক কমিটি' (an Executive Committee of monopoly capitalism) বলে মনে করেন।

৪। মার্কসীয় মতবাদ (The Marxist Theory)

রাষ্ট্রের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও কার্যাবলী সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং বৈজ্ঞানিক মতবাদ হোল মার্কসীয় মতবাদ। এই মতবাদ জৈব মতবাদের মত রাষ্ট্রকে 'একটি জীবন্ত প্রাণী', 'মানবের প্রতিমূর্তি" ইত্যাদি বলে, কিংবা আদর্শবাদের মত 'সর্বদোষমুক্ত বুদ্ধিময়তা', 'চেতনার বস্তুগত রূপ বা নৈতিক শক্তি' 'সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশস্থল', 'ঈশ্বরের পদক্ষেপ' বলে অথবা বুর্জোয়া রাষ্ট্রদর্শনের মত 'রাষ্ট্রকে জনকল্যাণ সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান' বলে মনে করে না। সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ এবং ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মার্কসবাদ রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছে।

বৈজ্ঞানিক মতবাদ

এই মতবাদ অনুসারে, আকস্মিকভাবে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়নি। সমাজ-বহির্ভূত কোন শক্তির দ্বারা তা সৃষ্ট হয়নি। সমাজবিবর্তনের একটি বিশেষ স্তরে উৎপাদন ব্যবস্থার চরিত্রগত পরিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রের জন্ম হয়। মার্কসের অভিন্নহৃদয় বন্ধু ফ্রেডারিক এঙ্গেলস (Frederick Engels)-এর ভাষায় "অনন্ত কাল থেকে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নেই। এমন সব সমাজ ছিল যারা রাষ্ট্র ছাড়াই চলত, যাদের রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কোনো ধারণাই ছিল না। অর্থনৈতিক বিকাশের একটা বিশেষ স্তরে যখন অনিবার্যভাবে সমাজে শ্রেণীবিভাগ এল, তখন এই বিভাগের জন্যই রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল।" লেনিনের মতে, উৎপাদন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য থেকেই অর্থনৈতিক শক্তির ভিত্তিতে সমাজের শ্রেণীবৈষম্যের সূত্রপাত হয়।

সমাজবিবর্তনের বিশেষ স্তরে রাষ্ট্রের উৎপত্তি

রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মার্কস-এঙ্গেলস সামাজিক অগ্রগতির স্তরকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা—ক. আদিম সাম্যবাদী সমাজ, খ. দাস-সমাজ, গ. সামন্ততান্ত্রিক সমাজ এবং ঘ. ধনতান্ত্রিক বা বুর্জোয়া সমাজ। আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা ছিল মনুষ্য সমাজের অগ্রগতির প্রাথমিক স্তর। এই স্তরে ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোন অস্তিত্ব না থাকায় সমাজে কোন শ্রেণী বা শ্রেণীশোষণ ছিল না। সুতরাং শোষণ-

রাষ্ট্র শ্রেণী-শোষণের হাতিয়ার

ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য কোন রাষ্ট্রযন্ত্রেরও প্রয়োজন ছিল না। সাম্যই ছিল সেই সমাজের মূল ভিত্তি। কিন্তু সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব, পণ্যবিনিময় ব্যবস্থার প্রচলন, শ্রমবিভাগের প্রবর্তন ইত্যাদির ফলে সমাজজীবনের অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হয়। এঙ্গেলসের ভাষায়, "সভ্য সমাজে রাষ্ট্রই সমাজকে একত্র ধরে রাখে এবং প্রত্যেকটি বিশিষ্ট পর্বেই এ রাষ্ট্র হল একমাত্র শাসকশ্রেণীর রাষ্ট্র এবং সকল ক্ষেত্রেই এটি হল মূলতঃ শোষিত, নিপীড়িত শ্রেণীকে দমন করার যন্ত্র।" তিনি আরো বলেছেন, "যেহেতু রাষ্ট্রের আবির্ভাব শ্রেণীবিরোধকে সংযত করার প্রয়োজন থেকে, সেই সঙ্গে তার উদ্ভব হয় শ্রেণীবিরোধের মধ্যেই। সেজন্য রাষ্ট্র হল সাধারণতঃ সব চেয়ে শক্তিশালী ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রভুত্বকারী শ্রেণীর রাষ্ট্র। এই শ্রেণী রাষ্ট্রের মাধ্যমে রাজনীতির ক্ষেত্রেও আধিপত্যকারী শ্রেণী হয়ে ওঠে এবং তার ফলে নিপীড়িত শ্রেণীর দমন এবং তার শোষণে নতুন হাতিয়ার লাভ করে। এইভাবে প্রাচীন যুগে রাষ্ট্র ছিল সর্বোপরি দাসদের দমনের জন্য দাস-মালিকদের রাষ্ট্র—যেমন সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল ভূমিদাস কৃষকদের বশে রাখার জন্য অভিজাতদের সংস্থা এবং আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র হচ্ছে পুঁজি কর্তৃক মজুরি-শ্রম শোষণের হাতিয়ার।" অর্থাৎ এই সব "রাষ্ট্র হচ্ছে বিত্তহীন শ্রেণীদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বিত্তশালী শ্রেণীর একটি সংগঠন।"

বুর্জোয়া রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও প্রকারভেদ

তবে বুর্জোয়া যুগের "একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে ; শ্রেণী-বিরোধ এতে সরল হয়ে এসেছে। গোটা সমাজ ক্রমেই দুটি বিশাল শত্রুশিবিরে ভাগ হয়ে পড়েছে, ভাগ হচ্ছে পরস্পরের সম্মুখীন দুই বিরাট শ্রেণীতে—বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়েত।" এঙ্গেলসের মতে, "আধুনিক বুর্জোয়া শ্রেণীটা একটা দীর্ঘ বিকাশধারার ফল, উৎপাদন ও বিনিময় পদ্ধতির ক্রমান্বয় বিপ্লবের পরিণতি।" এই বুর্জোয়াশ্রেণী রাষ্ট্রকাঠামোকে নিজ শ্রেণী-স্বার্থের উপযোগী করে গড়ে তোলে। আইন, প্রশাসন, বিচারালয়, পুলিস, সৈন্যবাহিনী প্রভৃতি সবই রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রভুত্বকারী বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থেই কাজ করে। আধুনিক রাষ্ট্রের শাসকমণ্ডলী হোল সমগ্র বুর্জোয়াশ্রেণীর সাধারণ কাজকর্ম পরিচালনার একটি কমিটি মাত্র। এরূপ রাষ্ট্রে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তা বুর্জোয়া স্বার্থের পরিপন্থী না হয়। বুর্জোয়া রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রকার হতে পারে, যেমন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, ফ্যাসীবাদী একনায়কতন্ত্র ইত্যাদি।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রে শ্রেণী-সংগ্রাম এবং তার পরিণতি

বুর্জোয়া রাষ্ট্রে শোষণের মাত্রা যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে শ্রেণীদ্বন্দ্বও ততই চরম আকার ধারণ করে। মার্কস-এঙ্গেলসের ভাষায় "যন্ত্রশিল্পের যে অগ্রগতি বুর্জোয়া শ্রেণী না ভেবেই বাড়িয়ে চলে, তার ফলে শ্রমিকদের প্রতিযোগিতা হেতু বিচ্ছিন্নতার জায়গায় আসে সম্মিলন-হেতু বিপ্লবী ঐক্য।... তাই বুর্জোয়াশ্রেণী সৃষ্টি করেছে সর্বোপরি তারই সমাধি-খনকের।" সর্বহারাশ্রেণী শোষণের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য বিপ্লবের মাধ্যমে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রযন্ত্রকে অধিকার করার চেষ্টা করে। শ্রমিক-শ্রেণীর বিপ্লবের প্রথম স্তর হোল সর্বহারাদের শাসক পদে উন্নীত করা। তাদের এই

সংগ্রাম হোল চূড়ান্ত সংগ্রাম। মার্কস-এঙ্গেলস্ যে-কোন শ্রেণীসংগ্রামকেই (Class-struggle) 'রাজনৈতিক সংগ্রাম' বলে আখ্যা দিয়েছেন। দাস সমাজ থেকে শুরু করে বুর্জোয়া সমাজ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরেই শ্রেণীসংগ্রাম প্রত্যক্ষ করা যায়। মার্কস-এঙ্গেলসের ভাষায়, "আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস।" তবে এই সংগ্রাম চলেছে কখনও আড়ালে, আবার কখনও-বা প্রকাশ্যে। তাঁদের মতে, এই মরণপণ সংগ্রামে বুর্জোয়ার পতন এবং প্রলেতারিয়েতের জয়লাভ দুই সমান অনিবার্য।" কারণ সর্বহারা বা প্রলেতারিয়েত শ্রেণী বিপ্লবের মাধ্যমে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ধ্বংস-সাধন করে 'সর্বহারার একনায়কতন্ত্র' (Dictatorship of the Proletariat) প্রতিষ্ঠিত করবে। 'সর্বহারার একনায়কত্ব' প্রতিষ্ঠিত হলেও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকবে। তবে তা বুর্জোয়া রাষ্ট্রের মত সংখ্যালঘুর স্বার্থে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বিরুদ্ধে আদৌ পরিচালিত হবে না। এরূপ রাষ্ট্রকে 'সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র' (Socialist State) বলে অভিহিত করা হয়। এরূপ রাষ্ট্রে উৎপাদনের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকে তার শ্রমের আনুপাতিক হারে মজুরি পাবে। 'যে কাজ করবে না সে খেতেও পাবে না'—এই নীতির দ্বারা সমাজ পরিচালিত হবে। বস্তুতঃ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হোল একটি নতুন ধরনের রাষ্ট্র। কারণ বুর্জোয়া শাসনযন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী এরূপ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে। লেনিন বলেছেন, এই নতুন ধরনের রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হোল: ১. এই রাষ্ট্র শ্রমিক ও কৃষকের সশস্ত্র শক্তির মূর্ত প্রকাশ এবং তা জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। ২. যাদের নিয়ে এই রাষ্ট্রযন্ত্র গঠিত হয়, তাদের সকলকেই নির্বাচিত হতে হয় এবং জনগণ তাদের ইচ্ছানুযায়ী প্রতিনিধিদের ফিরিয়ে আনতে (recall) পারে। ৩. বিভিন্ন বৃত্তির সঙ্গে এই রাষ্ট্রযন্ত্রের দৃঢ় সংযোগ থাকার ফলে আমলাতন্ত্র ছাড়াই সর্বপ্রকার সংস্কার সাধিত হতে পারে। ৪. নিপীড়িত শ্রেণীর মধ্যে যারা সর্বাপেক্ষা শ্রেণী-সচেতন, উদ্যোগী ও প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তাদেরই সংগঠনের একটি মূর্ত রূপ। ৫. এরূপ রাষ্ট্রে সংসদীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সুবিধাও বর্তমান। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কার্যাবলীর মধ্যে ধনতান্ত্রিক সম্পত্তির বিলোপ সাধন, দেশের ধনসম্পদকে সমগ্র দেশের জনগণের হাতে প্রদান, জনগণকে রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রদান, জাতিগত উৎপীড়ন নির্মূল করা, নারী-জাতির সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, বিপ্লবের শত্রুদের প্রতিরোধ ধ্বংস করা ইত্যাদি হোল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান লক্ষ্য হোল শ্রেণীশোষণের অবসান এবং শোষণহীন সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রকৃতি

সমাজতান্ত্রিক সমাজ যখন 'সাম্যবাদী সমাজে' (Communist Society) রূপান্তরিত হবে, তখন উৎপাদনের প্রাচুর্যের ফলে মানসিক এবং দৈহিক শ্রমের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নিরূপণ করা হবে না। এই সমাজে প্রত্যেকে তার সাধ্যমত কাজ করবে এবং নিজের প্রয়োজনমত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লাভ করবে। এরূপ সমাজে সর্বপ্রকার শ্রেণীশোষণের অবসান ঘটার ফলে শোষণের যন্ত্র হিসেবে রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকবে না; তা স্বাভাবিকভাবেই

রাষ্ট্রের অবলুপ্তি

'বিলুপ্ত হবে' (withering away of the State) ; এইভাবে শ্রেণীশাসন ও শ্রেণী-শোষণের হাতিয়ার হিসেবে যে রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল সর্বপ্রকার শ্রেণীদ্বন্দ্বের অবসান ঘটায় তার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবে।

সমালোচনা: রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে মার্কসীয় তত্ত্বের বিরুদ্ধে নানা প্রকার যুক্তির অবতারণা করা হয়। প্রধানতঃ বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা মার্কসবাদের বিরূপ সমালোচনা করে থাকেন।

প্রথমতঃ বার্কার (Barker) প্রমুখ সমালোচকদের মতে, রাষ্ট্র এবং সমাজকে অভিন্ন বলে বর্ণনা করে মার্কসবাদীরা ভুল করেছেন। কিন্তু বার্কারের সমালোচনা বিভ্রান্তিকর। সম্ভবতঃ তিনি মার্কসের বক্তব্যকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। কারণ মার্কসের মতে, সমাজ হোল মানুষের সেই সমস্ত সম্পর্কের যোগফল যা তার সামাজিক উৎপাদনের প্রয়োজনে অচেতনভাবে (unconsciously) গড়ে তোলে। কিন্তু প্রচলিত সম্পর্ককে বজায় রাখার জন্য সচেতনভাবে সৃষ্ট কতকগুলি নিয়মকানুনকে আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করতে রাষ্ট্র বাধ্য করে। শ্লেসিংগার (Rudolf Schlesinger)-এর মতে, মার্কস এবং এঙ্গেলস্ রাষ্ট্রকে বলপ্রয়োগের একটি প্রতিষ্ঠান বলে বর্ণনা করেছেন, যা সমাজের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন (the State is an organisation of coercion distinct from Society)।

রাষ্ট্র ও সমাজ অভিন্ন

দ্বিতীয়তঃ মার্কসবাদকে অনেকে 'অধিবিদ্যামূলক মতবাদ' (metaphysical theory) বলে সমালোচনা করেন। কারণ মার্কস আইনগত ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সামাজিক তথা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার 'উপরি-কাঠামো' (super-structure) বলে বর্ণনা করেছেন। পোপার (Popper)-এর মতে, এইভাবে মার্কস রাজনীতিকে বন্ধ্যা (impotent) করে দিয়েছেন। অন্যভাবে বলা যায়, অর্থনৈতিক অবস্থাকে (economic reality) রাজনীতি কখনই সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত করতে পারে না বলে মার্কস ভুল করেছেন। কিন্তু মার্কসবাদের বিরুদ্ধে এই চিরাচরিত সমালোচনারও কোনও মূল্য নেই। কারণ মার্কস অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে কখনই রাজনৈতিক উপাদানকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেননি। মানবজীবনে রাজনীতি এবং অন্যান্য আদর্শের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে মার্কস কখনই অস্বীকার করেননি। কিন্তু তিনি সর্বপ্রথম সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে তাদের উৎপত্তির কথা আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, আইনগত এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষ একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফল। এই সব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সামাজিক তথা অর্থনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি হলেও তা সামাজিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে কিংবা বিলম্বিত করতে পারে। প্লেখানভ (Plekhanov)-এর মতে, মার্কস এবং এঙ্গেলস সমাজের মধ্যে অবস্থিত শ্রেণীসংগ্রামকেই রাজনৈতিক কর্তৃত্বের জন্য সংগ্রাম বলে চিত্রিত করেছেন। সুতরাং পোপার প্রমুখ তাঁদের পূর্ববর্তী সমালোচকদের মতই সম্ভবতঃ মার্কসবাদের প্রকৃত বক্তব্য যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি।

মার্কসবাদ অধিবিদ্যা-মূলক মতবাদ

রাষ্ট্রের প্রকৃতির বিশ্লেষক হিসেবে মার্কসীয় মতবাদের বিরুদ্ধে তৃতীয় যুক্তি হোল—আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্রের শাসকমণ্ডলী সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের

ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়। সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক শক্তি বন্টন মূলতঃ রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণ করে—এরূপ অভিমত পোষণ করে মার্কসবাদ সত্যের অপলাপ করেছে বলে সমালোচনা করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হলেও এই যুক্তির মধ্যে সত্যতা বলে কিছুই নেই। কারণ উৎপাদনের উপাদানসমূহের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে গঠিত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে ধনসম্পদ পরোক্ষভাবে হলেও স্বতঃসিদ্ধভাবে তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এরূপ রাষ্ট্রে সেই রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসতে পারে যার পশ্চাতে ধনশালী শ্রেণীর প্রত্যক্ষ সমর্থন থাকে। ধনশালী ব্যক্তিবর্গ এরূপ রাজনৈতিক দলকে এই আশায় বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে সাহায্য করে যে, ক্ষমতাসীন হলে এই দল তাদেরই স্বার্থে আইন প্রণয়ন করবে এবং রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা করবে। প্রতিটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলে এই যুক্তির সত্যতা প্রমাণিত হবে।

কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উপাদানই রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ধারক নয়

চতুর্থতঃ মার্কসীয় মতবাদের বিরুদ্ধে অন্যতম প্রধান সমালোচনা হোল—এই মতবাদ কেবল শ্রেণী-সংগ্রামের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে সমাজের মধ্যে দ্বন্দ্ব, বিদ্বেষ, ঘৃণা প্রভৃতির বীজ বপণ করে সামাজিক সংহতি বিনষ্ট করেছে। কিন্তু এই বিরূপ সমালোচনাটিও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ মার্কসবাদের প্রধান লক্ষ্য শ্রেণীহীন, শোষণহীন একটি মুক্ত সমাজজীবনের প্রতিষ্ঠা। এই সমাজজীবন প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজে প্রকৃত শান্তি বিরাজ করবে। যে সমাজে শ্রেণী-বৈষম্য থাকবে সে সমাজে কখনই শান্তি আসতে পারে না—তা মার্কস ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণ করেছেন। সুতরাং বলা যায়, মার্কসীয় মতবাদ শ্রেণীদ্বন্দ্বের মাধ্যমে শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করে প্রকৃত শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের কথাই প্রচার করে।

দ্বন্দ্ব, বিদ্বেষ, ঘৃণা প্রভৃতির প্রচার

পরিশেষে বলা যায়, সমালোচকদের মতে, রাষ্ট্রের 'অবলুপ্তি' (withering away of the State) সম্পর্কে ধারণাটি ভ্রান্ত। বর্তমানে অবলুপ্ত হওয়ার পরিবর্তে ক্রমাগত রাষ্ট্র জনজীবনে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এমন কি বর্তমান বিশ্বের কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই এই সমালোচনা সত্য বলে প্রমাণিত হবে। কিন্তু এরূপ সমালোচনাও গ্রহণযোগ্য নয়। লেনিনের মতে, কেবলমাত্র কমিউনিস্ট সমাজব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেই 'রাষ্ট্রের অবলুপ্তি' ঘটবে। কিন্তু কমিউনিস্ট সমাজ এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই 'রাষ্ট্রের অবলুপ্তি'র সম্ভাবনাকে কোন মতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বর্তমান সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি সাম্যবাদী বা কমিউনিস্ট সমাজ গঠনের বনিয়াদ গড়ে তোলার জন্য একান্ত অপরিহার্য। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি যে চক্রান্ত করছে তা চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়ার জন্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রয়োজন।

রাষ্ট্রের অবলুপ্তির ধারণা ভ্রান্ত

উপসংহারে বলা যায় যে রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে মার্কসীয় মতবাদকে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্বীকার করে নিয়েছেন। রাষ্ট্রের প্রকৃতি যে একমাত্র মার্কসবাদের সাহায্যেই ব্যাখ্যা করা যায় সে কথা অকপটে স্বীকার করেছেন ল্যাস্কির মত বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ।

উপসংহার

অষ্টম অধ্যায়

রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা

[Sovereignty of the State]

১। সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Definition and Nature of Sovereignty)

গেটেলের মতে, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিত্তিই হোল সার্বভৌমিকতার ধারণা। সার্বভৌমিকতা ছাড়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনাই করা যায় না। বস্তুতঃ রাষ্ট্রের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে সার্বভৌমিকতা হোল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এই ক্ষমতাই রাষ্ট্রকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রদান করেছে।

সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা

লাতিন শব্দ 'সুপারেনাস্' (*superanus*) থেকে সার্বভৌমিকতা কথাটি এসেছে। 'সুপারেনাস্' শব্দটির অর্থ 'সর্বশ্রেষ্ঠ' (supreme)। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থে সার্বভৌমিকতা বলতে রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ, সর্বশ্রেষ্ঠ ও অবাধ ক্ষমতাকেই বোঝায়। ফরাসী দার্শনিক বোদা (Bodin)-র ভাষায় "আইনের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত নাগরিক ও প্রজাদের উপর রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতাই হোল সার্বভৌম ক্ষমতা।" বার্জেস (Burgess) সার্বভৌম ক্ষমতা বলতে অধস্তন ব্যক্তি এবং অধস্তন সংস্থাগুলির উপর রাষ্ট্রের মৌলিক, চূড়ান্ত ও সীমাহীন ক্ষমতাকে বুঝিয়েছেন। উইলোবি (Willoughby)-এর ভাষায় "সার্বভৌমিকতা হোল রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ইচ্ছা।" ইংরেজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী পোলক (Pollock)-এর মতে, সার্বভৌমিকতা বলতে সেই ক্ষমতাকে বোঝায় যা অস্থায়ী নয়, অর্পিত নয় এবং এমন কোন নিয়মের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, যাকে রাষ্ট্র পরিবর্তন করতে পারে না। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী র‍্যাফেল (Raphael) সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, 'রাষ্ট্র সার্বভৌম'—এই কথাটি বলার অর্থ হোল, সমাজের মধ্যে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত বা চরম কর্তৃত্ব রয়েছে অর্থাৎ রাষ্ট্রের আইন অন্যান্য সংঘের নিয়মকানুনের ঊর্ধ্বে। রাষ্ট্রের আইনের সঙ্গে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা সংঘের নিয়মকানুনের বিরোধ বাধলে রাষ্ট্রের আইনই বলবৎ হবে; সংঘ বা প্রতিষ্ঠানসমূহের আইনগুলি বাতিল হয়ে যাবে।

সার্বভৌমিকতার উপরি-উক্ত সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করলে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতাকেই সার্বভৌমিকতা বলে অভিহিত করা হয়।

রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতাকে স্বীকৃতি প্রদানের কারণ

রাষ্ট্রান্তর্গত সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য। রাষ্ট্রীয় নির্দেশ, তথা আইন অমান্য করলে শাস্তি পেতে হয়। তাই অনেকে মনে করেন যে, শাস্তির ভয়ে লোকে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কিন্তু ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, শাস্তি বা বলপ্রয়োগের ভয়েই কেবলমাত্র মানুষ রাষ্ট্রের নির্দেশ মান্য করে না,

বলপ্রয়োগই যদি কেবলমাত্র রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব রক্ষার কারণ হোত তাহলে স্বৈরাচারী শাসকবর্গের পতন ঘটত না। বস্তুতঃ মানুষ যখন একথা উপলব্ধি করতে পারে যে, রাষ্ট্রীয় নির্দেশ মান্য করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তখনই কেবলমাত্র তারা স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত্বকে আন্তরিকভাবে মান্য করে। মানুষ যদি সম্যকভাবে বুঝতে পারে যে, রাষ্ট্রের নির্দেশ আইনসংগত, যুক্তিযুক্ত এবং ন্যায়সঙ্গত, তা হলেই তারা স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রের আইন মান্য করে। বল-প্রয়োগের মাধ্যমে সাময়িকভাবে মানুষের আনুগত্য লাভ করা সম্ভব হলেও সুদীর্ঘকাল রাষ্ট্র এরূপ আনুগত্য লাভ করতে পারে না।

রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার দুটি দিক আছে, যথা—ক. আভ্যন্তরীণ এবং খ. বাহ্যিক। আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা (Internal Sovereignty) বলতে বোঝায়, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অর্থাৎ রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে রাষ্ট্রের আইন হোল চূড়ান্ত এবং অপ্রতিহত। কোন ব্যক্তি, কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান সেই আইন অবজ্ঞা বা অস্বীকার করতে পারে না। রাষ্ট্র প্রণীত আইনকানুনের সঙ্গে যদি কোন প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুনের বিরোধ বাধে তাহলে রাষ্ট্রের আইনই কেবলমাত্র বলবৎ থাকবে, প্রতিষ্ঠান বা সংঘের নিয়মকানুন বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, অকারণে কোন প্রতিষ্ঠান বা সংঘের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে না। অবশ্য প্রয়োজন মনে করলে কিংবা ইচ্ছা করলে রাষ্ট্র যে-কোন সময় তা করতে পারে। অন্যভাবে বলা যায়, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ প্রতিটি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র রাষ্ট্রের অনুমতিক্রমেই স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। রাষ্ট্র কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে চাইলে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি বাধাদান করে তখনই কেবল রাষ্ট্র তার সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ করে। অর্থাৎ রাষ্ট্র তার সার্বভৌম ক্ষমতা কেবলমাত্র শেষ পর্যায়েই ব্যবহার করে। বলা বাহুল্য, আইনের সাহায্যেই রাষ্ট্র তার সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, অনেকের ধারণা, আইনকে বলবৎ করার জন্যই যেহেতু রাষ্ট্রকে বলপ্রয়োগ করতে হয়, সেহেতু আইন রাষ্ট্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ আইনই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ আইন রাষ্ট্রের সৃষ্টিকর্তা নয়, বরং রাষ্ট্রই আইন প্রণয়ন করে। আইনকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বলবৎ করার অর্থই হোল রাষ্ট্র নিজের ইচ্ছাকে কার্যকরী করছে। অবশ্য একথাও সত্য যে, যেসব আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার প্রকাশ ঘটে সেগুলি যদি জনস্বার্থ-বিরোধী হয়, তাহলে অনেক সময় সেই সব আইনের বিরুদ্ধে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। রাষ্ট্র যদি সেই সব জনস্বার্থ-বিরোধী আইনের পরিবর্তন সাধন না করে তাহলে বিদ্রোহ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, রাশিয়ার স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগঠিত অক্টোবর বিপ্লব কিংবা পরাধীন ভারতের ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতা-সংগ্রামের কথা উল্লেখ করা যায়। সুতরাং বলা যায় যে, সার্বভৌমিকতার অস্তিত্ব নির্ভর করে জনগণের স্বীকৃতির উপর।

আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতার স্বরূপ

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্য কোন রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের নির্দেশে পরিচালিত

না হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এবং স্বেচ্ছায় কোন রাষ্ট্র কর্তৃক পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণকে বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা (External Sovereignty) বলে। অন্যভাবে বলা যায়, বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ-বিহীনতাকেই বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা বলা হয়। অনেকের মতে, আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতার প্রকাশের জন্যই বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা প্রয়োজন। গেটেলের ভাষায়, বস্তুতঃ বাহ্যিক স্বাধীনতা বলতে সেইসব অধিকারকে বোঝায়, যার মধ্য দিয়ে কোন রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবহারে নিজের আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতার প্রকাশ ঘটায়। সুতরাং বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতার স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। গেটেল প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ 'বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা' শব্দটি প্রয়োগের পরিবর্তে 'স্বাধীনতা' (independence) শব্দটির প্রয়োগই অধিক কাম্য বলে মনে করেন।

বাহ্যিক সার্বভৌমিকতার স্বরূপ

অনেকের মতে, বর্তমানে প্রতিটি রাষ্ট্রকেই যেহেতু আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলতে হয় সেহেতু কার্যক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্রই প্রকৃত অর্থে স্বাধীন নয়। বিশেষতঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (United Nations) সদস্যপদ যেসব রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে তাদের ক্ষেত্রে একথা যথার্থভাবে প্রযোজ্য। ঐসব রাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য। কিন্তু এই অভিযোগ সত্য নয়। কারণ বর্তমান বিশ্বের কোন রাষ্ট্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রত্যেকে কোন না-কোনভাবে অপরের উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া আণবিক যুগে যুদ্ধের সম্ভাবনা বিদূরিত করার জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা করেছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কখনই এবং কোনভাবেই কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা ক্ষুন্ন করে না। সর্বোপরি, বৃহত্তর স্বার্থে স্বেচ্ছাকৃত নিয়ন্ত্রণ নিজেরাই স্বীকার করে নিয়েছে বলে সেই নিয়ন্ত্রণ কখনই রাষ্ট্রের স্বাধীনতা বা সার্বভৌমিকতার পরিপন্থী নয়। আইনগত দিক থেকে জাতিপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণের কোন কার্যকরী মূল্য নেই বলেও অনেকে মনে করেন।

২। সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Sovereignty)

সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা সার্বভৌমিকতার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করি। বৈশিষ্ট্যগুলি হোল :

[ক] **মৌলিক ও চরম ক্ষমতা** (Original and Absolute Power) : রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা হোল মৌলিক, নিরঙ্কুশ ও সীমাহীন। অভ্যন্তরের এবং বাইরের কোন শক্তির নির্দেশে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় না। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র-প্রণীত আইনকে কোনভাবেই অস্বীকার করতে বা অবজ্ঞা করতে পারে না। রাষ্ট্র-প্রণীত আইন লঙ্ঘন করলে আইনভঙ্গকারীকে কঠোর শাস্তি পেতে হয়। এমনকি গুরুতর অপরাধের জন্য রাষ্ট্র কোন অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ডও দিতে পারে। একমাত্র রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোন সংস্থার এই চরম ক্ষমতা নেই।

মৌলিক ও চরম ক্ষমতা

অবশ্য কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রাকৃতিক আইন,

সাংবিধানিক আইন এবং নৈতিক আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ। হেনরী মেইন (Henry Maine)-এর মতে, সার্বভৌম শক্তির ব্যবহার প্রতিনিয়তই নৈতিক প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কিন্তু একথা ঠিক নয়। কারণ সার্বভৌমিকতা একটি আইনগত ধারণামাত্র। যে সমস্ত বিষয় আইনের গণ্ডির মধ্যে পড়ে কেবলমাত্র সেসব ক্ষেত্রেই সার্বভৌমিকতা প্রযুক্ত হয়, অন্যত্র হয় না। তাই আইন নীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়—একথা অভ্রান্ত বলে স্বীকার করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক আইন কখনই আইন বলে বিবেচিত হতে পারে না। সেইহেতু তার দ্বারা সার্বভৌমিকতা সীমাবদ্ধ—একথা বলাই যায় না। তৃতীয়তঃ সাংবিধানিক আইনের দ্বারাও সার্বভৌমিকতা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। কারণ সংবিধান একমাত্র সরকারের ক্ষমতাকে নির্দিষ্ট করে দেয়, রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে নয়।

রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা সম্পর্কে ভিন্ন মত

আবার আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসিগণ মনে করেন যে, রাষ্ট্রের বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা আন্তর্জাতিক আইন এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সীমাবদ্ধ। কিন্তু একথাও স্বীকার করা যায় না। কারণ আন্তর্জাতিক আইনকে যথাযথভাবে কার্যকরী করার কোন ব্যবস্থা না থাকার জন্য আন্তর্জাতিক আইন কখনই আইনপদবাচ্য বলে স্বীকৃত নয়। সে কারণে আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা সীমাবদ্ধ হতে পারে না বলে অনেক আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মত পোষণ করেন। দ্বিতীয়তঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (United Nations) মত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের নির্দেশাবলী মান্য করতে প্রতিটি রাষ্ট্র বাধ্য বলে অনেকে মত পোষণ করেন। কিন্তু একথাও সত্য নয়, কারণ সাম্মলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ গ্রহণ করা বা না-করা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রগুলির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তবে একথা সত্য যে কোন সার্বভৌম রাষ্ট্র যাতে অন্য কোন সার্বভৌম রাষ্ট্রকে আক্রমণ না করে তার জন্য কতকগুলি আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন বর্তমানে প্রতিটি সার্বভৌম রাষ্ট্রকে মান্য করতে হয়। কিন্তু ঐ নিয়মকানুন মান্য করা সার্বভৌম শক্তির স্বেচ্ছাধীন। যদি কোন রাষ্ট্র সম্মিলি জাতিপুঞ্জের নির্দেশ মানতে অস্বীকার করে তবে তার বিরুদ্ধে কার্যতঃ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বলা যায়, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে তাকে সীমাবদ্ধ করতে পারে না।

[খ] **সর্বজনীনতা** (Universality) : সার্বভৌমিকতার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হোল সর্বজনীনতা। সর্বজনীনতার অর্থ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সমস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সার্বভৌম শক্তির অধীন। তবে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যে সব বৈদেশিক প্রতিনিধি এবং দপ্তরখানাসমূহ থাকে সেগুলি উক্ত রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির অধীন নয়। এর অর্থ কিন্তু কখনই সার্বভৌম ক্ষমতার সর্বজনীনতার হ্রাস বোঝায় না। আন্তর্জাতিক আইনকানুন, পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সৌজন্যের খাতিরে রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় তার সার্বভৌম ক্ষমতা উক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে না। কোন রাষ্ট্র ইচ্ছা করলেই এই সৌজন্যমূলক পারস্পরিক বোঝাপড়ার অবসান ঘটাতে পারে। তবে একথা সত্য যে, প্রতিটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ। আইনগত

সর্বজনীনতা

পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনভাবে কখনই রাষ্ট্র তার অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপরে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না।

[গ] **স্থায়িত্ব (Permanence) :** স্থায়িত্ব হোল সার্বভৌমিকতার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব যতদিন থাকে ততদিন সার্বভৌমিকতা স্থায়ী হয়। রাষ্ট্র বিলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সার্বভৌমকতার স্থায়িত্ব বিনষ্ট হয়। অনেকে মনে করেন, সরকারের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। কারণ সরকার হোল সার্বভৌম শক্তির ব্যবহারকারী বা প্রয়োগকারী মাত্র। সরকারের পরিবর্তনে রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলি অবিকৃতই থাকে। এক সরকারের পরিবর্তন হলে অন্য সরকার রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যবহার করে।

স্থায়িত্ব

[ঘ] **অবিভাজ্যতা (Indivisibility) :** অবিভাজ্যতা সার্বভৌমিকতার চতুর্থ বৈশিষ্ট্য। অবিভাজ্যতা বলতে বোঝায়, সাবভৌমিকতাকে কখনই বিভক্ত করা যায় না। বস্তুতঃ রাষ্ট্র হোল আইনানুসারে সংগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ জন সমাজ। এই ঐক্যবদ্ধতার জন্য প্রয়োজন হয় সার্বভৌমকতার ঐক্যের। বস্তুতঃ সমাজব্যবস্থায় ঐক্য ও সংহতি অব্যাহত রাখার জন্য সার্বভৌম ক্ষমতার অবিভাজ্যতা একান্ত অপরিহার্য। সার্বভৌম ক্ষমতার বিভাজন ঘটলে সমাজে বিশৃংখলা আসার সমূহ সম্ভাবনা দেখা যায়। তাই অধ্যাপক গেটেল বলেছেন, "সার্বভৌমিকতার বিভাজন ধারণাটিই স্ব-বিরোধী।"

অবিভাজ্যতা

তবে বহুত্ববাদী (Pluralists) রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ সার্বভৌমিকতার এই বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে, সমাজের মধ্যে নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যথা—অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি। রাষ্ট্র হোল একটি প্রতিষ্ঠানমাত্র যেহেতু রাষ্ট্র অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির মতই, সেহেতু তার বিশেষ কোন ক্ষমতা থাকতে পারে না। অন্যভাবে বলা যায় যে, বহুত্ববাদীরা রাষ্ট্রের মত সমাজস্থ অন্যান্য সংঘগুলিকেও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে মন্তব্য করেন। কিন্তু বহুত্ববাদীদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ যে-কোন সময়ই সংঘগুলির মধ্যে ক্ষমতার প্রশ্নে সংঘর্ষ বাধতে পারে। এর ফলে সমাজের শান্তি, শৃংখলা ও অগ্রগতি নিশ্চিতভাবেই বাধাপ্রাপ্ত হবে। বহুত্ববাদীদের অন্যতম প্রবক্তা অধ্যাপক ল্যাস্কি (Laski) নিজেই স্বীকার করেছেন যে, রাষ্ট্র হোল অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতই ; কিন্তু সমগোত্রীয় সংঘগুলির মধ্যে রাষ্ট্র হোল সর্বশ্রেষ্ঠ। উপরি উক্ত কারণগুলির জন্য আমরা বহুত্ববাদীদের বক্তব্য গ্রহণ করতে পারি না।

[ঙ] **অহস্তান্তরযোগ্যতা (Inalienability) :** সার্বভৌমিকতার পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল অহস্তান্তরযোগ্যতা। রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতাকে কখনই হস্তান্তর করা যায় না। মানুষের জীবন, বৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গম হওয়ার অধিকার যেমন নিজেকে ধ্বংস না করে অপরকে প্রদান করা যায় না তেমনি সার্বভৌমিকতা হস্তান্তর করে কোন রাষ্ট্রই রাষ্ট্র হিসেবে বাঁচতে পারে না। সেদিক থেকে বিচার করে সার্বভৌমিকতাকে রাষ্ট্রের প্রাণ বলে অভিহিত করা যায়।

অহস্তান্তরযোগ্যতা

অনেকে কিন্তু রাষ্ট্রের কোন অংশ অপর রাষ্ট্রকে প্রদান করাকে সার্বভৌমিকতার

হস্তান্তর বলে মনে করেন। কিন্তু তাঁদের ধারণা ভ্রান্ত। কারণ রাষ্ট্রের সীমা পরিবর্তনের অর্থ কখনই তার সার্বভৌম ক্ষমতার পরিবর্তন নয়।

সার্বভৌমিকতার উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সার্বভৌমিকতার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক গেটেল বলেছেন, "সার্বভৌমিকতার ধারণাই হোল আধুনিক রাষ্ট্রের ভিত্তি।"

৩। সার্বভৌমিকতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (Origin and Development of Sovereignty)

আইনসংগত সার্বভৌমিকতার (Legal Sovereignty) তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে আধুনিককালে। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় দার্শনিকদের রচনার মধ্যে রাষ্ট্রকে বিশেষ মর্যাদা প্রদানের চেষ্টা করা হলেও সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে তাদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। মধ্যযুগের পাশ্চাত্য সভ্যতা সমগ্র খ্রীষ্টজগতের ধর্মগুরু পোপকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। এই সময় সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোক বিভিন্ন প্রকার অধিকার ভোগ করত। নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বও কোনও একটি সুনির্দিষ্ট কর্তৃত্বের হস্তে ন্যস্ত ছিল না। রোমান ক্যাথলিক চার্চ, পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য (Holy Roman Empire), সামন্ততান্ত্রিক ভূম্যধিকারী, গিল্ড (Guild) প্রভৃতি কর্তৃপক্ষের হস্তে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার ছিল। ঐ সব কর্তৃপক্ষ পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ সম্প্রসারণের প্রতিযোগিতায় প্রায়ই অবতীর্ণ হোত। কোকারের মতে, তখন রাষ্ট্রের জন্য কোন অনুভূতি ছিল না; কেন্দ্রীয় শক্তির উপর কোন প্রকার সাধারণ ও অভিন্ন আনুগত্য ছিল না; সর্বশক্তিমান কোন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না; রাষ্ট্রীয় আইনের সমপরিমাণ চাপ ছিল না (no equal pressure of civil law); আনুষ্ঠানিক ও বৈধ নিয়মকানুনের মাধ্যমে সংগঠনের কোন ধারণাগত ভিত্তি ছিল না, তখন যা কিছু ছিল তা চার্চের কর্তৃত্বাধীন ছিল, রাষ্ট্রের নয়।

মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সামন্তগণ রাজার প্রতি এবং সাধারণ মানুষ সামন্তগণের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করত। আবার একই সময়ে কর্তৃত্বের প্রশ্নে রাষ্ট্র ও চার্চের মধ্যে চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। বস্তুতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে সমাজে চরম বিশৃংখলা দেখা দেয়। পোপের নৈতিক অধঃপতনের জন্য তাঁর কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। রাজা এই সুযোগে নিজের প্রাধান্য-প্রতিপত্তি বিস্তার করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সাধারণ মানুষ একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে যখন আন্তরিকভাবে কামনা করছিল ঠিক তখনই আবির্ভাব ঘটে 'জাতীয় রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে'র (National Monarchical State)। রাজা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। ভূমিগত কর্তৃত্ব সামন্তবর্গের হাত থেকে রাজার হাতে চলে যায়। সেই সময় বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভাবনা থাকায় বণিকশ্রেণী তাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের নিশ্চয়তার জন্য রাজার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে শুরু করে। মধ্যযুগীয় সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা যখন রাজার শক্তিবৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয়ে উঠেছে তখন ইউরোপে শুরু হয় নবজাগরণ

(Renaissance)। এর ফলে শুরু হোল চার্চের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ। এই সময় রোমান আইনের পুনরুজ্জীবন ঘটে। 'আইনকে রাজার ইচ্ছা' (Law is the will of the State) বলে প্রচার করা হয়। রাজার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্রগঠনের প্রচেষ্টা সাফল্যমন্ডিত হয়। সেই সঙ্গে মার্টিন লুথার (Martin Luther)-এর নেতৃত্বে 'সংস্কার আন্দোলন' (Reformation Movement) শুরু হলে পোপের কর্তৃত্বের পরিবর্তে রাজন্যবর্গের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। এইভাবে ইংল্যান্ডে টিউডর বংশের শাসন, স্পেনে পঞ্চম চার্লসের শাসন ও ফ্রান্সে চতুর্দশ লুই-এর কর্তৃত্বাধীন চরম রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে রাজার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ষোড়শ শতাব্দীতে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে আধুনিক ধারণা গড়ে উঠে। ফরাসী দার্শনিক বোঁদা পোপের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় তাঁর 'সিক্স বুক্স্ অন দি রিপাবলিক' (Six Books on the Republic) নামক পুস্তকে সার্বভৌমিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেন। তাঁর মতে, "আইনের দ্বারা, অনিয়ন্ত্রিত নাগরিক ও প্রজাদের উপর রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতাই হোল সার্বভৌম ক্ষমতা।" বোঁদা ও তাঁর সমকালীন অনেক লেখকই রাষ্ট্রের পরিবর্তে রাজাকেই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে প্রচার করেন। তাঁদের পক্ষে এরূপ ভুল করা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ পোপের সঙ্গে সংগ্রামে রাজাই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। যাই হোক, বোঁদা সার্বভৌম ক্ষমতাকে অবিভাজ্য, শাশ্বত এবং অপ্রতিহত বা চরম ক্ষমতা বলে বর্ণনা করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে হব্স্ও বোঁদার মতই তাঁর 'লেভিয়াথান' নামক গ্রন্থে সার্বভৌম ক্ষমতাকে এমন একটি শক্তি বলে বর্ণনা করেন যার কাছে মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করে তাদের সমস্ত স্বাভাবিক অধিকার এবং স্বাধীনতা বিনা শর্তে অর্পণ করে। এই সার্বভৌম ক্ষমতা যেহেতু চুক্তির পক্ষ নয় সেহেতু তাঁর ক্ষমতা চূড়ান্ত। চুক্তিভঙ্গের অভিযোগে কখনই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করা যাবে না। ঐ শতাব্দীতে গ্রোটিয়াস (Grotious) নামক বিখ্যাত ডাচ আন্তর্জাতিক আইনবিদ্ এই অভিমত পোষণ করেন যে, চরম রাজনৈতিক কর্তৃত্ব কেবলমাত্র তাঁর হস্তেই অর্পিত থাকে যাঁর ক্রিয়াকলাপ অন্য কারো আজ্ঞাধীন নয় এবং যাঁর ইচ্ছা কেউ অতিক্রম করতে পারে না। এরূপ কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তিই হলেন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এইভাবে নবজাগরণপ্রসূত সার্বভৌমিকতার ধারণা অর্থাৎ একটি চরম শক্তিশালী কর্তৃত্বের ধারণা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর দার্শনিকগণ কর্তৃক প্রচারিত হয়। নবজাগরণপ্রসূত সার্বভৌমিকতার ধারণা ছিল প্রধানতঃ আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতার ধারণা মাত্র। সার্বভৌমিকতার উদ্ভব প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ সেন বলেছেন, মধ্যযুগের শেষ অধ্যায়ে ইউরোপে যখন উৎপাদনের শক্তিগুলি সমকালীন সামাজিক সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে তাদের সৃজনশীল শক্তির পূর্ণ ব্যবহারের সুযোগ-সন্ধানে ব্যস্ত ছিল সেই সময় ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক দাবি এবং ধর্মের নামে চার্চের অধিকার রক্ষার মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এই সময় রাজনৈতিক দিক থেকে সংগঠিত মানুষের স্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যাজকদের বিশেষ সুযোগসুবিধার বিরুদ্ধে সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব নামে একটি তত্ত্ব উপস্থিত করা হয়। নবজাগরণের সময় ইউরোপে এই তত্ত্ব বিকাশ-লাভ করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দার্শনিক রুশো সার্বভৌমিকতার তত্ত্বকে আরো বিকশিত করেন। তাঁর মতে, কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী নয়। 'সাধারণ ইচ্ছা'র হাতেই প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পিত থাকে। এই সাধারণ ইচ্ছা হোল সকলের 'প্রকৃত ইচ্ছা'র (Real will) সমষ্টিমাত্র। তাঁর মতে, 'সাধারণ ইচ্ছা' হোল সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী। সকলের কল্যাণকারী এই সার্বভৌম 'সাধারণ ইচ্ছা' একক এবং চূড়ান্ত অর্থাৎ অসীম ক্ষমতার অধিকারী। সাধারণ ইচ্ছার নির্দেশে পরিচালিত হওয়া প্রত্যেকেরই উচিত। আবার 'সাধারণ ইচ্ছা' সার্বভৌম বলে তাকে বিভক্ত করা বা হস্তান্তরিত করা যায় না; উল্লেখযোগ্য যে, রুশোর সার্বভৌমিকতা তত্ত্বে রাজার কোন স্থান নেই। এইভাবে রুশো কার্যতঃ জনগণের সার্বভৌমিকতা (Popular Sovereignty) তত্ত্বের জন্মদান করেন।

রুশোর পর বেন্থাম (Bentham) এবং জন অস্টিন (John Austin) সার্বভৌমিকতার তত্ত্বকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেন। তাঁরা রাষ্ট্রের আইনগত সার্বভৌমিকতার উপর অত্যধিক বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অস্টিনের ভাষায়, যখন কোন সমাজ-নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অপর কোন অনুরূপ কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য স্বীকার না করে সেই সমাজের অধিকাংশের স্বভাবজাত আনুগত্য লাভ করে তখন সেই নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ (ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ) সেই সমাজে সার্বভৌম এবং ঐ কর্তৃপক্ষসহ উক্ত সমাজ রাষ্ট্রনৈতিক ও স্বাধীন সমাজ।

এর পর গ্রীন, বোসাংকোয়েত প্রমুখ আদর্শবাদী দার্শনিকগণ রাষ্ট্রকে মানুষের সামাজিক বৃত্তির প্রকাশ বলে বর্ণনা করে তার নৈতিক উন্নতিবিধানের জন্য রাষ্ট্রের চরম কর্তৃত্বকে সমর্থন করেন।

বিংশ শতাব্দীতে ল্যাস্কি প্রমুখ বহুত্ববাদী দার্শনিকগণ এবং আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ রাষ্ট্রের একক সার্বভৌম ক্ষমতাকে অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে, রাষ্ট্র অন্যান্য সামাজিক সংঘের মতই একটি সংঘ। প্রতিটি সংঘই তার নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীন ও সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী। আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসীরা রাষ্ট্রের বাহ্যিক সার্বভৌমিকতার ধারণায় আস্থাশীল নন। বর্তমানে অবশ্য কোকার, দ্যুগুই, ফলেট প্রমুখ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ বহুত্ববাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদীদের সার্বভৌম তত্ত্বের বিরূপ সমালোচনা করেছেন। আবার সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের বহু তাত্ত্বিক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক আইন এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সমর্থনে রাষ্ট্রের বাহ্যিক সার্বভৌমিকতাকে সীমিত করার পক্ষে নানাপ্রকার যুক্তির অবতারণা করেন। চার্লস ম্যানিং প্রমুখ শান্তির প্রয়োজনে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতাকে বিসর্জন দেওয়ার দাবি জানান। সর্বোপরি, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি ও এই নীতির বাস্তব রূপায়ণ এবং বিশ্বশান্তি রক্ষা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সম্প্রসারণে নিত্যনতুন উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদির ফলে সার্বভৌমিকতার ধারণায় বিশেষ পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

৪। সার্বভৌমিকতার বিভিন্ন রূপ (Different kinds of Sovereignty)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ বিভিন্ন প্রকার সার্বভৌমিকতার অস্তিত্ব আছে বলে মনে করেন। সার্বভৌমিকতার প্রকারভেদকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে এখন আলোচনা করা যেতে পারে।

[ক] **নামসর্বস্ব সার্বভৌমিকতা (Titular Sovereignty) এবং প্রকৃত সার্বভৌমিকতা (Real Sovereignty) :** রাষ্ট্রের মধ্যে যিনি নামেমাত্র সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী অর্থাৎ যাঁর নামে সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহৃত হয়, তাঁকে নামসর্বস্ব সার্বভৌম বলে অভিহিত করা হয়। তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আদৌ তাঁর চরম ক্ষমতাকে প্রয়োগ করতে পারেন না। যাবতীয় শাসনকার্য তাঁর নামে অন্য কোন কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিচালিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে দেশের চরম কর্তৃত্ব যাঁর বা যাঁদের হস্তে ন্যস্ত থাকে তাঁকে বা তাঁদের প্রকৃত সার্বভৌম বলে বর্ণনা করা হয়। ব্রিটেনের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে উভয় প্রকার সার্বভৌম কর্তৃত্বের পার্থক্য নিরূপণ করা সহজ হয়ে পড়ে। ব্রিটেনে তত্ত্বগতভাবে রাজা বা রানী সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী। তাঁর নামেই দেশের যাবতীয় শাসনকার্য পরিচালিত হয় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিসমূহ নির্ধারিত হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ব্রিটিশ রাজা বা রানী 'রাজত্ব করেন মাত্র, শাসন করেন না'। তাঁর হয়ে যাবতীয় কাজ সম্পাদন করেন ব্রিটিশ মন্ত্রিপরিষদ। সম্পাদিত কার্যাবলীর জন্য মন্ত্রিপরিষদকে পার্লামেন্টের নিকট দায়িত্বশীল থাকতে হয়। রাজা বা রানী এই মন্ত্রিপরিষদের যে কোনো কাজে স্বাক্ষর প্রদান করতে বাধ্য। সুতরাং গ্রেট ব্রিটেনে তত্ত্বগতভাবে রাজা বা রানী সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী হলেও বাস্তবে তিনি নামসর্বস্ব শাসকমাত্র। অপরপক্ষে ব্রিটিশ মন্ত্রিপরিষদই হোল দেশের প্রকৃত শাসক। ভারতীয় রাষ্ট্রপতিকেও অনেকে নামসর্বস্ব শাসক এবং মন্ত্রিপরিষদকে প্রকৃত শাসক বলে অভিহিত করেন।

[খ] **আইনানুমোদিত সার্বভৌমিকতা (De Jure Sovereignty) এবং বাস্তব সার্বভৌমিকতা (De Facto Sovereignty) :** অনেক সময় ব্যবহারিক দিক থেকে বিচার করে আইনানুমোদিত ও বাস্তব সার্বভৌমিকতার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয়। আইনসংগতভাবে যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী তাঁকে আইনানুমোদিত সার্বভৌম বলা হয়। আইনই হোল এরূপ সার্বভৌমিকতার প্রধান ভিত্তি; আইনানুমোদিত সার্বভৌম আইন অনুসারে দেশ শাসন করেন এবং জনগণের স্বাভাবিক আনুগত্য অর্জন করেন। কিন্তু যখন কোন রাষ্ট্রে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদ আইন অনুসারে অথবা আইনের বিরুদ্ধে নিজেদের কর্তৃত্বকে চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন তাকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলা হয়। লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce)-এর মতে, যে ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ আইনসংগতভাবে কিংবা আইনবিরুদ্ধভাবে যখন নিজের চূড়ান্ত ইচ্ছাকে বলবৎ করতে পারেন, তখন তাঁকে বা তাঁদের বাস্তব সার্বভৌম বলে অভিহিত করা হয়।

দেশের সাধারণ অবস্থায় আইনানুমোদিত সার্বভৌম এবং বাস্তব সার্বভৌমের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। সাধারণতঃ অন্তর্বিপ্লব, বিদ্রোহ, বহিঃশত্রুর

আক্রমণ প্রভৃতি সময়ে উভয়প্রকার সার্বভৌমের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম চার্লসকে মৃত্যুদন্ড প্রদানের পর অলিভার ক্রমওয়েল (Oliver Cromwell) দীর্ঘ পার্লামেন্ট (Long Parliament) বাতিল করে দিয়ে বাস্তব সার্বভৌমিকতার অধিকারী হন। ফরাসী বিপ্লবের সময় ডাইরেক্টরীকে (Directory) পদচ্যুত করে নেপোলিয়ন (Napoleon) এবং পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থানের পর আয়ুব খান (Ayub Khan) বাস্তব সার্বভৌম বলে পরিচিত হন। অনেক সময় বৈদেশিক শক্তি দেশের কোন অংশ বলপূর্বক অধিকার করলে সেই অংশে উক্ত শক্তির বাস্তব সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসোলিনী (Mossolini) কর্তৃক আবিসিনিয়া অধিকৃত হওয়ার পর তিনি ঐ দেশের বাস্তব সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হন।

বাস্তব সার্বভৌমিকতা বেশ কিছুদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত থাকলে তা শেষ পর্যন্ত আইনানুমোদিত সার্বভৌমিকতায় রূপান্তরিত হয়। অন্তর্বিপ্লব কিংবা বিদ্রোহের ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষভাবে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু আইনানুমোদিত সার্বভৌম শক্তির অধিকারী যদি বিপ্লব দমন করতে সমর্থ হন তাহলে বাস্তব সার্বভৌমিকতাও তাঁর হস্তে কেন্দ্রীভূত হয়। তাই বলা যেতে পারে যে, আইনানুমোদিত সার্বভৌমিকতার সঙ্গে বাস্তব সার্বভৌমিকতার প্রকৃত কোন পার্থক্য নেই। বস্তুতঃ সার্বভৌমিকতার ধারণা হোল আইনগত ধারণা মাত্র। তাই অনেকে এই অভিমত প্রদান করেন যে, একটি রাষ্ট্রে আইনগতভাবে কেবলমাত্র একটি সার্বভৌম কর্তৃত্বই থাকে। আইনানুমোদিত সার্বভৌমিকতাকে বিজ্ঞানসম্মত সার্বভৌমিকতা বলে অভিহিত করা সমীচীন নয়। বিদ্রোহ বা বিপ্লবের সময় আইনানুমোদিত ও বাস্তব সার্বভৌমিকতার মধ্যকার বিরোধে এঁরা আইনানুমোদিত সার্বভৌম কর্তৃত্বকে প্রকৃত সার্বভৌমিকতার অধিকারী বলে বর্ণনা করেন। বস্তুতঃ বিদ্রোহ বা বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষ বাস্তবে সার্বভৌম শক্তি হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হলেও শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাঁদের জনগণের সাধারণ সম্মতি এবং অপরাপর রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করে আইনানুমোদিত সার্বভৌম বলে পরিচিত হতে হয়। এদিক থেকে বিচার করে বলা যায় যে, আইনানুমোদিত ও বাস্তব সার্বভৌমিকতার মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। তাই আইনানুমোদিত ও বাস্তব সার্বভৌমিকতার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের পরিবর্তে আইনানুমোদিত ও বাস্তব সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করাকেই অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত বলে গেটেল মন্তব্য করেছেন।

[গ] **আইনসংগত সার্বভৌমিকতা (Legal Sovereignty) এবং রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা (Political Sovereignty) :** আইনবিদদের দৃষ্টিতে সার্বভৌমিকতার ধারণাই হোল আইনগত ধারণা। প্রত্যেক রাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন করার চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষকেই আইনসংগত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে বর্ণনা করা হয়। আইন-প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষের আদেশই চূড়ান্ত এবং তা সবকিছুর ঊর্ধ্বে অবস্থান করে। সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মীয় অনুশাসন, বিচারালয়ের রায়, জনমতের নির্দেশ ইত্যাদি কোনভাবেই আইনসংগত সার্বভৌমিকতার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে না। আইনবিদগণের মতে, যে সার্বভৌমিকতা আইনানুমোদিত নয়, তার কোন মূল্য নেই। তা সম্পূর্ণভাবেই অবৈজ্ঞানিক। ব্রিটেনের 'রাজা-সহ-

পার্লামেন্ট'কে (King-in Parliament) অস্টিন (Austin) আইনসংগত সার্বভৌমিকতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলে বর্ণনা করেছেন। 'রাজা-সহ-পার্লামেন্ট' গ্রেট ব্রিটেনের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। ব্রিটেনের কোন ব্যক্তি, কোন প্রতিষ্ঠান, এমন কি আদালতও পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত আইনের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেন না। সমস্ত নীল চক্ষুবিশিষ্ট শিশুদের হত্যা করা হবে বলে যদি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কোন আইন প্রণয়ন করে তাহলে আইনগত দিক থেকে তা বৈধ। আদালতও এরূপ আইনকে অবৈধ বলে ঘোষণা করতে পারবেন না। কোন ব্যক্তি যদি এই আইনের বিরোধিতা করে তাহলে আইনভঙ্গের অপরাধে তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের চূড়ান্ত সার্বভৌম কর্তৃত্বের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে ডি লোলমি (De Lolme) মন্তব্য করেন, কেবলমাত্র নারীকে পুরুষে এবং পুরুষকে নারীতে রূপান্তরিত করা ছাড়া ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সব কিছুই করতে পারে। এদিক থেকে বিচার করে সার্বভৌম শক্তির আদেশকেই আইন বলে বর্ণনা করা যেতে পারে।

কিন্তু আইনসংগত সার্বভৌমিকতা কখনই চরম, অপ্রতিহত ও অনিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। বাস্তবে এরূপ কোন সার্বভৌম শক্তিরই সন্ধান পাওয়া যায় না। আইনসংগত সার্বভৌমিকতার পেছনে অন্য এক প্রকার সার্বভৌমিকতা থাকে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তাকে রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা বলে অভিহিত করা হয়। ডাইসি'র মতে, যে সার্বভৌমিকতাকে আইনবিদ্‌গণ স্বীকার করেন তার পেছনে আর একটি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী রয়েছে যার কাছে আইনসংগত সার্বভৌমিকতাকে মাথানত করতে হয়। অধ্যাপক গিলক্রিস্টের ভাষায়, রাষ্ট্রের যে সমষ্টিগত প্রভাব আইনসংগত সার্বভৌমিকতার পশ্চাতে অবস্থান করে সেগুলির ঐক্যবদ্ধ রূপ হোল রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা। গার্নারও অনুরূপ মত পোষণ করে বলেন, আইনসংগত সার্বভৌমিকতার পশ্চাতে অন্য একটি শক্তি থাকে, আইন যাকে স্বীকৃতি দেয় না, যা অসংগঠিত, যা আইনসিদ্ধ আদেশরূপে রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে প্রকাশ করতে অসমর্থ, তথাপি সেই শক্তির নির্দেশেই আইনসংগত সার্বভৌমকে কার্যক্ষেত্রে মাথানত করতে হয় এবং রাষ্ট্রে তার ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে। সুতরাং আইনসংগত সার্বভৌমিকতাকে, নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি বা প্রভাবকেই রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা বলা যায়। তবে কোন্ শক্তি বা কোন্ প্রভাবকে রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা বলে অভিহিত করা হবে তা নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অনেকে জনমতকে, অনেকে আবার ধর্মীয় ও নৈতিক অনুশাসনকে রাজনৈতিক সার্বভৌম বলে বর্ণনা করেন। তবে সাধারণভাবে জনমত গঠনকারী বিভিন্ন প্রভাব এবং নির্বাচকমণ্ডলীকে যুক্তভাবে রাজনৈতিক সার্বভৌম বলে অভিহিত করা যেতে পারে। জনমতের প্রভাবকে উপেক্ষা বা অস্বীকার করে কোন আইনসংগত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী সুদীর্ঘকাল ক্ষমতাসীন থাকতে পারে না। নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন না করলে আইনসংগত সার্বভৌম কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে গণ-অসন্তোষ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সেই অসন্তোষ বিপ্লবের আকারে আত্মপ্রকাশ করে আইনসংগত সার্বভৌমিকতার অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলতে পারে। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে ল্যাস্কি বলেন, আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করাই মানুষের সাধারণ অভ্যাস।

কিন্তু মানুষ নিজের জীবনের বিনিময়েও আইনের বিরোধিতা করেছে এমন দৃষ্টান্তও ইতিহাসে বিরল নয়। বস্তুতঃ জনমতের চরম বিরোধিতা করে কোন আইনসংগত সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী কখনই ক্ষমতায় আসীন থাকতে পারে না। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যেহেতু চূড়ান্ত আইন প্রণয়নকারী সংস্থা সেহেতু তা সমস্ত নীলচক্ষুবিশিষ্ট শিশুদের হত্যা করা সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করতে পারে। কিন্তু এরূপ আইন ন্যায়নীতিবোধের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাই ব্রিটিশ জনগণ এই আইনের চরম বিরোধিতা করতে কুণ্ঠিত হবে না। সুতরাং ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তত্ত্বগতভাবে যে-কোন আইন প্রণয়নের অধিকারী হলেও বাস্তবে তাকে সাধারণের ইচ্ছা বা জনমতের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে আইন প্রণয়ন করতে হয়। এইভাবে আইনসংগত সার্বভৌমিকতা কার্যক্ষেত্রে রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার দ্বারা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ-যোগ্য যে, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতাকে সার্বভৌমিকতা না বলে 'সাধারণের ইচ্ছা' বা 'জনমত' (public opinion) বলাই সঙ্গত বলে মনে করেন।

বর্তমান যুগের প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে আইনসংগত ও রাজনৈতিক সার্ব-ভৌমিকতার মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানের উপর গণতন্ত্রের সাফল্য বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। কিন্তু এই সামঞ্জস্য বিধান সহজ ব্যাপার নয়। তাই গেটেল মন্তব্য করেছেন, আইনসংগত ও চূড়ান্ত রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক নির্ধারণের সমস্যাই হোল সুশাসনের প্রধান সমস্যা। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের নগর-রাষ্ট্রগুলিতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রবর্তিত থাকায় নাগরিকগণ প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করতে পারত। কিন্তু বর্তমানে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের পরিবর্তে পরোক্ষ গণতন্ত্র প্রবর্তিত হওয়ার ফলে উভয় প্রকার সার্বভৌমিকতার মধ্যে সুসামঞ্জস্য বিধান করা সত্যই কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় প্রতিটি আইনসংগত সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারীকে পরিবর্তিত জনমানসের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ করতে হয়; অন্যথায় গণতন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমাজ শ্রেণীবিভক্ত থাকায় এবং সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্ব বর্তমান থাকায় আইনসংগত সার্বভৌমিকতা কার্যতঃ সংখ্যালঘু ধনিকশ্রেণীর স্বার্থে কাজ করে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার সঙ্গে তার বিরোধ অনিবার্য। কেবলমাত্র শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজে উভয় প্রকার সার্বভৌমিকতার মধ্যে অতি সহজেই সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব।

[ঘ] জনগণের সার্বভৌমিকতা (Popular Sovereignty): যোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে ধর্মসংস্কার আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলে পোপের প্রাধান্য হ্রাস পায় এবং রাজাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। রাজার এই ক্ষমতাবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হলে জনগণের সার্বভৌমিকতা সম্পর্কিত ধারণার উৎপত্তি ঘটে। মধ্যযুগে মারসিগুলিও, আলথুসিয়াস (Althusias) প্রমুখ ধর্ম-যাজকগণ রাজার প্রাধান্য-প্রতিপত্তি খর্ব করার জন্য জনগণের সার্বভৌমিকতা তত্ত্ব প্রচার করেন। এঁদের মতে, প্রথমে সার্বভৌমিকতা জনগণের হস্তেই অর্পিত ছিল এবং অহস্তান্তরযোগ্য বলে তা রাজার কাছে হস্তান্তরিত হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে

লক্ প্রচার করেন যে, জনগণই হোল চরম ক্ষমতার অধিকারী। তাই জনগণের ইচ্ছানুসারে ও সম্মতিক্রমেই কেবলমাত্র শাসক আইন প্রণয়ন করতে এবং আইন বলবৎ করতে পারেন। জনগণের ইচ্ছার বিরোধী কাজ করলে জনগণ সরকার বা শাসকের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে। লকের পর রুশো এবং জেফারসন (Jefferson)-এর হাতে জনগণের সার্বভৌমিকতা চরম রূপ পরিগ্রহ করে। রুশো প্রচার করেন যে, 'জনগণের কণ্ঠস্বরই হোল ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর' (Voice of the people is the voice of God)। তিনি 'সাধারণের ইচ্ছা'কে সার্বভৌম ক্ষমতার চরম অধিকারী বলে ঘোষণা করেন। তাঁর মতে, এই সার্বভৌম ক্ষমতা চরম, অভ্রান্ত এবং অহস্তান্তরযোগ্য। রুশো-প্রচারিত জনগণের সার্বভৌমিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৭৭৬ সালে আমেরিকার ঔপনিবেশিকগণ এবং ১৭৮৯ সালে ফরাসী জনগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই দুটি বিদ্রোহ ইতিহাসে যথাক্রমে আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম এবং ফরাসী বিপ্লব নামে পরিচিত। ১৭৯২ সালে ফরাসী আইনসভা ঘোষণা করল যে, তাদের এমন কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে যাতে জনগণের সার্বভৌমিকতা এবং স্বাধীন ও সাম্যের শাসন সুনিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণায় বলা হোল— সরকার জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েই ন্যায্য ক্ষমতা লাভ করেছে। এই সময় থেকেই জনগণের সার্বভৌমিকতা আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তি এবং মূলমন্ত্র হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে।

সমালোচনা : বাস্তবের কষ্টিপাথরে বিচার করে অনেকে জনগণের সার্বভৌমিকতাকে অবাস্তব ও অর্থহীন বলে প্রচার করেন। কারণ—প্রথমতঃ জনগণের সার্বভৌমিকতা তত্ত্ব যাঁরা প্রচার করেছেন তাঁদের কেউ ই 'জনগণ' বলতে কি বোঝায় তা সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করেননি। 'জনগণ' বলতে যদি দেশের সমস্ত মানুষকে বোঝায় তাহলেও বলা যায় যে, অনির্দিষ্ট এবং অসংগঠিত জনগণ কখনই যথার্থভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার সুষ্ঠু প্রয়োগ করতে পারে না। এরূপ জনগণের অভিমতকে রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হলেও আইনগতভাবে এর কোন মূল্য নেই। অধ্যাপক গার্নার বলেছেন, যেখানে সার্বিক ভোটাধিকার প্রবর্তিত হয়েছে এবং যেখানে নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আইনসিদ্ধ পদ্ধতিতে নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করে ও তার প্রাধান্য নিশ্চিত করে সেখানে জনগণের সার্বভৌমিকতা কার্যকরী হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। কিন্তু গার্নারের এই অভিমতটিও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ একটি দেশে নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশী নয়। এই স্বল্প সংখ্যক নির্বাচকমণ্ডলীর মতামতকে জনমতের অভিব্যক্তি বলে ধরে নেওয়া কোনভাবেই সঙ্গত নয়। তাছাড়া, প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে দলপ্রথা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মুষ্টিমেয় বাছাই-করা প্রতিনিধিগণ শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁদের কার্যাবলীকে জনমতের প্রকাশ বলে মনে করা উচিত নয়। কারণ এঁদের পশ্চাতে সংখ্যালঘু জনগণের সমর্থন থাকে মাত্র। তাই গেটেল মন্তব্য করেছেন, যাকে জনগণের সার্বভৌমিকতা বলে অভিহিত করা হয়, সেই জনগণ দেশের এক-পঞ্চমাংশ মাত্র। একে 'জনগণের সার্বভৌমিকতা' বলে অভিহিত করা যুক্তিহীন।

বস্তুতঃ দেশের সমস্ত জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পিত থাকলে তাকে কখনই 'জনগণের সার্বভৌমিকতা' বলে আখ্যা দেওয়া সমীচীন নয়।

অনেক সময় জনগণের সার্বভৌমিকতা বলতে জনগণের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে বোঝায়। এই অর্থে জনগণের সার্বভৌমিকতা বলতে অনেকে বিপ্লবের মাধ্যমে আইন-সংগত সরকারের পরিবর্তনের ক্ষমতাকে বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু সাধারণভাবে বলা যায়, বিপ্লবের ক্ষমতা যেহেতু আইনসংগত নয়, সেহেতু এই সার্বভৌমিকতার অস্তিত্ব আইনবিদ্‌গণ স্বীকার করেন না। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, শান্তির সময়ে অর্থাৎ সাধারণ অবস্থায় জনমতের সার্বভৌমিকতা জনমত ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু জনমত অনির্দিষ্ট এবং অসংগঠিত হওয়ায় আইনের দৃষ্টিতে তা সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী নয়। আবার অস্বাভাবিক অবস্থায় জনগণের সার্বভৌমিকতার অর্থ বিপ্লবের ক্ষমতা, যাকে আইনবিদ্‌গণ বে-আইনী বলে মনে করেন। তাই গেটেল জনগণের সার্বভৌমিকতার ধারণাকে রাষ্ট্রের সংজ্ঞার নিরিখে 'একটি অসংগত ধারণা' (a contradiction in terms) বলে বর্ণনা করেছেন।

জনগণের সার্বভৌমিকতা সম্পর্কিত তত্ত্বের বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও এর গুরুত্বকে কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতকে উপেক্ষা বা অস্বীকার করে কোন সরকারই ক্ষমতাসীন থাকতে পারে না। তাই জনমত যাতে শাসনযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে সেজন্য লিখিত সংবিধানের প্রবর্তন, ব্যাপক ভোটাধিকার প্রদান, স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ, জনপ্রতিনিধিদের নিকট সরকারের দায়িত্বশীলতার প্রবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে সরকারের উপর জনগণের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়। কোন কোন পরোক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণভোট (Referendum), গণ-উদ্যোগ (Initiative), প্রত্যাহার (Recall) প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে জনগণের সার্বভৌমিকতাকে কার্যকরভাবে রূপদানের চেষ্টা করা হয়।

মন্য

৫। একত্ববাদ (Monism)

সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে আইনসঙ্গত মতবাদ একত্ববাদ (Monism) নামে পরিচিত। অনেকে এই মতবাদকে 'পরম্পরাগত' (Traditional or classical) মতবাদ বলেও অভিহিত করেন। একত্ববাদীদের মতে, সার্বভৌমিকতা চরম, অবাধ, অসীম ও অবিভাজ্য। একত্ববাদীরা সার্বভৌমিকতার কেন্দ্রীকরণ নীতিতে তথা রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতায় বিশ্বাসী।

একত্ববাদ মতে কি বোঝায়

একত্ববাদকে দুভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—ক. পূর্ণ তত্ত্বগত (abstract) এবং খ. বাস্তব (concrete)। পূর্ণ তত্ত্বগত একত্ববাদ অনুসারে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে কোন প্রকার সংঘের অস্তিত্ব থাকতেই পারে না। রাষ্ট্র হোল এক এবং অদ্বিতীয়। সার্বভৌমিকতা কেবলমাত্র রাষ্ট্রের হস্তেই কেন্দ্রীভূত। এরূপ একত্ববাদের সমর্থকগণ মনে করেন যে, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে কোন প্রকার সংঘের অস্তিত্ব থাকার অর্থই হোল ঐক্যহীনতা। তাঁরা সমস্ত সংঘের অস্তিত্ব বিলোপ করে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

দু প্রকারের একত্ববাদ

বাস্তব একত্ববাদের সমর্থকবৃন্দ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রকার সংঘের অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেন না। তবে ঐসব সংঘের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা একান্ত প্রয়োজন বলে তাঁরা মনে করেন। এঁরা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতাকে চরম, অভিন্ন ও অবিভাজ্য বলে মনে করেন। সার্বভৌমিকতা কেবলমাত্র রাষ্ট্রেরই থাকতে পারে, অন্য কোন সংঘের থাকতে পারে না। তাই রাষ্ট্র তার ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে অপ্রতিহত ও চরম কর্তৃত্বের অধিকারী। রাষ্ট্র চরম বলে তা ধর্মীয় অনুশাসন, প্রথা, এমনকি আইনের দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত নয়। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অবস্থিত প্রতিটি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংঘ তার নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য। এরা যে-সমস্ত অধিকার বা সুযোগসুবিধা ভোগ করে তা রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত হয়।

বোঁদা, হবস্, বেন্থাম ও জন অস্টিন হলেন একত্ববাদের প্রধান প্রবক্তা। ফরাসী দার্শনিক বোঁদা পোপের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় তাঁর 'সিক্স বুক্স অন দি রিপাবলিক' (Six Books on the Republic) নামক পুস্তকে সার্বভৌমিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেন। তাঁর মতে, আইনের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত নাগরিক ও প্রজাদের উপর রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতাই হোল সার্বভৌম ক্ষমতা। এরূপ ক্ষমতাকে তিনি চরম (absolute), চিরস্থায়ী (perpetual) এবং আইনের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত (unrestrained by law) বলে বর্ণনা করেছেন। সার্বভৌম কর্তৃত্বকে তিনি আইনের উৎসস্থল বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, আইন হোল 'শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নির্দেশ' (Command of the human superior) এবং এরূপ আইন বলপ্রয়োগের (sanctions) মাধ্যমে বলবৎ করা হয়। তবে তিনি রাষ্ট্রের পরিবর্তে রাজাকেই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে প্রচার করে ভুল করেছেন। তাঁর পক্ষে এ ভুল করা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক, কারণ পোপের সঙ্গে সংগ্রামে রাজাই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করেছিলেন।

বোঁদার সার্বভৌমিকতা তত্ত্ব

বোঁদার পর ইংরেজ দার্শনিক হবস্ তাঁর 'লেভিয়াথান' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সার্বভৌমিকতা তত্ত্ব প্রচার করেন। তাঁর মতে, আদিম মনুষ্য সম্প্রদায় নিজেদের হাহাকারদীর্ণ জীবনের পরিসমাপ্তির জন্য নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে সমস্ত ক্ষমতা একজন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের হস্তে অর্পণ করে। পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ হলেন সার্বভৌম শক্তির কেন্দ্রস্থল। চুক্তির ফলে যে সার্বভৌম শক্তি জন্মলাভ করল তাঁর ক্ষমতা চরম বা নিরঙ্কুশ। অধ্যাপক ডানিং (Dunning)-এর মতে, এই চরম ক্ষমতার অধিকারীর উদ্ভব ঘটেছে চুক্তির পরে, চুক্তির পূর্বে তার কোন অস্তিত্ব ছিল না। যেহেতু সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী চুক্তির পক্ষে ছিলেন না, সেহেতু তিনি বা তাঁরা চুক্তির ঊর্ধ্বে। সুতরাং চুক্তিভঙ্গের অপরাধে কখনই তাঁকে বা তাঁদের দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। এমন কি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী যদি অত্যাচারীও হয়ে উঠেন তথাপি তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার কোন অধিকার জনগণের নেই। নিজেদের কল্যাণ সাধনের প্রয়োজনে চুক্তির মাধ্যমে প্রজারা তাদের সমস্ত ক্ষমতা সার্বভৌম শক্তির আধার রাজার হস্তে সমর্পণ করেছে। এই চুক্তি ভঙ্গ করার অর্থই হোল দুর্বিষহ ও ভয়ংকর

হবসের সার্বভৌমিকতা তত্ত্ব

প্রাকৃতিক অবস্থাকে পুনরায় আহ্বান করা। সুতরাং নিজেদের স্বার্থেই প্রজাদের চুক্তি মেনে চলা উচিত। হবস্ সার্বভৌম শক্তির অধিকারী রাজার আদেশ বা নির্দেশকেই আইন বলে বর্ণনা করেছেন। সার্বভৌম শক্তির অধিকারী যতটুকু স্বাধীনতা প্রজাদের প্রদান করা সমীচীন বলে মনে করবেন ততটুকু স্বাধীনতাই তারা ভোগ করতে পারবে। কারণ প্রজাদের কল্যাণ বিধানের জন্য কতটুকু স্বাধীনতা প্রয়োজন তা প্রজারা জানে না, জানেন কেবলমাত্র সার্বভৌম শক্তির অধিকারী রাজা। এইভাবে বোঁদার মতো হবস্ও রাজাকে সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী বলে বর্ণনা করে আইনগত সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব প্রচার করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বোঁদা সার্বভৌম শক্তিকে ঈশ্বরের আইন (Law of God), সাংবিধানিক আইন (Constitutional Law) এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের নিয়মের অধীন বলে বর্ণনা করে তাঁর অপ্রতিহত ক্ষমতার উপর কিছুটা বাধানিষেধ আরোপ করেছিলেন। কিন্তু হবস্ সার্বভৌম কর্তৃত্বের উপর এই সব বাধানিষেধ আরোপ করেননি।

বেন্থাম রাষ্ট্রকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে বর্ণনা করেন। যেহেতু রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা চরম এবং অসীম, সেহেতু তার কোন কাজই বে-আইনী হতে পারে না। তাঁর মতে, তথাকথিত প্রাকৃতিক আইন (Law of Nature), জনগণের প্রাকৃতিক অধিকার (Natural Rights) প্রভৃতি কোন কিছুই সার্বভৌম শক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে না। তবে তিনি একথা স্বীকার করেন যে, প্রজারাই কেবলমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্রকে বাধাদান করতে পারে। আইনকে তিনি সেই সার্বভৌম কর্তৃত্বের আদেশ বলে মনে করেন যার প্রতি জনসাধারণ তাদের স্বাভাবিক আনুগত্য প্রদর্শন করে।

বেন্থামের সার্বভৌমিকতা তত্ত্ব

৬। সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে অস্টিনের মতবাদ (Austin's Theory of Sovereignty)

একত্ববাদ তথা আইনগত সার্বভৌমিকতার প্রধান প্রবক্তা হলেন খ্যাত ইংরেজ আইনবিদ্ জন অস্টিন (John Austin)। ১৮৩২ সালে প্রকাশিত 'আইনশাস্ত্রের উপর বক্তৃতা' (Lectures on Jurisprudence) নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে তিনি তাঁর সার্বভৌমিকতা তত্ত্ব প্রচার করেন। তিনি হবসের সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের সঙ্গে হিতবাদী বেন্থামের সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে আইনগত সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ মতবাদ প্রচার করেন।

জন অস্টিনের সার্বভৌমিকতা তত্ত্ব

সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে জন অস্টিন বলেছেন, "যখন কোন সমাজে নির্দিষ্ট কোন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অপর কোন অনুরূপ কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য স্বীকার না করে সেই সমাজের অধিকাংশের স্বভাবজাত আনুগত্য লাভ করে তখন সেই নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ (ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ) সেই সমাজে সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী এবং ঐ কর্তৃপক্ষসহ উক্ত সমাজ রাজনৈতিক ও স্বাধীন সমাজ।" তিনি আইনকে অধস্তনের প্রতি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ বলে বর্ণনা করেন। এরূপ আদেশের পশ্চাতে চরম কর্তৃত্বের অসীম

অস্টিন-প্রদত্ত সংজ্ঞা

শক্তির সমর্থন থাকে বলে অধস্তন ব্যক্তিবর্গ সেই আদেশ উপেক্ষা বা অমান্য করতে সাহস পায় না। আইনের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে অস্টিন বলেন, "আইন হোল সার্বভৌম শক্তির আদেশ মাত্র" (**Law is the command of the Sovereign**)। তাঁর মতে, আইনের সঙ্গে নৈতিক সূত্র বা প্রথার কোন সম্পর্ক নেই। অস্টিন প্রদত্ত সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে সার্বভৌমিকতার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যথা :

সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য

(ক) কেবলমাত্র রাজনৈতিক ও স্বাধীন সমাজেই সার্বভৌমিকতার অস্তিত্ব থাকে।

(খ) এরূপ সমাজে সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী বিশেষ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ। সুতরাং সার্বভৌমিকতার অবস্থান সম্পর্কে কোন বিরোধ থাকার কথা নয়, কারণ প্রকৃতিগতভাবেই তা সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট। এরূপ সার্বভৌম শক্তি জনসাধারণের মত অনির্দিষ্ট কিংবা সাধারণ ইচ্ছা (General Will)-এর মত নৈর্ব্যক্তিক (Impersonal) নয়।

(গ) সার্বভৌম শক্তি হোল এমন একটি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যা অন্য কোন অনুরূপ কর্তৃপক্ষের নিকট আনুগত্য প্রদর্শন করে না, অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতা চরম ও অসীম।

(ঘ) অস্টিনের সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রকৃতিগতভাবে চরম ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী বলে রাষ্ট্রাধীন সব ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংঘের উপর কর্তৃত্ব করতে পারে। এরূপ সার্বভৌম কর্তৃত্ব সর্বব্যাপী বলে তা অবিভাজ্য অর্থাৎ তাকে বিভক্ত করা যায় না।

(ঙ) জনগণ স্বভাবজাতভাবেই সার্বভৌম কর্তৃত্বের প্রতি স্বাভাবিক আনুগত্য প্রদর্শন করে। সুতরাং জনগণের স্বাভাবিক আনুগত্যকে সার্বভৌমিকতার মানদণ্ড বলে মনে করা হয়। সার্বভৌম শক্তির প্রতি জনগণের আনুগত্য অস্থায়ী বা সাময়িক নয় ; স্বভাবজাত বলেই এরূপ আনুগত্য মোটামুটি স্থায়ী প্রকৃতি-সম্পন্ন হয়।

(চ) রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সার্বভৌমিকতা সকলের উপর সমানভাবে প্রযুক্ত হয়।

(ছ) সার্বভৌমের আদেশই হোল আইন। সকলেই সার্বভৌমের আদেশ অর্থাৎ আইন মান্য করতে বাধ্য। যারা আইন মান্য করে না তাদের শাস্তি পেতে হয়।

অধ্যাপক ল্যাস্ক-র মতে, অস্টিনের সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের তিনটি তাৎপর্য রয়েছে, যথা—১. অস্টিনের মতে, রাষ্ট্র হোল আইন অনুসারে সংগঠিত এমন একটি সংস্থা (a legal order) যেখানে নির্দিষ্ট কর্তৃত্বই হোল সমগ্র ক্ষমতার উৎস। ২. এরূপ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব (state power) অসীম অর্থাৎ কোন কিছুর দ্বারা সীমাবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত নয়। ৩. সার্বভৌম শক্তির আদেশই হোল আইন। আইনভঙ্গের অপরাধে রাষ্ট্র আইনভঙ্গকারীকে যথোচিত শাস্তি দিতে পারে।

সমালোচনা : জন অস্টিনের বিশুদ্ধ আইনগত সার্বভৌমিকতার তত্ত্বকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারবিশ্লেষণ করা হয় :

(১) অস্টিনের মতে সার্বভৌম শক্তি প্রকৃতিগতভাবে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ; তা জনসাধারণের মতো অনির্দিষ্ট কিংবা সাধারণ ইচ্ছার মতো নৈর্ব্যক্তিক নয়। সমাজের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষই—তা যে-কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ হোক না কেন—হোল সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। কিন্তু হেনরী মেইনের মতে, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের মধ্যে

যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্ণয় করা যায় না

সব সময় সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্দেশ করা যায় না। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। যুক্তরাষ্ট্রে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী নয়। এখানে সার্বভৌম কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বণ্টিত থাকে। তাছাড়া, উভয় প্রকার সরকারকেই সংবিধানের গণ্ডির মধ্যে থেকে কাজ করতে হয়। তাই অনেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানকে সার্বভৌম বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু এই যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকেও পরিবর্তন করা যায়। এদিক থেকে বিচার করে সংবিধান পরিবর্তনকারী সংস্থাকে সার্বভৌম অধিকারী বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু এই সংস্থা সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় অস্টিনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে তাকেও সার্বভৌম বলে অভিহিত করা যায় না। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমের অবস্থান নির্ণয় করা সত্যই কঠিন। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ল্যাস্কি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতার অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করা আদৌ সম্ভব নয়।

(২) অধ্যাপক ল্যাস্কি প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে অস্টিনের সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের সমালোচনা করে বলেন যে, অস্টিন আইনকে সার্বভৌম শক্তির আদেশ বলে বর্ণনা করে প্রথাগত আইনকে উপেক্ষা করেছেন। সার্বভৌমের আদেশ ছাড়াও প্রতিটি সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি বা প্রথা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকে। স্বয়ং সার্বভৌম এইসব প্রথাকে উপেক্ষা বা অস্বীকার করতে সাহস পান না। বিশ্ব-ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, এই সব প্রথা সামাজিক জীবনে আইনের মতই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। ল্যাস্কির মতে, তুরস্কের সুলতান যখন সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতেন তখন তাঁর পক্ষে কতকগুলি প্রথাগত বিধিনিষেধ উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। এগুলিকে মান্য করা তাঁর পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল। হেনরী মেইন বলেছেন, প্রাচ্যের অনুন্নত রাষ্ট্রগুলিতে প্রথাগত বিধিনিষেধের ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত প্রবল। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের মত স্বৈরাচারী শাসকও প্রচলিত প্রথাগুলিকে উপেক্ষা করতে সাহস পাননি। এদিক থেকে বিচার করে বলা যায় যে, প্রথাগত আইন যেহেতু সার্বভৌম শক্তির দ্বারা সৃষ্ট নয়, সেহেতু তিনি এগুলিকে উপেক্ষা করতে পারেন না। অনেকের মতে, অস্টিন প্রথাগত আইনকে আদৌ উপেক্ষা করেননি। কারণ তাঁর মতে, সার্বভৌম শক্তি যা অনুমোদন করেন তা-ই আইন অর্থাৎ তাঁর আদেশ। এর অর্থ হোল, প্রথাগত আইনগুলিকে প্রচলিত থাকার অনুমতি দিয়ে সার্বভৌম শক্তি এগুলিকে আইনে পরিণত হওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই বক্তব্যও যুক্তিগ্রাহ্য নয়, কারণ প্রথাগত আইনের বিরুদ্ধাচরণ করার সাহস তাঁর ছিল না বলে তিনি বাধ্য হয়েই এগুলিকে অনুমোদন করেছিলেন বলে মনে হয়। বস্তুতঃ অস্টিন প্রথাগত আইনের অস্তিত্বকে উপেক্ষা করেননি। কিন্তু সার্বভৌম শক্তি প্রথাগত আইনগুলিকে স্বেচ্ছায় আইনের মর্যাদা দিয়েছিলেন অথবা বাধ্য হয়েই দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে অস্টিন কোন সুস্পষ্ট অভিমত জ্ঞাপন করেননি।

অস্টিন প্রথাগত আইনকে উপেক্ষা করেছেন

(৩) সমালোচকদের মতে, অস্টিন আইনগত সার্বভৌমিকতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে কার্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতাকে উপেক্ষা করেছেন। অস্টিনের সার্বভৌমিকতা হোল চরম, চূড়ান্ত ও অসীম। কিন্তু আজ পর্যন্ত এরূপ শক্তিশালী কোন সার্বভৌম শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়নি। গিলক্রিস্টের মতে, রাষ্ট্রের যে সমষ্টিগত প্রভাব আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতার পশ্চাতে অবস্থান করে সেগুলির ঐক্যবদ্ধ রূপ হোল রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা। সাধারণভাবে জনমত গঠনকারী বিভিন্ন প্রভাব এবং নির্বাচকমণ্ডলীকে যুক্তভাবে রাজনৈতিক সার্বভৌম বলে অভিহিত করা হয়। এই রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতাকে আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতা কখনই উপেক্ষা করতে পারে না। অস্টিনের মতে, রাজা-সহ পার্লামেন্ট হোল সার্বভৌমিকতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্ট জনমতকে উপেক্ষা করে কোন আইন প্রণয়ন করতে সমর্থ হয় না। জনস্বার্থ-বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করার অর্থই হোল পরবর্তী নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের পরাজয় ঘটা। সুতরাং জনমতের ভয়ে আইনসঙ্গত সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী সদা-সর্বদাই সতর্কভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। অস্টিন রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমের প্রভাবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে ভুল করেছেন।

রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতাকে অস্টিন উপেক্ষা করেছেন

(৪) অস্টিনের সার্বভৌমিকতা তত্ত্ব গণতন্ত্রের পরিপন্থী বলে সমালোচকরা মনে করেন। গণতন্ত্র হোল এমন একটি সামাজিক পরিবেশ যেখানে ব্যক্তি তার ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারে। অস্টিন আইনগত সার্বভৌমকে চরম ও অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার অধিকারী বলে বর্ণনা করে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে আইনসঙ্গত কর্তৃত্বের উপর নির্ভরশীল করে তুলেছেন। তাছাড়া অস্টিন জনগণের সার্বভৌমিকতাকে কোনরূপ মূল্য দেননি। অথচ গণতন্ত্রের মূল শক্তিস্তম্ভ হোল জনসাধারণ।

অগণতান্ত্রিক মতবাদ

(৫) অস্টিন আইনকে সার্বভৌম শক্তির আদেশ বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, লোকে শাস্তির ভয়েই আইন মান্য করে। কিন্তু এই যুক্তিটিও আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অনেকেই মেনে নিতে সম্মত নন। তাঁদের মতে, যখন রাষ্ট্র ছিল না তখনও সমাজ কতকগুলি সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মীয় অনুশাসন ইত্যাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হোত। তাছাড়া বর্তমানে লোকে কেবলমাত্র শাস্তির ভয়েই আইন অমান্য করে না। লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce)-এর মতে, নির্লিপ্ততা, শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, শাস্তির ভয় এবং যৌক্তিকতার উপলব্ধিই আইন মান্য করার কারণ।

অস্টিনের আইন সম্পর্কিত ধারণা ত্রুটিপূর্ণ

(৬) গিয়ার্কে (Gierke), ক্র্যাবে (Krabbe), দ্যুগুই (Duguit), ল্যাস্কি, বার্কার প্রমুখ বহুত্ববাদীগণ সার্বভৌমিকতার একত্ববাদী ধারণাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। তাঁদের মতে, রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতাকে চরম এবং অসীম বলে বর্ণনা করে অস্টিন বাস্তব সত্যকে উপেক্ষা করেছেন। বহুত্ববাদী দার্শনিকদের মতে সমাজের মধ্যে রাষ্ট্র ছাড়াও অন্যান্য সংঘের অস্তিত্ব থাকে। এইসব সংঘ মানুষের ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিক বিকশিত করে

বহুত্ববাদীদের সমালোচনা

তাকে পরিপূর্ণতা দেয়। এইসব সংঘের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি সংঘগুলি মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক বলে স্বাভাবিকভাবেই সেগুলি রাষ্ট্রের মতই জনগণের আনুগত্য দাবি করতে পারে। তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই স্বাধীন ও সার্বভৌম। বহুত্ববাদীদের মতে, রাষ্ট্র হোল এইসব সংঘের মত একটি সংঘ। তাই রাষ্ট্রের ক্ষমতা কখনই অসীম ও চূড়ান্ত হতে পারে না। ল্যাস্কির মতে, মানুষের আনুগত্য যেহেতু বহুমুখী, সেহেতু রাষ্ট্র কখনই এককভাবে চরম সার্বভৌমিকতা দাবি করতে পারে না।

(৭) আন্তর্জাতিক আইনবিদ্‌গণ অস্টিনের সার্বভৌমিকতা তত্ত্ব তথা একত্ববাদের সমালোচনা করে বলেন যে, বর্তমানে কোন রাষ্ট্রই এককভাবে চরম বাহ্যিক সার্বভৌমিকতার অধিকারী নয়। প্রতিটি রাষ্ট্রকেই আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলতে হয়। তাছাড়া, বর্তমান পারমাণবিক যুগে যুদ্ধকে প্রতিহত করার জন্য প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করেছে। এই সদস্যপদ গ্রহণ করার অর্থই হোল—আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা মেনে নেওয়া। বস্তুতঃ কোন রাষ্ট্রই বর্তমানে এককভাবে বিভিন্ন অবস্থায় নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। তাই প্রতিটি রাষ্ট্রকেই অপরাপর রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হয়। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে প্রতিটি রাষ্ট্রকে কিছু না কিছু বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে হয়। সুতরাং বিশুদ্ধ আইনগত সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব আজ ব্যর্থ হয়েছে। তাই ল্যাস্কি মন্তব্য করেছেন, সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে সমস্ত ধারণাকেই পরিত্যাগ করতে পারলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পক্ষে উপকার হোত।

আন্তর্জাতিকতাবাদীদের সমালোচনা

(৮) পরিশেষে বলা যায় যে, অস্টিন প্রমুখ একত্ববাদী আইনবিদ্‌গণ যে সার্বভৌমিকতার কল্পনা করেছেন, সেই সার্বভৌমিকতা কার্যক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত সরকারই প্রয়োগ করে। কিন্তু সরকার যেহেতু মানুষকে নিয়ে গঠিত হয় সেহেতু তাদের পক্ষে ভুলত্রুটি করা খুব স্বাভাবিক। অস্টিনের সার্বভৌমিকতা তত্ত্ব মেনে নেওয়ার অর্থ সরকারের ভুলত্রুটিকে অভ্রান্ত ও চরম বলে স্বীকার করে নেওয়া—যা নীতিগতভাবে আদৌ কাম্য নয়। তাছাড়া, ধন-বৈষম্যমূলক সমাজে সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রধানতঃ সংখ্যালঘিষ্ঠ ধনিক-বণিকশ্রেণীর হস্তে ন্যস্ত থাকে বলে সাধারণ মানুষের কোনরূপ কল্যাণ সাধিত হয় না। এদিক থেকে বিচার করে অস্টিনের তত্ত্বকে চরম প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্ব বলে সমালোচনা করা যেতে পারে।

প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্ব

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একত্ববাদ তথা অস্টিনের সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের সমালোচনা করা হলেও একথা সত্য যে, সমালোচকগণ অনেক ক্ষেত্রেই অস্টিনের মতবাদের ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। অস্টিন আইনগত দিক থেকে বিচারবিশ্লেষণ করে সার্বভৌম শক্তিকে চরম ও অসীম বলে বর্ণনা করলেও তিনি কখনই সার্বভৌমিকতাকে পাশবিক বলের সঙ্গে অভিন্ন বলে বর্ণনা করেননি। ফ্রান্সিস্‌ গ্রাহাম উইলসন্‌ এই অভিমত পোষণ করেন যে, অস্টিন এমন মূর্খ ছিলেন না যে, তিনি রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা বলতে সরকারের স্বেচ্ছাচারের ক্ষমতাকে বুঝবেন। বস্তুতঃ সার্বভৌম শক্তির পশ্চাতে জনগণের স্বভাবজাত

উপসংহার

আনুগত্যের সমর্থনের কথা বলে অস্টিন কার্যতঃ সার্বভৌমিকতাকে জনগণের সম্মতির উপর ভিত্তিশীল করে গড়ে তুলেছেন। তবে একথা সত্য, তিনি আইনগত সার্বভৌমিকতাকে অত্যধিক প্রাধান্য দিয়ে রাজনৈতিক এবং জনগণের সার্বভৌমিকতাকে কিছুটা পরিমাণে উপেক্ষা করেছেন। তাই তাঁর সার্বভৌমিকতা তত্ত্বকে অসম্পূর্ণতা দোষে-দুষ্ট বলে মনে করা যেতে পারে।

৭। বহুত্ববাদ (Pluralism)

রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার চরম, অবাধ, অসীম এবং অখণ্ড অস্তিত্বের প্রচার একত্ববাদ নামে পরিচিত। একত্ববাদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া হিসেবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বহুত্ববাদের (Pluralism) আবির্ভাব ঘটে। ব্যক্তি ও সংঘজীবনের সর্বত্র রাষ্ট্রের অত্যধিক প্রাধান্য বিস্তার এবং অনাবশ্যক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া শুরু হয় রাজনৈতিক চিন্তাজগতে তা বহুত্ববাদ নামে পরিচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে এবং জৈব মতবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, হিতবাদ প্রভৃতি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়ার ফলে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। সমস্ত কর্তৃত্ব আইনগতভাবে রাষ্ট্রের হস্তে কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সংঘস্বাতন্ত্র্য ক্ষুন্ন হতে শুরু করে। বিশেষতঃ যুদ্ধের সময় রাষ্ট্র সর্বব্যাপী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে দাঁড়ায়। এরূপ সর্বব্যাপী ও কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে জার্মান আইনবিদ্ গিয়ার্কে (Gierke), ক্র্যাবে (Krabbe), ফরাসী দার্শনিক দ্যুগুই, ইংরেজ রাষ্ট্রনীতিবিদ্ ল্যাস্কি, আর্নেস্ট বার্কার, লিন্ডসে (Lindsay), মার্কিন রাজনীতিবিদ্ ফলেট (Follet) প্রমুখ নানাপ্রকার যুক্তিতর্কের অবতারণা করে বহুত্ববাদের সমর্থনে বক্তব্য প্রচার করেন।

একত্ববাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে বহুত্ববাদের আবির্ভাব

বহুত্ববাদী দার্শনিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ প্রধানতঃ তিনটি দিক থেকে একত্ববাদের সমালোচনা করেন, যথা—১. সামাজিক কাঠামোর দিক থেকে, ২. আইনগত দিক থেকে এবং ৩. আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে।

[১] বহুত্ববাদী দার্শনিকগণ একত্ববাদী সার্বভৌমিকতার ধারণাকে অবাস্তব, অবৈজ্ঞানিক এবং অকাম্য বলে মনে করেন। তাঁরা নৈরাজ্যবাদীদের মত রাষ্ট্রের বিলুপ্তি সাধনের পক্ষপাতী না হলেও অসীম সার্বভৌমত্বের অধিকারী হিসেবে রাষ্ট্রকে স্বীকার করে নিতে সম্মত নন। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার বিরুদ্ধে তাঁদের প্রধান যুক্তিগুলি হোল :

(ক) বহুত্ববাদীদের মতে, সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের বহুমুখী জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করতে রাষ্ট্র এককভাবে পারে না। তাই মানুষ সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি সংঘ বা প্রতিষ্ঠান গঠন করে। মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশে এইসব সংঘ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্র মানুষের কেবলমাত্র রাজনৈতিক জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারে কিন্তু জীবনের অন্যান্য দিকগুলি তাতে বিকশিত হয় না। তাই প্রয়োজন হয় বিভিন্ন প্রকার সংঘ বা সংগঠনের। প্রতিটি ব্যক্তি রাষ্ট্রের সভ্যপদ ছাড়াও

অন্যান্য সংঘের সভ্যপদ গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রের মতই সেগুলির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। এইসব সংঘের নিজস্ব স্বাধীন সত্তা রয়েছে। নিজ নিজ ক্ষেত্রে সংঘগুলি রাষ্ট্রের মতই জনগণের আনুগত্য দাবি করতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্র এককভাবে অসীম সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না। এবং সেই সব সংঘের ক্রিয়াকলাপে অহেতুকভাকে হস্তক্ষেপও করতে পারে না। গিয়ার্কে ও মেটল্যান্ড (Maitland) মনে করেন যে, স্থায়ী সংঘগুলি স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠে. প্রতিটি সংঘের পৃথক পৃথক সত্তা, চেতনা এবং ইচ্ছাশক্তি আছে। ব্যক্তির যেমন কতকগুলি অধিকার ও কর্তব্য থাকে, প্রতিটি সংঘেরও তেমনি কতকগুলি অধিকার ও কর্তব্য আছে। রাষ্ট্রের উচিত সংঘগুলির এই সব অধিকার ও কর্তব্যকে স্বীকৃতি দেওয়া।

(খ) একত্ববাদ রাষ্ট্র এবং সমাজকে অভিন্ন বলে বর্ণনা করে। একত্ববাদীদের মতে সমাজ হোল 'অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসমূহের সংগঠন' (association of unassociated Individuals)। বহুত্ববাদিগণ এই অভিমতকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, সমাজ অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসমূহের সংগঠন নয়; আবার রাষ্ট্র এবং সমাজ অভিন্নও নয়। সমাজ হোল কতকগুলি সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সংঘের যুক্ত সংঘমাত্র অর্থাৎ সমাজ সংঘমূলক। এরূপ সংঘগুলির মাধ্যমেই যেহেতু ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিক বিকশিত হয়, সেহেতু রাষ্ট্রের মতই এগুলিও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তাছাড়া, এই সংঘগুলি যেহেতু রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট হয়নি সেহেতু রাষ্ট্র যুক্তিসঙ্গতভাবেই এদের উপর সম্পূর্ণভাবে কর্তৃত্ব করতে পারে না। অন্যভাবে বলা যায়, বহুত্ববাদীদের মতে, সমাজের মধ্যে রাষ্ট্রই কেবলমাত্র চরম সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী নয়। রাষ্ট্র আইনভঙ্গের অপরাধে যেমন দৈহিক শাস্তিদান করতে পারে, এসব প্রতিষ্ঠানও তাদের সৃষ্ট নিয়মাবলী ভঙ্গের অপরাধে সামাজিক ও নৈতিক শাস্তি বিধান করতে পারে।

(গ) বহুত্ববাদীদের মতে, কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাই অসীম সর্বব্যাপী নয়। রাষ্ট্র ব্যক্তির বাহ্যিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সত্য কিন্তু তার অন্তর্জীবনের উপর কর্তৃত্ব করতে পারে না। ম্যাকআইভারের মতে, পেনসিল কাটার পক্ষে কুঠার যেমন অনুপযোগী, ব্যক্তির অন্তর্জীবনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির উন্নয়নে রাষ্ট্রও তেমন অনুপযোগী। বস্তুতঃ সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা বাস্তবায়িত হয়। সরকার কতিপয় ব্যক্তিকে নিয়েই গঠিত হয়। তাই সরকারের পক্ষে ভুলভ্রান্তি করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এরূপ সরকার কখনই মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশ সাধন করতে পারে না। তাই রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতাকে চরম ও সর্বব্যাপী বলে স্বীকার করা যায় না।

(ঘ) কোলে (Cole), হবসন (Hobson) প্রমুখ সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদের প্রবক্তাগণ মনে করেন যে, রাষ্ট্র হোল মানুষের সৃষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান। তাই রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার মানুষেরই আছে। মানুষ সংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজনৈতিক কার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে। সুতরাং এই সংঘগুলি রাষ্ট্রের মতই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। ম্যাকআইভার রাষ্ট্রকে একটি বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠান বলে বর্ণনা করলেও তাকে অসাধারণ প্রতিষ্ঠান বলে মনে করেন না। এইভাবে বহুত্ববাদিগণ

রাষ্ট্রের একক ও সর্বব্যাপী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। লিন্ডসের মতে, সার্বভৌম রাষ্ট্রের ধারণা স্পষ্টই ভেঙ্গে পড়েছে; অনেকের মতে বর্তমানে আমরা ব্যক্তি বনাম রাষ্ট্রের কথা না বলে রাষ্ট্র বনাম সংঘের কথাই বেশী করে বলে থাকি। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে, রাষ্ট্রের আইনসংগত সার্বভৌমিকতা হোল একটি শূন্যগর্ভ ধারণা। অনেকে এরূপ ধারণাকে কুসংস্কার বলেও বর্ণনা করেছেন।

(ঙ) বহুত্ববাদীদের অনেকেই একত্ববাদের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে নৈতিকতার প্রশ্ন তুলেছেন। ল্যাস্কির মতে, বিবেকের অনুশাসন মান্য করাই হোল আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য। বিবেক রাষ্ট্র কর্তৃত্বকে যতখানি মান্য করার নির্দেশ দেবে আমরা রাষ্ট্রের প্রতি ততটুকুই মাত্র আনুগত্য প্রদর্শন করব। একত্ববাদী দার্শনিকগণ বিবেকের গুরুত্বকে অস্বীকার করে রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের চরম আনুগত্য প্রদর্শন করা যুক্তিযুক্ত বলে প্রচার করে ভুল করেছেন।

[২] বহুত্ববাদীরা আইনগত দিক থেকেও একত্ববাদের তীব্র সমালোচনা করেন।

(ক) একত্ববাদী দার্শনিকগণ সার্বভৌম শক্তির আদেশকে আইন বলে বর্ণনা করে রাষ্ট্রকে আইনের একমাত্র উৎসস্থলে পরিণত করেছেন। কিন্তু ক্র্যাব, দ্যুগুই প্রমুখ বহুত্ববাদিগণ রাষ্ট্রকে আইনের উৎস বলে স্বীকার করে নিতে সম্মত নন। তাঁদের মতে, রাষ্ট্রসৃষ্টির বহু পূর্বে সমাজবদ্ধ মানুষ কতকগুলি সামাজিক নিয়মকানুন ও ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হোত। সুতরাং রাষ্ট্রকে কখনই আইনের একমাত্র উৎস বলে বর্ণনা করা যায় না।

(খ) যেহেতু রাষ্ট্রসৃষ্টির বহু পূর্ব থেকেই আইনের অস্তিত্ব ছিল সেহেতু অন্যান্য সামাজিক সংঘের মত রাষ্ট্রও আইনের ঊর্ধ্বে নয়। কিন্তু একত্ববাদিগণ রাষ্ট্রকে আইনের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়ে এবং রাষ্ট্রকে আইনের উৎস বলে বর্ণনা করে ভুল করেছেন।

(গ) একত্ববাদিগণ প্রচার করেন যে, লোকে শাস্তির ভয়েই আইন মান্য করে। কিন্তু বহুত্ববাদী লেখকগণ এরূপ যুক্তিকে ভ্রান্ত বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, আইন মান্য করাকে যথার্থ মনে করে বলেই লোকে আইন মান্য করে। অর্থাৎ আইনের উপযোগিতা সম্যক উপলব্ধিই তার প্রতি মানুষের আনুগত্য প্রদর্শনের শ্রেষ্ঠ কারণ, শাস্তির ভয়ে নয়।

(ঘ) বহুত্ববাদীদের মতে, রাষ্ট্রে আইনসংগত সার্বভৌমিকতা কার্যক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রযুক্ত হয়। সরকার আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সার্বভৌম শক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে বাস্তবায়িত করে। কিন্তু সরকার যেহেতু কতিপয় সাধারণ মানুষকে নিয়ে গঠিত সেহেতু তাদের হাতে অসীম, চূড়ান্ত ও সর্বব্যাপী সার্বভৌম কর্তৃত্ব রূপায়ণের দায়িত্ব অর্পণ করার অর্থ স্বৈরাচারকে প্রশ্রয় দেওয়া। বহুত্ববাদীরা তাই আইন প্রণয়নের দায়িত্ব কেবলমাত্র রাষ্ট্রের তথা সরকারের হস্তে অর্পণ না করে সমাজস্থিত সংঘগুলির হস্তেও অর্পণ করা সমীচীন বলে মনে করেন।

[৩] বহুত্ববাদী লেখকগণ আন্তর্জাতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে একত্ববাদের সমালোচনা করেন। তাঁদের মতে, আন্তর্জাতিকতার ধ্যানধারণা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে

একত্ববাদীদের আইনসংগত সার্বভৌমিকতা কার্যক্ষেত্রে কল্পনাপ্রসূত মতবাদে পরিণত হয়েছে। তাঁরা তিনভাবে একত্ববাদের সমালোচনা করেন, যথা :

(ক) বর্তমান বিশ্বে কোন রাষ্ট্রই বাহ্যিক ক্ষেত্রে সার্বভৌম কর্তৃত্বসম্পন্ন নয়। প্রতিটি রাষ্ট্রকেই আন্তর্জাতিক আইন, প্রথা ইত্যাদি মান্য করতে হয়। কোন রাষ্ট্রই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজের পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণ করতে পারে না। কোন রাষ্ট্র যদি আন্তর্জাতিক আইনকে অমান্য বা উপেক্ষা করে, তাহলে বিশ্ব-জনমত নিশ্চিতভাবেই সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যাবে। বলা বাহুল্য, বিশ্বের জনমতকে অগ্রাহ্য করে কোন রাষ্ট্রই সুদীর্ঘকাল এককভাবে চলতে পারে না। সুতরাং একত্ববাদীদের চিত্রিত অসীম ও চরম সাবভৌমিকতা আধুনিক বিশ্বের কোন রাষ্ট্রই ভোগ করতে পারে না।

(খ) আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসীগণ এই অভিমত পোষণ করেন যে, আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতার মতো রাষ্ট্রের বাহ্যিক সার্বভৌমিকতাও যদি সীমাহীন ও চরম হয় তাহলে বৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে আক্রমণ করে তাদের সার্বভৌমিকতাকে ধ্বংস করতে পারে। এর ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়। তাই প্রতিটি রাষ্ট্রের বাহ্যিক কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বর্তমানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নামে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নির্দেশ অনুযায়ী রাষ্ট্রগুলি তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে। এদিক থেকে বিচার করে কোন রাষ্ট্রকেই চরম সার্বভৌম বলে বর্ণনা করা যায় না।

(গ) আন্তর্জাতিক আইনবিদদের মতে, বর্তমানে আমরা একটি ভিন্ন পৃথিবীতে বাস করছি। এই পৃথিবীতে কোন রাষ্ট্রই এককভাবে এবং স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে তার জনগণের প্রয়োজন মিটাতে পারে না। তাই তাকে অপরাপর রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করতে হয়। বস্তুতঃ জাতীয় রাষ্ট্রের পরিবর্তে আন্তর্জাতিকতার আদর্শ সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে সমগ্র বিশ্বের মানুষ আজ একটি বৃহৎ বিশ্ব-পরিবারের মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। এমতাবস্থায় একত্ববাদীদের মতো রাষ্ট্রের অনিয়ন্ত্রিত সার্বভৌমিকতার কল্পনা করা প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবেরই পরিচয় দেয়।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে রাষ্ট্রের সার্ব-ভৌমিকতা আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক—উভয় দিক থেকেই সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে গেটেল বলেছেন, আন্তর্জাতিকতাবাদীরা অত্যন্ত শক্তিশালী সার্বভৌম রাষ্ট্রকে শৃংখলাবদ্ধ করেন এবং বহুত্ববাদীরা অস্ত্রোপচারের দ্বারা তার আভ্যন্তরীণ ক্ষমতাকে প্রয়োজনমত হ্রাস করেন।

সমালোচনা : রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার বিরুদ্ধে বহুত্ববাদ কাম্য প্রতিক্রিয়া হিসেবে আবির্ভূত হয়ে রাজনৈতিক চিন্তাজগতে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করলেও এই মতবাদ সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। নানা দিক থেকে কোকার, মরিস কোহেন (Morris Cohen), এমন কি বহুত্ববাদের একদা-সমর্থক বলে পরিচিত ল্যাস্কি প্রমুখ রাষ্ট্রনীতিবিদেরা বহুত্ববাদের সমালোচনা করেছেন।

বহুত্ববাদ ত্রুটিমুক্ত নয়

(ক) বহুত্ববাদিগণ এককভাবে রাষ্ট্রের হস্তে চরম সার্বভৌম ক্ষমতা প্রদানের পরিবর্তে সমাজস্থিত সংঘগুলিকেও রাষ্ট্রের মত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বাস্তবে রাষ্ট্রকে এমন কতকগুলি কার্য সম্পাদন করতে হয়

যেগুলি কোন সংঘের পক্ষে সম্পাদন করা অসম্ভব। উদাহরণ হিসেবে ব্যক্তি-জীবনের নিরাপত্তা বিধান, আইনগত দ্বন্দ্বের সুষ্ঠু মীমাংসা, রাষ্ট্রীয় শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ ইত্যাদি কার্যাবলীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাছাড়া, বহুত্ববাদিগণ বিভিন্ন সংঘের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণ অকাম্য বলে মনে করেন। কারণ তাঁরা সমাজস্থিত সংঘগুলিকে রাষ্ট্রের মতোই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু সার্বভৌমিকতা বা ক্ষমতার প্রশ্নে বিভিন্ন সংঘের মধ্যে বিরোধ বা সংঘর্ষ দেখা দিলে তা নিষ্পত্তির জন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ না করলে সমাজে বিশৃংখলা দেখা দেবে, সামাজিক ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হবে। সুতরাং রাষ্ট্রের হস্তে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকা যে একান্ত বাঞ্ছনীয় এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ নেই। অবশ্য কোন কোন বহুত্ববাদী এরূপ বিরোধের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে নিরপেক্ষ বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে বলে অভিমত পোষণ করেন। যদি তা হয়, তাহলে কার্যক্ষেত্রে বিচারকের সিদ্ধান্তের ন্যায় রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তও চূড়ান্ত বলে পরিগণিত হবে। সুতরাং বহুত্ববাদী দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষভাবে সার্বভৌম রাষ্ট্র-কর্তৃত্বকে অস্বীকার করলেও পরোক্ষভাবে তাঁরা তা স্বীকার করে নিয়েছেন।

রাষ্ট্রের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য

(খ) একত্ববাদী লেখকদের মতে, বহুত্ববাদী দার্শনিকগণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চরমত্বের আইনগত ও নৈতিক ধারণার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নিরূপণ করেননি। তাঁদের দৃষ্টিতে সার্বভৌমিকতার ধারণা হোল আইনগত ধারণামাত্র। এর সঙ্গে নৈতিকতার কোনরূপ সম্পর্ক নেই। বহুত্ববাদী লেখকগণ সংঘগুলির জন্য যে স্বাতন্ত্র্য ও সার্বভৌমত্ব দাবি করেন তা নীতিগতভাবে সমর্থনযোগ্য হলেও আইনগতভাবে কখনই সমর্থনযোগ্য নয়। সুতরাং বলা যায়, সংঘগুলির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার নৈতিক অধিকারকে বহুত্ববাদিগণ আইনগত অধিকারের পর্যায়ভুক্ত বলে বর্ণনা করে ভুল করেছেন।

বহুত্ববাদিগণ নৈতিক ও আইনগত ধারণাকে অভিন্ন বলে মনে করে ভুল করেছেন

(গ) অনেকের মতে, বহুত্ববাদিগণ একত্ববাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়কে যথাযথভাবে উপলব্ধি না করেই অযথা তার সমালোচনা করেছেন। একত্ববাদ সামাজিক নীতি ও যুক্তির দিক থেকে বিচার করে কখনই রাষ্ট্রকে সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী বলে বর্ণনা করেনি। তাছাড়া, ভ্রান্তভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা প্রয়োগ করা হলেও তার বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রতিবাদ করা চলবে না—এ কথাও একত্ববাদের প্রচারকগণ বলেননি। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে কোকার (Coker) বলেছেন, আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করার জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এবং যে ধরনের বাধানিষেধ রাষ্ট্র অপরের উপর আরোপ করে, অনুরূপ বাধানিষেধ কখনই তার নিজের উপর আরোপিত হতে পারে না। একত্ববাদীদের মতে, রাষ্ট্র সম-প্রকৃতিবিশিষ্ট অন্য কোন কর্তৃত্বের নিকট দায়িত্বশীল নয়। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, কোন একটি ভৌগোলিক অঞ্চলে আইন প্রণয়নকারী সংগঠন হিসেবে রাষ্ট্রের স্থান সেই ভূখণ্ডের অন্তর্গত অন্যান্য সংঘের ঊর্ধ্বে।

কোকারের অভিমত

(ঘ) সমালোচকদের মতে, বহুত্ববাদীদের আইন সম্পর্কিত ধারণাটিও ভ্রান্ত।

বহুত্ববাদীরা 'সামাজিক সংহতি' (social solidarity), 'বিবেকের অনুশাসন' (individual conscience) প্রভৃতিকে আইনের উৎস বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এগুলিকে আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে সুনির্দিষ্ট আইনের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না ; তাছাড়া, 'সামাজিক ন্যায়বিচার', 'ব্যক্তির ভাল-মন্দ' সম্পর্কিত ধারণা, কিংবা জনমতকে আইনের উপর প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি হিসেবে বহুত্ববাদীরা চিত্রিত করেছেন। কিন্তু একত্ববাদী দার্শনিকগণ এ সবের প্রভাবকে কখনই উপেক্ষা করেননি। সুতরাং বলা যায়, বহুত্ববাদীদের আইন সম্পর্কিত ধারণাটি অস্পষ্ট। বস্তুতঃ আইনগত দিক থেকে বিচার করে আইনকে বর্তমানেও সার্বভৌমের আদেশ বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়।

আইন সম্পর্কিত ধারণা ভ্রান্ত

(ঙ) একত্ববাদের সমর্থকগণের মতে, বহুত্ববাদিগণ সার্বভৌমিকতা এবং ব্যক্তিগত আনুগত্যকে বিভক্ত করে সমাজকে মধ্যযুগীয় বিশৃংখলা ও আধা-নৈরাজ্যের মধ্যে ঠেলে দিতে চেয়েছেন। মধ্যযুগে সার্বভৌমিকতা যেমন রাষ্ট্র, গীর্জা, সামন্ত প্রভু, বিভিন্ন গোষ্ঠী (clan) ইত্যাদির মধ্যে বিভক্ত থাকার ফলে সামাজিক শৃংখলা ও সংহতি বিনষ্ট হয়েছিল, তেমনি বহুত্ববাদিগণ রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংঘের সমতুল্য বলে বর্ণনা করে কার্যক্ষেত্রে সার্বভৌমিকতাকে এবং ব্যক্তিগত আনুগত্যকে বিভক্ত করেছেন। এর ফল সমাজের পক্ষে কখনই সুখকর হতে পারে না।

মধ্যযুগীয় বিশৃঙ্খলা ও আধা নৈরাজ্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা

(চ) একদা বহুত্ববাদের সমর্থক বলে পরিচিত অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কি পরবর্তী সময়ে বহুত্ববাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, বহুত্ববাদ রাষ্ট্রকে শ্রেণী-সম্পর্কের প্রকাশ হিসেবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে রাষ্ট্র প্রচলিত শ্রেণী-সম্পর্ককে অর্থাৎ প্রচলিত সম্পত্তি-ব্যবস্থাকে (system of property) সংরক্ষিত করার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। রাষ্ট্রের হাতে চরম সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত না থাকলে সে তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে না। সুতরাং শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সংঘগুলির হাতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব কখনই প্রদত্ত হতে পারে না। কেবলমাত্র শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজে বহুত্ববাদ কার্যকরী হতে পারে। কারণ এরূপ সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার অস্তিত্ব থাকে না।

বহুত্ববাদ রাষ্ট্রকে শ্রেণীসম্পর্কের প্রকাশ বলে উপলব্ধি করতে পারেনি

নানা দিক থেকে বহুত্ববাদের বিরূপ সমালোচনা করা হলেও এই মতবাদের গুরুত্ব একেবারেই অস্বীকার করা যায় না। প্রথমতঃ, এমন একটি সময়ে রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে বহুত্ববাদের আবির্ভাব ঘটে যখন রাষ্ট্রকে সর্বশক্তিমান বলে বর্ণনা করে রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তি ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে বলিদান করতে বাধ্য করা হয়েছিল। বহুত্ববাদ ব্যক্তি ও সংঘের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার দাবি তুলে গণতন্ত্রকে অনিবার্য অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার চেষ্টা করেছিল। দ্বিতীয়তঃ, সমাজের মধ্যে অবস্থিত সংঘগুলির স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকৃতি দিয়ে বহুত্ববাদ কার্যতঃ ক্ষমতা-বিকেন্দ্রী-করণ (Decentralisation)-এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। বলা বাহুল্য, বর্তমান গণতান্ত্রিক বিশ্বে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের আবশ্যকতা সর্বজনস্বীকৃত। তৃতীয়তঃ, বহুত্ববাদ ও নৈরাজ্যবাদ কখনই সমপর্যায়ভুক্ত নয়। বহুত্ববাদীরা নৈরাজ্য-

উপসংহার

বাদীদের মতো রাষ্ট্রের বিলুপ্তি চান না। তাঁরা কেবলমাত্র রাষ্ট্রের অসীম ও সর্বব্যাপী প্রাধান্য খর্ব করতে চেয়েছিলেন। রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তাকে বহুত্ববাদী দার্শনিকগণ আদৌ উপেক্ষা করেননি। মেটল্যান্ড (Maitland) রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংঘের উপর স্থান দিয়েছেন; পল বংকুর (Paul Boncour) রাষ্ট্রকে জাতীয় ঐক্য ও সাধারণ স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সংঘ বলে বর্ণনা করেছেন। অধ্যাপক ল্যাস্কির রাষ্ট্রের 'চরম সংরক্ষিত ক্ষমতাকে' (ultimate reserve power of State) অস্বীকার করেননি। ফিগিস্ (Figgis) রাষ্ট্রকে 'সংগঠনগুলির সংগঠন' (Society of Societies) বলে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং বহুত্ববাদিগণ প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রের চরম কর্তৃত্বকে সমর্থন না করলেও পরোক্ষভাবে তাঁরা এর উপযোগিতা অস্বীকার করেননি।

৮। সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্ণয় (Location of Sovereignty)

সার্বভৌমিকতার প্রচলিত ধারণা অনুসারে সার্বভৌমিকতা হোল নির্দিষ্ট এবং অবিভাজ্য। তাই রাষ্ট্রের মধ্যে একটি বিশেষ জায়গায় তার সুনির্দিষ্ট অবস্থিতি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্ণয়ের প্রশ্নে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে।

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় মোটামুটিভাবে সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্ণয় সহজ। এখানে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী বলে আইনগত দিক থেকে পার্লামেন্টই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। গ্রেট ব্রিটেনকে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার আদর্শ হিসেবে ধরা হয়। এখানে রাজ্যসহ-পার্লামেন্ট সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী—একথা বলার অর্থ হোল: এমন কোন আইন নেই যা পার্লামেন্ট প্রণয়ন করতে পারে না, এমন কোন আইন নেই যা পার্লামেন্ট সংশোধন করতে পারে না এবং এমন কোন আইন নেই যা পার্লামেন্ট বাতিল করতে পারে না। অর্থাৎ আইন সংক্রান্ত বিষয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ক্ষমতা চূড়ান্ত। এমন কি সংবিধান কিংবা বিচার বিভাগও পার্লামেন্টের ক্ষমতার উপর কোনপ্রকার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে না। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের চূড়ান্ত সার্বভৌমিকতার স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে লোলমি বলেছেন, স্ত্রীলোককে পুরুষে রূপান্তরিত করা এবং পুরুষকে স্ত্রীলোকে রূপান্তরিত করা ছাড়া ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সবকিছুই করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ইচ্ছা করে তা হলে সমস্ত নীল চক্ষুবিশিষ্ট শিশুদের হত্যা করা হবে—এই মর্মে আইন প্রণয়ন করতে পারে। এরূপ আইন সম্পূর্ণ বৈধ। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এরূপ সার্বভৌমিকতা কার্যক্ষেত্রে আছে কি না তা নিয়ে কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের মতে, তত্ত্বগতভাবে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যে-কোন আইন তৈরি করতে পারলেও কার্যক্ষেত্রে সে রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতাকে উপেক্ষা করতে পারে না। বস্তুতঃ জনমতের বিরুদ্ধাচরণ করে কোন সার্বভৌম শক্তিই যা খুশি তা-ই করতে

এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় সার্বভৌমিকতার অবস্থান

পারে না। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট জনস্বার্থ-বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করলে পরবর্তী নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলকে পরাজিত হতে হয়। সুতরাং ব্রিটিশ পার্লামেন্টও বাস্তবে চরম সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নয়। তবে আইনগত দিক থেকে বিচার করে ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে অভিহিত করা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্ণয়

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্ণয় করা যথেষ্ট কষ্টকর। এরূপ শাসনব্যবস্থায় দু'ধরনের সরকার থাকে, যথা—কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকার। প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকায় যেহেতু সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী সেহেতু সার্বভৌমিকতা সুনির্দিষ্ট-ভাবে কারো হাতে ন্যস্ত থাকে না। যেহেতু উভয়প্রকার সরকারের মধ্যে সংবিধানসম্মতভাবে ক্ষমতা বণ্টিত হয়, সেহেতু সংবিধানের গণ্ডির মধ্যে থেকে কাজ করলে বিচার বিভাগও তা বাতিল করতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়নের সময় হ্যামিলটন (Hamilton), ম্যাডিসন (Madison) প্রমুখ নেতৃবর্গ কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে সার্বভৌম বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু এরূপ বিভক্ত স্বাধীনতার ধারণা আইনবিদ্‌গণ কর্তৃক সমালোচিত হয়েছে। তাঁদের মতে, সার্বভৌমিকতা যেহেতু অবিভাজ্য, সেহেতু উভয়প্রকার সরকারের মধ্যে তাকে বিভক্ত করার অর্থই হোল—সার্বভৌমিকতাকে বিসর্জন দেওয়া। সমালোচকেরা মনে করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতা বণ্টিত হয় না, কেবলমাত্র ক্ষমতা বণ্টিত হয়। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে সংবিধান অনুসারে সার্বভৌমিকতা কেন্দ্র ও ইউনিয়ন রিপাবলিকগুলির মধ্যে বণ্টিত হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়ন বিভাজ্য সার্বভৌমিকতা তত্ত্বে বিশ্বাসী। ইউনিয়ন রিপাবলিকগুলি কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া প্রতিটি ইউনিয়ন রিপাবলিকের স্বতন্ত্র সৈন্য-বাহিনী রাখার ব্যবস্থা আছে। এমনকি তারা স্বাধীনভাবে বৈদেশিক চুক্তিও সম্পাদন করতে পারে। তাই অনেকে মনে করেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে সার্বভৌমিকতার বিভক্তিকরণ করা হয়েছে। অনেকে অবশ্য এই যুক্তি মেনে নিতে সম্মত নন। তাঁদের মতে, সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্ট পার্টির সর্বব্যাপী এবং অপ্রতিহত প্রাধান্য থাকায় কার্যতঃ সেই সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে অঙ্গরাজ্যগুলি সম্মিলিতভাবে একটি সন্ধি সমবায় গঠন করে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করত। কিন্তু ১৭৮৯ সালে নতুন সংবিধানে সার্বভৌমিকতার অবস্থিতি সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করা হয়নি। ম্যাডিসন, হ্যামিলটন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এবং হুইটন (Wheaton), টকভিল (Tocqueville), কুলি (Cooly), স্টোরি (Story) প্রমুখ লেখকরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে এই অভিমত পোষণ করেন যে, সেখানে উভয়প্রকার সরকারের হস্তেই সার্বভৌমিকতা অর্পিত হয়েছে। কিন্তু কালহন (Calhon) প্রমুখ লেখকগণ এরূপ বিভক্ত সার্বভৌমিকতার চরম বিরোধিতা করেছেন। যাই হোক, ১৮৬১-৬৫ সালের গৃহযুদ্ধের পর অঙ্গরাজ্যগুলির সার্বভৌমিকতা চরমভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

অনেকের মতে, যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানের মধ্যেই সার্বভৌমিকতা নিহিত থাকে।

কিন্তু এই মতবাদও অস্টিনের সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের বিরোধী, কারণ সংবিধান ক্ষমতা-প্রয়োগকারী কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ নয়। তাই লীকক বলেছেন, সংবিধানকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী না বলে সংবিধান পরিবর্তনের ক্ষমতাকেই সার্বভৌম বলে গণ্য করা সমীচীন। কিন্তু গেটেল প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ এই মতের বিরোধিতা করে বলেন যে, সংবিধান সংশোধনকারী সংস্থা অনিয়মিতভাবে সংবিধানের পরিবর্তন-সাধন করে। এই সংস্থাকে সার্বভৌম বলে বর্ণনা করার অর্থ হোল সার্বভৌম ক্ষমতাকে অধিকাংশ সময় নিষ্ক্রিয় করে রাখা। তাছাড়া, সংবিধান সংশোধনকারী সংস্থার ক্ষমতা কেবলমাত্র সংবিধান সংশোধন করার কার্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী সর্বক্ষেত্রেই ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করে। তাই এরূপ সংস্থাকে কোনমতেই সার্বভৌম বলে অভিহিত করা যায় না। গেটেল প্রমুখ লেখকরা যুক্তরাষ্ট্রে সমস্ত আইন প্রণয়নকারী সংস্থাকে সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী বলে ঘোষণা করেন। এদিক থেকে বিচার করে কেন্দ্রীয় আইনসভা, অঙ্গ-রাজ্যের আইনসভাগুলি, বিচার বিভাগ, শাসনবিভাগীয় কর্মচারী, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে ভোটদাতা, সংবিধান সংশোধনকারী সংস্থা ইত্যাদি হোল সার্বভৌম। এইভাবে গেটেল প্রমুখরা বিভক্ত সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব প্রচার করেছেন। ফ্রিম্যান (Freeman), দ্যুগুই, ব্লুন্টস্‌লি প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ বিভক্ত সার্বভৌমিকতা তত্ত্ব (Theory of Divided Sovereignty) সমর্থন করেছেন। বহুত্ববাদী দার্শনিকগণও বিভক্ত সার্বভৌমিকতার তত্ত্বে বিশ্বাসী। তাঁদের মতে, রাষ্ট্রের মত সংঘগুলিও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

কিন্তু রুশো এবং একত্ববাদী দার্শনিকগণ বিভক্ত সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের চরম বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের মতে, সার্বভৌম ক্ষমতা একক এবং অবিভাজ্য। রুশো মন্তব্য করেছেন যে, ক্ষমতার বিভক্তিকরণ সম্ভব হলেও সার্বভৌমিকতার বিভক্তিকরণ আদৌ সম্ভব নয়। সার্বভৌমিকতা সরকারের বিভিন্ন অংশের মাধ্যমে প্রকাশিত হলেও চূড়ান্তভাবে তা একটি নির্দিষ্ট কর্তৃত্বের হস্তে অর্পিত থাকে। রুশোর মতে, সার্বভৌমিকতা কেবলমাত্র সাধারণ ইচ্ছার হাতেই ন্যস্ত থাকে। একত্ববাদী দার্শনিকগণ মনে করেন যে, সার্বভৌমিকতা কেবলমাত্র রাষ্ট্রের হস্তেই অর্পিত থাকে। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী উইলোবী (Willoughby) তাঁর 'রাষ্ট্রের প্রকৃতি' (The Nature of the State) নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, সার্বভৌমিকতা অবিভাজ্য। গার্নারও এই অভিমত পোষণ করেন যে, সার্বভৌম ক্ষমতা কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সরকারগুলির ঊর্ধ্বে অবস্থান করে।

বস্তুতঃ এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্ণয় করা সহজ হলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্ণয় করা দুষ্কর। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে ল্যাস্কি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্ণয় করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

৯। সীমাবদ্ধ সার্বভৌমিকতা তত্ত্ব [Theory of Limited Sovereignty]

সার্বভৌমিকতার সনাতন তত্ত্ব অনুসারে সার্বভৌমিকতা মৌলিক, চরম এবং

সীমাহীন। এরূপ সার্বভৌম শক্তি সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণের ঊর্ধ্বে। কিন্তু লর্ড ব্রাইস, ব্লুন্টস্‌লি প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ এরূপ চরম এবং অসীম সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে, সার্বভৌম শক্তি আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক—উভয় দিক থেকেই সীমাবদ্ধ (The State is limited within and without)। ব্লুন্টসলির মতে, আভ্যন্তরীণ দিক থেকে রাষ্ট্র নিজস্ব প্রকৃতি ও নাগরিক অধিকার এবং বাহ্যিক দিক থেকে অপরাপর রাষ্ট্রের অধিকারের দ্বারা সীমাবদ্ধ। লর্ড ব্রাইস মনে করেন যে, সরকার সব সময়ই স্বতঃপ্রণোদিত না হলেও জনসাধারণের ভয়, শ্রদ্ধা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের অনুমোদন দ্বারা পরিচালিত হয়। বস্তুতঃ কোন সার্বভৌম শক্তিই অনিয়ন্ত্রিত নয়। সার্বভৌম শক্তির সীমাবদ্ধতাকে মোটামুটিভাবে তিনদিক থেকে আলোচনা করা যেতে পারে, যথা ঃ

সার্বভৌমিকতা মৌলিক, চরম ও সীমাহীন নয়

(ক) প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা নৈতিকতা, ধর্মীয় অনুশাসন, জনমত, চিরাচরিত প্রথা ইত্যাদির দ্বারা সীমাবদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই যিনি সদম্ভে নিজেকেই রাষ্ট্র (I am the State) বলে ঘোষণা করতেন, তিনিও ফরাসী জনগণের উপর প্রোটেস্টান্ট ধর্ম জোর করে চাপিয়ে দিতে সাহস পাননি। তুরস্কের সুলতান এমনকি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারও জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করতে সাহস পায়নি। সুতরাং সার্বভৌম শক্তি কতকগুলি ক্ষেত্রে নিশ্চিত-ভাবেই অসহায়। ধর্মবিশ্বাস ছাড়াও শাশ্বত নৈতিক আইনকে সার্বভৌম শক্তি উপেক্ষা করতে পারে না। সর্বোপরি, জনমতকে উপেক্ষা করে কোন সার্বভৌম শক্তিই সুদীর্ঘ-কাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারে না। বিশেষতঃ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমত এতই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যে, গণতন্ত্রকে 'জনমত-পরিচালিত শাসনব্যবস্থা' বলে অভিহিত করা হয়। জনমতের বিরোধিতা করে কিংবা ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব করে কোন সার্বভৌম শক্তিই যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারে না বিশ্ব-ইতিহাস তার প্রমাণ।

সার্বভৌমিকতা নীতি, ধর্ম, জনমত ইত্যাদি দ্বারা সীমাবদ্ধ

কিন্তু গার্নার প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ এই তত্ত্ব মেনে নিতে সম্মত নন। তাঁদের মতে, নৈতিক নিয়ম আইনগতভাবে সার্বভৌম কর্তৃত্বের উপর কোনরূপ বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে না। তবে একথা সত্য যে, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সার্বভৌম শক্তি সাধারণতঃ এমন কোন আইন প্রণয়ন করে না যা শাশ্বত নৈতিক নিয়ম কিংবা মানুষের ধর্ম-বিশ্বাসের বিরোধী। এরূপ করা হলে, সার্বভৌম শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া, অসীম সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব কখনই নীতিগত বা ধর্মীয় দিক থেকে রাষ্ট্রকে সীমাহীন বলে বর্ণনা করে না। এই তত্ত্বের সমর্থকরা কেবলমাত্র আইনগত দিক থেকে রাষ্ট্রীয় সার্ব-ভৌমিকতার তত্ত্ব প্রচার করেন। জনগণের অধিকার সম্পর্কে অনেকের বক্তব্য এই যে, অধিকার যেহেতু রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট, প্রদত্ত ও সংরক্ষিত হয় সেহেতু ব্যক্তির অধিকার কখনই সার্বভৌম শক্তির উপর বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে না। আইন কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত না হলে অধিকারগুলি কার্যতঃ স্বেচ্ছাচারিতায় রূপান্তরিত হয়।

আইনগত সার্বভৌমিকতার উপর এগুলি সঙ্গতভাবে বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে না

কিন্তু জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক উপেক্ষিত হলে জনসাধারণ নিজেদের জীবনের বিনিময়েও সেই অধিকার রক্ষায় অগ্রসর হয়েছে এমন অজস্র উদাহরণ ইতিহাসে রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, আইনগত দিক থেকে সার্বভৌমিকতা অসীম ও সর্বব্যাপী হলেও কার্যক্ষেত্রে তা নীতিবোধ, ধর্ম, প্রচলিত প্রথা, জনমত প্রভৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ—একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

(খ) সংবিধান এবং সাংবিধানিক আইন সার্বভৌম ক্ষমতাকে সংকুচিত করে বলে অনেকে মনে করেন। তাঁদের মতে, সংবিধান রাষ্ট্রকাঠামো এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী স্থির করে দেয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধান হোল দেশের সর্বোচ্চ আইন। আইনসভা সংবিধান-বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করলে, কিংবা শাসন বিভাগ সংবিধান-বহির্ভূতভাবে কাজ করলে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সেইসব আইন ও কার্যাবলীকে সংবিধান-বিরোধী ঘোষণা করে বাতিল করে দিতে পারে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে সংবিধান তথা সাংবিধানিক আইন রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার উপর বাধানিষেধ আরোপ করে বলে মনে হতে পারে।

সার্বভৌমিকতা সংবিধান ও সাংবিধানিক আইন কর্তৃক সীমাবদ্ধ

কিন্তু সমালোচকদের মতে, সংবিধানের এই নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ রাষ্ট্র ও সরকারকে অভিন্ন বলে মেনে নেওয়া—যা আদৌ সত্য নয়। সংবিধান সরকারের ক্ষমতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে; কিন্তু সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী রাষ্ট্রের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে না। কারণ সংবিধান রাষ্ট্র কর্তৃক পরিবর্তিত হতে পারে। তবে রাষ্ট্র নিজের দ্বারা সৃষ্ট সংবিধানের মাধ্যমে কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণ নিজের উপরই আরোপ করতে পারে। অধ্যাপক ডাইসি (Dicey) এইসব নিয়ন্ত্রণকে 'স্ব-আরোপিত নিয়ন্ত্রণ' (self-imposed restrictions) বলে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া, সাংবিধানিক আইনের সঙ্গে সাধারণ আইনের পার্থক্য নিরূপণকেও কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অবৈজ্ঞানিক বলে মনে করেন। প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে সাংবিধানিক আইন এবং সাধারণ আইনের মধ্যে কিছু পার্থক্য নিরূপণ করা সম্ভব হলেও আইনগত কার্যকারিতার দিক থেকে উভয়প্রকার আইনের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নিরূপণ করা যায় না। গেটেলের মতে, সাধারণ আইনের মতো সাংবিধানিক আইনও রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র (expression of the will of the State)। তাই সাংবিধানিক আইন কখনই আইনগত দিক থেকে সার্বভৌমিকতার উপর বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে না।

সাংবিধানিক আইনও বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে না

(গ) আন্তর্জাতিক আইনবিদগণ মনে করেন যে, আন্তর্জাতিক আইন, প্রথা, চুক্তি ইত্যাদি রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতাকে সংকুচিত করে। বর্তমান পরিবর্তিত বিশ্ব রাজনীতিতে কোন রাষ্ট্রই চরমভাবে সার্বভৌম শক্তির অধিকারী নয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ মেনে চলতে হয়।

আন্তর্জাতিক আইন কর্তৃক বাধানিষেধ আরোপ

কিন্তু আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আইনবিদগণ এই অভিমত পোষণ

করেন যে, সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক আইন, প্রথা ইত্যাদি স্বেচ্ছায় মান্য করে। কোন রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক আইন মান্য করতে বাধ্য করা যায় না। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক আইন প্রথা মাত্র। এই আইন ভঙ্গ করা হলে কার্যকরী বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আইনভঙ্গকারী রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক আইন মান্য করতে বাধ্য করার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ নেই। তাই আন্তর্জাতিক আইন জাতীয় আইনের মত বলবৎযোগ্য বলে মনে করা যায় না। তবে একথাও সত্য যে, বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক আইনকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে কোন রাষ্ট্রই নিজের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখতে পারে না। কারণ আন্তর্জাতিক আইনের পশ্চাতে থাকে বিশ্বজনমত এবং বিশ্ব-বিবেকের সমর্থন, যাকে কার্যতঃ কোন রাষ্ট্রই সম্পূর্ণ-ভাবে উপেক্ষা করতে পারে না।

আন্তর্জাতিক আইনও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে না

সুতরাং বলা যেতে পারে যে, আইনগত দিক থেকে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার উপর কোনরূপ বাধানিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যায় না সত্য, কিন্তু বাস্তবে বিভিন্ন দিক দিয়ে নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হতে পারে।

১০। সার্বভৌমিকতার ক্ষমতা তত্ত্ব (Power Theory of Sovereignty)

রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা বলতে চরম, অসীম ও সর্বব্যাপী কর্তৃত্বকে বোঝায়। এখানেই রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য সংঘের পার্থক্য। বর্তমানে সার্বভৌম রাষ্ট্রের আইনগত ভূমিকাকে কেউই অস্বীকার করেন না। চূড়ান্ত কর্তৃত্ব-সম্পন্ন রাষ্ট্রের আদেশই হল আইন। প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রতিটি সংঘ বা সংগঠন রাষ্ট্রের আইন মেনে চলতে বাধ্য। অন্যথায় আইন-ভঙ্গের অপরাধে তাদের শাস্তি পেতে হয়। রাষ্ট্রীয় আইনের পশ্চাতে নিছক বলপ্রয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করে কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যে মতবাদ প্রচার করেছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তা সার্বভৌমিকতার ক্ষমতা তত্ত্ব নামে পরিচিত। সার্বভৌমিকতার ক্ষমতা তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে র‍্যাফেল (Raphel) প্রথমে সার্বভৌমিকতার আইনগত তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন। এই তত্ত্বের সমর্থকরা সার্বভৌমিকতাকে কেবলমাত্র আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারবিশ্লেষণ করে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় আইন-ব্যবস্থাকে চূড়ান্ত বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু নৈতিক দিক থেকে বিচার করে একজন ব্যক্তি আইনকে চূড়ান্ত বলে স্বীকার করে নিতে নাও পারে। রাষ্ট্রের কোন আইন সম্পর্কে তার নৈতিক আপত্তি থাকলে সে বিবেকের নির্দেশে ঐ আইনকে অমান্য করতে পারে। এক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির নিকট আইন অপেক্ষা বিবেকই হোল সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, যখন একটি রাষ্ট্রে সৈন্যদলে ভর্তি হওয়া আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক করা হলে সেখানে নির্দিষ্ট বয়ঃপ্রাপ্ত স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত সক্ষম ব্যক্তিকে সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করতে আইন বাধ্য করে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করাকে নীতি-বিরোধী কাজ বলে মনে করে, তাহলে নীতিগতভাবে সে উক্ত আইন নাও মান্য করতে পারে।

ক্ষমতা তত্ত্বের প্রতিপাদ্য বিষয়

কিন্তু প্রশ্ন হোল—আইনগতভাবে সেই ব্যক্তির কি সামরিক বাহিনীতে যোগদান করতে অস্বীকার করার অধিকার আছে? র‍্যাফেলের মতে, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের আইনের প্রকৃতির উপর তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। যে সব রাষ্ট্রে নৈতিক দিক থেকে আইনের যাথার্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই সেইসব রাষ্ট্রে আইন অমান্য করলে শাস্তি পেতে হয়। বস্তুতঃ আইনগত দিক থেকে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা বলতে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রণীত আইনের চরম কর্তৃত্বকে বোঝায়। তা যদি হয়, তাহলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিও নিজ নিজ এলাকায় চরম কর্তৃত্ব দাবি করতে পারে। ব্যক্তি যেমন নৈতিক দিক থেকে তার বিবেকের নির্দেশকে চরম বলে মনে করতে পারে, খ্রীষ্টধর্মীয় প্রতিষ্ঠান চার্চও অনুরূপভাবে তার সৃষ্ট নিয়মকানুনকে চরম বলে ঘোষণা করতে পারে। এমন কি চার্চ একথাও ঘোষণা করতে পারে যে, মানবজীবনের এমন কোন দিক নেই যা ধর্মীয় পরিধির বাইরে অবস্থান করে। স্বাভাবিকভাবেই চার্চ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকেও ধর্মীয় অনুশাসনের অনুবর্তী বলে ঘোষণা করতে পারে। এইভাবে মধ্যযুগে চার্চ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের উপর নিজ কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য বিস্তার করতে চেয়েছিল।

র‍্যাফেলের অভিমত

মধ্যযুগে ধর্মযাজক পোপ বনাম সম্রাটদের দ্বন্দ্বের মূল কারণ ছিল রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের উপর ধর্মীয় কর্তৃত্বের প্রাধান্য বিস্তারের প্রচেষ্টা। যখন খ্রীষ্টান দুনিয়ার রাজন্যবর্গ পোপের কর্তৃত্বের প্রতি স্বীকৃতি জানাল, তখন ধর্মীয় কর্তৃত্বের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সামাজিক ব্যবস্থার ভাঙ্গন শুরু হলে কর্তৃত্বের প্রশ্নে পুনরায় পোপের সঙ্গে সম্রাটের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এই দ্বন্দ্বে শেষপর্যন্ত চার্চের পরাজয় ঘটে। সম্রাট, তথা রাজনৈতিক শক্তির জয় হয়। এই জয়ের মূলে ছিল তাদের শ্রেষ্ঠতর শক্তি। এই শ্রেষ্ঠতর শক্তি হোল নিছক বলপ্রয়োগের চরম ক্ষমতা। সার্বভৌমিকতার ক্ষমতাতত্ত্বের প্রবক্তারা মনে করেন যে, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের মতো নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবিকে কার্যকর করতে পারে না। কারণ তাদের হাতে রাষ্ট্রের মতো বলপ্রয়োগের চরম ক্ষমতা নেই। সুতরাং সার্বভৌমিকতার ক্ষমতাতত্ত্ব অনুসারে, রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা বলতে নিছক বলপ্রয়োগের চরম ক্ষমতাকে বোঝায়, রাষ্ট্রের আইনগত কর্তৃত্বকে নয়। তাঁদের মতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চূড়ান্ত বলপ্রয়োগের প্রয়োজন।

সমালোচনা: সার্বভৌমিকতার ক্ষমতাতত্ত্বের সমালোচনা প্রধানতঃ দুটি দিক থেকে করা হয়:

প্রথমতঃ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সার্বভৌমিকতার ক্ষমতাতত্ত্ব অপ্রয়োজনীয় এবং অচল। কারণ এই তত্ত্ব বিশ্বের কোন রাষ্ট্রকেই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করে না। এই তত্ত্বের প্রচারকেরা ক্ষমতার দিক থেকে বিচার করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে সার্বভৌম বলে স্বীকার করেন না। কিন্তু এই যুক্তি আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত শক্তিশালী রাষ্ট্রের পাশাপাশি সানমেরিনো, লিচেনস্টেন (Liechtenstein) প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিহীন রাষ্ট্রগুলিও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করেছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব অচল

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিছক বলপ্রয়োগের ক্ষমতাই যথেষ্ট নয় এবং আবশ্যিকভাবে তার প্রয়োজনও হয় না। লোকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব এবং আইনের উপযোগিতা উপলব্ধি করতে পারে বলেই তারা স্বাভাবিকভাবে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে স্বীকৃতি জানায়। বস্তুতঃ কেবল মাত্র বলপ্রয়োগের ভয়েই লোকে আইন মান্য করে না। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে অ্যালান্ বল্ (Alan Ball) মন্তব্য করেছেন যে, কেবলমাত্র বলপ্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করা যায় না। নিছক বল-প্রয়োগের দ্বারা যে আনুগত্য আদায় করা যায় তা অস্থায়ী হতে বাধ্য। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের প্রয়োজনীয়তাকে আদৌ অস্বীকার করা যায় না। সেইসব ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ ছাড়া রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

বলপ্রয়োগই আনুগত্যের একমাত্র মাপকাঠি নয়

১১। সার্বভৌমিকতার মার্কসীয় তত্ত্ব (Marxist Theory of Sovereignty)

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কর্তৃক প্রদত্ত সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতাকেই সার্বভৌমিকতা বলে অভিহিত করা হয়। রাষ্ট্রান্তর্গত সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের নির্দেশ মান্য করতে বাধ্য। রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার প্রধানতঃ দুটি দিক আছে, যথা—ক আভ্যন্তরীণ এবং খ. বাহ্যিক। আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা বলতে বোঝায় রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রের আইন হোল চূড়ান্ত এবং অপ্রতিহত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যখন অন্য কোন রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের নির্দেশে পরিচালিত না হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এবং স্বেচ্ছায় পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করে, তখন তাকে বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা বলে। অন্যভাবে বলা যায়, বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণবিহীনতাকেই বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা বলে। বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতার অনুসিদ্ধান্ত মাত্র। প্রকৃতিগত-ভাবে সার্বভৌমিকতা হোল রাষ্ট্রের মৌলিক, নিরঙ্কুশ ও অসীম ক্ষমতা। তাছাড়া, সর্বজনীনতা, অবিভাজ্যতা, অহস্তান্তরযোগ্যতা ইত্যাদি হোল সার্বভৌমিকতার গুরুত্ব-পূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

প্রচলিত অর্থে সার্ব-ভৌমিকতার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা রাষ্ট্রের কোনও শ্রেণী-চরিত্র আছে বলে মনে করেন না। তাঁদের চোখে রাষ্ট্র শ্রেণী-নিরপেক্ষ একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। তাই বুর্জোয়া তত্ত্ব অনুযায়ী রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য সার্বভৌমকতার কোনরূপ শ্রেণীগত তাৎপর্য নেই। কিন্তু রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতাকে মার্কসবাদীরা সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারবিশ্লেষণ করেন। তাঁদের মতে, রাষ্ট্র হোল শ্রেণী-শাসনের হাতিয়ার। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যে শ্রেণীর প্রাধান্য বিদ্যমান থাকে স্বাভাবিকভাবে সার্বভৌমিকতা সেই শ্রেণীরই করায়ত্ত হয়। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেছেন, সার্বভৌমিকতা হোল রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের চূড়ান্ত ক্ষমতা। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে এই ক্ষমতা প্রচলিত শ্রেণী-সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখে। ঐতিহাসিক

মার্কসীয় দৃষ্টিতে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা হোল শ্রেণী-সার্বভৌমিকতা

বস্তুবাদের সাহায্যে মার্কসবাদীরা তাঁদের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে, অনাদি অনন্তকাল থেকে রাষ্ট্র চলে আসেনি। সমাজবিবর্তনের একটি বিশেষ স্তরে শ্রেণীশোষণের হাতিয়ার হিসেবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। আদিম সাম্যবাদী সমাজে কোনরূপ শ্রেণীভেদ (Class distinction) না থাকায় শ্রেণীশোষণের হাতিয়ার হিসেবে রাষ্ট্রেরও কোন অস্তিত্ব ছিল না। দাস সমাজেই সর্বপ্রথম দাস-মালিকদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। এই সমাজে রাষ্ট্র দাসদের শোষণ করার কাজে দাস-প্রভুদের সাহায্য করত। পরবর্তী সময়ে সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্র অনুরূপভাবে শোষকশ্রেণীর স্বার্থে এবং শোষকশ্রেণী কর্তৃক ব্যবহৃত হোত। সামন্তসমাজে ভূস্বামীদের স্বার্থে এবং ধনতান্ত্রিক সমাজে পুঁজি-পতিদের স্বার্থে রাষ্ট্রযন্ত্র কাজ করে। এরূপ রাষ্ট্রকে চরম কর্তৃত্বসম্পন্ন করা না হলে প্রচলিত শ্রেণীসম্পর্ককে বজায় রাখা সম্ভব নয়। তাই রাষ্ট্রের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পণ করে কার্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের প্রচারকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত শ্রেণীর স্বার্থের পরিবর্তে সংখ্যালঘিষ্ঠ শোষকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। আইন হোল সার্বভৌম শক্তির ইচ্ছার প্রকাশ। তাই সার্বভৌম শক্তি যেহেতু শোষকশ্রেণী সেহেতু তাদের আইন কখনই শোষিত শ্রেণীর স্বার্থে প্রণীত হতে পারে না কিংবা তাদের স্বার্থরক্ষা করতে পারে না। রাষ্ট্র যেহেতু শ্রেণীশোষণের যন্ত্র সেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ সর্বহারাশ্রেণীকে পিষ্ঠ করার জন্য রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব প্রচারিত হয়।

মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে সার্বভৌমিকতা শুধুমাত্র একটি আইনগত ধারণা নয়; তা হোল রাজনীতিগত আইনী প্রত্যয় (politico-legal category)। তাই বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা সার্বভৌমিকতা ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের যে ব্যাখ্যাই প্রদান করুন না কেন, বাস্তবে সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একদিকে যেমন রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র নির্ধারণ করে দেয়, তেমনি আবার শ্রেণী-চরিত্রের উপর ভিত্তি করে সার্বভৌমিকতার শ্রেণী-চরিত্র গড়ে উঠে।

মার্কসীয় দৃষ্টিতে জনগণের সার্ব-ভৌমিকতার প্রকৃতি

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে চার্চের কর্তৃত্বের পরিবর্তে রাজার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সার্বভৌমিকতা তত্ত্ব প্রচারিত হয়। সার্বভৌম শক্তির হাতে বলপ্রয়োগের চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পণ করে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা কার্যক্ষেত্রে জনসাধারণের অধিকার ও স্বাধীনতা খর্ব করার কথা প্রচার করেছেন। বোদা সার্বভৌম শক্তিকে আইনের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত নাগরিক ও প্রজাদের উপর রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা বলে বর্ণনা করে কার্যক্ষেত্রে মুষ্টিমেয়ের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পণ করেছেন। হবস বোদার মতো সার্বভৌম শক্তিকে চূড়ান্ত এবং অপ্রতিহত বলে বর্ণনা করে তার বিরুদ্ধাচরণ করা যাবে না বলে মত প্রচার করেন। এইভাবে স্বৈরাচারী রাজাকে সার্বভৌম শক্তি বলে বর্ণনা করে জনগণের কর্তৃত্বকে তিনি অস্বীকার করেছেন। পরবর্তী সময়ে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে পুঁজিপতি শ্রেণীর কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জনগণের সার্বভৌমিকতা তত্ত্ব প্রচারিত হয়। এই তত্ত্ব প্রচারের ফলে ১৬৮৮ সালে ইংল্যান্ডে গৌরবময় বিপ্লব, ১৭৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লব সংগঠিত

হয়। এইসব বিপ্লবের সাফল্য সামন্ততন্ত্রের তথা চরম সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের অবসান ঘটিয়ে জনগণের সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের সূত্রপাত করে।

কিন্তু মার্কসবাদীদের মতে, ঐসব বিপ্লব যেহেতু পুঁজিপতিদের স্বার্থে পরিচালিত হয়েছিল সেহেতু ঐ সব বিপ্লবের পরে জনগণের সার্বভৌমিকতা তত্ত্ব প্রচারিত হলেও বাস্তবে জনগণের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পিত হয়নি। ঐসব বুর্জোয়া বিপ্লব কেবলমাত্র একশ্রেণীর শোষকের পরিবর্তে অন্য শ্রেণীর শোষককে সার্বভৌমিকতা প্রদান করেছে। পূর্বে রাজা ও সামন্তপ্রভুরা সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী ছিল। কিন্তু বিপ্লবোত্তর যুগে সামন্তপ্রভুদের পরিবর্তে সার্বভৌমিকতা অর্পিত হোল বুর্জোয়াদের হাতে।

বুর্জোয়া সার্বভৌমিকতা ও তার উৎপত্তি

এই নতুন সার্বভৌম বুর্জোয়া শ্রেণী বাস্তবকে অস্বীকার করে আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতা তত্ত্ব প্রচার করে। এই তত্ত্ব অনুসারে প্রত্যেক রাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন করার চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষকেই আইনসঙ্গতভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার চরম অধিকারী বলে বর্ণনা করা হয়। আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষের আদেশই হোল চূড়ান্ত এবং তা সবকিছুর উর্ধ্বে অবস্থান করে। সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মীয় অনুশাসন, বিচারালয়ের রায়, এমনকি জনমতের নির্দেশ ইত্যাদি কোনভাবেই আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতার উপর কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে না। আইনবিদদের মতে, যে সার্বভৌমিকতা আইনানুমোদিত নয়, তার কোন মূল্য নেই। এই তত্ত্বের অস্টিন প্রমুখ প্রচারকেরা রাজ্যসহ ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলে বর্ণনা করেন। মার্কসবাদীদের মতে পার্লামেন্টকে সার্বভৌম শক্তি বলে প্রচার করে আইনগত সার্বভৌমিকতার সমর্থকেরা কার্যতঃ বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে সার্বভৌমিকতা অর্পণ করেছেন। কারণ শ্রেণী-বৈষম্যমূলক সমাজে অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রভুত্বকারী শ্রেণী আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ পায়। এরূপ বুর্জোয়া পার্লামেন্ট কখনই জনগণের স্বার্থে কিংবা জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য কাজ করে না। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের আইনসভা প্রকৃতিগতভাবে জনস্বার্থবিরোধী হতে বাধ্য। বলা বাহুল্য, এরূপ পার্লামেন্টের হাতে চরম ক্ষমতা অর্পণ করার অর্থই হোল বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রাধান্যকে অক্ষুণ্ন রাখা অর্থাৎ প্রচলিত সম্পত্তি-সম্পর্ককে (property relations) বজায় রাখা। অধ্যাপক ডাইসির মতো বুর্জোয়া আইনবিদও ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে সার্বভৌম বলে ঘোষণা করে তার উপর কতকগুলি বাধানিষেধ আরোপ করেছেন। তিনি আইনগত এবং রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। তাঁর মতে, আইনগত দিক থেকে পার্লামেন্ট সার্বভৌম। রাজনৈতিক দিক থেকে জনসাধারণ তথা নির্বাচকমণ্ডলী সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী। কিন্তু অস্টিনের তত্ত্ব অনুসারে ডাইসির আইনগত সার্বভৌমিকতা আদৌ সার্বভৌমিকতা নয়। কারণ ডাইসির দৃষ্টিতে আইনগত সার্বভৌম কখনই অনিয়ন্ত্রিত হতে পারে না; পার্লামেন্ট কেবলমাত্র বিচার বিভাগের উর্ধ্বে। সুতরাং অস্টিনের দৃষ্টিতে এরূপ পার্লামেন্টকে প্রকৃত সার্বভৌম বলা

মার্কসীয় দৃষ্টিতে আইনসংগত সার্বভৌমিকতার প্রকৃতি

পুঁজিবাদী সমাজে জনগণের সার্বভৌমিকতা অর্থহীন

যায় না। আবার রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতাকে আইনগত দিক থেকে সার্বভৌম বলে স্বীকার করে নিতে আইনবিদ্‌গণ সম্মত নন। মার্কসবাদীদের মতে, রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা কার্যত শ্রেণীবিভক্ত সমাজে উৎপাদনের মালিকদের হাতেই অর্পিত থাকে। কারণ আইনগত সার্বভৌম শক্তি অর্থাৎ পার্লামেন্ট ঐসব পুঁজিপতিদের স্বার্থেই আইন প্রণয়ন করে এবং আইন বলবতের ব্যবস্থা করে। মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে, পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদনের উপকরণগুলি পুঁজিপতিদের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকায় দেশের সমগ্র অর্থনীতির উপর তাদের অপ্রতিহত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অর্থনৈতিক ভিতের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে উপরি-কাঠামো (Super-structure), যার মধ্যে সামরিক বাহিনী, আইনসভা, বিচারবিভাগ ইত্যাদি থাকে। সুতরাং পুঁজিবাদী সমাজে রাষ্ট্র ও প্রভুত্বকারী শ্রেণী অভিন্ন বলে জনগণের সার্বভৌমিকতা কার্যক্ষেত্রে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। অনেক সময় রাজনৈতিক অধিকার, জনগণের সার্বভৌমিকতা ইত্যাদির বাতাবরণ সৃষ্টি করে প্রভুত্বকারী শ্রেণী সুকৌশলে সার্বভৌম ক্ষমতাকে করায়ত্ত করে নেয়।

বুর্জোয়া যুক্তরাষ্ট্রেও সার্বভৌমিকতা বুর্জোয়া শ্রেণীর হস্তে ন্যস্ত

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রচারকেরা যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্ণয়ের প্রশ্নে নিজেদের মধ্যে বিরোধে লিপ্ত হন। তাঁদের অনেকে বিভাজ্য সার্বভৌমিকতা তত্ত্ব প্রচার করে মন্তব্য করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতা কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টিত হয়েছে। কিন্তু অনেকেই সার্বভৌমিকতা অবিভাজ্য বলে প্রচার করে এই মত গ্রহণযোগ্য নয় বলে ঘোষণা করেন। আবার কেউ কেউ সংবিধানকেই সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে এরূপ বিরোধ বাতাবরণ সৃষ্টির নামান্তর মাত্র। কারণ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এককেন্দ্রিক বা যুক্তরাষ্ট্রীয় যে ধরনের শাসনব্যবস্থাই প্রবর্তিত থাকুক না কেন, সেখানে বাস্তবে অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রভুত্বকারী শ্রেণীর হস্তেই সার্বভৌমিকতা ন্যস্ত থাকে এবং সেই শ্রেণীই সংবিধান সৃষ্টি করে। মার্কসীয় দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র সংবিধানের মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স প্রভৃতি বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সংবিধানে তাই জনগণকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান করা হয়নি। রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান করেই বুর্জোয়া সংবিধানের প্রণেতারা বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা না থাকলে জনসাধারণ কখনই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না। সুতরাং বলা যেতে পারে—মার্কসবাদীদের মতে, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনসাধারণ কখনই প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না। কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজেই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি দিক থেকে জনসাধারণ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়ন, গণসাধারণতন্ত্রী চীন প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সর্বহারা শ্রেণী তত্ত্বগত দিক থেকে যেমন সার্বভৌম, বাস্তব দিক থেকেও তেমনি সার্বভৌম। বস্তুতঃ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে সার্বভৌম ক্ষমতা সংখ্যালঘু বুর্জোয়া শ্রেণীর হাত থেকে শ্রমিক শ্রেণী ও তার সহযোগী শ্রেণীগুলির হাতে চলে যায়। প্রতিষ্ঠিত হয় সর্বহারা শ্রেণীর

একনায়কত্ব। এই একনায়কত্ব শ্রমিক শ্রেণীর সার্বভৌমিকতার একটি বিশেষ দিক। সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে দমন করে সর্বহারা শ্রেণীর স্বার্থ-রক্ষা করার জন্য একটি সুশৃংখল কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ সার্বভৌম ক্ষমতাকে ব্যবহার করে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজ যখন সাম্যবাদী সমাজে রূপান্তরিত হবে, তখন যেহেতু রাষ্ট্রের কোনরূপ অস্তিত্ব থাকবে না, সেহেতু রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা বলেও কোন কিছু থাকবে না। সেই সমাজে জনগণই হবে সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী।

১২। সাধারণ ইচ্ছা ও সার্বভৌমিকতা (General Will and Sovereignty)

সাধারণ ইচ্ছার সার্বভৌমিকতা তত্ত্ব সর্বপ্রথম রুশো কর্তৃক প্রচারিত হয়। রাজনৈতিক আনুগত্যের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে রুশো তাঁর 'সামাজিক চুক্তি' (Social Contract, 1762) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সাধারণ ইচ্ছা-তত্ত্ব প্রচার করেন। কিভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার সমন্বয় সাধন করা যায় তা-ই ছিল রুশোর সমস্যা। তিনি তাঁর সাধারণ ইচ্ছার মধ্যে এই সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রুশো তাঁর 'সামাজিক চুক্তি' পুস্তকের কোথাও সাধারণ ইচ্ছার সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নিরূপণ করেননি।

রুশো ও সাধারণ ইচ্ছার সার্বভৌমিকতা

রুশোর মতে, প্রাকৃতিক অবস্থায় বসবাসকারী ব্যক্তিগণ নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে প্রত্যেকে সর্বপ্রকার ক্ষমতা সাধারণ ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করে। এই সাধারণ ইচ্ছা হোল জনসাধারণের কল্যাণকামী ইচ্ছার সমষ্টিমাত্র। এই ইচ্ছা কিন্তু সমাজস্থ সকলের ব্যক্তিগত ইচ্ছার যোগফল নয়, কারণ ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনেক সময় সমষ্টির স্বার্থের পরিবর্তে ব্যক্তিগত নির্দিষ্ট স্বার্থকে বড় বলে মনে করে। তাঁর মতে, মানুষ দু'ধরনের ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হতে পারে, যথা—প্রকৃত ইচ্ছা (Real will) এবং অপ্রকৃত ইচ্ছা (Unreal will)। যখন কেউ ব্যক্তিগত স্বার্থকে সামাজিক স্বার্থের উপরে স্থান দেয় তখন ধরে নিতে হবে যে, সে তার অপ্রকৃত ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। প্রকৃত ইচ্ছা কখনই সমাজের স্বার্থ অপেক্ষা ব্যক্তির স্বার্থকে বড় করে দেখে না। সুতরাং ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা সমষ্টিগত স্বার্থ যেখানে বড় সেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থের ইচ্ছার সঙ্গে সমাজস্থ ইচ্ছার সংঘাত বাধলে বলপ্রয়োগ দ্বারাই সাধারণ ইচ্ছাকে বলবৎ করা হবে। কারণ সাধারণ ইচ্ছা সবসময়ই অভ্রান্ত এবং সমষ্টির মঙ্গলবিধায়ক।

সাধারণ ইচ্ছার স্বরূপ

রুশোর মতে, সাধারণ ইচ্ছার একটি পৃথক সমষ্টিগত নৈতিক সত্তা আছে যা অন্যান্যদের ব্যক্তিসত্তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রত্যেকে তাদের ব্যক্তিগত সত্তা ও সমস্ত ক্ষমতা সাধারণ ইচ্ছার নিকট সমর্পণ করলেও বাস্তবে তাদের যৌথ ব্যক্তিত্বের ক্ষমতা সমগ্র সমাজের সভ্য হিসেবে তারা প্রত্যেকেই ফিরে পেল। সুতরাং সবকিছু সাধারণ ইচ্ছার নিকট সমর্পণ করেও তারা নিঃস্ব হোল না। সামাজিক বা রাষ্ট্রিক জীবনে প্রত্যেকেই সাধারণ ইচ্ছার অঙ্গীভূত ও অনুবর্তী ব্যক্তিগত ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হতে লাগল। অন্যভাবে বলা যায়, সাধারণ ইচ্ছার অধীনে নিজেকে

স্থাপিত করে ব্যক্তি একদিকে যেমন তার অবাধ অধিকার ও স্বাভাবিক স্বাধীনতা হারিয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি তার পরিবর্তে লাভ করেছিল রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা এবং তার সব কিছুর সামাজিক স্বীকৃতি। সুতরাং সাধারণ ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করে কার্যতঃ ব্যক্তি স্বাধীনই থেকে গেল।

রুশো সাধারণ ইচ্ছাকে সার্বভৌম বলে ঘোষণা করেন। তিনি বোদাঁ বা হবসের মত চরম রাজতন্ত্রকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে প্রচার করেননি। রুশোর সার্বভৌমিকতা জনগণের সার্বভৌমিকতামাত্র। রুশোর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী সাধারণ ইচ্ছার মধ্যে সার্বভৌমিকতার সমস্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মতে, সার্বভৌম সাধারণ ইচ্ছা চরম (absolute)। যেহেতু এই ইচ্ছা কল্যাণকারী প্রকৃত ইচ্ছার সমন্বয়, সেহেতু প্রত্যেকেই এরূপ ইচ্ছাকে মান্য করতে বাধ্য। যদি কেউ সাধারণ ইচ্ছার বিরোধিতা করে তাহলে তাকে অপ্রকৃত ইচ্ছার হাত থেকে মুক্ত করে প্রকৃত ইচ্ছার অনুবর্তী হয়ে চলতে বাধ্য করা হবে। রুশোর ভাষায়, তাকে বলপূর্বক স্বাধীন করা হবে (forced to be free)। স্যাবাইন (Sabine)-এর মতে, এর অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তকে সংখ্যালঘিষ্ঠদের মানতে বাধ্য করা। অন্যভাবে বলা যায়, এই অর্থে রুশোর সাধারণ ইচ্ছা সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছামাত্র। রুশোর সার্বভৌম সাধারণ ইচ্ছার প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য প্রদর্শনের অন্যতম কারণ হোল এই যে, সাধারণ ইচ্ছা নৈতিক দিক থেকে ব্যক্তিগত ইচ্ছা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এভাবে রুশো সাধারণ ইচ্ছার নিকট ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে সাধারণ ইচ্ছাকে চরম ক্ষমতার অধিকারী করে তুলেছেন।

সার্বভৌম সাধারণ ইচ্ছার বৈশিষ্ট্য

সার্বভৌম সাধারণ ইচ্ছার অন্য দু'টি বৈশিষ্ট্য হোল : অ-হস্তান্তরযোগ্যতা (inalienability) এবং অবিভাজ্যতা (indivisibility)। সার্বভৌম ক্ষমতা বিভক্ত হলে তা আর সার্বভৌম থাকে না। সার্বভৌম সাধারণ ইচ্ছাকে হস্তান্তরও করা যায় না। রুশোর মতে, সরকার যে ক্ষমতা ব্যবহার করে তা ক্ষমতার হস্তান্তর মাত্র, ইচ্ছার হস্তান্তর নয়। এরূপ অর্পিত ক্ষমতার অধিকারী কখনই মৌলিক আইন প্রণয়ন করতে পারে না। কারণ একমাত্র সাধারণ ইচ্ছাই মৌলিক আইন প্রণয়নের অধিকারী। এই অধিকার অন্যের হাতে অর্পণ করা হলে সাধারণ ইচ্ছার সার্বভৌম চরিত্র ক্ষুণ্ণ হবে অর্থাৎ অ-হস্তান্তরযোগ্যতা বিনষ্ট হবে। এইভাবে রুশো সাধারণ ইচ্ছাকে চরম, একক, অভ্রান্ত, অ-হস্তান্তরযোগ্য এবং অবিভাজ্য বলে বর্ণনা করেছেন।

সমালোচনা : বর্তমানে নানাদিক থেকে রুশোর সার্বভৌম সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্বের সমালোচনা করা হয়। যথা :

সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচারিতার নামান্তর

প্রথমতঃ, রুশোর সার্বভৌম সাধারণ ইচ্ছা বাস্তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুই নয়। সংখ্যালঘিষ্ঠেরা সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করলে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমষ্টিগত ইচ্ছা মান্য করতে বাধ্য করা হবে বলে ঘোষণা করে রুশো কার্যতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচারিতা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ, রুশো সাধারণ ইচ্ছাকে সার্বভৌম বলে কল্পনা করে তার হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পণ করেছেন। সাধারণ ইচ্ছা কখনই ভুল করতে পারে না এবং কখনই

সংকীর্ণ স্বার্থে পরিচালিত হতে পারে না, তাই তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা আবশ্যিক। এইভাবে রুশোর সার্বভৌম সাধারণ ইচ্ছা বাস্তবে হবসের স্বৈরাচারী রাজার মতই অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছে। হার্নশ (Hearnshaw) মন্তব্য করেছেন, "রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছা' হবসের মস্তকহীন লেভিয়াথান মাত্র।" কারণ "রুশোর এই ছিন্নমস্তক লেভিয়াথান হবসের মস্তক-সমন্বিত লেভিয়াথানের মতো অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী।"

রাজার মতো স্বৈরাচারী

তৃতীয়তঃ, রুশো সার্বভৌম সাধারণ ইচ্ছার বাস্তব রূপায়ণের জন্য জনগণকে প্রতিনিয়তই সরকারের সংগে জড়িত থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান যুগের বৃহদায়তন রাষ্ট্রে সকল নাগরিকের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করা অসম্ভব। এদিক থেকে বিচার করে রুশোর তত্ত্বকে অবাস্তব তত্ত্ব বলে সমালোচনা করা যেতে পারে।

অবাস্তব চিন্তা

রুশোর সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্বের মধ্যে অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষ্য করা গেলেও তাঁর প্রচারিত তত্ত্ব রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করেছে। রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উৎস জনসাধারণ এবং জনকল্যাণ সাধনই সার্বভৌম শক্তির প্রধানতম কর্তব্য বলে ঘোষণা করে রুশো জনগণের সার্বভৌমিকতা তত্ত্ব প্রচার করেছেন। এদিক থেকে বিচার করে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথিকৃৎ হিসেবে নিঃসন্দেহে তিনি নমস্য।

মূল্য

১৩। সার্বভৌমিকতা এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা (Sovereignty and International Order)

পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে আধুনিক রাষ্ট্র সার্বভৌমত্ব লাভ করে। কারণ তখন রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নাগরিকদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে সক্ষম ছিল না। যে সব চিন্তাবিদ্ রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের পক্ষে ছিলেন তাঁরা ঐ সময় রাষ্ট্রকে সর্বপ্রকার বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করেন। এর পর উনবিংশ শতাব্দীতে অস্টিন প্রমুখ একত্ববাদিগণ (Monists) সার্বভৌমিকতার কেন্দ্রীকরণ নীতি অর্থাৎ রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতার নীতি প্রচার করেন। তাঁদের মতে, প্রকৃতিগতভাবে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা হোল চরম, অবাধ, অসীম ও অবিভাজ্য। আর যেহেতু রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা চরম ও অসীম সেহেতু প্রাকৃতিক আইন, জনগণের প্রাকৃতিক অধিকার প্রভৃতিও তার ওপর কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের মূল কথা

কিন্তু আজকের দিনে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার সাবেকী তত্ত্ব অকার্যকর হয়ে পড়েছে কারণ বর্তমানে কোন রাষ্ট্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়: একে অপরের উপর নির্ভরশীল। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কি বলেছেন, জাতীয় বিচ্ছিন্নতা নয়, আন্তর্জাতিক নির্ভরতা; প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে আমাদের মন অধিকার করে রয়েছে। যদি একটি রাষ্ট্রকে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ যোগাযোগ রাখতে হয় তাহলে একটি

পারস্পরিক নির্ভরশীলতার যুগে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার অস্থিরহীনতা

রাষ্ট্র স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে কখনই টিকে থাকতে পারে না। সে যে-বৃহৎ সমাজের অংশ তার অভাব-অভিযোগ এর অস্তিত্বের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে। তাই স্থানীয় বিষয়গুলি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকলেও যেসব বিষয়ে অন্য রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট, সেই সব বিষয় কখনই তার হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না। কারণ বর্তমানে পৃথিবী এত বেশী পরস্পর-নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে যে, কোনও একটি রাষ্ট্রের স্বাধীন অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা অন্যান্য রাষ্ট্রের শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক বলে বিবেচিত হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইংল্যান্ড যদি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তার সীমান্ত ও অস্ত্রশস্ত্র, শুল্কের তহবিল ও শ্রম সংক্রান্ত মান, তার বিচারালয়ে বিদেশীদের অধিকার, অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বিরোধ নিষ্পত্তিতে তার পদ্ধতি ইত্যাদি নির্ধারণ করে, তাহলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে উঠবে। এমতাবস্থায় রাজনীতির সাধারণ প্রশ্নে রাষ্ট্রকে বৃহৎ সমাজের একটি রাজ্য হিসেবে দেখতে হবে এবং বাইরের বৃহত্তর স্বার্থের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে এর আইনকে সীমাবদ্ধ করতে হবে। অন্যভাবে বলা যায়, রাষ্ট্রীয় বা পৌর আইনকে আইনসঙ্গত ভাবেই আন্তর্জাতিক আইনের অধীনস্থ থাকতে হবে। এইসব কারণে ল্যাস্কি মন্তব্য করেছেন, তিনশ' বছর পূর্বের রোমান চার্চের সার্বভৌমত্বের মতো বর্তমান বিশ্বে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অচল হয়ে পড়েছে।

যুদ্ধের সম্ভাবনাকে দূর করার জন্য রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার অবসান প্রয়োজন

তাছাড়া, বর্তমানে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হওয়ার ফলে একদিকে যেমন উৎপাদন আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি নতুন নতুন ভয়ংকর অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এমতাবস্থায় বাহ্যিক ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্রের অবাধ ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত ক্ষমতাকে স্বীকার করে নেওয়ার অর্থই হোল যুদ্ধকে সাদরে অভ্যর্থনা জানানো। কারণ এরূপ ক্ষমতা থাকলে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থকে চরিতার্থ করার এবং বিশ্বব্যাপী নিজেদের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য ঐকান্তিক ভাবে প্রয়াস চালাবে। বর্তমান বিশ্বের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। প্রতিটি রাষ্ট্রই সংশ্লিষ্ট সমাজের অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রভুত্বকারী শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার নাম করে উক্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা সমাজের প্রচলিত শ্রেণী-সম্পর্ককে বিদ্যমান রাখার জন্য সচেষ্ট হয়। নিজ দেশের বাজারে উৎপাদিত সামগ্রী যথেষ্ট বিক্রি না হওয়ায় পুঁজিপতি শ্রেণী বিদেশী বাজারের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করে। এইভাবে পুঁজিপতি রাষ্ট্রের শাসক-শ্রেণী কাঁচামাল সংগ্রহ ও উৎপাদিত শিল্পজাত দ্রব্যাদি অতিরিক্ত মুনাফায় বিক্রয় করার জন্য দুর্বল রাষ্ট্রগুলিতে উপনিবেশ স্থাপন করে। অনেক সময় উপনিবেশ স্থাপন করতে বিভিন্ন দেশের পুঁজিপতি শ্রেণী একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত তারা নিজেদের স্বার্থেই বিশ্বের বাজারকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয়। কিন্তু এতেও শান্তি আসে না। তাই তারা বিশ্বের ভূখণ্ডগত বণ্টনের কাজে আত্মনিয়োগ করে। এইভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কয়েকটি বৃহৎ পুঁজিবাদী শক্তি বিশ্বের ভূখণ্ডগত বণ্টনের কাজ মোটামুটিভাবে শেষ করে ফেলে। তাই আজ সর্বাপেক্ষা ধনশালী রাষ্ট্রের মহাজনী পুঁজির মালিকদের

পক্ষেও নতুন বাজার খুঁজে পাওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। আর তা করতে হলেই তাকে অপরের অংশের দিকে হাত বাড়াতে হবে। বলা বাহুল্য, তা করতে গিয়েই বর্তমান শতাব্দীর দুটি ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। তাই বলা যায়, আজকের দিনে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতাকে স্বীকার করে নেওয়ার অর্থই হোল নতুন করে আর একটি বিশ্বযুদ্ধের দিকে পৃথিবীকে ঠেলে দেওয়া। কিন্তু যেহেতু বিশ্বের শান্তিকামী সাধারণ মানুষ আর যুদ্ধ চায় না, সেহেতু রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার উপর কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা একান্তভাবেই প্রয়োজন। তাই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন, আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির আন্তর্জাতিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সৌভ্রাত্রের সম্প্রসারণ প্রভৃতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার দাবি উঠেছে।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের কারণ

অনুন্নত ও উন্নতিকামী পুঁজিবাদী দেশগুলিও একথা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতাকে পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ তাদের বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়া। ঐসব রাষ্ট্র নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়। এমন কি উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিও সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতাকে কিছুটা পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করার পক্ষপাতী। বিশ্লেষণ করে বলা যায়, বর্তমান শতাব্দীতে বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের সংকট শুরু হলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি বুঝতে পারে যে, সাবেকী পথে তাদের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ কায়েম করা সম্ভব নয়। তাই তারা সামরিক জোট গঠন, অনুন্নত ও অর্ধোন্নত দেশগুলিকে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদানের নামে নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন দেশে পুতুল সরকার গঠন করে সেইসব দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ ইত্যাদি নীতি অনুসরণ করতে থাকে। এইভাবে নয়া-উপনিবেশবাদ (Neo-colonialism) কায়েম করার মাধ্যমে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করে। এসব করতে গিয়ে তারা নিজেদের প্রয়োজনেই রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতাকে কিছুটা পরিমাণে সঙ্কুচিত করতে দ্বিধাবোধ করে না। এর ফলে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ বা লীগ অব নেশনস্ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নামে দুটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক আন্তর্জাতিকতার নীতি গ্রহণের কারণ

অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার নীতির বিরোধিতা করে। সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে উগ্র জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সঙ্গে চরম রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার বিরোধিতা করে সর্বহারা শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার (proletarian internationalism) মহান্ নীতিকে সমুচ্চে তুলে ধরার কথা বলে। তাই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি সর্বপ্রকার শ্রেণী-শোষণের অবসান ঘটানো এবং বিশ্বকে যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিকতার আদর্শ নিরলসভাবে প্রচার করে চলেছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ঐকান্তিক প্রয়াসের কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে, নানা কারণে হবস্‌ ও অস্টিনের সার্বভৌমিকতার ধ্রুপদী তত্ত্ব বর্তমান শতাব্দীর জটিল সমাজে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। তাই আন্তর্জাতিক আইন, আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা প্রভৃতি কিছু-না-কিছু পরিমাণে সব রাষ্ট্রকেই মেনে চলতে হয়। আন্তর্জাতিক আইন এখন শুধু আন্তর্জাতিক বিচারালয়েই প্রযুক্ত হয় না, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাধারণ বিচারালয় কর্তৃকও তা গৃহীত ও প্রযুক্ত হয়। তাছাড়া, লীগ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নানাপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও এই দুটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার নামে একক রাষ্ট্রের বাড়াবাড়িকে বেশ কিছুটা পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে, সে বিষয়ে সম্ভবতঃ দ্বিমত পোষণ করার কোন অবকাশ নেই। অবশ্য একথাও সত্য যে, অনেকে আন্তর্জাতিক আইনকে আইন বলে মেনে নিতে সম্মত নন। এঁদের মতে, আন্তর্জাতিক আইন কোনও সার্বভৌম শক্তির আদেশ নয়। তাছাড়া, এগুলিকে ভঙ্গ করার অপরাধে আইন ভঙ্গকারী রাষ্ট্রকে কোনরূপ শাস্তি দেওয়া যায় না। কিন্তু অনেকে এইসব যুক্তিকে গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করেন। কারণ আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উপলব্ধি যেমন ব্যক্তিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আইন মেনে চলতে উৎসাহিত করে, তেমনি আন্তর্জাতিক আইনের উপযোগিতাই রাষ্ট্রগুলিকে এই ধরনের আইন মেনে চলতে অনুপ্রাণিত করে। তাছাড়া, বর্তমানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আইনকে বলবৎ করার ব্যবস্থা রয়েছে।

আন্তর্জাতিক আইন, আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা প্রভৃতির সম্প্রসারণ

পরিশেষে বলা যায়, বিশ্ব-রাষ্ট্র গঠন কিংবা আন্তর্জাতিকতার সম্প্রসারণের রঙ্গিন স্বপ্ন দেখা সত্ত্বেও বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রই রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতাকে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিতে আদৌ সম্মত নয়। প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রই নিজের চরম রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। এমন কি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদেও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা রক্ষা করার গ্যারান্টি প্রদান করা হয়েছে। অবশ্য সেই সঙ্গে একথাও সত্য যে, রাষ্ট্রের উপর নানাপ্রকার আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা আরোপিত হওয়ার ফলে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম শক্তির কিছুটা গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো অতি বড় শক্তিধর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের পক্ষেও সেইসব বাধ্যবাধ্যতাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তবে যতদিন পর্যন্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তির মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততদিন পর্যন্ত আন্তর্জাতিকতার সুমহান আদর্শ কতখানি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু তা বলে নিরাশ হলে চলবে না। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী মানুষ হিসেবে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার সংকীর্ণ বেড়াজাল অতিক্রম করে আন্তর্জাতিকতার পবিত্র তীর্থে উপনীত হওয়ার জন্য আমাদের প্রত্যেককেই সচেতনভাবে প্রয়াসী হতে হবে।

উপসংহার

নবম অধ্যায়

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা

[Nationalism and Internationalism]

১। জনসমাজ, জাতীয় জনসমাজ ও জাতি (People, Nationality and Nation)

জাতীয়তাবাদ এমন একটি শব্দ যা দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক চিন্তাজগতে আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। জাতীয়তাবাদের সঙ্গে যে সব ধারণা নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত সেগুলি হোল জনসমাজ (People), জাতীয় জনসমাজ (Nationality) এবং জাতি (Nation)। জাতীয় জনসমাজ এবং জাতি—এ দুটি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হোল একই পূর্বপুরুষ থেকে জাত জনসমষ্টি। কিন্তু এ দুটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ একমত নন। কেউ কেউ জাতীয় জনসমাজ ও জাতির মধ্যে কোন পার্থক্য নিরূপণ করতে চান না। আবার কেউ কেউ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে বলে মনে করেন। বস্তুতঃ জাতীয় জনসমাজ ও জাতির মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা অতি সূক্ষ্ম।

ভূমিকা

অনেকে আবার ইংরেজী 'নেশন' (Nation), 'ন্যাশন্যালিটি' (Nationality) প্রভৃতি শব্দের যথার্থ বাংলা পরিভাষা নেই বলে মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মশক্তি' নামক গ্রন্থে 'নেশন কী' প্রবন্ধে বলেন, "স্বীকার করিতে হইবে, বাংলায় 'নেশন' কথার প্রতিশব্দ নাই।…নেশন ও ন্যাশন্যাল শব্দ বাংলায় চলিয়া গেলে অনেক অর্থদ্বৈধ-ভাবদ্বৈধের হাত এড়ানো যায়।" আমরা সুবিধার জন্য 'নেশন' ও 'ন্যাশান্যালিটি'র বাংলা প্রতিশব্দ যথাক্রমে 'জাতি' ও 'জাতীয় জনসমাজ' করতে পারি।

(ক) **জনসমাজ** (People): জনসমাজ বলতে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী এমন একটি জনসমষ্টিকে বোঝায়, যাদের মধ্যে ভাষাগত, ধর্মগত, সাহিত্যগত, ইতিহাসগত আচারব্যবহার ও অধিকারগত ক্ষেত্রে ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। এই সংজ্ঞাটির সঙ্গে জনসমাজের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পশ্চাতে আর একটি শক্তি কাজ করে বলে অনেকের ধারণা। তা হোল উদ্ভবগত ঐক্য। লর্ড বায়রন, ম্যাটসিনি (Mazzini), লীকক্ প্রমুখ উদ্ভবগত ঐক্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ম্যাটসিনির মতে, উদ্ভবগত ঐক্য সম্বন্ধে সচেতন না থাকলে জাতির উদ্ভব ঘটে না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বায়রন ও ম্যাটসিনি জনসমাজের ধারণা সম্পর্কে আলোচনার পরিবর্তে জাতিসম্পর্কিত ধারণাই আলোচনা করেছেন।

জনসমাজের সংজ্ঞা

(খ) **জাতীয় জনসমাজ** (Nationality): জাতীয় জনসমাজ হোল এমন একটি ঐক্যবদ্ধ জনসমাজ যে নিজেকে অন্য জনসমাজ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বলে মনে করে। জাতীয় জনসমাজ হোল রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন একটি জনসমাজ। এই রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাই জাতীয় জনসমাজকে জনসমাজ থেকে পৃথক করে। সুতরাং জাতীয় জনসমাজ বলতে

জাতীয় জনসমাজের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী এমন একটি জনসমষ্টিকে বুঝায় যাদের মধ্যে বংশ, ধর্ম, ভাষা, কৃষ্টি প্রভৃতির ঐক্যের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ দেখা যায়। কোকার (Coker)-এর মতে, অতীত ইতিহাসের অভিজ্ঞতা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সমন্বয়ের ফলেই জাতীয় জনসমাজ গঠিত হয়।

(গ) জাতি (Nation): 'জাতি' বলতে কি বোঝায় তা বলা কঠিন। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে ল্যাস্কি বলেছেন, জাতির সংজ্ঞা নির্দেশ করা সহজ নয়, কারণ কোন বিচার্য বাহ্যিক উপাদানে তাকে চিহ্নিত করা যায় না। জাতির সার্বিক সংজ্ঞা দেওয়া যায় না বলে সমাজবিজ্ঞানীদের প্রথম বিশ্ব কংগ্রেস ঘোষণা করেছিল। ফরাসী দার্শনিক রেঁনা বলেছেন, ভাষা কিংবা জৈবিক ভিত্তিতে জাতি সৃষ্টি হয় না। জাতি হোল এক জীবন্ত আধ্যাত্মিক নীতির মূর্ত রূপ। কোন গৌরবোজ্জ্বল বা দুঃখময় অতীত স্মৃতির বন্ধন এবং একই রাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ হবার ইচ্ছাই একটি জনসমাজকে জাতিতে পরিণত করে। আলফ্রেড জিমার্নও এই অভিমত পোষণ করেছেন যে, যে-জনসমাজের মানুষ নিজেদের একটি জাতিসত্তার অঙ্গীভূত বলে মনে করে সেটিই হোল জাতি। জাতীয় জনসমাজের মধ্যে যখন রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার গভীরতা পরিলক্ষিত হয়, তখন সেই জাতীয় জনসমাজকেই জাতি বলা হয়। লর্ড ব্রাইসের মতে রাষ্ট্রনৈতিকভাবে সংগঠিত বহিঃশাসন থেকে সর্বপ্রকারে মুক্ত অথবা মুক্তিকামী একটি নির্দিষ্ট জনসমাজকে জাতি বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, যে-জনসমাজের মধ্যে ঐক্যবোধ ও পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা থাকে তাকে জাতীয় জনসমাজ বলে। কিন্তু যখন কোন জাতীয় জনসমাজ পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার বাস্তব রূপায়ণ ঘটায় কিংবা বাস্তব রূপায়ণের জন্য সচেষ্ট হয়, তখনই কেবলমাত্র তাকে জাতি বলে গণ্য করা হয়। গিলক্রিস্টের মতে, জাতি হোল রাষ্ট্র ছাড়া আরও কিছু; রাষ্ট্রকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে অর্থাৎ জাতি হোল রাষ্ট্রাধীন সুগঠিত একটি জনসমাজ (the unity of the people organised into one State)। হায়েস (Hayes) বলেছেন, একটি জাতীয় জনসমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে এবং সার্বভৌম স্বাধীনতা অর্জন করে জাতিতে পরিণত হয়। অনেকে জাতীয় জনসমাজ ও জাতিকে অভিন্ন বলে মনে করেন। তাঁরা জাতীয় জনসমাজকেই জাতি বলে অভিহিত করার পক্ষপাতী। রবীন্দ্রনাথের মতে, "অতীতে সকলে মিলিয়া ত্যাগদুঃখ স্বীকার এবং পুনর্বার সকলে মিলিয়া ত্যাগদুঃখ স্বীকার করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবার ভাব হইতে জনসাধারণকে যে একটি নিবিড় অভিব্যক্তি দান করে, তা-ই 'নেশন'। অতীতের গৌরবময় স্মৃতি ও সেই স্মৃতির অনুরূপ ভবিষ্যতের আদর্শ, একসঙ্গে দুঃখ বহনের বন্ধন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে। জাতির গঠন হয় মানুষেরই মতো—সুদীর্ঘ অতীতকালের প্রয়াস, ত্যাগস্বীকার ও নিষ্ঠার দ্বারা। নেশন হইল একটি সজীব সত্তা।" বার্ট্রেন্ড রাসেল (Bertrand Russel) জাতিকে শূকরের দল বা কাকের ঝাঁক বা গরুর পালের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

স্ট্যালিন (Stalin)-এর মতে, "জাতি হোল ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত এমন একটি স্থায়ী জনসমাজ যাদের ভাষা এক, বাসভূমি এক, অর্থনৈতিক জীবন এক, মানসিক গঠনও এক এবং এই মানসিক গঠন একটি

জাতির সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

স্ট্যালিনের অভিমত

সাধারণ সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়।" স্তালিনের প্রদত্ত সংজ্ঞাটি নিশ্চিতভাবেই বাস্তবধর্মী। কারণ এই সংজ্ঞায় জাতিকে ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত একটি স্থায়ী জনসমাজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

অংকশাস্ত্রের সাহায্যে জনসমাজ, জাতীয় জনসমাজ ও জাতির মধ্যে পার্থক্যের স্বরূপ নির্ণয় করা যেতে পারে :

জনসমাজ = ঐক্যবদ্ধ জনসমষ্টি − রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা

জাতীয় জনসমাজ = জনসমাজ + রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা

জাতি = রাষ্ট্রনৈতিকভাবে সচেতন জাতীয় জনসমাজ + জাতীয়তাবোধ।

(ঘ) **রাষ্ট্র ও জাতি (State and Nation) :** অনেকে জাতি ও রাষ্ট্রকে অভিন্ন বলে বর্ণনা করলেও গিলক্রিস্ট, হায়েস প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। হায়েসের মতে, একটি জাতীয় জনসমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে এবং সার্বভৌম স্বাধীনতা অর্জন করে জাতিতে রূপান্তরিত হয়। এরূপ ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন সার্বভৌম জনসমাজকে অনেক সময় রাষ্ট্র বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু হায়েস বলেন, রাষ্ট্র হোল প্রধানতঃ একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, জাতীয় জনসমাজ হোল প্রধানতঃ একটি সাংস্কৃতিক সত্তা যেখানে পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক তাৎপর্য এসেছে। বস্তুতঃ জাতিত্ব অর্জনের সংগে রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার বিশেষ সম্পর্ক থাকলেও একথা অনস্বীকার্য যে, রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটলেও জাতির উদ্ভব ঘটে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরাজিত জার্মানি, জাপান ইত্যাদি রাষ্ট্র কর্তৃত্ব হারালেও জাতিত্ব বিসর্জন দেয়নি। আবার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল কিন্তু অধিবাসীদের মধ্যে কেবলমাত্র রাজনৈতিক বন্ধন ছাড়া অন্য কোন বন্ধন না থাকায় তা জাতিতে পরিণত হয়নি। তবে বর্তমানে জাতীয় আন্দোলনের ফলে জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য ক্রমশঃই বিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে।

রাষ্ট্র ও জাতির মধ্যে পার্থক্য

২। জাতীয় সমাজের উপাদান (Elements of Nationality)

যে সব উপাদান কোন একটি জনসমাজকে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় জনসমাজে রূপান্তরিত করে সেগুলিকে জাতীয় জনসমাজের উপাদান বলা হয়। জাতীয় জনসমাজের উপাদানগুলি আবার জাতিগঠনে সহায়তা করে। এই উপাদানগুলিকে মূলতঃ দু'টি ভাগে বিভক্ত করা যায় যথা—বাহ্যিক উপাদান এবং ভাবগত উপাদান। বাহ্যিক উপাদানগুলির মধ্যে ভৌগোলিক সান্নিধ্য, বংশ, ভাষা ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে অভিন্ন রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ও ঐতিহাসিক ঐক্যকে ভাবগত উপাদান বলে গণ্য করা হয়।

বাহ্যিক ও ভাবগত উপাদান

(ক) **ভৌগোলিক ঐক্য (Geographical Unity) :** কোন একটি সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে জনসমষ্টি যদি সুদীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করে তবে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং ভাবের আদান-প্রদান চলতে থাকে। এর ফলে উক্ত ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনসমাজের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ঐক্য গড়ে উঠে। কিন্তু ভৌগোলিক সান্নিধ্যকে জাতীয় জনসমাজ গঠনের একান্ত অপরিহার্য

ভৌগোলিক ঐক্য

উপাদান বলে মনে করা হয়। প্যালেস্টাইন সৃষ্টির পূর্বে ইহুদি জাতি পৃথিবীর সর্বত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকলেও তাদের মধ্যে ঐক্যবোধের কোন অভাব ছিল না।

(খ) **বংশ (Race)**: যখন কোন জাতীয় জনসমাজের অন্তর্গত সকল ব্যক্তিই নিজেদের একই বংশোদ্ভূত বলে মনে করে তখনই তাদের মধ্যে একাত্মবোধ গড়ে উঠে।

বংশ

এই বংশগত ঐক্যবোধ জাতীয়তাবাদের কৃষ্টিতে এক উল্লেখযোগ্য উপাদান। হিটলার জার্মান জাতির বংশগত শ্রেষ্ঠত্বের কথা প্রচার করে জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রমাণ করেছেন যে, কোন জাতির মধ্যেই রক্তের বিশুদ্ধতা নেই। তাছাড়া, বংশগত ঐক্য জাতীয় জনসমাজ গঠনের অপরিহার্য উপাদান নয়। জার্মান, ইংরেজ, ওলন্দাজ প্রভৃতি জাতির মধ্যে বংশগত ঐক্য থাকলেও জাতীয় জনসমাজ হিসেবে তারা সম্পূর্ণ পৃথক। বরং তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হয়।

(গ) **ভাষা (Language)**: ভাষা হোল ভাবপ্রকাশের মাধ্যম। তাই ভাষার মধ্য দিয়েই একাত্মবোধ গড়ে উঠে। যখন একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে একটি সাধারণ

ভাষা

ভাষা প্রচলিত থাকে তখন সেখানকার জনগণের মধ্যে অতি সহজেই ঐক্য গড়ে উঠতে দেখা যায়। এই ভাষা জাতীয় সাহিত্য, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হয়ে দাঁড়ায়। জার্মান দার্শনিক ফিক্‌টে (Fichte)-এর মতে ভাষাই হোল জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির অন্যতম প্রধান উপাদান। কিন্তু ভাষার মধ্য দিয়ে জাতীয় ঐক্য আসে বলে অনেকে মনে করেন না। বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক থাকলেও ভারতবর্ষে জাতীয় ঐক্যের অভাব পরিলক্ষিত হয় না।

(ঘ) **ধর্ম (Religion)**: প্রাচীন ও মধ্যযুগে ধর্মীয় ঐক্য জাতি গঠনের একটি উপাদান বলে বিবেচিত হোত। অনেক আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জাতীয়তাবাদের

ধর্ম

সৃষ্টিতে ধর্মের প্রভাবকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। অধ্যাপক গিলক্রিস্ট (Gilchrist)-এর মতে, ধর্মবিশ্বাসের পার্থক্য যেখানে প্রবল সেখানে জাতিগত ঐক্য স্বল্পস্থায়ী হতে বাধ্য। ধর্মের ভিন্নতা হেতু ভারতবর্ষের বিভাজন এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করে। কিন্তু ধর্মগত অনৈক্য জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করে একথা বর্তমানে মেনে নেওয়া কষ্টকর। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র বহু-ধর্মীয় দেশ হলেও সেখানে জনগণের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের অভাব আদৌ দেখা যায় না।

(ঙ) **রাষ্ট্রীয় সংগঠন (Political Organisation)**: একই সরকারের অধীনে

রাষ্ট্রীয় সংগঠন

সুদীর্ঘকাল ধরে বসবাস করলে জনসাধারণের মধ্যে স্বাভাবিক-ভাবেই একাত্মবোধ গড়ে উঠে। ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড এবং ওয়েলসের জনগণ ব্রিটিশ সরকারের অধীনে থেকে ব্রিটিশ জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হতে সমর্থ হয়েছে।

(চ) **অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঐক্য (Economic Unity)**: জাতীয় জনসমাজ গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান হোল অর্থনৈতিক বন্ধন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এমন একটা আন্তরিক বন্ধন চাই যাতে জাতির বিভিন্ন অংশ একই সম্পূর্ণতার মধ্যে

গ্রথিত হয়। ইংল্যান্ড ও আমেরিকার মধ্যে এমন কোন বন্ধন না থাকায় তারা স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে গড়ে উঠেছে। জর্জিয়ানরা একই ভূখণ্ডে বাস করত, একই ভাষায় কথা বলত, তবু তারা একটি জাতি ছিল না। কারণ কতকগুলি অসংলগ্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত হওয়ার ফলে তারা একটি সাধারণ অর্থনৈতিক জীবন পায়নি; শতাব্দীর পর শতাব্দী তারা পরস্পরের মধ্যে লড়াই করেছে, লুণ্ঠন চালিয়েছে, পরস্পরের বিরুদ্ধে পার্সী ও তুর্কীদের সাহায্য গ্রহণ করেছে। "কোন কোন ভাগ্যবান রাজা কখনও কখনও এই রাষ্ট্রগুলিকে সংযুক্ত করতে পেরেছিলেন বটে, কিন্তু তা ছিল আকস্মিক ও ক্ষণস্থায়ী। অতে বড়জোর শাসনকার্যের ক্ষেত্রে উপর উপর একটি পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু রাজাদের খামখেয়ালী ও চাষীদের ঔদাসীন্যের ফলে অ আবার শীঘ্রই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। জর্জিয়াতে অর্থনৈতিক ঐক্য ছিল না, কাজেই এরকম হতে বাধ্য। উনিশ শতাব্দীর শেষার্ধে জর্জিয়াতে ভূমিদাস প্রথা ধ্বংস হয়ে দেশের অর্থনৈতিক জীবন গড়ে উঠল, যোগাযোগ ব্যবস্থা বর্ধিত হয়ে পুঁজিবাদের উদ্ভব হল, জর্জিয়ায় বিভিন্ন জেলার মধ্যে শ্রম বিভাগের পত্তন হল, রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা চুরমার হয়ে সেগুলি একটি একত্রবদ্ধ সম্পূর্ণতায় আবদ্ধ হল, শুধু তখনই জর্জিয়া একটি জাতি হিসেবে দেখা দিল। যেসব জাতি সামন্ততান্ত্রিক স্তর পার হয়েছে ও পুঁজিবাদ গড়ে তুলেছে তাদের সকলের সম্বন্ধে এই একই কথা। সুতরাং অর্থনৈতিক জীবনের ঐক্য, অর্থনৈতিক সংযোগ জাতির আর একটি বৈশিষ্ট্য।"

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঐক্য

(ছ) **ঐতিহ্যগত ঐক্য (Cultural Unity) :** সুদীর্ঘকাল ধরে একই ভূখণ্ডে বসবাস করলে জনসমাজের মধ্যে ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের ফলে ঐতিহ্যগত ঐক্য গড়ে উঠে। আচারব্যবহার, বংশ-ভাষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারতবাসীদের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকলেও তারা যে ভারতীয় ঐতিহ্যের সাধক—একথা ক্ষণকালের জন্যও বিস্মৃত . না। বার্নস (Burns) বলেছেন, রক্তের অভিন্নতা অপেক্ষা একটি যৌথ স্মৃতি এবং একটি যৌথ আদর্শ জাতিগঠনে অধিকতর সাহায্য করে। তাই ফরাসী অধ্যাপক রেনাঁ (Renan)-এর মতে, জাতীয় জনসমাজ সম্পর্কে ধারণা হোল মূলতঃ ভাবগত। এই ভাবগত ঐক্য দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল—অতীতের স্মৃতি এবং ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার আকাঙ্ক্ষা। একই জনসমাজে বসবাসকারী মানুষেরা যখন সুখ-দুঃখ, মান-অপমান প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই নিজেদের সম-অংশীদার বলে মনে করে তখনই জাতীয় জনসমাজের সৃষ্টি হয়। স্তালিনের মতে, "অবশ্য এই মানসিক গড়ন (যাকে আবার 'জাতীয় চরিত্র'ও বলা হয়) আলাদা করে দেখতে গেলে তার সংজ্ঞা দেওয়া যায় না; কিন্তু যেহেতু এটি এক একটি পৃথক সংস্কৃতির মধ্যে রূপ পায় যা গোটা জাতিটির পক্ষে সর্বজনীন, সেহেতু এর সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব এবং একে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য যে, 'জাতীয় চরিত্র' চিরনির্দিষ্ট কিছু নয়, জীবনধারণের অবস্থার বদলের সঙ্গে সঙ্গে এরও রূপান্তর হয়। কিন্তু যে-কোন নির্দিষ্ট সময়ে এর অস্তিত্ব রয়েছে বলে জাতির সাধারণ আকৃতির উপর এর ছাপ বসে যায়। সুতরাং মানসিক গড়নের ঐক্য, যা সংস্কৃতিগত ঐক্যের

ঐতিহ্যগত ঐক্য

মধ্যে প্রকাশিত হয়, তাও জাতির বৈশিষ্ট্য।" স্তালিন আরো বলেন, "অন্য যে-কোন ঐতিহাসিক ব্যাপারের মতো জাতিও যে পরিবর্তনের অধীন তা বলাই বাহুল্য; জাতিরও ইতিহাস আছে, আরম্ভ এবং শেষ আছে। জোর দিয়ে বলতে হয় যে, উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির কোন একটিকে আলাদা করে ধরলে শুধু তাই দিয়ে জাতির সংজ্ঞা নিরূপণ করা যায় না। অপরপক্ষে, কোন জাতি থেকে এর একটি বৈশিষ্ট্যও যদি বাদ পড়ে, তাহলেই তাকে আর জাতি বলা যায় না।" "এমন লোক পাওয়া সম্ভব যাদের 'জাতীয় চরিত্র' একই রকম। কিন্তু তারা যদি অর্থনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়, আলাদা আলাদা ভূখণ্ডে বাস করে, আলাদা আলাদা ভাষায় কথা বলে, কিংবা ঐ রকম আর কিছু করে তা হলেই তাদের আর জাতি বলা যায় না। এর উদাহরণ হল রাশিয়া, গ্যালিসিয়া, আমেরিকা, জার্জিয়া, ককেশিয়ান উচ্চভূমি প্রভৃতি জায়গার ইহুদীরা; আমাদের মতে তারা একটি জাতি নয়। আবার এমন লোকও পাওয়া যেতে পারে যাদের বাসভূমি ও অর্থনৈতিক জীবন এক: কিন্তু তবুও তাদের ভাষা এবং 'জাতীয় চরিত্র' এক না হলে তাদের একটি জাতি বলা যাবে না। বালটিক প্রদেশের জার্মান ও লেটরা এর উদাহরণ।" তাই স্তালিনের অভিমত হোল, "যখন কোন জন-সমাজে এই সব বৈশিষ্ট্যের প্রত্যেকটিই বর্তমান থাকে কেবল তখনই তাদের একটি জাতি বলে গণ্য করা যাবে।"

সমস্ত উপাদান বর্তমান না থাকলে জাতিগঠন হয় না

৩। জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি (Origin of the Ideal of Nationalism)

মানব-ইতিহাসের ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ক্রমবিবর্ধিত মানব-ইতিহাসের সব পর্যায়েই জাতির উদ্ভব হয়নি। জাতীয়তাবোধের ধারণার উৎপত্তি সাম্প্রতিক কালের ঘটনা মাত্র। প্রাচীন গ্রীস ও পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা নিজেদের জাতি হিসেবে কল্পনাও করতে পারত না। সেই যুগের সমাজব্যবস্থা ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। শক্তিশালী রাজার অধীনে বিপুল জনসংখ্যা সুদীর্ঘকাল একত্র বসবাস করলেও তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ (Nationality) গড়ে উঠেনি। জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভবের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহ্যগত পরিবেশের অভাবে জাতীয়তাবোধের ধারণার উদ্ভব হতে পারেনি।

প্রাচীনকালে জাতীয়তাবোধের উদ্ভব ঘটেনি

জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বার্নস (Burns) বলেছেন, নবজাগরণপ্রসূত সার্বভৌমকতার সঙ্গে ব্যাপক অধিকারসমূহের সমন্বয় সাধিত হওয়ার ফলে জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি হয়। ইউরোপে নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলনের সময় জাতীয়তাবোধের (nationality) ধারণার সূত্রপাত ঘটে। মধ্যযুগের পাশ্চাত্য সভ্যতা সমগ্র খ্রীষ্টজগতে ধর্মগুরু পোপকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। এই সময় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ বিভিন্ন প্রকার অধিকার ভোগ করত। নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব কোন সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তে অর্পিত ছিল না।

নবজাগরণ ও জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত

রোমান ক্যাথলিক চার্চ, পবিত্র রোমান সম্রাট, সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী, গিল্ড (Guild) প্রভৃতি কর্তৃপক্ষের হস্তে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার ছিল। ঐ সব কর্তৃপক্ষ পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ সম্প্রসারণের জন্য প্রায়শঃই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতেন। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সামন্তগণ রাজার প্রতি এবং সাধারণ মানুষ সামন্তদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করত। আবার ঐ সময়েই শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্নে রাষ্ট্র তথা রাজা ও চার্চের মধ্যে চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে সমাজে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। পোপের নৈতিক অধঃপতনের জন্য তাঁর কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। রাজা এই সুযোগে নিজের প্রাধান্য প্রতিপত্তি বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। সাধারণ মানুষ একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে যখন আন্তরিকভাবেই কামনা করছিল, ঠিক তখনই আবির্ভাব ঘটে 'জাতীয় রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের' (National Monarchical State)। রাজা রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন। ভূমিগত কর্তৃত্ব সামন্তবর্গের হাত থেকে রাজার হাতে চলে যায়। এই সময় বৈদেশিক আক্রমণ তথা যুদ্ধের ব্যাপক সম্ভাবনা থাকায় বণিকশ্রেণী তাদের ব্যবসাবাণিজ্যের নিশ্চয়তার জন্য রাজার প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য প্রদর্শন করতে শুরু করে। মধ্যযুগীয় সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা যখন রাজার শক্তিবৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল, তখন ইউরোপে শুরু হয় 'নবজাগরণ' (Renaissance)। 'নবজাগরণ' প্রকাশ পেল চার্চের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিদ্রোহে। এই সময় রোমান আইনের পুনরুজ্জীবন ঘটে। 'আইন রাজার ইচ্ছা' (Law is the will of the State) বলে প্রচার করা হয়। রাজার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্রগঠনের প্রচেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত হয়। সেই সঙ্গে মার্টিন লুথার (Martin Luther)-এর নেতৃত্বে 'সংস্কার আন্দোলন' (Reformation Movement) শুরু হলে পোপের কর্তৃত্বের পরিবর্তে রাজন্যবর্গের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে ইংল্যান্ডে টিউডর বংশের শাসন, স্পেনে পঞ্চম চার্লসের শাসন ও ফ্রান্সে চতুর্দশ লুই-এর কর্তৃত্বাধীনে জাতীয় রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

কিন্তু বার্নসের মতে, নবজাগরণ-প্রসূত সার্বভৌমিকতা (Renaissance Sovereignty) প্রকৃতিগতভাবে একটি জাতীয় আদর্শ (national ideal) বলে বিবেচিত না হলেও পরবর্তী সময়ে তা জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য রাজন্যবর্গ প্রজাদের দেশপ্রেমের (Patriotism) উপর গুরুত্ব আরোপ করে জাতীয় সংস্কৃতির (national cultures) গোড়াপত্তন করেন। ঐ সব রাজন্যবর্গ প্রচার করতে লাগলেন যে, রাজার ক্ষমতাই যেহেতু চূড়ান্ত, সেহেতু রাজার প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য প্রদর্শন করাই হোল দেশপ্রেমিক প্রজাদের প্রাথমিক ও পবিত্র কর্তব্য। এইভাবে দেশপ্রেমের নামে জাতীয়তাবোধ (national sentiment) জাগরিত করে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং রাজাকে সেই সার্বভৌম শক্তির অধীশ্বর বলে প্রচার করা হয়। কিন্তু বর্তমানে জাতীয়তাবাদ বলতে যা বোঝায় তার উৎপত্তি ঐ সময় হয়নি। জাতীয়তাবাদের ধারণা পরিপূর্ণতা লাভ করে ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের সময়।

১৭৮৯ সালে ফ্রান্সের জনগণ 'সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা'র বৈপ্লবিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, চার্চ প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সমকালীন দার্শনিকবৃন্দ জনগণের সার্বভৌমিকতা তত্ত্ব প্রচার করেন। তাঁদের মতে, জনগণই হোল সরকারের ক্ষমতার প্রধান উৎসস্থল। নিজেদের মনোনীত সরকার গঠন করার অধিকার জনগণ, তথা, প্রতিটি জাতির রয়েছে। এইভাবে জনগণের বৈপ্লবিক অধিকার তত্ত্ব প্রচারিত হওয়ার ফলে ফরাসী জনগণের মধ্যে দেশপ্রেমের আদর্শ ব্যাপক-ভাবে পরিব্যাপ্তি লাভ করে। প্রতিটি দেশপ্রেমিক মানুষ নিজের দেশকে ঐকান্তিকভাবে ভালবাসতে শুরু করে। সে নিজের দেশকে তার পবিত্র মাতৃভূমি, দেশের মানুষকে আপনজন এবং দেশের অস্তিত্বকে নিজের অস্তিত্ব বলে মনে করতে শুরু করে। ফরাসী বিপ্লবের এই জাতীয়তাবাদী আদর্শের বহ্নিশিখা সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশে ক্রমে ক্রমে সম্প্রসারিত হতে থাকে। ফলে ১৭৮৯-১৮৬০ সালের মধ্যে ঐ দুই মহাদেশে কতকগুলি বিপ্লব সংঘটিত হয়। ভিয়েনা সম্মেলনের (১৮১৫) পর মেটারনিক এই নব-জাগ্রত জাতীয়তাবাদের আদর্শকে অস্বীকার করে ইউরোপের মানচিত্রকে প্রাচীন ভাবধারার ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাসের জন্য সচেষ্ট হলে ইউরোপের বিভিন্ন অংশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গণবিপ্লবের আকারে আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৩০ সালে বেলজিয়াম একটি জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে। জোসেফ ম্যাট্‌সিনি ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রচার করেন। ম্যাট্‌সিনি, কাউন্ট কাভুর ও গ্যারিবল্ডির অক্লান্ত চেষ্টায় ১৮৭০ সালে ঐক্যবদ্ধ ইতালি জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ম্যাট্‌সিনি-প্রচারিত জাতীয়তাবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য দেশপ্রেমিক জনগণ সংগ্রাম শুরু করে।

বৈপ্লবিক অধিকারের ধারণা ও জাতীয়তাবাদ

সুতরাং ফরাসী বিপ্লব গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত করে—একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। ফরাসী বিপ্লবের তিনটি প্রধান আদর্শ—সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা—জাতির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা, তথা, জাতিকে ভালবাসাই একজন নাগরিকের সর্বাপেক্ষা বড় গুণ বলে প্রচার করে মানুষের মন থেকে সম্প্রদায়গত, ধর্মীয় ইত্যাদি সংকীর্ণতা বিদূরিত করে। এই বিপ্লব রাজার পরিবর্তে রাষ্ট্রের অন্তর্গত জনগণকে জাতি (nation) বলে বর্ণনা করে এবং সামগ্রিকভাবে জাতীয় কল্যাণ সাধনকে সরকারের পবিত্রতম কর্তব্য বলে প্রচার করে জাতীয়তাবাদের আদর্শকে পরিপূর্ণতা দান করে। সুতরাং ফরাসী বিপ্লবের গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা ও আদর্শ, জাতীয়তাবাদ ও 'জাতীয় সার্ব-ভৌমিকতা'র (National Sovereignty) আদর্শের ভিত্তি স্থাপন করে। বার্কারের মতে, জাতীয় সার্বভৌমিকতা বলতে জাতির সেই চরম অধিকার বোঝায় যার সাহায্যে প্রতিটি জাতি নিজেদের প্রতিনিধি কিংবা গণভোটের দ্বারা নির্বাচিত রাজার মাধ্যমে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। সুতরাং নবজাগরণ-প্রসূত সার্বভৌমিকতা ও ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত বৈপ্লবিক অধিকারসমূহের ফলেই জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি—বার্নসের এই উক্তি কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না।

উপসংহার

৪। রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে জাতীয়তাবাদ (Nationalism as Political Ideal)

জাতীয়তাবাদ হোল একটি ভাবগত ধারণা। বংশ, ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, সংহতি প্রভৃতি যে-কোন এক বা একাধিক কারণে যখন একটি জনসমাজের মধ্যে গভীর একাত্মবোধ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একাত্মবোধের জন্য ঐ জনসমাজের প্রত্যেকে সুখ-দুঃখ, ন্যায়-অন্যায় ও মান-অপমানের সমান অংশীদার বলে নিজেকে মনে করে, তখন তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়। এই জাতীয়তাবোধের সঙ্গে দেশপ্রেম মিলিত হয়ে যখন একটি রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ হিসেবে তা গড়ে উঠে তখন তাকে জাতীয়তাবাদ (Nationalism) বলে। সুতরাং জাতীয়তাবাদ মূর্ত হয়ে উঠে রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার মধ্যে। জাতীয় জনসমাজ জাতিতে পরিণত হলে জাতীয়তাবাদ যে রূপ পরিগ্রহ করে তাকে জাতির রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা বলে অভিহিত করা হয়। জাতির মধ্যে স্বাজাত্যবোধ বৃদ্ধি পেলে প্রতিটি জাতি নিজেদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি তোলে। এই দাবি বাস্তবে রূপায়িত হলে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং জাতীয়তাবোধ হোল এমন একটি শক্তি যা কিছু সংখ্যক মানুষকে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে একই রাষ্ট্রের অধীনে ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করার অনুপ্রেরণা যোগায়। বার্ট্রান্ড রাসেল জাতীয়তাবাদকে এমন একটি সাদৃশ্য ও ঐক্যের অনুভূতি (a sentiment of similarity and solidarity) বলে বর্ণনা করেছেন যা একে অপরকে ভালবাসতে শিক্ষা দেয়। সাধারণ ভাষা, সাধারণ বংশ, সাধারণ সংস্কৃত ইত্যাদির অনুভূতি একটি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে। কিন্তু যে সব উপাদান জাতিকে ঐক্যসূত্রে সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত করে সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হোল রাজনৈতিক বন্ধন। প্রতিটি জাতির মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগের আকাঙ্ক্ষাই জাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের ঐক্যবদ্ধ করে। সুতরাং রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে জাতীয়তাবাদ হোল জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের চরম পরিণতি। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে, মানুষের সঙ্গলিপ্সু প্রবৃত্তি (gregarious instinct) এবং স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছাই হোল জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। লেনিন বলেছেন, "জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলতে একমাত্র রাজনৈতিক অর্থে স্বাধীনতার অধিকারকে, অত্যাচারী জাতির বন্ধন থেকে অবাধ রাজনৈতিক পৃথকীকরণকেই বোঝায়। সুনির্দিষ্টভাবে বিচ্ছেদের জন্য এবং যে জাতি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাদেরই গণভোটে বিচ্ছেদ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রচার-অভিযান চালাবার পূর্ণ স্বাধীনতাই হল রাজনৈতিক গণতন্ত্রের এই দাবির অন্তর্নিহিত অর্থ। সুতরাং এই দাবিকে পৃথকীকরণের, টুকরো-টুকরো-করণের এবং ছোট ছোট রাষ্ট্র গঠনের দাবির সমান করে দেখলে চলবে না। এই দাবি বলতে শুধু এক জাতির উপর অপর এক জাতির সর্বপ্রকার অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দৃঢ় অভিব্যক্তিকেই বোঝায়।" সুতরাং জাতীয়তাবাদের সুমহান্ আদর্শ গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার অনুপন্থী হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষকে মুক্তি-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছে। জাতীয়তাবাদ মানুষকে নিজের জাতিকে ভালবাসতে শিক্ষা দেয়; কিন্তু তাই বলে অন্য জাতিকে ঘৃণা করতে শিক্ষা দেয় না। এই আদর্শ জাতিকে আত্মপ্রত্যয়ের যেমন শিক্ষা দেয়, তেমনি

আদর্শ জাতীয়তাবাদের অর্থ ও প্রকৃতি

সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা যোগায়। ইতালীয় জাতীয়তাবাদের জনক ম্যাটসিনি মনে করতেন, প্রতিটি জাতির মধ্যে কোন-না-কোন বিষয়ে অন্তর্নিহিত প্রতিভা আছে। তিনি মানবসমাজকে 'স্বাজাত্যাভিমানী বিভিন্ন জাতীয় সমবায়' বলে বর্ণনা করেছেন। এই সব জাতি যদি পারস্পরিক সহযোগিতা ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হতে পারে তা হলে মানবসমাজের কল্যাণ ও উন্নতি যে সাধিত হবে এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করার কোন অবকাশ নেই। বস্তুতঃ আদর্শ জাতীয়তাবাদ 'নিজে বাঁচ, অপরকে বাঁচতে দাও' (Live and let others live)—এই সুমহান্ আদর্শ প্রচার করে বিশ্বসভ্যতায় প্রগতির পথ উন্মুক্ত করেছে। এই বিশেষ ঐক্যানুভূতি মানুষকে নব নব শিল্প, সাহিত্য, চারুকলা প্রভৃতি সৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়ে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছে। সমষ্টির প্রয়োজনে ব্যবহৃত জাতীয় সম্পদ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির পথ প্রশস্ত করে আন্তর্জাতিক দরবারে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা—এই তিনটি রাজনৈতিক আদর্শই জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি। রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে জাতীয়তাবাদের মূল্যায়ন করতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয় যে, জাতীয়তাবাদ প্রতিটি জাতির অন্তর্নিহিত প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের গণতান্ত্রিক নীতিতে আস্থাশীল। এইভাবে প্রতিটি জাতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করে সামগ্রিকভাবে সমগ্র মানবসমাজের বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। 'নিজে বাঁচ, অপরকে বাঁচতে দাও' এই নীতি জাতীয়তাবাদের মূলমন্ত্র হওয়ায় জাতিতে জাতিতে সৌহার্দ্যপূর্ণ বন্ধুত্ব গড়ে উঠে ; কেউ কাউকে ঘৃণা বা বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখে না। সুতরাং এরূপ জাতীয়তাবাদ মানব সভ্যতার পরিপন্থী নয়, বরং তার অনুপন্থী বা সহায়ক।

সপক্ষে যুক্তি

দ্বিতীয়তঃ জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম হোল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম মাত্র। নবজাগরণের সময় যে জাতীয়তাবোধের সূত্রপাত হয় এবং পরবর্তী সময়ে ফরাসী বিপ্লবের সময়ে যা পরিপূর্ণতা লাভ করে অনেকের মতে তা নিঃসন্দেহে একটি বৈপ্লবিক আদর্শ। এই আদর্শ পরবর্তী সময়ে উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার আদর্শের জন্মদাতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এই জাতীয়তাবাদী আদর্শ বিভিন্ন জাতিকে নিজেদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার তথা বৈদেশিক শাসনের বন্ধনমুক্তির সংগ্রামে অনুপ্রেরণা দান করে। বর্তমানে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার মুক্তিকামী মানুষ পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করার জন্য জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন এবং তাদের অধিকাংশই সেই সংগ্রামে জয়যুক্ত হয়েছেন।

জাতীয়তাবাদের আদর্শ যখন সংকীর্ণ স্বার্থের গণ্ডি অতিক্রম করে বৃহত্তর প্রয়োজনে মানুষকে ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে এবং বিশেষ একটি সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে তখন তা নিঃসন্দেহে একটি মহান্ রাজনৈতিক আদর্শ। কিন্তু আধুনিক জাতীয়তাবাদ সেই মহান্ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছে। জাতীয়তাবাদ যখন আদর্শভ্রষ্ট হয়ে সংকীর্ণ স্বাদেশিকতায় পরিণত হয়, তখন তাকে বিকৃত জাতীয়তাবাদ

বিপক্ষে যুক্তি

বলে অভিহিত করা হয়। স্বাদেশিকতা বলতে স্বদেশ ও স্বজনের প্রতি অনুরাগ বোঝায়। স্বাদেশিকতা একটি মহান্ আদর্শ। কিন্তু উগ্র স্বাদেশিকতা সংকীর্ণ জাত্যভিমানকে ডেকে আনে। সংকীর্ণ জাত্যভিমান প্রতিটি জাতিকে একথা ভাবতে শিক্ষা দেয় যে, নিজের জাতির ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা হোল অন্যান্য জাতির ভাষা, ধর্ম ইত্যাদি থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ। এরূপ বিকৃত জাতীয়তাবাদ এক জাতির স্বার্থের সঙ্গে অন্য জাতির স্বার্থের সংঘাত ঘটায়। নিজেদের জাতীয় স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কিংবা জাতীয় স্বার্থের সম্প্রসারণের জন্য জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ দেখা দেয়। এই অনিয়ন্ত্রিত জাতীয়তাবাদ উগ্র রূপ ধারণ করলেই মানবসভ্যতার সংকট ঘনীভূত হয়। সবল জাতির আক্রমণে দুর্বল জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি প্রভৃতি বিপন্ন হয়।

বিকৃত জাতীয়তাবাদ মানবসভ্যতার পরিপন্থী

ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বলা যায়, একচেটিয়া ধনতন্ত্রের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদ বিকৃত রূপে পরিগ্রহ করতে শুরু করে। বুর্জোয়া-শ্রেণী সর্বপ্রথম সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করার জন্য এবং পরে ধনতন্ত্রবাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয়তাবাদকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। পরবর্তী সময়ে ধনতন্ত্রবাদের বিকাশের ফলে ধনতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি প্রবল আকার ধারণ করলে জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয়। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে, বর্তমান বিশ্বের শিল্প সংগঠনের পরিণতি এবং আধুনিক যুদ্ধকৌশলের অভাবনীয় উন্নতি রাষ্ট্রকে মানবতার বিরুদ্ধে এক সর্বনাশা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অত্যধিক মুনাফালাভের আশায় জাতীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি বিদেশী বাজারের প্রসার, কাঁচামাল সংগ্রহ, বিদেশে মূলধন বিনিয়োগ ইত্যাদির দিকে বিশেষ মনোযোগী হয়ে উঠে। ব্যবসাবাণিজ্যের সম্প্রসারণের জন্য উপনিবেশ গঠনের প্রয়োজনীয়তা একান্তভাবেই অনুভূত হয়। এইভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস হোল জাতীয়তাবাদের উন্মাদনায় উন্মত্ত ইউরোপীয় বুর্জোয়া জাতীয় রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দুর্বল ও অনুন্নত জাতিগুলির স্বাধীনতা অপহরণ ও অর্থনৈতিক শোষণের ইতিহাস মাত্র। এই সাম্রাজ্যবাদী জাতীয়তাবাদ সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি বিস্তার করে। নিজেদের শোষণভিত্তিক অত্যাচারী ঔপনিবেশিক শাসনের সপক্ষে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি নতুন নতুন যুক্তিতর্কের অবতারণা করতে শুরু করে। কিপলিং এর 'শ্বেতাঙ্গের বোঝা', 'নর্ডিক কুলের উৎকর্ষ' (Superiority of the Nordic Race) ইত্যাদি যুক্তির অবতারণা করে ঔপনিবেশিক শাসনের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে উপনিবেশ হিসেবে রাখার জন্য যুক্তির অবতারণা করত যে, অসভ্য ও বর্বর ভারতীয়দের শিক্ষিত ও সুসভ্য করার পবিত্র দায়িত্ব ইংরেজদের। হিটলার জার্মান জাতিকে প্রকৃত আর্য জাতি বলে বর্ণনা করে অনার্য জাতিসমূহের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করার তার অধিকার আছে বলে প্রচার করে বহু রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা ও স্বাধীনতা অপহরণ করেন। এই বিকৃত জাতীয়তাবাদের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে হায়েস্ মন্তব্য করেন যে, আমাদের যুগে জাতীয়তাবোধ, জাতীয় রাষ্ট্র ও দেশপ্রেমের সংমিশ্রণে যে জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়েছে তা চরম অন্যায়

ও অমঙ্গলের প্রধান উৎসস্থলে পরিণত হয়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নৈবেদ্য' নামক কাব্যগ্রন্থে এই বিকৃত স্বার্থপর জাতীয়তাবাদের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন :

"স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত ; লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম ; প্রলয় মন্থন ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।"

অনেকে মনে করেন যে, জাতীয় রাষ্ট্রগুলিই যুদ্ধের কারণ। তাই যুদ্ধ প্রতিরোধ ও আন্তর্জাতিকতার সম্প্রসারণের জন্য জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রগুলির অবসান ঘটানো প্রয়োজন। কিন্তু এ ধারণা ভুল। আমাদের যুগে যুদ্ধের প্রকৃত কারণ হোল একচেটিয়া পুঁজিবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ। এই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি পররাজ্য গ্রাস করে, লুণ্ঠন করে এবং পদানত জাতিগুলির ভাগবাটোয়ারা নিয়ে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বাধায়। সুতরাং যুদ্ধ প্রতিরোধের উপায় হোল সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিরোধ করা এবং পদানত ও নিপীড়িত জাতিগুলির মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন করা। বস্তুতঃ বিকৃত জাতীয়তাবাদই হোল মানবসভ্যতার সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু। যখন পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি অপর জাতিকে পদানত করার জন্য, লুণ্ঠন করার জন্য এবং তাদের স্বাধীনতা অপহরণ করার জন্য দেশপ্রেমের মত মহৎ মানসিক বৃত্তির বিকৃতি ঘটায়, তখনই বিকৃত জাতীয়তাবাদের (Perverted Nationalism) উদ্ভব ঘটে। বর্তমানে আবার বিত্তশালী পুঁজিপতি রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণী বিভিন্ন দুর্বল ও অনগ্রসর জাতিকে অর্থ সাহায্যের নামে তাদের অর্থনৈতিক দিক থেকে শোষণ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র যখন বৃহৎ পুঁজিপতি রাষ্ট্রগুলির উপর অর্থনৈতিক দিক থেকে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তখন তাদের রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়। এরূপ অর্থনৈতিক শোষণ 'অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ' (Economic Imperialism) নামে পরিচিত। সুতরাং আদর্শ জাতীয়তাবাদ বিশ্বশান্তি ও মানবসভ্যতার শত্রু নয়—বিকৃত জাতীয়তাবাদই, যা সাম্রাজ্যবাদের নামান্তর মাত্র—হোল বিশ্বশান্তি, মানবসভ্যতা ও আন্তর্জাতিকতার প্রধানতম শত্রু।

যুদ্ধের প্রকৃত কারণ একচেটিয়া পুঁজিবাদ

বিকৃত জাতীয়তাবাদ মানবসভ্যতার পরিপন্থী

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে জাতীয়তাবাদকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা—ক. বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ এবং খ. প্রলেতারীয় জাতীয়তাবাদ। বুর্জোয়া সমাজে উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিক বুর্জোয়া শ্রেণী হওয়ার ফলে সামাজিক সংযোগসাধনের যাবতীয় ব্যবস্থা, যথা—পত্রপত্রিকা, পুস্তকপুস্তিকা, বেতার, দূরদর্শন ইত্যাদি ঐ শ্রেণী কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। স্বাভাবিকভাবে উক্ত শ্রেণী সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে

বুর্জোয়া ও প্রলেতারীয় জাতীয়তাবাদ

অতি সহজেই নিজেদের শ্রেণী-কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়। সুতরাং এরূপ সমাজের জাতীয়তাবাদ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ মাত্র। কিন্তু যে সমাজে সর্বহারা শ্রেণীর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত, সেখানে সামাজিক সংযোগ সাধনের ব্যবস্থাগুলি উক্ত শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকায় যে জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয় তাকে প্রলেতারীয় বা সর্বহারা-শ্রেণীর জাতীয়তাবাদ বলে অভিহিত করা হয়। এরূপ জাতীয়তাবাদ বিশ্বশান্তি, মানবসভ্যতা এবং আন্তর্জাতিকতার সহায়ক, শত্রু নয়।

৫। জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (Right of Self-determination)

যখন কোন আত্মসচেতন জাতীয় জনসমাজ নিজের পৃথক সত্তা ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করার জন্য একটি নিজস্ব রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে নিজের রাজনৈতিক ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার দাবি জানায়, তখন তাকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (Right of self-determination) বলে অভিহিত করা হয়। যে সমস্ত জাতি তাদের রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত তারা নিজেদের জাতীয় ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্যই একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বা সরকারের প্রত্যক্ষ সাহায্য ও সহযোগিতায় সেই জাতিটি নিজের ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে অগ্রগতির চেষ্টা করে। সুতরাং 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' (One Nation, One State)—এই শ্লোগানই হোল আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার মৌলিক নীতি।

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলতে কি বোঝায়

লেনিনের মতে, "জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলতে একমাত্র রাজনৈতিক অর্থে স্বাধীনতার অধিকারকে, অত্যাচারী জাতির বন্ধন থেকে অবাধ রাজনৈতিক পৃথকীকরণের অধিকারকেই বোঝায়। সুনির্দিষ্টভাবে বিচ্ছেদের জন্য এবং যে জাতি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাদেরই গণভোটে বিচ্ছেদ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রচার অভি[যা]ন চালাবার জন্য স্বাধীনতাই হল রাজনৈতিক গণতন্ত্রের এই দা[বি]র অন্তর্নিহিত অর্থ। সুতরাং এই দাবিকে পৃথকীকরণের, টুকরো-টুকরো করণের এবং ছোট ছোট রাষ্ট্র গঠনের দাবির সমান করে দেখলে চলবে না। এই দাবি বলতে শুধু এক জাতির উপর অপর এক জাতির সর্বপ্রকার অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দৃঢ় অভিব্যক্তিই বোঝায়। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পূর্ণ স্বাধীনতা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় যতই স্বীকৃত হতে থাকবে, কার্যক্ষেত্রে পৃথকীকরণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ততই হ্রাস পেতে থাকবে; কারণ অর্থনৈতিক উন্নতি আর জনস্বার্থ—এই উভয় দিক থেকেই বড় বড় রাষ্ট্রে যে অনেক সুযোগসুবিধা পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে তর্কের কোন অবকাশ নেই, অধিকন্তু ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই সব সুযোগসুবিধাও বাড়তে থাকে। নীতি হিসেবে ফেডারেশনকে স্বীকার করে নেওয়া আর আত্মনিয়ন্ত্রণকে স্বীকার করে নেওয়া এক জিনিস নয়। কোনো ব্যক্তি ঐ নীতির তীব্র বিরোধী এবং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সমর্থক ও প্রচারক হতে পারেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের তাৎপর্য: লেনিন ও স্তালিনের অভিমত

কেন্দ্রিকতার দিকে অগ্রসর হবার একমাত্র পথ হিসেবে তিনি জাতীয় অসাম্যের পরিবর্তে ফেডারেশনকেই পছন্দ করবেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই মার্কস আয়াল্যান্ডের ইংল্যান্ডের পদানত হয়ে থাকার চেয়ে, এমন কি আয়াল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের ফেডারেশনের পক্ষেই মত দিয়েছিলেন অথচ মার্কস ছিলেন গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সমর্থক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে মানবজাতিকে বিভক্ত করে রাখার এবং জাতিসমূহকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার সকল রকম রূপের অবসান করাই শুধু নয়, জাতিসমূহের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপনই শুধু নয়, তাদের একত্রীকরণও সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য।" তিনি আরো মন্তব্য করেন, "মানবজাতি যেমন অত্যাচারিত শ্রেণীর একনায়কত্বের উত্তরণকালের মধ্য দিয়েই শুধু শ্রেণীসমূহের বিলুপ্তির স্তরে পৌঁছাতে পারে ঠিক সেভাবেই মানবজাতি সকল নিপীড়িত জাতির পূর্ণ মুক্তির, অর্থাৎ তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার স্বাধীনতা উত্তরণকালের মধ্য দিয়েই শুধু জাতিসমূহের অবশ্যম্ভাবী একীকরণের স্তরে পৌঁছাতে পারে।...নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের সীমানার অভ্যন্তরে অত্যাচারিত জাতিসমূহকে জোরজবরদস্তি করে রাখার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীকে সংগ্রাম করতে হবে। এর অর্থ হোল—আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য তাদের সংগ্রাম করতে হবে, উপনিবেশের জন্য এবং 'নিজেদের' জাতি কর্তৃক নিপীড়িত জাতিসমূহের জন্য রাজনৈতিক পৃথকীকরণের স্বাধীনতা প্রলেতারিয়েতকেই দাবি করতে হবে। এর উল্টো কথা যদি সত্য হয়, তাহলে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদ শূন্যগর্ভ কথাই হয়ে দাঁড়াবে; অত্যাচারিত আর অত্যাচারী জাতিগুলির শ্রমিকদের মধ্যে আস্থা বা শ্রেণী-সংহতি বলে কিছুই থাকবে না। স্তালিন (Stalin)-এর মতে, "নিজের ভাগ্য নিরূপণ করার অধিকার শুধু জাতির নিজেরই হাতে—এই হল আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের অর্থ। জাতির জীবনে জবরদস্তি হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারও নেই, তার স্কুল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করার অধিকার কারও নেই, আচার ব্যবহারের অন্যথা করার অধিকার কারও নেই, তার ভাষাকে দমন করা বা তার অধিকারকে সঙ্কুচিত করার অধিকারও নেই—এই হল আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের অর্থ। তা বলে জাতির প্রত্যেকটি আচার ও প্রতিষ্ঠানকেই সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা সমর্থন করবে এমন কোন কথা নেই। কোন জাতির উপর বলপ্রয়োগের বিরোধিতা করতে গিয়ে তারা শুধু এই দাবিরই সমর্থন করবে যে, আপন ভাগ্য নিরূপণের অধিকার সেই জাতির হাতেই চাই। সঙ্গে সঙ্গে সেই জাতির যে কোন অনিষ্টকর আচার ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও তারা আন্দোলন করবে, যাতে সেই জাতির শ্রমিকশ্রেণী ঐ সব অনিষ্ট থেকে মুক্ত হতে পারে।"

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার তত্ত্বের উদ্ভব প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে মহামতি লেনিন বলেন, "জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিই শুধু নয়, আমাদের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক কর্মসূচির সকল বিষয়ই পেটিবুর্জোয়ারা অনেক আগেই—সেই সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতেই জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেছিল।" সেই দিন থেকে শুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত পেটিবুর্জোয়ারা সেগুলিকে স্বপ্নাশ্রয়ী পদ্ধতিতেই প্রকাশ করেছে। কারণ 'শান্তিপূর্ণে" গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বলে তারা শ্রেণীসংগ্রামকে এবং গণতন্ত্রে সেই শ্রেণীসংগ্রামের ক্রমবর্ধমান তীব্রতা লক্ষ্য করতে সক্ষম হয়নি। বস্তুতঃ ১৭৭২ সালে

পোল্যান্ড দ্বি-খণ্ডিত হওয়ার সময় থেকে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার তত্ত্ব অর্থাৎ 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' তত্ত্বটি প্রচারিত হয় এবং উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তা প্রবল আকার ধারণ করে। ইতালীয় দার্শনিক ম্যাটসিনি প্রচার করেন যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভাগ্য নির্ধারণ করার অধিকার রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসমাজের স্বাভাবিক অধিকার এবং বিশ্বজনীনভাবে এই অধিকার স্বীকৃত হলে পৃথিবীতে আর কোন রাজনৈতিক সমস্যা থাকবে না। জন স্টুয়ার্ট মিল বলেন, "জাতীয় জনসমাজের সীমারেখা রাষ্ট্রের সীমারেখার সমান হওয়া উচিত।" বার্ট্রান্ড রাসেল-ও অনুরূপ মন্তব্য করেন। তাঁর মতে, "কোন জনসমাজকে তাদের নিজস্ব জাতীয় সরকার ছাড়া অন্য কোন সরকারের শাসনাধীনে থাকতে বাধ্য করা আর একটি নারীকে যে ঘৃণা করে এমন পুরুষকে বিবাহ করতে বাধ্য করা একই জিনিস।"

জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের তত্ত্বটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের মানুষের মনে বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য আদর্শ বলে বিবেচিত হয়। ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর পেট্রোগ্রাদে লেনিন ঘোষণা করেন যে, সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে জার-শাসিত রাশিয়ায় অত্যাচারিত জাতিসমূহকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও জাতীয় স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে। ১৯১৮ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসন (Wilson) জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার তত্ত্বের সমর্থনে কংগ্রেসে জোরালো বক্তব্য উপস্থিত করেন। সান ইয়াৎ সেন (Sun Yat-sen)-এর মতে, বলশেভিক বিপ্লব ও সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার তত্ত্ব বলিষ্ঠভাবে প্রচার হওয়ায় এশিয়ার বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতার জন্য রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়।

সপক্ষে যুক্তি (Arguments for) : 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' বা আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবির সপক্ষে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করা হয় :

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার গণতন্ত্রসম্মত

[১] একটি রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে একটিমাত্র জাতি বাস করলে সেই জাতিভুক্ত জনসাধারণ নিজেদের নির্বাচিত সরকার গঠনের সুযোগ পায়। এই সরকার গঠনের অধিকার গণতান্ত্রিক নীতিসম্মত। কিন্তু বহুজাতি রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু জাতিগুলি কখনই সরকার গঠনের সুযোগ পায় না। বলা বাহুল্য, সরকার গঠনে তাদের কোন ভূমিকা না থাকায় তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহও স্বাভাবিকভাবে উপেক্ষিত হতে দেখা যায়। অথচ বহুজাতি রাষ্ট্রের সরকারের ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রতিটি জাতিকে কর (Tax) প্রদান করতে হয়। এইভাবে বহুজাতি রাষ্ট্র গণতন্ত্রসম্মত নয় বলে অনেকে মনে করেন।

জাতীয় গুণাবলী বিকাশের সহায়ক

[২] প্রতিটি জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি, প্রতিভা, ঐতিহ্য ইত্যাদি থাকে। এই সকল জাতীয় গুণাবলীর পরিপূর্ণ বিকাশ কেবলমাত্র জাতীয় সরকারের মাধ্যমেই ঘটতে পারে। কিন্তু একটি রাষ্ট্রে বহুজাতি থাকলে সংখ্যালঘু জাতির গুণাবলী বিকাশের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হয় না। ফলে সুদীর্ঘকাল ধরে উপেক্ষিত সংখ্যালঘু জাতিসমূহ পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে শান্তি, সংহতি ও জাতীয় অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

[৩] ন্যায়নীতিবোধের দিক থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি স্বীকার করে নেওয়া

উচিত বলে অনেকে মনে করেন। কারণ বহুজাতি-সমন্বিত রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু দুর্বল জাতিগুলিকে বলপূর্বক সবল জাতির নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়। কিন্তু নৈতিকতার দিক থেকে বিচার করে একে কোনমতেই সমর্থন করা যায় না। কারণ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ভাগ্যকে নির্ধারণ করার অধিকার প্রতিটি জাতির থাকা উচিত। এই ন্যায়সঙ্গত দাবি স্বীকৃতিলাভ করলেই সবলের দ্বারা দুর্বলের উপর অত্যাচারের পথ বন্ধ হবে।

নৈতিকতার দিক থেকে সমর্থনযোগ্য

[৪] প্রতিটি জাতির নিজস্ব রাষ্ট্র ও নিজস্ব সরকার থাকলেই কেবলমাত্র সেই জাতি নিঃসন্দেহে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে উন্নতিলাভ করতে পারে। বিশ্বব্যাপী সভ্যতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি প্রভৃতির উন্নতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা গড়ে উঠবে। এই প্রতিযোগিতার ফলে বিশ্বে সর্বক্ষেত্রে প্রগতি এবং অগ্রগতি স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং সভ্যতার অগ্রগতির জন্য, বিশ্ব সংস্কৃতির সমৃদ্ধির জন্য জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়, "বৈচিত্র্য এবং অনেক সময় বিরোধী প্রবৃত্তি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নেশন সভ্যতা বিস্তার করিতে সহায়তা করিতেছে। মনুষ্যত্বের মহাসংগীতে প্রত্যেকে এক একটি সুর যোগ করিয়া দিতেছে, সবটা একত্রে মিলিয়া বাস্তবলোক যে একটি কল্পনাগম্য মহিমার সৃষ্টি করিতেছে, তাহা কাহারও একক চেষ্টার অতীত।"

বিশ্বসভ্যতার বিকাশে সাহায্য করে

[৫] যখন একটি সরকার একটিমাত্র জাতির দ্বারা নির্বাচিত হয়, তখন সেই সরকার বিপুলভাবে জনসমর্থন লাভ করে। সরকারের আইনগুলির প্রতি জনসাধারণ তাদের আনুগত্য প্রদর্শন করে। কারণ সেই আইনগুলি তাদের স্বাধীনতা রক্ষার অতন্দ্র প্রহরীস্বরূপ। এইভাবে এক-জাতি সমন্বিত রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সমন্বয় সাধন করা সহজসাধ্য হয়।

ব্যক্তিস্বাধীনতার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সমন্বয় সাধন সম্ভব

বিপক্ষে যুক্তি (Arguments against) : আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবির সপক্ষে পূর্বোক্ত যুক্তিসমূহ প্রদর্শিত হলেও বর্তমানে নানা দিক থেকে নীতিটির সমালোচনা করা হয়ে থাকে।

(ক) বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক লর্ড অ্যাক্টন (Lord Acton) জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের বিরুদ্ধে মত পোষণ করতে গিয়ে বলেন যে, একটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন জাতির অবস্থিতি সেই রাষ্ট্রের সভ্যতা, সংস্কৃতি প্রভৃতিকে উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কারণ বহুজাতি-সমন্বিত রাষ্ট্রে সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে অনগ্রসর জাতিসমূহ অগ্রসর জাতির সান্নিধ্যে থেকে সভ্য হয়ে উঠে। তাদের আচার-আচরণ, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই অগ্রগতি সাধিত হতে পারে। তাছাড়া, ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতিটি জাতির মধ্যে কোন-না-কোন দিকে পারদর্শিতা থাকেই। বহুজাতি অধ্যুষিত রাষ্ট্রে পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের ফলে যে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সৃষ্টি হয় তা নিঃসন্দেহে উচ্চমান-সম্পন্ন। তাই লর্ড অ্যাক্টন বলেছেন, যেখানে একটি রাষ্ট্রের সীমারেখার মধ্যে কেবলমাত্র একটি জাতি বাস করে সেখানে জনসমাজ অনগ্রসর হতে বাধ্য।

জনসমাজ অনগ্রসর হতে বাধ্য

(খ) অনেকের মতে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারটির বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব নয় এবং তা সম্ভব হলেও বাঞ্ছনীয় নয়। বহুজাতিক রাষ্ট্রে একাধিক জাতি সুদীর্ঘকাল ধরে বসবাস করার ফলে যে একাত্মবোধের সৃষ্টি হয় এই নীতিটিকে বাস্তবে কার্যকরী করতে গেলে ঐ সব জাতির মধ্যে শুধু যে ঐক্যবোধ বিনষ্ট হবে তাই নয়, সেইসঙ্গে গুরুতর অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সঙ্কটও দেখা দিতে পারে। এই নীতিটি মেনে নিলে ইংল্যান্ড চারটি এবং সুইজারল্যান্ড তিনটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়বে।

বাস্তব প্রয়োগ অসম্ভব : আর সম্ভব হলেও তা অবাঞ্ছনীয়

(গ) ভৌগোলিক কারণে আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতিকে অনেকে গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করেন। প্রকৃতিদত্ত একটি ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে অনেক সময় একাধিক জাতি পাশাপাশি বাস করে। প্রতিটি জাতির জন্য পৃথক রাষ্ট্রের সৃষ্টি করা হলে স্বাভাবিকভাবেই প্রাকৃতিক সম্পদও রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়বে। ফলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা রাষ্ট্রের অগ্রগতির পথকে রুদ্ধ করে দিতে পারে।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়

(ঘ) একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী বহু-জাতি রাষ্ট্রকে যদি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত করা হয় তাহলে যে রাষ্ট্রগুলির জন্ম হবে তারা যে শুধু আকৃতিতেই ক্ষুদ্র হবে তা নয়, প্রকৃতিতেও তারা হবে শক্তিহীন। এই সব শক্তিহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র কখনই আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি এবং রাজনীতি গড়ে তুলতে সক্ষম হবে না। তাদের এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি তাদের গ্রাস করে নিতে পারে। কিংবা তাদের বশংবদ করে গড়ে তুলতে পারে, তাই 'এক-জাতি এক-রাষ্ট্র' তত্ত্বটিকে সমর্থন না করাই শ্রেয় বলে অনেকে মত পোষণ করেন।

সাম্রাজ্যবাদের প্রসার ঘটে

(ঙ) অনেকের মতে, আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিটি সীমাহীন। এই নীতির উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র পুনর্গঠনের কার্য একবার শুরু হলে সেই দাবি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতেই থাকে। প্রতিটি ক্ষুদ্র জাতি তখন আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি জানাতে শুরু করে। বলা বাহুল্য, তাদের সেই দাবি পূরণের অর্থই হোল একটি শক্তিশালী জাতিকে শক্তিহীন কতকগুলি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে পরিণত করা। তাই লর্ড কার্জন (Lord Curzon) আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে এমন একটি অস্ত্র বলে বর্ণনা করেন যার দুদিকেই ধার আছে। কারণ এই নীতিটি যেমন একদিকে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন একটি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার অনুপ্রেরণা যোগায়, অন্যদিকে তেমনি ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের সংহতি নষ্ট করে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা, সন্দেহ, বিদ্বেষ প্রভৃতির জন্ম দেয়। এর ফলে যুদ্ধের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়।

আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি সীমাহীন

(চ) আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, এক-জাতি-সমষ্টি রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা বহু-জাতি রাষ্ট্রগুলি অনেক বেশী উন্নত ও শক্তিশালী। সোভিয়েত রাশিয়া, ইংল্যান্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রের কথা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। এই রাষ্ট্রগুলি জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি প্রভৃতি সব বিষয়েই এক-জাতি রাষ্ট্র অপেক্ষা অনেক বেশী অগ্রসর এবং

অভিজ্ঞতার যুক্তি

শক্তিশালী। তাই বাস্তব অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে বিচার করে এক-জাতি রাষ্ট্র অপেক্ষা বহু-জাতি রাষ্ট্র অধিকতর কাম্য বলে মনে করাই সঙ্গত।

জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের বিরুদ্ধে উপরি-উক্ত যুক্তিগুলির অবতারণা করা হলেও একথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমানে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম চলছে তাকে সমর্থন করতেই হয়। কারণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার যখন জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের আকার ধারণ করে, তখন সেই দাবি অস্বীকার করার অর্থই হোল মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে অস্বীকার করা।

উপসংহার

৬। আন্তর্জাতিকতা (Internationalism)

আন্তর্জাতিকতা (Internationalism) বলতে কি বোঝায় তা নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। কোন কোন শান্তিবাদী দার্শনিক এবং চিন্তাবিদ্ মনে করেন যে, জাতীয় রাষ্ট্রগুলিই বর্তমান বিশ্বে যুদ্ধের প্রকৃত কারণ। এই সব রাষ্ট্রের পারস্পরিক স্বার্থদ্বন্দ্ব সভ্যতার সংকটকে ঘনীভূত করে তুলেছে। তাই যুদ্ধ প্রতিরোধ ও আন্তর্জাতিকতার প্রসারের জন্য তাঁরা জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রগুলির অবসান ঘটানো প্রয়োজন বলে প্রচার করেন। তাঁদের মতে, সমস্ত জাতীয় রাষ্ট্রগুলি যখন একটি 'বিশ্বরাষ্ট্রে'র (World State) মধ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে মিলিত হতে পারবে, তখনই কেবলমাত্র প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। এই ধারণাকে বিশ্বজনীনতা (Cosmopolitanism) বা সর্বজনীনতা (Universalism) বলা যেতে পারে, কিন্তু তাকে কখনই আন্তর্জাতিকতা বলে অভিহিত করা যায় না। কারণ বিশ্ব-রাষ্ট্র সৃষ্টির মাধ্যমে কখনই যুদ্ধের সম্ভাবনাকে বিদূরিত করা যায় না। সুতরাং আদর্শ জাতীয়তাবাদ কখনই যুদ্ধের কারণ হতে পারে না। জাতীয় স্বাধীনতা এবং দেশপ্রেম হিংসা ও বিদ্বেষের পরিবর্তে সৌভ্রাত্রবোধ জাগরিত করে। "নিজে বাঁচ, অপরকে বাঁচতে দাও।"—এই নীতির উপর আস্থাশীল জাতীয় রাষ্ট্রগুলি কখনই যুদ্ধকে আহ্বান করে না। বস্তুতঃ আমাদের যুগে যুদ্ধের প্রকৃত কারণ হোল একচেটিয়া পুঁজিবাদ, যা সাম্রাজ্যবাদের নামান্তর মাত্র। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি পররাজ্য গ্রাস করে, লুণ্ঠন করে এবং পদানত জাতিগুলির ভাগ্যবাঁটোয়ারা নিয়ে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বাধায়। তাই যুদ্ধ প্রতিরোধের প্রকৃত উপায় হোল সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিরোধ করা এবং নিপীড়িত জাতিগুলির মুক্তি-সংগ্রামকে সমর্থন করা।

আন্তর্জাতিকতার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসীদের মতে, আন্তর্জাতিকতা হোল একটি মানসিক অনুভূতি। এই মানসিক অনুভূতি মানুষকে বিশ্ব-সৌভ্রাত্রবোধে উদ্দীপ্ত করে। আন্তর্জাতিকতার মহান আদর্শে আস্থাশীল ব্যক্তি কখনই নিজেকে কেবলমাত্র একটি রাষ্ট্রের সদস্য বলে ভাববে না ; তার পরিবর্তে সে নিজেকে বিশ্বের একজন নাগরিক বলে মনে করবে। যখন মানুষের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হবে তখন জাতিসমূহ সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে শান্তি, স্বাধীনতা ও প্রগতি প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালাবে। তাছাড়া, বর্তমান বিশ্বে কোন জাতিই স্বয়ংসম্পূর্ণ বা আত্মনির্ভরশীল নয়। আত্ম-

আন্তর্জাতিকতার প্রয়োজনীয়তা

কেন্দ্রিকভাবে কোন জাতির পক্ষে বেঁচে থাকা বর্তমানে অসম্ভব। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার অভাবনীয় উন্নতি আজ বিশ্বের এক প্রান্তের সঙ্গে অতি সহজেই অন্য প্রান্তের নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তুলেছে। তাছাড়া অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে জাতিসমূহ পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। একক প্রচেষ্টায় ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোন জাতি বা রাষ্ট্র নিজের প্রয়োজন মেটাতে পারছে না। সর্বোপরি, বর্তমান শতাব্দীর বিগত দুটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ও শোচনীয় ধ্বংসলীলা এবং ভবিষ্যৎ আণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে বাস করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নতুন করে সচেতন করে তুলেছে। সংকীর্ণ জাতিগত স্বার্থ অপেক্ষা প্রতিটি জাতি আজ আন্তর্জাতিকতার কথা নতুন করে চিন্তা করতে শুরু করেছে।

আত্মপ্রীতি ও আত্মপ্রত্যয় হোল মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ। কিন্তু নিজেকে ভালবাসার অর্থ কখনই অপরকে ঘৃণা করা নয়; আত্মপ্রত্যয়ের অর্থ কখনই অপরকে অবিশ্বাস করা হতে পারে না। জাতীয় জীবনে এই ধারণার বিকাশ হলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমস্ত কলহের অবসান ঘটে। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা কোন জাতির নিজস্ব সম্পদ নয়। এই সুমহান আদর্শগুলি সব জাতির আদর্শ হওয়া উচিত। আর এই মহান্ আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব জাগরিত হলেই আন্তর্জাতিকতার প্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য হয়ে উঠে। বস্তুতঃ আন্তর্জাতিকতার প্রধান উদ্দেশ্য হোল—প্রতিটি জাতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অবিকৃত রেখে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে প্রতিটি জাতি পরস্পরের সঙ্গে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে সহযোগিতার সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। এর জন্য কিন্তু জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র বা তার সার্বভৌমিকতাকে খর্ব করার প্রয়োজন নেই। এইভাবে আন্তর্জাতিকতা জাতিসমূহের এমন একটি যৌথ পরিবার গঠন করতে চায় যেখানে ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতিটি জাতিই সমান ও সমমর্যাদার অধিকারী। তারা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী এবং শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের বিরোধের নিষ্পত্তি করে নিতে প্রস্তুত। অবশ্য সেজন্য প্রতিটি জাতিকেই কিছুটা পরিমাণে আত্মত্যাগ অবশ্যই করতে হবে এবং জাতীয় সার্বভৌমিকতার উপর কিছু কিছু বাধানিষেধ আরোপকে স্বীকার করে নিতে হবে। অন্যভাবে বলা যায়, আন্তর্জাতিকতার স্বার্থে প্রতিটি জাতিকেই কিছুটা আত্মত্যাগের মনোভাব দেখাতে হবে।

সুতরাং বলা যায় যে, জাতীয়তাবাদকে পরিহার করার পরিবর্তে তার মধ্য থেকেই আন্তর্জাতিকতা জন্মগ্রহণ করে। বার্ট্রেন্ড রাসেলের মতে, জাতির সীমারেখার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সীমারেখার মিলন না ঘটলে সত্যিকারের কোনো আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। সুতরাং জাতীয়তাবাদের সোপান বেয়েই আন্তর্জাতিকতার চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব—একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। বর্তমান বিশ্বে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) নামক আন্তর্জাতিক সংগঠনটি জাতীয়তাবাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিকতার সমন্বয় সাধনের পবিত্র কর্তব্য সম্পাদন করে সুন্দর পৃথিবী গঠনের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা করছে বলে অনেকে মনে করেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কোন অতিজাতীয় রাষ্ট্র নয়, বরং এটি হোল সার্বভৌম

প্রকৃত জাতীয়তাবাদই আন্তর্জাতিকতার সোপান

রাষ্ট্রগুলির একটি স্বেচ্ছা-সংঘ মাত্র। এর সদস্য রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক আইন ও দায়দায়িত্ব মান্য করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য-রাষ্ট্রগুলি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারণ, আন্তর্জাতিক আইন ও নৈতিকতার নীতি মান্য করে শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গঠনের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ।

উপযোগিতা

বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিকতার গুরুত্বকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আজ আমরা এমন এক বিশ্বে বাস করছি যেখানে পারস্পরিক সন্দেহ, স্বার্থদ্বন্দ্ব ইত্যাদি চারপাশের আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তুলেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবনীয় উন্নতির ফলে আণবিক অস্ত্রাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই আণবিক যুগে যুদ্ধের প্রকৃতি হোল সামগ্রিক যুদ্ধ। বলা বাহুল্য, সামগ্রিক যুদ্ধের অর্থই হোল সামগ্রিক ধ্বংস। মানবসভ্যতাকে সম্ভাব্য পারমাণবিক যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে আন্তর্জাতিকতার সুমহান আদর্শকে বাস্তবে গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আজ আমাদের সম্মুখে মাত্র দুটি পথ উন্মুক্ত আছে। প্রথমটি হোল—আন্তর্জাতিকতার পথ এবং দ্বিতীয়টি হোল ধ্বংসের পথ। নিশ্চিতভাবে আমরা দ্বিতীয়টির পরিবর্তে প্রথমটিকে বেছে নেব। তাছাড়া, আন্তর্জাতিকতার আদর্শ গৃহীত হলে জাতিসমূহের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য যে অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন, তা নির্মাণের জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, সেই অর্থ বিশ্বের কল্যাণে ব্যয়িত হতে পারবে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, আন্তর্জাতিকতার সুমহান্ আদর্শই বিশ্বসভ্যতাকে রক্ষা করতে পারে। এর বিপরীত পথে চললে মানবসভ্যতা নিশ্চিতভাবেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

৭। জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা (Nationalism and Internationalism)

জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি

জাতীয়তাবাদ হোল একটি ভাবগত ধারণা। বংশ, ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতির যে কোন এক বা একাধিক কারণে যখন একটি জনসমাজের মধ্যে গভীর একাত্মবোধ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই একাত্মবোধের জন্য ঐ জনসমাজের প্রত্যেকে সুখ দুঃখ, ন্যায়-অন্যায় ও মান-অপমানের সমান অংশীদার বলে নিজেকে মনে করে, তখন তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়। এই জাতীয়তাবোধের সঙ্গে দেশপ্রেম মিলিত হবে যখন তা একটি রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ হিসেবে গড়ে উঠে তখন তাকে জাতীয়তাবাদ (National-ism) বলে। সুতরাং জাতীয়তাবাদ মূর্ত হয়ে উঠে রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার মধ্যে। জাতির মধ্যে স্বাজাত্যবোধ বৃদ্ধি পেলে প্রতিটি জাতি নিজেদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি তোলে। এই দাবি বাস্তবে রূপায়িত হলে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং জাতীয়তাবাদ হোল এমন একটি শক্তি যা কিছু সংখ্যক মানুষকে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে একই রাষ্ট্রের অধীনে ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করার অনুপ্রেরণা যোগায়। ল্যাস্কির মতে, মানুষের সঙ্ঘলিপ্সু প্রবৃত্তি এবং স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছাই হোল জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। জাতীয়তাবাদ মানুষকে নিজের জাতির মত

অন্য জাতিকেও ভালবাসতে শিক্ষা দেয়। এই আদর্শ জাতিকে আত্মপ্রত্যয়ের যেমন শিক্ষা দেয়, তেমনি সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা যোগায়। আদর্শ জাতীয়তাবাদ 'নিজে বাঁচ, অপরকে বাঁচতে দাও' (Live and let others live)—এই সুমহান আদর্শ প্রচার করে বিশ্ব সভ্যতার প্রগতির পথ উন্মুক্ত করেছে। এই বিশেষ ঐক্যানুভূতি মানুষকে নব নব শিল্প, সাহিত্য, চারুকলা প্রভৃতি সৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়ে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছে, সমষ্টির প্রয়োজনে ব্যবহৃত জাতীয় সম্পদ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির পথ প্রশস্ত করে আন্তর্জাতিক দরবারে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

অপরদিকে আন্তর্জাতিকতা বলতে কি বোঝায় তা নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন শান্তিবাদী দার্শনিক ও চিন্তাবিদ্ মনে করেন যে, জাতীয় রাষ্ট্রগুলি বর্তমান বিশ্বে যুদ্ধের প্রকৃত কারণ। এই সব রাষ্ট্রের পারস্পরিক স্বার্থ-দ্বন্দ্ব সভ্যতার সঙ্কটকে ঘনীভূত করে তুলেছে। তাই যুদ্ধ প্রতিরোধ ও আন্তর্জাতিকতার সম্প্রসারণের জন্য তারা জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রগুলির অবসান ঘটানো প্রয়োজন বলে প্রচার করেন। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত। কারণ বিশ্বরাষ্ট্র সৃষ্টির মাধ্যমে কখনই যুদ্ধের সম্ভাবনাকে বিদূরিত করা যায় না। বস্তুতঃ, আন্তর্জাতিকতা হোল এমন একটি মানসিক অনুভূতি যা মানুষকে বিশ্বসৌভ্রাতৃত্ববোধে উদ্দীপ্ত করে। আন্তর্জাতিকতার আদর্শে আস্থাশীল ব্যক্তি কখনই নিজেকে একটিমাত্র রাষ্ট্রের সদস্য বলে ভাববে না ; তার পরিবর্তে সে নিজেকে বিশ্বের একজন নাগরিক বলে মনে করবে। যখন মানুষের এই ধারণা বদ্ধমূল হবে তখন জাতিসমূহ সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে শান্তি, স্বাধীনতা ও প্রগতি প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালাবে। তাছাড়া, বর্তমান বিশ্বে কোন জাতিই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল নয়। আত্মকেন্দ্রিকভাবে কোন জাতির পক্ষে বেঁচে থাকা বর্তমানে অসম্ভব। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ভাবনীয় উন্নতি আজ বিশ্বের এক প্রান্তের সঙ্গে অতি সহজেই অন্য প্রান্তের নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তুলেছে। তাছাড়া অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে জাতিসমূহ পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। একক প্রচেষ্টায় ক্ষুদ্র, বৃহৎ কোন জাতি বা রাষ্ট্র নিজের প্রয়োজন মিটাতে পারছে না। সর্বোপরি, বর্তমান শতাব্দীর বিগত দুটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ও শোচনীয় ধ্বংসলীলা এবং ভবিষ্যৎ আণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে বাস করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নতুন করে সচেতন করে তুলেছে। সংকীর্ণ জাগতিক স্বার্থ অপেক্ষা জাতি আজ আন্তর্জাতিকতার কথা নতুন করে চিন্তা করতে শুরু করেছে।

আন্তর্জাতিকতার প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তা

আত্মপ্রীতি ও আত্মপ্রত্যয় হোল মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ। কিন্তু নিজেকে ভালবাসার অর্থ কখনই অপরকে ঘৃণা করা নয় ; আত্মপ্রত্যয়ের অর্থ কখনই অপরকে অবিশ্বাস করা হতে পারে না। জাতীয় জীবনে এই ধারণার বিকাশ হলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমস্ত কলহের অবসান ঘটে। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা কোন জাতির নিজস্ব সম্পদ নয়। এই সুমহান আদর্শগুলি সব জাতির আদর্শ হওয়া উচিত। বলা বাহুল্য, এই মহান আদর্শের

জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতার সোপান

প্রতি শ্রদ্ধার ভাব জাগরিত হলেই আন্তর্জাতিকতার প্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য হয়ে উঠে। বস্তুতঃ, আন্তর্জাতিকতার প্রধান উদ্দেশ্য হোল—প্রতিটি জাতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অবিকৃত ও অক্ষুন্ন রেখে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে প্রতিটি জাতি পরস্পরের সঙ্গে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে সহযোগিতার সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। এর জন্য কিন্তু জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র বা তার সার্বভৌমিকতা খর্ব করার কোন প্রয়োজন নেই। এইভাবে আন্তর্জাতিকতা জাতিসমূহের এমন একটি যৌথ পরিবার গঠন করতে চায় যেখানে ক্ষুদ্র, বৃহৎ প্রতিটি জাতিই সমান ও সমমর্যাদার অধিকারী। তারা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী ও শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের বিরোধের নিষ্পত্তি করে নিতে প্রস্তুত। অবশ্য সেজন্য প্রতিটি জাতিকে কিছুটা পরিমাণে আত্মত্যাগ অবশ্যই করতে হবে এবং জাতীয় সার্বভৌমিকতার উপর কিছু কিছু বাধানিষেধ আরোপকে স্বীকার করে নিতে হবে। সুতরাং জাতীয়তাবাদকে পরিহার করার পরিবর্তে তার মধ্য থেকেই আন্তর্জাতিকতা জন্মগ্রহণ করে। বার্ট্রেন্ড রাসেলের মতে, জাতির সীমারেখার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সীমারেখার মিলন না ঘটলে সত্যিকারের কোন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা অসম্ভব। সুতরাং জাতীয়তাবাদের সোপান বেয়েই আন্তর্জাতিকতার চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব। জাতীয়তাবাদের জনক ম্যাট্‌সিনি মনে করতেন যে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতেই কেবলমাত্র জাতিসত্তার চরম বিকাশ ঘটতে পারে। তাই প্রকৃত জাতীয়তাবাদকে কখনই আন্তর্জাতিকতার পথে প্রতিবন্ধক বলে মনে করা সমীচীন নয়। বরং বলা যায়, আদর্শ জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতার সহায়ক মাত্র। বর্তমানে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন জাতীয়তাবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত। এরূপ জাতীয়তাবাদ নিঃসন্দেহে একটি প্রগতিশীল শক্তি, কারণ এটি সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে এবং গণতন্ত্রের সপক্ষে সংগ্রাম করছে। এই প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদ কখনই মানুষকে স্বার্থপর ও নীচ মনোবৃত্তিসম্পন্ন করে গড়ে তোলে না। বরং তা ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে সমষ্টির স্বার্থকে স্থাপন করার শিক্ষা দেয়। আদর্শ জাতীয়তাবাদ নিজের জাতিকে ভালবাসতে যেমন শিক্ষা দেয়, তেমনি অন্য জাতিকেও ভালোবাসার জন্য অনুপ্রেরণা দান করে। এরূপ জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতার সহায়ক মাত্র।

বিকৃত জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতার প্রধানতম শত্রু

ইতিহাসগতভাবে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়েছে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। জাতীয়তাবাদ সেদিন স্বৈরাচারী ও অগণতান্ত্রিক সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে ধ্বংস করে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণতন্ত্র ও অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করেছিল। জাতীয়তাবাদের নেতৃত্ব দিয়েছিল উদীয়মান মধ্যবিত্তশ্রেণী। পরবর্তী সময়ে একচেটিয়া পুঁজিবাদের উদ্ভব হওয়ায় এই জাতীয়তাবাদ উগ্র জাতীয়তাবাদে পরিণত হয়। এরূপ জাতীয়তাবাদকে বিকৃত জাতীয়তাবাদ বলে অভিহিত করা হয়। উগ্র স্বাদেশিকতা সংকীর্ণ জাত্যভিমানকে আহ্বান করে। সংকীর্ণ জাত্যভিমান প্রতিটি জাতিকে এই শিক্ষা দেয় যে, তার জাতীয় ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা ইত্যাদি হোল অন্যান্য জাতির ভাষা, ধর্ম ইত্যাদি থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ। নিজ

জাতির স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কিংবা জাতীয় স্বার্থের সম্প্রসারণের জন্য বিকৃত জাতীয়তাবাদ জাতিতে জাতিতে যুদ্ধের সূচনা করে। এই নিয়ন্ত্রিত জাতীয়তাবাদ উগ্র রূপ ধারণ করলেই মানবসভ্যতার সঙ্কট ঘনিয়ে আসে। সবল জাতির আক্রমণে দুর্বল জাতির স্বাধীনতা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিপন্ন হয়। অত্যধিক মুনাফা-লাভের আশায় জাতীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি বিদেশী বাজারের প্রসার, কাঁচা মাল সংগ্রহ, বিদেশে মূলধন বিনিয়োগ ইত্যাদির দিকে বিশেষ মনোযোগী হয়ে উঠে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের জন্য তারা উপনিবেশ গড়ে তোলে। এইভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস হোল জাতীয়তাবাদের উন্মাদনায় উন্মত্ত ইউরোপীয় বুর্জোয়া জাতীয় রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও ল্যাতিন আমেরিকার দুর্বল ও অনুন্নত জাতিগুলির স্বাধীনতা অপহরণ ও অর্থনৈতিক শোষণের ইতিহাস মাত্র। এই সাম্রাজ্যবাদী জাতীয়তাবাদ সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি বিস্তার করে। নিজেদের শোষণভিত্তিক অত্যাচারী ঔপনিবেশিক শাসনের সপক্ষে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি নতুন নতুন যুক্তি-তর্কের অবতারণা করতে শুরু করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে উপনিবেশ হিসেবে রাখার জন্য এই যুক্তির অবতারণা করত যে, অসভ্য ও বর্বর ভারতীয়দের সুসভ্য ও শিক্ষিত করার পবিত্র দায়িত্ব ইংরেজদের। আবার হিটলার জার্মান জাতিকে প্রকৃত আর্যজাতি বলে বর্ণনা করে অনার্য জাতিসমূহের উপর কর্তৃত্ব করার তার অধিকার আছে বলে প্রচার করে বহু রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা ও স্বাধীনতা অপহরণ করেন। এই বিকৃত জাতীয়তাবাদই আন্তর্জাতিকতার তথা মানবসভ্যতার চিরশত্রু। বর্তমানে বিত্তশালী পুঁজিপতি রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণী বিভিন্ন দুর্বল ও অনগ্রসর জাতিকে অর্থসাহায্যের নামে অর্থনৈতিক দিক থেকে শোষণ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি যখন বৃহৎ পুঁজিপতি রাষ্ট্রগুলির উপর অর্থনৈতিক দিক থেকে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তখন তাদের রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা বিপন্ন হয়। এরূপ অর্থনৈতিক শোষণ 'অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ' Economic Imperialism) নামে পরিচিত। সুতরাং আদর্শ জাতীয়তাবাদ বিশ্বশান্তির ও মানবতার তথা আন্তর্জাতিকতার শত্রু নয়। বিকৃত জাতীয়তাবাদ—যা সাম্রাজ্যবাদের নামান্তর মাত্র—বিশ্বশান্তি, মানবসভ্যতা ও আন্তর্জাতিকতার প্রধানতম শত্রু।

৮। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা
(Bourgeois Nationalism and Proletarian Internationalism)

বর্তমান যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হোল মানবজাতির ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ। বিশ্বের বিকাশধারায় জটিলতা ও তার পরস্পর-বিরোধী প্রকৃতি সত্ত্বেও দুটি মৌলিক প্রবণতা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। "একদিকে শান্তি ও প্রগতির শক্তিগুলি তাদের চাপ বৃদ্ধি করছে, বিশ্ব-সমাজতন্ত্রের অবস্থান ক্রমশঃ শক্তিশালী হচ্ছে এবং জাতিসমূহের ভবিষ্যতের উপর তার প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে বুর্জোয়া তাত্ত্বিক ও রাজনীতিবিদরা বিশ্ব-ধনতন্ত্রের অবস্থানকে সংহত করার জন্য, ধনতন্ত্রের

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার বিরোধী

অনুকূলে শক্তিগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক পরিবর্তনের জন্য, সামাজিক পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া গ্রথ করার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। দু'টি জগৎ, দুটি ব্যবস্থা পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, রাজনীতিতে ও ভাবাদর্শের জগতে। অত্যন্ত তীব্র ও মীমাংসাতীত সেই ভাবাদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে বুর্জোয়াশ্রেণী সর্বোপরি জাতীয়তাবাদের উপর তার আশা নিবন্ধ রেখেছে।" ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বলা যায়, বুর্জোয়াশ্রেণী ও প্রলেতারীয় শ্রেণীর মধ্যেকার সংগ্রামের অর্থ—সবসময়েই আন্তর্জাতিকতা ও জাতীয়তাবাদের মধ্যে সংগ্রাম। লেনিন বলেছিলেন, "বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা—এ দু'টি মীমাংসাতীত বৈরিতাপূর্ণ রণধ্বনি, যা সমগ্র ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার দুটি বিরাট শ্রেণীশিবিরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং তা জাতীয় প্রশ্নে দু'টি নীতি (বস্তুতঃ দু'টি বিশ্ববীক্ষা) প্রকাশ করে।

"প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা বলতে বোঝায় একটি ভাবাদর্শ, একটি নীতি, একটি সামাজিক সম্পর্ক, একপ্রকার চেতনা এবং বিপ্লবী আন্দোলন আর সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সমস্ত জাতির শ্রমিক ও তাদের মিত্রদের শ্রেণীগত ঐক্য ও সংহতির একটা বোধ।" "শ্রমিকশ্রেণী ও তার রাজনৈতিক দলগুলির জাতীয় বাহিনীর সমতা এবং এই-সব পার্টির স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ঐক্য গঠন, আন্তর্জাতিকতা ও দেশপ্রেমের মিলন সাধন এবং শ্রমিকশ্রেণী ও সাধারণভাবে শ্রমজীবী মানুষের কর্মকাণ্ডে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় উৎপাদনকে মেলানো ; কোন একটি দেশের শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থকে প্রাধান্যদান এবং বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কিত প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারার বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম।"

প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার স্বরূপ

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার সম্পূর্ণ বিরোধী। এটি হোল বুর্জোয়াশ্রেণীর ভাবাদর্শ, তাদের নীতি ও কার্যকলাপের একটি অঙ্গ। জাতীয় সচেতনতা ও মানসিকতার উপর জাতীয়তাবাদী ভাবধারাগুলির যথেষ্ট প্রভাব আছে। জাতীয়তাবাদ জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে অন্ধ ভক্তির বিষয়বস্তু করে তোলে এবং যে-সামাজিক ও শ্রেণীগত উপাদানসমূহ সমাজের গঠনবিন্যাস নির্ধারণ করে, সেগুলির উপর জাতীয় উপাদান-গুলিকে স্থান দেয়। "বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সহজাত প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারা-গুলি জাতীয় সংকীর্ণতা ও বিচ্ছিন্নতার দিকে এবং প্রায়শই জাতিতে জাতিতে শত্রুতা ও বিদ্বেষের দিকে নিয়ে যায়।...ক্ষমতালাভের বিবাদে জাতীয়তাবাদ সব সময়েই বুর্জোয়াশ্রেণীর অন্যতম মুখ্য হাতিয়ার হয়ে এসেছে।" মার্কসের উক্তি উদ্ধৃত করে বলা যায়, "বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় ওঠার সঙ্গে সঙ্গে 'নিজেদের ভণ্ডামিগুলিকে একটা জাতীয় মোড়কে ঢেকে দিতে' দক্ষ হয়ে উঠেছিল। জাতীয়তাবাদ ও জাত্যভিমানের সাহায্যে শ্রমজীবী মানুষের শ্রেণী-সচেতনতার স্থলে জাতীয় সচেতনতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং এইভাবে সমস্ত শ্রেণীর স্বার্থের মধ্যে একটা বাহ্যিক মিল সৃষ্টি করার জন্য বুর্জোয়াশ্রেণী সমস্ত রকম প্রয়াস চালায়।

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের স্বরূপ

মজার ব্যাপার হোল—অতীতের মতো বর্তমানেও বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা এ কথাটা জোর দিয়ে বলেন যে, প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী।

কিন্তু একথা সত্য নয়। আন্তর্জাতিক স্বার্থগুলি কখনই জাতীয় স্বার্থের বিরোধী হতে পারে না; বরং সব জাতির পক্ষে অভিন্ন সত্যিকারের প্রগতিশীল সামাজিক ও জাতীয় বিকাশের প্রবণতাই এগুলি প্রকাশ করে, যে-আন্তর্জাতিকতা শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিমূর্তি হিসেবে প্রথমে বিভিন্ন দেশে দেখা দিয়েছিল এবং এসব দেশের একটি উপাদান হিসেবে পুষ্ট হয়ে উঠেছিল, তা ক্রমবর্ধমানভাবে সামাজিক প্রগতির একটি স্বতন্ত্র উপাদান হিসেবে বিকশিত হয়েছে, যা পরে শ্রমিকশ্রেণীর ইতিহাস সৃষ্টিকারী ব্রতের সমস্ত বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্ব করছে।

প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী নয়

আন্তর্জাতিক ক্রিয়াশীলতার ক্ষেত্র নিরন্তরভাবে প্রসারমান। স্বতন্ত্র এক একটি দেশের সমাজবিকাশের বিভিন্ন উপাদানই শুধু এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না, এ সব দেশের জাতীয় জীবনের গণ্ডিকেও তা অতিক্রম করে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিকতার নীতিগুলি সমগ্র বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর, বিশেষতঃ যে-সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী এইসব নীতির ভিত্তিতে সাফল্যলাভ করছে, তাদের কর্মকাণ্ডের ভিত্তি। যেসব স্রোতোধারা বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার প্রবাহ সৃষ্টি করছে, ঐ নীতিগুলি তাদের ঐক্যের ভিত্তি।

১৭৯২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর ফরাসী প্রজাতন্ত্র ঘোষণার ৫৩তম বার্ষিকী উপলক্ষে এঙ্গেলস বলেছিলেন, "...সমস্ত দেশের প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ এক, শত্রু এক এবং তাদের সামনে একই সংগ্রাম। প্রলেতারীয় জনগণ প্রকৃতিগতভাবেই জাতীয় পক্ষপাত থেকে মুক্ত। তাদের আত্মিক বিকাশ ও অগ্রগতি মূলতঃ মানবতাধর্মী ও জাতীয়তাবাদ-বিরোধী। একমাত্র প্রলেতারীয়রাই জাতীয় সংকীর্ণতাকে ধ্বংস করতে পারে, জাগ্রত প্রলেতারিয়েতই একমাত্র বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে।" তবে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের মধ্যেও অনেক সময় সাধারণ গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকে। লেনিন বলেছিলেন, "যে-কোন নির্যাতিত জাতির বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের মধ্যে এক সাধারণ গণতান্ত্রিক মর্মবস্তু আছে, যা নির্যাতনের বিরুদ্ধে পরিচালিত এবং এই মর্মবস্তুকে আমরা সমর্থন জানাই। একই সঙ্গে আমরা কঠোরভাবে একে জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের প্রবণতা থেকে পৃথক করে দেখি; ইহুদিদের ওপর পোলিশ বুর্জোয়াদের অত্যাচার করার প্রবণতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করি।"

দশম অধ্যায়

সাম্রাজ্যবাদ

[Imperialism]

১। সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা (Definition of Imperialism)

সাম্রাজ্যবাদের একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্দেশ করা কষ্টকর। কারণ সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও মনীষীদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টাকে কেউ কেউ সাম্রাজ্যবাদ বলে অভিহিত করেন। অধ্যাপক সুম্যান (Schuman)-এর মতে, একটি দেশের জনগণের উপর বল-প্রয়োগ ও হিংসার মাধ্যমে বৈদেশিক শাসন চাপিয়ে দেওয়াকে সাম্রাজ্যবাদ বলা হয়। বার্নস্ (C. D. Burns) বলেন যে, একটি সরকার এবং সুসংহত আইনব্যবস্থার দ্বারা অনেকগুলি দেশ ও জাতিকে একসঙ্গে শাসন করা হলে তাকে সাম্রাজ্যবাদ বলে। এইচ. জি. ওয়েলস (H. G. Wells)-এর ভাষায়, সর্বপ্রকার আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ হোল মোটামুটিভাবে একটি সচেতন জাতীয় রাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা মাত্র। অনেক সময় সাম্রাজ্য-বিস্তারের নগ্ন প্রচেষ্টাকে আড়াল করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি নানা প্রকার নীতিকথা ও নৈতিক দায়িত্ব পালনের অজুহাত দেখায়। একটি দেশ কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্য দেশের উপর নিয়ন্ত্রণ বিস্তারকে চার্লস হডেজ (Charles Hodges) সাম্রাজ্যবাদ বলে অভিহিত করেছেন। মরগেনথোর মতে, নিজস্ব রাষ্ট্রীয় সীমানার বাইরে কোন রাষ্ট্রের সম্প্রসারণই হোল সাম্রাজ্যবাদ। ১৯০২ সালে প্রকাশিত 'সাম্রাজ্যবাদ' নামক পুস্তকে হবসন বলেন, সেকেলে সাম্রাজ্যবাদ থেকে নতুন সাম্রাজ্যবাদের পার্থক্য হোল এই যে: "প্রথমতঃ, একটিমাত্র বর্ধিষ্ণু সাম্রাজ্যের উচ্চাকাঙ্ক্ষার জায়গায় তা আনে একটি প্রতিযোগী সাম্রাজ্যের তত্ত্ব ও ব্যবহার—যাদের প্রত্যেকেই একই প্রকার রাজনৈতিক স্ফীতি ও বাণিজ্যিক লাভের লালসায় চালিত; দ্বিতীয়তঃ, বণিক স্বার্থের উপর ফিনান্স বা পুঁজি লগ্নি সংক্রান্ত স্বার্থগুলির প্রাধান্য।" কাউটস্কির মতে, সাম্রাজ্যবাদ হোল ফিনান্স পুঁজির 'বেশ পছন্দসই' একটা কর্মনীতি, 'কৃষিপ্রধান' দেশগুলিকে দখল করার জন্য শিল্পপ্রধান দেশগুলির একটা ঝোঁক। লেনিন কাউটস্কি-প্রদত্ত সংজ্ঞাটিকে 'নিতান্ত বাজে' বলে সমালোচনা করে বলেন, "সাম্রাজ্যবাদের একটি যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দিতে হলে বলতে হয় যে, সাম্রাজ্যবাদ হোল পুঁজিবাদের একচেটিয়া পর্যায়।" তিনি সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক দিকটির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

সাম্রাজ্যবাদের বিভিন্ন সংজ্ঞা

২। সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি (Nature of Imperialism)

প্রাচীনকালে সাম্রাজ্যবাদ প্রত্যক্ষভাবে পররাজ্য গ্রাস করে একটি সুবিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করত। নানা কারণে সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি হয়। কখনও-বা উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার পুনর্বসতির জন্য, কখনও বা ধর্মপ্রচারের জন্য, কখনও বা নিজ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি হলেও একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে,

সাম্রাজ্যবিস্তারের পশ্চাতে লুকিয়ে থাকে অর্থনৈতিক স্বার্থ। প্রাচীনকালের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বাণিজ্য বিস্তারের জন্য রোম কার্থেজ নগরীর উপর নিজের প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। এইভাবে স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশের সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটেছিল ব্যবসায়-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ ধর্মপ্রচারকগণ উত্তর আমেরিকায় গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশরা উত্তর আমেরিকাকে নিজেদের বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলে। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৬০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবার জন্য। কিন্তু ১৭৫৭ সালে বণিকের মানদন্ড রাজদন্ডরূপে দেখা দিয়েছিল। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ফরাসী ও পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে পরাজিত হলে কার্যতঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অপ্রতিহত হয়ে উঠে। বার্নার্ড শ' (Bernard Shaw) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর 'দি ম্যান অব্ ডেস্টিনি' (The man of Destiny, 1896) নামক গ্রন্থে বলেন যে, প্রতিটি ইংরেজ এমন একটি অত্যাশ্চর্য শক্তি নিয়ে জন্মায় যা তাকে বিশ্বের প্রভু করে তোলে। স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বাধীনতার সর্বোচ্চ রক্ষাকর্তা হিসেবে ইংরেজরা যখন প্রায় অর্ধেক পৃথিবীকে পদানত করে, তখন তারা একে উপনিবেশ বলে আখ্যা দেয়। আবার যখন তারা ম্যানচেস্টারের উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান করতে চায়, তখন তারা অসভ্য জাতিগুলির (Natives) মধ্যে শান্তির বাণী প্রচারের জন্য মিশনারী প্রেরণ করে। কিন্তু অসভ্য মানুষগুলি ক্ষিপ্ত হয়ে মিশনারীদের হত্যা করলে ইংরেজরা পবিত্র খ্রীষ্টধর্মকে রক্ষার জন্য ঐ সব দেশে সৈন্য প্রেরণ করে। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে তারা জয়লাভ করে এবং ঐ 'অসভ্য দেশগুলি'র বাজার ঈশ্বরের কাছ থেকে উপহার পায়। এইভাবে নানা অজুহাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি তাদের সাম্রাজ্যের বিস্তার করে।

সবপ্রকার সাম্রাজ্যবাদের পশ্চাতে থাকে অর্থনৈতিক স্বার্থ

অনেক সময় বিকৃত জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদের রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। বিকৃত জাতীয়তাবাদ নিজের জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতাকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রচার করে অন্যান্য জাতির উপর আধিপত্য ও কর্তৃত্ব করার কথা বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, নাৎসীবাদ জার্মান জাতির সর্বক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে অপর জাতিগুলির উপর কর্তৃত্ব করার স্বাভাবিক অধিকার জার্মানদের আছে—এই তত্ত্ব প্রচার করে সাম্রাজ্যবাদ রূপে চিহ্নিত হয়। বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ রোডেশিয়ার সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ সরকার বর্ণবিদ্বেষী নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে কার্যতঃ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বাহক হিসেবে সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণকায় জনগণের উপর সাম্রাজ্যবাদী পীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি উগ্র জাতীয়তাবাদের জন্য দুর্বল জাতিগুলিকে আক্রমণ করে। ফলে সেই সব জাতির ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি, স্বাধীনতা, সার্বভৌমিকতা সবই বিপন্ন হয়। ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বলা যায়, ধনতন্ত্রবাদের বিকাশের বিশেষ পর্যায়ে জাতীয়তাবাদ বিকৃত রূপ ধারণ করতে শুরু করে। বুর্জোয়া শ্রেণী সর্বপ্রথম সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য এবং পরে ধনতন্ত্রবাদের বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য বিস্তারের জন্য জাতীয়তাবাদকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। পরবর্তী সময়ে

বিকৃত জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদের জনক

ধনতন্ত্রবাদের বিকাশের ফলে পুঁজিবাদের আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি প্রবল আকার ধারণ করলে জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয়। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে, বর্তমান বিশ্বের শিল্প সংগঠনের পরিণতি এবং আধুনিক যুদ্ধকৌশলের অভাবনীয় উন্নতি রাষ্ট্রকে মানবতার বিরুদ্ধে এক সর্বনাশা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। অত্যধিক মুনাফালাভের আশায় পুঁজিপতি-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি বিদেশী বাজারের প্রসার, কাঁচামাল সংগ্রহ, বিদেশে মূলধন নিয়োগ ইত্যাদির দিকে বিশেষ মনোযোগী হয়ে উঠে। ফিনান্স ক্যাপিটালের জন্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি উপনিবেশ গঠনের প্রয়োজনীয়তা একান্তভাবেই অনুভব করে। এইভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস হোল জাতীয়তাবাদের উম্মাদনায় উন্মত্ত ইউরোপীয় বুর্জোয়া জাতীয় রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার দুর্বল ও অনুন্নত জাতিগুলির স্বাধীনতা অপহরণ ও অর্থনৈতিক শোষণের ইতিহাস মাত্র। এই সাম্রাজ্যবাদ সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং পরবর্তী পর্যায়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের প্রাধান্য, প্রতিপত্তি ও প্রভুত্ব বিস্তার করতে শুরু করে।

সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে নানা প্রকার চমৎকার যুক্তির অবতারণা

নিজেদের শোষণভিত্তিক অত্যাচারী ঔপনিবেশিক শাসনের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি নতুন নতুন যুক্তিতর্কের অবতারণা করতে শুরু করে। কিপলিং-এর 'শ্বেতাঙ্গের বোঝা'*, 'নরডিক কুলের উৎকর্ষ' ইত্যাদি যুক্তির অবতারণা করে ঔপনিবেশিক শাসনের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে উপনিবেশ হিসেবে রাখার জন্য এই যুক্তির অবতারণা করত যে, অসভ্য ও বর্বর ভারতীয়দের শিক্ষিত ও সুসভ্য করার পবিত্র দায়িত্ব ইংরেজদের। হিটলার জার্মান জাতিকে প্রকৃত আর্য জাতি বলে বর্ণনা করে অনার্য জাতিসমূহের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করার অধিকার তাঁর আছে বলে প্রচার করে বহু রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা ও স্বাধীনতা অপহরণ করেন। সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নৈবেদ্য' নামক কাব্যগ্রন্থে বলেছেন—

"স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত ; লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম ; প্রলয়-মন্থন ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্ক শয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।"

* ১৮৯৯ সালে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী কবি কিপলিং লিখেছিলেন :

"Take up the white man's burden
Send forth the best ye breed
Go bind your sons to exile
To serve your captive's need
To wait in heavy harness
On fluttered folk and wild
Your new caught sullen peoples
Half devil and half child"

লেনিন তাঁর 'সাম্রাজ্যবাদ—পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়' (Imperialism—The Highest Stage of Capitalism) নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করেছেন। পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী স্তরে পরিণত হয় ১৯০০ সালের কাছাকাছি সময়ে। তাঁর মতে সাম্রাজ্যবাদ হোল একচেটিয়া পুঁজিবাদ।

সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিনের তত্ত্ব

লেনিন সাম্রাজ্যবাদের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, যথা :

(১) উৎপাদন ও পুঁজির কেন্দ্রীকরণ এতদূর সম্প্রসারিত হয়েছে যে তার ফলে একচেটিয়া কর্তৃত্বের উদ্ভব হয়েছে এবং তা অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান নিয়ামক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই এই ব্যাপারটি প্রত্যেক উন্নত পুঁজিবাদী দেশেই ঘটেছে এবং বিশেষভাবে জার্মানি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

উৎপাদন ও পুঁজির কেন্দ্রীকরণ

(২) সাম্রাজ্যবাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে লেনিন বলেছেন, "উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন, তা থেকে একচেটিয়ার উদ্ভব, শিল্পের সঙ্গে ব্যাঙ্কের মিলন বা একাঙ্গীভবন—এই হচ্ছে মহাজনী পুঁজির উদ্ভবের ইতিহাস····" শিল্পের মত ব্যাঙ্কেও অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বৃহৎ ও শক্তিশালী ব্যাঙ্কগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঙ্ককে গ্রাস করে ফেলে। এইভাবে ব্যাঙ্কে একচেটিয়া প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক ও শিল্পের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। বৃহৎ ব্যাঙ্কগুলি অর্থনৈতিক জগতের সর্বময় নিয়ন্তা হয়ে দাঁড়ায়। এই সময় ভারী শিল্প নির্মাণের জন্য যে বিপুল পরিমাণ পুঁজির প্রয়োজন তা এককভাবে কোন শিল্পপতির পক্ষে যোগান দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তাদের নির্ভর করতে হয় ব্যাঙ্কের উপর। ফলে ব্যাঙ্কের মালিকরা শিল্পপতিদের উপর নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তারের সহজ সুযোগ লাভ করে। শিল্পের শেয়ার ক্রয় করে ক্রমশঃ তারা শিল্পের মালিক হয়ে উঠে। শেষ পর্যন্ত শিল্প ও ব্যাঙ্কের মালিকানা কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। দেশের শিল্প, ব্যাঙ্ক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়ায় মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি। শিল্প ও ব্যাঙ্কের মিলনের ফলে বিপুল পরিমাণ পুঁজি সমাজজীবনের সর্বপ্রধান নিয়ামক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তাকে 'মহাজনী পুঁজি' (Finance Capital) বলা হয়। মহাজনী পুঁজির মালিকরা রাষ্ট্রের উপর তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়।

মহাজনী পুঁজির বৃদ্ধিসাধন

(৩) সাম্রাজ্যবাদের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হোল পুঁজি রপ্তানি, যা পণ্য রপ্তানি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। স্বদেশে পুঁজির বিনিয়োগ না করে বিদেশে পুঁজি খাটানোকেই পুঁজি রপ্তানি বলা হয়। সাম্রাজ্যবাদী যুগে পুঁজিবাদ এমন একটি স্তরে উপনীত হয়েছে যে স্বদেশে পুঁজি বিনিয়োগ করে পুঁজিপতিরা আশানুরূপ মুনাফা অর্জন করতে পারছে না। এমতাবস্থায় তারা বিদেশে পুঁজি খাটিয়ে আশাতীত মুনাফা অর্জন করতে চাইছে।

পুঁজি রপ্তানি

(৪) সাম্রাজ্যবাদের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হোল আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজিপতি জোটের আবির্ভাব। কার্টেল, সিন্ডিকেট, ট্রাস্ট ইত্যাদি একচেটিয়া পুঁজিপতি জোট

কেবলমাত্র স্বদেশের বাজার নিজেদের মধ্যে বণ্টিত করে সন্তুষ্ট হতে পারে না। তাই তারা পুঁজির পরিমাণ অনুসারে বিশ্বের বাজারকেও নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয়। অনেক সময় প্রতিটি গোষ্ঠীকে এক একটি বাজার নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় এবং চুক্তির মাধ্যমে দাম নির্ধারিত হয়। এরূপ আন্তর্জাতিক চুক্তির উদ্দেশ্য হোল দুটি, যথা—নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়িয়ে চলা এবং বিশ্ববাজারে নতুন কোন শক্তিকে অনুপ্রবেশ করতে না দেওয়া। তবে একথা সত্য যে, পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকলেও প্রচ্ছন্নভাবে তা চলতে থাকে। বিভিন্ন দেশের একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলি বিশ্বের বাজার নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হলেও লেনিন নানা তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, এরূপ আন্তর্জাতিক চুক্তি কখনই স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না। কারণ পুঁজিবাদের অগ্রগতির ধর্মই হোল তার অসম বিকাশ। তাই চুক্তিবদ্ধ বিভিন্ন পুঁজিপতি গোষ্ঠী নিজেদের সম্পাদিত চুক্তি অবসানের দাবি তোলে এবং অন্যান্য গোষ্ঠী যদি সেই দাবি মেনে না নেয় তবে বাজার দখলের জন্য সুতীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়। সুতরাং এই অর্থনৈতিক চুক্তিগুলি কার্যক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মহাজনী পুঁজিপতি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন বাণিজ্য-যুদ্ধে যুদ্ধবিরতি রূপে কাজ করে।

আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীর আবির্ভাব

(৫) সাম্রাজ্যবাদের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হোল একচেটিয়া পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিশ্বের ভূখণ্ডগত বণ্টন। আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজিবাদী শক্তিগুলি অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশ্বের বাজারকে নিজেদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না। তারা বিশ্বের ভূখণ্ডগত বণ্টনের কাজেও আত্মনিয়োগ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কয়েকটি বৃহৎ পুঁজিবাদী শক্তি বিশ্বের ভূখণ্ডগত বণ্টনের কাজ মোটামুটিভাবে শেষ করে ফেলেছে। তাই সাম্রাজ্যবাদী যুগে নতুন করে অধিকার করার মত ভূখণ্ড আর অবশিষ্ট নেই। ফলে, সর্বাপেক্ষা ধনশালী রাষ্ট্রের মহাজনী পুঁজির মালিক-গোষ্ঠীর পক্ষে নতুন বাজার খুঁজে পাওয়া কষ্টকর হয়ে উঠে। আর তা করতে হলেই অপরের অংশের দিকে তাকে হাত বাড়াতে হয়। অন্যভাবে বলা যায়, বিশ্বযুদ্ধের দ্বারা বিজয়ী রাষ্ট্রের অনুকূলে বিশ্বের পুনর্বণ্টনের পথ প্রশস্ত করে নিতে হয়। তাই সাম্রাজ্যবাদী যুগে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠে। নাৎসী জার্মানির মহাজনী পুঁজির অভিযানের কথা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

বিশ্বের ভূখণ্ডগত বণ্টন

ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদের স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে লেনিন বলেছেন, "সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের একটি বিশেষ ঐতিহাসিক পর্যায়। সাম্রাজ্যবাদ হোল, ১. একচেটিয়া পুঁজিবাদ, ২. পরোপজীবী বা ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ, ৩. মুমূর্ষু পুঁজিবাদ।" বর্তমান যুগে সাম্রাজ্যবাদ যে রূপই পরিগ্রহ করুক না কেন তা হোল পুঁজিবাদ। এই পুঁজিবাদ একচেটিয়া রূপ ধারণ করলেও চরিত্রগতভাবে এর কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয় না। উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা, শ্রমিক মালিক বিরোধ, পুঁজিপতি কর্তৃক শ্রমিক শোষণ, অর্থনৈতিক সংকট প্রভৃতি পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি, পরিপূর্ণভাবে শুধু বর্তমানই থাকে না, সাম্রাজ্যবাদের যুগে সেগুলি আরও প্রকট

আকার ধারণ করে। এই যুগে পুঁজিবাদ কতকগুলি স্ববিরোধের জালে জড়িয়ে পড়ে যার হাত থেকে তার পরিত্রাণ পাবার কোন আশা থাকে না।

লেনিন সাম্রাজ্যবাদকে ক্ষয়িষ্ণু বা পরোপজীবী পুঁজিবাদ বলে চিত্রিত করেছেন। "কারণ সাম্রাজ্যবাদ সামাজিক উৎপাদনের অগ্রগতিকে রোধ করে এবং প্রত্যক্ষ উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কহীন একদল পরোপজীবী পুঁজিপতি শ্রেণীর জন্ম দেয়"। অবাধ প্রতিযোগিতার যুগে যে উৎপাদন-সম্পর্ক পুঁজিবাদী উৎপাদন শক্তির বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে, সাম্রাজ্যবাদী যুগে সেই উৎপাদন-সম্পর্কই উৎপাদনের অগ্রগতির পথে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে থাকে।

ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ

লেনিন সাম্রাজ্যবাদকে 'মৃতপ্রায়' বা 'মুমূর্ষু' পুঁজিবাদ বলে অভিহিত করেছেন। কারণ "সাম্রাজ্যবাদ ধনতন্ত্রের স্ব-বিরোধকে এমন শেষ সীমায়, চূড়ান্ত পর্যায়ে এনে ফেলেছে যার পরই শুরু হয় বিপ্লব।" এই স্ব-বিরোধগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হোল তিনটি, যথা—১. শ্রম ও পুঁজির মধ্যে বিরোধ, ২. সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির নিজেদের মধ্যেকার বিরোধ এবং ৩. সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও উপনিবেশের মধ্যে বিরোধ। "সাধারণভাবে এগুলোই হোল সাম্রাজ্যবাদের প্রধান স্ব-বিরোধ ; এর ফলেই পুরানো আমলের 'সমৃদ্ধিশালী' ধনতন্ত্র মৃতপ্রায় ধনতন্ত্রে পরিণত হয়েছে।" সাম্রাজ্যবাদ কেবলমাত্র বিপ্লবকেই অবশ্যম্ভাবী করে তোলেনি, ধনতান্ত্রিক দুর্গের উপর প্রত্যক্ষ আঘাত হানবার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সুবিধাজনক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। লেনিন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এই ক্ষয়িষ্ণু ও মৃতপ্রায় পুঁজিবাদের অনিবার্য ধ্বংসই হোল ইতিহাসের নির্দেশিত পরিণাম। লেনিনের সেই ভবিষ্যদ্বাণী আজ সফল হতে চলেছে। বিশ্বের এক-চতুর্থাংশ ভূখণ্ডে বর্তমানে একচেটিয়া পুঁজিবাদের তথা সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যু ঘটেছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা।

মৃতপ্রায় পুঁজিবাদ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগ হোল সাম্রাজ্যবাদের অবক্ষয়ের যুগ। এই যুগে ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালি প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে শক্তিহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু ভয়ংকর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সে বিশ্বকে 'ঠান্ডা লড়াই'-এর দিকে ঠেলে দিয়ে নতুন উপায়ে মুমূর্ষু সাম্রাজ্যবাদকে বাঁচাতে চাইছে। বিভিন্ন দেশকে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদানের নামে কার্যতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেইসব দেশের রাজনীতিকে যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করছে। এরূপ অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ 'ডলার সাম্রাজ্যবাদ' নামে পরিচিত। কেউ কেউ আবার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে নয়া উপনিবেশবাদ (Neo-colonialism) নামেও অভিহিত করেন।

ডলার সাম্রাজ্যবাদ

৩। নয়া উপনিবেশবাদ (Neo-colonialism)

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর যুগ হোল সাম্রাজ্যবাদের অবক্ষয়ের যুগ। এই যুগে ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। কিন্তু ভয়ংকর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সে বিশ্বকে 'ঠান্ডা লড়াই'-এর দিকে ঠেলে দিয়ে নতুন উপায়ে

মুমূর্ষু সাম্রাজ্যবাদকে বাঁচাতে চাইছে। বর্তমানে প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসন পূর্বের মতো না থাকলেও সাম্রাজ্যবাদ কিন্তু পৃথিবীর বুক থেকে একেবারে মুছে গেল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি আর উপনিবেশগুলিকে তাদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখতে সক্ষম হোল না। তাই বিশ্ব-পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে তারা সাম্রাজ্যবাদী শোষণের কায়দাটা পরিবর্তন করে নিল। এই নতুন কায়দায় পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদকে 'নয়া উপনিবেশবাদ' (Neo-colonialism) বলে আখ্যা দেওয়া হয়। এরূপ উপনিবেশবাদী ব্যবস্থায় রাষ্ট্রশক্তি স্থানীয় মানুষদের হাতে থাকলেও অর্থনৈতিক শক্তির চাবিকাঠি থাকে বিদেশী মালিকদের হাতে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি প্রধানতঃ চারটি উপায়ে স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করে। এই চারটি উপায় হোল—১. বৈদেশিক সাহায্য, ২. বৈদেশিক বাণিজ্য, ৩. বহুজাতিক পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান এবং ৪. খাদ্য ও অস্ত্র সরবরাহ।

নয়া উপনিবেশবাদ ও তার নিয়ন্ত্রণের সাধনসমূহ

১. বৈদেশিক সাহায্য : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো অতি উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি তৃতীয় বিশ্বের ক্ষুদ্র-বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য বৈদেশিক সাহায্য প্রদানের প্রস্তাব করল। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের আশায় সেই প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করল। কিন্তু ওই সাহায্য গ্রহণের আগে একবারও তার ফলাফল সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করল না। কারণ একে সাহায্য বলা হলেও আসলে তা হোল ঋণ, যা সুদসহ পরিশোধযোগ্য। বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে নানা ধরনের অনুৎপাদনশীল প্রচেষ্টায় বিপুল পরিমাণ টাকা এলো আর গেলো : কিন্তু অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি সাধিত হোল না। অনুন্নত, অর্ধোন্নত বা উন্নতিকামী দেশগুলির শেষ পর্যন্ত ঋণ পরিশোধেরও ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু ঋণ শোধ না হলেও ব্যাপকভাবে নতুন ঋণ আসতে লাগল। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থার সৃষ্টি হোল যে, নতুন ঋণের শতকরা চল্লিশভাগ পর্যন্ত পুরানো ঋণ পরিশোধের জন্য সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ে দিতে হয়েছে। "এইভাবে সনাতনী মহাজনী কায়দায় ওরা ঋণের বাঁধনে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললো।" তাছাড়া, বহুক্ষেত্রেই প্রকল্পভিত্তিক বৈদেশিক সাহায্য প্রদান করা হোল। প্রকল্প মঞ্জুরের প্রধান শর্ত হলো এই যে, এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কিনতে হবে সাহায্যকারী পুঁজিবাদী দেশ থেকে এবং প্রকল্প চালাবার জন্য পরামর্শদাতা, বিশেষজ্ঞ, ইঞ্জিনীয়ার প্রমুখকেও এই দেশ প্রেরণ করবে। এইভাবে বৈদেশিক সাহায্যের নামে "পুঁজিবাদীরা মাছের তেলে মাছ ভাজার বন্দোবস্ত করলো।" মার্কিন বৈদেশিক সাহায্যের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হোল—যেসব দেশ মার্কিন সাহায্য গ্রহণ করবে তারা তাদের দেশে অবস্থিত কোন মার্কিন কোম্পানীর বিরুদ্ধে কোনরূপ 'বৈষম্যমূলক' ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে না। কোন মার্কিন কোম্পানীকে অধিগ্রহণ করা হলে সেই দেশ আর মার্কিন সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। ষাটের দশকে শ্রীলঙ্কায় মার্কিন তৈল কোম্পানীগুলির জাতীয়করণ করা হলে ঐদেশে মার্কিন

বৈদেশিক সাহায্যের স্বরূপ

বৈদেশিক সাহায্য তখনকার মতো বন্ধ হয়ে যায়। এইভাবে মার্কিন পুঁজিবাদী বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে এই বৈদেশিক সাহায্য 'রক্ষাকবচে'র মতো কাজ করে চলেছে।

২. **বৈদেশিক বাণিজ্য :** বর্তমানে উপনিবেশগুলির উপর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অবসান ঘটলেও সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রইলো। পূর্বতন উপনিবেশগুলি সাম্রাজ্যবাদী-শাসনের হাত থেকে মুক্তি পেলেও ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির রাজধানীসমূহ তাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে থেকে গেল। উদাহরণ হিসেবে আলজিরিয়া, মরিসাস, সেনেগাল ও আইভরি কোস্টের বৈদেশিক বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে প্যারিস ; ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার লন্ডন এবং সুরিনাম ও ইন্দোনেশিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে আমস্টারডামের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। "চা, কফি, চিনি থেকে শুরু করে তেল, তামা, বক্সাইট--সবকিছুই তৈরী হলো তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ; কিন্তু বিক্রী হলো সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মারফত। 'নীলাম' হলো লন্ডনে, প্যারিসে, আমস্টারডামে।" ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ সম্পাদিত হোল সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির দ্বারাই। যে-জাহাজে করে মাল গেল তার মালিক ওরাই আর যে-কোম্পানী বীমার ব্যবস্থা করল তার মালিকানাও ওদের হাতে। কাজেই কোন্ খনিজ পদার্থ বা কাঁচামাল কী দামে বিক্রী হবে তা নির্ধারণ করার মালিকও হোল ওরাই। বলা বাহুল্য, দাম নির্ধারণের সময় তারা নিজেদের লাভ-ক্ষতির মানদন্ডটিকেই সর্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করবে। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের 'অসম বাণিজ্যিক বিনিময়' সাম্রাজ্যবাদী-শোষণের অন্যতম প্রধান অস্ত্র হিসেবে কাজ করে।

বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রকৃতি : অসম বিনিময়

৩. **বহুজাতিক পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানসমূহ :** বহুজাতিক পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাগুলি হোল নয়া-উপনিবেশবাদের তৃতীয় অস্ত্র। উন্নত পুঁজিবাদী দেশে অসম প্রতিযোগিতায় বড় বড় কোম্পানীগুলি ছোট ছোট কোম্পানীকে গ্রাস করে ফেলে। এই প্রক্রিয়া প্রধানতঃ তিনটি উপায়ে ঘটে থাকে, যথা—১. মূল্যযুদ্ধ, ২. সংহতি-সাধন এবং ৩. গবেষণা। ১. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোম্পানীগুলি দু'চারটি শহর বা অঞ্চলে ব্যবসা করে। কিন্তু বৃহৎ কোম্পানীগুলি ব্যবসা করে সমগ্র দেশ জুড়ে। তাই বৃহৎ কোম্পানীগুলি দু' একটি অঞ্চলে দাম কমিয়ে দিয়ে কিছুটা ক্ষতি স্বীকার করতে পারে। এর ফলে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে না পেরে বাধ্য হয়েই তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। তাদের আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গেই বৃহৎ কোম্পানীগুলি তাদের উৎপাদিত সামগ্রীর দাম বেশ কিছুটা বাড়িয়ে দিয়ে পূর্বেকার ক্ষতি পুষিয়ে নেয়। ২. বৃহৎ কোম্পানীগুলি একটি শিল্পের সর্বস্তরে কাজ করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তৈল ক্ষেত্রে তৈল অনুসন্ধান, তৈল খনির উন্নয়ন, তৈল উৎপাদন, পরিবহন, পরিশোধন, বন্টন প্রভৃতি কার্য একই কোম্পানী সম্পাদন করে। কোনও একটি ক্ষুদ্র কোম্পানী হয়তো তৈল শোধনের ব্যবসায় ঢুকলো। কিন্তু ওকে

বহুজাতিক পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ

কাঁচা তৈল ক্রয় করতে হবে ঐ বৃহৎ কোম্পানীটির কাছ থেকে এবং পরিশুদ্ধ তৈল বিক্রয় করতে হবে ওই কোম্পানীর কাছেই। ফলে হয় ক্ষুদ্র কোম্পানীটিকে ঐ বৃহৎ কোম্পানীর দালালে পরিণত হতে হবে, নয়তো সে কাঁচা তৈলের দাম এমনভাবে বৃদ্ধি করবে এবং পরিশোধিত তৈলের দাম এমনভাবে হ্রাস করবে যে, ক্ষুদ্র কোম্পানীটির পক্ষে ব্যবসায় করা সম্ভব হবে না। ৩. তাছাড়া, বৃহৎ কোম্পানীগুলি উন্নত ধরনের গবেষণা কার্য চালাবার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে। এই উন্নত গবেষণা-কার্য চালানোর উদ্দেশ্য হোল উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করে মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি করা। এইভাবে ক্ষুদ্র কোম্পানীগুলি কোনক্রমে প্রতিযোগিতায় ওদের কাছাকাছি এসে যাওয়ার পূর্বেই গবেষণার ফল দিয়ে ওরা বেশ কয়েক লাফ এগিয়ে যায়। তাই প্রতিযোগিতায় ওদের সঙ্গে এঁটে ওঠা খুবই শক্ত ব্যাপার। বলা বাহুল্য, প্রতিটি উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে গাড়ী, তৈল, ইলেকট্রনিকস, চা, কফি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসাগুলির প্রায় শতকরা সত্তর ভাগের বেশী দশ-বারটি বৃহৎ কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণাধীনে রয়েছে। এরা "যেন বিরাট বিরাট অক্টোপাসের মতো অসংখ্য বাহু দিয়ে পৃথিবীর অর্থনীতিকে চেপে রয়েছে। এদের সঙ্গে রয়েছে পৃথিবীর সেরা বৈজ্ঞানিক, গাণিতিক, ইঞ্জিনীয়ার, অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং প্রশাসক।" এদের আয়-ব্যয়ের হিসাব রীতিমত চমকপ্রদ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'জেনারেল মোটরস্' কোম্পানীর এক বৎসরের মোট বিক্রীর পরিমাণ সুইজারল্যান্ডের মতো একটি ধনী শিল্পোন্নত দেশের জাতীয় আয়ের সমান। প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশের শাসকগোষ্ঠী এইসব বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের ইঙ্গিতে পরিচালিত হন। বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের দেশ অপেক্ষা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি থেকে অনেক বেশী মুনাফা অর্জন করে। "আজকাল দু'ধরনের শিল্প, বিশেষ করে এরা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে করছে—(ক) যেগুলো শিল্পের উৎপাদনের 'নোংরা স্তর', যা পরিবেশ ও আবহাওয়া বিষাক্ত করবে, এবং যে শিল্প ওখানে করবার ব্যাপারে উন্নত দেশের সাধারণ নাগরিকদের আপত্তি আছে; এবং (খ) সেই সব শিল্প যেখানে শ্রম বেশী লাগে। তাই গরীব দেশগুলোর গরীব শ্রমিকদের ওদেশের তুলনায় নামমাত্র মজুরী দিয়ে উৎপাদন তুলে নেওয়া লাভজনক।" বহুক্ষেত্রে স্থানীয় আইনের সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য ঐসব বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি স্থানীয় কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একযোগে শিল্প স্থাপন করে। তবে একসঙ্গে কাজ করলেও বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ এবং নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি ওদের হাতেই থাকে। এইসব বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ব্যাঙ্কের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে। ব্যাঙ্কের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক এমন হোল যাতে করে ব্যাঙ্কের সংগৃহীত টাকা ওরা অতি সহজেই স্বনিয়ন্ত্রিত শিল্পে নিয়োগ করতে পারে। লেনিন এরূপ সম্পর্ককে শিল্প মূলধন ও ব্যাঙ্ক মূলধনের বিবাহ বলে বর্ণনা করেছেন। ওই সব বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান সমগ্র বিশ্বের বাজারকে চুক্তি বা সন্ধির মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে নিয়েছে।

৪. **খাদ্য ও অন্ন সরবরাহ:** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পক্ষেত্রের মতো কৃষিক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগের ফলে কৃষিক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হোল। মার্কিন কৃষক পরিণত হোল পুঁজিবাদী কৃষকে। সেখানকার

লোকসংখ্যার চাহিদার তুলনায় খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বেশী হওয়ায় বিশ্বের বাজারে খাদ্য রপ্তানি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যেহেতু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে ব্যাপকভাবে খাদ্যের ঘাটতি রয়েছে, সেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মতো পুঁজিবাদী দেশগুলি ঐসব দেশে খাদ্য রপ্তানির মাধ্যমে রাজনৈতিক ফয়দা লুঠ করতে চাইলো।

খাদ্যের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ

ওরা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির খাদ্য-সংকটের সুযোগ নিয়ে তাদের দিয়ে নানাপ্রকার অসম্মানজনক চুক্তি স্বাক্ষর করিয়ে খাদ্য যোগান দিতে শুরু করল। ভারতের সঙ্গে সম্পাদিত এই ধরনের একটি চুক্তি হোল পি. এল. ৪৮০ (Public Law 480)। ঐ চুক্তি অনুযায়ী অল্প দামে ও অল্প সুদে ভারতবর্ষের খাদ্য-ঘাটতি পূরণের জন্য গম পাঠানো হোল। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ডলারের মূল্য অনুযায়ী ভারতীয় টাকায় ঋণ পরিশোধ করা যাবে। কিন্তু ঐ টাকার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে মার্কিন দূতাবাসের এবং কিভাবে ঐ টাকা ব্যয়িত হবে সে সম্পর্কে ভারত সরকার কোন খোঁজ-খবর নিতে পারবে না। ফলে ঐ টাকায় নানাপ্রকার শিক্ষাগত গবেষণার ক্ষেত্রে সহযোগিতার নামে দেশের শিক্ষিত ও মেধাবী মানুষের একাংশকে ওরা কিনে ফেলল। ঐ টাকার অন্য অংশ ব্যয়িত হোল গুপ্তচর বৃত্তির কাজে। সর্বোপরি, খাদ্য সাহায্যের একটি অলিখিত শর্ত হোল—ওদের কথামতো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ করতে হবে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যাবে। ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত 'পি. এল. ৪৮০'-র প্রভাবে ভারতকে 'জোটনিরপেক্ষতার বাগাড়ম্বর' বন্ধ রাখতে হয়। ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ নিয়ে সারা বিশ্ব যখন তোলপাড়, তখন ভারত সরকার বিশ্বের দরবারে এ ব্যাপারে কোন বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখতে পারেনি। পরবর্তী সময়ে অবশ্য মার্কিন খাদ্য সরবরাহের রাজনীতিতে কিছুটা পরিবর্তন চোখে পড়ে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে খাদ্যে স্বয়ম্ভর করে গড়ে তোলার জন্য 'সবুজ বিপ্লবে'র ফরমুলা ঘোষিত হোল। রকফেলার ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে মেক্সিকো ও ম্যানিলায় অতি উৎপাদনশীল বীজ উৎপাদনের জন্য গবেষণা চললো। সেই সব বীজ পাঠানো হোল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে। অতি উৎপাদনশীল বীজ ব্যবহারের ফলে ঐ দেশগুলির খাদ্যোৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেল। ফলে মার্কিন মুলুক থেকে ধান, গম প্রভৃতির আমদানী কমলেও রাসায়নিক সার, কীট-নাশক ঔষধ, ট্রাক্টর, কম্বাইন হারভেস্টার ইত্যাদির আমদানী ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেল। আর ঐ সব উপকরণ সরবরাহ করল বিভিন্ন পুঁজিবাদী শিল্প-প্রতিষ্ঠান। ফলে নয়া ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে পুঁজিবাদী শোষণের এক নতুন রাস্তা তৈরী হোল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক শোষণকে অব্যাহত রাখার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের প্রভাব-প্রতিপত্তি রোধের উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার আঞ্চলিক শক্তি জোট বা সামরিক জোট গড়ে তোলে। এগুলির মধ্যে 'ন্যাটো' (NATO), 'সেন্টো' (CENTO), 'সিয়াটো' (SEATO), 'আঞ্জুস' (ANZUS) ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এসবের ফলে বিশ্বে যুদ্ধের সম্ভাবনা তিরোহিত

অস্ত্রের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ

হওয়ার পরিবর্তে শতগুণ বৃদ্ধি পেল। আর যুদ্ধের সম্ভাবনা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, অস্ত্রের ব্যবসা করে নয়া-সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি ততোই ফুলে-ফেঁপে উঠছে। "প্রতি বছর পৃথিবীতে মোট যতো অস্ত্র এবং সামরিক প্রয়োজনে ব্যয় হয় তার মূল্য চার লক্ষ কোটী টাকা।" ভাবতে অবাক লাগে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক বছরে যত টাকা ব্যয়িত হয় সেই একই পরিমাণ টাকা বিশ্বের একদিনের সামরিক ব্যয়ের পিছনে খরচ হয়। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি সামরিক খাতে বায়বরাদ্দ বাড়াতে যাতে বাধ্য হয় সেজন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টির কাজে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিত্যনতুন ইন্ধন যুগিয়ে চলে। এর ফলে ভারত-বাংলাদেশ, ভারত-পাকিস্তান, পাকিস্তান-আফগানিস্তান, ইরান-আফগানিস্তান, ইরান-ইরাক, ইরাক-সিরিয়া, সিরিয়া-ইজিপ্ট, ইজিপ্ট-লিবিয়া, লিবিয়া-আলজিরিয়া, আলজিরিয়া-মরক্কো প্রভৃতি রাষ্ট্রের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়েছে। তবে আশার কথা—বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠতে শুরু করেছে। আজ ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকাতে রেগন-নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, শোভাযাত্রা চলছে। এমন কি যুদ্ধবাজ ইসরাইলের পথে পথে হাজার হাজার মানুষ শোভাযাত্রায় সামিল হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, হাতে হাত মিলিয়ে তৃতীয় বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবাজ নীতি ও নয়া-ঔপনিবেশিক চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

৪। সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টির উপাদানসমূহ (**Factors leading to Imperialism**)

সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবের পশ্চাতে কতকগুলি উপাদান কাজ করে। প্রধান প্রধান উপাদানগুলি হোল :

(১) সাম্রাজ্যবাদের প্রবক্তাগণ মনে করেন যে, একটি সুসভ্য জাতির উদ্দেশ্য হোল অসভ্য ও বর্বর জাতিগুলিকে সভ্যতার আলো দান করা। তথাকথিত অসভ্য, বর্বর ও অনুন্নত জাতিগুলিকে সুসভ্য ও উন্নত করার তথাকথিত 'পবিত্র কর্তব্য' পালনের নামে অনেক সময় সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি হয়।

বিকৃত জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাবাদ একটি মহান্ আদর্শ। 'নিজে বাঁচো, অপরকে বাঁচতে দাও'—এই হোল প্রকৃত জাতীয়তাবাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু জাতীয়তাবাদ যখন বিকৃত আকার ধারণ করে তখন তা কার্যতঃ অন্য জাতিগুলিকে নিকৃষ্ট বলে মনে করতে শিক্ষা দেয়। আমার জাতি, আমার সভ্যতা, আমার সংস্কৃতি, আমার ধর্ম ইত্যাদি হোল অন্যান্য জাতি, ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক বড়—এই মনোভাব বিকৃত জাতীয়তাবাদের জনক। এর ফলে অন্যান্য জাতিকে পদানত করে নিজেদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদি গ্রহণ করতে যখনই একটি জাতি চেষ্টা করে তখনই সাম্রাজ্যবাদের জন্ম হয়। উদাহরণস্বরূপে বলা যায় যে, ১৮৭৭ সালে সিসিল (রোডস্) ঘোষণা করেন যে, "আমরাই হলাম বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি (the first race)। তাই বিশ্বের যত বেশী দেশে আমরা বাস করব ততই মনুষ্যজাতির মঙ্গল সাধিত হবে।" ব্রিটিশ জাতির এই শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উৎপত্তি ঘটে।

তাছাড়া খ্রীষ্টান মিশনারীরাও একথা প্রচার করতেন যে, বিশ্বের আদিম ও অসভ্য জাতিগুলিকে মুক্ত করার দায়িত্ব ইংরেজদের। লর্ড লুগার (Lord Lugard) মনে করতেন যে, ব্রিটিশরাই হোল শ্রেষ্ঠ জাতি। তাই বিশ্বের অন্যান্য জাতিকে উন্নত করার দায়িত্ব মূলতঃ তাঁদেরই। আধুনিককালে জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্বের কথা প্রচার করে হিটলার অনুরূপভাবে জার্মানিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এইভাবে বিকৃত বা স্বার্থপর জাতীয়তাবাদ কোন-না-কোনভাবে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের দোহাই দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের ফিরিওয়ালা হিসেবে কাজ করে।

উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা

(২) অনেক সময় একটি দেশের উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার পুনর্বাসনের জন্য নতুন নতুন দেশজয়ের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে অস্বাভাবিকভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে সেই সব রাষ্ট্রে তাদের বসতির ব্যবস্থা করা অসম্ভব হয়ে পড়লে নতুন নতুন উপনিবেশ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলতে দেখা যায়। ফলে ঐ সব রাষ্ট্রে সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি হয়। ১৯৪১ সাল পর্যন্ত জাপান এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ব্রিটেনেও বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদী নীতি এইভাবে চরিতার্থ করতে শুরু করে। কিন্তু অনেকের মতে, এই ধারণা সত্য নয়। কারণ কোরিয়া, ফরমোজা এবং মাঞ্চুরিয়াতে যেসব জাপানী বসবাস করতে শুরু করে তাদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য।

সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলির উপর প্রাধান্য-বিস্তারের প্রচেষ্টা

(৩) সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলির উপর বৃহৎ শক্তিগুলির আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা থেকে অনেক সময় সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ঘটে। গ্রেট ব্রিটেন এই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে জীব্রাল্টার (Gibralter), মাল্টা (Malta), এডেন (Aden), সিঙ্গাপুর (Singapore), প্রভৃতি স্থানের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ সব স্থানের উপর প্রাধান্য বিস্তার করার জন্য সচেষ্ট। উদাহরণস্বরূপ দিয়াগো গার্সিয়ার উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তারের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টার কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আদর্শগত কারণ

(৪) অনেকের মতে, আদর্শগত ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা থেকে সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি হতে পারে। বর্তমান বিশ্বে ক্রমবর্ধমান কমিউনিস্ট প্রভাবকে রোধ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী তার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে কাজে লাগাচ্ছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পশ্চাতে আদর্শবাদ যে একটি বড় উপাদান সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বস্তুতঃ, ভিয়েতনাম, লাওস, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের উপর মার্কিন সরকারের বর্বর ও পৈশাচিক আক্রমণের পশ্চাতে যে তাদের আদর্শগত সাম্রাজ্যবাদী ইচ্ছা কাজ করছে সে বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করার সম্ভবতঃ কোন অবকাশ নেই।

(৫) আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অনেকেই এবং বিশেষতঃ মার্কসবাদীরা প্রধানতঃ অর্থনৈতিক কারণে সাম্রাজ্যবাদ জন্মগ্রহণ করে বলে মনে করেন। ইংল্যান্ডে শিল্প-

বিপ্লবের পর উৎপাদন ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হওয়ার ফলে উৎপাদন অনেক বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন দেশের পুঁজিপতিরা কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য, উৎপাদিত শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য এবং উদ্বৃত্ত পুঁজি বিনিয়োগের জন্য সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা একান্তভাবে অনুভব করে। কেবলমাত্র বিদেশে ব্যবসাবাণিজ্য করেই পুঁজিপতিরা সন্তুষ্ট হতে পারে না। অন্যান্য দেশের পুঁজিপতিদের প্রতিযোগিতার হাত থেকে নিজেদের বাজার রক্ষা করার জন্য তারা বিভিন্ন দেশের উপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। বড় বড় ব্যাঙ্কগুলি ব্যবসায়ীদের ঋণ দিয়ে সাহায্য করে।

অর্থনৈতিক কারণ

বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টির পশ্চাতে যে-সব উপাদানের কথা বলা হোল এগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক উপাদানই হোল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। আপাতদৃষ্টিতে সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টির পশ্চাতে যে কারণই থাকুক না কেন, একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, সর্বপ্রকার সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টির পশ্চাতে রয়েছে অর্থনৈতিক স্বার্থ। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে এমিল বার্নস্ বলেন, "ভাসাভাসাভাবে দেখলে মনে হতে পারে যে, এই নীতির (সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার নীতি) মূলে কাজ করে যতদূর সম্ভব নিজ দেশের পতাকাকে উড্ডীয়মান দেখার এক বিমূর্ত আকাঙ্ক্ষা কিন্তু আর একটু গভীরভাবে দেখলে বোঝা যায় যে, এই বিস্তারের নীতির মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক কারণ। সেই কারণ সম্বন্ধে কখনও বলা হয় যে, তা হল বাজারের সন্ধান, কখনও বলা হয় বিশেষ বিশেষ কাঁচামাল ও খাদ্যের সন্ধান, আবার কখনও বলা হয় নিজ দেশের অতিরিক্ত লোকসংখ্যার জন্য স্থান অন্বেষণ।"

অর্থনৈতিক উপাদানই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ

৫। সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় মুক্তির-আন্দোলন (Imperialism and National Liberation Movement)

সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার সময় বুর্জোয়ারা সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার ধ্বনি তুলেছিল। কিন্তু পুঁজিবাদ তার বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে এসে সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকৃতিতে আসে প্রচণ্ড পরিবর্তন। প্রতিক্রিয়ার দুর্গ, বৈপ্লবিক ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির উপর অত্যাচার ও নির্মম দমনপীড়ন হয়ে উঠে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির প্রধান নীতি। সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসনে দুর্বলতর জাতিগুলির স্বাধীনতাই শুধু ক্ষুণ্ণ হয়নি, সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তারা নির্মমভাবে শোষিত হয়েছে। পৃথিবীর বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের উপর সাম্রাজ্যবাদ ঔপনিবেশিক নিগড় চাপিয়ে দেয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে বিশ্বের বিভিন্ন উপনিবেশগুলিতে শুরু হয় জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার মুক্তিকামী সংগ্রামী মানুষ সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। প্রধানতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বিশ্বের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম প্রবল আকার ধারণ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়ায় মহান্ অক্টোবর বিপ্লবের (১৯১৭) সাফল্য এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের উদ্ভব

সোভিয়েত কমিউনিস্টদের হাতে ফ্যাসীবাদের পরাজয় বিভিন্ন দেশের মানুষকে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা যোগায়।

ঔপনিবেশিক পীড়নের ভার কোনো-না-কোনোভাবে সহ্য করতে হয় পরাধীন দেশের শ্রমিক, কৃষক, জাতীয় বুর্জোয়া ও জাতীয় বুদ্ধিজীবী প্রমুখ সকলকেই। তাই তারা সকলেই জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। তবে কেবলমাত্র সামন্ত ও উপজাতি-প্রধানদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা এবং জমিদাররা এই মুক্তি-সংগ্রামের বিরোধিতা করে। তাছাড়া, স্থানীয় বুর্জোয়াদের একাংশ, যারা বিদেশী কোম্পানির কাজ করে মুনাফা লুটে তারাও অনেক সময় মুক্তি-সংগ্রামের বিরোধিতা করে। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারাও দেশপ্রেমের খাতিরে মুক্তি-সংগ্রামের সমর্থন করে। তবে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে শ্রেণী-সচেতন শ্রমিক-শ্রেণী। কৃষকেরা হোল জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের মূল গণশক্তি এবং সর্বহারাদের প্রধান সহযোগী। ভূমিহীনতা, ঔপনিবেশিক প্রশাসনের স্বেচ্ছাচার, জমিদার ও কুসীদজীবীদের জুলুম ইত্যাদিতে অতিষ্ঠ হয়ে কৃষকেরা মুক্তি-আন্দোলনে সামিল হয়। এই কৃষকেরা মুক্তি-আন্দোলনে কার পক্ষে যাবে তার উপর নির্ভর করে মুক্তি-আন্দোলনের নেতৃত্ব কার হাতে থাকবে। কৃষকেরা যদি শ্রমিক-শ্রেণীর সঙ্গে থাকে তা হলে মুক্তি-আন্দোলন শুধুমাত্র বৈদেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়েই ক্ষান্ত হয় না, সর্বপ্রকার পুঁজিবাদের অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা তখন তাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যেখানে নেতৃত্ব জাতীয় পুঁজিপতিদের হাতে থাকে সেখানে কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেই মুক্তি-আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। গণ-সাধারণতন্ত্রী চীন, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশের মুক্তি-আন্দোলনের নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণীর হাতে থাকার ফলে সেই সব দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, বার্মা, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশের জাতীয় মু- -আন্দোলনের নেতৃত্ব জাতীয় বুর্জোয়াদের হাতে থাকায় সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব হয়নি। ঔপনিবেশিকদের বিতাড়িত করে জাতীয় বুর্জোয়ারা এইসব দেশে প্রাধান্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে। তাছাড়া, এমন কতকগুলি রাষ্ট্র রয়েছে যারা স্বাধীনতালাভের অনতিকাল পরেই সাম্রাজ্যবাদী জোটে যোগদান করেছে। থাইল্যান্ড, ফিলিপিনস্ প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের প্রকৃতি

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এশিয়ার মুক্তি-আন্দোলন আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার শোষিত ও নির্যাতিত মানুষদের মুক্তি-সংগ্রাম শুরু করার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

এশিয়ার মুক্তি-আন্দোলনের পশ্চাতে সাম্যবাদ, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি উপাদান কাজ করেছে। সাম্যবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে চীন, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে মুক্তি-আন্দোলন শুরু হয়। ঐসব দেশে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে যে মুক্তি-সংগ্রাম শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তা সাফল্যমণ্ডিত হয়। জাপানী সামরিক-ফ্যাসীবাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় গণতান্ত্রিক ভিয়েতনাম, ১৯৪৯ সালে সাফল্যমণ্ডিত হয় চীনের মহাবিপ্লব এবং প্রথমে জাপানী

এশিয়ার জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের স্বরূপ

ফ্যাসীবাদ এবং পরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করে ১৯৫৩ সালে গঠিত হয় উত্তর কোরিয়ার সমাজতান্ত্রিক সরকার। দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী জনগণ সুদীর্ঘ কাল ধরে ফরাসী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে জয়যুক্ত হয়। বর্তমানে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম ঐক্যবদ্ধ হয়ে অবিভক্ত ভিয়েতনামের প্রতিষ্ঠা করেছে। অনুরূপভাবে লাওসের বিপ্লবী জনগণ জাপানী এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র মুক্তি-সংগ্রামে বিজয়ী হয়েছে। একইভাবে কাম্বোডিয়ার জনসাধারণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের পুতুল সরকারের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে এশিয়ার মাটিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সমাধি রচনা করেছে। ঐসব রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এশিয়া মহাদেশে ভারতবর্ষ, সিংহল (বর্তমানে শ্রীলঙ্কা), ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে মুক্তি-আন্দোলন শুরু হয় তার নেতৃত্ব ছিল কিন্তু জাতীয় বুর্জোয়াদের হাতে। তাই মুক্তি-আন্দোলনে জয়যুক্ত হওয়ার পর এইসব দেশের জনগণ পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত হলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা পেল না।

মধ্য প্রাচ্যে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের স্বরূপ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়ে, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় যে-ব্যাপক উপনিবেশবাদ-বিরোধী মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় তার ফলে সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, লিবিয়া, সুদান, টিউনিশিয়া ও মরক্কো ১৯৪৫ সালের পরে স্বাধীনতা লাভ করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে মিশর ও সিরিয়া ঐক্যবদ্ধ আরব প্রজাতন্ত্র গঠন করে। ১৯৫৮ সালে ইরাকে বিপ্লবের ফলে প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এইভাবে মধ্যপ্রাচ্যে আরবদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের বিশেষতঃ ব্রিটিশ ও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যু পরোয়ানা জারী করেছে। মধ্যপ্রাচ্যের তৈলসম্পদ যা সাম্রাজ্যবাদীদের হাতছানি দিয়ে ডাকত তা আজ তাদের হাতের বাইরে চলে গেছে। মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সাফল্যের পশ্চাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এশিয়ার বুকে ডলার সাম্রাজ্যবাদ

এশিয়ার সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলির অনেকেই বর্তমানে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করেছে। ফলে তারা ডলার সাম্রাজ্যবাদের শিকার হয়ে পড়েছে। তবে ব্যতিক্রম হোল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি। অবশ্য একথা সত্য যে, এশিয়ার অ-সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির জনগণ উত্তরোত্তর ডলার সাম্রাজ্যবাদের বন্ধন ছিন্ন করার জন্য তাদের জাতীয় সরকারের উপর চাপ দিচ্ছে। ফিলিপিনস, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি মার্কিন শক্তিজোটে যোগ দিয়ে কার্যতঃ নিজেদের অর্থনৈতিক দাসত্বের বন্ধনে প্রত্যক্ষ ভাবে আবদ্ধ করে ফেলেছে। বর্তমানে এশিয়ার বুক থেকে ঔপনিবেশিকতা পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। এখনও ব্রুনেই ও হংকং ব্রিটিশ উপনিবেশ হিসেবে এবং ম্যাকাও পর্তুগালের উপনিবেশ হিসেবে রয়ে গেছে। ১৯৭৬ সালের ১৭ই জুলাই পর্তুগালের উপনিবেশ পূর্ব তিমরকে ইন্দোনেশিয়া বলপূর্বক অধিকার করে নেয়। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার এই আগ্রাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে ফ্রেতিলিনের নেতৃত্বে পূর্ব তিমরে মুক্তিযুদ্ধ এখনও চলছে।

সাম্প্রতিককালের বিশ্বরাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হোল আফ্রিকা মহাদেশের অধিকাংশ মানুষের ঔপনিবেশিকতার নাগপাশ থেকে মুক্তি। এই মহাদেশের প্রায় সবটাই ছিল ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির উপনিবেশ। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ইথিওপিয়া। তাও আবার ত্রিশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে মুসোলিনী কর্তৃক অধিকৃত হয়। সমগ্র আফ্রিকা পরাধীনতার অন্ধকারে তলিয়ে যায়। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই দক্ষিণ আফ্রিকায় শুরু হয়েছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ জার্মান সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্তিলাভের আশায় ইংরেজ পক্ষকে সমর্থন করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা প্রতারিত হন। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই আশ্বাসে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন যে, যুদ্ধে তাঁরা বিজয়ী হলে আফ্রিকার অধিকাংশ উপনিবেশকে স্বাধীনতা প্রদান করা হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আফ্রিকার রাজনৈতিক সচেতন মানুষ ফ্যাসিবাদের ধ্বংস সাধনে মিত্রপক্ষকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে। কিন্তু যুদ্ধোত্তর আফ্রিকার মানুষ অবাক বিস্ময়ে দেখল যে, ইউরোপ ও এশিয়ার যেসব স্থান সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীনে গিয়েছিল সেই-সব দেশ শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতাই লাভ করল না, তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য ও সমর্থনে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছে। অথচ, মিত্রপক্ষ তাদের সঙ্গে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। একমাত্র ইথিওপিয়া ছাড়া অন্য কোন দেশ রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেল না। তাও আবার ইথিওপিয়ার সরকারকে ইঙ্গ-মার্কিন জোটের দয়ার উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে হোল। আফ্রিকার নেতৃবৃন্দের নিকট পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মুখোশ খুলে পড়ল। তাঁরা যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারলেন যে সশস্ত্র মুক্তি-যুদ্ধ শুরু করা না হলে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। শুরু হয় দুর্বার মুক্তি সংগ্রাম। আলজিরিয়া, অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, গিনি-বিসৌ, কেপভার্দি, কেনিয়া, জাম্বিয়া, নাইজিরিয়া প্রভৃতি দেশে মুক্তি সংগ্রাম শুরু হয় ষাটের দশকের কাছাকাছি সময় থেকে। মুক্তি-আন্দোলনের ফলে ১৯৬০ সালে আফ্রিকার ১৭টি দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৬৩ সালে যখন 'আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা' (Organisation of African Unity) গঠিত হয় তখন ৪৬টি দেশ তার সভ্যপদ গ্রহণ করে। এর পর প্রতি বছর একটি-দুটি করে দেশ ঔপনিবেশিকতার নিগড় থেকে মুক্তিলাভ করতে থাকে। কিন্তু পর্তুগীজ উপনিবেশগুলিতে সুদীর্ঘ দিন ধরে মুক্তি-সংগ্রাম চলতে থাকে। ডলার সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতায় পর্তুগালের ফ্যাসিস্ট সালাজার চক্র নিষ্ঠুর অত্যাচারের মাধ্যমে মুক্তি-সংগ্রামকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খোদ পর্তুগালে নিষ্ঠুর সালাজার চক্রের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। নতুন সরকার ১৯৭৫ সালের মধ্যে গিনি-বিসৌ, কেপভার্দি, মোজাম্বিক, সাওতোম, প্রিন্সেপে এবং অ্যাঙ্গোলাকে স্বাধীনতা প্রদান করে। এখনও কিন্তু আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক শাসনের পরিপূর্ণ অবসান ঘটেনি। সেন্ট হেলেনা, এসেনসন, চাগোস দ্বীপপুঞ্জ এবং ট্রিস্টান দা কুন হা —এই চারটি এখনও ব্রিটেনের উপনিবেশ হিসেবে থেকে গেছে। তাছাড়া, দক্ষিণ

আফ্রিকায় মুক্তি আন্দোলনের স্বরূপ

রোডেশিয়া এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ উপনিবেশ, যদিও সেখানকার সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গরা নিজেদের 'স্বাধীন' বলে ঘোষণা করেছে। ব্রিটেন ছাড়া ফ্রান্স এবং স্পেনেরও কয়েকটি উপনিবেশ এখনও আফ্রিকাতে আছে। স্পেনের উপনিবেশ হোল মেলিলা ও সেউতা, ফ্রান্সের অধীনে রয়েছে মোট চারটি ছোট ছোট উপনিবেশ। স্পেন পশ্চিম সাহারার উপনিবেশ ছেড়ে চলে এলেও তারই সহযোগিতায় মরিতানিয়া ও মরক্কো ঐ অঞ্চল বলপূর্বক অধিকার করে নিয়েছে। তবে পশ্চিম সাহারাকে মুক্ত করার জন্য জনসাধারণ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে আফ্রিকা মহাদেশের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ উপনিবেশ হোল নামিবিয়া যা দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণতন্ত্রের শ্বেতাঙ্গ স্বৈরাচারী সরকারের অধীন। বর্তমানে আফ্রিকার দক্ষিণাংশে দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণতন্ত্র, দক্ষিণ রোডেশিয়া ও নামিবিয়াই হোল উপনিবেশবাদের বৃহৎ ঘাঁটি। যদিও এই দেশগুলিকে প্রচলিত অর্থে উপনিবেশ বলা যায় না, তথাপি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়তায় ঐ সব দেশের সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণকায় জনগণের উপর সাম্রাজ্যবাদী প্রভুসুলভ অত্যাচার চালায় এবং বর্ণবিদ্বেষ প্রচার করে। কিন্তু ঐ তিনটি দেশে উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে দুর্বার গতিতে মুক্তি-আন্দোলন চলছে।

আফ্রিকায় ডলার সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার

আফ্রিকা মহাদেশের ছোটবড় অর্ধশতাধিক দেশে উপনিবেশবাদের অবসান ঘটলেও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে তাদের অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এই দেশগুলির অধিকাংশই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। মরক্কো, টিউনিসিয়া, লেসোথো, জায়েরে বরুন্দি ইত্যাদি দেশে পুঁজিবাদী সরকারের উপর সামন্তদের প্রভাব অপরিসীম। লিবিয়া, সোমালিয়া, কেনিয়া, জাম্বিয়া, নাইজিরিয়া প্রভৃতিও পুঁজিবাদী দেশ। ঐ সব দেশের নেতৃবৃন্দ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ করলেও বর্তমানে তাঁরা ডলার সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদের কাছ থেকে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য নিতে কুণ্ঠিত নন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তারা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারের সুযোগ নিয়ে আফ্রিকার প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে উত্তেজনা, সংঘর্ষ, এমনকি যুদ্ধও ঘটাচ্ছে। উগান্ডা, কেনিয়া, লিবিয়া, মিশর, ইথিওপিয়া, সোমালিয়া, আলজিরিয়া, মরক্কো প্রভৃতি দেশের মধ্যে সংঘর্ষ ও যুদ্ধ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আফ্রিকায় ডলার সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা

তবে আফ্রিকা মহাদেশের কয়েকটি দেশ পশ্চিম ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে সুদীর্ঘকাল ধরে রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা লাভ করে। এই সব রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের চরম বিরোধী এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি সাধারণভাবে আস্থাশীল। এই দেশগুলির মধ্যে আলজিরিয়া, গিনি বিসৌ, কেপভার্দে, অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে ঐসব দেশের নতুন সরকারকেও প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক সরকার বলে অভিহিত করা যায় না। বস্তুতঃ সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের কোন দেশেই শ্রমিকশ্রেণী

যথেষ্ট সংঘবদ্ধ ও শ্রেণীসচেতন নয়। সমগ্র আফ্রিকায় শ্রেণীসচেতনতার ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা শ্রমিকের সংখ্যা মাত্র পঞ্চাশ লক্ষের মত। তাই আফ্রিকার মুক্তি-আন্দোলন সমাজতন্ত্রের পথে পরিচালিত হতে পারেনি।

লাতিন আমেরিকায় সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি ও জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন

এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলি যেমন সুদীর্ঘকাল ধরে ঔপনিবেশিক শাসনে শোষিত ও অত্যাচারিত হয়েছিল, লাতিন আমেরিকার দেশগুলি কিন্তু সেরূপ প্রত্যক্ষভাবে ঔপনিবেশিকতার নিগড়ে বাঁধা পড়েনি। লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ রাষ্ট্রই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছিল। কিউবা, পানামা প্রভৃতি রাষ্ট্র বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির কর্তৃত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে। কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে লাতিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি স্বাধীন হলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলার সাম্রাজ্যবাদের কাছে সম্পূর্ণভাবেই বাঁধা পড়েছে। লাতিন আমেরিকার রপ্তানিযোগ্য কাঁচা মালের প্রায় সবটাই ক্রয় করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অন্যদিকে ভোগ্যদ্রব্যাদি ও শিল্পজাত সামগ্রীর জন্য তারা বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরই নির্ভরশীল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বল্পমূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে লাতিন আমেরিকার কাঁচামাল ক্রয় করে এবং তা থেকে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ওইসব দেশে বহুমূল্যে বিক্রয় করে। ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে লাতিন আমেরিকার দেশগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিপতিদের দ্বারা নির্মমভাবে শোষিত হতে থাকে। লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে কোন প্রকার ভূমিসংস্কার করা হয় নি। ফলে লক্ষ লক্ষ কৃষক এখনও ভূমিহীন থেকে গেছে। প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলির স্বাধীন কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ঐ সব দেশের জাতীয় বুর্জোয়ারাও এতই দুর্বল যে তারা মার্কিন পুঁজিপতিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে ভয় পায়।

লাতিন আমেরিকায় ডলার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুক্তি-সংগ্রাম

কিন্তু সাম্প্রতিককালে লাতিন আমেরিকায় পরিবর্তন ঘটেছে। সেখানকার মানুষ কাগজকলমের স্বাধীনতা অপেক্ষা প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তথা ডলার সাম্রাজ্যবাদের বন্ধন ছিন্ন করার জন্য নবপর্যায়ে মুক্তি-আন্দোলন শুরু করেছে। লাতিন আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লব ত্বরান্বিত হয়েছে উত্তরোত্তর শ্রমিক-শ্রেণীর সংগঠন বৃদ্ধির ফলে। বর্তমানে লাতিন আমেরিকার বহুদেশে শ্রমিকশ্রেণী অর্থনৈতিক স্বার্থ ছাড়াও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ডলার সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেছে। উদাহরণ হিসেবে আর্জেন্টিনার কথা বলা যেতে পারে। ১৯৫৮ সালে ঐদেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় বিপ্লবী শক্তিগুলি যে প্রগতিশীল কর্মসূচী ঘোষণা করে তার প্রতি অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলগুলি সমর্থন জানায়। অনুরূপভাবে চিলি, ভেনেজুয়েলা, কিউবা, ব্রাজিল, উরুগুয়ে প্রভৃতি দেশে ডলার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশের কৃষক সম্প্রদায় রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে উঠে। তারা সামন্ততন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, লাতিন আমেরিকার কৃষকদের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর সমন্বয় সাধিত না হওয়ার ফলে ঐসব দেশে জাতীয় মুক্তি-

আন্দোলন আশানুরূপভাবে ব্যাপকতা লাভ করতে পারেনি। তবে লক্ষণীয় বিষয় হোল, সাম্প্রতিককালে লাতিন আমেরিকার কয়েকটি দেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দোসর একনায়কতন্ত্রী সরকারের পতন ঘটিয়ে নতুন সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছে। তারা জাতীয় স্বার্থে তথা জনগণের স্বার্থে সর্বপ্রকার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে বলে ঘোষণা করেছে। পেরু, বলিভিয়া, কলম্বিয়া প্রভৃতি দেশের কথা এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য; ১৯৫৮ সালে ভেনেজুয়েলাতে জাতীয় বিপ্লব আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ইতিহাসের একটি নতুন সংযোজন। কিন্তু লাতিন আমেরিকার বুকে যে দেশটি সর্বাপেক্ষা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তা হোল কিউবা। ১৯৫৯ সালে ফিদেল কাস্ত্রো, চে-গুয়েভারা প্রমুখ বিপ্লবীদের নেতৃত্বে ঐ দেশে মার্কিন দোসর বাতিস্তা সরকারের পতন ঘটিয়ে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লাতিন আমেরিকার জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তার প্রমাণ, সাম্প্রতিককালে চিলিতে বামপন্থী আলেন্দে সরকারের পতন। তবে লাতিন আমেরিকার জনগণ ক্রমেই সচেতন ও সংঘবদ্ধ হচ্ছে। এর ফলে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বন্ধন থেকে তাদের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে।

৬। বিশ্বশান্তির সমস্যা (The Problems of World Peace)

প্রতিটি যুদ্ধের বিভীষিকা ও নৃশংসতা মানুষকে শান্তিকামী করে তোলে। কিন্তু মানব-ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা বড় শিক্ষা হোল এই যে, একটি যুদ্ধের ভয়াবহ স্মৃতি বিস্মৃতির অন্তরালে তলিয়ে যাবার আগেই শুরু হয় স্বার্থের হানাহানি; শুরু হয় নতুন করে আর একটি যুদ্ধ। কিন্তু যে পৃথিবীতে আমরা বাস করছি তার সঙ্গে পুরানো পৃথিবীর অনেক পার্থক্য। উৎপাদন, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অবিশ্বাস্য উন্নতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবনীয় অগ্রগতি একদিকে যেমন সমগ্র পৃথিবীকে আমাদের ঘরের সামনে এনে দিয়েছে, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি দিক থেকে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল করে তুলেছে; অন্যদিকে তেমনি যুদ্ধের প্রকৃতি ও কলাকৌশলের ক্ষেত্রেও বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধন করেছে। বর্তমান যুগ হোল আণবিক যুগ। এই যুগে অতীতের যুদ্ধ কৌশল অকাম্য এবং অপ্রতুল বলে বিবেচিত হয়। বিংশ শতাব্দীর যুদ্ধ পারমাণবিক অস্ত্রাদির দ্বারা পরিচালিত হয় বলে তা অতি সহজেই সর্বাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। নতুন নতুন মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে যুদ্ধের ধ্বংসকারী ক্ষমতা ও ভয়াবহতা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষতঃ পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়াবহ উন্নতি মানুষকে আজ এ কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, আগামী দিনের বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবী থেকে সমগ্র মানবসমাজকেই নিশ্চিহ্ন করে দেবে। বস্তুতঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহত হয় কোটি কোটি মানুষ; ধ্বংস হয় বহু শহর, বন্দর ও নগর। পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকেন অগণিত নরনারী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা ও ভয়ংকরতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী। এই প্রচন্ড ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে মানুষ

যুদ্ধের ভয়াবহতা ও বিশ্বশান্তির প্রয়োজনীয়তা

একথা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারল যে, মানবজাতির ভবিষ্যৎকে নিরাপদ করতে হলে যুদ্ধকে দিতে হবে চিরবিদায়; শান্তিকে করতে হবে সুপ্রতিষ্ঠিত। বস্তুতঃ মানবসভ্যতার অগ্রগতির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হোল যুদ্ধ। জাতিসমূহের মধ্যে অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতা একদিকে যেমন তাদের মধ্যে বৈরিতার মনোভাব জাগিয়ে তুলে, অন্যদিকে তেমনি প্রতিটি জাতির জাতীয় সম্পদের একটি বৃহৎ অংশ অস্ত্রসজ্জায় ব্যয়িত হয়; ফলে ঐ সব জাতির অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথ অবরুদ্ধ হয়। মানবসভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে, তার অগ্রগতির ধারাকে অপ্রতিহত রাখতে হলে বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজন। তাই যুগে যুগে শান্তির পূজারী মহামনীষিবৃন্দ যুদ্ধকে শুধু ঘৃণাই করেন নি, যুদ্ধের হাত থেকে বিশ্বের মানুষকে মুক্তি দেওয়ার কথা তথা স্থায়ী বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার কথা প্রচার করেছেন। কিন্তু তাঁদের সেই স্বপ্ন বর্তমান শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর সর্বপ্রথম বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক বাস্তব প্রয়াস চালানো হয়। তার ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় 'জাতিসংঘ' বা 'লীগ অব নেশনস' (League of Nations)।

১৯১৯ সালের ২৭শে এপ্রিল 'প্যারিস শান্তি সম্মেলনে' (The Paris Peace Conference) জাতিসংঘের 'চুক্তিপত্র' (Convenant) গৃহীত হয়। ১৯২০ সালে ১০ই জানুয়ারী থেকে জাতিসংঘ বাস্তবে কাজ শুরু করে। 'চুক্তিপত্রে'র প্রস্তাবনায় ঘোষণা করা হয় যে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বন্ধন সুদৃঢ় করার মাধ্যমে বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই হোল জাতিসংঘের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের বাস্তব রূপায়ণের জন্য জাতিসংঘের সদস্য-রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধের পথ পরিহার করে ন্যায়ের ভিত্তিতে সম্মানজনক সম্পর্ক গড়ে তুলতে এবং আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তিসমূহ মান্য করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। চুক্তিপত্রে বলা হয় যে, কোন সদস্য রাষ্ট্র যদি চুক্তিপত্র অস্বীকার করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় তাহলে অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রগুলি সেই যুদ্ধ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলে ধরে নেবে এবং আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ব্যবসাবাণিজ্য ও অন্যান্য অর্থনৈতিক যোগাযোগ ছিন্ন করবে। প্রয়োজন হলে চুক্তিপত্রের শর্তাবলী সংরক্ষণের জন্য সদস্যরাষ্ট্রগুলি উপযুক্ত পরিমাণ সৈন্য-সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। তাছাড়া, সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যেকার যে-কোন বিরোধের শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিষ্পত্তিকরণের জন্যও তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। জাতিসংঘের শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যসমূহের বাস্তব রূপদানের দায়িত্ব অর্পিত হয় সভা (Assembly), পরিষদ (Council), প্রধান কর্মসচিব (Secretary General), স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত (Permanent Court of International Justice) প্রভৃতি সংস্থার হাতে। জাতিসংঘের প্রচেষ্টায় ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত বিশ্বে মোটামুটি শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রীস বুলগেরিয়া সমস্যা, পোল্যান্ড লিথুয়ানিয়া সমস্যা, তুরস্ক ইরাক সীমান্ত সমস্যা ইত্যাদির সমাধান করে জাতিসংঘ শান্তি স্থাপনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই যে জাতিসংঘ শান্তি স্থাপনে সফল হয়েছিল একথা বলা যায় না। ১৯৩০ সালের পর বিশ্বশান্তি স্থাপনে জাতিসংঘের ইতিহাস ব্যর্থতার ইতিহাস মাত্র। ১৯৩১ সালে জাপান

জাতিসংঘের শান্তি স্থাপনের চেষ্টা

কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ, ১৯৩৫ সালে ইতালি কর্তৃক ইথিওপিয়া আক্রমণ, ১৯৩৬ সালে স্পেনের গৃহযুদ্ধ ইত্যাদিতে জাতিসংঘ শান্তি স্থাপনে কোন কার্যকরী ভূমিকাই পালন করতে পারেনি।

নিরস্ত্রীকরণ ছাড়া যে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব—একথা জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাতাগণ সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই চুক্তিপত্রের ৮নং ধারাতে নিরস্ত্রীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। নিরস্ত্রীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল পরিষদের হাতে। ১৯২০ সালে পরিষদ 'অস্থায়ী মিশ্র কমিশন' (Temporary Mixed Commission) গঠন করে। এই কমিশন প্রতিটি রাষ্ট্রের সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করার জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করে। কিন্তু কোন রাষ্ট্রই এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে সম্মত না হওয়ায় ১৯২২ সালে সভা কমিশনকে প্রতিটি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি খসড়া চুক্তি প্রস্তুত করতে অনুরোধ জানায়। কমিশন তখন নিরাপত্তার সঙ্গে সংযুক্ত করে নিরস্ত্রীকরণের জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করে। কিন্তু মতবিরোধের দরুন এই প্রস্তাবটিও গৃহীত হয়নি। এরপর ১৯২৫ সালে সভা একটি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আহ্বান করার জন্য পরিষদকে নির্দেশ দেয়। পরিষদ 'নিরস্ত্রীকরণের জন্য একটি প্রস্তুতি কমিশন' (Preparatory Commission for Disarmament) গঠন করে। ১৯২৬ সালের জানুয়ারি মাসে কমিশন কাজ আরম্ভ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন উক্ত কমিশনে যোগদানে সম্মত হয়। কিন্তু পদাতিক সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করার ব্যাপারে সদস্যরা ঐকমত্যে উপনীত হলেও একটি দেশের সৈন্যসংখ্যা হিসেব করার পদ্ধতি নিয়ে সদস্যদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব কমিশনে উত্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'অস্ত্রশস্ত্র' বলতে কি বোঝায় এবং কিভাবে নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব তা নিয়ে বিরোধ তুঙ্গে উঠলে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধি লিটভিনফ্ (Litvinov) একটি প্রস্তাব পেশ করলেন যে, অবিলম্বে প্রতিটি দেশকে অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণভাবে বিলোপ করতে হবে। কিন্তু এরূপ প্রস্তাব কেউ গ্রহণ করতে সম্মত হোল না। এইভাবে পারস্পরিক মতবিরোধের দরুন ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে কমিশন অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে 'খসড়া চুক্তি' (Draft Covenant) প্রস্তুত করেছিল তা কার্যতঃ মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তবে জাতিসংঘের 'পরিষদ' ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জেনেভাতে একটি 'আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন' (Disarmament Conference) আহ্বান করে। এই সম্মেলনও নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে ঐকমত্যে উপনীত হতে ব্যর্থ হয়। প্রস্তাব, পাল্টা প্রস্তাব, এমন কি সম্মেলন পরিত্যাগ ইত্যাদি ঘটনা জাতিসংঘের নিরস্ত্রীকরণের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়।

জাতিসংঘের নিরস্ত্রীকরণের প্রচেষ্টা ও ব্যর্থতা

জাতিসংঘ যেমন নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি রক্ষার চেষ্টা করেছিল, তেমনি কয়েকটি রাষ্ট্র নিজেদের উদ্যোগের মাধ্যমেও নিরস্ত্রীকরণের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। ১৯২১ সালের ওয়াশিংটন সম্মেলন (Washington Conference), ১৯২৭ সালের জেনেভা সম্মেলন ইত্যাদি হোল তার

জাতিসংঘের বাইরে নিরস্ত্রীকরণের প্রচেষ্টা

প্রমাণ। কিন্তু এই সব সম্মেলনও নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সমর্থ হয়নি।

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের ব্যর্থতার ফলে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের লেলিহান অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয়ে উঠে। কিন্তু প্রশ্ন হোল জাতিসংঘের এই ব্যর্থতার কারণ কি? বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের ব্যর্থতার উল্লেখযোগ্য কারণগুলি হোল:

শান্তিস্থাপনে জাতিসংঘের ব্যর্থতার কারণ

(১) চুক্তিপত্রের মধ্যে এমন কতকগুলি সহজাত ত্রুটি বা ফাঁক (gap) ছিল যার ফলে জাতিসংঘ ব্যর্থ হয়েছিল। ক. চুক্তিপত্রের কোথাও 'শান্তি' (Peace) কিংবা 'যুদ্ধকে পরিহার' (Outlawing of War) করার কথা ঘোষণা করা হয়নি ; খ. নিজ সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার কোন ক্ষমতা জাতিসংঘের ছিল না ; গ. গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সভা এবং পরিষদে সব সদস্য-রাষ্ট্রের সম্মতিসূচক ভোটের প্রয়োজন হোত ; ঘ. জাতিসংঘের নিজস্ব কোন সৈন্যবাহিনী ছিল না ; ঙ. জাতিসংঘ ছিল মূলতঃ একটি ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠান—তাই তা বিশ্বজনীন রূপে পরিগ্রহ করতে সক্ষম হয়নি ইত্যাদি।

(২) অনেকের মতে, প্যারিস শান্তি সম্মেলনে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত রাষ্ট্রগুলি জাতিসংঘকে বিজয়ী শক্তিবর্গের একটি সংঘ বলে মনে করত। তাই তারা আন্তরিকভাবে জাতিসংঘের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠতে পারে নি।

(৩) জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর সোভিয়েত ইউনিয়নকে সদস্যপদ প্রদান করা হয়নি। ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘকে পাশ্চমী রাষ্ট্রগুলির একটি ষড়যন্ত্রমূলক প্রতিষ্ঠান বলে মনে করত। তাছাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত একটি বৃহৎ শক্তি কখনই জাতিসংঘের সদস্যপদ গ্রহণ করেনি। ১৯৩৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নকে জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রদান করা হোল, কিন্তু অন্যদিকে জার্মানি, ইতালি ও জাপান জাতিসংঘের সদস্যপদ পরিত্যাগ করে। এইভাবে জাতিসংঘ বৃহৎ শক্তিগুলিকে কখনই ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হয়নি।

(৪) বিশ্বশান্তি স্থাপনে জাতিসংঘের ব্যর্থতার প্রধান কারণ হোল রাজনৈতিক। বৃহৎ শক্তিগুলির পরস্পর-বিরোধী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থদ্বন্দ্বই জাতিসংঘের ব্যর্থতাকে প্রকট করে তোলে। ফ্রান্স এবং তার মিত্র রাষ্ট্রবর্গ চাইত ভবিষ্যতে যাতে জার্মানি আর বিশ্বযুদ্ধ বাধাতে না পারে সেজন্য সর্বদিক থেকে জার্মানিকে পঙ্গু করে দিয়ে স্থিতাবস্থা (Status-quo) বজায় রাখতে হবে। কিন্তু ব্রিটেন ইউরোপ মহাদেশে নয়া শক্তি-সাম্য (New Balance of Power) প্রতিষ্ঠার জন্য জার্মানির পুনরাবির্ভাব ঐকান্তিকভাবে কামনা করত। এইভাবে বিশের শতকের প্রথম দিকে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস ইত্যাদি যখন বিশ্ব রাজনীতিকে জটিল করে তুলেছে ঠিক সেই সময় নাৎসীবাদ ও ফ্যাসীবাদের আবির্ভাব ঘটে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার উপর এদের বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। নাৎসীবাদ ও ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্রসমূহের উগ্র জাতীয়তাবাদী জঙ্গী নীতি ও মনোভাব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দাবাগ্নি প্রজ্বলিত করেছিল। অথচ মজার ব্যাপার হোল, ব্রিটেন ও ফ্রান্স সমাজতান্ত্রিক

সোভিয়েত ইউনিয়নের ভয়ে এদের তোষণ করার নীতি গ্রহণ করেছিল। এই সব কারণে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ ব্যর্থ হয়েছিল।

অবশ্য অনেকের মতে জাতিসংঘ যতদিন পর্যন্ত বৃহৎ বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির স্বার্থের অনুপন্থী ছিল ততদিন পর্যন্ত তার পতন ঘটেনি; কিন্তু যখনই তারা জাতিসংঘকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হোল তখনই তারা জাতিসংঘ থেকে একে একে দূরে সরে যেতে লাগল। এইভাবে বৃহৎ শক্তিগুলির অসহযোগিতাই জাতিসংঘের পতনের প্রধান কারণ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা

১৯৩৯ সালে ১লা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের লেলিহান অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতিসংঘের অপমৃত্যু ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা, মারণাস্ত্রের অভিনবত্ব ও ধ্বংসলীলা, অভাবনীয় পরিমাণ সম্পত্তি-ক্ষয়, অগণিত মানুষের প্রাণনাশ বিশ্বের মানুষকে এবং রাষ্ট্রনৈতিক নেতৃবৃন্দকে পুনরায় শান্তিমুখী করে তোলে। তাঁরা সুস্পষ্টভাবে একথা উপলব্ধি করতে পারেন যে, মানুষের সামনে মাত্র দুটি পথ খোলা আছে: একটি হোল 'সর্বাত্মক ধ্বংস ও অপমৃত্যু' এবং অপরটি হোল 'আন্তর্জাতিক শান্তি ও মৈত্রী'। মানুষকে এই দুটি পথের একটিকে বেছে নিতেই হবে। যুদ্ধ-ক্লান্ত পৃথিবীর মানুষ দ্বিতীয় পথটিকেই বেছে নিল। তাই যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় মিত্রশক্তিবর্গ (Allied Powers) 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ' (United Nations) নামে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় 'অতলান্তিক সনদ' (Atlantic Charter, 1941), 'ওয়াশিংটন সম্মেলন' (Washington Conference, 1942), 'মস্কো ঘোষণা' (Moscow Declaration, 1943), 'তেহেরান ঘোষণা' (Teheran Declaration, 1943), 'ডাম্বারটন ওকস্ বৈঠক' (Dumberton Oaks Conference, 1944), 'ইয়াল্টা সম্মেলন' (Yalta Conference, 1945), এবং 'সানফ্রান্সিসকো সম্মেলন' (San Francisco Conference, 1945) অনুষ্ঠিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব প্রধানতঃ নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council)-এর হাতে অর্পিত হলেও নানা কারণে পরিষদ এই দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে সেই দায়িত্ব এসে পড়ে সাধারণ সভা ও প্রধান কর্মসচিবের উপর। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, বর্তমানে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হওয়া তো দূরের কথা, যে-কোন মুহূর্তে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণদামামা বেজে উঠা অসম্ভব নয়। নানা কারণে বর্তমানে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার পথে যে সব সমস্যা পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে সেগুলি হোল:

[illegible] শান্তির প্রতিবন্ধক

ক. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বের বিশ্বরাজনীতির চরিত্রগত পরিবর্তন বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর ধনতান্ত্রিক গোষ্ঠীর নেতা হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আত্ম-প্রকাশ করেছে। তার নেতৃত্বে গঠিত আঞ্চলিক জোটগুলি, যেমন—'উত্তর আতলান্তিক চুক্তি সংস্থা' (North Atlantic Treaty Organisation), 'মধ্য-প্রাচ্য চুক্তি সংস্থা' (Central Treaty Organisa-

tion) ইত্যাদি সমাজতান্ত্রিক ও জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিকে 'ঠান্ডা লড়াই' বা 'স্নায়ু-যুদ্ধে'র (Cold War) দিকে ঠেলে দিয়েছে। ফলে বাধ্য হয়েই সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে 'ওয়ারশ চুক্তি'র (Warsaw Pact) মাধ্যমে নিজেদের ঐক্য সুদৃঢ় করার কাজে মনোনিবেশ করেছে। এই দুই পরস্পর-বিরোধী গোষ্ঠীর বিশ্বব্যাপী মতাদর্শগত সংগ্রাম বিশ্বশান্তিকে বিপন্ন করে তুলেছে। তবে একথা সত্য যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি কখনই বিশ্বশান্তির বিরোধী নয়, বরং তারা বিশ্বশান্তিকে সুদৃঢ় করার পক্ষে। কিন্তু পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি, বিশেষতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে সাম্যবাদের ভূতের ভয় দেখিয়ে বিশ্ব-ব্যাপী সাম্যবাদকে ধ্বংস করার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। তাদের আগ্রাসী মনোবৃত্তির হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি আঞ্চলিক জোট গঠন করেছে। অবশ্য একথাও সত্য যে, এই দুই পরস্পর-বিরোধী গোষ্ঠীর আদর্শগত বিরোধের ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উপর।

(খ) বিশ্বশান্তির পথে অন্যতম প্রতিবন্ধক হোল জাতিবিদ্বেষ, বর্ণবিদ্বেষ এবং ধর্মবিদ্বেষী মনোভাব। অনেক সময় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রনায়কগণ নিজেদের অপশাসনের প্রকৃতি আড়াল করার জন্য জনগণকে এই বলে উৎসাহিত করেন যে, তাদের জাতি শ্রেষ্ঠ জাতি। অন্যান্য জাতির উপর কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য বিস্তার করার অধিকার তাদের আছে। হিটলার জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্ব প্রচার করে বিশ্বশান্তির হন্তারক হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়েছেন। বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘু সরকার বর্ণবিদ্বেষ প্রচার করে চলেছে। ঐসব রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণকায় মানুষ সর্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত। তারা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। অনেক সময় ধর্মীয় কারণেও বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হতে পারে বলে অনেকের ধারণা। আরব দুনিয়ার সঙ্গে ইহুদি রাষ্ট্র ইস্রায়েলের যুদ্ধের পেছনে ধর্মীয় কারণ লুকিয়ে আছে ; তবে একথা সত্য যে ধর্মীয় কারণ অপেক্ষা আদর্শগত এবং অর্থনৈতিক কারণেই যে আরব-ইস্রায়েল যুদ্ধ সে-সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ নেই।

জাতিবিদ্বেষ, বর্ণবিদ্বেষ ইত্যাদি

(গ) বর্তমানে বিশ্বে উপনিবেশগুলির জনগণকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করতে অস্বীকার করায় এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার উপনিবেশগুলিতে মুক্তি-সংগ্রাম শুরু হয়েছে। বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের মতে উপনিবেশ-গুলির জনগণের এই সংগ্রাম বিশ্বশান্তির পরিপন্থী। কিন্তু এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিটি জাতির রাজনৈতিক অধিকার। এই অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ন্যায়সঙ্গত। বস্তুতঃ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির সংকীর্ণ স্বার্থপর মনোবৃত্তি উপনিবেশবাদকে জিইয়ে রেখেছে। তারাই প্রকৃতপক্ষে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান অন্তরায়।

পুঁজিবাদ ও বিশ্বশান্তি

(ঘ) বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার পথে সর্বাপেক্ষা প্রধান অন্তরায় হোল সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু কোনো কোনো শান্তিবাদী দার্শনিক ও চিন্তাবিদ্ মনে করেন যে, জাতীয় রাষ্ট্রগুলি বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃত কারণ। এই সব রাষ্ট্রের পারস্পরিক স্বার্থ-দ্বন্দ্ব সভ্যতার সঙ্কটকে ঘনীভূত করে তুলেছে। তাই যুদ্ধ প্রতিরোধ করা তথা বিশ্বশান্তির প্রতিষ্ঠা

ও আন্তর্জাতিকতার প্রসারের জন্য তাঁরা জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রগুলির অবসান ঘটানো প্রয়োজন বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, সমস্ত জাতীয় রাষ্ট্রগুলি যখন একটি বিশ্বরাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্যবন্ধভাবে মিলিত হতে পারবে, তখনই কেবলমাত্র প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু তাঁদের এই ধারণাকে বিশ্বজনীনতা বলা যেতে পারে, আন্তর্জাতিকতা বলা যেতে পারে না। তাছাড়া, বিশ্বরাষ্ট্র সৃষ্টির মাধ্যমে কখনই যুদ্ধের সম্ভাবনাকে বিদূরিত করা যায় না। বস্তুতঃ আমাদের যুগে যুদ্ধের প্রকৃত কারণ হোল পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক অনুসৃত সাম্রাজ্যবাদী নীতি। সাম্রাজ্যবাদ উগ্র জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে অপরাপর জাতিকে আক্রমণ করে এবং বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি যেসব যুদ্ধ করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল—ক. মালয়, ইন্দোনেশিয়া, ইয়েমেন, গ্রীস, সাইপ্রাস, সুয়েজ এবং কেনিয়াতে—ইংল্যান্ড; খ. ভিয়েতনাম, লাওস, কাম্বোডিয়া, সুয়েজ ও আলজিরিয়াতে—ফ্রান্স; গ. ইন্দোনেশিয়াতে—হল্যান্ড; ঘ. কঙ্গোতে—বেলজিয়াম এবং ঙ. ফিলিপিনস, গ্রীস, কোরিয়া ও ভিয়েতনামে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

বিশ্বশান্তির প্রধান শত্রু সাম্রাজ্যবাদ

তবে আশার কথা এই যে, বর্তমানে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সমাজতান্ত্রিক এবং জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির প্রাধান্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাঁদের প্রচেষ্টায় আজ দিকে দিকে যুদ্ধবিরোধী ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ঐসব রাষ্ট্রের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নিরস্ত্রীকরণের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি নানাভাবে নিরস্ত্রীকরণের বিরোধিতা করে চলেছে। সুতরাং বলা যায়, যতদিন সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা পদে পদে বিঘ্নিত হতে বাধ্য।

তবে কি আমরা বিশ্বাস হারাবো? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। মানুষের প্রতি বিশ্বাস আমরা যেন না হারাই। তাই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। আজকের পৃথিবীর ভারসাম্য শান্তি-শিবিরের পক্ষে, যুদ্ধ-শিবিরের পক্ষে নয়—এটাই সবচেয়ে আশার কথা। আমরা আশা করব, অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার পথে নিশ্চিতভাবেই অগ্রসর হবে।

উপসংহার

৭। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমিকা (Role of the United Nations)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জাতি-সংঘ (League of Nations)। কিন্তু ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের লেলিহান অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতিসংঘের অপমৃত্যু ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা, মারণাস্ত্রের অভিনবত্ব ও ধ্বংসলীলা, অভাবনীয় পরিমাণ সম্পত্তি-ক্ষয়, অগণিত মানুষের প্রাণনাশ বিশ্বের মানুষকে এবং রাষ্ট্রনৈতিক নেতৃবৃন্দকে

সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জের প্রতিষ্ঠা

পুনরায় শান্তিকামী করে তোলে। ১৯৪১ সালের ১৪ই আগস্ট থেকে শুরু করে ১৯৪৫ সালের ২৬শে জুন পর্যন্ত নানা সম্মেলন ও আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) নামে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ আনুষ্ঠানিক-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উৎপত্তি বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে এইচ. জি. নিকোলাস (H. G. Nicholas) বলেন, "এইভাবে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার ২৬ বৎসর পরে বিশ্বের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে দ্বিতীয়বার শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে।"

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা হোল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান উদ্দেশ্য। সনদ-স্রষ্টাগণ একথা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য এমন একটি পৃথিবীর প্রয়োজন যেখানে সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের বন্ধনে জাতিগুলি পারস্পরিকভাবে আবদ্ধ থাকবে। আন্তর্জাতিক আইন, ন্যায়নীতিবোধের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মধ্য দিয়েই কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ একটি সুন্দর পৃথিবী গঠনের স্বপ্ন সফল হতে পারে। তাঁরা আরো উপলব্ধি করতে সমর্থ হন যে, মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃতিলাভ না করলে পৃথিবীর বুকে শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা বাতুলতা মাত্র। কারণ সুদীর্ঘকাল ধরে মানুষকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখে কখনই বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সর্বোপরি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধান ছাড়া এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমব্যবহার ছাড়া কখনই বিশ্বশান্তি আসতে পারে না। তাই জাতিপুঞ্জের সনদে (Charter) সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব প্রধানতঃ নিরাপত্তা পরিষদের (Security Council) হাতে অর্পিত হলেও সাধারণ সভা (General Assembly) এবং প্রধান কর্মসচিবও (Secretary General) এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সহ-যোগিতার বন্ধন সুদৃঢ় করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে সাধারণ সভা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council) এবং অছি পরিষদের (Trusteeship Council) হাতে।

বিশ্বশান্তি রক্ষার ব্যাপারে কার্যাবলীর শ্রেণীবিভাগ

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রাজনৈতিক ভূমিকার পর্যালোচনা করতে গিয়ে এর কার্যাবলীকে আমরা প্রধানতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করতে পারি, যথা—ক. যুদ্ধবিরতি ও যুদ্ধবিরতি রেখা (Truce line) পরিদর্শন করার জন্য পর্যবেক্ষক-প্রতিনিধি প্রেরণ; খ. সংঘর্ষরত পক্ষগুলিকে সংযত করার জন্য মধ্যবর্তী স্থানে জাতিপুঞ্জের সৈন্যবাহিনী সংস্থাপন; গ. পরস্পর সংঘর্ষরত পক্ষগুলিকে নিবৃত্ত করার জন্য সৈন্যবাহিনীর হস্তে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব অর্পণ; ঘ. সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ (Communal Conflict) বন্ধ করার জন্য

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৈন্যবাহিনী প্রেরণ এবং ঙ. আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা অবলম্বন। 'ক' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বিরোধগুলি হোল বল্‌কান্ সমস্যা (১৯৪৬-৪৭), কাশ্মীর সমস্যা (১৯৪৮-৬৪), প্যালেস্টাইন সমস্যা (১৯৪৭-৬৩), লেবানন সমস্যা (১৯৫৮), পশ্চিম ইরানের সমস্যা (১৯৬২-৬৩), ইয়েমেনের সমস্যা (১৯৬৩-৬৪) ইত্যাদি। 'খ' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হোল ইস্রায়েল সীমান্তে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৈন্যবাহিনী সংস্থাপন। 'গ' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হোল কঙ্গোতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৈন্যবাহিনী প্রেরণ। সাইপ্রাস এবং কোরিয়ার সমস্যা যথাক্রমে 'ঘ' এবং 'ঙ' শ্রেণীর অন্তর্গত।

শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতা

কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করতে ব্যর্থ হয়েছে। তা-ই শুধু নয়, পরিষদ কার্যতঃ কোন যুদ্ধ বন্ধ করতেও সক্ষম হয়নি। যেসব সমস্যার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতির মত বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি কোন-না কোনোভাবে যুক্ত সেইসব সমস্যার সমাধান করা নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ থেকে ডোমিনিকান রিপাবলিককে রক্ষা করতে জাতিপুঞ্জ ব্যর্থ হয়েছে। অনুরূপভাবে সাইপ্রাস প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমিকতার উপর ব্রিটেনের হস্তক্ষেপ, সেনিগালের বিরুদ্ধে পর্তুগালের আক্রমণ, বেলজিয়াম কর্তৃক কঙ্গো আক্রমণ, লেবাননের উপর ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করতে জাতিপুঞ্জ ব্যর্থ হয়েছে। সর্বোপরি, ইন্দোচীনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি, যথা—ভিয়েতনাম, লাওস ও কাম্বোডিয়ার উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বর্বর আক্রমণ কিংবা মার্কিনদোসর ইস্রায়েল কর্তৃক আরব রাষ্ট্রগুলির উপর নগ্ন আক্রমণ সত্ত্বেও জাতিপুঞ্জ কার্যকরী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ঐসব ক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কেবলমাত্র নিন্দাপ্রস্তাব গ্রহণ কিংবা যুদ্ধবিরতির নির্দেশ দেওয়া ছাড়া কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। ১৯৬৭ সালে আরব রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে ইস্রায়েল যুদ্ধ ঘোষণা করলেও ইস্রায়েলের সপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওকালতির জন্য জাতিপুঞ্জ কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি।

কোরিয়ার সমস্যা ও জাতিপুঞ্জ

অনেকের মতে, কোরিয়ার সমস্যা সমাধানে জাতিপুঞ্জের সাফল্য বিশ্বশান্তির ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কোরিয়ার সমস্যার পর্যালোচনা করলে সেখানে জাতিপুঞ্জের নক্কারজনক ভূমিকা আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে। ১৯৫০ সালের ১০ই জুন 'জাতিপুঞ্জের কোরিয়া বিষয়ক কমিশন' একজন প্রতিনিধিকে শান্তি স্থাপন ও ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া গঠনের জন্য উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রেরণ করে। পরদিন উত্তর কোরিয়ার তিনজন প্রতিনিধি কমিশনের নিকট বক্তব্য পেশ করার জন্য দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রবেশ করলে রী সরকারের পুলিস তাঁদের গ্রেপ্তার করে। ফলে উভয় সরকারের মধ্যে শান্তিপূর্ণ আলোচনার সম্ভাব্য পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এর পর ২৫শে জুন দক্ষিণ কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণ করায় কোরিয়া যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। ঐদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি নিরাপত্তা পরিষদের

বিশেষ অধিবেশনে উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারী বলে চিহ্নিত করে একটি প্রস্তাব গ্রহণের দাবি জানান। নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েত প্রতিনিধি গণ-সাধারণতন্ত্রী চীনকে জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ প্রদান না করার প্রতিবাদে ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাস থেকে পরিষদের অধিবেশন বয়কট করেছিলেন। সোভিয়েত প্রতিনিধির অনুপস্থিতির সুযোগে নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। ২৭শে জুন অপর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে মার্কিন প্রভাবিত নিরাপত্তা পরিষদ দক্ষিণ কোরিয়াকে উত্তর কোরিয়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য সদস্য-রাষ্ট্রগুলিকে নির্দেশ দেয়। মজার ব্যাপার হোল—কোরিয়ার জাতিপুঞ্জের সৈন্য-বাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় মার্কিন জেনারেল ম্যাক্‌আর্থারের ওপর। এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে উত্তর কোরিয়ার সমাজতান্ত্রিক সরকারকে পর্যুদস্ত করার সুযোগ লাভ করেছিল। কোরিয়ার ঘটনা থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, ঐ সময় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছিল। যাই হোক, ১লা আগস্ট সোভিয়েত প্রতিনিধি [illegible] মালিক নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করার পর উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে আর কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা পরিষদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কারণ সোভিয়েত প্রতিনিধি 'ভেটো' প্রয়োগ করে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের যে-কোন প্রস্তাবকে বাতিল করে দিতে লাগলেন।

'শান্তির জন্য সম্মিলিত হচ্ছি প্রস্তাব' গ্রহণ

সোভিয়েত ভেটো প্রয়োগের ফলে নিরাপত্তা পরিষদকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টায় ১৯৫০ সালের ৩রা নভেম্বর সাধারণ সভা 'শান্তির জন্য সম্মিলিত হচ্ছি প্রস্তাবটি' (Uniting for Peace Resolution) গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, ভেটো প্রয়োগের ফলে নিরাপত্তা পরিষদ শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অক্ষম হলে সে বিষয়ে সাধারণ সভা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। যাই হোক, অনেকে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনকে জাতিপুঞ্জের শান্তি রক্ষায় ইতিহাসে এক অত্যুজ্জ্বল অধ্যায় বলে মনে করলেও গুডস্পিড (Goodspeed), ম্যাকআইভার (MacIver) প্রমুখ তা স্বীকার করতে সম্মত নন। ম্যাকআইভারের মতে, কোরিয়ার যুদ্ধ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দ্বারা পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়নি। এই যুদ্ধ মূলতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হয়েছিল। বস্তুতঃ কোরিয়ার সমস্যা সমাধানে জাতিপুঞ্জের ভূমিকা জাতিপুঞ্জের আদর্শকে ধূলায় লুণ্ঠিত করেছে।

বিশ্বশান্তি-রক্ষায় সাধারণ সভার ভূমিকা

বিশ্বশান্তি রক্ষায় নিরাপত্তা পরিষদের ব্যর্থতার জন্য ১৯৫০ সালে গৃহীত 'শান্তির জন্য সম্মিলিত হচ্ছি প্রস্তাব'টির সহায়তায় সাধারণ সভা বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করে। ১৯৫৭ সালে প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধানের জন্য সাধারণ সভা কর্তৃক 'বিশেষ কমিটি'র নিয়োগ, বা সুয়েজ ও সিনাই অঞ্চলে শান্তি স্থাপনের জন্য 'জাতিপুঞ্জের জরুরীকালীন সৈন্যবাহিনী' স্থাপন কিংবা সুয়েজ সমস্যার জন্য ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইস্রায়েলের কাছে সৈন্য অপসারণের 'আবেদন' জানানো ইত্যাদির কথা বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য। কিন্তু নিজ সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার কোনো ক্ষমতা সাধারণ সভার হাতে না থাকায় বিশ্বশান্তি স্থাপনে তার ব্যর্থ ভূমিকাই আমাদের চোখে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯৬৫ সালে দক্ষিণ রোডেশিয়া সরকারের বর্ণবিদ্বেষ নীতির বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের, এমন কি প্রয়োজনবোধে বলপ্রয়োগের যে-সুপারিশ সাধারণ সভা করেছিল ব্রিটেন তার প্রতি বিন্দুমাত্র সম্মান প্রদর্শন করেনি।

বিশ্বশান্তি রক্ষায় প্রধান কর্মসচিবের ভূমিকা

বিশ্বশান্তি রক্ষায় সাধারণ সভার ব্যর্থতার জন্য ১৯৫৬ সালের পর থেকে সেই দায়িত্ব এসে পড়ে প্রধান কর্মসচিবের হাতে। কিন্তু প্রধান কর্মসচিবের নিরপেক্ষ ভূমিকাকে কেন্দ্র করে ঝড় উঠলে ট্রিগভী লীকে তাঁর কার্যকাল পরিসমাপ্তির পূর্বেই বিদায় নিতে হয়। পরবর্তী প্রধান কর্মসচিব হ্যামারশীল্ড কয়েকটি ক্ষেত্রে কিছুটা সাফল্য অর্জন করেন। এ বিষয়ে সুয়েজ সমস্যার সমাধানে তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুয়েজ সমস্যার সমাধানে সাফল্যের পুরস্কার হিসেবে তাঁকে পুনর্নির্বাচিত করা হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কঙ্গো সমস্যার সমাধানকল্পে গৃহীত ব্যবস্থাবলীর জন্য তাঁকে চরম বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। আফ্রিকার নবজাগরণের অন্যতম স্রষ্টা প্যাট্রিস লুমুম্বার শোচনীয় মৃত্যুর জন্য তাঁকেই দায়ী করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, কঙ্গো সমস্যার সমাধান করার জন্য আলোচনা চালাবার উদ্দেশ্যে কাতাঙ্গা যাওয়ার পথে উত্তর রোডেশিয়া অঞ্চলে বিমান দুর্ঘটনায় হ্যামারশীল্ড প্রাণ হারান। পরবর্তী প্রধান কর্মসচিব উ থান্টের চেষ্টায় কঙ্গো সমস্যার সমাধান হয়। তিনি কিউবা সমস্যার সমাধানেও মোটামুটি সাফল্য অর্জন করেন। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য কিংবা ইন্দোচীন সমস্যার সমাধানে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন। পরবর্তী প্রধান কর্মসচিব কুর্ট ওয়াল্ডহেইম আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি স্থাপনে বিশেষ কোন সাফল্যের স্বাক্ষর রাখতে পারেননি। তাই আজও বার্লিন সমস্যা, কাশ্মীর সমস্যা, মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা, সাইপ্রাস সমস্যা ইত্যাদি বিশ্বশান্তিকে অনিশ্চয়তার মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে।

বিশ্বশান্তি রক্ষায় জাতিপুঞ্জের সাফল্য

বিশ্বশান্তি রক্ষায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ইতিহাস শুধু ব্যর্থতারই ইতিহাস বললে ভুল করা হবে। কারণ ১৯৫৭ সালে ইন্দোনেশিয়ায় ও প্যালেস্টাইনে, ১৯৫৬ সালে ইজিপ্টে, ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত সংঘর্ষে, ১৯৬০ সালে কঙ্গোতে যুদ্ধের পরিব্যাপ্তি রোধে জাতিপুঞ্জের ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসার অপেক্ষা রাখে। বর্তমান 'ঠান্ডা লড়াই'-এর যুগে এখনও যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধেনি তার কারণ হোল বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরলস প্রচেষ্টা।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতার পশ্চাতে যেসব কারণ রয়েছে তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ :

(ক) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক বনাম ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার মধ্যে যে 'ঠান্ডা লড়াই' চলছে তার প্রভাব থেকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জও মুক্ত নয়।

বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি জাতিপুঞ্জকে ব্যবহার করছে 'ঠান্ডা লড়াই'-এর ময়দান হিসেবে। ফলে কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কোন প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত হলে বৃহৎ শক্তিগুলি 'ভেটো' প্রয়োগের দ্বারা তা অকার্যকর করে দিতে থাকে। এ বিষয়ে ভিয়েতনামের প্রশ্নে মার্কিন 'ভেটো', দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যায় মার্কিন 'ভেটো' এবং সুয়েজ সমস্যায় ব্রিটেন ও ফ্রান্সের 'ভেটো' প্রয়োগের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতার কারণ: 'ভেটো' প্রয়োগ

(খ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার জন্য একটি স্থায়ী সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন, কিন্তু জাতিপুঞ্জের এরূপ কোন স্থায়ী সামরিক বাহিনী না থাকায় প্রয়োজনের সময় সদস্য-রাষ্ট্রগুলির উপর তাকে নির্ভর করে থাকতে হয়। ফলে প্রয়োজনমত দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা জাতিপুঞ্জের পক্ষে একরকম অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাছাড়া, সদস্য-রাষ্ট্রগুলি যদি সৈন্য সাহায্য না করে সেক্ষেত্রেও জাতিপুঞ্জ উক্ত সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না।

স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর অভাব

(গ) সনদের মধ্যে বিশেষ কয়েকটি ধারা (Articles) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য সাধনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের 'ভেটো' প্রয়োগের ক্ষমতা, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধ করার সম্মতি প্রদান, 'আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে' হস্তক্ষেপ না-করার-নীতি প্রভৃতি এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ত্রুটিপূর্ণ কয়েকটি ধারা

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে অধ্যাপক স্যুম্যান (Schuman) বলেন যে, ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স জাতিসংঘকে ব্যবহার করেছিল ফ্যাসীবাদী আক্রমণকারীদের তোষণ করার জন্য। যখন তারা দেখল যে, তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা জাতিসংঘের মধ্যে কাজ না করে তার বাইরে কাজ করা দরকার, তখন তারা জাতিসংঘকে এড়িয়ে যেতে লাগল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও অনুরূপভাবে কমিউনিজম্ ঠেকাবার জন্য এবং তার জাতীয় স্বার্থের খাতিরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে ব্যবহার করতে লাগল এবং বহুক্ষেত্রে একে এড়িয়ে বা এর নাম করে সামরিক পরিকল্পনা ও জোট গড়ে তুলল। উদাহরণ স্বরূপ 'ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন', 'মার্শাল পরিকল্পনা,' 'আইসেনহাওয়ার ডক্‌ট্রিন,' 'ন্যাটো,' 'সেন্টো,' 'সিয়াটো' প্রভৃতির নাম করা যায়। বস্তুতঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতার কারণ হোল পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির অনুসৃত নীতি। বিশ্বের অধিকাংশ সম্পদ এদের হাতে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিপুল সম্পদকে এরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। এই নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্যই প্রয়োজন এদের যুদ্ধপ্রস্তুতির। যখনই ঐ সব অনুন্নত দেশের জাতীয়তাবাদী সরকার এই নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে এবং যখন অন্য কোন উপায়ে সেই সব সরকারকে দাবিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি, তখনই এরা যুদ্ধের সাহায্য নিয়েছে।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতা অতি সহজেই চোখে পড়ে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ রোডেশিয়ার বর্ণবিদ্বেষী সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ সরকার

মানবতার মৌলিক নীতিগুলি উপেক্ষা করে সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণকায় জনগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার ও নির্মম শোষণ চালাচ্ছে। কিন্তু জাতিপুঞ্জ কেবলমাত্র নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করা ছাড়া কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। অবশ্য একথা সত্য যে, জাতিপুঞ্জের 'মানবিক অধিকার সংক্রান্ত বিশ্ব ঘোষণাপত্র' (**Universal Declaration of Human Rights**) মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জের একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। কিন্তু এই ঘোষণাপত্রটি বিশ্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি। ঘোষণাপত্রের বিষয়বস্তু নিয়ে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে তীব্র মতবিরোধের পরিণামে ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর ঘোষণা পত্রটি সাধারণ সভায় গৃহীত হওয়ার সময় সোভিয়েত ইউনিয়নসহ অন্যান্য কতকগুলি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকে। তাছাড়া, মানবিক অধিকার সংক্রান্ত বিশ্ব ঘোষণাপত্রে যে সব অধিকার স্থানলাভ করেছে সেগুলিকে কার্যকর করার ব্যাপারে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা না থাকায় কার্যক্ষেত্রে সেগুলি মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। ১৯৭৫ সালকে 'আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ' বলে ঘোষণা করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পুরুষদের সঙ্গে স্ত্রীলোকদের সম-অধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেছে।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতা

স্বায়ত্তশাসনহীন অঞ্চলগুলিকে (**Non-self-governing Territories**) স্বাধীনতা প্রদানের জন্য জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও এখনও বিশ্বের বহু অঞ্চল ঔপনিবেশিকতার শিকার হয়ে রয়েছে। তবে একথা সত্য যে, ১৯৬০ সাল থেকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভিতরে ও বাইরে ঔপনিবেশিকতা বিরোধী আন্দোলন ব্যাপকভাবে চলছে। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে অনেকগুলি নতুন রাষ্ট্র জন্মলাভ করেছে। তাছাড়া, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলি উত্তরোত্তর বেশী পরিমাণে জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ লাভ করার ফলে ঔপনিবেশিকতা বিরোধী আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করেছে।

স্বায়ত্তশাসনহীন অঞ্চলসমূহের মুক্তি

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং জাতিপুঞ্জের 'বিশেষ সংস্থাগুলি' (**Specialised Agencies**) অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি দিক থেকে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সহযোগিতার বন্ধন সুদৃঢ় করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এ বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (**World Health Organisation**), সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা (**UNESCO**), আন্তর্জাতিক শিশু ভান্ডার (**ICF**) প্রভৃতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু 'বিশেষ সংস্থা'গুলিতেও পাশ্চাত্য রাষ্ট্রজোটের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রজোটের তীব্র মতবিরোধ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি এখনও আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার, আন্তর্জাতিক শ্রমদপ্তর প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করেনি। অনুরূপভাবে সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও সিঙ্গাপুর 'ইউনেস্কো' থেকে বেরিয়ে আসার ফলে এই বিশেষ সংস্থাটি চরম অর্থনৈতিক সংকটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্বরাষ্ট্র হিসেবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবি যে আজ উপেক্ষিত —একথা অনেক খ্যাতিমান আন্তর্জাতিক আইনবিদ মনে করেন। বর্তমান যুগে

'ঠাণ্ডা লড়াই'কে জিইয়ে রেখে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। কিন্তু

উপসংহার

সবচেয়ে আশার কথা হোল সাম্প্রতিককালে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার পদানত দেশগুলি উত্তরোত্তর স্বাধীনতালাভ করছে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ গ্রহণ করছে ; জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন আজ এতই শক্তিশালী যে তার সাহায্যে যুদ্ধের শক্তিগুলিকে দুর্বল করে দেওয়া সম্ভব। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জেও এই প্রভাব আমরা দেখতে পাই। তাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই।

———

একাদশ অধ্যায়

আইন

[Law]

১। আইনের অর্থ ও প্রকৃতি (Meaning and Nature of Law)

আইন (Law) শব্দটিকে ব্যাপক ও সংকীর্ণ—উভয় অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ব্যাপক অর্থে 'আইন' শব্দটির প্রয়োগ জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায়। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবন গড়ে তোলার জন্য মানুষকে কতকগুলি সামাজিক বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। এই বিধিনিষেধগুলিকে সামাজিক আইন বলে। আবার সুসভ্য জীব হিসেবে মানুষ ন্যায়-অন্যায়, ভাল মন্দ, সৎ-অসৎ প্রভৃতির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে সমাজ জীবনকে সুষ্ঠভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজন কতকগুলি নিয়মকানুনের, যেগুলির সাহায্যে মানুষের মানসিক আচার-আচরণের সঙ্গে সামাজিক উদ্দেশ্যের সমন্বয় সাধন করা হয়। এই নিয়মগুলি নৈতিক আইন বলে পরিচিত। তাছাড়া, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মধ্যে যে কার্যকারণ সম্পর্ক দেখা যায় তার পশ্চাতেও কতকগুলি নিয়ম থাকে। এই নিয়মগুলিকে আমরা প্রাকৃতিক আইন বলে বর্ণনা করি।

ব্যাপক অর্থে আইনের ব্যবহার

কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান ব্যাপক অর্থে আইনের আলোচনা করে না। কারণ মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন মঙ্গলময় করে গড়ে তোলাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কতকগুলি নিয়ম কানুন তৈরি করে। এই নিয়মকানুনগুলিকে রাষ্ট্রীয় আইন বলে অভিহিত করা হয়। রাষ্ট্রীয় আইন ভঙ্গ করলে আইনভঙ্গকারীকে দৈহিক শাস্তি পেতে হয়, কারণ রাষ্ট্রীয় আইনের প্রধান রক্ষাকর্তা হোল সার্বভৌম শক্তির অধিকারী রাষ্ট্র।

সংকীর্ণ অর্থে আইনের ব্যবহার

রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রীয় আইন নিয়ে আলোচনা করে কিন্তু আইনের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে বাদানুবাদের অন্ত নেই। ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আইনের সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছেন। হবস্, বোদাঁ, হল্যান্ড, অস্টিন প্রমুখ বিশ্লেষণমূলক মতবাদে বিশ্বাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ আইনকে সার্বভৌম শক্তির আদেশ বলে বর্ণনা করেছেন। অস্টিনের মতে, আইন হোল নিম্নতনের প্রতি উর্ধ্বতন রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের আদেশ। হল্যান্ড (Holland) বলেন, রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত্ব কর্তৃক মানুষের বাহ্যিক আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী সাধারণ নিয়মই হোল আইন। কিন্তু জার্মান আইনবিদ স্যাভিনী

আইনের প্রকৃতি সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী মত

(Savigny), হেনরী মেইন (Henry Maine), ক্লার্ক (Clark) প্রমুখ আইন সম্পর্কে ঐতিহাসিক মতবাদে বিশ্বাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণের মতে, প্রত্যেক দেশেই সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি, লোকাচার প্রভৃতি প্রচলিত থাকে। এগুলি কালক্রমে আইনের মর্যাদা লাভ করে। সুতরাং কোনভাবেই আইনকে সার্বভৌম শক্তির আদেশ বলে মেনে নেওয়া যায় না। স্যাভিনীর মতে, আইন তৈরি করা রাষ্ট্রের কাজ নয়। "আইনের যাথার্থ্য উপলব্ধি ও তার প্রয়োগ করাই হোল রাষ্ট্রের প্রকৃত কাজ।" কিন্তু দ্যুগুই (Duguit), ক্র্যাবে (Krabbe) প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানিগণ মনে করেন যে, বিভিন্ন সামাজিক কারণ ও প্রভাবের ফলে আইনের সৃষ্টি। তাঁদের মতে আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য হোল সামাজিক কল্যাণ সাধন করা। আইন সার্বভৌম শক্তির নির্দেশ কিংবা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত সামাজিক প্রথা বলে সর্বক্ষেত্রেই আইন মেনে চলতে হবে—একথা তাঁরা বিশ্বাস করেন না। অন্যভাবে বলা যায়, সমাজবিজ্ঞানমূলক মতবাদে বিশ্বাসীদের মতে, আইন সমাজের কল্যাণ সাধন করে বলেই মানুষ আইন মান্য করে।

উইলসন প্রদত্ত সংজ্ঞা

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী উইলসন (Wilson) আইনের প্রকৃতি সম্পর্কিত পরস্পর-বিরোধী মতবাদগুলির সমন্বয় সাধন করে আইনের মোটামুটি একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে, আইন হোল মানুষের স্থায়ী আচার-ব্যবহার ও চিন্তার সেই অংশ যা সর্বজনীন নিয়মের আকারে আনুষ্ঠানিক ও সুনির্দিষ্টভাবে স্বীকৃতিলাভ করেছে এবং যার পশ্চাতে সরকারী কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার সুস্পষ্ট সমর্থন আছে। সুতরাং প্রচলিত আচারব্যবহার সার্বভৌম শক্তির স্বীকৃতি লাভ করলেই তা আইন বলে পরিগণিত হয়।

বার্কারের অভিমত

অবশ্য বার্কার (Barker) প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ মনে করেন যে, কেবলমাত্র রাষ্ট্র-কর্তৃক স্বীকৃত, ঘোষিত এবং প্রযুক্ত হলেই আইনকে আদর্শ আইন বলা যায় না। তাঁর মতে আইনের মধ্যে—বৈধতা (Validity) এবং নৈতিক মূল্য (Value) অবশ্যই থাকতে হবে। বৈধতা বলতে বোঝায় আইনের পশ্চাতে সার্বভৌম শক্তির অধিকারী রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও সমর্থন। আবার নৈতিক মূল্য বলতে বোঝায় আইনকে সামাজিক ন্যায়নীতিবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। তবে বার্কার একথা স্বীকার করেন যে, আইনের দৃষ্টিতে কোন আইনের নৈতিক মূল্য থাক, বা না থাক, তা বৈধ হলেই সকলে তাকে মান্য করতে বাধ্য।

পূর্বোক্ত সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করলে আইনের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

আইনের বৈশিষ্ট্য

প্রথমতঃ, আইন হোল বিধিবদ্ধ কতকগুলি আচার-আচরণ। দ্বিতীয়তঃ আইন কেবলমাত্র মানুষের বাহ্যিক আচার আচরণকেই নিয়ন্ত্রণ করে। তৃতীয়তঃ, আইনের বিধানগুলি সুনির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট এবং সর্বজনীন। চতুর্থতঃ, আইনকে কার্যকরী করাই হোল সার্বভৌম শক্তির প্রধান কর্তব্য। তাই আইনভঙ্গ করলে আইনভঙ্গকারীকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হয়। পঞ্চমতঃ, সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক সমর্থিত বলে আইনের স্থান সবার ঊর্ধ্বে।

আইন সম্পর্কে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি দৃষ্টিভঙ্গীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় মার্কসবাদী লেখকদের প্রদত্ত সংজ্ঞায়। মার্কস ও এঙ্গেলস বলেছেন,

"যে সকল ব্যক্তি শাসন করে, তারা কেবল রাষ্ট্রের মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতা সংগঠিত করে না, তারা…নিজেদের ইচ্ছাকে সর্বজনীন ইচ্ছারূপে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ইচ্ছা বা আইনরূপে প্রতিষ্ঠিত করে।" ভিশিনস্কী (Vyshinsky)-র মতে, আইন হোল সেই সমস্ত আচরণবিধি যা সমাজের প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর ইচ্ছার প্রকাশ। বিধিবন্ধ আইন, আদেশ, জরুরী বিধি এবং রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত বা অনুমোদিত রীতিনীতি ও প্রথাগুলিতে এই আচরণবিধিগুলি সম্মিলিত থাকে। ভি. তুমানোভ (V. Tumanov) মন্তব্য করেছেন যে, "আইন হোল এক বিশেষ সামাজিক অভিব্যক্তি (phenomenon) যার প্রধান লক্ষ্য হল সামাজিক সম্পর্কগুলির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ রচনা করা এবং মানুষের কর্মকে প্রভাবিত করা ; আইনকে সমাজ এবং রাষ্ট্রের কার্যাবলীর একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিও বলা যায়।" ল্যাস্কি (Laski)-র মতে, যারা অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী তাদের ইচ্ছাকে রাষ্ট্র প্রকাশ করে। রাষ্ট্রের আইন হোল একটি মুখোশ, যার আবরণের পশ্চাতে থেকে ধনিকশ্রেণী রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সুবিধা ভোগ করে। অন্যভাবে বলা যায়, আইন হোল সমাজের অধিকার ভোগী শ্রেণীর স্বার্থবাহী নিয়মকানুন। বিভিন্ন যুগে সমাজের প্রভুত্বকারী শ্রেণী নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন করেছে এবং রাষ্ট্রশক্তির সহায়তায় সেই আইন মান্য করতে জনগণকে বাধ্য করেছে। দাস সমাজে আইন দাসমালিকদের স্বার্থে দাসদের বিরুদ্ধে ; সামন্ত সমাজে আইন সামন্তপ্রভুদের স্বার্থে ভূমিদাসদের বিরুদ্ধে এবং পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতিদের স্বার্থে সংখ্যাগরিষ্ঠ সর্বহারা শ্রেণীর বিরুদ্ধে কাজ করে। সুতরাং শ্রেণীবৈষম্যমূলক সমাজে আইন কখনই নিরপেক্ষ হতে পারে না এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে না। কেবলমাত্র শ্রেণীহীন শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজেই আইন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

মার্কসবাদীদের মত

২। প্রাকৃতিক আইনের ধারণা (Concept of Natural Law)

প্রাকৃতিক আইনের ধারণা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিশেষ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। প্রাকৃতিক আইনের ধারণা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দার্শনিকের হাতে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায়, প্রাকৃতিক আইন হোল ঈশ্বরের কিংবা মানুষের সামাজিক প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত ন্যায়ের মৌলিক নীতি। এই নীতিগুলিকে সার্বভৌম শক্তির আদেশ কিংবা প্রচলিত আচারব্যবহার বলে বর্ণনা করা যুক্তিযুক্ত নয়। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অনুমোদন ছাড়াই এই আইন সমাজে প্রচলিত থাকে। এদিক থেকে বিচার করে প্রাকৃতিক আইনকে রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে অবস্থিত বলে বর্ণনা করা যায়।

প্রাকৃতিক আইনের স্বরূপ

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের লেখায় প্রাকৃতিক আইন সম্বন্ধীয় আলোচনার সর্বপ্রথম সূত্রপাত ঘটে। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (Plato) এবং অ্যারিস্টটল (Aristotle) প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্লেটো বস্তুনিরপেক্ষ ন্যায়-বোধ এবং মনুষ্যসৃষ্ট আইনের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। অ্যারিস্টটল বিশেষ আইন (Particular Law) এবং বিশ্বজনীন আইন

বিভিন্ন যুগে প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কে ধারণা

(Universal Law)-এর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে শেষোক্ত আইনকে প্রাকৃতিক আইন বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে প্রাকৃতিক আইন যেহেতু মানুষের স্বাভাবিক ন্যায়-অন্যায়বোধের প্রকাশ, সেহেতু এই আইন রাষ্ট্রের পূর্বেতন এবং রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে অবস্থিত। কারণ মানুষের স্বাভাবিক ন্যায়-অন্যায়বোধ রাষ্ট্রসৃষ্টির বহু পূর্বে থেকেই প্রচলিত ছিল। সোফিস্ট (Sophist) দার্শনিকেরা মনে করতেন যে, মানুষের সৃষ্ট আইন কৃত্রিম এবং পরিবর্তনশীল ; কিন্তু প্রাকৃতিক আইন শাশ্বত এবং অপরিবর্তনশীল। সিনিক (Cynic) দার্শনিকরা মনুষ্যসৃষ্ট সর্বপ্রকার প্রতিষ্ঠানকেই কৃত্রিম বলে অভিহিত করে উপেক্ষা করেছেন। তাঁরা মনে করতেন যে, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা নির্বাহ করা প্রত্যেক মানুষের উচিত। স্টোয়িক (Stoic) দার্শনিকরা প্রাকৃতিক আইনকে শাশ্বত ন্যায়বোধ বলে অভিহিত করেছেন। এই আইন মানুষের ন্যায়বোধের মাধ্যমেই কেবলমাত্র প্রকাশিত হতে পারে বলে তাঁদের ধারণা। তাঁদের মতে, মানুষের এরূপ ন্যায়বোধের দ্বারা তাঁদের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। প্রাকৃতিক আইনের ধারণা রোমান আইন ব্যবস্থাকে সুগভীরভাবে প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়। রোমান দার্শনিকগণ প্রাকৃতিক আইনকে সহজাত, চিরন্তন, অপৌরুষেয় এবং দুর্বোধ বলে বর্ণনা করে মনুষ্যসৃষ্ট আইনকে উক্ত আইনের অনুবর্তী করে গড়ে তুলেছেন। রোমান আইনশাস্ত্র পৌর আইনের (Jus civile) সঙ্গে প্রাকৃতিক আইনকেও (Jus naturale) স্বীকার করেছেন। এই প্রাকৃতিক আইন রোমান আদালতে প্রযুক্ত না হলেও রোমান বিচারপতিরা এই আইনের দ্বারা যথেষ্ট-ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। মধ্যযুগে খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ প্রাকৃতিক বিধানকে ঐশ্বরিক আইন (Law of God) বলে অভিহিত করেন। পরবর্তী সময়ে ধর্ম-নিরপেক্ষ যুক্তিবাদীরাও (Secular rationallst) যুক্তি দ্বারা বিশ্লেষণ করে স্বাভাবিক আইনকে মান্য করা উচিত বলে প্রচার করেন। এর পর ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রাকৃতিক আইনের প্রাধান্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। বোঁদা, হবস্, লক্, রুশো প্রমুখ দার্শনিকরা প্রাকৃতিক আইনকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। চুক্তিবাদী দার্শনিকরা রাষ্ট্রপূর্ব অবস্থায় অর্থাৎ প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষের জীবন প্রাকৃতিক আইনের দ্বারা পরিচালিত হোত বলে মনে করতেন। ওলন্দাজ আইনবিদ্ হিউগো গ্রোটিয়াস্ (Hugo Grotius) প্রাকৃতিক আইনকে 'যথার্থ বিচারবোধের নির্দেশ' (dictate of right reason) বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি এরূপ আইনকে আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তি বলে মনে করতেন। হেনরী মেইনও (Henry Maine) আন্তর্জাতিক আইন প্রাকৃতিক আইন কর্তৃক সৃষ্ট বলে বর্ণনা করেন। বর্তমানে প্রাকৃতিক আইনের সমর্থকগণ মনে করেন যে, প্রতিটি বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির নিকট প্রাকৃতিক আইন অপরিবর্তনীয়। কেউ যদি এরূপ আইনকে মান্য করতে সম্মত না হয় তাহলে সে তার অপ্রকৃত ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত বলে ধরে নিতে হবে।

সমালোচনা ঃ বর্তমানে নানাদিক থেকে প্রাকৃতিক আইনের সমালোচনা করা হয়। প্রথমতঃ বিভিন্ন যুগে প্রাকৃতিক আইন দার্শনিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ কর্তৃক সমর্থিত ও স্বীকৃত হলেও এই ধারণা কোন নির্দিষ্ট অর্থে কোনদিনই ব্যবহৃত হয়নি।

কারণ এরূপ আইনকে বলবৎ করার কোন উপায় নেই। সাধারণ অবস্থায় যখন নির্দিষ্ট আইনের সঙ্গে প্রাকৃতিক আইনের বিরোধ বেধেছে সেখানে প্রাকৃতিক আইন বাতিল হয়ে গেছে। বস্তুতঃ প্রাকৃতিক আইনের পশ্চাতে রাষ্ট্রকর্তৃত্বের সমর্থন না থাকায় তা অদ্যাবধি কার্যকরী হয়নি।

অকার্যকারিতা

দ্বিতীয়তঃ অনেকের মতে, বিপ্লবের সময় প্রাকৃতিক আইনকে বলবৎ থাকতে দেখা যায়। কিন্তু বার্কার (Barker) মনে করেন, যে-আইন কেবলমাত্র বিপ্লবের সময় এবং রাষ্ট্রের ধ্বংসকার্যে প্রযুক্ত হয় তাকে কখনই প্রকৃত আইন বলা যায় না। আইন সর্বদাই রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং প্রযুক্ত হবে। কিন্তু প্রাকৃতিক আইন এই শর্ত পূরণ করতে অক্ষম হওয়ায় তা আইনের পদবাচ্য নয়।

প্রাকৃতিক আইন আইন-পদবাচ্য নয়

তৃতীয়তঃ প্রাকৃতিক আইনের সমর্থকগণ প্রাকৃতিক আইনকে শাশ্বত ও অপরিবর্তনশীল বলে মনে করেন। কিন্তু আইন হোল মানুষের ধ্যানধারণার বহিঃপ্রকাশ। তাই সমাজপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আইনও পরিবর্তিত হতে বাধ্য। সুতরাং প্রাকৃতিক আইনও অপরিবর্তনীয় বলে বর্ণনা করে এর সমর্থকগণ ভুল করেছেন।

আইন অপরিবর্তনশীল নয়

প্রাকৃতিক আইনের পূর্বোক্ত ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এর কিছুটা গুরুত্ব রয়েছে। অনেকের মতে, বর্তমান বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রেই রায়দানের সময় বিচারপতিরা নিজস্ব বিবেক ও ন্যায়বোধের দ্বারা পরিচালিত হন। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক আইনের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব প্রাকৃতিক আইনের পরোক্ষ স্বীকৃতিমাত্র ; সর্বোপরি, আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রের প্রতিটি সরকারই মানুষের জীবন ও সম্পত্তির অধিকারকে অলঙ্ঘনীয় বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। এরূপ স্বীকৃতিদানের অর্থ প্রাকৃতিক আইনকে মেনে নেওয়া বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু তাঁদের এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

গুরুত্ব

৩। সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ হিসেবে আইন (Law as the Expression of the General Will)

ফরাসী দার্শনিক রুশো রাজনৈতিক আনুগত্যের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাঁর 'সামাজিক চুক্তি' (Social Contract, 1762) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্ব প্রচার করেন। কিভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার সমন্বয় সাধন করা যায় তা-ই ছিল রুশোর সমস্যা। তিনি তাঁর সাধারণ ইচ্ছার (General will) মধ্যে এই সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর 'সামাজিক চুক্তি' পুস্তকের কোথাও সাধারণ ইচ্ছার সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নিরূপণ করেন নি।

রুশোর মতে সাধারণ ইচ্ছা হোল জনসাধারণের কল্যাণকামী ইচ্ছার সমষ্টি মাত্র। এই ইচ্ছা কিন্তু সমাজস্থ সকলের ব্যক্তিগত ইচ্ছার যোগফল নয়, কারণ ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনেক সময় সমষ্টির স্বার্থের পরিবর্তে ব্যক্তিগত নির্দিষ্ট স্বার্থকে বড় বলে মনে করে। তাঁর মতে মানুষ দু'ধরনের ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হতে পারে, যথা—প্রকৃত ইচ্ছা (Real will) এবং অপ্রকৃত ইচ্ছা (Unreal

সাধারণ ইচ্ছার স্বরূপ

will)। যখন কেউ ব্যক্তিগত স্বার্থকে সামাজিক স্বার্থের উপরে স্থান দেয় তখন ধরে নিতে হবে যে সে তার অপ্রকৃত ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। প্রকৃত ইচ্ছা কখনই সমাজের স্বার্থ অপেক্ষা ব্যক্তির স্বার্থকে বড় করে দেখে না।

রুশোর মতে সাধারণ ইচ্ছা হোল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং আইন হোল সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ। যেহেতু আইন সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ, সেই হেতু কেউই আইনকে তথা সাধারণ ইচ্ছাকে অমান্য করতে পারে না। যদি কেউ আইন অমান্য করে তাহলে ধরে নিতে হবে যে সেই ব্যক্তি তার অপ্রকৃত ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় সেই ব্যক্তিকে বলপূর্বক সাধারণ ইচ্ছার অনুবর্তী হয়ে চলতে অর্থাৎ আইন মান্য করতে বাধ্য করা হবে। রুশো একথা ঘোষণা করেন যে সাধারণ ইচ্ছা কর্তৃক আইন প্রণীত হবে। তাই, সমগ্র সম্প্রদায়কেই আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করতে হয়। তবে রুশো একথা স্বীকার করেন যে, সকলে আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করলেও একই আইন প্রণয়নের ব্যাপারে তাঁরা ঐকমত্যে উপনীত হতে নাও পারেন। এক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকেই আইন হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। রুশোর মতে, কেবলমাত্র সাধারণ ইচ্ছাই হোল আইনের একমাত্র উৎস। যেহেতু সাধারণ ইচ্ছা প্রকৃতিগতভাবে কল্যাণকামী ইচ্ছা, সেহেতু আইনকে প্রত্যেকের মান্য করা উচিত। সাধারণ ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোন উৎস থেকে আইনের উদ্ভব হয় না বলে রুশো দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন।

আইন সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশমাত্র

সমালোচনা : বর্তমানে নানাদিক থেকে রুশোর আইন সংক্রান্ত তত্ত্বের সমালোচনা করা হয়।

প্রথমতঃ, রুশো আইনকে সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ বলে বর্ণনা করেছেন। এরূপ আইন প্রণয়ন করার জন্য জনসাধারণকে সর্বদাই প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়ন কার্যে ব্যাপৃত থাকতে হবে বলে তিনি ঘোষণা করেন। কিন্তু বর্তমান যুগের বৃহদায়তন রাষ্ট্রে সকল নাগরিকের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করা অসম্ভব। তাই, জনসাধারণ তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু রুশো এই ব্যবস্থাকে দাসত্বের ব্যাপকতর রূপ বলে বর্ণনা করেছেন। এদিক থেকে বিচার করে রুশোর আইনতত্ত্বকে অবাস্তব তত্ত্ব বলে সমালোচনা করা হয়।

অবাস্তব তত্ত্ব

দ্বিতীয়তঃ, রুশো আইনকে সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সাধারণ ইচ্ছা কার্যক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই আইন কার্যতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে সৃষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্তৃক প্রণীত হয়। এরূপ আইন সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থকে যথাযথ মর্যাদা নাও দিতে পারে। সমালোচকদের মতে, রুশো সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ হিসেবে আইনকে বর্ণনা করে প্রত্যেককে সেই আইন মান্য করতে নির্দেশ দিয়ে কার্যক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচারিতাকে সমর্থন করেছেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচারিতাকে সমর্থন

তৃতীয়তঃ, মার্কসবাদী লেখকরা রুশোর আইনতত্ত্বের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে আইন কখনই সাধারণ স্বার্থকে রক্ষা করে না।

বৈষম্যমূলক সমাজে আইন অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রভুত্বকারী শ্রেণীর ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র। এরূপ আইন কখনই সর্বহারা শ্রেণীর স্বার্থের অনুপন্থী হতে পারে না। দাস সমাজে আইন দাস মালিকদের স্বার্থ, সামন্ত সমাজে সামন্তপ্রভুদের স্বার্থ এবং পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষা করে। সুতরাং এরূপ আইনকে সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ এবং জনকল্যাণকামী বলে আদৌ অভিহিত করা যায় না।

মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে আইন

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, আদর্শবাদের ভিত্তিতে আইনকে সার্বভৌম সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ বলে বর্ণনা করা গেলেও বাস্তবের দিক থেকে তাকে এভাবে বর্ণনা করা যায় না। তবে সাধারণ ইচ্ছা বলতে যদি জনমতকে বোঝায় তা হলে আইনকে জনমতের প্রকাশ বলে অভিহিত করা যায়। এভাবে বর্ণনা করা হলে রুশোর আইনতত্ত্বকে অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক তত্ত্ব বলে স্বীকৃতি জানাতেই হবে।

উপসংহার

৪। আইন সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ (Different Theories of Law)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রীয় আইন নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু আইনের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও আইনবিদ্‌দের মধ্যে বাদানুবাদের অন্ত নেই। ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও দার্শনিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আইনের সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছেন। আইন সম্পর্কিত পরস্পরবিরোধী মতবাদগুলিকে মূলতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—ক. বিশ্লেষণমূলক মতবাদ, খ. ঐতিহাসিক মতবাদ, গ. দার্শনিক-মতবাদ, ঘ. তুলনামূলক মতবাদ, ঙ. সমাজবিজ্ঞানমূলক মতবাদ এবং চ. মার্কসীয় মতবাদ।

আইন সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ

[ক] **বিশ্লেষণমূলক মতবাদ (The Analytical School)** : হব্‌স, বোদা, হল্যান্ড, অস্টিন প্রমুখ আইনবিদ্‌গণ আইনের বিশ্লেষণমূলক মতবাদের প্রধান প্রবক্তা। বিশ্লেষণমূলক মতবাদের সমর্থকগণ প্রধানতঃ বেন্থাম এবং অস্টিনের আইন সম্পর্কিত ধারণার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ফরাসী দার্শনিক বোদা সার্বভৌম কর্তৃত্বকে আইনের উৎসস্থল বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, আইন হোল 'শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নির্দেশ' (command of the human superior) এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আইন বলবৎ করা হয়। ইংরেজ দার্শনিক হব্‌স সার্বভৌম শক্তির অধিকারী রাজার আদেশ বা নির্দেশকেই আইন বলে বর্ণনা করেছেন। তবে হব্‌স বোদার মতো সার্বভৌম কর্তৃত্বের উপর কোনরকম বাধানিষেধ আরোপের পক্ষপাতী ছিলেন না। বেন্থাম সার্বভৌম কর্তৃত্বের আদেশকে আইন বলে বর্ণনা করে সেই আইনের প্রতি স্বাভাবিক আনুগত্য প্রদর্শন করা জনগণের কর্তব্য বলে প্রচার করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রখ্যাত ইংরেজ আইনবিদ্ জন অস্টিন আইনকে অধস্তনের প্রতি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ (command) বলে বর্ণনা করেন। এরূপ আদেশের পেছনে চরম কর্তৃত্বের সমর্থন থাকে বলে অধস্তন ব্যক্তিবর্গ সেই আদেশ উপেক্ষা বা অমান্য করতে সাহস পায় না। আইনের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে অস্টিন বলেন, "আইন হোল

সার্বভৌম শক্তির আদেশ মাত্র"। এরূপ আইনের সঙ্গে নৈতিক সূত্র বা প্রথার কোন সম্পর্ক নেই। আইন যেহেতু সার্বভৌম শক্তির আদেশ, সেহেতু আইন ভঙ্গ করা হলে আইনভঙ্গকারীকে যথোচিত শাস্তি পেতে হয়। হল্যান্ড (Holland) মনে করেন যে, সার্বভৌম রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্ব দ্বারা প্রযুক্ত বাহ্যিক আচরণ-নিয়ন্ত্রণকারী সাধারণ নিয়মই হোল আইন।

সমালোচনা : অধ্যাপক ল্যাস্কি প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে আইনের বিশ্লেষণমূলক মতবাদের সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে অস্টিন আইনকে সার্বভৌম শক্তির আদেশ বলে বর্ণনা করে প্রথাগত আইনকে উপেক্ষা করেছেন। সার্বভৌমের আদেশ ছাড়াও প্রতিটি সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি বা প্রথা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকে। স্বয়ং সার্বভৌম এইসব প্রথাকে উপেক্ষা বা অস্বীকার করতে সাহস পান না। বিশ্ব-ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, এইসব প্রথা সামাজিক জীবনে আইনের মতই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। ল্যাস্কির মতে, তুরস্কের সুলতান যখন সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতেন তখনও তাঁর পক্ষে কতকগুলি প্রথাগত বিধিনিষেধ উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। এইগুলিকে মান্য করা তাঁর পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল। হেনরী মেইন বলেছেন, প্রাচ্যের অনুন্নত রাষ্ট্রগুলিতে প্রথাগত বিধিনিষেধের ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত প্রবল। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের মত স্বৈরাচারী শাসকও প্রচলিত প্রথাগুলিকে উপেক্ষা করতে সাহস পাননি। এদিক থেকে বিচার করে বলা যায় যে, প্রথাগত আইন যেহেতু সার্বভৌম শক্তির সৃষ্ট নয়, সেহেতু তিনি এগুলিকে উপেক্ষা করতে পারেন না। অনেকের মতে, অস্টিন প্রথাগত আইনকে আদৌ উপেক্ষা করেননি। কারণ তাঁর মতে, সার্বভৌম শক্তি যা অনুমোদন করেন তা-ই আইন, অর্থাৎ তাঁর আদেশ। এর অর্থ হোল, প্রথাগত আইনগুলিকে প্রচলিত থাকার অনুমতি দিয়ে সার্বভৌম শক্তি এগুলিকে আইনে পরিণত হওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই বক্তব্য যুক্তিগ্রাহ্য নয়। কারণ, প্রথাগত আইনের বিরুদ্ধাচরণ করার সাহস তাঁর ছিল না বলেই তিনি বাধ্য হয়েই এগুলিকে অনুমোদন করেছিলেন বলে মনে হয়। বস্তুতঃ অস্টিন প্রথাগত আইনের অস্তিত্বকে উপেক্ষা করেন নি। কিন্তু সার্বভৌম শক্তি প্রথাগত আইনগুলিকে স্বেচ্ছায় আইনের মর্যাদা দিয়েছিলেন অথবা বাধ্য হয়েই দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে অস্টিন কোন সুস্পষ্ট অভিমত জ্ঞাপন করেন নি।

প্রথাগত আইনকে উপেক্ষা

দ্বিতীয়তঃ বিশ্লেষণমূলক মতবাদীদের মতে, লোকে শাস্তির ভয়েই আইন মান্য করে। কিন্তু এই যুক্তিটিও আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অনেকেই মেনে নিতে সম্মত নন। তাঁদের মতে, যখন রাষ্ট্র ছিল না তখনও সমাজ কতকগুলি সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মীয় অনুশাসন ইত্যাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হোত। তাছাড়া, বর্তমানে লোকে কেবলমাত্র শাস্তির ভয়েই আইন মান্য করে না। লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce)-এর মতে, নির্লিপ্ততা, শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, শাস্তির ভয় এবং যৌক্তিকতার উপলব্ধিই আইন মান্য করার কারণ।

আইন মান্য করার কারণ নিয়ে মতপার্থক্য

তৃতীয়তঃ সমালোচকদের মতে, বিশ্লেষণমূলক মতবাদ আইন এবং আদেশকে

অভিন্ন বলে বর্ণনা করে ভুল করেছে। কারণ আদেশ ঊর্ধ্বতন এবং অধস্তনের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আইনের ঊর্ধ্বে—এই মতবাদ স্থাপন করেছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন এবং আদেশের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নিরূপণ করা হয় না এবং আইন-প্রণয়নকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাধারণ নাগরিকেরও কোন পার্থক্য নিরূপণ করা হয় না। অন্যভাবে বলা যায়, গণতন্ত্রে সাধারণ নাগরিকের মতই আইন-প্রণয়নকারী আইনের অধীন। তাছাড়া আদেশ (command) বলতে আইন প্রণয়নকে বোঝায় না, শাসনকার্য পরিচালনাকে বোঝায়। আইন মোটামুটিভাবে স্থায়ী কিন্তু আদেশ বিশেষ অবস্থায় ঘোষিত হয়। সুতরাং তা প্রকৃতিগতভাবে অস্থায়ী। অতএব আইনকে সার্বভৌমের আদেশ বলে বর্ণনা করা সমীচীন নয় বলে সমালোচকেরা মনে করেন।

আইন ও আদেশ এক নয়

চতুর্থতঃ বিশ্লেষণমূলক মতবাদ আইনকে শ্রেণীস্বার্থের প্রকাশ বলে বর্ণনা না করে ভুল করেছে। মার্কসবাদীদের মতে, প্রতিটি সমাজেই আইন প্রভুত্বকারী শ্রেণীরই ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র। এরূপ আইন সমাজে প্রভুত্বকারী শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করে। দাস সমাজে দাস মালিকদের, সামন্ত সমাজে সামন্তপ্রভুদের এবং ধনতান্ত্রিক সমাজে পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে আইন ব্যবহৃত হয়। কেবলমাত্র বৈষম্যহীন সমাজেই আইন জনস্বার্থ রক্ষা করতে পারে।

মার্কসবাদিগণ কর্তৃক সমালোচনা

পঞ্চমতঃ বিশ্লেষণমূলক মতবাদ আইনের অসম্পূর্ণ মতবাদ মাত্র। কারণ আইনের অন্যান্য উৎস, যথা—প্রথা, ধর্ম, বিচারালয়ের রায় পণ্ডিত ব্যক্তিদের এই মতবাদ অস্বীকার করেছে। কেবলমাত্র সার্বভৌম শক্তিকেই আইনের উৎস বলে বর্ণনা করে এই মতবাদের সমর্থকগণ সত্যের অপলাপ করেছেন।

অসম্পূর্ণ মতবাদ

[খ] **ঐতিহাসিক মতবাদ (The Historical School):** বিশ্লেষণমূলক মতবাদের প্রতিবাদ হিসেবে আইন সম্পর্কে ঐতিহাসিক মতবাদের জন্ম। জার্মান আইনবিদ স্যাভিনী (Savigny), হেনরী মেইন (Henry Maine), ক্লার্ক (Clark), সিজউইক (Sidgwick) প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ আইন সম্পর্কে ঐতিহাসিক মতবাদের প্রচারক। এঁদের মতে, বিশ্লেষণমূলক মতবাদের সর্বপ্রধান ত্রুটি হোল এই যে, এই মতবাদ আইনকে স্থিতিশীল বলে বর্ণনা করে। কিন্তু প্রতিনিয়তই সমাজ পরিবর্তিত হচ্ছে। এই সামাজিক পরিবর্তনের পশ্চাতে নানা প্রকার সামাজিক শক্তি কাজ করে। সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আইনের পরিবর্তন সাধিত হয়। কোন একজন আইন-প্রণেতার আজ্ঞায় হঠাৎ একদিন আইন প্রণীত হয়—ঐতিহাসিক মতবাদ এ ধারণাকে অবাস্তব বলে মনে করে। তাছাড়া, এই মতবাদের সমর্থকগণ মনে করেন যে, প্রত্যেক সমাজেই সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি, লোকাচার প্রভৃতি প্রচলিত থাকে। কালক্রমে এগুলি আইনের মর্যাদা লাভ করে। সুতরাং কোনভাবেই আইনকে কেবলমাত্র সার্বভৌম শক্তির আদেশ বলে মেনে নেওয়া যায় না। স্যাভিনীর মতে আইন তৈরি

ঐতিহাসিক মতবাদ অনুসারে আইনের প্রকৃতি

করা রাষ্ট্রের কাজ নয়। 'আইনের যাথার্থ্য উপলব্ধি ও তার প্রয়োগ করাই হোল রাষ্ট্রের প্রকৃত কাজ।' এদিক থেকে বিচার করে ঐতিহাসিক মতবাদিগণ আইনকে 'নিজে নিজেই সৃষ্ট' (self-created) এবং 'নিজে নিজেই বলবৎযোগ্য' (self-executed) বলে বর্ণনা করেন। ঐতিহাসিক মতবাদের সমর্থক ও প্রচারকগণ মনে করেন যে, কেবলমাত্র শাস্তি বা বলপ্রয়োগের ভয়ে লোকে আইন মান্য করে না। জনসাধারণ কর্তৃক স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থিত ও পালিত না হলে কোন আইনই বাস্তবে কার্যকরী হতে পারে না। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে জানে (Zane) বলেছেন, মানুষের বিশ্বজনীন অভিজ্ঞতা এই শিক্ষা দিয়েছে যে, আইন জনসাধারণের বৃহৎ অংশ কর্তৃক গৃহীত না হলে তাকে কখনই কার্যকরীভাবে বলবৎ করা যায় না। আপাতদৃষ্টিতে হব্‌স এবং অস্টিনের মতো মনে হতে পারে যে, সরকার আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তাঁর মতে, সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত নিয়মাবলীই আইন ও সরকারকে তৈরি করে।

ঐতিহাসিক মতবাদীদের সমালোচনার উত্তরে আইনের বিশ্লেষণমূলক মতবাদের সমর্থকগণ বলেন যে, প্রথা নিজের থেকেই আইনে রূপান্তরিত হয় না। সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি, লোকাচার প্রভৃতিকে প্রচলিত থাকার অনুমতি দিয়ে সার্বভৌম শক্তি এগুলিকে আইনে পরিণত হওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের এই বক্তব্য যুক্তিগ্রাহ্য নয়। কারণ প্রথাগত আইনের বিরুদ্ধাচরণ করার সাহস সার্বভৌমের ছিল না বলে তিনি বাধ্য হয়ে এগুলিকে অনুমোদন করেছিলেন।

বিশ্লেষণমূলক মতবাদ প্রথাগত আইনকে উপেক্ষা করেনি বলে অনেকের ধারণা

সুতরাং ঐতিহাসিক মতবাদ একথা প্রচার করে যে আইন যেহেতু সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক সৃষ্ট হয় না সেহেতু তিনি নিজেই আইনের ঊর্ধ্বে নন। সমাজের প্রচলিত আইনকে মেনে চলতে তিনিও বাধ্য। হেনরী মেইন বলেছেন, প্রাচ্যের অনুন্নত রাষ্ট্রগুলিতে প্রথাগত বিধিনিষেধের ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত বেশী। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন যে, পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের মত স্বৈরাচারী শাসকও প্রচলিত প্রথাগুলিকে উপেক্ষা করতে সাহস পাননি।

সার্বভৌম শক্তি নিজেই প্রথাগত আইনের ঊর্ধ্বে নন

সমালোচনা: আইন সম্পর্কে ঐতিহাসিক মতবাদের মধ্যে সত্যতা থাকলেও এর ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কারণ:

প্রথমতঃ আইনের পশ্চাতে যে সার্বভৌম শক্তির সমর্থন থাকে তা অস্বীকার করে এই মতবাদ ভুল করেছে। বস্তুতঃ আইন কর্তৃক সমর্থিত ও প্রযুক্ত না হলে কোন আইনকেই লোকে স্বেচ্ছায় মান্য করতে পারে না। কিন্তু এই মতবাদ কেবলমাত্র জনগণের স্বেচ্ছা-সমর্থনকে আইনের বাস্তব রূপায়ণের একমাত্র উপাদান বলে বর্ণনা করে বাস্তবতাবর্জিত মতবাদ হিসেবে সমালোচিত হয়েছে।

আইনের ভিত্তি কেবলমাত্র জনগণের স্বেচ্ছা-সমর্থন নয়

দ্বিতীয়তঃ ঐতিহাসিক মতবাদের সমর্থকগণ আইনের মধ্যে যে আদর্শবাদিতার প্রেরণা ও প্রভাব রয়েছে তা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অথচ এই আদর্শবাদিতাই সমাজকে যথার্থ নীতিবোধের দিকে

আইনের নৈতিক উদ্দেশ্য উপেক্ষিত

পরিচালিত করে। সমালোচকদের মতে, আইনের ঐতিহাসিক মতবাদ আইনের উৎপত্তির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে তার নৈতিক উদ্দেশ্যকে কার্যত অস্বীকার করে ভুল করেছে।

তৃতীয়তঃ মার্কসবাদীদের মতে, আইনের ঐতিহাসিক মতবাদ আইনকে শ্রেণীস্বার্থের দিক থেকে বিচারবিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। মার্কসবাদী লেখকগণ ঐতিহাসিক-ভাবে প্রমাণ করেছেন যে, সমাজবিবর্তনের বিভিন্ন অধ্যায়ে আইন সমাজের প্রভুত্বকারী শ্রেণীর স্বার্থে কাজ করেছে। দাস-সমাজে, সামন্ত সমাজে ও পুঁজিবাদী সমাজে আইন যথাক্রমে দাসমালিক, সামন্তপ্রভু এবং পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করেছে। ঐ সব সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত মানুষের স্বার্থে আইন কাজ করেনি এবং করছেও না। এরূপ আইনকে মার্কসবাদীরা শাসক শ্রেণীর ইচ্ছার প্রকাশ বলেই বর্ণনা করেন। সুতরাং ঐতিহাসিক মতবাদ আইনের প্রকৃতিনির্ণয়ে প্রকৃত ইতিহাস বর্ণনা করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে সমালোচনা করা হয়।

মার্কসবাদীগণ কর্তৃক সমালোচনা

উপরি-উক্ত সমালোচনা সত্ত্বেও আইনের ঐতিহাসিক মতবাদের মূল্যকে কোনমতেই উপেক্ষা বা অস্বীকার করা যায় না। সমাজে সুদীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত প্রথাগুলিই যে ক্রমে ক্রমে আইনে রূপান্তরিত হয় এ কথা অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া জনসমর্থন ছাড়া যে কোনও সরকারই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারে না—একথা আজ ঐতিহাসিকভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। সর্বোপরি, কোন আইনই যে স্থিতিশীল নয়, বরং গতিশীল—ঐতিহাসিক মতবাদীদের এই যুক্তি বিতর্কের অবকাশ রাখে না। পরিবর্তিত সমাজমনের সঙ্গে যে আইন সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে না তা যে কালক্রমে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে—এ কথা সন্দেহাতীতভাবেই প্রমাণিত হয়েছে।

মূল্য

[গ] **দার্শনিক মতবাদ (The Philosophical School) :** আইনের দার্শনিক মতবাদ আইনকে বাস্তব দৃষ্টিতে বিচারবিশ্লেষণ করার পরিবর্তে আদর্শের প্রকাশ হিসেবেই বর্ণনা করে। এই মতবাদের সমর্থকগণ আইন-ব্যবস্থাকে নৈতিকতার মানদণ্ডে বিচার করার পক্ষপাতী। তাঁরা ন্যায়বিচারের ধারণাকে (idea of justice) আদর্শ আইন ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করতে চান। এই মতবাদ আইনের বস্তুনিরপেক্ষ প্রকৃতিতে আস্থাশীল। আধুনিক কালের দার্শনিক মতবাদীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলেন অধ্যাপক জোসেফ কোলার (Joseph Kohler)। তাঁর মতে, একজন আইনজ্ঞ দার্শনিক আইনের বাস্তব বিষয়বস্তু আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আদর্শগত দিকটিকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করবেন। তিনি আইনকে সংস্কৃতির সৃষ্টি (Product of Culture) এবং সংস্কৃতি উন্নতিসাধনের উপায় (a means furthering) হিসেবে বর্ণনা করেন। দার্শনিক মতবাদ অনুসারে, যথার্থ আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ করা এবং তাকে দার্শনিক মানদণ্ডে বিচার করে প্রয়োগ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

দার্শনিক মতবাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়

কিন্তু বিভিন্ন যুগে দার্শনিকগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আইনের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি আলোচনা করার ফলে দার্শনিক মতবাদ একটি সুসমঞ্জস মতবাদ হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা

করতে সক্ষম হয়নি। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টট্‌ল (Aristotle) আইনকে যুক্তি-নির্ভর বুদ্ধির প্রকাশ (Expression of Reason) বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, এই যুক্তিনির্ভর বুদ্ধির প্রকাশই কেবলমাত্র সর্বাঙ্গীন সামাজিক কল্যাণ সাধন করতে পারে। গ্রীসের স্টোইক (Stoics) দার্শনিকগণ 'প্রাকৃতিক আইনকে' (Natural law) আইন বলে বর্ণনা করেছেন।

বিভিন্ন যুগে দার্শনিক মতবাদের বক্তব্য

তাঁদের মতে, কতকগুলি সত্য ও ন্যায়নীতির দ্বারা বিশ্ব পরিচালিত হচ্ছে। এই সব ন্যায়নীতি শাশ্বত ; এর কোন ক্ষয়ক্ষতি নেই। এই সব শাশ্বত প্রাকৃতিক আইনের অবস্থান রাষ্ট্রীয় আইনের ঊর্ধ্বে। মানুষ যেহেতু প্রজ্ঞাশীল জীব সেহেতু সে তার নিজস্ব বিচারক্ষমতার দ্বারা প্রাকৃতিক আইনের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে এবং তার মানদণ্ডে বাস্তব আইনের যাথার্থ্য নিরূপণ করতে পারে। আবার অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দার্শনিক রুশো (Rousseau) আইনকে 'সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ' (Expression of General Will) বলে বর্ণনা করেন। তিনি আইনকে বস্তুগ্রাহ্য নয় বলে মনে করতেন। এর পর উনবিংশ শতাব্দীতে আদর্শবাদী দার্শনিকগণ রাষ্ট্রীয় আইনকে সর্বোচ্চ নীতির প্রকাশ বলে বর্ণনা করেন। হেগেল (Hegel) রাষ্ট্রকে 'সর্বদোষমুক্ত বুদ্ধিময়তা' (Perfected rationality) এবং 'চেতনার বস্তুগত রূপ' বা 'নৈতিক শক্তি' (Objective Reason or Spirit) বলে বর্ণনা করে এর নির্দেশকেই আইন বলে বর্ণনা করেছেন। বর্তমান শতাব্দীতে দার্শনিক মতবাদের সমর্থকগণ সামাজিক স্বার্থ ও আদ (Social Interests and Ideals) প্রতিষ্ঠার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে সামাজিক ন্যায়বিচার (Social justices) প্রতিষ্ঠাকে আইনের পবিত্র উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা করেছেন।

সমালোচনা ঃ কিন্তু বর্তমানে দার্শনিক মতবাদকে নানাভাবে সমালোচনা করা যায় ঃ

প্রথমতঃ এই মতবাদ আইনকে বস্তুনিরপেক্ষ আদর্শের প্রকাশ ব র্ণনা করে কাল্পনিক মতবাদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার না করে এই মতবাদ আইনকে আদর্শের প্রকাশ বলে বর্ণনা করে ভুল করেছে। কারণ, আইন হোল আইনবিদ্‌গণ কর্তৃক প্রচারিত কতকগুলি নিয়ম। আইনবিদ্‌ সর্বক্ষেত্রেই তাঁদের নিজ নিজ সামাজিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হন। তাই তাঁদের পক্ষে নিরপেক্ষ কোন আদর্শ আইনের রূপরেখা তৈরি করা অসম্ভব। এই কারণে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দার্শনিক নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে আইনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন।

আইন আদর্শের প্রকাশ নয়

দ্বিতীয়তঃ এই মতবাদ আইনকে শ্রেণীস্বার্থের প্রকাশ বলে স্বীকার না করে ? বাস্তব মতবাদ বলে সমালোচিত হয়েছে। বিভিন্ন যুগে আইন ; প্রভুত্বকারী শ্রেণীর স্বার্থে কাজ করেছে তা চাপা দেওয়ার জনাই বুর্জোয়া দার্শনিকগণ আইনের উপর নৈতিকতা, শাশ্বত প্রজ্ঞা ইত্যাদির ছাপ দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করেছেন।

তৃতীয়তঃ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণের মতে, আইনকে কখনই নৈতিকতার মানদণ্ডে বিচার করা সমীচীন নয়। আইনের সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্ক থাকলেও উভয়ের মধ্যে

পার্থক্যকে অস্বীকার করা যায় না। নৈতিকতার দৃষ্টিতে যা অন্যায় আইনের দৃষ্টিতে তা অপরাধ বলে পরিগণিত হতে নাও পারে। তাছাড়া, নৈতিকতার পশ্চাতে কোন কার্যকরী শক্তির সমর্থন নেই, কিন্তু আইনের পশ্চাতে কার্যকরী শক্তি থাকে। তাই আইন ভঙ্গ করলে দৈহিক শাস্তি পেতে হয়; কিন্তু নৈতিক আইনকে উপেক্ষা করলে বিবেকের দংশন কিংবা সামাজিক বদনাম সহ্য করতে হয়।

আইনকে নৈতিকতার মানদণ্ডে বিচার করা সমীচীন নয়

এই সব কারণে আইনের দার্শনিক মতবাদকে অবৈজ্ঞানিক ও অবাস্তব মতবাদ বলে সমালোচনা করা হয়।

[ঘ] **তুলনামূলক মতবাদ (The Comparative School):** আইন সম্পর্কে তুলনামূলক মতবাদটি সাম্প্রতিককালে প্রচারিত হয়েছে। এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা হলেন ইংল্যাণ্ডের স্যার পল ভিনিগ্রাডভ্ (Paul Vinigradoff)। তুলনামূলক মতবাদের প্রচারকগণ আইনের প্রকৃতি-নির্ণয়ে ঐতিহাসিক মতবাদিগণ কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতি অনুসরণের পক্ষপাতী। অতীতের আইন ব্যবস্থার সঙ্গে বর্তমানের আইন ব্যবস্থার একটি তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে এই মতবাদের প্রচারকরা আইনের প্রকৃতি সম্পর্কে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চান। আইন সম্পর্কে তাঁদের অনুসিদ্ধান্তকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য তাঁরা অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান থেকেও মালমসলা সংগ্রহ করেন। যদিও তুলনামূলক মতবাদের কর্মসূচী উচ্চাশা-সমন্বিত, তথাপি এই মতবাদ আইন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ এবং বাস্তবমুখী আলোচনা করতে এখনও সক্ষম হয়নি।

তুলনামূলক মতবাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়

[ঙ] **সমাজবিজ্ঞানমূলক মতবাদ (The Sociological School):** আইনের উৎস ও প্রকৃতি নির্ণয়ে সমাজবিজ্ঞানমূলক মতবাদ হলো অন্যতম আধুনিক মতবাদ। এই মতবাদের প্রধান সমর্থক ও প্রবক্তা হলেন অস্ট্রিয়ার গামপ্লোউইক (Gumplowick), ফ্রান্সের দ্যুগুই (Duguit); হল্যাণ্ডের ক্র্যাবে (Krabbe), এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রস্কো পাউণ্ড (Roscoe Pound) ও বিচারপতি হোমস্ (Holmes) প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানিগণ। অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কিও (Harold Laski) সমাজবিজ্ঞানমূলক মতবাদের অন্যতম প্রধান সমর্থক। এই মতবাদের প্রবক্তাগণ প্রধানতঃ মনোবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান ও প্রয়োগবাদী দর্শন থেকে তাঁদের তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। তাঁদের মতে, বিভিন্ন সামাজিক কারণ এবং প্রভাবের ফলে আইনের সৃষ্টি হয়েছে। সামাজিক কল্যাণসাধনকেই তাঁরা আইনের প্রধান উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা করেন। সমাজবিজ্ঞানমূলক মতবাদের প্রবক্তাগণ আইনের উৎপত্তি এবং প্রয়োগপদ্ধতি বিচারবিশ্লেষণ করে এই মন্তব্য করেন যে, আইনের সার্থকতা অবাস্তব তত্ত্ব ও আলোচনায় নয়, তার সার্থকতা বাস্তব উপযোগিতায়। সামাজিক কল্যাণ সাধনের কোন্ কোন্ আদর্শ আইনে রূপায়িত হওয়া উচিত তা-ই হোল এই মতবাদের প্রধান বিচার্য বিষয়। আইন সার্বভৌম শক্তির নির্দেশ কিংবা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত সামাজিক প্রথা বলেই সর্বক্ষেত্রে আইন মেনে চলতে হবে—একথা এই মতবাদ বিশ্বাস করে না। সমাজবিজ্ঞানমূলক মতবাদের প্রবক্তাদের মতে, আইন সমাজের কল্যাণ সাধন করে বলেই

সমাজবিজ্ঞানমূলক মতবাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়

লোকে আইন মান্য করে। এইভাবে আইনকে সর্বোচ্চ শক্তি, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব অপেক্ষা আইনের বৈধতাই প্রধান এবং আইনের স্থান রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের ঊর্ধ্বে বলে তাঁরা ঘোষণা করেন।

দ্যুগুই-এর মতে, আইন হোল সমাজে মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী কতকগুলি নিয়ম। মানুষ সামাজিক ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে বলেই সচেতনভাবে আইন মান্য করে। তিনি আইনকে রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ বলে বর্ণনা করে তাকে রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। রাষ্ট্র কেবলমাত্র প্রচলিত ব্যবহারিক নিয়মাবলীকে কার্যকর করতে পারে।

দ্যুগুই-এর অভিমত

এইভাবে দ্যুগুই আইনকে প্রধানতঃ তার উদ্দেশ্যের দিক থেকে বিচারবিশ্লেষণ করলেও ক্র্যাবে তাকে উৎসের দিক থেকেই আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, মানুষের যাথার্থ্য সম্পর্কে অনুভূতি (sense of right) হোল আইনের উৎস। তিনিও আইনকে রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছেন এবং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার পরিবর্তে আইনের সার্বভৌমিকতাকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

ক্র্যাবের অভিমত

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে একথা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, সমাজবিজ্ঞানমূলক মতবাদিগণ আইন সম্পর্কে আলোচনার সময় বহু বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হতে পারেননি। কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁরা সবাই একমত যে, সামাজিক প্রভাবের ফলে আইনের সৃষ্টি এবং সামাজিক কল্যাণবিধান করা আইনের উদ্দেশ্য। তাঁরা প্রত্যেকেই 'আইন সার্বভৌম রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট'—এই মতের তার বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে এরূপ যুক্তির অবতারণা করেন যে, এমন একটি সময় ছিল যখন রাষ্ট্রের কোন অস্তিত্ব না থাকলেও আইনের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু এমন কোনও রাষ্ট্র দেখা যায় না, আইন ছাড়াই যার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করা যায়। তাঁদের মতে, আইনের প্রধান উদ্দেশ্য হোল সমাজকে সেবা করা এবং রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হোল সামাজিক কল্যাণ বিধানের কাজে আইনকে বিধিবদ্ধ করা এবং জনগণের নিকট তা প্রচার করা।

আইন ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিষয়ে ধারণা

সমাজবিজ্ঞানমূলক মতবাদকে অনেকখানি গ্রহণযোগ্য বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু এই মতবাদও আইনকে শ্রেণীস্বার্থের প্রকাশ হিসেবে আলোচনা করেনি বলে সমালোচনা করা হয়। এই মতবাদ অনুসারে সামাজিক কল্যাণ সাধন করা আইনের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু ধনবৈষম্যমূলক সমাজে আইন যেহেতু প্রভুত্বকারী শ্রেণীর স্বার্থকে রক্ষা করে, সেহেতু তাকে কোনমতেই জন-কল্যাণকর বলে মনে করা সমীচীন নয়। আইন কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজে জনকল্যাণ সাধন করতে পারে। সমাজবিজ্ঞানমূলক মতবাদিগণ এই বাস্তব সত্যকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

মূল্যায়ন

[চ] মার্কসীয় মতবাদ (The Marxist School) ঃ যে-সব মতবাদ পূর্বে আলোচিত হয়েছে মার্কসীয় মতবাদ সেই সমস্ত মতবাদ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। একটি নতুন বৈজ্ঞানিক তথা বাস্তবসম্মত দৃষ্টি-কোণ থেকে মার্কসবাদ আইনের প্রকৃতি নির্ণয় করেছে। মার্কস (Marks)-এর মতে, আইন রাষ্ট্র-প্রকৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাই

মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে আইনের প্রকৃতি

রাষ্ট্রের প্রকৃতির উপর আইনের প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। তিনি আইনকে 'জনগণের ইচ্ছার প্রকাশ' (expression of the will of the people) এবং 'সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতিসমূহের প্রকাশ' (reflection of the principles of social justice) বলে স্বীকার করে নিতে সম্মত নন। তিনি আইনকে রাষ্ট্রের ইচ্ছার প্রকাশ বলে বর্ণনা করেন। শ্রেণীবৈষম্যমূলক সমাজে রাষ্ট্র যেহেতু প্রভুত্বকারী শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার যন্ত্র হিসেবে কাজ করে, সেহেতু আইনও সেই শ্রেণীর ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র। ভিশিনস্কি (Vyshinsky)-র মতে, আইন হোল সেই সমস্ত আচরণবিধি যা সমাজের প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর ইচ্ছার প্রকাশ। বিধিবদ্ধ আইন, আদেশ, জরুরী বিধি এবং রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত বা অনুমোদিত রীতিনীতি ও প্রথাগুলিতে এই আচরণ-বিধিগুলি সম্মিলিত থাকে। ভি· তুমানোভ বলেছেন, আইন হোল এমন এক বিশেষ সামাজিক অভিব্যক্তি (phenomenon) যার প্রধান লক্ষ্য হোল সামাজিক সম্পর্কগুলিকে সুনির্দিষ্টভাবে নিয়ন্ত্রণ করা এবং মানুষের কার্যকলাপকে প্রভাবিত করা। তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রের কার্যাবলীর একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি বলেও আইনকে বর্ণনা করেছেন।

মার্কসবাদীদের মতে, আইনের আধিদৈবিক কিংবা সমাজ-বহির্ভূত কোন উৎস নেই। সমাজ-বিকাশের যে-অবস্থায় রাষ্ট্রের উদ্ভব, সেই অবস্থাতেই 'রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি' হিসেবে আইনেরও উৎপত্তি ঘটেছিল। মার্কসীয় তত্ত্ব অনুসারে, সমাজের ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের বিশেষ একটি স্তরে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। মার্কস-বাদীরা অর্থনৈতিক উপাদানকে ভিত্তি বলে বর্ণনা করে আইন, বিচার বিভাগ, সৈন্য-বাহিনী, পুলিস, আমলা প্রভৃতিকে উপরি-কাঠামো (super-structure) বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মতে—অতীতের সমস্ত রাষ্ট্রই, যেমন দাস-রাষ্ট্র, সামন্ত-রাষ্ট্র এবং বর্তমানের ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র হোল যথাক্রমে সংখ্যালঘু দাস-মালিক, সামন্ত-প্রভু এবং পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার। এই সব রাষ্ট্রে শাসকশ্রেণী নিজেদের শোষণভিত্তিক শাসনব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য নিজেদের স্বার্থের উপযোগী কতকগুলি নিয়ম তৈরি করে তাকে আইন বলে আখ্যা দেয় এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সেগুলিকে বলবৎ করে। এই সব রাষ্ট্রের আইন কখনই সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে কিংবা সামাজিক কল্যাণ সাধন করতে পারে না। মার্কসবাদীদের মতে, কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে অর্থাৎ সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব কায়েম হলে রাষ্ট্র সংখ্যাগরিষ্ঠ সর্বহারাশ্রেণীর স্বার্থে সামাজিক কল্যাণকর আইন প্রণয়ন করতে পারে। উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই আইনের শিকড় নিহিত থাকে। তাই আইনের মৌলিক নীতিগুলি কখনই এবং কোন সমাজেই সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সীমা অতিক্রম করে বিশেষ কোন নীতি বা আদর্শকে কার্যকর করতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পুঁজিবাদী সমাজে কর্মের অধিকার সুনিশ্চিত করে কখনই কোন আইন প্রণীত হতে পারে না। বস্তুতঃ পুঁজিবাদী সমাজে প্রচলিত উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করেই সর্বপ্রকার আইন প্রণীত হয়। অন্য-ভাবে বলা যায়, পুঁজিপতি শ্রেণীর ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে সুরক্ষিত করার জন্য

বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্রীয় আইনের প্রকৃতি

আইন প্রণয়ন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাই এরূপ সমাজে উৎপাদনের উপায়ের উপর ব্যক্তিগত মালিকানাকে উচ্ছেদ করার জন্য কোন আইন প্রণীত হতে দেখা যায় না।

আইন সম্পর্কে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিঃসন্দেহে বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। আইন সম্পর্কিত অন্যান্য মতবাদগুলি আইনকে শ্রেণীস্বার্থের প্রকাশ বলে বর্ণনা না করার জন্য সমালোচিত হয়েছে। মার্কসবাদীরা ঐতিহাসিকভাবে তাঁদের বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন—এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বস্তুতঃ, শ্রেণী-বৈষম্যমূলক সমাজে আইন প্রকৃতিগত-ভাবে বৈষম্যমূলক হতে বাধ্য। মার্কসীয় মতবাদের মধ্যে যুক্তি ও বাস্তবতা আছে বলেই তা সর্বতোভাবে সমর্থনযোগ্য।

মূল্যায়ন

৫। আইনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Law)

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে আইনের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হল্যান্ড (Holland) কাজের পরিধি ও ধরনের ভিত্তিতে আইনকে প্রধানতঃ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, যথা—ক. জাতীয় আইন (Municipal Law) এবং খ. আন্তর্জাতিক আইন (International Law)। জাতীয় আইনকে আবার তিনি দুভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা—সরকারী আইন (Public Law) এবং ব্যক্তিগত আইন (Private Law)। হল্যান্ডের সমর্থকগণ সরকারী আইনকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন, শাসনতান্ত্রিক আইন (Constitutional Law), শাসন সংক্রান্ত আইন (Administrative Law) এবং ফৌজদারী আইন (Criminal Law)।

হল্যাণ্ড কর্তৃক আইনের শ্রেণীবিভাগ

হল্যান্ড যেভাবে আইনের শ্রেণী-বিভাগ করেছেন একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে তা সুন্দরভাবে দেখানো যেতে পারে :
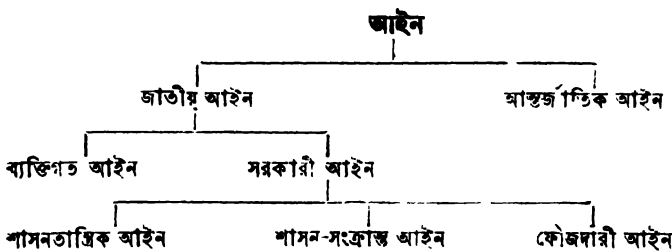
কিন্তু ম্যাকআইভার (MacIver) রাজনৈতিক আইনকে প্রধানতঃ ১. জাতীয় এবং, ২. আন্তর্জাতিক—এই দুভাগে বিভক্ত করেন। তিনি জাতীয় আইনকে আবার দু'টি ভাগে ভাগ করেছেন, যথা—শাসনতান্ত্রিক (Constitutional) এবং সাধারণ (Ordinary)। তাঁর মতে সাধারণ আইন দু'ধরনের হতে পারে, যথা—সরকারী এবং ব্যক্তিগত। সরকারী আইনকে তিনি শাসন-সংক্রান্ত এবং অবিশেষক (General)—এই দু'ভাগে বিভক্ত করেন।

ম্যাকআইভারের শ্রেণীবিভাগ

ম্যাকআইভারকে অনুসরণ করে নিম্নলিখিত রেখাচিত্রের সাহায্যে[1] আইনের শ্রেণী-বিভাগ করা যেতে পারে :
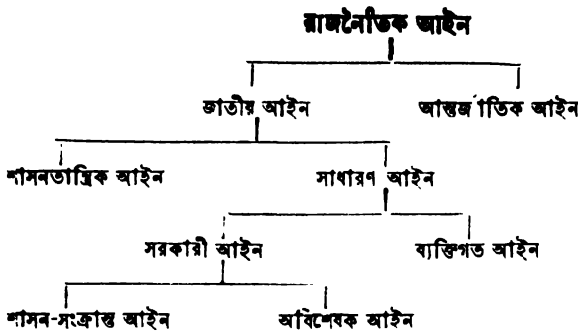
ম্যাকআইভারের শ্রেণীবিভাগ অনেকেই স্বীকার করে নিতে সম্মত নন।[2] কারণ, তিনি শাসনতান্ত্রিক আইনকে সরকারী আইন বলে স্বীকার করেন না। তাছাড়া শাসন সংক্রান্ত আইনকে তিনি সরকারী আইনের পর্যায়ে ফেলেছেন। কিন্তু শাসনতান্ত্রিক আইনকে কেন উক্ত পর্যায়ভুক্ত করা হবে না সে সম্পর্কে তিনি কোনরূপ মন্তব্য করেন নি। তাছাড়া সাধারণ এবং অবিশেষক আইনের মধ্যে তিনি যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন তাও সুস্পষ্ট নয়। হল্যান্ড ও ম্যাকআইভার আন্তর্জাতিক আইনের কোনরূপ শ্রেণীবিভাগ করেন নি। বর্তমানে আন্তর্জাতিক আইনকে দুভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা—ব্যক্তিকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক আইন এবং সরকারী আন্তর্জাতিক আইন। সরকারী আন্তর্জাতিক আইনকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা—শান্তি-সংক্রান্ত আইন, যুদ্ধ-সংক্রান্ত আইন এবং নিরপেক্ষতা-সংক্রান্ত আইন।

আইনের আধুনিক শ্রেণীবিভাগ

আইনের আধুনিক শ্রেণী-বিভাগকে নিম্ন-বর্ণিত রেখাচিত্রের সাহায্যে আলোচনা করা যেতে পারে :
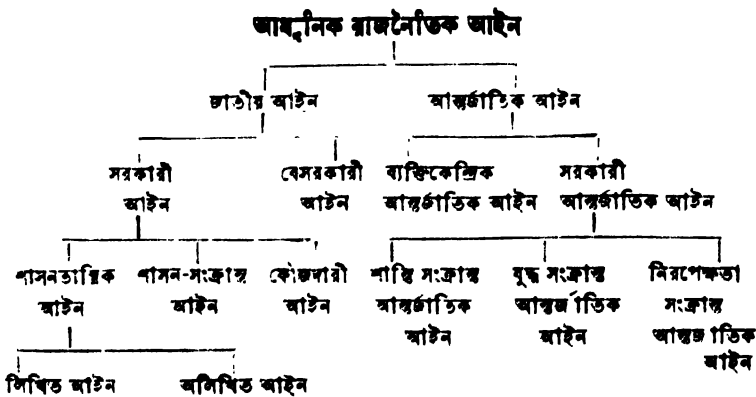
জাতীয় আইন (Municipal Laws) : জাতীয় আইন হোল সেইসব আইন যা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত হয়। জাতীয় আইন রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমারেখার বাইরে প্রযুক্ত হতে পারে না। জাতীয় আইন একটি রাষ্ট্রের সমাজজীবনের সমগ্র অংশ জুড়ে থাকে। জাতীয় আইন দু'ধরনের হয়, যথা—সরকারী আইন এবং বেসরকারী আইন। রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত আইনকে সরকারী আইন বলে। কিন্তু রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত নয় এমন আইনকে বেসরকারী আইন বলে অভিহিত করা হয়।

জাতীয় আইন

আন্তর্জাতিক আইন (International Law) : আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে আইনের দ্বারা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারিত হয় তাকে আন্তর্জাতিক আইন বলা হয়। লরেন্স (Lawrence)-এর মতে, সাধারণভাবে যে সমস্ত নিয়ম-কানুনের দ্বারা সুসভ্য রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয় সেগুলিকে আন্তর্জাতিক আইন বলে অভিহিত করা হয়। আন্তর্জাতিক আইন প্রকৃতপক্ষে আইন পদবাচ্য কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। অদ্যাবধি এই বিরোধের নিষ্পত্তি হয়নি।[১]

আন্তর্জাতিক আইন

শাসনতান্ত্রিক আইন (Constitutional Law) : অধ্যাপক গিলক্রিস্টের মতে, যে নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে সরকার দাঁড়িয়ে থাকে সেগুলিকে শাসনতান্ত্রিক বা সাংবিধানিক আইন বলা হয়। অধ্যাপক উইলোবী (Willoughby)-র মতে, যে আইন সরকারের সংগঠন, তার ক্ষমতার বণ্টন এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগ এবং কার্যপরিচালকদের ক্ষমতার প্রয়োগ ও সীমারেখার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাকে সাংবিধানিক আইন বলে অভিহিত করা হয়। গেটেলের ভাষায়, শাসতান্ত্রিক আইন রাষ্ট্রের মধ্যে সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্ণয় করে এবং সমস্ত আইনের উৎসের ইঙ্গিত প্রদান করে। শাসনতান্ত্রিক আইন লিখিত ও অলিখিত —দুই ধরনেরই হতে পারে। তবে, লিখিত আইনেরও কিছু অলিখিত অংশ থাকে, আবার অলিখিত আইনেরও কিছু লিখিত অংশ থাকে।

শাসনতান্ত্রিক আইন

শাসন-সংক্রান্ত আইন (Administrative Law) : অধ্যাপক ডাইসি (Dicey)-র মতে, শাসন-সংক্রান্ত আইন বলতে ব্যক্তি এবং শাসনবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক নির্ধারণকারী আইনকেই বোঝায়। শাসন-সংক্রান্ত আইন হোল সেইসব আইন যা রাষ্ট্রের ভিত্তিস্বরূপ। বিভিন্ন বিভাগের সুষ্ঠু কার্য পরিচালনার জন্য এই ধরনের আইন অত্যাবশ্যক। এইসব আইন শাসন-বিভাগের গঠন ও ক্ষমতার সীমা নির্দেশ করে এবং ব্যক্তিগত অধিকারভঙ্গের ক্ষেত্রে প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করে। বিধিবদ্ধ আইন, বিচারালয়ের রায়, অর্পিত ক্ষমতাবলে শাসন কর্তৃপক্ষ-প্রণীত নিয়মাবলী, নির্দেশ, প্রশাসনিক আদালতের রায় ইত্যাদি হোল শাসন-সংক্রান্ত আইনের উৎস। পুলিস বিভাগ, আয়কর বিভাগ ইত্যাদির খুঁটিনাটি আইন হোল এই ধরনের উদাহরণ।

শাসন-সংক্রান্ত আইন

---

১. 'আন্তর্জাতিক আইন' সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পরে করা হয়েছে।

ফৌজদারী আইন (Criminal Law) : ফৌজদারী আইন হোল সমাজে আইন-শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য, নাগরিক জীবনে নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এবং অপরাধীদের দন্ডাজ্ঞা দেওয়ার জন্য প্রণীত আইন।

ফৌজদারী আইন

৬। আইনের উৎস (Sources of Law)

আইনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আইন কেবলমাত্র রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট হয় না। নানাবিধ সামাজিক শক্তি আইনের উৎস হিসেবে কাজ করে। অধ্যাপক হল্যান্ডকে অনুসরণ করে আমরা ক. প্রথা, খ. ধর্ম, গ. বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত, ঘ. বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা, ঙ. ন্যায়বিচার এবং চ. আইন পরিষদকে আইনের উৎস বলে বর্ণনা করতে পারি।

[ক] **প্রথা (Custom) :** সমাজের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত আচারব্যবহার, রীতিনীতি প্রভৃতিকে প্রথা বলে। প্রথাই হোল আইনের প্রাচীনতম উৎস। কোন এক সময়ে কোন এক ব্যক্তিবিশেষ একটি রীতি সমাজের মধ্যে প্রবর্তন করে। পরবর্তীকালে যখন সমাজের অনেকেই সেই রীতি অনুসরণ করতে থাকে তখনই তাকে প্রথা বলা হয়। প্রথার উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে হল্যান্ড বলেন যে, একটি তৃণক্ষেত্রের উপর দিয়ে যেমন করে একটি পায়েচলা পথ তৈরি হয় তেমনি করে প্রথার উৎপত্তি। প্রাচীনকালে পরিবারের সঙ্গে পরিবারের, গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর বিরোধ বাধলে পরিবার-প্রধান বা গোষ্ঠী-প্রধান প্রচলিত প্রথা অনুসারে বিরোধের নিষ্পত্তি করতেন। কালক্রমে সেই আচার-আচরণগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করলে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে সেগুলি আইনের মর্যাদা লাভ করে। আধুনিককালেও প্রতিটি রাষ্ট্রের আইনের মধ্যে প্রথাগত আইনের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। ভারতে হিন্দু ও মুসলমান আইন মূলতঃ প্রথাভিত্তিক। ইংল্যান্ডের সংবিধান অলিখিত হওয়ার জন্য সেখানে প্রথাগত আইন ও শাসন-সংক্রান্ত রীতিনীতি রাষ্ট্র পরিচালনায় অস্বাভাবিক গুরুত্ব অর্জন করেছে। বস্তুতঃ, আইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে প্রথার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রথা

[খ] **ধর্ম (Religion) :** প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারাই পরিচালিত হোত। সে কারণে তখন ধর্ম ও আইনের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নিরূপণ করা হোত না। আদিম মনুষ্যসমাজের মধ্যে যখন সভ্যতার আলো পৌঁছায়নি তখন মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে সামাজিক ঐক্য বজায় রাখার প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছিল ধর্মীয় অনুশাসন। আদিম মানুষ অজ্ঞতাবশেই সেদিন ছিল ধর্মের প্রতি একান্ত অনুরক্ত। তাই ধর্মীয় অনুশাসন বা রীতিনীতি তাদের নিয়ন্ত্রণ করে প্রাচীন সমাজজীবনে শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতা আনয়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে বর্ণনা করে রাজার নির্দেশ মান্য করার শিক্ষা দিয়ে ধর্ম প্রত্যক্ষভাবে আইনের জন্ম দেয়। পরোক্ষভাবে চিরাচরিত প্রথাকে সমর্থন করত বলে ধর্মই তাকে স্থায়িত্ব প্রদান করেছিল। বর্তমান ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান আইনের উপর ধর্ম ও ধর্মীয় প্রথার প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়। ইহুদি সমাজে ধর্মীয় অনুশাসন সমগ্র আইন

ধর্ম

ব্যবস্থার একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করে আছে। এমনকি প্রাচীন গ্রীস ও রোমের অধিকাংশ আইন ছিল ধর্মভিত্তিক। সুতরাং, আইনের অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে ধর্মের ভূমিকা কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

[গ] **বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত (Adjudication) :** আদিম সমাজব্যবস্থায় মানুষের জীবন জটিল হয়ে উঠলে সমাজে নানারূপ দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা না করলে সমাজজীবনে শান্তিশৃঙ্খলা বিনষ্ট হবে এই ভেবে দলপতি, গোষ্ঠীপতি, রাজা বা সমাজের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা বিরোধ-নিষ্পত্তির কাজে এগিয়ে আসেন। উদ্ভব হয় বিচার-ব্যবস্থার। বিচারপতিরা তখন কেবলমাত্র প্রথা ও ধর্মীয় অনুশাসন প্রয়োগ করে সব দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে পারতেন না। তাই অনেক সময় তাঁরা নিজেদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে দ্বন্দ্ব বা বিরোধের মীমাংসা করতেন। এইভাবে বিচারের রায় ভবিষ্যৎ বিচারকার্যে আইন হিসেবে পরিগণিত হতে শুরু করে।

বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত

বর্তমানেও বিচারের রায় অনেক সময় আইনের সৃষ্টি করে। পরিবর্তিত সমাজের পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য বিচারকেরা অনেক সময় নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আইনের ব্যাখ্যা করেন। তাছাড়া, অস্পষ্ট আইনের ব্যাখ্যা করা কিংবা আইনের অপূর্ণতা পূরণ করার কাজেও বিচারপতিদের সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে অনুরূপ মামলার ক্ষেত্রে নজীর হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। এই বিচারপতিগণ তাঁদের রায় প্রদানের মাধ্যমে আইনের সৃষ্টি করে।

[ঘ] **বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা (Scientific Commentaries) :** আইন কতকগুলি শব্দের সাহায্যে রচিত হয়। স্বাভাবিকভাবে আইনের বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। এমনকি কখনও কখনও প্রচলিত আইন সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন হয়ে পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে আইনের প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করা একান্ত প্রয়োজন। আইনজ্ঞ পন্ডিতগণ আইন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকাদি প্রণয়ন করে থাকেন। বিভিন্ন টীকা, ভাষ্য, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে তাঁরা একদিকে যেমন আইনের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করেন, অন্যদিকে তেমনি আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা প্রচার করেন। সে কারণে বর্তমানে প্রতিটি দেশে আইনজ্ঞগণের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা বিচারের রায়দানের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। মনুসংহিতা ভারতীয় আইনে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। অনুরূপভাবে, ইংল্যান্ডের কোক (Coke), ব্ল্যাকস্টোন (Blackstone), আমেরিকার স্টোরি (story), কেন্ট (Kent) প্রমুখ আইনবিদ্‌দের অভিমতকে আইনের উৎস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

[ঙ] **ন্যায়বিচার (Equity) :** ন্যায়বিচার বলতে সাম্য, সততা ও বিবেকবুদ্ধি অনুসারে বিচার করা বুঝায়। ন্যায়বিচার আইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। বিচারপতিগণের কার্য ন্যায়বিচার করে সমাজকে সুন্দর করে গড়ে তোলা। কিন্তু এই কার্য সম্পাদন করতে গিয়ে অনেক সময় বিচারপতিগণ দেখেন, কোন বিশেষ ধরনের মামলা সম্পর্কে আইনের কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই কিংবা কোন প্রচলিত আইন সমাজের ন্যায়নীতিবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন হয়ে পড়েছে।

এরূপ ক্ষেত্রে বিচারপতিগণ নিজেদের বিবেকবুদ্ধি অনুসারে উক্ত মামলার রায়দান করেন। ফলে নতুন আইনের সৃষ্টি হয়। এরূপ নতুন আইন সৃষ্টির অবস্থা না থাকলে গতিশীল সমাজ ও সামাজিক ন্যায়বোধের সঙ্গে আইন তাল রেখে চলতে পারে না।

[চ] **আইন প্রণয়ন** (**Legislation**) : আধুনিক রাষ্ট্রে আইনসভা কর্তৃক আইন প্রণয়নই আইনের প্রধানতম উৎস বলে বিবেচিত হয়। আইনসভার সদস্যগণ জনমতের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে আধুনিকভাবে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে আইন প্রণয়ন করেন। গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের সংখ্যাও অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে প্রথা, ধর্ম প্রভৃতি আইনের অন্যান্য উৎসগুলির গুরুত্ব ক্রমে ক্রমে হ্রাস পেতে শুরু করেছে।

আইন প্রণয়ন

পরিশেষে আমরা মন্তব্য করতে পারি যে, আইনের উৎস হিসেবে প্রথা, ধর্ম, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত, ন্যায়বিচার প্রভৃতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হলেও আইনের ক্রমবিকাশে তারা কখন এবং কিভাবে সাহায্য করেছে সে সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট অভিমত প্রদান করা সম্ভব নয়। তবে প্রথা ও ধর্ম আইনের সর্বপ্রাচীন উৎস। প্রাচীনকালে সম্ভবতঃ প্রথা ও ধর্ম প্রায় একই সময়ে আইনের উৎস বলে বিবেচিত হলেও বর্তমানে আইনের উপর ধর্ম অপেক্ষা প্রথার প্রভাব অনেক বেশি পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তী সময়ে বিচারকের রায় ও ন্যায়বিচার আইনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করে। কিন্তু বর্তমানে এগুলি অপেক্ষা আইনজ্ঞ ব্যক্তিদের আলোচনা এবং আইনসভা আইনের সর্বপ্রধান উৎস বলে বিবেচিত হয়। আইনের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে কোন একটি উৎসের গুরুত্ব অসীম বলে মনে করা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়।

উপসংহার

৭। আইন মান্য করার কারণ (Reason for Obeying Law)

আইন মান্য করা হয় কেন ?—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। হবস্, বেন্থাম, অস্টিন প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ মনে করেন যে, অরাজকতার আশঙ্কায় কিংবা ভয়ে লোকে আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে ; হবসের মতে, লোকে ভাল করেই জানে যে আইন ভঙ্গ করা হলে সমাজের মধ্যে পুনরায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে ; সমাজের শান্তিশৃঙ্খলা বিনষ্ট হবে। এই সত্যোপলব্ধি আইনকে সমীহ করতে শিক্ষা দেয়। অস্টিনের মতে, আইন রাষ্ট্র কর্তৃক সমর্থিত এবং প্রযুক্ত হয় বলেই লোকে আইন মান্য করে। কারণ তারা জানে যে আইন ভঙ্গ করার অপরাধে রাষ্ট্র আইনভঙ্গকারীকে শুধু অভিযুক্ত করে না, শাস্তিদানের ব্যবস্থা করে।

কেন আইন মান্য করা হয়—এই প্রশ্নে মত-পার্থক্য : প্রথম মত অনুসারে অরাজকতার আশঙ্কা ও ভয় আইন মান্য করার কারণ

কিন্তু রুশো, গ্রীন প্রমুখ আদর্শবাদী দার্শনিকগণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে আইনের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে উপলব্ধিই মানুষকে আইন মান্য করতে

অনুপ্রেরণা যোগায়। কারণ তারা একথা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারে যে, সমাজের কল্যাণ বিধান করাই হোল আইনের প্রকৃত কাজ। তাছাড়া আইনের ভিত্তি হোল জনমত। গ্রীনের ভাষায়, বলপ্রয়োগ নয়, জনগণের ইচ্ছাই হোল রাষ্ট্রের ভিত্তি। এই অর্থে রাষ্ট্র-সৃষ্ট আইনের বিরোধিতা করার অর্থই হোল নিজেদের বিরোধিতা করা। এই সত্যানুসন্ধান ও সত্যোপলব্ধি মানুষকে স্বাভাবিকভাবে আইন মান্য করতে সহায়তা করে।

দ্বিতীয় মত অনুসারে আইনের উপযোগিতার উপলব্ধি আইন মান্য করার কারণ

বলা যায় যে, এককভাবে কোন মতই সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। তাই উভয় মতের সমন্বয় সাধন করে হেনরী মেইন বলেছেন, শাস্তির ভয় এবং যৌক্তিকতার উপলব্ধি—উভয় কারণে মানুষ আইন মান্য করে।

উভয় মতের সমন্বয় সাধন

লর্ড ব্রাইস আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের কারণসমূহকে মোটামুটিভাবে পাঁচভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা—ক. নির্লিপ্ততা, খ. শ্রদ্ধা, গ. সহানুভূতি, ঘ. শাস্তির ভয় এবং, ঙ. যৌক্তিকতার উপলব্ধি। নির্লিপ্ততার অর্থ রাষ্ট্রীয় কার্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার নিষ্ক্রিয়তা প্রদর্শন। নিষ্ক্রিয়তার জন্য অপরে আইন মান্য করেছে তাই আমিও মান্য করব—এই ধারণার জন্ম হয়। রাষ্ট্রনেতাদের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভক্তির জন্য অনেক সময় মানুষ সেইসব রাষ্ট্রনেতাদের প্রণীত আইনকে সমাজ-কল্যাণের একমাত্র উপায় বলে মনে করে তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। সাধারণ মানুষের আচার-আচরণের প্রতি সহানুভূতিবশতঃ একে অপরকে অনুসরণ করে আইন মান্য করে। তাছাড়া, আইনভঙ্গের অপরাধে রাষ্ট্র শাস্তি বিধান করবে—এই ভেবে অনেকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। আবার আইনের যৌক্তিকতার উপলব্ধিও মানুষকে আইন মান্য করতে অনুপ্রেরণা যোগায়।

লর্ড ব্রাইসের অভিমত

মার্কসবাদীদের মতে, আইন সমাজে একটি বিশেষ উৎপাদন-সম্পর্ক টিকিয়ে রাখে। উৎপাদন-ব্যবস্থায় যে-শ্রেণী প্রভুত্ব করে আইন সেই শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করে। আইনের পশ্চাতে আছে এই প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর সহায়ক বলপ্রয়োগের যন্ত্র। এই বলপ্রয়োগ করা হয়ে থাকে সশস্ত্র বাহিনী ও বিচারালয়ের সাহায্যে। সহজ কথায় বলা যায় যে, উৎপাদনের উপাদানগুলি যাদের হাতে থাকে তারাই সমাজে প্রভুত্ব করে এবং তারা প্রয়োজনবোধে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আইন মান্য করতে জনগণকে বাধ্য করে।

মার্কসবাদীদের অভিমত

৮। আইন ও নৈতিক বিধি (Law and Morality)

প্রাচীনকালে রাষ্ট্রনীতিবিদ্ ও দার্শনিকগণ আইন এবং নৈতিক বিধির মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নিরূপণ করতেন না। তাঁরা নীতিবিজ্ঞানকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংশ বলে মনে করতেন ; প্লেটো তাঁর 'গণরাজ্য' (The Republic) এবং অ্যারিস্টটল তাঁর 'রাষ্ট্রনীতি' (The Politics) নামক পুস্তকে রাষ্ট্রের ও আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনায় নৈতিক আদর্শের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রাচীন ভারতে রাজার কর্তব্য রাজা-প্রজার

প্রাচীনকালে আইন ও নৈতিক বিধি অভিন্ন ছিল

পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতি নীতিবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল[১]। এইভাবে প্রাচীন বিশ্বে নৈতিকতার কষ্টিপাথরে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও আচার-আচরণকে বিচার করা হোত ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত। কিন্তু প্রখ্যাত ইতালীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মেকিয়াভেলি সর্বপ্রথম নীতিবিজ্ঞানের প্রভাব থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে মুক্ত করেন। সেই থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আইন ও নৈতিক বিধির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নিরূপণ করতে শুরু করেন।

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য : বর্তমানে আইন ও নৈতিক বিধির মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি নিরূপণ করা হয় :

(১) আইন ও নৈতিক বিধির মধ্যে বিষয়বস্তুগতভাবে পার্থক্য রয়েছে। আইন কেবলমাত্র মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণকেই নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু নৈতিক বিধি মানুষের সমগ্র জীবনকে, যেমন—তার চিন্তা, অনুভূতি, কার্যকলাপের উদ্দেশ্য, বাস্তব কার্যকলাপ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং নৈতিক বিধি মানুষের বাহ্যিক আচরণ এবং মানসিক চিন্তা উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু আইনের সঙ্গে মানুষের মন বা মানসিক অনুভূতির প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নেই। তবে, বর্তমানে অনেক সময় আদালত কোন অপরাধীর বিচার করতে গিয়ে তার বাহ্যিক আচরণের পশ্চাতে যে কারণ লুকিয়ে থাকে তা অনুসন্ধানের চেষ্টা করে। তবে সাধারণভাবে আইন মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণকেই নিয়ন্ত্রণ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চুরি করার কথা চিন্তা করা আইনের চোখে অপরাধ নয়; চুরি করা আইনের চোখে অপরাধ। কিন্তু চুরি করার কথা চিন্তা করা এবং চুরি করা—উভয়ই নৈতিক বিধির দৃষ্টিতে সমভাবেই নিন্দনীয়। এদিক থেকে বিচার করে নৈতিক বিধির বিষয়বস্তুকে আইনের বিষয়বস্তু অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যাপক বলা যায়।

বিষয়বস্তুগত পার্থক্য

(২) আইন সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট। তা সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্বারা বলবৎযোগ্য। কিন্তু নৈতিক বিধি আদৌ সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট নয়। দেশ, কাল ও পাত্র-ভেদে নৈতিক বিধিগুলি বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। নৈতিক বিশ্বাস কিছু পরিমাণে ব্যক্তিগত এবং কিছু পরিমাণে সামাজিক ব্যাপার। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এক সময় ভারতবর্ষে অস্পৃশ্যতাকে দুর্নীতিমূলক বলে মনে করা হোত না। কিন্তু বর্তমানে তাকে দুর্নীতিমূলক বলে মনে করা হয়।

আইন নির্দিষ্ট কিন্তু নৈতিক বিধি অনির্দিষ্ট

(৩) নীতিশাস্ত্র কোন কাজ বা চিন্তাকে ভালমন্দ, উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদির মানদণ্ডে বিচার করে। কিন্তু আইন এইসব মানদণ্ডকে গ্রহণ করে না।

ঔচিত্য-অনৌচিত্যের মানদণ্ডে পার্থক্য

(৪) আইনের পশ্চাতে সার্বভৌম শক্তির সক্রিয় সমর্থন থাকে। আইনভঙ্গ করা

---

১ "শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ
এতৎ চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্মস্য লক্ষণম্।"—মনুসংহিতা, [প্রথম অধ্যায়, ১২ শ্লোক]
—অর্থাৎ বেদ, উপনিষদ, সৎ আচার এবং নিজস্ব জ্ঞানবোধ হোল ধর্ম তথা আইনের লক্ষণ।

হলে আইনভঙ্গকারীকে আইন-নির্দিষ্ট শাস্তি ভোগ করতে হয়। কিন্তু নীতিশাস্ত্রের পশ্চাতে এরূপ কোন বলপ্রয়োগকারী কার্যকরী শক্তি থাকে না বলে নৈতিক বিধি ভঙ্গ করলে নির্দিষ্ট দৈহিক শাস্তি ভোগ করতে হয় না। নৈতিক বিধি-ভঙ্গকারীকে বড়জোর বিবেকের দংশন সহ্য করতে হয় কিংবা লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়।

বলবৎকরণের ক্ষেত্রে উভয়ের পার্থক্য

(৫) প্রকৃতিগত দিক থেকেও আইন এবং নৈতিক বিধির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয়। আইন প্রশাসনিক কার্যের, তথা রাষ্ট্র পরিকল্পনার, সুবিধার জন্য প্রণীত হয়। সমাজের ন্যায়নীতিবোধের সঙ্গে আইনের সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। কিন্তু নৈতিক বিধি সমাজের নৈতিক মানোন্নয়নের দিকে দৃষ্টি রেখে প্রণীত হয়। তাই, অনেক সময় দেখা যায় রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে এমন সব আইন প্রণীত হয় যা ন্যায়নীতিবোধের বিরোধী। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন অবস্থাতেই সরকার নীতিগতভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনে যুদ্ধকালীন অবস্থায় সরকার আইনসঙ্গতভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করতে পারে।

প্রকৃতিগত পার্থক্য

উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক : আইন ও নৈতিক বিধির উপরি-উক্ত পার্থক্যগুলি থাকা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে তা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। গেটেল্ বলেছেন, মানুষের নীতিজ্ঞান রাষ্ট্রীয় আইনকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করে। আইন হোল সামাজিক ন্যায়-নীতিবোধের প্রতিফলন মাত্র। যে-দেশের নৈতিক মূল্যবোধ উচ্চমানের নয়, সে-দেশের আইন ব্যবস্থাও কখনই উচ্চমানসম্পন্ন হতে পারে না। তা ছাড়া, অনেক সময় রাষ্ট্রীয় আইনের সাহায্যে সমাজে নীতিবিগর্হিত প্রথা, লোকাচার প্রভৃতির বিলোপ সাধন করে মানুষের পুরাতন নৈতিক ধ্যানধারণার পরিবর্তন সাধন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ প্রাচীন ভারতবর্ষের সতীদাহ প্রথার কথা উল্লেখ করা যায়। এই প্রথা তদানীন্তন সমাজে নৈতিক বিধি-বি ধী ছিল না। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এই নীতিবিগর্হিত প্রথাদির বিলোপ সাধন করা হলে সাময়িকভাবে সতীদাহ প্রথা বিলোপ আইনের বিরোধিত. পরিলক্ষিত হলেও শেষ পর্যন্ত জনগণ আইনটির যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে পারে। এই ভাবে আইন দুর্নীতি বা কু-নীতির পরিবর্তে সু-নীতিকে আহ্বান করে সমাজের কল্যাণবিধান করতে পারে। আবার, আইন সর্বক্ষেত্রেই সামাজিক নীতি-নির্ভর। সমাজে সুদীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত নৈতিক বিধিগুলি আইনে রূপান্তরিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মদ্যপান নীতি-বিগর্হিত কাজ। বর্তমান ভারতবর্ষের অনেক রাজ্যে এই নীতিটিকে আইনে রূপান্তরিত করা হয়েছে। তবে, একথাও সত্য যে, রাষ্ট্র যদি কোন নৈতিক ধ্যানধারণাকে বলপূর্বক জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে তাহলে জনসাধারণ তাকে সহজ মনে গ্রহণ করে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতবাসীরা মদ্যপানকে খারাপ বলে মনে না করছে ততক্ষণ পর্যন্ত মদ্যপান নিবারণ সংক্রান্ত আইন বাস্তবে কার্যকরী হওয়া সম্ভব নয়। আইন ও নৈতিক বিধির মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের বর্ণনা দিতে গিয়ে আইভর ব্রাউন (Ivor Brown) বলেন, নীতিশাস্ত্রের ধারণা প্রতি-

উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

ফলিত না হলে রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ অর্থহীন এবং রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ ছাড়া নৈতিক মতবাদও অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য।

মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে আইন ও নৈতিকতার সম্পর্ক

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, নৈতিক ধ্যানধারণাও সমাজ এবং রাষ্ট্র-নির্ভর। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক ধারণা ও নৈতিক আদর্শের পরিবর্তন ঘটে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নৈতিক ভিত্তি হোল স্বার্থপরতা, লোভ, সম্পত্তি অর্জন, অবাধ ও নির্মম প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নৈতিক ভিত্তি হোল সমাজের জন্য কাজ করা, ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে সামাজিক স্বার্থকে স্থান দেওয়া, পারস্পরিক সহযোগিতা ইত্যাদি।

৯। আন্তর্জাতিক আইনের সংজ্ঞা (Definition of the International Law)

আন্তর্জাতিক আইনের বিভিন্ন সংজ্ঞা

বর্তমানে আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করছি যেখানে আত্মনির্ভরশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন জাতীয় রাষ্ট্রের কথা ভাবাই যায় না। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পরস্পর-নির্ভরশীলতা আধুনিক রাষ্ট্রগুলির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই, প্রয়োজন এমন কতকগুলি নিয়মকানুনের যেগুলি বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করবে। এই নিয়মগুলিকেই আন্তর্জাতিক আইন (International Law) বলে অভিহিত করা হয়। আন্তর্জাতিকতার গুরুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক আইনের গুরুত্বও অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে এস্. জে. লরেন্স (S. J. Lawrence) বলেন, সাধারণভাবে যে-সব নিয়মকানুনের দ্বারা সভ্য রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয় সেগুলিকে আন্তর্জাতিক আইন বলা হয়। প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক আইনবিদ্ ওপেনহিম (Oppenheim)-এর মতে, আন্তর্জাতিক আইন হোল সেইসব নিয়মকানুন ও চুক্তির সমষ্টি যার আইনগত বাধ্যবাধকতা সভ্য রাষ্ট্রগুলি পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মেনে নেয়। ফেনউইক (Fenwick) বলেন যে, আন্তর্জাতিক আইন হোল এমন কতকগুলি সাধারণ নীতি (General Principles) এবং নির্দিষ্ট নিয়ম (Specific Rules) যেগুলি আন্তর্জাতিক সমাজের সদস্যগণ তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে মেনে চলে। আন্তর্জাতিক আইনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিকার, তাদের অধিকার সংরক্ষণের উপায় এবং অধিকার ভঙ্গ করা হলে প্রতিকারের ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে নির্দেশ লিপিবদ্ধ করা রয়েছে। আন্তর্জাতিক আইন ছাড়া এমন কতকগুলি সৌজন্য-বিধি (rules of courtesy) রয়েছে যেগুলি আন্তঃরাষ্ট্র-সম্পর্ক নির্ধারণ করে। কূটনৈতিক প্রথাসমূহ পালন, কোন রাষ্ট্রের অভিযুক্ত বা দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীকে নিজ রাষ্ট্রে প্রেরণ ইত্যাদি হোল আন্তর্জাতিক সৌজন্য-বিধির উদাহরণ। এগুলিকে আন্তর্জাতিক প্রথা বলেও অভিহিত করা যায়। এছাড়া আন্তর্জাতিক শাসন সংক্রান্ত আইনের (International Administrative Law) অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, যেমন বিভিন্ন দেশের মধ্যে যাতায়াত, চিঠিপত্রের বিনিময় ইত্যাদি।

১০। আন্তর্জাতিক আইনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of International Law)

আন্তর্জাতিক আইনকে প্রধানতঃ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা—১. ব্যক্তিগত আন্তর্জাতিক আইন এবং ২. সরকারী আন্তর্জাতিক আইন। ব্যক্তিগত আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে কোন ব্যক্তির অধিকার বা স্বার্থ নিয়ে যদি দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের বিরোধ বাধে তবে তার বিচার ব্যক্তিগত আন্তর্জাতিক আইন অনুসারেই হয়। বিবাহ-বিচ্ছেদ, অবৈধ সন্তানের অধিকার বিষয়ক আইন ইত্যাদি হোল এই শ্রেণীর অন্তর্গত। অনেকে ব্যক্তিগত আন্তর্জাতিক আইনকে আন্তর্জাতিক আইনের স্বীকৃতি দিতে সম্মত নন। তাঁদের মতে, আন্তর্জাতিক আইন কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলির সম্পর্কেই নির্ধারণ করে ; ব্যক্তিগত সম্পর্ক আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় পড়ে না।

ব্যক্তিগত ও সরকারী আন্তর্জাতিক আইন

অনেকে আবার পররাষ্ট্র নীতিকেও আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেন। কারণ, পররাষ্ট্রনীতি জাতীয় স্বার্থ ও সুবিধার ভিত্তিতে জাতীয় রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক নির্ধারিত হয়। সমালোচকেরা পররাষ্ট্রনীতিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (International relations) বলে মেনে নিলেও আন্তর্জাতিক আইন বলে মেনে নিতে রাজী নন। সরকারী আন্তর্জাতিক আইনকে আবার তিনভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা—১. শান্তি সংক্রান্ত আইন, ২. যুদ্ধ সংক্রান্ত আইন এবং ৩. নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত আইন। শান্তির সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে-সব আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্ক নির্ধারণ করে সেগুলিকে শান্তি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন বলা হয়। যুদ্ধের সময় যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলি যে-সব নিয়ম মেনে চলে সেগুলিকে যুদ্ধ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন বলে। যুদ্ধের সময়ে নিরস্ত্র মানুষের উপর কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসালয় ইত্যাদির উপর বোমা বর্ষণ নিষিদ্ধকরণ আইন, জীবাণু যুদ্ধ নিষিদ্ধকরণ, যুদ্ধে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি হোল যুদ্ধ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইনের উদাহরণ। নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন বলতে সেই সব আইনকে বোঝায় যেগুলি যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে নিরপেক্ষতা অবলম্বনের নীতি সম্পর্কিত আইন।

সরকারী আন্তর্জাতিক আইনের শ্রেণীবিভাগ

১১। আন্তর্জাতিক আইনের শ্রেণীচরিত্র (Class-Character of International Law)

আদিম সাম্যবাদী সমাজে রাষ্ট্রের কোন অস্তিত্ব না থাকায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য আন্তর্জাতিক আইনের কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। কিন্তু আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে যাওয়ার পর প্রতিষ্ঠিত হয় দাস সমাজ। উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিতে সমাজ দাস-মালিক এবং দাস-শোষক ও শোষিত—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই সমাজে শোষক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য রাষ্ট্র জন্মলাভ করে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যিক ও অন্যান্য সম্পর্ক নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা থেকেই আন্তর্জাতিক আইনের সৃষ্টি হয়।

দাস-যুগে উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তি ছিল উৎপাদনের উপায়গুলির উপর এবং

দাসদের উপর দাস-মালিকদের মালিকানার স্বীকৃতি। ঐ সময়কার আন্তর্জাতিক আইন দাস-ব্যবসায়কে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়ে বিভিন্ন দাস-রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করত। সেই যুগে যুদ্ধ-বন্দীদের ক্রীতদাসে পরিণত করা সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হোত। দাস-বিদ্রোহ দমন করার জন্য কিংবা পলাতক দাসদের নিজেদের রাষ্ট্রে ফেরত পাঠানো সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হোত। এইভাবে দাস-যুগের আন্তর্জাতিক আইন দাস-মালিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঐক্য সংস্থাপনের মাধ্যমে দাসদের স্বার্থের বিরোধী আচরণ করত।

দাস-যুগে আন্তর্জাতিক আইনের প্রকৃতি

দাস-যুগের পরবর্তী সময়ে সামন্ত-যুগ শুরু হলে নতুন উৎপাদন-সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক আইনের প্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়। এই সময় আন্তর্জাতিক আইন দাসদের দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করার পরিবর্তে তাদের দাসত্ব মোচনের ব্যবস্থা করে। সামন্ত যুগের আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রকে রাজা ও সম্রাটের সম্পত্তি বলে স্বীকৃতি প্রদান করে। রাজা বা সম্রাট ইচ্ছামত রাষ্ট্রের ভূখন্ড বিক্রয় করতে কিংবা বংশধরদের প্রদান করতে পারতেন। রাষ্ট্রীয় ভূখন্ডকে উপহার প্রদান, বংশধরদের নিকট হস্তান্তর, বিভিন্ন রাজপরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন, রাজবংশীয় যুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হোত। ওই যুগে খ্রীষ্টধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও (church) রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারত। এইভাবে সামন্ত যুগের আন্তর্জাতিক আইন নৃপতি ও সামন্তপ্রভুরা যাতে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে ভূমিদাসদের ঐক্যবদ্ধভাবে শোষণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করত।

সামন্ত-যুগে আন্তর্জাতিক আইনের প্রকৃতি

এর পর সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া বিপ্লব সাফল্যমন্ডিত হলে আন্তর্জাতিক বিধিব্যবস্থারও অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হয়। ধনতন্ত্রবাদের যুগে রাজার সার্বভৌমিকতার পরিবর্তে জনগণের সার্বভৌমিকতা স্বীকৃতিলাভ করে। সেই সঙ্গে সব রাষ্ট্রই সমান, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না-করা, সমুদ্রে স্বাধীনভাবে যাতায়াত করা ইত্যাদি নীতি আন্তর্জাতিক আইনের অঙ্গীভূত হয়। পুঁজিবাদী যুগে উৎপাদন ক্ষেত্রে পুঁজিপতিদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে সমস্ত রাষ্ট্রের পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার অনুকূলে আন্তর্জাতিক আইন গড়ে উঠে।

পুঁজিবাদী যুগে আন্তর্জাতিক আইনের প্রকৃতি

কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংকট শুরু হলে, বিশেষতঃ ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় মহান্ অক্টোবর বিপ্লব সাফল্যমন্ডিত হলে সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি তাদেরই সৃষ্ট প্রগতিশীল আন্তর্জাতিক আইনগুলিকে ভঙ্গ করতে শুরু করে। অক্টোবর বিপ্লবের ফলে জার সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরেই যে কেবলমাত্র আমূল পরিবর্তন সাধিত হোল তা নয়, সেইসঙ্গে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রেও কতকগুলি পুরোপুরি নতুন নীতি প্রবর্তিত হয়। ইতিহাসে সর্বপ্রথম 'যুদ্ধের অধিকারের' (right to war) পরিবর্তে 'জনগণের শান্তির অধিকার' (people's right to peace) প্রতিষ্ঠিত হয়

সমাজতান্ত্রিক যুগে আন্তর্জাতিক আইনের প্রকৃতি

এবং সর্বপ্রকার 'আক্রমণমূলক যুদ্ধকে' (aggressive war) মানবতার বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ বলে চিহ্নিত করা হয়। সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির সমতা, জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, ভৌগোলিক ঐক্য, শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা ও সহাবস্থান ইত্যাদি নীতি আন্তর্জাতিক আইনের অঙ্গীভূত হয় এবং সেগুলিকে কার্যকরী করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন-সহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি ঐকান্তিকভাবে প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সম্প্রসারণের ফলে আন্তর্জাতিক আইনও প্রকৃতিগত-ভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মানবসমাজের ক্রমবিবর্তনের প্রতিটি স্তরে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রকৃতির ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক আইনের চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছে। দাস-যুগ, সামন্ত-যুগ ও পুঁজিবাদী যুগে শোষক রাষ্ট্র-গুলির স্বার্থে বিভিন্ন প্রকার আন্তর্জাতিক আইন গড়ে উঠেছিল। সেদিক থেকে বিচার করে জাতীয় আইনের মতই আন্তর্জাতিক আইনেরও যে শ্রেণী-চরিত্র (class-character) আছে তা বলা বাহুল্যমাত্র।

১২। আন্তর্জাতিক আইনের উৎস (Sources of International Law)

আন্তর্জাতিক আইনের উৎস নির্ধারণের বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইনবিদ্‌দের মধ্যে মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। তবে মোটামুটিভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে উদ্ভূত প্রথা এবং বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ সন্ধি ও চুক্তিকে আন্তর্জাতিক আইনের উৎস বলে প্রায় সকলে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু লরেন্সের মতে, আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনবিদরা রাষ্ট্রসমূহের সম্মতিকেই (consent of Nations) আন্তর্জাতিক আইনের একমাত্র উৎস বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, চুক্তি এবং প্রথা উভয়ই এই সম্মতির ফল। ওপেনহিমও চুক্তি এবং প্রথাকেই আন্তর্জাতিক আইনের উৎস বলে মনে করেন। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সংবিধির (Statute of International Court of Justice) ৩৮নং ধারা অনুসারে আন্তর্জাতিক আইনের উৎস হোল:

আন্তর্জাতিক আইনের উৎস

(১) সাধারণ বা বিশেষ আন্তর্জাতিক চুক্তি দ্বারা কৃত এবং বাদী-বিবাদী রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক প্রকাশ্যভাবে স্বীকৃত নিয়মাবলী;
(২) আন্তর্জাতিক প্রথাসমূহ;
(৩) সভ্যজাতিগুলি কর্তৃক স্বীকৃত আইনের সাধারণ নিয়মাবলী; এবং
(৪) বিভিন্ন রাষ্ট্রের আইনবিদ্‌গণ কর্তৃক প্রচারিত শিক্ষাসমূহ।

১৩। আন্তর্জাতিক আইনের প্রকৃতি: আন্তর্জাতিক আইন কি আইন? (Nature of International law: Is International Law a Law)

আন্তর্জাতিক আইনের প্রকৃতি নির্ধারণের প্রশ্নে যথেষ্ট মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। অস্টিন, হল্যান্ড প্রমুখ আইনের বিশ্লেষণমূলক মতবাদের প্রচারকগণ আন্তর্জাতিক

আইনকে আইনের পদবাচ্য বলে আদৌ স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে আইন হোল নিম্নতনের প্রতি সার্বভৌম ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুনির্দিষ্ট আদেশ। আইন অমান্য করা হলে অমান্যকারীকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী শাস্তি দিতে পারে। কিন্তু আইনের এইসব বৈশিষ্ট্য আন্তর্জাতিক আইনের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায় না। কারণ আন্তর্জাতিক আইন কোনও সার্বভৌম শক্তির আদেশ নয় এবং এগুলি সুনির্দিষ্ট আকারেও লিপিবদ্ধ করা হয়নি। সর্বোপরি আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করলে রাষ্ট্রগুলিকে আইন ভঙ্গের অপরাধে শাস্তি দেওয়া যায় না। কোন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন মেনে নিতে অস্বীকার করলে তার উপর কোন রকম বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যায় না। অন্যভাবে বলা যায়, যাদের উপর আন্তর্জাতিক আইন প্রযুক্ত হবে সেইসব সার্বভৌম রাষ্ট্রের সম্মতির উপর ভিত্তি করে এরূপ আইন দাঁড়িয়ে থাকে। বিশ্লেষণী আইনবিদ্‌দের মতে, কোন রাষ্ট্র যখন অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পরিচালিত হয় তখন তাকে আর সার্বভৌম রাষ্ট্র বলা যায় না। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক আইনের কোন সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট উৎস না থাকায় এগুলিকে প্রকৃতপক্ষে আইন বলে স্বীকার করা যায় না। হল্যাণ্ডের মতে, আন্তর্জাতিক আইন হোল বিধিশাস্ত্রের বিলয় স্থান (Vanishing point of Jurisprudence)। অস্টিনের অন্যতম অনুগামী লর্ড সলস্‌বেরী মন্তব্য করেন যে, আমরা সচরাচর যে অর্থে 'আইন' কথাটি প্রয়োগ করি সে অর্থে আন্তর্জাতিক আইনের কোন অস্তিত্ব নেই।

আন্তর্জাতিক আইন আইন-পদবাচ্য নয়

কিন্তু হেনরী মেইন, স্যাভিনী প্রমুখ আইনবিদ্‌গণ আন্তর্জাতিক আইনকে আইনের পদবাচ্য বলে মনে করেন। তবে কিভাবে আইনের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হবে তার উপর আন্তর্জাতিক আইন আইন কিনা তা নির্ভর করে। আইনগত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে আন্তর্জাতিক আইনকে আইন বলা যায় না, কারণ আন্তর্জাতিক আইন বিশ্বরাষ্ট্রের আইন মাত্র। কিন্তু বর্তমানে সমগ্র বিশ্ব প্রধানতঃ দুটি শত্রুশিবিরে বিভক্ত হওয়ায় বিশ্বরাষ্ট্র তার মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। ফলে আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে কোন ঐকমত্য অদ্যাবধি গড়ে ওঠেনি। তাই আন্তর্জাতিক আইনকে একটি 'পরস্পর-বিরোধী ধারণা' (a contradiction in terms) বলে অভিহিত করা হয়। আন্তর্জাতিক আইনকে আইন হতে গেলে একটিমাত্র কর্তৃত্বের দ্বারা তাকে কার্যকরী করার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনকে কার্যকরী করার মত এরূপ কোন একক কর্তৃপক্ষ নেই। তাই সমালোচকরা বলেন, আন্তর্জাতিক আইনকে হয় আন্তর্জাতিক হতে হবে, নয়তো আইন হতে হবে।

আইনের সংজ্ঞার উপর আন্তর্জাতিক আইনের প্রকৃতি নির্ভরশীল

তবে আইনকে যদি ব্যাপক অর্থে সাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি নিয়ম বলে ধরা যায় তাহলে আন্তর্জাতিক আইন নিঃসন্দেহে আইন পদবাচ্য। ওপেনহিম, পোলক (Pollock), কেলসেন (Kelsen), ফেনউইক (Fenwick), হল (Hall), লরেন্স (Lawrence) প্রমুখ আন্তর্জাতিক আইনবিদ্‌গণ আন্তর্জাতিক আইনকে আইন-পদবাচ্য বলে মনে করেন। তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করেন :

সপক্ষে যুক্তি

(১) জাতীয় আইনের মত আন্তর্জাতিক আইনও সাধারণ স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

অর্থাৎ আইনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বলেই জনসাধারণ যেমন জাতীয় আইনকে মেনে নেয় তেমনি আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োজনীয়তা আছে বলেই রাষ্ট্রগুলি তাকে মান্য করে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য যেমন আইনের প্রয়োজন, তেমনি রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের জন্যও আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক আইন না থাকলে যুদ্ধকে প্রতিরোধ করা যায় না, পারস্পরিক বিরোধের মীমাংসা করা যায় না এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। আমরা বর্তমানে এমন একটি বিশ্বপরিবারের মধ্যে বাস করছি যেখানে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন।

সাধারণ স্বীকৃতির যুক্তি

(২) জাতীয় আইনের মত আন্তর্জাতিক আইনও ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। উভয়ের উৎসও মোটামুটিভাবে অভিন্ন। এগুলি হোল প্রথা, চুক্তি, পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনা, বিচারালয়ের রায় ইত্যাদি। সুতরাং উৎসগত দিক থেকে বিচার করে আন্তর্জাতিক আইনকে আইন বলে গণ্য করা যায়।

উৎসগত অভিন্নতা

(৩) আন্তর্জাতিক আইন বলবৎযোগ্য নয়—এই যুক্তিও ভ্রান্তিপূর্ণ। বর্তমানে আন্তর্জাতিক আইনকে কার্যকরী করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। তাই রাষ্ট্রগুলি শাস্তির ভয়ে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করতে সাহস পায় না।

আন্তর্জাতিক আইন বলবৎযোগ্য

(৪) আন্তর্জাতিক আইনবিদদের মতে সাম্রাজ্যবাদী ও যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক আইনকে ভঙ্গ করে ঠিকই কিন্তু তার অর্থ আন্তর্জাতিক আইনের গুরুত্বহীনতা নয়। জাতীয় আইনের ক্ষেত্রেও আইনভঙ্গের অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। প্রতিটি রাষ্ট্রেই সমাজ-বিরোধীরা আইন ভঙ্গ করে। আইন সর্বক্ষেত্রেই সব অপরাধীকে সমান ভাবে শাস্তি দিতে পারে না। এক্ষেত্রে জাতীয় আইন যদি আইন বলে বিবেচিত হয় তাহলে আন্তর্জাতিক আইনও নিঃসন্দেহে আইন-পদবাচ্য।

আইনভঙ্গের যুক্তি সত্য নয়

(৫) আন্তর্জাতিক আইনভঙ্গকারী রাষ্ট্রগুলি কখনই একথা স্বীকার করে না যে তারা আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করেছে। এর থেকে একথা বোঝা যায়, আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি কোন রাষ্ট্র অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারে না। সুতরাং, আন্তর্জাতিক আইন নিঃসন্দেহে আইন বলে বিবেচিত হতে পারে।

আন্তর্জাতিক আইনের সর্বজন-স্বীকৃতি

বস্তুতঃ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ-প্রতিষ্ঠিত স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয় এবং বর্তমানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বিচারালয় আন্তর্জাতিক আইনকে একটি সুনির্দিষ্ট রূপদানের চেষ্টা করেছে। গেটেলের মতে, আন্তর্জাতিক আইনের যে-সব ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায় সেগুলি যে-কোন ধরনের আইনের প্রাথমিক পর্যায়ে পরিলক্ষিত হয়। তবে একথা সত্য যে, আন্তর্জাতিক আইন এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে থেকে গেছে। একে দুর্বল আইন বলে অভিহিত করা যেতে পারে, কারণ প্রথমতঃ, আন্তর্জাতিক আইনকে এখনও

উপসংহার

সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক বিচারালয় বিশ্ব আদালত হিসেবে কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে, কারণ এই বিচারালয়ের স্বেচ্ছাধীন এলাকাভুক্ত ক্ষমতার কোন কার্যকরী মূল্য নেই। বিবদমান রাষ্ট্রগুলির সম্পূর্ণ সম্মতি থাকলেই কেবলমাত্র বিচারালয় বিবাদ মীমাংসার কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে। তাছাড়া কোন রাষ্ট্র যদি স্বেচ্ছায় বিচারালয়ের আবশ্যিক কর্তৃত্ব মেনে নিতে সম্মত না হয় তাহলে তার উপর বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত আরোপিত হয় না। এইভাবে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের মর্যাদা জাতীয় বিচারালয়ের মর্যাদার সমতুল্য নয়। তৃতীয়তঃ, পরিবর্তিত বিশ্ব-রাজনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন করার মতো কোন বিশ্ব-আইনসভার অস্তিত্ব নেই। চতুর্থতঃ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাফল্য নির্ভর করে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলির পারস্পরিক সহযোগিতার উপর। কিন্তু সাম্প্রতিক বিশ্বে ঠাণ্ডা লড়াই (Cold war) ব্যাপকভাবে শুরু হওয়ায় আন্তর্জাতিক আইনকে মান্য করার জন্য বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে ঐকান্তিকতার বিশেষ অভাব দেখা যায়। তাই জাতিপুঞ্জ আন্তর্জাতিক আইনভঙ্গকারী বৃহৎ শক্তিগুলির কিংবা তাদের মিত্র রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ইন্দোচীনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে জাতিপুঞ্জের অকার্যকারিতা বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। পঞ্চমতঃ, আন্তর্জাতিক আইনের সাধারণ নীতিগুলি নির্ধারণের প্রশ্নে বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে অদ্যাবধি মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তাই স্যুম্যান (Schuman) বলেছেন, যতদিন পর্যন্ত মানুষ প্রতিষ্ঠিত বিধি আনুযায়ী কাজ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবে, ততদিন পর্যন্ত আইনের নীতির জীবন্ত ও ক্রমবর্ধমান সমষ্টি হিসেবে আন্তর্জাতিক আইন বর্তমান থাকবে। ওপেনহিম যথার্থই বলেছেন যে, আন্তর্জাতিক আইন যদিও আইন তথাপি আইনের সীমারেখার খুব কাছাকাছি স্থানে যে এর অবস্থান সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

১৪। আন্তর্জাতিক আইনের পথে প্রতিবন্ধকতা (Hindrances to International Law)

আন্তর্জাতিক আইন আইনের মর্যাদালাভের দিকে অগ্রসর হলেও কতকগুলি প্রতিবন্ধকতা তার গতিকে মন্থর করে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক আইনের রূপ পরিগ্রহের পথে প্রতিবন্ধকতাগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

মানুষের শক্তিমত্ততা

(১) বার্ট্রেন্ড রাসেল (Bertrand Russell)-এর মতে, মানুষের যুক্তিহীন শক্তিমত্ততা হোল আন্তর্জাতিক আইনের বাস্তব রূপমণ্ডনের পথে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হওয়ার ফলে মানুষ প্রকৃতির উপর আপন কর্তৃত্ব বেশ কিছু পরিমাণে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে। প্রকৃতির উপর আপন প্রভাব বিস্তারের সাফল্য মানুষকে শক্তিমদে মত্ত করে তুলেছে। হিংস্রতা, বর্বরতা, পৈশাচিকতা ইত্যাদি এক শ্রেণীর মানুষকে যুদ্ধোন্মাদ করে তুলেছে। তারা আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করাকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে মনে করে। ফলে, আন্তর্জাতিক আইন প্রকৃত আইনের পদমর্যাদা লাভে বঞ্চিত হয়েছে।

(২) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্ব সুস্পষ্টভাবে পরস্পর-বিরোধী দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এই দুটি শিবির হোল ধনতান্ত্রিক শিবির এবং সমাজতান্ত্রিক শিবির। ধনতান্ত্রিক শিবিরের নেতৃত্ব দিচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নেতৃত্বে রয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক আরনল্ড টয়েনবি সাম্প্রতিক বিশ্ব-রাজনীতিকে তাই 'দ্বি-গোলার্ধ রাজনীতি' (Bi-polar politics) বলে বর্ণনা করেছেন। উভয় রাষ্ট্রই আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজেদের রাজনৈতিক মতাদর্শ ও প্রাধান্য-প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য সচেষ্ট বলে বুর্জোয়া আন্তর্জাতিক আইনবিদরা অভিমত পোষণ করেন। পরস্পরবিরোধী এই দুই গোষ্ঠীর আদর্শগত বিরোধের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উপর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিপুঞ্জকে ব্যবহার করতে লাগল ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ময়দান হিসেবে। ফলে তার বিরুদ্ধে বা তার কোন মিত্র রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আইনভঙ্গের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, আরব-ভূমি আক্রমণকারী ইস্রায়েল কিংবা ইন্দোচীন আক্রমণকারী স্বয়ং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ব্যর্থ হয়েছে। এইভাবে বৃহৎ শক্তিদ্বয়ের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই আন্তর্জাতিক আইন কার্যকর করার পথে যেমন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে, তেমনি নতুন আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নের পথেও বাধা সৃষ্টি করছে।

ঠাণ্ডা লড়াই

(৩) ধনতন্ত্রবাদের বিকাশের শেষ স্তরে সাম্রাজ্যবাদের জন্ম। বিদেশ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ, উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয়ের জন্য নতুন নতুন বৈদেশিক বাজারের অনুসন্ধান ইত্যাদি কারণে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। এর ফলে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ-ভীতি দেখা দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক আইনকে পদদলিত করে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে চরিতার্থ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। এর ফলে সর্বজনস্বীকৃত আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নের পথে চরম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদ

(৪) অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে, আন্তর্জাতিক আইনের প্রধান প্রতিবন্ধকতার সন্ধান পাওয়া যায় অধিকাংশ রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধের মধ্যে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে ধন-বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকায়, মুষ্টিমেয় পুঁজি-পতিদের হাতে উৎপাদনের উপকরণগুলি কেন্দ্রীভূত থাকায়, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও তাদেরই হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে। এইসব সার্বভৌম রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনের সর্বপ্রকার বাধানিষেধ উপেক্ষা করে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থকেই বড় বলে মনে করে। এর ফলে আন্তর্জাতিক আইন প্রকৃত আইনের মর্যাদা লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই অনেকে মনে করেন যে, বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত না হলে আন্তর্জাতিক আইন কখনই তার প্রকৃত রূপ পরিগ্রহ করতে পারবে না।

শ্রেণীসম্পর্ক

দ্বাদশ অধ্যায়

অধিকার

[Rights]

১। অধিকারের অর্থ ও প্রকৃতি (Meaning and Nature of Rights)

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে আত্মবিকাশের জন্য তার প্রয়োজন কতকগুলি সুযোগসুবিধা। সাধারণভাবে এইসব সুযোগসুবিধাকে অধিকার বলা হয়। কিন্তু সমাজে বাস করে মানুষ কখনই অবাধ বা সীমাহীন অধিকার দাবি করতে পারে না। সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজজীবন যাপন করতে হলে প্রত্যেকের প্রয়োজন এবং সুযোগসুবিধাগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা অপরিহার্য। এই সামঞ্জস্য বিধানের ব্যাপারে ব্যর্থ হওয়ার অর্থ অধিকারের বিনষ্টিকরণ। সুতরাং সমাজজীবনের বাইরে অধিকারের কথা কল্পনা করা যায় না। তাই গ্রীন বলেছেন, কেবলমাত্র সমাজের সভ্য হিসেবেই মানুষ অধিকার লাভ করতে পারে। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে, অধিকার হোল সমাজজীবনের সেই সকল অবস্থা যেগুলি ছাড়া ব্যক্তির প্রকৃষ্টতম বিকাশ সম্ভব হয় না। সুতরাং অধিকারের ধারণা সম্পূর্ণ সামাজিক।

অধিকার একটি সামাজিক ধারণা

অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত না হলে সমাজের সকলের আত্মবিকাশের পথ প্রশস্ত হয় না। সুতরাং আইনানুগের দৃষ্টিতে অধিকার হোল রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত দাবি। রাষ্ট্র রাষ্ট্রাধীন ব্যক্তির এরূপ দাবি স্বীকার করে নিয়ে এবং সেগুলিকে সংরক্ষিত করে একদিকে যেমন ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। এদিক থেকে বিচার করে অধিকারকে আইনগত ধারণা বলাই সঙ্গত। বোসাংকোয়েত (Bosanquet)-এর ভাষায়, অধিকার হোল সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক প্রযুক্ত দাবি। বস্তুতঃ, পরস্পরের সুযোগসুবিধা সম্পর্কে অবহিত থাকার ফলে প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ অধিকার ভোগের মাধ্যমে সুষ্ঠু সমাজজীবন যাপন করতে সক্ষম হয়। সুতরাং অধিকার কেবলমাত্র ব্যক্তিগত হতে পারে না, সমষ্টিগতও বটে। তাই ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণের সহায়ক না হলে কোন দাবি আইনের চোখে অধিকার বলে বিবেচিত হয় না।

অধিকার একটি আইনগত ধারণা

আদর্শবাদী দার্শনিক গ্রীনের মতে, "পরস্পরের প্রয়োজন সম্পর্কে নৈতিক চেতনা-সম্পন্ন সমাজব্যবস্থা ছাড়া অধিকারের অস্তিত্ব থাকতে পারে না।" সামাজিক জীব হিসেবে কোন ব্যক্তি যদি শুধু তার নিজের সুখসুবিধার কথা চিন্তা করে তবে সে সামাজিক জীবনযাপন করতে পারে না। তাই নিজের সুখসুবিধার সঙ্গে সঙ্গে অপরের সুখসুবিধার কথাও তাকে ভাবতে হবে। এইভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি যখন পারস্পরিক সুযোগসুবিধা সম্পর্কে সহানুভূতিশীল মনোভাব পোষণ করে তখনই সমাজে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

অধিকার সম্বন্ধে গ্রীনের ধারণা

সুতরাং গ্রীন নৈতিক শুভচেতনা-সম্পন্ন সমাজব্যবস্থাতেই অধিকার থাকতে পারে বলে মনে করেন।

অধ্যাপক ল্যাস্কি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অধিকারের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, অধিকার এই অর্থে রাষ্ট্রের অগ্রবর্তী যে, স্বীকৃত হোক বা না হোক, রাষ্ট্রের বৈধতা তার উপর নির্ভর করে। অন্যভাবে বলা যায় যে, রাষ্ট্রের স্বীকৃতির মাধ্যমেই অধিকার সার্থক হতে পারে বলে ল্যাস্কি মনে করেন। রাষ্ট্র নাগরিককে কি পরিমাণ অধিকার প্রদান ও রক্ষা করছে তার উপর নির্ভর করবে সে কতখানি আনুগত্য তাদের কাছ থেকে দাবি করবে। সুতরাং রাষ্ট্র অধিকার সৃষ্টি করতে পারে না, তাকে স্বীকার ও সংরক্ষণ করে মাত্র। রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত বা সংরক্ষিত না হলে অধিকারের কোনো নৈতিক ভিত্তি থাকে না—এই যুক্তি ল্যাস্কি স্বীকার করে নিতে সম্মত নন। তাঁর মতে জনগণের এমন কতকগুলি ন্যায়সঙ্গত দাবি থাকে যেগুলি রাষ্ট্র স্বীকার করে না কিন্তু সেই অধিকারগুলি মূল্যহীন বা ভিত্তিহীন একথা কোনমতেই বলা যায় না। ল্যাস্কির মতে, কতকগুলি স্বীকৃত এবং কতকগুলি অস্বীকৃত অথচ স্বীকারযোগ্য অধিকারসমষ্টির মাঝে রাষ্ট্র দাঁড়িয়ে আছে। স্বীকারযোগ্য অধিকারগুলিকে রাষ্ট্র যতখানি স্বীকৃতি দিতে পারবে ততখানি সে তার অস্তিত্বের সার্থকতা প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হবে। সুতরাং রাষ্ট্র নিজেই নিজের লক্ষ্য হতে পারে না; মানুষের উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজন।

অধিকার সম্পর্কে ল্যাস্কি-প্রদত্ত সংজ্ঞা

অধিকারের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বার্কার বলেছেন, অধিকার হোল মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী সেই সব সুযোগসুবিধা যেগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়। সুতরাং কোন সুযোগসুবিধা বা দাবিকে তখনই অধিকার বলা যাবে যদি তা দুটি শর্ত পূরণ করে—১. এই সুযোগসুবিধা বা দাবি প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক হবে এবং ২. এটি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হবে। কিন্তু "ঐতিহাসিক বস্তুবাদ মানবিক অধিকারকে সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক এবং নিছক নৈতিক বিচার থেকে মুক্ত করে সমাজের এক বাস্তব সত্তা হিসেবে বিচার করে।" শ্রেণীবিভক্ত সমাজে স্বার্থের সংঘর্ষ অনিবার্যভাবে অধিকারের প্রশ্নে বিরোধ সৃষ্টি করে। একদিকে যেমন ধনিকশ্রেণী মুনাফা লাভ করার অধিকার দাবি করে, অন্যদিকে তেমনি শ্রমিকশ্রেণী উপযুক্ত মজুরি দাবি করে। এরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র শ্রেণী-নিরপেক্ষভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার রক্ষা করতে পারে না। এই বিরোধের ফলে রাষ্ট্র সকল স্বার্থের সমন্বয় সাধন করে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় না। বাস্তবে রাষ্ট্র একটি নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থাকে রক্ষা করে। এই সমাজব্যবস্থা রক্ষা করার জন্যই আইনকানুন প্রণীত হয়। সুতরাং সমাজ-নিরপেক্ষভাবে কোন অধিকার রক্ষা করা যায় না। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানুষের অধিকারের সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়। ধনতান্ত্রিক সমাজে নীতি হিসেবে স্বীকৃত হলেও মানুষের মৌলিক অধিকারগুলি বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। যে পরিমাণে অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস পাবে সেই পরিমাণে রাষ্ট্র সকলের অধিকার রক্ষা করতে সমর্থ হবে।

অধিকারের সংজ্ঞা

২। অধিকারের প্রকার-ভেদ (Different Types of Rights)

সাধারণভাবে অধিকারকে দুভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা—ক. নৈতিক অধিকার (Moral Rights) এবং খ. আইনগত অধিকার (Legal Rights)। সামাজিক ন্যায়-নীতিবোধের উপর ভিত্তি করে যেসব অধিকার গড়ে উঠে সেগুলিকে নৈতিক অধিকার বলে। এইসব অধিকারভঙ্গের অপরাধে রাষ্ট্র কোনরূপ শাস্তি বিধান করতে পারে না। নৈতিক অধিকার ভঙ্গকারী কেবলমাত্র নিজ বিবেকের দংশন অনুভব করে এবং সমাজ কর্তৃক নিন্দিত হয়। প্রতিবেশীর কাছ থেকে সহৃদয় ব্যবহারের দাবি, ছাত্রদের কাছ থেকে শিক্ষকের শ্রদ্ধা-লাভের দাবি হোল নৈতিক অধিকারের উদাহরণ।

নৈতিক অধিকার

যেসব অধিকার আইন কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয় সেগুলিকে আইনগত অধিকার বলে। আইনগত অধিকারগুলিকে প্রধানতঃ চারভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা, ১. পৌর অধিকার (Civil Rights), ২. রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights), ৩. সামাজিক অধিকার (Social Rights) এবং ৪. অর্থনৈতিক অধিকার (Economic Rights)।

আইনগত অধিকার

[১] **পৌর অধিকারসমূহ (Civil Rights) :** যে সব সুযোগসুবিধা ছাড়া মানুষ সভ্য ও সামাজিক জীবনযাপন করতে পারে না এবং যে সমস্ত সুযোগের অভাবে ব্যক্তিসত্তার সম্পূর্ণ বিকাশসাধন ব্যাহত হয়, সেইসব সুযোগসুবিধাকে পৌর অধিকার বলা হয়। পরবর্তী অংশে উল্লিখিত পৌর অধিকারগুলিকে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ বলে বর্তমানে মনে করা হয়।

পৌর অধিকারের সংজ্ঞা

(ক) **জীবনের অধিকার** অর্থাৎ বেঁচে থাকার অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। এই অধিকার ছাড়া অন্যান্য অধিকারগুলির কোন বাস্তব ভিত্তি থাকে না, কারণ—জীবনের নিরাপত্তা না থাকলে অন্যান্য অধিকারগুলি ভোগ করা কখনই সম্ভব নয়। জীবনের অধিকার বলতে আত্মরক্ষার অধিকার এবং আত্মরক্ষার প্রয়োজনে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের অধিকারও বোঝায়। প্রতিটি সভ্য রাষ্ট্র এই অধিকারটি সংরক্ষণ করে।

জীবনের অধিকার

(খ) **স্বাধীন চিন্তার অধিকার** মানুষের মানসিক এবং নৈতিক অগ্রগতির ভিত্তি। চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার অর্থ হোল বাক্-স্বাধীনতা ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা। সমাজে প্রত্যেকটি মানুষের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার থাকা উচিত। এ প্রসঙ্গে ল্যাস্কি বলেন, যে-মানুষের স্বাধীন-ভাবে চিন্তা করার ও মত প্রকাশ করার অধিকার নেই, সে শীঘ্রই চিন্তা করা পরিত্যাগ করে; এবং যে-মানুষ চিন্তা করে না সে প্রকৃত অর্থে নাগরিক বলে গণ্য হতে পারে না। আবার বলা যায় যে, মত-প্রকাশের অধিকার বা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক সরকারের মূল ভিত্তি। এই স্বাধীনতা না থাকলে সরকারী নীতিগুলিকে জনমতের প্রতিফলন বলে গণ্য করা যায় না। এই অধিকার সরকারকে স্বৈরাচারী হতে বাধা দেয়। বিভিন্ন মতের সংঘাত সত্যকে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। তাই কোন মতকে দাবিয়ে দেওয়া রাষ্ট্রের উচিত নয়। তবে এই অধিকার নিরঙ্কুশ

চিন্তা ও মত প্রকাশের অধিকার

নয়। সদাচার, শ্লীলতা, রাষ্ট্রীয় সংহতি ও নিরাপত্তা প্রভৃতি রক্ষার জন্য রাষ্ট্র যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে। তবে বাধানিষেধগুলি যুক্তিসঙ্গত কিনা তা বিচার করার অধিকার সরকার-নিয়ন্ত্রণমুক্ত নিরপেক্ষ আদালতের থাকা উচিত।

(গ) স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করার মত স্বাধীনভাবে চলাফেরা এবং সংঘ বা সমিতি গঠন করার অধিকার মানুষের ব্যক্তিসত্তার বিকাশের ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনীয়। কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক করা বা ইচ্ছামত গ্রেপ্তার করা প্রভৃতি এই অধিকারের বিরোধী। যদি শাসক সম্প্রদায় দলীয় মনোবৃত্তি বা সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য উপযুক্ত কারণ না দেখিয়ে কোন ব্যক্তিকে বেআইনীভাবে গ্রেপ্তার করে তবে তা হবে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপন্থী ও গণতান্ত্রিক আদর্শের বিরোধী। জাতীয় বিপদের দিনে অর্থাৎ জরুরী অবস্থার সময় জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে এই অধিকারটিকে ক্ষুণ্ন করা যেতে পারে বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন। তবে এটা খুবই সাময়িক হওয়া উচিত এবং একমাত্র যুদ্ধকালীন অবস্থায় সতর্কতার সঙ্গে এই অধিকার প্রয়োগ করা সঙ্গত; ল্যাস্কি প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, কোন অবস্থাতেই এই অধিকারটিকে সঙ্কুচিত করা উচিত নয়।

ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার

(ঘ) জীবনের সঙ্গে জীবিকার প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই জীবনধারণের জন্য প্রতিটি কর্মক্ষম ব্যক্তির কার্যে নিযুক্ত হওয়ার অধিকার রয়েছে। শুধু কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে রাষ্ট্রের কর্তব্য শেষ হয় না। দক্ষতা অনুযায়ী উপযুক্ত মজুরীলাভের অধিকারও একান্ত প্রয়োজন। যদি তা না করা হয় তাহলে দেশে যোগ্য ব্যক্তিকে যথার্থ মর্যাদা প্রদান করা হয় না। স্বাভাবিকভাবেই জনগণ এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করতে পারে।

কার্যের অধিকার

কার্যের অধিকারকে বাস্তবে রূপ দিতে বাধা হলো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা। অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থার উপর ব্যক্তিগত মালিকানার ফলে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও এ অধিকার আইনগত স্বীকৃতিলাভ করেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশেও বেকারত্বের অবসান হয়নি এবং কার্যের অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত নয়। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ই প্রত্যেকটি কর্মক্ষম ব্যক্তির কার্যের অধিকার স্বীকৃত হতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে কার্যের অধিকার স্বীকৃত এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও এ অধিকার বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছে।

(ঙ) ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার বলতে বোঝায় ব্যক্তির সম্পত্তি অর্জনের ও রক্ষার, সম্পত্তি ক্রয়বিক্রয় ও ভোগ করার অধিকার। নিজ সম্পত্তিকে দান ও হস্তান্তর করার অধিকারও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সম্পত্তির অধিকার থাকা উচিত কিনা—এ নিয়ে বর্তমানে যথেষ্ট মতবিরোধ দেখা যায়। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের স্বীকৃতি প্রদানকে ধনবৈষম্যমূলক সমাজের প্রকৃষ্ট নিদর্শন বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, এই অধিকারের ফলেই মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ-ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। এই অধিকার থেকেই অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অসাম্যের সৃষ্টি হয়েছে। তাই সমাজতান্ত্রিক সমাজের মূল লক্ষ্য হোল এই শোষণমূলক সম্পত্তির অধিকারের বিলোপসাধন। আবার ধনতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসীরা মনে করেন যে, ব্যক্তিগত

সম্পত্তির অধিকার

সম্পত্তির অধিকার ছাড়া ব্যক্তিসত্তার বিকাশ কখনই সম্ভব নয়। অনেকের মতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন না করে সম্পত্তি যাতে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত না হয় তা দেখা এবং সম্পত্তির ন্যায়সংগত বন্টন ও ভোগের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

পরিবার গঠনের অধিকার

(চ) পরিবার গঠনের অধিকার বলতে বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠন করার সুযোগসুবিধা বোঝায়। পিতামাতা, ভাইভগ্নী, সন্তানসন্ততি এবং পত্নীকে নিয়ে একটি সুখী পরিবার গঠন মানুষের অন্যতম পৌর অধিকার।

ধর্মের অধিকার

(ছ) ধর্মবিশ্বাস মানুষের সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার। তাই স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণ ও ধর্মপ্রচার করার অধিকার মানুষের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আমার ধর্মাচরণ ও ধর্মপ্রচারের অধিকার আছে বলে অন্য ধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের উপর অত্যাচার করার কোন অধিকার আমার নেই। সে কারণে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোন ব্যক্তি যাতে অন্য ধর্মে হস্তক্ষেপ না করে স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণ ও ধর্মপ্রচার করতে পারে সেদিকে রাষ্ট্র সতর্ক দৃষ্টি রাখে।

শিক্ষার অধিকার

(জ) সভ্য সমাজগঠনের কাজে শিক্ষার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা ছাড়া মানুষ কখনই আত্মসচেতন ও সমাজসচেতন হয়ে গড়ে উঠতে পারে না। সর্বোপরি শিক্ষাই মানুষের বৃত্তি, সামাজিক পদমর্যাদা, চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রভৃতি বিকাশে সহায়তা করে। তাই শিক্ষার অধিকার স্বীকার করে নেওয়া রাষ্ট্রের কর্তব্য।

চুক্তি সম্পাদনের অধিকার

(ঝ) ন্যায়সংগতভাবে একে অপরের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করতে পারে। এই চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে দেশের শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতির বিশেষ উন্নতি সাধিত হতে পারে। কিন্তু অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত থাকার কোন চুক্তিকে রাষ্ট্র বে-আইনী বলে ঘোষণা করতে পারে।

সাম্যের অধিকার

(ঞ) আইনের চোখে সকলেই সমান এবং আইন কর্তৃক সমানভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকারকে সাম্যের অধিকার বলে। ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রীপুরুষ, ধনীনির্ধন নির্বিশেষে সকলকেই আইন সমদৃষ্টিতে দেখবে।

উপরি-উক্ত পৌর অধিকারগুলি আলোচনা করার পর একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, কোন অধিকারই অবাধ বা নিরঙ্কুশ হতে পারে না। প্রতিটি অধিকারভোগের সঙ্গে কর্তব্য পালন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কর্তব্য পালন না করলে কোন ব্যক্তি নিজ অধিকার দাবি করতে পারে না।

রাজনৈতিক অধিকারের সংজ্ঞা

[২] **রাজনৈতিক অধিকারসমূহ (Political Rights) :** রাজনৈতিক অধিকার বলতে রাষ্ট্রীয় কার্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ বোঝায়। জনগণই হোল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সার্বভৌম। তাই জনগণের রাজনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি ছাড়া সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন করা অসম্ভব। রাজনৈতিক অধিকারগুলির মধ্যে যেগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি নিম্নে আলোচিত হোল :

(ক) রাজনৈতিক অধিকারগুলির মধ্যে ভোটদানের অধিকার সর্বাপেক্ষা

গুরুত্বপূর্ণ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটদানের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়। এই অধিকার প্রয়োগ করে নাগরিকেরা নিজেদের মনোমত সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়। তবে নাবালক, বিকৃতমস্তিষ্ক, দেউলিয়া, বিদেশী প্রভৃতি ব্যক্তিদের ভোটদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। অনেকে আবার শিক্ষা ও সম্পত্তিকে ভোটাধিকারের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করতে চান। কিন্তু অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে, শিক্ষা ও সম্পত্তিকে ভোটাধিকারের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা সঙ্গত নয়। প্রাপ্তবয়স্কের সর্বজনীন ভোটাধিকারই প্রকৃত গণতন্ত্রের ভিত্তি।

ভোটদানের অধিকার

(খ) যোগ্যতাসম্পন্ন প্রতিটি নাগরিকের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার অধিকার সমস্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বীকৃতিলাভ করেছে। যোগ্য নাগরিক আইনসভা কিংবা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সভ্য হিসেবে নির্বাচিত হতে পারেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন রকম যোগ্যতার অধিকারী হতে হয়।

নির্বাচিত হওযার অধিকার

(গ) উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রতিটি নাগরিক সরকারী কার্যে নিযুক্ত হওয়ার অধিকারী। যোগ্যতাই হোল সরকারী কার্যে নিযুক্ত হওয়ার একমাত্র মাপকাঠি। সরকারী চাকরি প্রদানের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ, জাতি প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র কোন যোগ্য নাগরিককে সরকারী কার্যে নিযুক্ত হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না।

সরকারী কার্যে নিযুক্ত হওয়ার অধিকার

(ঘ) নিজেদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাগরিকেরা তার যথোচিত প্রতিবিধান দাবি করতে পারে। এই অধিকার নাগরিকদের অন্যতম মৌলিক অধিকার।

আবেদন করার অধিকার

ঙ)) সরকারের কোন কাজের ফলে নাগরিক-স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলে বা ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে নাগরিকগণ সেই কার্যের সমালোচনা করতে পারেন। সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনার অর্থ রাষ্ট্রের বিরোধিতা নয়। সুতরাং সরকার-বিরোধী হওয়ার অর্থ রাষ্ট্র-বিরোধী হওয়া নয়।

সরকারী কার্যের সমালোচনা করার অধিকার

[৩] **সামাজিক অধিকার (Social Rights) :** নাগরিকদের সামাজিক জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে গড়ে তোলার জন্য কতকগুলি সামাজিক সুযোগসুবিধা একান্ত অপরিহার্য। রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হলে সেগুলিকে সামাজিক অধিকার বলা হয়। কেবলমাত্র রাজনৈতিক অধিকার মানুষের পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে না ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের। যে রাষ্ট্রে সামাজিক অধিকার স্বীকৃত হয় না তাকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে অভিহিত করা সমীচীন নয়। সামাজিক ক্ষেত্রে অসাম্য-বৈষম্য থাকলে রাষ্ট্র শ্রেণীশোষণের যন্ত্রে পরিণত হয়। তাই সামাজিক অধিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের জন্য একান্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন রাষ্ট্রে

সংজ্ঞা ও গুরুত্ব

যেসব সামাজিক অধিকার স্বীকৃতিলাভ করেছে সেগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ

শিক্ষার অধিকার

(ক) সভ্য সমাজগঠনের কাজে শিক্ষার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা ছাড়া মানুষ কখনই আত্মসচেতন হয়ে উঠতে পারে না। সর্বোপরি, শিক্ষাই মানুষের বৃত্তি, সামাজিক পদমর্যাদা, চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রভৃতি বিকাশে সহায়তা করে। তাই শিক্ষার অধিকার স্বীকার করে নেওয়া প্রতিটি রাষ্ট্রের কর্তব্য।

ধর্মের অধিকার

(খ) ধর্মবিশ্বাস মানুষের সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার। তাই স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণ ও ধর্মপ্রচার করার সামাজিক অধিকার মানুষের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আমার ধর্মাচরণ ও ধর্মপ্রচারের অধিকার আছে বলে অন্য ধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের উপর অত্যাচার করার কোন অধিকার আমার নেই। তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিটি ব্যক্তি যাতে অন্য ধর্মে হস্তক্ষেপ না করে স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণ ও ধর্মপ্রচার করতে পারে সেদিকে রাষ্ট্র সতর্ক দৃষ্টি রাখে।

সামাজিক সুস্থ পরিবেশে বাস করার অধিকার

(গ) প্রতিটি মানুষ চায় একটি সুন্দর সামাজিক পরিবেশের মধ্যে বাস করতে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, কিছু সংখ্যক ব্যক্তি অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত থাকার ফলে অধিকাংশ মানুষের সমাজজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মদ্য ও মাদক দ্রব্য পান করে সমাজের প্রচলিত নীতিবোধ-বিরোধী আচরণ করা হলে মানুষের সমাজজীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। তাই সমাজজীবনের সুস্থ পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়। সুস্থ সামাজিক পরিবেশে বাস করার অধিকার প্রত্যেকের জন্মগত অধিকার। জনকল্যাণকামী ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই অধিকার বিশেষভাবে স্বীকৃতিলাভ করেছে।

স্বাস্থ্য ও শক্তি রক্ষার অধিকার

(ঘ) প্রতিটি পুরুষ ও নারী যাতে সুস্থ ও সবল দেহের অধিকারী হতে পারে সেজন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। রুগ্ন ও ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা সাধারণতঃ সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি নিজ কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে পারে না। তাই এই অধিকারটি স্বীকার করে নেওয়া রাষ্ট্রের কর্তব্য।

সামাজিক সাম্যের অধিকার

(ঙ) সামাজিক দিক থেকে বিচার করে বলা যায় যে, সমাজে স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলে সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাওয়ার অধিকারী। রাষ্ট্র, ধর্ম, বর্ণ, জাতি প্রভৃতির কারণে মানুষের মধ্যে কোনরকম ভেদবিচার করবে না।

সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা

[৪] **অর্থনৈতিক অধিকার (Economic Rights) ঃ** অর্থনৈতিক অধিকার হোল সেইসব অধিকার যেগুলি অভাব-অনটন ও অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি দিয়ে মানুষের জীবনকে সুখস্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও নিরাপদ করে তোলে। অধ্যাপক ল্যাস্কির ভাষায়, দৈনন্দিন অন্ন-সংস্থানের ব্যাপারে যুক্তিসংগত অর্থ খুঁজে পাওয়ার সুযোগ ও নিরাপত্তাকে অর্থনৈতিক অধিকার বলে। এই অধিকার ছাড়া মানুষ সুস্থভাবে জীবনযাপন করতে পারে

না। যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও যদি মানুষকে বেকারত্বের জ্বালায় জ্বলতে হয়, অন্ন সংস্থানের প্রয়োজনে অহরহ যদি তাকে ঘুরে বেড়াতে হয়, তাহলে তার কাছে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলি মূল্যহীন হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে সমাজে ধনীদরিদ্রের ব্যবধান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। যে-সমাজে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই সেখানে শ্রমিকেরা ধনশালী মালিকদের আজ্ঞাবহ ক্রীতদাস মাত্র। তাই বার্কার (Barker) মন্তব্য করেছেন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরাধীন শ্রমিক কখনই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বধীন হতে পারে না। বলা বাহুল্য, অর্থনৈতিক অধিকার না থাকলে ব্যক্তি তার ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করতে সক্ষম হয় না। এই অবস্থায় আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপনের আশা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের যথার্থ রূপদানের প্রয়োজনে অর্থনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি একান্ত অপরিহার্য।

অর্থনৈতিক অধিকারসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ

(ক) কর্মের অধিকার অর্থনৈতিক অধিকারগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কর্মের অধিকার বলতে বোঝায় প্রতিটি ব্যক্তি তার যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুসারে কর্মে নিযুক্ত হতে পারবে। মানুষ চায় তার জীবনকে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে ভরিয়ে তুলতে, কিন্তু অলসভাবে বসে থাকলে সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেউ তার কাছে পৌঁছে দেবে না। তাই নিজস্ব প্রয়োজন মেটাবার জন্য প্রতিটি কার্যক্ষম মানুষ কাজ করতে চায়। রাষ্ট্রের কর্তব্য হোল প্রত্যেকের সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী তাকে কার্যে নিযুক্ত করা। কর্মের অধিকার না থাকলে ব্যক্তি কখনই সম্যকভাবে তার ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারে না। তাই বিশ্বের প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কর্মের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ স্মরণযোগ্য যে, ব্যক্তির দক্ষতা ও যোগ্যতার বিচার না করে সকলকে একই রকম কাজে নিয়োগ করাকে কার্যের অধিকার বলা যায় না। দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রতিটি ব্যক্তিকে কার্যে নিয়োগ করার নামই কর্মের অধিকার।

কর্মের অধিকার

(খ) শুধুমাত্র কর্মের অধিকার থাকলেই ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ সুগম হয় না। উপযুক্ত কাজের জন্য উপযুক্ত বেতন দেওয়া না হলে কর্মের অধিকার মূল্যহীন হয়ে পড়ে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, একজন ইঞ্জিনীয়ারের বেতন যদি একজন শ্রমিকের সমান হয়, তাহলে গুণগত কৌলিন্যের প্রতি অর্থাৎ যোগ্যতার প্রতি সুবিচার করা হয় না। তাই বেতন প্রদানের সময় কার্যের গুণ ও পরিমাণের উপর লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন। তবে একথা সত্য যে, প্রতিটি নাগরিকের সভ্য জীবনযাপনের জন্য ন্যূনতম যেটুকু বেতনের প্রয়োজন সেটুকু তাকে প্রদান করতে হবে, তা না হলে সমাজে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত হবে না। জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান বলতে বোঝায় প্রয়োজনমত খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। যে-ব্যক্তি খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে না, তার রাজনৈতিক জীবন বলে কিছু থাকতে পারে না।

উপযুক্ত পারিশ্রমিকের অধিকার

(গ) গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলেছেন, সুন্দর জীবন-যাপনের জন্য অবকাশ অপরিহার্য। সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অবকাশের অধিকার একান্ত

প্রয়োজন ভিত্তিতে

পশুর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য নিরূপণ করা হয় শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতির সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হোল মনুষ্য সমাজ। উদ্ভাবনী শক্তি মানুষকে নতুন নতুন সৃষ্টিকাজে উৎসাহিত করে। এই উদ্ভাবনী শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন অবকাশের।

অবকাশের অধিকার

তা ছাড়া, অবকাশ না থাকলে মানুষ যন্ত্রতুল্য হয়ে পড়ে। তাই অনেক সময় বৈচিত্র্যহীন জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অন্তরাত্মা মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। ফলে সমাজের স্বাভাবিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়। তাই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে কর্মের সময়সীমা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অনেকে আবার মনে করেন যে, শুধু দৈনন্দিন কার্যে সময়সীমা নির্ধারণ করাই যথেষ্ট নয়, অবসর যাপনের জন্য বিভিন্ন অবকাশের অধিকার প্রতিটি মানুষের একান্ত প্রয়োজন। অনেকের মতে, শুধুমাত্র অবকাশের অধিকার থাকলেই চলবে না ; সেইসঙ্গে দৈনন্দিন কর্মের সময়-সীমা নির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন। সুযোগসুবিধা থাকাও একান্ত প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

(ঘ) মানুষ বার্ধক্যে উপনীত হলে স্বাভাবিকভাবেই কর্ম সম্পাদনে অক্ষম হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় রাষ্ট্রের কর্তব্য তার ভরণপোষণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করা। কারণ কর্মক্ষম অবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুযায়ী সমাজ তথা রাষ্ট্রের জন্য কাজ করে। কিন্তু বৃদ্ধ হয়ে পড়লে তার ভরণপোষণের ব্যবস্থা যদি রাষ্ট্র না করে তাহলে অন্যায় করা হবে। তাই সমাজতান্ত্রিক ও জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রসমূহে বার্ধক্য-ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। অনুরূপভাবে অক্ষম ব্যক্তিদেরও

বৃদ্ধ ও অক্ষম অবস্থায় রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিপালিত হওয়ার অধিকার

প্রতিপালনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের গ্রহণ করা উচিত। নানা কারণে মানুষ কার্য সম্পাদনে অক্ষম হয়ে পড়তে পারে। সম্ভবতঃ বিকলাঙ্গ কিংবা মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে দৈহিক পরিশ্রম করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে তাদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই—একথা মেনে নেওয়া যায় না। তাই তাদের প্রতিপালন করা রাষ্ট্রের একান্ত কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ, কর্মরত অবস্থায় কোন শ্রমিক যদি আঘাতজনিত কারণে অক্ষম হয়ে পড়ে সেক্ষেত্রেও তার প্রতিপালনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর স্বাভাবিকভাবেই বর্তায়। প্রতিটি জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের সরকার এই উদ্দেশ্যে বীমা পরিকল্পনা, প্রভিডেন্ট ফান্ড পরিকল্পনা প্রভৃতি চালু করে থাকে। বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের অর্থনৈতিক অধিকার স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে জনগণের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ সুগম করে যথার্থ নাগরিক হিসেবে মানুষকে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে যেতে রাষ্ট্র সাহায্য করছে।

৩। অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ (Different Theories of Rights)

অধিকারকে কেন্দ্র করে যুগে যুগে দার্শনিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা গিয়েছে। বিভিন্ন সময়ে অধিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা দার্শনিক ও রাজনৈতিক জগতে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে অধিকার

সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। ঐ শতাব্দীতে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এতই ব্যাপকভাবে শুরু হয় যে, ইউরোপ এবং আমেরিকা মহাদেশ অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কেঁপে উঠে। কিন্তু অধিকারের প্রকৃতি সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা অদ্যাবধি ঐকমত্যে উপনীত হতে পারেন নি। তাই অধিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠেছে। এই মতবাদগুলির মধ্যে,—১. স্বাভাবিক অধিকার সম্বন্ধে মতবাদ (Theory of Natural Rights), ২. আইনগত মতবাদ (Legal Theory of Rights), ৩. ঐতিহাসিক মতবাদ (Historical Theory of Rights), ৪. আদর্শবাদী মতবাদ (Idealist Theory of Rights) এবং ৫. মার্কসীয় মতবাদ (Marxist Theory of Rights) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অধিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ

[১] **স্বাভাবিক অধিকার সম্বন্ধে মতবাদ (Theory of Natural Rights):** স্বাভাবিক অধিকারের ধারণা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এই মতবাদের সমর্থকগণ মনে করেন যে, মানুষ কতকগুলি সহজাত, স্বাভাবিক, অপরিহার্য, চিরন্তন ও অবাধ অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং কোন সমাজব্যবস্থা তার সেই অধিকারে কোনভাবেই হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এই অধিকার ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই বলে স্বাভাবিক অধিকার-তত্ত্ব প্রচার করে। মানুষের দেহের বর্ণের মতোই স্বাভাবিক অধিকারগুলিও মানুষে অঙ্গীভূত। তবে স্বাভাবিক অধিকার বলতে কোন্ অধিকারগুলিকে বোঝায় তা নিয়ে এই মতের সমর্থকগণ ঐকমত্যে উপনীত হতে পারেন নি। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার মানুষের সহজাত বা স্বাভাবিক অধিকার। কোন অজুহাতেই রাষ্ট্র মানুষকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না।

স্বাভাবিক অধিকারের প্রকৃতি

ইতিহাসের কষ্টিপাথরে বিচার করলে দেখা যায় যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্বাভাবিক অধিকার-তত্ত্ব বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণী সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়ে তদানীন্তন অভিজাতশ্রেণীর ঈশ্বরপ্রদত্ত অধিকারের দাবির বিরুদ্ধে জনগণের স্বাভাবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠে। এই সময় বুর্জোয়াদের এই প্রচেষ্টাকে নিঃসন্দেহে একটি প্রগতিশীল আন্দোলন বলে চিহ্নিত করা যায়। তবে প্রাচীনকালেও স্বাভাবিক অধিকার তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীসের স্টোয়িক দার্শনিকদের রচনায় এবং পরবর্তী সময়ে রোমক আইনবিদ্‌দের রচনায় স্বাভাবিক অধিকার-তত্ত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে চুক্তি মতবাদী দার্শনিকদের দ্বারা স্বাভাবিক অধিকারের ধারণা বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। তারপর আদর্শবাদী ও উপযোগিতাবাদী দার্শনিকরাও স্বাভাবিক অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বর্তমানে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে গিডিংস (Giddings) প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্বাভাবিক অধিকার-তত্ত্বটি আলোচনা করেন।

ঐতিহাসিক পটভূমি

হবস্ স্বাভাবিক অধিকার বলতে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে প্রত্যেকের নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী যা খুশি তা-ই করার অবাধ স্বাধীনতাকে বোঝাতে চেয়েছেন। তাঁর

মতে, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে মানুষ নিজের অভাব পরিতৃপ্তির জন্য যে-কোন জিনিসের উপর ক্ষমতা দাবি করতে পারে। ইংরেজ দার্শনিক লক জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকারকে প্রাকৃতিক অধিকার বলে বর্ণনা করেছেন। ফরাসী দার্শনিক রুশো স্বাভাবিক অধিকারকে সাধারণ ইচ্ছার অঙ্গীভূত বলে প্রচার করেন। তাঁর মতে, সাধারণ ইচ্ছাই মানুষের জীবন, স্বাধীনতা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় অধিকারের সংরক্ষক। ব্যক্তিগত ইচ্ছা সাধারণ ইচ্ছার অঙ্গীভূত বলে ব্যক্তির স্বাভাবিক অধিকার অক্ষুণ্ণই থেকে যায়।

হবস্, লক ও রুশোর অভিমত

স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্বটির বাস্তব প্রয়োগ ঘটে আমেরিকা ও ফ্রান্সের স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্যে। ১৭৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণায় বলা হয়েছিল যে মানুষ কতকগুলি অপরিহার্য অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। ১৭৯৩ সালে ফ্রান্সের স্বাধীনতা ঘোষণায় বলা হয় যে, স্বাধীনতা, সাম্য, নিরাপত্তা এবং সম্পত্তির অধিকার হোল মানুষের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্বাভাবিক অধিকার। এই অধিকারগুলির মধ্যে জীবন, স্বাধীনতা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজ দার্শনিক টমাস পেইন (Thomas Paine)-ও স্বাভাবিক তত্ত্বটিকে বিশেষভাবে সমর্থন করেন।

আমেরিকা ও ফ্রান্সের স্বাধীনতার অধিকার

হিতবাদী দার্শনিকদের মধ্যে বেন্থাম এবং স্পেনসার (Spencer) স্বাভাবিক অধিকার তত্ত্বের সমর্থক ছিলেন। তাঁদের মতে, ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের স্বাধীনতা হোল মৌলিক বা স্বাভাবিক অধিকার। রাষ্ট্র যদি ব্যক্তির এই অধিকার রক্ষা করতে না পারে তাহলে ব্যক্তিও রাষ্ট্রের নির্দেশ অমান্য করতে পারে। তবে তাঁরা একথা বলেন যে, অধিকার কখনই সমাজ-নিরপেক্ষ হতে পারে না। সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হলেই অধিকারের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে।

হিতবাদী দার্শনিকদের অভিমত

গ্রীন প্রমুখ আদর্শবাদী দার্শনিকগণ প্রাকৃতিক অধিকারকে একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচারবিশ্লেষণ করেছেন। গ্রীনের মতে, প্রতিটি মানুষের নৈতিক উপলব্ধির জন্য যে অধিকারগুলি প্রয়োজন সেগুলিই হোল তার স্বাভাবিক অধিকার। রাষ্ট্র সেই অধিকারগুলিকে সংরক্ষণ করে মানুষের নৈতিক সত্তাকে বিকশিত করতে পারে।

গ্রীনের অভিমত

অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে, মত-প্রকাশের স্বাধীনতা, উপযুক্ত বেতনের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, অন্ন সংস্থানের অধিকার, স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ইত্যাদি হোল এই অর্থে স্বাভাবিক অধিকার যে, সেগুলিকে অস্বীকার করলে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য যথাযথভাবে রূপায়িত হতে পারে না। তিনি নাগরিকতার পক্ষে অপরিহার্য অধিকারগুলিকেই স্বাভাবিক অধিকার বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে রাষ্ট্রের বৈধতা অধিকারের উপরেই নির্ভরশীল; কেবলমাত্র স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমেই অধিকারের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয় না।

ল্যাস্কির অভিমত

সাম্প্রতিককালে সমাজবিজ্ঞানিগণ একটি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাভাবিক অধিকার-তত্ত্ব আলোচনা করেছেন। তাঁদের মতে, স্বাভাবিক অধিকার সহজাত চিরন্তন

অধিকার নয়, তা সামাজিক নীতির সহায়ক ব্যক্তিগত সুযোগসুবিধা মাত্র। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেই মাত্র এরূপ অধিকার কল্পনা করা যায়। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে গিডিংস বলেন যে, সামাজিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নির্বাচনের সূত্র দ্বারা প্রযুক্ত সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় অধিকার হোল স্বাভাবিক অধিকার।

সাম্প্রতিক ধারণা

সমালোচনা ঃ বর্তমানে নানাদিক থেকে স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্বটির সমালোচনা করা হয়।

(১) 'স্বাভাবিক' (Natural) শব্দটির কোন সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা না থাকায় কোন্ অধিকারকে স্বাভাবিক অধিকার বলা হবে এবং কোন্ অধিকারকে অস্বাভাবিক অধিকার বলা হবে তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থেকে যায়। তাই স্বাভাবিক অধিকারগুলি কি কি সে সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি অদ্যাবধি নির্ণীত হয়নি। তাই কোন কোন লেখক রাষ্ট্রপূর্ব অবস্থায় কতকগুলি 'তথাকথিত' অধিকারকে স্বাভাবিক অধিকার বলে আখ্যা দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ স্বাভাবিক অধিকার বলে সমাজজীবনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ অধিকারগুলিকে স্বাভাবিক অধিকার বলে অভিহিত করেছেন।

স্বাভাবিক অধিকার সুনির্দিষ্ট নয়

(২) কোন অধিকারই সহজাত ও চিরন্তন হতে পারে না। কারণ অধিকারের ধারণা একটি সামাজিক ধারণা মাত্র। সমাজ প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে। গতিশীল সমাজে স্থিতিশীল ও চিরন্তন অধিকার বলে কোন কিছু থাকতে পারে না। একসময় দাস মালিকরা ক্রীতদাসদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে সংরক্ষণের অধিকারকে তাদের স্বাভাবিক অধিকার বলে মনে করত। বর্তমানে এই অধিকারের কল্পনাই করা যায় না।

অধিকার কখনই সহজাত ও চিরন্তন হতে পারে না

(৩) অবাধ অধিকার বলে কোন অধিকার হতে পারে না; অবাধ অধিকার উচ্ছৃঙ্খলার নামান্তর মাত্র। স্বাভাবিক অধিকারকে অবাধ বলে ঘোষণা করে যাঁরা সর্বপ্রকার রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে উপেক্ষা করার কথা বলেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে অধিকারের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেননি। কারণ একের অবাধ অধিকারের অর্থ অপরের অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়া। এর ফলে মুষ্টিমেয় সবল ও অর্থশালী ব্যক্তির প্রাধান্যই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাদের অধিকারই কার্যতঃ রক্ষিত হয়। এরূপ অধিকারকে তাই নীতিগতভাবে সমর্থন করা যায় না।

অধিকার অবাধ নয়

(৪) এই মতবাদের কোন কোন সমর্থক মনে করেন যে, স্বাভাবিক অধিকার প্রাক্-সামাজিক এবং প্রাক্-রাজনৈতিক অবস্থায় বিরাজমান ছিল। কিন্তু সমাজ-নিরপেক্ষ এবং রাষ্ট্রনিরপেক্ষ অধিকার বলে কোন অধিকারই থাকতে পারে না। তাই হল্যান্ড বলেছেন, অধিকার সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের আইন দ্বারা সৃষ্ট বা স্বীকৃত। বোসাংকোয়েত (Bosanquet) মনে করেন যে, রাষ্ট্রনিরপেক্ষ অধিকারের কথা কল্পনা করা যায় না। তাই বেন্থাম প্রমুখ হিতবাদিগণ এই অভিমত পোষণ করেন যে, অধিকার হোল সমাজস্বীকৃত দাবি। তাই সমাজনিরপেক্ষ কোন অধিকার থাকতে পারে না।

অধিকার সমাজ ও রাষ্ট্রনিরপেক্ষ হতে পারে না

(৫) অনেক সময় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা স্বাভাবিক অধিকার সংরক্ষণের অজুহাতে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধিকে সংকুচিত করার কথা ঘোষণা করেন। জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে, যেসব কার্যের ফলাফল কেবলমাত্র ব্যক্তিকে স্পর্শ করে সেইসব কাজ করার অধিকার ব্যক্তির স্বাভাবিক অধিকার। এইসব অধিকারে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা রাষ্ট্রের নেই। কিন্তু সমাজে এমন কতকগুলি কাজ আছে যা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হলেও তার ফল সমগ্র সমাজকে ভোগ করতে হয়, যেমন—মদ্যপান করলে কেবলমাত্র ব্যক্তিগতভাবে মদ্যপায়ীরই ক্ষতি হয় না, সামগ্রিকভাবে সমাজও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং, আত্মকেন্দ্রিক অধিকার বলে কোন অধিকার থাকতে পারে না। তাই সর্বক্ষেত্রেই অধিকারের উপর কাম্য নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আত্মকেন্দ্রিক কাযের ধারণা ভ্রান্ত

(৬) মার্কসবাদীরা স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্বকে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক মতবাদ বলে সমালোচনা করেন। স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ সমাজের মুষ্টিমেয় শোষকশ্রেণীর অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া। স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব অধিকারকে শ্রেণী-সম্পর্কের দৃষ্টিতে বিচারবিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

মার্কসবাদীদের সমালোচনা

[২] **অধিকার সম্বন্ধে আইনগত মতবাদ** (**Legal Theory of Rights**) **:** অধিকার সম্বন্ধে আইনগত মতবাদটি সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে একাত্মবাদী তত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। স্বাভাবিক অধিকার তত্ত্বের প্রতিবাদ হিসেবে এই মতবাদটি জন্মলাভ করে।

অধিকার সম্বন্ধে আইনগত মতবাদ অনুসারে মানুষের কোন অধিকার থাকতে পারে না। রাষ্ট্র তথা সমাজনিরপেক্ষ অধিকারের ধারণাও অলীক। এই তত্ত্বের প্রবক্তারা মনে করেন যে, অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট ও রক্ষিত হয়। রাষ্ট্রই অধিকারের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দেয়। সমস্ত অধিকারের উৎস হোল রাষ্ট্র। তাই অধিকার কখনই রাষ্ট্র-পূর্ববর্তী (Prior to the State) হতে পারে না। রাষ্ট্রই তার আইনগত কাঠামোর মধ্যে নাগরিকদের কতকগুলি সুযোগসুবিধা প্রদান করে যেগুলিকে অধিকার বলে অভিহিত করা হয়। আইনের সাহায্যে রাষ্ট্র অধিকার সংরক্ষণ করে। এই মতবাদ অনুসারে যেহেতু অধিকার আইন কর্তৃক সৃষ্ট ও সংরক্ষিত হয়, সেহেতু আইনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অধিকারেরও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং অবাধ ও চিরন্তন বলে কোন অধিকার থাকতে পারে না।

আইনগত মতবাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়

সমালোচনা : অধিকারের আইনগত ধারণাটিকে নানাভাবে সমালোচনা করা হয়।

(ক) ল্যাস্কি প্রমুখ বহুত্ববাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এই মতবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, রাষ্ট্র কখনই অধিকার সৃষ্টি করতে পারে না। তা কেবল অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় মাত্র। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাগরিকদের কোন অধিকার থাকতে পারে না—আইনবিদদের এই যুক্তিকেও তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, অধিকার হোল এমন একটি সামাজিক অবস্থা যা ছাড়া মানুষ পরিপূর্ণভাবে তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশ সাধন করতে

বহুত্ববাদীদের সমালোচনা

পারে না। তিনি আরও বলেন যে, কেবলমাত্র রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবেই ব্যক্তি তার অধিকার ভোগ করতে পারে—একথাও সত্য নয়। রাষ্ট্র ছাড়াও সমাজে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকার সংগঠন তার ব্যক্তিত্ববিকাশের উপযোগী সুযোগসুবিধা সৃষ্টি করে। তাঁর মতে, আইন এককভাবে কখনই অধিকারের উৎস হতে পারে না। অধিকারের প্রকৃত উৎস হোল আমাদের ভালমন্দ (right and wrong) সম্পর্কিত ধারণা। কেবলমাত্র রাষ্ট্রের ইচ্ছার উপর তথা আইনের উপর নির্ভর করে ব্যক্তি তার সভ্য জীবনযাপনের উপযোগী অধিকারসমূহ ভোগ করতে পারে না।

(খ) মার্কসবাদীদের মতে, ধনবৈষম্যমূলক সমাজে রাষ্ট্র যেহেতু শোষকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে সেইহেতু রাষ্ট্রের আইনও প্রকৃতিগতভাবে বৈষম্যমূলক হতে বাধ্য। এরূপ বৈষম্যমূলক আইন কখনই জনগণের অধিকার সংরক্ষণ করতে পারে না। বস্তুতঃ, সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজের আইন সামন্তপ্রভুদের এবং ধনতান্ত্রিক সমাজের আইন পুঁজিপতিদের অধিকার রক্ষা করে মাত্র। এইসব আইন কখনই শোষিত জনগণের অধিকার রক্ষা করতে পারে না।

মার্কসবাদীদের সমালোচনা

(গ) অধিকারের আইনগত তত্ত্ব রাজনৈতিক দর্শনের (Political Philosophy) উদ্দেশ্য যথাযথভাবে পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে সমালোচকরা মনে করেন। ল্যাস্কির মতে, বিশুদ্ধ আইনগত মতবাদ রাজনৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারেনি। কারণ এই মতবাদ সেইসব অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বলে না যেগুলিকে স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন।

রাজনৈতিক দর্শনের উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থতা

উপরি-উক্ত সমালোচনা সত্ত্বেও আইনগত মতবাদের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। বার্কারের মতে, এই মতবাদ রাষ্ট্রকে অধিকারের উৎস বলে বর্ণনা করে বাস্তব সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে। তবে, এই মতবাদের সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি হোল এই যে, একটিমাত্র উৎসকে অধিকারের একক উৎস বলে বর্ণনা করে এই মতবাদের সমর্থকরা অতিরঞ্জনদোষে দুষ্ট হয়েছেন।

[৩] অধিকার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মতবাদ (Historical Theory of Rights) : 'ইতিহাস অধিকার সৃষ্টি করেছে' অর্থাৎ অধিকার ইতিহাসের সৃষ্টি—এই ধারণা হোল অধিকার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মতবাদের প্রধান বক্তব্য। এই মতবাদের প্রবক্তাগণ একথা প্রচার করেন যে সমাজে সুদীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত প্রথাসমূহই কালক্রমে অধিকারে রূপান্তরিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন ব্যক্তি যদি পর পর কয়েক বৎসর ধরে তার বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে জন্মদিনে উপহার লাভ করে, তাহলে সে জন্মদিনে উপহার পাওয়াকে তার অধিকার বলে মনে করে। এইভাবে উপহার প্রদানের নিছক প্রথা কালক্রমে পূর্ববর্ণিত ব্যক্তির অধিকারে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে পথ চলার অধিকারও একটি প্রথাভিত্তিক অধিকার। ঐতিহাসিক মতবাদ অনুসারে প্রথার প্রতি আসক্তি থেকেই মানুষের স্বাভাবিক অধিকারবোধের ধারণা জন্মলাভ করে। বংশপরম্পরায় কোনো একটি প্রথাকে মানা করা হলে সেই

ঐতিহাসিক মতবাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়

প্রথাটিকে মানুষ অভ্যাসবশতঃ স্বাভাবিকভাবেই মেনে চলে। এইভাবে প্রথাটি কালক্রমে মানুষের অধিকারে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং অধিকারকে নতুনভাবে তৈরি করার কিংবা প্রবর্তন করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

এডমন্ড বার্ক (Edmund Burke) এই অভিমত পোষণ করেন যে, মানুষের বিমূর্ত অধিকার (abstract rights of man)-এর উপর ভিত্তি করে ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু ইংল্যান্ডে বিপ্লব ঘটেছিল ইংরেজদের প্রথাগত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। বস্তুতঃ, সুদীর্ঘকাল ধরে ইংরেজরা যে-সব অধিকার ভোগ করত সেগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তারা সংগ্রাম করেছিল। এই সংগ্রামের ফলে 'অধিকারের সনদ' (Magna Carta) এবং 'অধিকার সম্বন্ধীয় আবেদনপত্র' (Petition of Rights) গৃহীত হয়।

সমালোচনা ঃ অধিকার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মতবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয় যে, বেশ কিছু সংখ্যক অধিকার সুদীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত প্রথা থেকে সৃষ্টি হলেও সব অধিকার প্রথাভিত্তিক—একথা মেনে নেওয়া কষ্টকর।

অধিকারের উৎস কেবলমাত্র প্রথা নয়

হকিং (Hocking)-এর মতে, একসময় বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু ক্রীতদাস প্রথা কখনই অধিকারে রূপান্তরিত হয়নি। বস্তুতঃ, ক্রীতদাস রাখার অধিকার আপেক্ষিক অধিকারের ধারণা মাত্র। অর্থাৎ, এক সময় ক্রীতদাস রাখার অধিকার দাস-মালিকদের থাকলেও মানুষের নৈতিক ধারণা সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ক্রীতদাস প্রথাকে কেউই অধিকার বলে স্বীকার করে নিতে সম্মত নন।

দ্বিতীয়তঃ, অধিকারকে প্রথাভিত্তিক করে গড়ে তোলা হলে সমাজসংস্কার করা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। কারণ সমাজে প্রচলিত কু-প্রথাগুলিকে বিলোপ করার জন্য যদি সরকার কোন আইন প্রণয়নের চেষ্টা করে, জনগণ সাধারণতঃ সেই আইনের বিরোধিতা করে। অবশ্য বিবেকবান ও প্রগতিশীল মানুষমাত্রেই এরূপ আইনকে স্বাগত জানাতে দ্বিধাবোধ করে না।

সংস্কারমূলক আইন প্রণয়নে বাধার সৃষ্টি

[৪] অধিকার সম্বন্ধে আদর্শবাদী তত্ত্ব (Idealist Theory of Rights) ঃ অধিকার সম্বন্ধে আদর্শবাদী তত্ত্বকে অনেকে ব্যক্তিত্ব তত্ত্ব (Personality Theory) বলে অভিহিত করেন। এই মতবাদ অনুসারে, মানুষের আভ্যন্তরীণ বিকাশের জন্য কতকগুলি অপরিহার্য বাহ্যিক অবস্থা বা পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন। এই বাহ্য পরিবেশ সৃষ্টিকেই আদর্শবাদী তত্ত্বের প্রবক্তারা অধিকার বলে বর্ণনা করেন।

আদর্শবাদী তত্ত্বের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়

হেনরীসি (Henrici)-র মতে, অধিকার হোল মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের এবং ব্যক্তিত্বের বিশুদ্ধতা সংরক্ষণের উপযোগী বাহ্যিক পরিবেশ (material conditions)। অন্যভাবে বলা যায়, আদর্শবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষের ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টিকেই আদর্শবাদীরা অধিকার বলে বর্ণনা করেছেন। এই মতবাদ ব্যক্তিসত্তার বিকাশের অধিকারকে (Right to personality) মানুষের মৌলিক অধিকার বলে বর্ণনা করেছে। অন্যান্য সব অধিকার এই অধিকার থেকেই উৎপত্তি হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির

অধিকার ইত্যাদিকে বিচার করা হবে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশে তাদের অবদানের কষ্টিপাথরে। কেউ যদি তার ব্যক্তিত্ববিকাশে ঐ সব অধিকারের অপব্যবহার করে, তাহলে সমাজ তাকে তার সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে।

সুতরাং আদর্শবাদী তত্ত্বের দৃষ্টিতে অধিকারকে তিনটি দিক থেকে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, সমাজের মধ্য থেকেই অধিকারের উৎপত্তি এবং অধিকারগুলি মানুষের প্রকৃতির মধ্যে যেহেতু নিহিত থাকে সেইহেতু মানুষ নিজের মঙ্গলের জন্যই অধিকার কামনা করে। বলা বাহুল্য, মানুষ নিজের কল্যাণ চায় বলেই অপরের কল্যাণ সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, প্রতিটি অধিকারের সঙ্গে কর্তব্যবোধও জড়িত থাকে। অর্থাৎ একজনের আত্মবিকাশের অধিকার ভোগের অর্থ অপরের কর্তব্য পালন। আবার অপরের আত্মবিকাশের অধিকারের বাস্তব রূপায়ণ নির্ভর করে আমার কর্তব্য পালনের উপর। তৃতীয়তঃ, ব্যক্তির অধিকারসমূহ তার পূর্ণাঙ্গ আত্মবিকাশের মৌলিক অধিকারের অধীন। প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে সহায়তা করা সামগ্রিকভাবে সমাজের কর্তব্য। ব্যক্তির কোন একটি অধিকার যদি এই উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয় তাহলে সমাজ সেই ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে। সংক্ষেপে বলা যায়, প্রত্যেকের আত্মবিকাশের অধিকার সমাজস্থ অন্যান্য ব্যক্তির আত্মবিকাশের অধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। তাই অধ্যাপক ল্যাস্কি মন্তব্য করেছেন, বস্তুতঃ অধিকার হোল সমাজজীবনের এমন-কতকগুলি সুযোগসুবিধা যেগুলি ছাড়া সাধারণভাবে কোন ব্যক্তিই তার পরিপূর্ণ আত্মবিকাশ করতে সক্ষম হয় না।

অধিকারের তিনটি অর্থ

অধিকারের আদর্শবাদী তত্ত্ব নৈতিক দিক থেকে অধিকারকে আলোচনা করে। প্রত্যেকেই নীতিগত কারণে সমাজের কাছ থেকে অধিকারকে দাবি করতে পারে। অধিকারের ধারণা 'মানুষের মন বা আত্মা'র (Mind or Soul of man) মধ্যেই নিহিত থাকে। এইভাবে আদর্শবাদী তত্ত্ব অধিকারের আইনগত দিক অপেক্ষা নৈতিক দিকের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। তাছাড়া ব্যক্তির আত্মবিকাশের অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলে বর্ণনা করে এই মতবাদ ব্যক্তিকে সমাজের যূপকাষ্ঠে বলিদান করেনি।

গুরুত্ব

সমালোচনা : কিন্তু এই মতবাদ নৈতিক স্বাধীনতার মান (standard) নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশে উপযোগী পরিবেশ কি—এই মতবাদের প্রচারকরা এর কোন সঠিক ও সুনির্দিষ্ট উত্তর দিতে পারেননি। গান্ধীজীর মতে, সত্য ও অহিংসা (Truth and non-Violence) হোল ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের একমাত্র পথ। কিন্তু অনেকে হিংসার পথকেই ব্যক্তিত্ব বিকাশের একমাত্র পথ বলে মনে করেন। সুতরাং এ বিষয়ে কোন সর্ববাদী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অদ্যাবধি সম্ভব হয় নি। তাই মতবাদটি বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

[৫] **অধিকারের মার্কসীয় তত্ত্ব (Marxist Theory of Rights) :** মার্কসবাদীরা সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অধিকার তত্ত্বকে আলোচনা করেছেন। অধিকার

সম্পর্কিত মার্কসীয় মতবাদের উৎপত্তি, রাষ্ট্র ও আইন সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। মার্কসের মতে, রাষ্ট্র এবং আইন ইতিহাসের এক বিশেষ অধ্যায়ে জন্মলাভ করে। মার্কসবাদীরা সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থাকে ভিত বলে বর্ণনা করে রাষ্ট্র, আইন ইত্যাদিকে উপরিকাঠামো (Super-structure) বলে অভিহিত করেন। উৎপাদন ব্যবস্থার উপর যে-শ্রেণীর প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি বিদ্যমান থাকে রাষ্ট্রযন্ত্রও সেই শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। শাসকশ্রেণী নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজেদের মনোমত আইন প্রণয়ন করে এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সেই আইনকে কার্যকরী করে। মার্কসবাদীদের মতে, এই আইন কখনই শ্রেণীস্বার্থ-নিরপেক্ষ হতে পারে না। অন্যভাবে বলা যায়, অর্থনৈতিক দিক থেকে সুবিধাভোগী শ্রেণী রাজনৈতিক দিক থেকেও বিশেষ সুযোগসুবিধা বা অধিকার ভোগ করে। আইন ও রাষ্ট্র সেই শ্রেণীর বিশেষ অধিকার রক্ষার চেষ্টা করে। শ্রেণীবৈষম্যমূলক সমাজে আইন কখনই আপামর জনসাধারণের অধিকার রক্ষা করে না, রক্ষা করতে পারে না। তা কেবলমাত্র সমাজের প্রভুত্বকারী সংখ্যালঘু শ্রেণীর অধিকার রক্ষা করে মাত্র। ল্যাস্কিও মার্কস-বাদীদের মতই একথা স্বীকার করেছেন। সুতরাং রাষ্ট্রীয় আইন কেবলমাত্র সম্পত্তিশালী শ্রেণীর অধিকারকেই সংরক্ষণ করে মাত্র। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সামন্ততান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্র সামন্তপ্রভুদের স্বার্থে পরিচালিত হোত বলে সেই সমাজের আইন মুষ্টিমেয় সামন্ত প্রভুদের সম্পত্তির উপর বিশেষ অধিকার সংরক্ষণ করত। ধনতান্ত্রিক সমাজে আইন পুঁজিপতি শ্রেণীর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তাদের স্বার্থের উপযোগী কতকগুলি বিশেষ অধিকার রক্ষা করে মাত্র। সুতরাং শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অধিকার কখনই জনগণের অধিকার হতে পারে না : তা মুষ্টিমেয় শাসকশ্রেণীর অধিকার মাত্র ; অনেক সময় অবশ্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও জনগণকে কিছু কিছু অধিকার প্রদান করা হয়। তবে এই অধিকারগুলি মূলতঃ পৌর অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার। এইসব অধিকার প্রদান করার অর্থ কিন্তু জনগণের ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশসাধন নয়। কারণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য বজায় রেখে কখনই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বার্কার বলেন, অর্থনৈতিক দিক থেকে পরাধীন শ্রমিক কখনই রাজনৈতিক দিক থেকে স্বাধীন হতে পারে না। বস্তুতঃ এই-সব অধিকার প্রদান করে একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশের বাতাবরণ সৃষ্টি করে জনগণকে ধাপ্পা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। অনেক সময় আবার কোন কোন বুর্জোয়া রাষ্ট্রে সামাজিক কল্যাণমূলক আইন প্রণয়ন করে জনগণের 'তথাকথিত' অধিকার রক্ষার কথা ঘোষণা করা হয়। আসলে এরূপ অধিকার প্রদান করে শোষকগোষ্ঠী একদিকে যেমন গণবিক্ষোভকে প্রশমিত করার চেষ্টা করে, অন্যদিকে তেমনি বৃহত্তর শ্রেণীস্বার্থে শোষিত শ্রেণীকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা চালানো হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ধনতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে মানুষের পবিত্র অধিকার বলে বর্ণনা করে এই অধিকারের উপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করা হয়। প্রকৃত অর্থে এই অধিকারের স্বীকৃতির দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্পত্তিহীন সাধারণ মানুষের কোন লাভই হয় না। আসলে বুর্জোয়া স্বার্থকে রক্ষা করার এ এক অভিনব চক্রান্ত। আবার

মার্কসীয় অধিকার তত্ত্বের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়

প্রতিটি বুর্জোয়া রাষ্ট্রেই মানুষের জীবনের অধিকার (Right to Life) অলঙ্ঘনীয় বলে বর্ণনা করা হয়। এর পেছনেও শোষক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার প্রচেষ্টা নিহিত। কারণ মানুষের জীবনের অধিকার না থাকলে শক্তিশালী ও ধনশালী পুঁজিপতিগণ কর্তৃক সাধারণ শ্রমিকদের জীবন বিনষ্ট হবে। ফলে এমন এক সময় আসবে যখন উৎপাদন ব্যবস্থা চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমিক পাওয়া যাবে না। সুতরাং পুঁজিপতিদের নিজেদের বৃহত্তর স্বার্থে এই অধিকারটি স্বীকার করে নেওয়া তাদের একান্ত প্রয়োজন। এইভাবে বলা যায়, বৈষম্যমূলক সমাজে অধিকার কখনই শ্রেণী-স্বার্থ-নিরপেক্ষ হতে পারে না। কেবলমাত্র শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজেই অধিকার সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার বলে বিবেচিত হতে পারে। এরূপ সমাজে সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জনগণ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি অধিকার যথার্থভাবেই ভোগ করতে পারে।

৪। বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় অধিকার (Rights in different Social Systems)

উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তিতে সমাজব্যবস্থা যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান অবস্থায় পেঁাছেছে। বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিতেই অধিকারের প্রকৃতি অতীতে নির্ধারিত হোত এবং বর্তমানেও নির্ধারিত হয়। সমাজ-বিকাশের বিভিন্ন স্তরে আমরা যথাক্রমে আদিম সাম্যবাদী সমাজ, দাস-সমাজ, সামন্ত-সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ দেখেছি। প্রতিটি সমাজেই অধিকার প্রদত্ত হোত প্রচলিত উৎপাদন-সম্পর্কের ভিত্তিতে। তাই অধিকারের ধারণাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা-নির্ভর বলে মনে করা হয়। অধিকার কখনই সমাজ-নিরপেক্ষ হতে পারে না।

অধিকার সমাজ-নিরপেক্ষ হতে পারে না

আদিম সাম্যবাদী সমাজে উৎপাদনের উপাদানগুলির মালিক ছিল সমগ্র সমাজ। সেই সমাজের সকল সভ্য একসঙ্গে কাজ করত এবং উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী সকলেই একসঙ্গে ভোগ করত। সমাজে কোনপ্রকার শ্রেণীবৈষম্য ও শ্রেণীশোষণ না থাকায় অধিকারভোগী ও অধিকারহীন মানুষের কোন ভেদাভেদ ছিল না। সমাজে নারীপুরুষ সমমর্যাদার অধিকারী ছিল।

আদিম সাম্যবাদী সমাজে অধিকার

কিন্তু আদিম সাম্যবাদী সমাজের পরবর্তী স্তরে অর্থাৎ দাস সমাজে উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তন সাধিত হওয়ার ফলে প্রয়োজন হোল এমন এক শ্রেণীর মানুষের, যারা খাওয়া-থাকার পরিবর্তে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকদের জন্য পরিশ্রম করবে, অথচ সমান অধিকার দাবি করবে না। উৎপাদনের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে ক্রীতদাসদের উৎপাদনের কাজে লাগানো হতে লাগল। সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ল দাস-মালিক এবং দাসে, অর্থাৎ শোষক এবং শোষিতে। এরূপ দাস-সমাজব্যবস্থায় দাস-মালিকরা উৎপাদনের সমস্ত উপাদানের, এমন কি উৎপাদনকারী দাসদেরও মালিক ছিল। তারা দাসদের পশুর মত ক্রয়-বিক্রয় করতে পারত। এমন

দাস-সমাজে অধিকার

কি তাদের যে-কোন সময়ে খেয়ালখুশী মত হত্যাও পর্যন্ত করতে পারত। এই যুগে রাষ্ট্র দাস-মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করত। দাস-সমাজে দাসদের কোন প্রকার সামাজিক বা রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। তারা ছিল মালিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সমাজে তাদের মানুষ বলে গণ্য করা হোত না। স্বাভাবিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা তথা রাজনীতিতে তাদের অংশগ্রহণের প্রশ্ন ছিল অবান্তর। সমাজে সর্বপ্রকার অধিকার ভোগ করত কেবলমাত্র দাস-মালিকরা।

সামন্ত-সমাজে অধিকার

তারপর উৎপাদন ব্যবস্থার দ্রুত বিকাশের ফলে এক সময় দাস-ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। আবির্ভাব ঘটে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের। এই সমাজে সামন্ত অর্থাৎ জমিদার হোল জমির মালিক আর কৃষক হোল তার অধীনতাবদ্ধ মানুষ। এখানেও রাষ্ট্র-শক্তি পরিচালিত হোত সামন্তদের স্বার্থে। কৃষকদের তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের কোন প্রকার অধিকারকেই তখন স্বীকৃতি দেওয়া হোত না। অত্যাচারী সামন্ত ও রাজাদের অবাধ শোষণের বিরুদ্ধে যাতে সাধারণ মানুষ রুখে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য প্রচার করা হোত যে, রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা চলছে। তাই রাষ্ট্র কিংবা রাজার বিরুদ্ধে জনগণের কোন অধিকারই থাকতে পারে না। সমাজের সবকিছু অধিকার পাওয়ার অধিকারী হোল একমাত্র অভিজাত শ্রেণী। এঁদের অধিকার হোল বিধিদত্ত অধিকার। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১২১৫ সালের ১৫ই জুন ইংল্যাণ্ডের সামন্তরা রুনীমিড নামক স্থানে সমবেত হয়ে রাজা জনের নিকট তাদের অধিকারের দাবি সম্বলিত 'মহাসনদ' (Magna Carta) পেশ করে। এই 'মহাসনদ'কে জনগণের অধিকারের সনদ বলে যতই প্রচার করা হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তা ছিল চরম রাজশক্তির ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে ভূম্যধিকারী ও যাজক সম্প্রদায়ের শ্রেণী-স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে প্রদত্ত কতকগুলি অধিকার। মহাসনদে বর্ণিত অধিকারগুলি কেবলমাত্র স্বাধীন মানুষরাই ভোগ করতে পারত। সামন্ত-সমাজে যেহেতু কেবলমাত্র ভূস্বামী ও যাজকরা স্বাধীন বলে বিবেচিত হোত, সেহেতু ঐ সব অধিকার কেবলমাত্র তারাই ভোগ করত। সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক ও নারী জাতি তা থেকে বঞ্চিত থাকত।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অধিকার

সমাজ পরিবর্তনের এক বিশেষ স্তরে এসে সামন্ততন্ত্রের পরিবর্তে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা প্রাধান্যলাভ করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিরোধ দেখা দেয় সামন্ত শ্রেণীর সঙ্গে। ইউরোপের ইতিহাসে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এর প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। রেনেসাঁ, রিফরমেশন, বাণিজ্য-বিপ্লব ও শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইউরোপের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তার জগতে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়। উদীয়মান মধ্যবিত্তশ্রেণী প্রচার করে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার গণতান্ত্রিক আদর্শ। ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ, ঐশ্বরিক অধিকারবাদ এবং স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামের শেষে প্রতিষ্ঠিত হয় গণতান্ত্রিক অধিকারের আদর্শ। ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম গণতন্ত্রের তোরণ-দ্বার উন্মোচিত করে। রুশো প্রমুখ দার্শনিকরা জনগণের সার্বভৌমিকতাকে স্বীকৃতি দেন। তাঁরা একথা প্রচার করেন যে,

প্রতিটি মানুষের এমন কতকগুলি মৌলিক অধিকার আছে যেগুলি অলঙ্ঘনীয়। জন্মসূত্রে কেউ অভিজাত বা অভাজন হয় না। রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সমান অধিকার সকলের আছে।

সমাজবিকাশের এই স্তরে মানুষের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃতিলাভ করল। বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নাগরিকরা যে-সব অধিকার ভোগ করে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল জীবনের অধিকার, সামাজিক সাম্যের অধিকার, চিন্তা ও মতপ্রকাশের অধিকার, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, ধর্মের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, ভোটদানের অধিকার, নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, সরকারী কার্যে নিযুক্ত হওয়ার অধিকার ইত্যাদি। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কর্মের অধিকার, উপযুক্ত পারিশ্রমিকের অধিকার, অবকাশ যাপনের অধিকার, বৃদ্ধ ও অক্ষম অবস্থায় রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিপালিত হওয়ার অধিকার ইত্যাদি অর্থনৈতিক অধিকারগুলিকে আদৌ স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। অথচ অর্থনৈতিক অধিকার ছাড়া রাজনৈতিক অধিকারগুলি তত্ত্বসর্বস্ব নীতিকথায় পর্যবসিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও যদি মানুষকে বেকারত্বের জ্বালায় জ্বলতে হয়, অন্নসংস্থানের প্রয়োজনে অহরহ যদি তাকে ঘুরে বেড়াতে হয়, তা হলে তার কাছে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলি মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তাই বার্কার বলেছেন, অর্থনৈতিক দিক থেকে পরাধীন শ্রমিক কখনই রাজনৈতিক দিক থেকে স্বাধীন হতে পারে না। বস্তুতঃ, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের যথার্থ রূপদানের প্রয়োজনে অর্থনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিতে অর্থনৈতিক অধিকারসমূহের আদৌ স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলিকেই কেবলমাত্র স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

কেবলমাত্র সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি

কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সামগ্রিক সঙ্কট শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিতেও জনসাধারণ বাস্তবে সংবিধান-প্রদত্ত অধিকারগুলি ভোগ করতে পারে না। "ধনিক রাষ্ট্রে জনসাধারণ স্বাধীন আবহাওয়ায় মতামত গঠন ও তা প্রকাশের সুযোগ পায় না। ধনিকের স্বার্থ-বিরোধী মতপ্রচারে সহস্র অসুবিধার সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। এই অবস্থার মধ্যে সত্যকার জনমত গঠন কিংবা ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য।" বস্তুতঃ, ধনবৈষম্যমূলক সমাজে জনমত গঠন ও প্রচারের মাধ্যমগুলি ধনিক শ্রেণীর কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হওয়ার ফলে প্রকৃত জনমত গঠিত হতে পারে না। তাছাড়া, মিথ্যা প্রচারকৌশলে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে ধনিকশ্রেণী নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থের উপযোগী মতামতকেই জনমত বলে প্রচার করে। আর প্রকৃত জনমত গঠিত ও প্রকাশিত না হলে জনগণের রাজনৈতিক অধিকার মূল্যহীন হয়ে পড়তে বাধ্য। পুঁজিবাদী সংকট যতই তীব্রতর আকার ধারণ করে বিভিন্ন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে ততই সভা-সমিতি অনুষ্ঠান, রাজনৈতিক দল গঠন ইত্যাদির উপর নানা প্রকার বিধিনিষেধ আরোপ করে সরকারের সমালোচনার পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। এই ভাবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক

রাষ্ট্রগুলিতে নয়া-ফ্যাসীবাদ আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে। ফলে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি পদদলিত হতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫০ সালে গৃহীত 'ম্যাক্‌ক্যারান আইন' (Maccarran Law)-এর কিংবা ভারতবর্ষে 'মিসা' আইনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমোক্ত আইনের সাহায্যে টেলিফোনে কথোপকথন এবং ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের যোগাযোগের উপর পুলিসী নিয়ন্ত্রণ বৈধ করা হয়। ভারতবর্ষে 'মিসা' আইনের সাহায্যে যে-কোন ব্যক্তিকে সরকার বিনা বিচারে আটক করে রাখতে পারত। এইভাবে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় কার্যতঃ জনসাধারণ ততদিন পর্যন্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারসমূহ ভোগ করতে পারে যতদিন পুঁজিবাদীদের স্বার্থ পুরোপুরি সংরক্ষিত থাকে। কিন্তু তাদের স্বার্থে আঘাত লাগলেই মানুষের এইসব অধিকার পদদলিত হয়।

পুঁজিবাদের সংকট শুরু হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন, গণসাধারণতন্ত্রী চীন প্রভৃতি দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এরূপ সমাজব্যবস্থায় শ্রেণীশোষণের অবলুপ্তি ঘটায় শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্বও বিলুপ্ত হয়। বুর্জোয়া সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে একটি পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় অধিকার বলে মনে করা হয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনের উপাদানসমূহের উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের বিলোপ সাধন করা হয়। বুর্জোয়া সমাজে কেবলমাত্র রাজনৈতিক এবং কিছু পরিমাণে সামাজিক অধিকার স্বীকৃতি লাভ করলেও অর্থনৈতিক অধিকারসমূহ উপেক্ষিত হয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারসমূহকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং অর্থনৈতিক অধিকারসমূহকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণসাধারণতন্ত্রী চীনে জনগণের কর্মের অধিকার, বিশ্রাম ও অবকাশ যাপনের অধিকার, বার্ধক্য, অসুস্থতা ও অক্ষম অবস্থায় রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিপালিত হওয়ার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, সাম্যের অধিকার, ধর্মাচরণের অধিকার, সংঘ গঠনের অধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার ইত্যাদি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবে নাগরিকদের অধিকার এমনভাবে ভোগ করতে হবে যাতে অধিকার ভোগের প্রবণতা সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনের সহায়ক হয়। বস্তুতঃ, সমাজতান্ত্রিক সমাজে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এক সূত্রে গ্রথিত হলেও অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে অধিকারগুলি কেবলমাত্র জনগণকে তত্ত্বগতভাবে প্রদান করা হয়নি, সেগুলির বাস্তব রূপায়ণেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে অধিকারের প্রকৃতি

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভিত্তিতে জনগণের অধিকার স্বীকৃতিলাভ করে। শ্রেণীবৈষম্যমূলক সমাজে রাষ্ট্র জনগণকে এমন কোন অধিকার প্রদান করে না যা প্রভুত্বকারী শ্রেণীর স্বার্থ-বিরোধী। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণী-শোষণ না থাকায় জনগণ প্রকৃতপক্ষে অধিকার-সম্পন্ন মানুষ হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে।

৫। সম্পত্তির অধিকার (Right to Property)

সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে বিরোধের অন্ত নেই। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার থাকা উচিত কিনা—এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে পরস্পর-বিরোধী দুটি আধুনিক মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। এই দুটি মতবাদ হোল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ; ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে, সম্পত্তির অধিকার হোল মানুষের জন্মগত অধিকার। এই অধিকার ছাড়া মানুষের ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ-সাধন কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি সমাজে শোষণ, অত্যাচার ও লাঞ্ছনাবঞ্চনার সর্বপ্রধান উৎস। এই অধিকার স্বীকৃত হওয়ার অর্থ সমাজে ধনবৈষম্যকে স্বীকৃতি দেওয়া। ধনবৈষম্যমূলক সমাজে সংখ্যালঘু ধনীদের দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র জনসাধারণ শোষিত হয়। তাই সমাজতন্ত্রবাদিগণ, বিশেষতঃ মার্কসবাদিগণ, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের বিলোপ সাধনের কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে পরস্পর-বিরোধী দু'টি মত

[১] **বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার (Right to Private Property in different Social Systems) :**

ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ধারা বর্ণনা করতে গিয়ে কার্ল মার্কস (Karl Marx) ও তাঁর অনুগামীরা ক্রমবিকাশের স্তরকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। আদিম সাম্যবাদী সমাজে কোনপ্রকার ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব ছিল না। এ প্রসঙ্গে মার্কস বলেন, "আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় উৎপাদন-সম্পর্কের মূল ভিত্তি ছিল,—উৎপাদনের উপাদানগুলির মালিক গোটা সমাজ। পাথরের হাতিয়ার ও পরবর্তীকালে তীর-ধনুক নিয়ে একাকী ব্যক্তিগতভাবে প্রাকৃতিক শক্তি ও হিংস্র প্রাণীদের মোকাবিলা করা অসম্ভব ছিল। বন্য ফল সংগ্রহ করতে মাছ ধরতে, যে-কোনো প্রকার বাসস্থান তৈরি করতে মানুষ একসঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করতে বাধ্য ছিল, যদি না সে অনাহারে মরতে চাইত বা বন্য হিংস্র পশু বা প্রতিবেশী গোষ্ঠীর শিকার হতে চাইত। একসঙ্গে শ্রম করা, উৎপাদনের উপাদানের যৌথ মালিকানা, এইসব উৎপন্ন দ্রব্যের যৌথ মালিকানাই নির্দেশ করে। উৎপাদনের উপাদানে ব্যক্তিগত মালিকানার রীতি তখনও প্রচলিত হয়নি। সেখানে কোন শ্রেণীভেদ ছিল না, ছিল না শোষণ।" ঐ সমাজে শ্রেণীভেদ না থাকায় শ্রেণী-শাসনের যন্ত্র হিসেবে রাষ্ট্রেরও কোন অস্তিত্ব ছিল না।

আদিম সাম্যবাদী সমাজে সম্পত্তির স্বরূপ

সমাজ-বিবর্তনের পরবর্তী স্তরে অর্থাৎ দাস-সমাজেই সর্বপ্রথম ব্যক্তিগত সম্পত্তির রীতি চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বৃদ্ধির প্রবণতাও দেখা যায়। কিছু কিছু ব্যক্তি যে-কোন উপায়ে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করতে শুরু করে। মার্কসের ভাষায়, "বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে বিনিময় এবং তার ফলে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে সম্পদ সঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। উৎপাদন কাজে সমাজের সব সভ্যকে একযোগে ও

দাস-সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব

স্বাধীনভাবে কাজ করতে এই যুগে আর দেখা যায় না। কর্মবিমুখ দাস-মালিক কর্তৃক শোষিত দাসদের দিয়ে জোর করে কাজ করিয়ে নেওয়াই ঐ সময়ে প্রচলিত ছিল। সুতরাং এখানে উৎপাদনের উপাদান ও উৎপন্ন দ্রব্যের উপর আর যৌথ মালিকানা নেই। ব্যক্তিগত মালিকানা তার স্থান দখল করেছে। দাস-মালিকই প্রকৃত অর্থে প্রথম ও প্রধান সম্পত্তিবান।" দাস-সমাজে দাস মালিকরা উৎপাদনের উপাদান-গুলির, এমন কি উৎপাদনকারী দাসদের মালিক হয়ে উঠে। সর্বপ্রকার উৎপাদিত সামগ্রীর উপর কেবলমাত্র দাস-মালিকদের ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল।

সামন্ত সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি

এর পর সামন্ততান্ত্রিক সমাজে "জোড় বাঁধা পরিবার থেকে একপতি-পত্নীক পরিবারে রূপান্তরের পাশাপাশি ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মালিকানার রীতি প্রতিষ্ঠিত হোল।" এঙ্গেলস (Engels) বলেছেন, "জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা বিকাশের পাশে পাশেই মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছিল। তাই, এখন জমি হোল এমন একটি পণ্য যাকে বিক্রী করা যায়, বাঁধা দেওয়া যায়। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার রীতি পত্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাঁধা দেওয়ার রীতি আবিষ্কৃত হোল। এর ফলে, "একদিকে সম্পদ দ্রুত অল্পসংখ্যক লোকের হাতে জমতে ও কেন্দ্রীভূত হতে লাগল ; অপর দিকে সম্পদহীন লোকের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়তে লাগল।" সামন্ত-সমাজে সামন্ত-প্রভুরা সর্বপ্রকার সম্পত্তি ও উৎপাদনের উপাদানসমূহের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করে। তবে ভূমিদাসরা তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না। ভূমিই ছিল সামন্ত-অর্থনীতির প্রধান বুনিয়াদ এবং ঐ ভূমির উপরেই সামন্তদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি

পুঁজিবাদী সমাজে কলকারখানা, মূলধন ইত্যাদির উপর পুঁজিপতিদের একক অধিকার স্বীকৃত হয়। পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার রক্ষার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্র কাজ করতে থাকে। পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে পবিত্র বলে ঘোষণা করে আইনের সাহায্যে সেই অধিকারকে রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট হয়। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানগুলি ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে পরিচালিত হয়। প্রতিটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে স্বীকার করে নিয়ে তাকে সংরক্ষণের জন্য নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করে। এরূপ সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে পবিত্র বলে ঘোষণা করে তাকে শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে একটি পবিত্র ও মৌলিক অধিকার বলে স্বীকার করে নিয়ে কার্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রযন্ত্র পুঁজিপতিদের শোষণব্যবস্থাকেই স্থায়িত্বদানের জন্য সচেষ্ট হয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। মার্কিন শাসনতন্ত্রে বলা হয়েছে যে, 'আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি' (Due process of Law) ছাড়া কোন ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না (৫ম ও ১৪শ সংশোধন)। তাছাড়া, জনস্বার্থে ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে চাইলে সম্পত্তির

মালিককে উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে রাষ্ট্র বাধ্য থাকে। গ্রেট ব্রিটেনেও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার প্রথাগত আইনের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে। ভারতবর্ষে বর্তমানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকার বলে বিবেচিত না হলেও স্বাধীনতার পর জাতীয় সম্পদ ও উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পুঁজিপতিদের একচেটিয়া প্রাধান্য যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ; এখানেও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবস্থিতি ষোল আনাই বর্তমান রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, শোষণভিত্তিক সমাজের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য হোল ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবস্থিতি।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে সম্পত্তির অধিকারের স্বরূপ

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে কোন পবিত্র বা মৌলিক অধিকার বলে মনে করা হয় না। এই ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হোল সর্বপ্রকার শ্রেণী-শোষণ ও শ্রেণীশাসনের বিলোপ সাধন। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা যেহেতু ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে শ্রেণীশোষণ ও শ্রেণীশাসনের সর্বপ্রকার উৎস বলে মনে করে, সেহেতু সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পর তাদের কাজ হোল সম্পত্তির উপর সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত মালিকানার অবলুপ্তি সাধন। সেজন্য সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে তারা সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করে। এখানে বৈষম্যমূলক সমাজের মত পরশ্রমভোগী কোন শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকে না। 'যে কাজ করবে না, সে খেতেও পাবে না'—এই নীতির ভিত্তিতে সমাজ পরিচালিত হয়। রাষ্ট্র উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে ' ত ব সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকাশ অনুযায়ী বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সম্পত্তির প্রকৃতি বিভিন্ন হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন শাসনতন্ত্রে ঘোষণা করা হয়েছে যে, যৌথ খামার ও অন্যান্য সমবায়মূলক সম্পত্তির আকারে উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর সামাজিক মালিকানার প্রতিষ্ঠাই হোল সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান বনিয়াদ (১০নং ধারা)। এখানে ব্যক্তিগত লাভের জন্য কিংবা অন্য কোন স্বার্থপর উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তিকে কেউ ব্যবহার করতে পারে না। দেশের সমস্ত সম্পত্তির মালিক হোল রাষ্ট্র (১১নং ধারা)। অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়নে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। নাগরিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তি হোল অর্জিত আয়। দৈনন্দিন ব্যবহার্য ও ব্যক্তিগত ভোগ ও সুবিধার সামগ্রী, একটি ছোট জোতের যন্ত্র ও সাধিত্র, একটি বাড়ি ও অর্জিত সঞ্চয় সোভিয়েত নাগরিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে থাকতে পারে। নাগরিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং তার উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক রক্ষিত হয়। সুতরাং সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সম্পত্তিকে কোনভাবেই শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। গণসাধারণতন্ত্রী চীনেও উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বর্তমানে চীনে উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর 'ধরনের মালিকানা স্বীকৃতিলাভ করেছে, যথা—ক. সমগ্র জনগণের সমাজতান্ত্রিক মালিকানা এবং খ. শ্রমজীবী জনগণের সমাজতান্ত্রিক যৌথ মালিকানা (৫নং ধারা)। অর্থনীতির রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র হোল জাতীয় অর্থনীতির প্রধান পরিচালিকা শক্তি। এখানে গ্রামীণ গণ-কমিউনের অর্থনীতি হোল ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণের মালিকানাধীন যৌথ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি।

এক্ষেত্রে বর্তমানে তিন ধরনের মালিকানা রয়েছে, যথা—ক. কমিউন, খ. উৎপাদন ব্রিগেড এবং গ. উৎপাদন টিমের মালিকানা। অবশ্য গণ-কমিউনের যৌথ অর্থনীতির পূর্ণ আধিপত্য সুনিশ্চিত করে গণ-কমিউনের সদস্যগণ তাঁদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ছোট ছোট জমি চাষ করতে পারে, পারিবারিক প্রয়োজনে সীমিতভাবে অন্যান্য উৎপাদনে নিয়োজিত হতে পারে, এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তারা পশুচারণ এলাকায় সীমিত সংখ্যক গবাদি পশু রাখতে পারে (৭নং ধারা)।

[২] ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের সপক্ষে যুক্তি (Argument for Right to Private Property):

যাঁরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে পবিত্র বলে মনে করেন তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির অবতারণা করেন:

(১) জন লক্ (John Locke)-ই সর্বপ্রথম ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের সপক্ষে জোরালো বক্তব্য উপস্থিত করেন। তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে 'মানুষের স্বাভাবিক অধিকার' বলে বর্ণনা করেন। তার মতে, প্রাকৃতিক অবস্থায় (State of Nature) সবকিছুর উপর মানুষের যৌথ অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু যখন সে কোনকিছুর উপর (যেমন জমির উপর) তার শ্রমশক্তি প্রয়োগ করতে শুরু করল তখন তা তার নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত হোল। এভাবে মানুষের জীবন ও স্বাধীনতার অধিকারের মতই ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারও তার মৌলিক ও অহস্তান্তরযোগ্য বলে বিবেচিত হতে লাগল। অন্য কোন ব্যক্তি, কিংবা সরকারও কোন কারণে এবং কোন অবস্থাতেই তার এই প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না বলে লক্ ঘোষণা করেন। পরবর্তী সময়ে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীদের অনেকেই অনুরূপ যুক্তি প্রদর্শন করে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে অলঙ্ঘনীয় বলে প্রচার করেন। তাঁরা ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে চরম অধিকার বলে মনে করতেন। হবহাউস (Hobhouse), জিনসবার্গ (Ginsberg), হুইলার (Wheeler) প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ এই অভিমত পোষণ করেন যে, সমস্ত সমাজেই কোন না কোন ধরনের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার বর্তমান থাকতে দেখা যায়। সুতরাং ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্র অধিকারের স্বীকৃতি ও সংরক্ষণ করা রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য বলে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা মনে করেন।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের 'স্বাভাবিক তত্ত্ব'

(২) মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বিচারবিশ্লেষণ করে অনেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক অধিকার বলে বর্ণনা করেন। মনোবিজ্ঞানীরা এই যুক্তি দেখান যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার মানুষকে কর্মে অনুপ্রেরণা যোগায়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকলে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করতে চাইবে না। সুতরাং ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার মানুষকে নব নব কর্মে আত্মনিয়োগ করতে অনুপ্রেরণা দান করে, চূড়ান্তভাবে সে সামাজিক কল্যাণের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। প্রত্যেক ব্যক্তি যখন নিজের স্বার্থে সাধ্যমত কাজ করে তখন সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন স্বাভাবিকভাবেই আসে।

মনস্তত্ত্বের যুক্তি

(৩) ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের সমর্থকগণ বলেন যে, সম্পত্তি হোল ব্যক্তির পরিশ্রমের ফল ও পুরস্কার। সম্পত্তির অধিকারকে স্বীকার করে না নিলে রীতি-বহির্ভূত কাজ করা হবে—কারণ শ্রমকে যথাযোগ্য মূল্য দেওয়া রাষ্ট্রের নৈতিক কর্তব্য। এই অধিকার স্বীকার না করার অর্থ মানুষের গুণাবলীকে যথাযোগ্য মর্যাদা না দেওয়া। নৈতিক দিক থেকে সম্পত্তির কাজ হোল স্বাধীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবনের প্রতিষ্ঠা। সুতরাং নৈতিক দিক থেকে এই অধিকারকে স্বীকৃতি না দিলে অন্যায় করা হবে, পূর্ণ জীবনের প্রতিষ্ঠা থেকে মানুষকে বঞ্চিত করার নৈতিক অধিকার কারো নেই।

নৈতিকতার যুক্তি

বিপক্ষে যুক্তি (Arguments against) : কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের বিরুদ্ধে বর্তমানে নানা প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করা হয়।

(ক) সমালোচকদের মতে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার কখনই এবং কোনভাবেই প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক 'অধিকার' বলে বিবেচিত হতে পারে না। কারণ এই অধিকার-সহ অন্যান্য সর্বপ্রকার অধিকার সমাজবিকাশের একটি বিশেষ স্তরে 'সমাজের উপহার' (gift of society) হিসেবে প্রদত্ত হয়েছে এবং সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হওয়ার ফলেই সেগুলি অধিকারে পরিণত হয়েছে। প্রতিটি ব্যক্তি যেহেতু সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ সেহেতু সমাজের বাইরে কিংবা সমাজের বিরুদ্ধে তার কোন অলঙ্ঘনীয় অধিকার থাকতে পারে না। সুতরাং অন্যান্য অধিকারের মতই ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের স্বীকৃতি নির্ভর করে ব্যক্তি সমাজের প্রতি কতখানি কর্তব্য পালন করছে তার উপর।

প্রাকৃতিক অধিকারের ধারণা ভ্রান্ত

(খ) তাছাড়া, যে সব চুক্তি-মতবাদী দার্শনিক প্রাক্-সামাজিক ও প্রাক-রাষ্ট্র-নৈতিক অবস্থায় মানুষ ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী ছিল বলে প্রচার করেছেন, তাঁরা ইতিহাসকে অস্বীকার করেছেন। কারণ সমাজ বা রাষ্ট্র ছাড়া কোন প্রকার অধিকারের অস্তিত্ব কল্পনাই করা যায় না। যুক্তিবাদী কোন ব্যক্তি এরূপ যুক্তিকে সত্য বলে গ্রহণ করতে পারেন না। মার্কস ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, আদিম সাম্যবাদী সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোন অস্তিত্ব ছিল না। দাস-সমাজেই সর্বপ্রথম ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ঘটে। সেই সমাজের শোষণভিত্তিক ব্যবস্থাকে সংরক্ষিত করার জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের তত্ত্ব দাস-মালিকগণ কর্তৃক প্রচারিত হয়। পরবর্তীকালে সামন্ত ও বুর্জোয়া সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার পবিত্র বলে প্রচার করা হয়। ঐ সব শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষক শ্রেণীর শোষণ-ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার জন্যই ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্র অধিকারের স্বীকৃতিদান ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করাকে রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য বলে প্রচার করা হয়। মার্কসবাদীরা মনে করেন যে, প্রচলিত শ্রেণীভিত্তিক সম্পত্তি-সম্পর্ককে (Property Relation) বজায় রাখার জন্যই এই অধিকার-তত্ত্ব বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা প্রচার করেন। প্রুঁধো (Proudhon) 'সম্পত্তি চৌর্যবৃত্তি' (Property is a theft) বলে একে সমালোচনা করেন।

মার্কসবাদীগণ কর্তৃক সমালোচনা

(গ) ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের সপক্ষে মনস্তাত্ত্বিক যে-যুক্তিগুলি প্রদর্শিত হয় সমালোচকদের মতে তাও গ্রহণযোগ্য নয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার কর্মে

অনুপ্রেরণা যোগায়—তর্কের খাতিরে এই যুক্তিকে স্বীকার করলেও বলা যেতে পারে যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সর্বদাই সামাজিক কল্যাণের সপক্ষে ব্যবহার করা সমীচীন।

মনস্তাত্ত্বিক যুক্তি সমর্থনযোগ্য নয়

আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার আমাকে কর্মে উৎসাহ বা অনুপ্রেরণা যোগায় বলে আমার নিশ্চয়ই মদের দোকান করার অবাধ অধিকার নেই। কারণ, এই অধিকার জনস্বার্থের বিরোধী। তাছাড়া কোটিপতির সন্তানের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার থাকলেই যে সে সব সময়ে কাজ করবে এমন কোন মানে নেই।

(ঘ) নৈতিকতার যুক্তি প্রদর্শন করে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের সপক্ষে বলা হয় যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি হোল ব্যক্তিগত শ্রমের মূল্য। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে এই যুক্তিটি

নৈতিকতার যুক্তিও ভ্রান্ত

গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ লক্ষ লক্ষ মানুষ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করা সত্ত্বেও কেন নিজেদের অন্নসংস্থান করতে পারে না, অথচ কোটিপতি ব্যক্তিরা পরিশ্রম না করেও মাত্রাতিরিক্ত বিলাসব্যসনে দিনযাপন করতে পারে—এর কোন সদুত্তর দিতে নীতিবাদীরা ব্যর্থ হয়েছেন। বস্তুতঃ, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার মুনাফালাভের জন্য যে পরিশ্রম তাকেই স্বীকৃতি দেয় মাত্র; সাধারণ মানুষের জীবনধারণের জন্য যে শ্রম তার কোন মূল্য দেয় না। তাই ল্যাস্কি বলেছেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার সমাজে পরশ্রমভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি করে যা নীতিগতভাবে কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয়।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের নানা প্রকার ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়ন, গণসাধারণতন্ত্রী চীন প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে—শোষণের মাধ্যম বলে—ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে স্বীকার করা হয়নি। ঐসব রাষ্ট্রে সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৬। রাষ্ট্রের বিরোধিতা করার অধিকার (Right to Resistance)

রাষ্ট্রের বিরোধিতা করার অধিকার নাগরিকদের থাকা উচিত কিনা এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌দের মধ্যে যে উত্তপ্ত আলোচনা বহুকাল পূর্বে শুরু হয়েছে

রাষ্ট্রের বিরোধিতা করার অধিকার একটি বহু-বিতর্কিত বিষয়

এখনও তার পরিসমাপ্তি ঘটেনি। রাষ্ট্রতত্ত্বের আলোচনায় এটি যে একটি বিতর্কিত বিষয় সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। মানুষ সাধারণতঃ রাষ্ট্রকে তথা রাষ্ট্রীয় আইনকানুনকে মান্য করে, তাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। যদি কেউ কখনও রাষ্ট্রের তথা রাষ্ট্রীয় আইনের বিরোধিতা করে তা হলে আইনভঙ্গের অপরাধে তাকে শাস্তি পেতে হয়। অবশ্য রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার উদাহরণ ইতিহাসে শত সহস্র রয়েছে। অনেক সময় শান্তিপূর্ণভাবে তথা অহিংস উপায়ে রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা হয়েছে। কখনও কখনও হিংসাত্মক উপায়ে কিংবা বৈপ্লবিক উপায়ে রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা হয়েছে। সর্বযুগেই রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী নাগরিক বা প্রজাদের একথাই শিক্ষা দিয়েছে যে, রাষ্ট্রের নির্দেশ মান্য করা তাদের পবিত্র কর্তব্য। কিন্তু অনেক সময় রাষ্ট্রীয়

কর্তৃপক্ষের সেই নির্দেশ অমান্য করে মানুষ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। বস্তুতঃ, অতীতের মতো বর্তমানেও শাসক-গোষ্ঠীর আদেশ বা নির্দেশকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে তার বিরুদ্ধে মানুষ সংগ্রাম করে চলেছে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য।

কিন্তু প্রশ্ন হোল—কেন মানুষ রাষ্ট্রকে মান্য করবে, কেন তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে? অন্যভাবে বলা যায়, রাজনৈতিক আনুগত্যের কারণ কি? কোন অবস্থাতেই কি মানুষ রাষ্ট্রের বিরোধিতা করতে পারে না? একথা সকলেই জানে যে, সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকার হিসেবে রাষ্ট্র সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচার-আচরণ তথা ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্রীয় আইন একটি সুনির্দিষ্ট পথে জনসাধারণের ব্যবহারকে পরিচালিত করে। রাষ্ট্রের আদেশ হিসেবে পরিচিত আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমেই কেবলমাত্র ব্যক্তি তার আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ পরিতৃপ্তি সাধন করতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। রাষ্ট্রীয় আইন যেহেতু দেশের সর্বোচ্চ নিয়ম, সেহেতু সেই নিয়মের অনুবর্তী হয়ে প্রতিটি ব্যক্তি এবং প্রতিটি সংগঠনকে কাজ করতে হয়। এক শ্রেণীর লেখকের মতে, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমেই ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশসাধন সম্ভব। এইভাবে রাষ্ট্র বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণসাধন করে বলেই তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা উচিত—অনেকের তা-ই অভিমত।

রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের কারণ

কিন্তু অনেকে মনে করেন যে, রাষ্ট্র সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী বলেই আমরা তার প্রতি রাজনৈতিক আনুগত্য প্রদর্শন করি—একথা ঠিক নয়। ল্যাস্কি প্রমুখের মতে, রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণসাধন করেই আমাদের আনুগত্য দাবি করতে পারে। তাঁর মতে, আমরা রাষ্ট্রের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য প্রদর্শন করতে পারি; কিন্তু রাষ্ট্র কখনই বলপূর্বক আমাদের আনুগত্য দাবি করতে পারে না। রাষ্ট্র কতটা পরিমাণে জনকল্যাণ সাধন করছে তার ভিত্তিতেই আমরা তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করব।

রাষ্ট্র বলপূর্বক আনুগত্য দাবি করতে পারে না

প্রাচীন গ্রীসের সোফিস্ট (Sophist) দার্শনিকরা নাগরিকদের রাষ্ট্রের বিরোধিতা করার অধিকারকে স্বীকার করলেও প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল তা সমর্থন করেননি। কাণ্ট ও হেগেলের মত আদর্শবাদী ও ভাববাদী দার্শনিকগণ সর্বাত্মক রাষ্ট্রের কল্পনা করে রাষ্ট্রের বিরোধিতা করাকে অন্যায় ও অযৌক্তিক বলে বর্ণনা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, প্রচলিত সম্পত্তি-সম্পর্ককে বজায় রাখাই ছিল তাঁদের মূল উদ্দেশ্য। তাই ঐ সব দার্শনিক অনেকক্ষেত্রে রাষ্ট্রের উপর দেবত্ব আরোপ করে জনসাধারণকে রাষ্ট্রের অন্যায় ও অবিচার মুখ বুজে সহ্য করতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে ইংরেজ দার্শনিক হবস্ চরম রাজতন্ত্রকে সমর্থন করলেও জীবনের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা যায় বলে ঘোষণা করেন। জনগণের স্বাভাবিক অধিকার ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করলে সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহ ঘোষণা করার অধিকার আছে বলে লক প্রচার করেন।

ল্যাস্কির অভিমত

রাষ্ট্রীয় আইন কতিপয় ব্যক্তির দ্বারা সৃষ্ট হয় এবং কয়েকজন ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত সরকারের মাধ্যমে তা প্রযুক্ত হয়। ঐ সব ব্যক্তিদের নির্দেশ যদি জনস্বার্থের পরিপন্থী হয় তাহলেও কি আমরা তা অবনত মস্তকে মেনে নেব? এই প্রশ্নের উত্তরে আদর্শবাদী গ্রীন বলেছেন, রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষা ছাড়া অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে নাগরিকরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না। তবে স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধাচরণ করাকে তিনি অধিকার বলে স্বীকৃতি না দিলেও 'কর্তব্য' (Duty of resistance) বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অন্যভাবে বলা যায়, রাষ্ট্র যদি নাগরিকের নৈতিক চরিত্র বিকাশের উপযোগী অধিকার স্বীকার করে নেয়, তাহলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাগরিকদের কোন অধিকার থাকতে পারে না; কিন্তু অধ্যাপক ল্যাস্কি নাগরিকদের নৈতিক অধিকারের উপর গুরুত্ব আরোপ অপেক্ষা বাস্তব অধিকার প্রতিষ্ঠার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্র যদি নাগরিকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার, বাক্-স্বাধীনতার অধিকার, সংঘ গঠনের অধিকার, ন্যায়বিচার লাভের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, উপযুক্ত কার্যের জন্য উপযুক্ত মজুরির অধিকার ইত্যাদি স্বীকার না করে, তাহলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করার নৈতিক অধিকার নাগরিকের আছে। নীতিগত দিক ছাড়াও তিনি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করার অধিকারকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন। একজন সমাজতন্ত্রবাদী হিসেবে তিনি বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতার কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি এই অভিমত পোষণ করেন যে, রাষ্ট্র যদি ব্যক্তির অধিকারসমূহ সংরক্ষণ করতে না পারে, তাহলে নীতিগত ভাবে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে জনগণ বাধ্য নয়।

রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা প্রসঙ্গে বিভিন্ন দার্শনিক

সুতরাং রাষ্ট্র কখনই নাগরিকদের শর্তহীন অখণ্ড আনুগত্য দাবি করতে পারে না। রাষ্ট্র আমাদের আনুগত্য দাবি করতে পারে তখনই যখন সে তার নিজের কর্তব্য পালন করে। রাষ্ট্র নাগরিকদের পূর্ণ-আত্মবিকাশের উপযোগী অধিকারের সৃষ্টি করলেই কেবলমাত্র আনুগত্য দাবি করতে পারে, অন্যথায় নয়। সুতরাং যে-রাষ্ট্র তার নিজের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয় তার প্রতি কখনই আনুগত্য প্রদর্শন করা চলে না।

রাষ্ট্র শর্তহীন আনুগত্য দাবি করতে পারে না

মার্কসবাদীদের মতে, ধনবৈষম্যমূলক সমাজে রাষ্ট্র যেহেতু শোষক শ্রেণীর স্বার্থ-রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে, সেইহেতু ঐ সব রাষ্ট্র কখনই জনসাধারণের আত্ম-বিকাশের উপযোগী অধিকার প্রদান করতে পারে না। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র আইনের সাহায্যে প্রচলিত সম্পত্তি ব্যবস্থাকেই সংরক্ষিত করে। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্পত্তিহীন সর্বহারা শ্রেণী তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকে। এরূপ রাষ্ট্রে কখনই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আইন, আদালত ইত্যাদি সবই সম্পত্তিশালী শ্রেণীর অধিকারকেই রক্ষা করে। তাই অধিকারহীন শ্রেণী নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগত কারণেই এরূপ রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে। মার্কসবাদীদের মতে, বৈপ্লবিক উপায় ছাড়া এরূপ রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে সর্বহারা শ্রেণী কখনই জয়যুক্ত হতে পারবে না। কারণ শাসক শ্রেণী হিংসার সাহায্যেই জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার

মার্কসবাদীদের অভিমত

প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে স্তব্ধ করে দিতে চাইবে। সুতরাং হিংসাকে রোধ করার জন্য হিংসার আশ্রয় সর্বহারাদের গ্রহণ করতেই হবে। তবে শুধু হিংসাকে অবলম্বন করেই সর্বহারাশ্রেণী চূড়ান্ত বিজয়লাভ করতে পারবে না। ১৯১৭ সালে এপ্রিল মাসে, লেনিন তাঁর দ্বৈত ক্ষমতাতত্ত্বে (The Dual Power Theory) এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন, "একটা ক্ষমতায় পরিণত হতে হলে শ্রেণীসচেতন মেহনতী মানুষকে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করতে হবে। যতক্ষণ জনসাধারণের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করা না হয়, ততক্ষণ ক্ষমতা দখলের বিকল্প কোন পথ নেই।...সংখ্যালঘু মানুষ নিয়ে আমাদের ক্ষমতা দখলের সাহস না দেখানোই উচিত।" সুতরাং মার্কসবাদীরা বিপ্লব ও অহিংসাকে সমার্থক বলে মনে করেন না; যদিও বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা উভয়কে অভিন্ন বলে বর্ণনা করে জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে চান।

কিন্তু গান্ধী-সহ অহিংসার পূজারী নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রীয় অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে নাগরিকদের সংগ্রাম করার অধিকার স্বীকার করলেও তাঁরা সেই অধিকারকে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষপাতী। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন পরিচালনার সময় গান্ধী ভারতবর্ষে এই পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দলের মত জাতীয় বিপ্লবী দলগুলি এবং সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বামপন্থী নেতৃবৃন্দ গান্ধীর এই আন্দোলন-পদ্ধতিকে সমর্থন করতে পারেননি। তাই তাঁরা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে অত্যাচারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন।

অহিংস প্রতিরোধ

অধ্যাপক ল্যাস্কি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকে শেষ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার কথা বলেছেন। তাঁর মতে, যখন সমস্ত সাংবিধানিক উপায়ে জনগণের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার বিধানের চেষ্টা ব্যর্থ হবে এবং যখন প্রতিরোধকারীরা একথা উপলব্ধি করতে পারবে যে, শক্তির ভারসাম্য তাদের দিকে, তখনই কেবলমাত্র তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে। তবে একথা নিশ্চিত যে, শোষক শ্রেণী কখনই স্বেচ্ছায় জনগণকে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রদান করবে না। কারণ এই অধিকার প্রদান করার অর্থ নিজেদের সমাধি খনন করা। তাই জনগণকে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শেষ পর্যন্ত অস্ত্র নিজেদের হাতে তুলে নিতেই হয়। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাতিন আমেরিকার মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রাম এই ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি অঙ্গুলি-সংকেত করে।

ল্যাস্কি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে শেষ অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করার পক্ষপাতী

৭। নাগরিকদের কর্তব্য (Duties of a Citizen)

অধিকার এবং কর্তব্যের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। তা হোল—অধিকার ভোগ করা বা না-করা নির্ভর করে ব্যক্তির ওপর। কিন্তু কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোন মূল্য নেই। রাষ্ট্র কর্তৃক নির্দিষ্ট কর্তব্যগুলি পালন করা ব্যক্তির ক্ষেত্রে আবশ্যিক। অন্যভাবে বলা যায়, "অধিকার ভোগ নাগরিকের ইচ্ছাধীন, অপরদিকে কর্তব্য হল ব্যক্তির জন্য আইন কর্তৃক নির্দিষ্ট সামাজিক ব্যবহার। সমাজকে

কর্তব্যের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

রক্ষা করার উদ্দেশ্য নিয়েই ব্যক্তির জন্য সামাজিকভাবে করণীয় কাজগুলি নির্দিষ্ট করে দিতে হয়।...কর্তব্য সম্পাদন বাধ্যতামূলক।" বস্তুতঃ, নিজ ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী অধিকার ভোগের জন্য প্রতিটি নাগরিককে কতকগুলি কর্তব্য পালন করতে হয়। কর্তব্য পালন ছাড়া অধিকার ভোগের কথা কল্পনা করা যায় না। তাই অধিকারের স্বীকৃতির অর্থই হোল কতকগুলি দায়িত্ব পালনে স্বীকৃত হওয়া। এই স্বীকৃতিগুলিই হোল কর্তব্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, সরকারের আইন প্রণয়ন করার অধিকার আছে। এই অধিকারের বিনিময়ে সরকারের কর্তব্য হোল জনকল্যাণকামী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন করা। আবার রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা জনগণের অধিকার যথাযথভাবে সংরক্ষিত হলে স্বাভাবিকভাবে রাষ্ট্রের প্রতি জনগণের কর্তব্য পালনের আবশ্যিকতা দেখা দেয়। প্রতিটি নাগরিককে দ্বিমুখী কর্তব্য পালন করতে হয়। প্রথমতঃ, নিজ অধিকার ভোগের দ্বারা যাতে অপরের অধিকার ক্ষুণ্ণ না হয় তা লক্ষ্য রাখা প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, 'আমার যেমন মতামত প্রকাশের অধিকার আছে তেমনি অপরেরও সেই অধিকার আছে।' আমার কর্তব্য যেমন অপরের উক্ত অধিকারে হস্তক্ষেপ না-করা, তেমনি অপরের কর্তব্য হোল আমার মতামত প্রকাশের অধিকারের সুযোগ করে দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ, অধিকারগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হলে রাষ্ট্র যাতে যথাযথভাবে কার্যাদি পরিচালনা করতে পারে সেজন্য তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য।

৮। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের কর্তব্য

রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের যেসব কর্তব্য রয়েছে তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

(ক) নিজ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করাই হোল নাগরিকদের প্রাথমিক কর্তব্য। আনুগত্য প্রদর্শনের অর্থ হোল রাষ্ট্রের কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে তার সঙ্গে সর্বতোভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করা। অপরাধ নিবারণ, শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় কার্যে সহযোগিতা করা নাগরিকের কর্তব্য। আবার বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঘটলে সর্বস্ব ত্যাগ করে, এমনকি প্রয়োজনে আত্মবলিদান প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিকের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

আনুগত্য প্রদর্শন

(খ) আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র নাগরিকদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। তাই রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন নাগরিকের কর্তব্য। আইন অমান্য করলে দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে; ফলে নাগরিকদের অধিকারগুলি কার্যতঃ ভিত্তিহীন হয়ে পড়বে। অবশ্য রাষ্ট্র-প্রণীত আইন যদি ব্যক্তির মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে এবং অগণতান্ত্রিক আদর্শের পরিপোষক হয়, তবে সেই আইনের বিরুদ্ধাচরণ করা নাগরিকের নৈতিক কর্তব্য।

রাষ্ট্রের আইন মান্য করা

(গ) আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা ও জনহিতকর কার্যাদি পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রের বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। নাগরিকদের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ কর ধার্য

করে রাষ্ট্র ব্যয়নির্বাহের ব্যবস্থা করে। প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত ন্যায্য কর (Tax) যথাসময়ে প্রদান করা, কর ফাঁকি না দেওয়া ইত্যাদি।

কর প্রদান

জনগণ এই কর্তব্য পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করলে স্বাভাবিক-ভাবেই রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনায় ব্যাঘাত ঘটবে, ফলে সার্বিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হবে।

(ঘ) প্রতিটি নাগরিকের রাষ্ট্রপরিচালনায় অংশগ্রহণ করার অধিকার আছে। এই অধিকার ভোটদানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। কিন্তু উক্ত অধিকার ভোগের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য হোল সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে সামগ্রিক কল্যাণের জন্য নিজ বিবেক-বুদ্ধি অনুসারে ভোটদান করা।

সংভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ

(ঙ) উপরি-উক্ত কর্তব্যগুলি ছাড়াও নাগরিকের অন্যান্য কয়েকটি কর্তব্য পালন করতে হয়। এগুলি হোল—জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা, উন্নততর সমাজগঠনের জন্য সচেষ্ট হওয়া, প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রের অধীনে কর্মগ্রহণ করে দেশের সেবা করা প্রভৃতি। জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের প্রতি নিজ কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি একদিকে যেমন নিজ সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে পারে, অন্যদিকে তেমনি সমগ্র দেশের অগ্রগতির কাজে সহায়তা করতে পারে।

অন্যান্য কর্তব্য

৯। অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক (Relation between Rights and Duties)

অধিকার বলতে এমন একটি সামাজিক পরিবেশের সৃষ্টি বোঝায় যেখানে প্রতিটি নাগরিক নিজস্ব ব্যক্তিসত্তার সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়। গ্রীন (Green)-এর মতে, সমষ্টিগত নৈতিক কল্যাণ সম্বন্ধে চেতনা ছাড়া অধিকারের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। সমষ্টিগত কল্যাণ সাধনের জন্য প্রতিটি নাগরিককে কতকগুলি কর্তব্য পালন করতে হয়। কর্তব্য বলতে রাষ্ট্র, এবং সমাজ এবং অন্যান্য ব্যক্তির প্রতি দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি প্রদান বোঝায়।

অধিকারের অর্থ কর্তব্য পালন

মানুষ অধিকার ভোগ করে সামাজিক জীব হিসেবে। তাই সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হোল মানুষের অধিকারের ভিত্তি। হবহাউস (Hobhouse)-এর মতে, অধিকার ভোগ সামাজিক দায়িত্ব পালনের শর্তসাপেক্ষ। সমাজ ব্যক্তিকে অধিকার প্রদান করে যাতে সে ব্যক্তিত্ব বিকাশের মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণে নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করতে পারে। এ প্রসঙ্গে ল্যাস্কি বলেন যে, আমাদের অধিকার সমাজ থেকে শুধু নেওয়ার জন্য নয়, সমাজকে কিছু দেওয়ার জন্যও। সুতরাং সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের কর্তব্য হোল অধিকারগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে নিজের ও সমাজের মঙ্গল সাধন করা এবং সভ্যতার অগ্রগতিতে সাহায্য করা। এদিক থেকে বিচার করে অধিকার ও কর্তব্য—দুটিকেই সামাজিক ধারণা বলা যেতে পারে।

অধিকার ও সামাজিক কর্তব্য

আবার অধিকার হোল সর্বজনীন। ব্যক্তিত্ব বিকাশের অধিকার শুধুমাত্র যে

একজন ব্যক্তির আছে তা নয়. এই অধিকার সকলের জীবন ও জীবিকার অধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার, পরিবার গঠনের অধিকার প্রভৃতি আমার যেমন আছে, অন্যদেরও তেমনি আছে। এই শর্তটি যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারলে প্রতিটি মানুষ নিজে যেমন সেগুলি ভোগ করে তেমনি অন্যকে ভোগ করার সুযোগ দিয়ে নিজ কর্তব্য পালন করে। অন্যভাবে বলা যায়, সমাজের প্রতিটি মানুষের অধিকার ভোগ অপরের কর্তব্য পালনের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। আমার অধিকার ভোগের পথে বাধা সৃষ্টি না করা যেমন অপরের কর্তব্য, তেমনি আমার কর্তব্য হোল অপরকে অধিকার ভোগের সুযোগ দেওয়া।

অধিকার ও কর্তব্য পারস্পরিক

অধিকার ও কর্তব্যের আর একটি দিক আছে। অধিকারের সরাসরি উৎস হোল রাষ্ট্র। কারণ রাষ্ট্র যতক্ষণ পর্যন্ত অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান না করে ততক্ষণ পর্যন্ত অধিকারের সামাজিক দাবিগুলি বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করতে পারে না। যেহেতু রাষ্ট্র অধিকারগুলি স্বীকার করে নেয় সেহেতু স্বভাবতঃই রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। রাষ্ট্র যাতে সুষ্ঠুভাবে কার্যাদি পরিচালনা করতে পারে সেজন্য রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন, নিয়মিত কর প্রদান, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, সৎ ও সুচিন্তিতভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ প্রভৃতি নাগরিকের অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য। নাগরিকগণ যদি নিজ নিজ কর্তব্য পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করে তাহলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হলে নাগরিক-অধিকারসমূহ ভিত্তিহীন হয়ে পড়তে বাধ্য। সুতরাং নাগরিকদের কর্তব্য পালনের উপর যেমন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নির্ভরশীল, তেমনি নাগরিকের অধিকারসমূহের যথার্থ প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রের কর্তব্য পালনের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু কোন রাষ্ট্র যদি নাগরিক অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করে তবে সেই রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকগণ স্বাভাবিকভাবেই কর্তব্য পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করতে পারে। তাই বলা যেতে পারে, কোন সরকার যদি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে পদদলিত করে বা অধিকাংশ লোককে বঞ্চিত করে মুষ্টিমেয় লোকের অধিকার সংরক্ষণ করে তা হলে ব্যক্তির কর্তব্য হোল তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।

রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য

বুর্জোয়া রাষ্ট্রে আইনগত সাম্য থাকা সত্ত্বেও সবাই সমানভাবে অধিকার ভোগ করে না। স্বাভাবিকভাবে যারা অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, রাষ্ট্র নীতিগতভাবে তাদের কর্তব্য পালনে বাধ্য করতে পারে না। লক্ষণীয় বিষয় হোল— বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সংবিধানে সাধারণতঃ কেবলমাত্র নাগরিক অধিকার সমূহকে লিপিবদ্ধ করা হয়; নাগরিকদের কর্তব্য পালনের কথা বলা হয় না। এর প্রধান কারণ হোল—বুর্জোয়া রাষ্ট্রে ধনিক-বণিক শ্রেণীর মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি থাকে যারা কাজ করে না, অথচ সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক বেশী অধিকার ভোগ করে। সংবিধানে যদি নাগরিকদের কোন্ কোন্ কর্তব্য পালন করতে হবে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয় কিংবা অধিকার ভোগকে কর্তব্য পালনের সাপেক্ষিক করা হয়, তাহলে ঐসব পরশ্রমভোগী মানুষদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে। কিন্তু কোন বুর্জোয়া রাষ্ট্রে তা হওয়া সম্ভব নয়। এরূপ সমাজে সর্বপ্রকার অধিকার ভোগ

বিভিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থায় অধিকার ও কর্তব্য

করে ধনিক-বণিক শ্রেণী এবং শোষিত শ্রমজীবী মানুষকে অনেক বেশী পরিমাণে কর্তব্য পালন করতে হয়। ১৮৯১ সালের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির খসড়া কর্মসূচীর সমালোচনা করে এঙ্গেলস কর্মসূচীতে গৃহীত 'সকলের জন্য সমান অধিকার'কে আরো সুনির্দিষ্ট করে 'সকলের সমান অধিকার ও সমান কর্তব্য' করার দাবি জানান। কার্ল মার্কসও কর্তব্যকে বাদ দিয়ে শুধু অধিকার কিংবা অধিকারকে বাদ দিয়ে শুধু কর্তব্যকে গ্রহণযোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেছিলেন। তাই সমাজতান্ত্রিক সমাজে অধিকার ও কর্তব্যের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করে উভয়কেই সংবিধানের মধ্যে যথাযোগ্যভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, এরূপ সমাজে অধিকার যেমন সকলেই সমানভাবে ভোগ করতে পারে, তেমনি আবার সকলকেই সমানভাবে কর্তব্য পালন করতে হয়।

তাই অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বলতে পারি, অধিকার ও কর্তব্য একই বস্তুর দুটি দিক। অধিকারের মধ্যে কর্তব্য নিহিত থাকে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

স্বাধীনতা ও সাম্য

[Liberty and Equality]

১। স্বাধীনতার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Definition and Nature of Liberty)

সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা—এই তিনটি রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ যুগ যুগ ধরে মানুষের মনে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গঠনের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। এই তিনটি আদর্শের মধ্যে স্বাধীনতার গুরুত্ব সর্বাধিক বলে অনেকে মনে করেন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ স্বাধীনতার স্বরূপ আলোচনা করার ফলে বর্তমানে এই আদর্শটি সর্বাধিক বিতর্কের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস হোল স্বাধীনতা রক্ষার বা স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার এবং শোষণমুক্ত সমাজগঠনের জন্য সংগ্রামের ইতিহাস।

স্বাধীনতার গুরুত্ব

সাধারণভাবে স্বাধীনতা বলতে অনিয়ন্ত্রিতভাবে যা খুশি করার অধিকার বোঝায়। কিন্তু সুসভ্য সমাজের মধ্যে অবাধ স্বাধীনতা ভোগের ইতিহাস মানুষের কখনই থাকতে পারে না। মানুষ যদি একান্তভাবে এই অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করতে চায় তাহলে তাকে সমাজজীবন পরিত্যাগ করে বন্যজীবন গ্রহণ করতে হবে। সমাজের মধ্যে অবাধ স্বাধীনতা বলতে কোন কিছু থাকতে পারে না। কারণ একজনের অবাধ স্বাধীনতা থাকার অর্থ অপরের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপের স্বীকৃতি প্রদান ছাড়া আর কিছুই নয়। এরূপ অবাধ স্বাধীনতাকে স্বাধীনতা না বলে স্বেচ্ছাচারিতা বলাই সমীচীন। অবাধ স্বাধীনতা মেনে নেওয়া হলে সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হবে। মনুষ্যজীবন ও পশুজীবনের মধ্যে তখন কোন পার্থক্য থাকবে না। তাই সুষ্ঠু ও সাবলীল সমাজজীবন গঠনের জন্য মানুষের অবাধ ইচ্ছার উপর কিছু না কিছু বাধানিষেধ আরোপ করা একান্ত প্রয়োজন। এই সব বাধানিষেধ মেনে চললে কখনই ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় না, বরং তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে।

প্রকৃত স্বাধীনতা বলতে এক অর্থে সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতার অনুপস্থিতিকে বোঝায়। তবে প্রতিবন্ধকতার অনুপস্থিতির অর্থ ব্যক্তির যথেচ্ছ আচরণের অবাধ স্বাধীনতা নয়। এর অর্থ হোল—কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর থেকে বাধানিষেধ দূর করা। ল্যাস্কির মতে, স্বাধীনতা হোল সেই সকল সামাজিক অবস্থার উপর থেকে বাধানিষেধ দূরীকরণ যা আধুনিক সভ্য জগতে ব্যক্তির কল্যাণ সাধনের জন্য একান্ত প্রয়োজন। এখানে সামাজিক ব্যবস্থা, যাকে আমরা বলি সামাজিক অধিকার। এই অধিকারগুলি না থাকলে এবং এগুলি অবাধ না হলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব কখনই সম্ভব নয়।

অধ্যাপক ল্যাস্কি 'স্বাধীনতা' বলতে এমন একটি পরিবেশ সংরক্ষণ করাকে বোঝাতে চেয়েছেন, যেখানে মানুষের ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব। বলা বাহুল্য, স্বাধীনতার উপযোগী এই পরিবেশ সৃষ্টি হয় কতকগুলি বাহ্যিক অবস্থার সংরক্ষণের দ্বারা। এই বাহ্যিক অবস্থার সংরক্ষণ কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের দ্বারাই সম্ভব। কারণ রাষ্ট্র আইনের সাহায্যে প্রত্যেকের আত্মবিকাশের উপযোগী সুযোগসুবিধা প্রদান করে এবং প্রত্যেকের স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ন্ত্রণ করে তাকে নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে। তাই অধ্যাপক ল্যাস্কি মন্তব্য করেছেন যে, স্বাধীনতার প্রকৃতির মধ্যেই তার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। নিয়ন্ত্রণবিহীন স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা বলে কখনই বিবেচিত হয় না। এই অর্থে বলা যায় যে, প্রত্যেকের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা সকলের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে বাধ্য।

ল্যাস্কি প্রদত্ত সংজ্ঞা

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, হেগেল (Hegel) প্রমুখ আদর্শবাদী দার্শনিকগণ রাষ্ট্রের সমস্ত আইন মান্য করাকেই স্বাধীনতা বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ল্যাস্কি তাঁদের এই যুক্তি অস্বীকার করে এই অভিমত পোষণ করেন যে, রাষ্ট্রের আইন সৃষ্ট হয় সরকারের দ্বারা। যেহেতু সরকার মুষ্টিমেয় ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত, সেহেতু সরকারের আইন সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী না-ও হতে পারে। সেক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী আইনকে মান্য করার অর্থ ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব হতে দেওয়া। তাই ব্যক্তিস্বাধীনতার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের যথাযথ সমন্বয় সাধন একান্ত প্রয়োজন।

আইন সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতার রক্ষক নয়

মার্কসবাদিগণ অবশ্য স্বাধীনতাকে বাধানিষেধ অপসারণের অর্থে ব্যবহার করেন না। স্বাধীনতার মার্কসীয় তত্ত্ব সর্বপ্রকার আর্থিক শোষণের অবসান ঘটিয়ে মানুষের সামাজিক মুক্তির পথ প্রশস্ত করার কথা বলে। এই মত অনুসারে স্বাধীনতা হোল মানুষের পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ (full freedom of development of the human personality)। কেবলমাত্র শোষণভিত্তিক সমাজব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রবর্তন ঘটলেই ব্যক্তির পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ উন্মুক্ত হতে পারে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ মানুষের পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারবে। এর জন্য প্রয়োজন সাম্যবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠা। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে প্রক্রিয়া শুরু হয়, সাম্যবাদী স্তরে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। সাম্যবাদী স্তরে বৈষয়িক সম্পদের উৎপাদনের ক্ষেত্রে এমন প্রাচুর্যের সৃষ্টি হয় যে, প্রতিটি ব্যক্তির স্বাভাবিক প্রয়োজন মিটাতে সমাজ সক্ষম হবে। মানুষের জীবিকার সঙ্গে শ্রমের কোনরূপ সম্পর্ক থাকবে না। ফলে মানুষের কাছে শ্রম হবে স্বাধীন ও আরামদায়ক। শ্রমিক-কৃষক, বুদ্ধিজীবী ও মেহনতী মানুষের মধ্যে কোনরূপ শ্রেণীগত বা গোষ্ঠীগত পার্থক্য থাকবে না। এমতাবস্থায় সমাজের প্রতিটি মানুষ প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা ভোগ করতে সক্ষম হবে। সুতরাং বলা যায়, পুঁজিবাদী সমাজে মানুষ কখনই এবং কোনভাবেই স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক সমাজে সর্বপ্রকার শোষণের অবসান ঘটিয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতার যে সূচনা করে সাম্যবাদী সমাজে তা পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে।

মার্কসীয় দৃষ্টিতে স্বাধীনতা

২। স্বাধীনতার ধারণার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (Origin and Development of ideas of the Liberty)

প্রাচীনকালে গ্রীসের এথেন্স নগরীতে সর্বপ্রথম স্বাধীনতা সম্বন্ধে ধারণার উদ্ভব ঘটে। এথেন্সবাসীরা স্বাধীনতাকে সম্প্রদায়গত ও ব্যক্তিগত—উভয় অর্থে ব্যবহার করতেন। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলতে তাঁরা স্ব-শাসন (Self-rule) এবং দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগ থেকে মুক্ত হওয়া বোঝাতেন। এথেন্সবাসীরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলতে ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বাহ্যিক আচার আচরণের উপর সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণ-বিহীনতা বুঝাতেন। আবার সম্প্রদায়গত স্বাধীনতা বলতে তারা সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর উপর সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণ-বিহীনতা বোঝাতেন। এইভাবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ভোগ করার জন্য এবং সুখী ও সম্মানিত জীবন যাপনের জন্য প্রাচীন গ্রীকরা দাসপ্রথাকে স্বাভাবিক বলে মনে করতেন। দাসদের উপর সর্বপ্রকার দৈহিক কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পণ করে তাঁরা স্বাধীন নাগরিক হিসেবে সৃজনশীল কার্যে আত্মনিয়োগ করতেন। এদিক থেকে বিচার করে প্রাচীন গ্রীসের স্বাধীনতার ধারণা অসাম্য-বৈষম্য নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে মনে করা হয়।

এথেন্সে সর্বপ্রথম স্বাধীনতার ধারণার উদ্ভব ঘটে

এর পর স্টোয়িক (Stoic) দার্শনিকরা দাস প্রথার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বাভাবিক অসাম্যের তত্ত্বের সমালোচনা করেন। তাঁরা বিশ্বজনীন প্রাকৃতিক আইন, বিশ্বজনীন নাগরিকত্ব এবং মানুষের স্বাভাবিক সাম্যের আদর্শ প্রচার করেন। তাঁদের মতে, সকল মানুষই যেহেতু সমান সেহেতু স্বাধীনতা হোল স্বাভাবিক। কিন্তু স্টোয়িক দার্শনিকরা রাজনৈতিকভাবে সাম্য ও স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা করেন নি। রোমক যুগে স্টোয়িকদের আদর্শ বেশ কিছু পরিমাণে গৃহীত হয়। রোমানরা কিছু পরিমাণে জনগণের সার্বভৌমিকতা তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন। তাঁরা ব্যক্তিকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করে দেখার পক্ষপাতী ছিলেন এবং মনে করতেন যে, রাষ্ট্রের প্রধান কাজ হোল ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষণ করা।

স্টোয়িকদের স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণা

পরবর্তীকালে স্যার টমাস মুর (Thomas Moore), হ্যারিংটন (Harrington), জন বল (John Ball) প্রমুখের রচনায় স্বাধীনতার বাণী প্রচারিত হয়। কিন্তু সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে লক ও রুশো বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে স্বাধীনতার তত্ত্ব প্রচার করেন। রুশো বলেন, মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মায়, কিন্তু সর্বত্রই সে শৃঙ্খলাবদ্ধ। চুক্তিমতবাদী দার্শনিক লক মনে করতেন যে, প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত হোত প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা। এরূপ নিয়ন্ত্রিত জীবনে সাম্য ও স্বাধীনতা বিরাজ করত। মানুষ পরিচালিত হোত যুক্তি ও বিবেকের দ্বারা। এই প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতার অধিকার ভোগ করত। রুশোর মতে প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মুক্ত জীবন যাপন করত। কিন্তু নানা কারণে তাদের জীবন হয়ে উঠে বিষময়; তাই তারা চুক্তির মাধ্যমে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পণ করেছিল সাধারণ ইচ্ছার হাতে। রুশোর মতে, এই সাধারণ ইচ্ছার

লক ও রুশোর স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণা

অধীনে নিজেকে স্থাপিত করে একদিকে যেমন মানুষ সবকিছুর উপর অবাধ অধিকার ও স্বাধীনতা হারিয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি সে লাভ করেছিল রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা ও সামাজিক স্বীকৃতি। সপ্তদশ শতাব্দীতে মিলটন (Milton)-ও স্বাধীনতার কথা প্রচার করেছিলেন।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ফরাসী বিপ্লবের সময়ে ও পরে স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণা

প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার তত্ত্ব বাস্তব রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে প্রচারিত হয় আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৭৭৬) এবং ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) সময়ে। এই দুটি বিপ্লবে মূল শ্লোগান ছিল—সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা (equality, fraternity and liberty)। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময় উদীয়মান পুঁজিপতি শ্রেণী স্বাধীনতাকেই মূলমন্ত্র বলে প্রচার করে জনসাধারণের সমর্থন ও সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করে। বুর্জোয়ারা নেতিবাচক অর্থে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করেন। তাঁরা সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণহীনতাকে স্বাধীনতা বলে বর্ণনা করেন। মন্তেস্কু (Montesquieu) ১৭৪৮ সালে প্রকাশিত 'স্পিরিট অব্ দি লজ্' (L' Espirit De Lois) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের প্রয়োজনীতার কথা উল্লেখ করেন। ১৭৬৫ সালে প্রকাশিত তাঁর 'ইংল্যান্ডের আইনের উপর মতামত' (Commentaries on the Laws of England) নামক গ্রন্থে ব্ল্যাকস্টোন (Blackstone)-ও অনুরূপ মন্তব্য করেন। ম্যাডিসন (Madison) একই হস্তে যাবতীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ হলে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিনষ্ট হয় বলে প্রচার করেন। মন্তেস্কুর মতে, ব্যাপক অর্থে স্বাধীনতা বলতে বোঝায় ব্যক্তির নিজের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করা।

মিল ও আদর্শবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি

কিন্তু রাষ্ট্রের ভূমিগত সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে মতবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সার্বভৌমিকতার ধারণার সঙ্গে স্বাধীনতার ধারণার সংঘর্ষ বাধে। এই সময় একদল দার্শনিক রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার ধারণাকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার ধারণা বলে প্রচার করতে শুরু করেন। আবার কেউ কেউ উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা করেন। জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) তাঁর 'স্বাধীনতা সংক্রান্ত গ্রন্থে' (Essay on Liberty, 1859) প্রচার করেন যে, স্বাধীনতা হোল মানুষের মৌলিক মানসিক শক্তির বলিষ্ঠ অথচ ভিন্নমুখী ও অব্যাহত প্রকাশ। তিনি চিন্তার স্বাধীনতা ইত্যাদির সপক্ষে প্রচার করতে গিয়ে এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, আত্মকেন্দ্রিক কার্যে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বার্কার প্রমুখ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ মিলকে 'শূন্যগর্ভ স্বাধীনতার প্রচারক' (the prophet of an empty liberty) বলে অভিহিত করেন। আদর্শবাদী দার্শনিকগণ স্বাধীনতার নেতিবাচক ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী। এঁরা আত্মোপলব্ধির নৈতিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করে উচ্চতর সত্তার প্রকাশকে মানবজীবনের লক্ষ্য বলে বর্ণনা করেন। তাঁদের মতে, স্বাধীনতা নিজের মূল্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আত্মোপলব্ধির পথকে নিজের লক্ষ্য বলে মনে করে। আদর্শবাদী দার্শনিক হেগেল (Hegel) রাষ্ট্র ছাড়া স্বাধীনতার কল্পনা করা যায় না বলে মনে করতেন। গ্রীনের মতে, মানুষের ব্যক্তিসচেতনতা আছে বলেই তার

স্বাধীনতা প্রয়োজন। বর্তমানে নানাদিক থেকে আদর্শবাদী দার্শনিকদের স্বাধীনতা তত্ত্বকে সমালোচনা করা হয়।

স্বাধীনতা সম্পর্কে আধুনিক ধারণা : ল্যাস্কির অভিমত

আধুনিককালে স্বাধীনতা বলতে অনিয়ন্ত্রিতভাবে যা খুশি করার অধিকার বোঝায় না। অধ্যাপক ল্যাস্কি স্বাধীনতা বলতে এমন একটি পরিবেশ সংরক্ষণ করাকে বোঝাতে চেয়েছেন, যেখানে মানুষের ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব। তাঁর মতে, স্বাধীনতার উপযোগী এই পরিবেশ সৃষ্ট হয় কতকগুলি বাহ্যিক অবস্থা সংরক্ষণের দ্বারা। এই বাহ্যিক অবস্থার সংরক্ষণ কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের দ্বারাই সম্ভব। বার্কারের মতে, ব্যক্তির আত্মোপলব্ধিই যেহেতু রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, সেহেতু রাষ্ট্র গঠিত হবে স্বাধীন মনুষ্য সম্প্রদায়কে নিয়ে, দাসদের নিয়ে নয়।

মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা

মার্কসবাদিগণ স্বাধীনতাকে বাধানিষেধ অপসারণের অর্থে ব্যবহার করেন না। স্বাধীনতার মার্কসবাদী তত্ত্ব সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক শোষণের অবসান ঘটিয়ে মানুষের সামাজিক মুক্তির পথ প্রশস্ত করার কথা বলে। এই মত অনুসারে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মার্কসবাদীদের মতে, পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থার অবসানের মাধ্যমেই কেবলমাত্র জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতে পারে। সুতরাং স্বাধীনতার ধারণা যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। স্বাধীনতার ধারণা কখনই সমাজ নিরপেক্ষ হতে পারে না। তাই বিভিন্ন সময়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তিতে স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণাটিও গড়ে উঠেছে এবং বিকশিত হয়েছে।

৩। স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ (Different Forms of Liberty)

বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ 'স্বাধীনতা' শব্দটিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন। এর ফলে আমরা বিভিন্ন প্রকার স্বাধীনতার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করতে পারি।

[ক] ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত স্বাধীনতা (Individual and National Liberty) : প্রাচীন গ্রীকরা, বিশেষত এথেন্সবাসীরা স্বাধীনতাকে সম্প্রদায়গত ও ব্যক্তিগত—উভয় অর্থে ব্যবহার করতেন। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলতে তাঁরা স্বশাসন Self-rule এবং দৈনন্দিন অভাব অভিযোগ থেকে মুক্ত হওয়া বোঝাতেন। এথেন্সে স্বশাসন প্রবর্তিত থাকার ফলে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল। এথেন্সবাসীরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলতে ব্যক্তির স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যক্তির আচার আচরণের উপর সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণহীনতা বুঝতেন। তাঁরা সম্প্রদায়গত স্বাধীনতা বলতে যা বুঝতেন বর্তমানে তাকে অনেকে জাতীয় স্বাধীনতা বলে অভিহিত করেন। বার্নস (Burns)-এর মতে, জাতির সর্বপ্রকার স্বাভাবিক উন্নতির ভিত্তি হোল জাতীয় স্বাধীনতা। জাতীয় স্বাধীনতা বলতে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণবিহীনতা বোঝায়। জাতীয় স্বাধীনতা না থাকলে পরাধীন জাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না।

[খ] **স্বাভাবিক স্বাধীনতা (Natural Liberty) :** প্রাক্-রাজনৈতিক যুগে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে মানুষ যথেচ্ছাচরণে যে অবাধ ক্ষমতা ভোগ করত তাকে স্বাভাবিক স্বাধীনতা বলে অভিহিত করা যায়। রুশো স্বাভাবিক স্বাধীনতা তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন। তাঁর মতে, 'মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল। কিন্তু সে আজ চতুর্দিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ।' রুশোর এই উক্তির প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় নৈরাজ্যবাদী দার্শনিকদের মধ্যে। তাঁদের মতে, মানুষ আজ সামাজিক ও রাজনৈতিক আইনের অসংখ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ বলে সে তার ব্যক্তিসত্তার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ সাধন করতে পারে না। তাই নৈরাজ্যবাদীরা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিলোপ সাধনের মাধ্যমে স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষপাতী। কিন্তু আইন ছাড়া স্বাধীনতা যে স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর মাত্র সম্ভবতঃ এই সত্যটি উপলব্ধি করতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। তাই বর্তমানে আইনকে স্বাধীনতার শর্ত বলে অনেকে বর্ণনা করেছেন।

স্বাভাবিক স্বাধীনতার প্রকৃতি

[গ] **সামাজিক স্বাধীনতা (Social Liberty) :** যে স্বাধীনতা সামাজিক বিবেক কর্তৃক স্বীকৃত এবং সামাজিক বিধি কর্তৃক সংরক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে সামাজিক স্বাধীনতা বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু যেহেতু সামাজিক বিবেক তথা ন্যায়বোধ অনির্দিষ্ট, অস্পষ্ট ও আপেক্ষিক, সেইহেতু এরূপ স্বাধীনতার ধারণাও অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট এবং আপেক্ষিক হতে বাধ্য। একসময় দাস রাখার স্বাধীনতা অনেক রাষ্ট্রে সমাজের কর্ণধারদের সামাজিক স্বাধীনতা বলে বিবেচিত হোত। বর্তমানে সামাজিক ধ্যান ধারণার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক স্বাধীনতার এরূপ ধারণাও পরিবর্তিত হয়েছে।

[ঘ] **আইনগত স্বাধীনতা Legal Liberty :** রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইনসঙ্গত স্বাধীনতাকে প্রকৃত স্বাধীনতা বলে আলোচনা করা হয়। রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত, সংরক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতাকেই আইনসঙ্গত স্বাধীনতা বলা হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে, কোন স্বাধীনতাই নিয়ন্ত্রণবিহীন হতে পারে না। রাষ্ট্র সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে [illegible] আইনের মাধ্যমে প্রত্যেকের স্বাধীনতার উপর কিছু না কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। আইনসঙ্গত স্বাধীনতা প্রকৃতিগতভাবে নির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত হয়।

৪। আইনসঙ্গত স্বাধীনতার প্রকারভেদ (Different kinds of Legal Liberty)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীনতা শব্দটিকে আলোচনা করেছেন। স্বাভাবিকভাবে স্বাধীনতার প্রকারভেদ নিয়েও তাঁদের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বাধীনতাকে একটি আইনগত ধারণা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এই আইনগত স্বাধীনতা তিন প্রকারের, যথা—ক. ব্যক্তিস্বাধীনতা বা পৌর স্বাধীনতা, খ. রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং গ. অর্থনৈতিক স্বাধীনতা।

[ক] **ব্যক্তিস্বাধীনতা বা পৌর-স্বাধীনতা (Civil Liberty) :** ব্যক্তিস্বাধীনতা বা পৌর-স্বাধীনতা বলতে সেইসব অধিকার-ভোগ বোঝায় যার দ্বারা মানুষ তার ব্যক্তিসত্তার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সাধন করতে পারে। প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তার নাগরিকদের এরূপ ব্যক্তিস্বাধীনতা বা পৌর স্বাধীনতা প্রদান করে থাকে। এই সব স্বাধীনতার মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার, ধর্মের অধিকার, বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গুরুত্বপূর্ণ অধিকারগুলি যদি রাষ্ট্র কর্তৃক যথাযথভাবে স্বীকৃত ও সংরক্ষিত না হয়, তাহলে ব্যক্তির চরিত্র-বিকাশ ব্যাহত হবে। তাই বর্তমানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা বা পৌর স্বাধীনতা স্বীকৃতিলাভ করেছে।

ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বরূপ

[খ] **রাজনৈতিক স্বাধীনতা (Political Liberty) :** রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকার গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার বোঝায়। নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, নির্বাচন করার অধিকার, যোগ্যতা অনুযায়ী সরকারী চাকরিলাভের অধিকার, নিরপেক্ষভাবে সরকারী কার্যাবলীর সমালোচনা করার অধিকার প্রভৃতি রাজনৈতিক স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। এই স্বাধীনতার স্বীকৃতি ছাড়া গণতন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নাগরিকদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করে নেয়।

রাজনৈতিক স্বাধীনতার রূপ

[গ] **অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (Economic Liberty) :** অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ অভাব ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি। যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী কর্মে নিযুক্ত হওয়ার অধিকার, বেকার ও বার্ধক্য ভাতা পাওয়ার অধিকার, রুগ্ন ও অক্ষম অবস্থায় রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিপালিত হওয়ার অধিকার, উপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভের অধিকার ইত্যাদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। ল্যাস্কি প্রমুখ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। অন্নসংস্থানের জন্য দিবারাত্র ঘুরে বেড়াতে হলে, কিংবা বেকারত্বের জ্বালায় জ্বলতে হলে মানুষের মনে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণের কোন প্রবৃত্তিই জাগে না। কবি সুকান্তের ভাষায় :

অর্থনৈতিক স্বাধীনতার রূপ

> "ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় :
> পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।"

বস্তুতঃ, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে অন্যান্য স্বাধীনতা মানুষের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়তে বাধ্য। তাই বার্কার Barker মন্তব্য করেছেন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরাধীন শ্রমিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কখনোই স্বাধীন হতে পারে না। তাই অনেকে নাগরিকদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রদানের সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রদানের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তবে যে সমাজ-ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় লোকের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে সেখানে

জনগণের প্রকৃত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকতে পারে না। প্রকৃত অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন উৎপাদন ব্যবস্থায় সামাজিক মালিকানার প্রবর্তন। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাতেই অর্থনৈতিক অধিকারগুলিকে সংরক্ষিত থাকতে দেখা যায়।

৫। স্বাধীনতা সম্পর্কে বুর্জোয়া ধারণা (Bourgeois Concept of Liberty)

বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হোল ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বীকৃতি, অবাধ প্রতিযোগিতা, ব্যক্তিগত মুনাফা, উৎপাদনের এককেন্দ্রীকরণ, সংখ্যালঘু শ্রেণীর স্বার্থে মুষ্টিমেয় বাছাই-করা ব্যক্তির শাসন ইত্যাদি। এইসব মৌলিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বুর্জোয়া স্বাধীনতার ধারণা গড়ে উঠেছে। স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কোন অবস্থাতেই স্বাধীনতা সমাজের আর্থিক কাঠামো-নিরপেক্ষ হতে পারে না। তাই বুর্জোয়া আর্থিক কাঠামোর ভিত্তিতেই বুর্জোয়া স্বাধীনতার ধারণা গড়ে ওঠে—একথা বলা বাহুল্য মাত্র।

স্বাধীনতার ধারণা আর্থিক কাঠামো নিরপেক্ষ নয়

স্বাধীনতা সম্পর্কে বুর্জোয়া ধারণার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। হার্বার্ট আফথেকার (Herbert Aptheker)-এর মতে, স্বাধীনতা সম্পর্কে বুর্জোয়া মতবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হোল: ১. পুঁজিবাদ হোল প্রাকৃতিক অর্থনীতির একটি স্বাভাবিক অবস্থা; ২. সর্বপ্রকার সরকারী বাধানিষেধের অনুপস্থিতি (the absence of Governmental restraint); ৩. সরকারের উপর বাধানিষেধের উপস্থিতি; ৪. ক্ষমতা হোল একটি প্রয়োজনীয় ক্ষতিকারক বস্তু (necessary evil) এবং স্বাধীনতার অবস্থিতির জন্য তার নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক; ৫. স্বাধীনতা কেবলমাত্র রাজনৈতিক দিক থেকেই প্রাসঙ্গিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে নয় এবং ... স্বাধীনতার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে আর্থিক অসাম্যের উপস্থিতি। এছাড়াও স্বতঃস্ফূর্ততা (spontaneity), ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ (individualism) এবং দেশের অভ্যন্তরে মুষ্টিমেয় বাছাই-করা লোকের শাসন (elitism)—এই তিনটি হোল বুর্জোয়া স্বাধীনতার অপরাপর বৈশিষ্ট্য।

আফথেকারের অভিমত

স্বাধীনতার বুর্জোয়া ধারণার প্রথম বৈশিষ্ট্য হোল—এখানে স্বাধীনতা বলতে সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতার অবসানকে বোঝায়। বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা বুর্জোয়া বিপ্লবকে যুক্তি (reason) ও স্বাধীনতার বিপ্লব বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন। স্বাধীনতা সম্পর্কে এই বুর্জোয়া ধারণা সম্পূর্ণ নেতিবাচক (negative)। বুর্জোয়া তত্ত্ব স্বাধীনতা বলতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতিকে বোঝায়। এই ব্যবস্থা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে পবিত্র অধিকার বলে বর্ণনা করে একথা প্রচার করে যে, রাষ্ট্র এবং সরকারের প্রধান কর্তব্য হোল ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে স্বীকার করা ও সংরক্ষণ করা। বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা স্বাধীনতা সম্পর্কে ভাববাদী ধারণার তীব্র সমালোচনা করেছেন।

বুর্জোয়া স্বাধীনতা নেতিবাচক স্বাধীনতার ধারণা

স্বাধীনতা সম্পর্কে বুর্জোয়া ধারণার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হোল এই যে, স্বাধীনতা বলতে কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতাকেই বোঝায়। অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে স্বাধীনতার কোন সম্পর্ক নেই বলে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা প্রচার করেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সমর্থকরা স্বাধীনতার অর্থনৈতিক দিকটিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করতে পারেন নি। তাই তাঁরা মিশ্র অর্থনীতি (Mixed Economy) ও জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের (Welfare State) তত্ত্ব প্রচার করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে তার সংকটের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন।

স্বাধীনতা বলতে কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা

স্বাধীনতার বুর্জোয়া ধারণার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হোল অসাম্যের অবস্থিতি। বুর্জোয়া রাষ্ট্রে সাম্য সম্পর্কে ধারণা হোল নিছক আনুষ্ঠানিক (formal) ধারণামাত্র। এখানে সাম্য বলতে বোঝায় আইনের চোখে সকলেই সমান। বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা মনে করেন যে, যেখানে মানুষ তার দক্ষতা ও সামর্থ্য অনুসারে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলতে পারে, সেই দেশের সরকারকেই কেবলমাত্র স্বাধীন সরকার বলে অভিহিত করা যায়। তাঁরা আর্থিক বৈষম্যকে রাজনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তি বলে বর্ণনা করেন। কারণ সম্পদের অবস্থান বা অনুপস্থিতি সামর্থ্যের অবস্থান বা অনুপস্থিতিকে নির্ধারণ করে।

অসাম্যের অবস্থিতি

চতুর্থতঃ বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা স্বতঃস্ফূর্ততাকে স্বাধীনতার অপরিহার্য অঙ্গ বলে বর্ণনা করেন। বুর্জোয়া তত্ত্ব অনুসারে, পুঁজিবাদ হোল একটি স্বাভাবিক অবস্থা। যেখানে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করতে পারে না সেখানে স্বাধীনতাও থাকে না। তাঁদের মতে কেবলমাত্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে যথাযোগ্য মূল্য প্রদান করা হয়। তাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেই কেবলমাত্র স্বাধীনতার অস্তিত্ব থাকতে পারে।

স্বতঃস্ফূর্ততা

পঞ্চমতঃ বুর্জোয়া স্বাধীনতার ধারণা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী ধ্যানধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। বুর্জোয়াদের মতে, পুঁজিবাদ যদি স্বাভাবিক ব্যবস্থা হয় তাহলে প্রতিযোগিতা (laissez faire) সঠিক। অবাধ প্রতিযোগিতা যদি সঠিক হয় তা হলে প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজের জন্য কাজ করতে পারে। এইভাবে বুর্জোয়া স্বাধীনতার ধারণা প্রত্যেকটি বিষয়কেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক বলে মনে করে।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক [illegible]

ষষ্ঠতঃ স্বাধীনতার বুর্জোয়া ধারণা মুষ্টিমেয় বাছাই-করা লোকের তত্ত্বে আস্থাশীল। এই তত্ত্ব অনুসারে আপামর জনসাধারণ কখনই যথাযোগ্যভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারে না। তাই সুশাসনের জন্য বাছাই-করা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির প্রয়োজন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় বাছাই-করা লোকের তত্ত্ব দুভাবে কার্যকরী হয়। প্রথমতঃ আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিকদের বিশেষ গুণান্বিত বলে মনে করা হয়। দ্বিতীয়তঃ বাহ্যিক ক্ষেত্রে কৃষ্ণকায় মানুষের তুলনায় সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা অনেক বেশী উৎকৃষ্ট বলে প্রচার করা হয়। আফথেকারের মতে স্বাধীনতার সম্পর্কে বুর্জোয়া ধারণা

মুষ্টিমেয় বাছাই-করা লোকের শাসন

প্রধানতঃ মুষ্টিমেয় বাছাই-করা লোকের শাসন এবং জাতি-বিদ্বেষের তত্ত্বের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

সমালোচনা : স্বাধীনতা সম্পর্কে বুর্জোয়া ধারণার সমালোচনা নানা দিক থেকে করা যেতে পারে।

নেতিবাচক ধারণা

(১) এই ধারণা সম্পূর্ণ নেতিবাচক। কারণ বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা স্বাধীনতা বলতে সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতার অবসান বোঝান। কিন্তু বার্কার (Barker), ল্যাস্কি (Laski) প্রমুখ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ এই নেতিবাচক অর্থে স্বাধীনতাকে গ্রহণ করতে রাজী নন। ল্যাস্কি স্বাধীনতা বলতে এমন একটি পরিবেশের সংরক্ষণকে বোঝাতে চেয়েছেন যেখানে প্রত্যেকেই তার আত্মোপলব্ধির সুযোগ পায়। এর অর্থ হোল রাষ্ট্র কাম্য বাধানিষেধ আরোপ করেই কেবলমাত্র এরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। বার্কারের মতে, আইনসঙ্গত স্বাধীনতা কখনই অবাধ হতে পারে না। এরূপ স্বাধীনতা সকল মানুষের জন্য নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা মাত্র। বস্তুতঃ নিয়ন্ত্রণবিহীন স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর মাত্র। এরূপ স্বাধীনতা স্বীকার করে নিলে সবলের অত্যাচারে দুর্বল, পুঁজিপতিদের অত্যাচারে শ্রমিক, ধনীদের অত্যাচারে দরিদ্র ব্যক্তিদের স্বাধীনতা মূল্যহীন হয়ে পড়বে।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা উপেক্ষিত

(২) বুর্জোয়ারা স্বাধীনতা বলতে কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতাকেই বোঝাতে চান। কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা মূল্যহীন বলে ল্যাস্কি, বার্কার প্রমুখ লেখকেরা এবং মার্কসবাদিগণ মনে করেন। বার্কারের ভাষায়, অর্থনৈতিক দিক থেকে পরাধীন শ্রমিক কখনই রাজনৈতিক দিক থেকে স্বাধীন হতে পারে না।

সাম্যহীন স্বাধীনতা

(৩) স্বাধীনতা সম্পর্কে বুর্জোয়া তত্ত্ব অনুসারে সাম্য বলতে আইনের চোখে সকলেই সমান বোঝায়। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য-বৈষম্য বিদ্যমান থাকলে মানুষ কখনই আইনের চোখে সমান হতে পারে না। ধনবৈষম্যমূলক সমাজে রাষ্ট্র ধনিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে বলে আইনও বৈষম্যমূলক হতে বাধ্য। সুতরাং এই আইন কখনই সাধারণ মানুষের স্বাধীনতার রক্ষক হতে পারে না।

মার্কসবাদীদের সমালোচনা

(৪) মার্কসবাদীরা স্বতঃস্ফূর্ততাকে স্বাধীনতা বলে আদৌ মনে করেন না। এর পরিবর্তে পরিকল্পিত অর্থনীতির মাধ্যমে স্বাধীনতা যথার্থভাবে কার্যকরী হতে পারে বলে মার্কসবাদীরা মনে করেন। তাঁরা স্বতঃস্ফূর্ততাকে অবৈজ্ঞানিক বলে সমালোচনা করেন।

স্বাধীনতার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধারণাও ভ্রান্ত

(৫) স্বাধীনতা সম্পর্কে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধ্যানধারণাও ভ্রান্ত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ এককভাবে সমাজ-নিরপেক্ষ থেকে কোন ব্যক্তির পক্ষেই পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব নয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের স্বাধীনতা তত্ত্বকে স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ ক্ষুধার্ত নেকড়ের হরিণ শিশু ভক্ষণের স্বাধীনতা। এরূপ স্বাধীনতা কার্যক্ষেত্রে মুষ্টিমেয়ের স্বাধীনতা মাত্র।

(৬) স্বাধীনতা সম্বন্ধে মুষ্টিমেয় বাছাই-করা লোকের তত্ত্বটিও সমালোচনার

অপেক্ষা রাখে। এই তত্ত্ব উৎপাদনের মালিকদের বিশেষ গুণান্বিত বলে প্রচার করে এবং জাতিবিদ্বেষ প্রচার করে। তাই তত্ত্বটিকে চরম মানবতাবাদ-বিরোধী বলে ইতিহাসের কাঠগড়ায় বিচারের জন্য অভিযুক্ত করা যেতে পারে।

মানবতাবাদ-বিরোধী তত্ত্ব

৬। স্বাধীনতা সম্পর্কে মার্কসবাদী তত্ত্ব (Marxist Theory of Liberty)

স্বাধীনতা সম্পর্কে বুর্জোয়া ধারণার প্রতিবাদ হিসেবে মার্কসবাদী তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটে। মার্কসবাদীরা স্বাধীনতাকে বুর্জোয়া তত্ত্বের মতো নেতিবাচক অর্থে প্রয়োগ করার পরিবর্তে ইতিবাচক (Positive) অর্থে প্রয়োগ করেছেন। তাঁরা পুঁজিবাদকে কৃত্রিম ও পরাশ্রয়ী ব্যবস্থা বলে মনে করেন। তাঁরা একথা মনে করেন যে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে পবিত্র বলে বর্ণনা করে কার্যক্ষেত্রে সর্বপ্রকার অসাম্য-বৈষম্যকে প্রশ্রয় দিয়েছে। এরূপ রাষ্ট্র সম্পত্তিশালী শ্রেণীর স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা করে। মার্কসবাদীদের মতে, মানুষের স্বাধীনতা প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে বুর্জোয়া রাষ্ট্রতন্ত্রের বিলোপ সাধন একান্ত প্রয়োজন। সর্বহারাশ্রেণী রাষ্ট্রবিপ্লবের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে তাদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করে শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ গড়ে তুলবে। এই সমাজ হবে স্বাধীনতার পীঠস্থান।

মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা

মার্কসবাদীদের মতে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে সামগ্রিকভাবে সমাজের মধ্যে প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। অন্যভাবে বলা যায়, মার্কসবাদ পুঁজিবাদী স্বাধীনতা-তত্ত্বকে পুঁজিপতিদের আর্থিক শোষণ অব্যাহত রাখার রাজনৈতিক তত্ত্ব বলে মনে করে। মার্কসবাদীরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে সমস্ত স্বাধীনতার অগ্রদূত বলে মনে করেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য-বৈষম্যের অবসান ঘটলেই কেবলমাত্র রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে বলে তাঁরা মনে করেন। তাঁদের মতে সামাজিক, এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা একই সূত্রে গ্রথিত। কোনো স্বাধীনতাকেই বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা করা যায় না।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ

স্বাধীনতার মার্কসবাদী তত্ত্ব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের চরম বিরোধী। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অবাধ প্রতিযোগিতা, নেতিবাচক রাষ্ট্রের ধারণা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের স্বীকৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করে। তাই মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সামাজিক কল্যাণ ও সামাজিক স্বার্থের চরম বিরোধী।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের বিরোধী তত্ত্ব

মার্কসবাদ মুষ্টিমেয় বাছাই-করা ব্যক্তির শাসনের চরম বিরোধী। কেবলমাত্র শ্রেণীবিভক্ত সমাজেই এই তত্ত্বের প্রচার করা হয়। এই তত্ত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে অজ্ঞ, অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও নৈপুণ্যহীন বলে বর্ণনা করে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের হাতে শাসনক্ষমতা অর্পণের পক্ষপাতী।

মুষ্টিমেয় বাছাই-করা শাসনের বিরোধী

এইসব ব্যক্তি নিজেদের স্বার্থের উপযোগী শিক্ষা, সংস্কৃতি, শাসনব্যবস্থা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করে কার্যক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বাধীনতাকে উপেক্ষা করে। কিন্তু মার্কসবাদীরা মনে করেন যে, জনগণই হোল ইতিহাসের গতিপ্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ন্তা। তাই তাদের হাতে সর্বপ্রকার শাসনক্ষমতা প্রদান করে গণতন্ত্রকে সার্থক করে তোলা যায়। বস্তুতঃ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি অনুসরণের মাধ্যমে জনগণের স্বাধীনতাকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

স্বাধীনতার মার্কসবাদী তত্ত্ব বুর্জোয়াদের জাতিবিদ্বেষী ও সাম্রাজ্যবাদী নীতির চরম বিরোধী। কৃষ্ণকায় মানুষের তুলনায় শ্বেতাঙ্গরা অনেক বেশি গুণান্বিত—একথা মার্কসবাদ বিশ্বাস করে না। মার্কসবাদীরা শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে একজাতি কর্তৃক অন্য জাতিকে পদানত করার প্রচেষ্টাকে ঔপনিবেশিকতা বা সাম্রাজ্যবাদিতা বলে অভিহিত করেন। অন্যভাবে বলা যায়, মার্কসবাদ জাতিবিদ্বেষ তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী। মুষ্টিমেয় শোষক গোষ্ঠীর কবল থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য তাঁরা সর্বহারাদের আন্তর্জাতিকতার তত্ত্ব প্রচার করেন। বস্তুতঃ স্বতঃস্ফূর্ততাকে প্রাধান্যের আসনে বসিয়ে এবং মুষ্টিমেয়ের শাসনকে কায়েম করে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা যে স্বাধীনতার কথা প্রচার করেন মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে সেই স্বাধীনতা কেবলমাত্র স্বাধীনতার অস্বীকৃতিই নয়, তা অবৈজ্ঞানিকও বটে। মার্কসবাদীরা তাই পরিকল্পিত জীবনের মাধ্যমে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে চান এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সাহায্যে স্বাধীনতাকেও বিশ্লেষণ করার পক্ষপাতী। তাই এঙ্গেলস্ স্বাধীনতাকেও 'ঐতিহাসিক অগ্রগতির ফল' (a product of historical development) বলে বর্ণনা করেছেন।

জাতিবিদ্বেষী ও সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরোধী

পরিশেষে আফথেকারের ভাষায় বলা যেতে পারে, "সুতরাং বুর্জোয়া মতবাদে স্বাধীনতার শুধু একটি রাজনৈতিক অর্থই আছে আর অর্থনৈতিক বিষয়ের সঙ্গে তার কোন প্রাসঙ্গিকতাই নেই। সেখানে মার্কসীয় তত্ত্বানুসারে অর্থনৈতিক সম্পর্ক-বিন্যাসই সামাজিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ও সারবস্তুকে মূলতঃ নির্ণয় করে থাকে। আর সেই কারণে স্বাধীনতার প্রশ্নটির সঙ্গে এইসব সম্পর্ক-বিন্যাসের ঘনিষ্ঠতম সংযোগ আছে। মার্কসবাদীদের কাছে স্বাধীনতার সমস্যা হল মানবিক, আর সেই কারণেই সামাজিক; তা নিছক রাজনৈতিক নয়। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী হল দ্বান্দ্বিক, তা কখনই পৃথক পৃথক ভাগে খণ্ডিত নয়। সেইজন্য তা অন্য সবকিছুতে যেমন, স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও তেমনি প্রশ্নটিকে কোনও বিমূর্তরূপে বা কোনও অংশ হিসেবে দেখে না, দেখে একটি একীভূত বিষয় হিসেবে এবং সম্পূর্ণ নিটোল অবস্থাতেই।"

৭। স্বাধীনতার রক্ষাকবচ (Safeguards of Liberty)

সমাজবদ্ধ মানুষ সমাজের মধ্যে বাস করে কখনই অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না। স্বাধীনতার চরিত্রের মধ্যেই রয়েছে নিয়ন্ত্রণ। রাষ্ট্র আইনের সাহায্যে মানুষের অবাধ স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে সমাজের কল্যাণ সাধনে উদ্যোগী হয়। এই স্বাধীনতা ছাড়া মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশ কখনই সম্ভব নয়। সুতরাং আইনকে স্বাধীনতার পরিপন্থী

স্বাধীনতার রক্ষাকবচের প্রয়োজনীয়তা

না বলে পরিপূরক বলা যেতে পারে। অন্যভাবে বলা যায়—আইন হোল স্বাধীনতার শর্ত।

এদিক থেকে বিচার করে আইনকে নিঃসন্দেহে স্বাধীনতার সর্বপ্রথম রক্ষাকবচ বলা যেতে পারে। কিন্তু আইন প্রণীত হয় সরকারের দ্বারা এবং সরকার গঠিত হয় মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তিকে নিয়ে। তাই অনেক সময় দেখা যায়, সরকার যাঁদের নিয়ে গঠিত সেইসব ব্যক্তি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে আইনের অপব্যবহার করে থাকেন। তাঁরা ভুলে যান যে, জনকল্যাণ সাধন করাই তাঁদের প্রাথমিক কর্তব্য। বলা বাহুল্য, নির্বাচিত হলে ক্ষমতার আসনে বসে আদর্শভ্রষ্ট সরকার জনগণের স্বাধীনতা রক্ষার পরিবর্তে তার বিনাশ সাধন করে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করে। ফলে রাষ্ট্রীয় আইন পক্ষপাতমূলক হয়ে পড়ে। অনেক সময় রাষ্ট্রীয় আইন শ্রেণী-স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনেও ব্যবহৃত হয়। এইসব ক্ষেত্রে আইন কখনই স্বাধীনতার শর্ত বলে বিবেচিত হতে পারে না। তাই ব্যক্তিস্বাধীনতার সংরক্ষণের জন্য কতকগুলি রক্ষাকবচের প্রয়োজন। প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। এই ব্যবস্থাগুলিকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলে অভিহিত করা হয়। অধ্যাপক ল্যাস্কি যথার্থই বলেছেন যে, সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা ছাড়া অধিকাংশ লোকের পক্ষে স্বাধীনতা ভোগ করা অসম্ভব।

স্বাধীনতার গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচগুলি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হোল।

[ক] **সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধকরণ :** সংবিধানে মৌলিক অধিকার সমূহ লিপিবদ্ধ করা এবং সেইসব অধিকার ভঙ্গের বিরুদ্ধে শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের যথার্থ ব্যবস্থা করাকে অনেকে স্বাধীনতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ বলে মনে করেন। নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হলে সেগুলি সম্পর্কে জনগণের সুস্পষ্ট ধারণা থাকে। এর ফলে অধিকারগুলি ভঙ্গ করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে তারা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারে। কোন সময় সরকার যদি উক্ত অধিকার ভঙ্গ করে তবে জনগণ সাংবিধানিক উপায়ে নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হতে পারে। জনগণের স্বাধীনতার উপর বিধিবহির্ভূতভাবে সরকারী হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করে গণতন্ত্রকে রক্ষা করাই হোল নিরপেক্ষ আদালতের প্রধানতম কর্তব্য। এইসব কারণে সাম্প্রতিককালে সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধকরণের দিকে বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। ভারতবর্ষ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি রাষ্ট্রের সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধকরণ

[খ] **ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ :** সরকারের কার্যাবলী পরিচালিত হয় তিনটি বিভাগের দ্বারা। এই তিনটি বিভাগ হোল আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করে, শাসন বিভাগ আইনকে বাস্তবে রূপদান করে এবং বিচার বিভাগ আইনের ব্যাখ্যা করে। মন্তেস্কু, ব্ল্যাকস্টোন প্রমুখ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সমর্থকেরা মনে করেন যে, একই ব্যক্তি বা একই বিভাগের হস্তে আইন প্রণয়ন, শাসন ও বিচারকার্য

ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ

পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণ করা হলে সমাজে কখনোই ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষিত হতে পারে না, কারণ অত্যধিক ক্ষমতা উক্ত ব্যক্তি বা বিভাগকে স্বৈরাচারী করে তুলতে পারে।

ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণে ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ নীতির গুরুত্ব যে অসীম সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রে এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। তবে কেউ কেউ মনে করেন যে, ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ কখনই স্বাধীনতার প্রকৃত রক্ষাকবচ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। ইংল্যান্ডে ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ না থাকলেও ইংরেজরা আমেরিকানদের অপেক্ষা কোন অংশে কম স্বাধীনতা ভোগ করে না। নিরপেক্ষভাবে বলা যায় যে, পূর্ণ অর্থে ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ নীতিটি কাম্য বলে বিবেচিত না হলেও বিচার বিভাগীয় স্বাতন্ত্র্য একান্ত প্রয়োজন। বিচারপতিগণ যদি আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকেন তা হলে ন্যায় ও নিরপেক্ষভাবে বিচার করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা উপেক্ষিত হয়।

ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ স্বাধীনতার প্রকৃত রক্ষাকবচ নয়

[গ] আইনের অনুশাসন: অধ্যাপক ডাইসি (Dicey) প্রমুখ রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ আইনের অনুশাসন (Rule of Law)-কে স্বাধীনতার অন্যতম প্রধান রক্ষাকবচ বলে বর্ণনা করেছেন। আইনের অনুশাসন বলতে বোঝায়—১. আইনের প্রাধান্য এবং ২. আইনের চক্ষে সাম্য। আইনের প্রাধান্য থাকায় সরকার বে-আইনীভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না। আবার আইনের চক্ষে সবাই সমান হওয়ার জন্য ধনী-নির্ধন, অভিজাত-অভাজন, স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সমানভাবে স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। এইভাবে সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীনতা আইন কর্তৃক সংরক্ষিত হওয়ার ফলে যথার্থ রূপ পরিগ্রহ করতে পারে।

আইনের অনুশাসন

কিন্তু শ্রেণীবিভক্ত সমাজে আইনের দৃষ্টিতে সাম্য থাকতে পারে না। কারণ এরূপ সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানসমূহ, এমন কি সরকারও পরিচালিত হয় ধনিক ও বণিক শ্রেণীর স্বার্থে। স্বাভাবিকভাবে আইন ধনিক-শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য রচিত হয়। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা রক্ষার কোন সুযোগই থাকে না। তাই ধনতান্ত্রিক-সমাজব্যবস্থায় আইনের অনুশাসন কখনই স্বাধীনতার প্রকৃত রক্ষাকবচ বলে পরিগণিত হতে পারে না।

আইনের অনুশাসন প্রকৃত রক্ষাকবচ নয়

[ঘ] দায়িত্বশীল সরকার: দায়িত্বশীল সরকারকে স্বাধীনতার একটি গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ বলে মনে করা হয়। এরূপ শাসনব্যবস্থায় একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকার ফলে সরকারী দল কখনই স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে না। কারণ আইনসভার ভিতরে ও বাইরে বিরোধী পক্ষের সমালোচনার ভয়ে সরকার জনগণের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে সাহস পায় না। সরকারের ভুল-ত্রুটির সমালোচনা করে বিরোধী দলগুলি নিজেদের সপক্ষে জনমত গঠন করতে সর্বদাই সচেষ্ট থাকে। বলা বাহুল্য, বিরোধী দলগুলি জনগণের সমর্থন

দায়িত্বশীল সরকার

অর্জন করতে সক্ষম হলে সরকারী দলের পক্ষে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় আসীন থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই সরকার ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে কখনই জনমতের বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহসী হয় না। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, শক্তিশালী বিরোধী দলের অস্তিত্ব ছাড়া কখনই দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা সাফল্য অর্জন করতে পারে না।

[ঙ] **প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ:** প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলতে সরকার পরিচালনায় এবং আইন প্রণয়নে জনগণের প্রত্যক্ষ বা সক্রিয় ভূমিকা পালন বোঝায়।

প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ

গণভোট, গণ-উদ্যোগ, পদচ্যুতি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিগুলিকে অনেকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলে মনে করেন। সরকার নাগরিকদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে জনসাধারণ সরকারকে নিয়ন্ত্রণ বা ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার ভয়ে সরকার জনগণের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে সাহসী হয় না। কিন্তু বর্তমানে ভৌগোলিক ও জনসংখ্যার দিক থেকে রাষ্ট্রের আয়তন অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বৃহদায়তন রাষ্ট্রগুলিতে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায় না।

[চ] **ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণ:** ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ সরকারী কার্য পরিচালনার দায়িত্ব কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে অর্পিত হবে না। এই ক্ষমতা

ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণ

রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির হস্তেও প্রদত্ত হবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার এককভাবে এবং ইচ্ছামত ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারবে না। তার ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণ করা সহজতর হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন, যে-রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের হস্তে ক্ষমতা অতিমাত্রায় পুঞ্জীভূত থাকে সেখানে কোন প্রকার ব্যক্তিস্বাধীনতার অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

[ছ] **সদা-জাগ্রত জনমত:** স্বাধীনতার সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ হোল সদা-জাগ্রত জনমত। নাগরিকগণ সচেতনভাবে স্বাধীনতা রক্ষায় অগ্রসর না হলে উপরি-উক্ত

সদা-জাগ্রত জনমত

ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করেও কোনভাবেই তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। তাই জনগণকে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সদাসর্বদা সচেতন থাকতে হয়। সরকার যদি ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার প্রয়াসী হয় তাহলে সেই মুহূর্তে জনগণকে স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। যে-কোন মূল্যে, প্রয়োজনবোধে আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়েও জনগণকে স্বাধীনতা রক্ষার পবিত্র কর্তব্য পালন করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। তাই গ্রীক দার্শনিক পেরিক্লিস (**Pericles**) বলেছেন, সদাসতর্কতা স্বাধীনতার মূল্য এবং সাহসিকতা স্বাধীনতার মূলমন্ত্র। স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজনে নাগরিকদের যেমন সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়, তেমনি অধিকারহীন মানুষদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতেও নিরলস সংগ্রাম করা প্রয়োজন। এই অর্থে স্বাধীনতা-সংগ্রাম হোল অন্তহীন। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে, একদিকে যেমন সদা-জাগ্রত জনমতের প্রয়োজন, আবার অন্যদিকে তেমনি সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধকরণ, বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা, ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণ ইত্যাদিরও প্রয়োজন আছে।

৮। আইন ও স্বাধীনতা (Law and Liberty)

স্বাধীনতা বলতে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা বোঝায় যেখানে প্রতিটি মানুষ তার নিজস্ব ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারে। স্বাধীনতার উপযোগী এই পরিবেশ তখনই সৃষ্ট ও রক্ষিত হতে পারে, যদি রাষ্ট্র ব্যক্তিসত্তার বিকাশের উপযোগী অধিকারসমূহকে স্বীকৃতি দেয় এবং সেগুলি যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। এদিক থেকে বিচার করে বলা যায় যে, স্বাধীনতা একদিকে যেমন আইনের উপর নির্ভরশীল, অন্যদিকে তেমনি আবার রাষ্ট্রক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। আইনের দ্বারাই রাষ্ট্র স্বাধীনতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। তাই প্রকৃত স্বাধীনতা বলতে আইন দ্বারা অনুমোদিত স্বাধীনতাকে বোঝায়। আইন ছাড়া স্বাধীনতার অস্তিত্বের কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু আইন হোল মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী ও সার্বভৌম শক্তির দ্বারা সমর্থিত নিয়মাবলী। সুতরাং আইনের অর্থই হোল নিয়ন্ত্রণ। আপাতদৃষ্টিতে আইন ও স্বাধীনতা পরস্পর-বিরোধী বলে মনে হলেও উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করে বার্কার (Barker) বলেছেন যে, স্বাধীনতা এবং আইন কখনোই পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় না ; বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজনে সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বাধীনতার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। এই অর্থে প্রত্যেকের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা আবশ্যিকভাবে সকলের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা দ্বারা সীমিত এবং নিয়ন্ত্রিত।

আইনসঙ্গত স্বাধীনতাই যথার্থ স্বাধীনতা

কিন্তু জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill), হামবল্ট (Humboldt), স্পেন্সার (Spencer) প্রমুখের মতে, আইন, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব এবং স্বাধীনতা পরস্পর-বিরোধী। তাঁরা মনে করেন যে, ব্যক্তিগত কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করার কোন অধিকার রাষ্ট্রের নেই। এই নিয়ন্ত্রণের অর্থ ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব করা। লর্ড ব্রাইস (Bryce)-এর মতে, আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে একটির প্রাবল্য দেখা দিলে অপরটি সংকুচিত হয়ে পড়ে, কিন্তু একথা সত্য নয়। কারণ অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর মাত্র। নিয়ন্ত্রণ ছাড়া কখনোই যথার্থভাবে স্বাধীনতা ভোগ করা যায় না। আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রই এই নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত না হলে সবলের অত্যাচারে দুর্বলের স্বাধীনতা এবং শক্তিশালী রাষ্ট্রের আক্রমণে দুর্বল রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এরূপ অবাধ স্বাধীনতা প্রদানের ফলে সমাজে মুষ্টিমেয় শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিই কেবলমাত্র স্বাধীনতা ভোগ করবে। অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ দুর্বল জনসাধারণ আত্মবিকাশের উপযোগী সব সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। বস্তুতঃ, এরূপ সমাজব্যবস্থা ভয়াবহ ও বিশৃংখল হয়ে পড়ে। জোর যার মুলুক তার—নীতিটি সমাজের নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু স্মরণ রাখা একান্ত প্রয়োজন যে, স্বাধীনতা সমাজের প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার। এই অধিকার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নীতিগতভাবেও স্বীকৃতিলাভ করেছে। রাষ্ট্র যেহেতু প্রতিটি নাগরিকের অভিভাবক সেহেতু সমাজের প্রতিটি মানুষের স্বাধীনতা সংরক্ষণের দায়িত্ব নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রের উপর বর্তায়। সবলের অত্যাচার থেকে দুর্বলের স্বাধীনতা রক্ষা

আইন স্বাধীনতার রক্ষক

করে রাষ্ট্র স্বাভাবিকভাবেই নাগরিকদের আনুগত্য দাবি করতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে যথেচ্ছাচারের স্বাধীনতার উপর বাধানিষেধ আরোপ করে জনগণের স্বাধীনতা রক্ষার গুরুদায়িত্ব পালন করে।

আইনের সাহায্যে রাষ্ট্র মূলতঃ তিনটি উপায়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করে। প্রথমতঃ, সবলের অত্যাচারের হাত থেকে আইন দুর্বলকে রক্ষা করে। দ্বিতীয়তঃ, শাসকগোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারিতার ফলে যাতে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিনষ্ট হতে না পারে সেজন্য রাষ্ট্র বিশেষ ধরনের আইন প্রণয়ন করতে পারে। তৃতীয়তঃ, আইনের দ্বারা রাষ্ট্র এমন একটি সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে যেখানে প্রতিটি মানুষ তার স্বাধীনতা ভোগের মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে। আধুনিক রাষ্ট্রগুলি ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির প্রয়োজনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মাদকদ্রব্য বর্জন প্রভৃতি বিষয়ে জনহিতকর আইন প্রণয়ন করছে। আইন ও স্বাধীনতার এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রীচি (Ritchie) মন্তব্য করেন যে, স্বাধীনতা বলতে যদি আত্মবিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা বোঝায়, তাহলে তা নিশ্চিতভাবেই আইনের দ্বারা সৃষ্ট হয়।

তিনটি উপায়ে আইন স্বাধীনতা রক্ষা করে

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্টই প্রতীয়মান যে, আইন ও স্বাধীনতা পরস্পরবিরোধী নয় ; বরং একে অপরের পরিপূরক মাত্র। বস্তুতঃ, আইন একাধারে যেমন স্বাধীনতার রক্ষক হিসেবে কাজ করে, অন্যদিকে তেমনি স্বাধীনতার সম্প্রসারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আইন ছাড়া স্বাধীনতার অস্তিত্ব কল্পনাই করা যায় না। এই অর্থে আইন হোল স্বাধীনতার শর্ত (Law is the condition of Liberty)।

আইন, স্বাধীনতার শর্ত

কিন্তু আইন যে সর্বক্ষেত্রেই স্বাধীনতার শর্ত হিসেবে কাজ করবে এমন কোন কথা নেই। অধ্যাপক ল্যাস্কি (Laski), কার্ল মার্কস (Karl Marx) প্রমুখ মনীষিবৃন্দ মনে করেন যে, ধনবৈষম্যমূলক সমাজে আইন বৈষম্যমূলক হতে বাধ্য। বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন সর্বদাই ধনিক ও বণিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র জনসাধারণ কখনই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না। ল্যাস্কির মতে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। আবার কোন কোন রাষ্ট্রে আইন স্বাধীনতার রক্ষক না হয়ে ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যালঘু বর্ণবিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ সরকারের আইন সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিকদের স্বাধীনতা খর্ব করার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এদিক থেকে বিচার করে বলা যায় যে, আইন কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজে স্বাধীনতার প্রকৃত শর্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি

৯। বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থায় স্বাধীনতার প্রকৃতি (Nature of Liberty in different Social Systems)

সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা—এই তিনটি রাজনৈতিক আদর্শ যুগ যুগ ধরে মানুষের

মনে নতুন সমাজ গঠনের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। কিন্তু সর্বপ্রকার সমাজ ব্যবস্থায় স্বাধীনতার প্রকৃতি অভিন্ন হয় না। কোন্ সমাজে স্বাধীনতার প্রকৃতি কিরূপ হবে তা নির্ভর করে সেই সমাজের আর্থিক কাঠামোর উপর। অন্যভাবে বলা যায় যে, সমাজের আর্থিক কাঠামোর দ্বারা স্বাধীনতার প্রকৃতি নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

আর্থিক কাঠামোর সঙ্গে স্বাধীনতার সম্পর্ক

আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় সমগ্র সমাজ উৎপাদনের উপাদানসমূহের মালিক হওয়ায় সমাজের মধ্যে কোন শ্রেণীবৈষম্য বা শ্রেণীশোষণ ছিল না। সমাজে নারী-পুরুষরা সর্বপ্রকার স্বাধীনতা সমানভাবেই ভোগ করত; কিন্তু দাস সমাজে উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তন সাধিত হওয়ার ফলে সমাজে সর্বপ্রথম শ্রেণীশোষণের প্রবর্তন ঘটে। এই সমাজে রাষ্ট্র দাস-মালিকদের স্বার্থে পরিচালিত হওয়ায় তারা সর্বপ্রকার স্বাধীনতা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে থাকে। অপরদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দাসরা সর্বপ্রকার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত থাকত। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তো তাদের ছিলই না, এমন কি জীবনের স্বাধীনতা অর্থাৎ বাঁচার অধিকারও তাদের ছিল না। দাস-মালিকেরা ইচ্ছে করলেই তাদের হত্যা করতে পারত। এক কথায়, দাসরা দাস-মালিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হওয়ায় স্বাধীনতার স্বাদ কেমন তা তারা জানতই না। এই দাস-সমাজেই সর্বপ্রথম স্ত্রীলোকদের উপর পুরুষের সর্বপ্রকার কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। স্ত্রীলোকদের কোনরকম স্বাধীনতা ছিল না। ঐ সমাজে মুষ্টিমেয় দাস-মালিকরাই সর্বপ্রকার সুযোগসুবিধা ও স্বাধীনতা ভোগ করতে পারত।

দাস-সমাজে স্বাধীনতার স্বরূপ

সামন্ত সমাজে সামন্তশ্রেণী সর্বপ্রকার স্বাধীনতা ভোগ করত এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের সর্বপ্রকার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হোত। কৃষকেরা ছিল জমির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। তবে এই সমাজে কৃষকদের বাঁচার স্বাধীনতা ছিল। সামন্তরা দাস-মালিকদের মত ইচ্ছেমতো তাদের হত্যা করতে পারত না। রাষ্ট্র সামন্তশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করত। তাই রাষ্ট্র পরিচালনায় কেবলমাত্র ঐ ভাগ্যবান সামন্তরাই অংশগ্রহণ করতে পারত। এই সমাজে স্ত্রীলোকেরাও কৃষকদের মত সর্বপ্রকার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত থাকত।

সামন্ত সমাজে স্বাধীনতার স্বরূপ

বুর্জোয়া সমাজে স্বাধীনতার প্রকৃতি বুর্জোয়া আর্থিক কাঠামোর ভিত্তিতেই গড়ে উঠে। হার্বার্ট আফ্‌থেকারের মতে, স্বাধীনতা সম্পর্কে বুর্জোয়া মতবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হোল—১. পুঁজিবাদ হোল রাজনৈতিক অর্থনীতির একটি স্বাভাবিক অবস্থা; ২. সর্বপ্রকার সরকারী বাধানিষেধের অনুপস্থিতি; ৩. সরকারের উপর বাধানিষেধের উপস্থিতি; ৪. ক্ষমতা হোল একটি প্রয়োজনীয় শত্রু এবং স্বাধীনতার অবস্থিতির জন্য তার নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক; ৫. স্বাধীনতা কেবলমাত্র রাজনৈতিক দিক থেকেই প্রাসঙ্গিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে নয়; এবং ৬. স্বাধীনতার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে আর্থিক অসাম্যের উপস্থিতি। এছাড়াও স্বতঃস্ফূর্ততা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ এবং দেশের অভ্যন্তরে মুষ্টিমেয়

বুর্জোয়া স্বাধীনতার বৈশিষ্ট্য

বাছাই-করা লোকের শাসন—এই তিনটি হোল বুর্জোয়া স্বাধীনতার অপরাপর বৈশিষ্ট্য। বুর্জোয়া সমাজে তথা উদারনৈতিক ব্যবস্থায় স্বাধীনতা বলতে সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতার অবসানকে বোঝায়। বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা নেতিবাচক স্বাধীনতার আদর্শে বিশ্বাসী। এই ব্যবস্থা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে পবিত্র বলে বর্ণনা করে একথা প্রচার করে যে, রাষ্ট্র ও সরকারের প্রধান কর্তব্য হোল ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে স্বীকার করা ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। প্রতিটি বুর্জোয়া সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার সংবিধানে স্বীকৃতিলাভ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রের কথা এ সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা উপেক্ষিত হওয়ার ফল

বুর্জোয়া সমাজে কেবলমাত্র রাজনৈতিক এবং কিছু পরিমাণে সামাজিক স্বাধীনতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ঐ সব সমাজে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়। প্রতিটি বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সংবিধানে নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকারগুলিকে, যেমন—মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সরকারের সমালোচনা করার স্বাধীনতা, নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, নির্বাচন করার অধিকার ইত্যাদিকে লিপিবদ্ধ করা হয়। সেই সঙ্গে ব্যক্তিস্বাধীনতা, যেমন—স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার, ধর্মের অধিকার ইত্যাদিকেও স্বীকৃতিপ্রদান করা হয়। কিন্তু এইসব অধিকার কার্যক্ষেত্রে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাবে অবাস্তব বলে পরিগণিত হয়। কারণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা না থাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ কখনই তাদের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারগুলিকে বাস্তবায়িত করার সুযোগ পায় না। বুর্জোয়া সমাজে রাষ্ট্রযন্ত্র ধনিক শ্রেণীর অবাধ শোষণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান করে না। ফলে ধনশালীদের নিয়ন্ত্রণবিহীন স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতায় রূপান্তরিত হয়। সবলের অত্যাচারে দুর্বল, পুঁজিপতিদের অত্যাচারে শ্রমিক, ধনীদের অত্যাচারে দরিদ্র ব্যক্তিদের স্বাধীনতা অপহৃত হয়। তবে একথা সত্য যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে তার চরমতম সংকটের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা মিশ্র অর্থনীতি, জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের আদর্শ ইত্যাদি প্রচার করে জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। বস্তুতঃ, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় জনগণের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকায় রাজনৈতিক স্বাধীনতাও কার্যক্ষেত্রে মূল্যহীন হয়ে পড়েছে।

আইনের চোখে সাম্যের ধারণা ভ্রান্ত

পুঁজিবাদী সমাজে আইনের চোখে সকলেই সমান অর্থাৎ রাষ্ট্র সকলকেই সমান ভাবে স্বাধীনতা প্রদান করে—এই তত্ত্ব প্রচার করা হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য-বৈষম্য বিদ্যমান থাকায় ঐ সব সমাজে রাষ্ট্র ধনিক-বণিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। এইসব রাষ্ট্র-প্রণীত আইন কখনই সকলকে সমান চোখে দেখতে পারে না। অর্থাৎ ঐ সব আইনের দ্বারা জনগণের স্বাধীনতা কখনই রক্ষিত হতে পারে না। কারণ পুঁজিপতিরা আর্থিক বৈষম্যকেই রাজনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তি বলে মনে করেন। সুতরাং সর্বজনীন ভোটাধিকারের তত্ত্ব এই সমাজে শূন্যগর্ভ স্বাধীনতার তত্ত্ব মাত্র।

বুর্জোয়া স্বাধীনতার ধারণা অনুসারে পুঁজিবাদ হোল একটি স্বাভাবিক অবস্থা। অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজের ভাগ্যকে নির্ধারণ করার স্বাধীনতা প্রত্যেকেরই আছে বলে বুর্জোয়া সমাজে প্রচার করা হয়। তাই সর্বপ্রকার পরিকল্পিত ব্যবস্থাকে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা অকাম্য বলে মনে করেন। কিন্তু এ ধরনের অবাধ প্রতিযোগিতার অর্থ মুষ্টিমেয়ের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বাধীনতা খর্ব করা। বুর্জোয়া স্বাধীনতার তত্ত্বকে স্বীকার করে নিলে যা দাঁড়ায় তা হোল কলকারখানার মালিক যেমন শ্রমিকদের বেতন, কার্যের সময় ইত্যাদি নির্ধারণের স্বাধীনতা ভোগ করে, তেমনি শ্রমিকরাও অনুরূপ স্বাধীনতার অধিকারী। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে মালিকদের স্বাধীনতার বিরোধী যে কোন প্রস্তাব বা দাবি যদি শ্রমিকেরা তোলে তা হলে কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার স্বাধীনতা মালিকের আছে। এর অর্থ, মালিকের স্বাধীনতা তথা মতামতকে স্বীকার করে না নিলে শ্রমিকদের বাঁচার স্বাধীনতা থাকে না। সুতরাং বুর্জোয়া সমাজে যাকে স্বাধীনতা বলে প্রচার করা হয় আসলে তা মুষ্টিমেয়ের স্বাধীনতা মাত্র। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপকরণ-গুলির মালিকেরা বিশেষ গুণান্বিত বলে প্রচার করে তাঁদের বিশেষ স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। আবার বাহ্যিক ক্ষেত্রে জাতি বা বর্ণের দোহাই দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভুত্ব বিস্তারের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। এইভাবে হিটলার জার্মান জাতিকে শ্রেষ্ঠ জাতি বলে বর্ণনা করে অন্যান্য জাতির উপর কর্তৃত্ব করার স্বাধীনতা জার্মান জাতির আছে বলে প্রচার করেন; সুতরাং পুঁজিবাদী সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে মুষ্টিমেয়ের স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

বুর্জোয়া সমাজে মুষ্টিমেয়র স্বাধীনতার রক্ষিত হয়

মার্কসবাদীদের মতে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা জনগণকে প্রদান করা হয় সেই স্বাধীনতাও শেষ পর্যন্ত মিথ্যায় পর্যবসিত হয়। কারণ অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে যে, যখনই ঐসব দেশে সর্বহারাশ্রেণীর পার্টির ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে তখনই সেই পার্টির কার্যকলাপের উপর নানাপ্রকার বাধানিষেধ আরোপ করা হয়। এছাড়া, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর নানাপ্রকার বাধানিষেধ আরোপ করে শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়ারা দেশে ফ্যাসীবাদ কায়েম করে। সুতরাং পুঁজিবাদী সমাজে জনসাধারণের প্রকৃত কোন স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা মূল্যহীন

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে জন-গণের স্বাধীনতা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্কসবাদীরা মনে করেন যে, সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে সামগ্রিকভাবে সমাজে প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্কসবাদীরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে সমগ্র স্বাধীনতার অগ্রদূত বলে মনে করেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য-বৈষম্যের অবসান ঘটলেই কেবলমাত্র রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে বলে তাঁরা মনে করেন। তাঁদের মতে, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটিকে

সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রকৃত স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা

বাদ দিয়ে অন্যটির কল্পনাই করা যায় না। অর্থাৎ কোন স্বাধীনতাই বিচ্ছিন্ন নয়। গণ-সাধারণতন্ত্রী চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে মুষ্টিমেয় বাছাই-করা ব্যক্তির শাসনের পরিবর্তে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। জনগণকেই ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি বলে মনে করা হয়। তাঁদের হাতেই সর্বপ্রকার শাসনক্ষমতা প্রদান করে গণতন্ত্রকে বাস্তবে রূপায়িত করা হয়. বস্তুতঃ, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি অনুসরণের মাধ্যমে জনগণের স্বাধীনতাকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। মার্কসবাদ যেহেতু সাম্রাজ্যবাদ ও জাতিবিদ্বেষ তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী সেহেতু সমাজতান্ত্রিক সমাজে সর্বহারাদের আন্তর্জাতিকতার তত্ত্ব প্রচার করা হয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজে পরিকল্পিত জীবনের মাধ্যমে জনগণের স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

জনগণের স্বাধীনতা বাস্তবায়িত হয়

১০। সাম্যের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Definition and Nature of Equality)

সাম্য ও স্বাধীনতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। স্বাধীনতার ধারণাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে সাম্যনীতির প্রয়োগ অপরিহার্য। আপাতঃদৃষ্টিতে সাম্য বলতে সকলেই সমান বোঝায়। কিন্তু এরূপ সাম্যের ধারণা অলীক ধারণা মাত্র। ল্যাস্কির মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সাম্য বলতে সব বিষয়ে সমান ক্ষমতা বা অভিন্নতা বোঝায় না। এমন কি সাম্য বলতে ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও অভিন্নতা বোঝায় না। বাস্তবে দেখা যায়, শারীরিক ও মানসিক গঠনের দিক থেকে মানুষের সঙ্গে মানুষের যথেষ্ট পার্থক্য থাকে। ল্যাস্কি বলেছেন, একজন গণিতজ্ঞ ও একজন রাজমিস্ত্রি সমাজের কাছ থেকে সমপরিমাণ স্বীকৃতি লাভ করলে সমাজের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। তাঁর মতে, মানুষের অভাব, যোগ্যতা এবং প্রয়োজনের মধ্যে যতদিন পার্থক্য থাকবে ততদিন পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে ব্যবহারের সমতা থাকতে পারে না। সুতরাং সাম্য বলতে কখনই ব্যবহারের অভিন্নতা (identity of treatment)-কে বোঝায় না। যেহেতু ক্ষমতা ও যোগ্যতার দিক থেকে মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য থাকে সেহেতু রাষ্ট্রের কাছ থেকে সকলেই সমান ব্যবহার দাবি করতে পারে না। বস্তুতঃ ল্যাস্কির মতে, সাম্য বলতে বোঝায় বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অনুপস্থিতি এবং প্রত্যেকের সমান সুযোগ-সুবিধা লাভের অধিকার। এদিক থেকে বিচার করে সাম্য বলতে সুযোগের সমতাকে বোঝায়। যে সমাজে . শ্রেণীর লোক বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে সেই সমাজে তাঁদের অধিকারভোগী শ্রেণী বলে অভিহিত করা হয়। তাদের বিশেষ সুযোগসুবিধা প্রদানের অর্থ অন্যদের সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত করা। এরূপ সমাজে স্বাধীনতার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। কিন্তু লর্ড অ্যাকটন্ (Lord Acton), টকভিল (Tocquevile) প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সাম্যকে স্বাধীনতার পরিপন্থী বলে মনে করতেন। হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer)-ও অনুরূপ অভিমত পোষণ

সাম্যের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

করতেন। কিন্তু তাঁরা স্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেননি। কারণ অর্থনৈতিক সাম্য ছাড়া ব্যক্তিস্বাধীনতা কখনই বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য বৈষম্য বর্তমান থাকলে বাস্তবে ধনশালী শ্রেণীর দ্বারা ধনহীনদের স্বাধীনতা অপহৃত হয়। সুতরাং অর্থনৈতিক দিক থেকে সাম্যমূলক সমাজেই কেবল স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ল্যাস্কি সাম্য বলতে প্রত্যেকের সমান সুযোগসুবিধা লাভের অধিকারকে বোঝাতে চেয়েছেন।

সমাজতন্ত্র সব কিছুকে পিটিয়ে সমান করে দেবে, প্রত্যেকের প্রয়োজন ও ব্যক্তিগত জীবন সমান ও এক করে দেবে ইত্যাদি কথা মার্কসবাদের বিরুদ্ধে প্রচার করা হয়। কিন্তু ঐরূপ ধারণার সঙ্গে মার্কসবাদের কোন সম্পর্ক নেই। মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে সাম্যের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে স্তালিন বলেছিলেন, "সাম্য বলতে মার্কস একথা কখনই বোঝাতে চাননি যে, ব্যক্তির স্বতন্ত্র প্রয়োজন ও জীবন সমান করে দেওয়া হবে। সাম্য বলতে তিনি সমাজের শ্রেণী-বিভাগ লোপের কথাই বলেছেন। অর্থাৎ—১. পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ ও অধিকারচ্যুত করার পর সমস্ত মেহনতী জনসাধারণ সমানভাবে মুক্তিলাভ করবে : ২. উৎপাদনের সমস্ত উপায় সমগ্র সমাজের সম্পত্তিতে পরিণত হওয়ার পর ব্যক্তিগত সম্পত্তির সবই সমানভাবে লোপ পাবে ; ৩. নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করার সমান কর্তব্য থাকবে এবং কাজের পরিমাণ অনুযায়ী সমস্ত মেহনতী মানুষ সমান পারিশ্রমিক পাবে ; ৪. সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করা সকলেরই সমান কর্তব্য এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পারিশ্রমিক লাভের অধিকার সমস্ত মেহনতী মানুষের সমানভাবে থাকবে। অধিকন্তু মার্কসবাদ এই ধারণাকে স্বীকার করে নিয়ে অগ্রসর হয়েছে যে, সমাজতন্ত্রের যুগে বা কমিউনিস্ট সমাজের যুগে কখনই মানুষের রুচি ও প্রয়োজন গুণ বা পরিমাণের দিক থেকে অভিন্ন নয় এবং তা হতেও পারে না। এটাই হোল সাম্য সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণা।" লেনিনের মতে, "...শোষক ও শোষিতের মধ্যে, ভূরিভোজী ও ক্ষুধার্তদের মধ্যে 'সাম্য' আমরা খনই স্বীকার করি না।" তিনি ঘোষণা করেন যে, "যতদিন পর্যন্ত শ্রেণী-বিভাগ বজায় আছে, ততদিন শ্রেণীসমূহের স্বাধীনতা ও সাম্যের কথা বলার অর্থই বুর্জোয়াদের মতো প্রতারণা করা।"

মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে সাম্য

১১। সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক (Relation between Equality and Liberty)

সাম্য ও স্বাধীনতা একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির অস্তিত্বের কথা কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন সাম্য ও স্বাধীনতাকে পরস্পর-বিরোধী আদর্শ বলে মনে করা হোত। লর্ড অ্যাক্টন (Lord Acton), টকভিল (Tocqueville) প্রমুখ রাষ্ট্র-বিজ্ঞানিগণ সাম্যকে স্বাধীনতার পরিপন্থী বলে মনে করতেন। হার্বার্ট স্পেন্সারও অনুরূপ অভিমত পোষণ করতেন। অ্যাক্টনের মতে, 'সাম্যের জন্য আবেগ স্বাধীনতার আকাশকে নির্মূল করে।' কিন্তু

সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর-বিরোধী বলে অনেকের ধারণা

এই ধারণা সঠিক নয়। সম্ভবতঃ এঁরা সাম্যের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেননি। বস্তুতঃ ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, যখন কোন ব্যক্তির স্বৈরাচারিতা প্রতিরোধ করার উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি হয়নি, কেবলমাত্র তখনই সেই স্বৈরাচারী ব্যক্তি ক্ষমতার অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত স্বার্থে সমাজের ধনসম্পদকে ব্যবহার করেছে। ফলে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যক্তিরা চরমতম দুঃখদারিদ্র্যের মধ্যে পড়েছে। এমতাবস্থায় সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর-বিরোধী বলে প্রতিপন্ন হয়েছে।

কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বলা যায় যে, সাম্য ও স্বাধীনতা আদৌ পরস্পর-বিরোধী নয়; বরং একে অপরের পরিপূরক। স্বাধীনতার ধারণাকে কার্যকরী করতে হলে সাম্যের প্রয়োগ একান্তভাবেই অপরিহার্য। ল্যাস্কির মতে, সমাজের মধ্যে যদি বিশেষ সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা থাকে তাহলে জনগণের কোন প্রকার স্বাধীনতা থাকতে পারে না। বস্তুতঃ, স্বাধীনতা বলতে এমন একটি সামাজিক পরিবেশকে বোঝায় যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি নিজস্ব ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশসাধনের সুযোগ পায়। সমানাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে কখনই স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে টনি (R. H. Tawney) বলেছেন, স্বাধীনতা বলতে যদি মানবতার নিরবচ্ছিন্ন প্রসার বোঝায়, তাহলে সেই স্বাধীনতা কেবলমাত্র সাম্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থাতেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সুতরাং সাম্য কখনই স্বাধীনতার পরিপন্থী হতে পারে না। বস্তুতঃ বর্তমানে উভয় ধারণাই প্রকৃতিগত ভাবে আইনগত ধারণামাত্র। স্বাধীনতা রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত এবং রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা সংরক্ষিত হয়। স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রীয় আইন সমাজের মধ্যে অবস্থিত বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অবসান ঘটায়। তবে একথা সত্য যে, ধনবৈষম্যমূলক সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত না থাকায় রাজনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে আইনগত স্বাধীনতার কোন মূল্য থাকে না। এরূপ সমাজে ধনশালী ব্যক্তিদের দ্বারা ধনহীনরা ক্রমাগতই শোষিত ও বঞ্চিত হতে থাকে। আইনও এখানে বৈষম্যমূলক হতে বাধ্য। তাই বলা যেতে পারে যে, কেবলমাত্র সাম্যমূলক সমাজে অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজে স্বাধীনতা অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে।

সাম্য ও স্বাধীনতা একে অপরের পরিপূরক

১২। সাম্যের ধারণার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (Origin and development of the ideas of Equality)

স্টোয়িক দার্শনিকগণ দাস প্রথার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সর্বপ্রথম স্বাভাবিক অসাম্যের তত্ত্বের বিরোধিতা করেন। তারা বিশ্বজনীন প্রাকৃতিক আইন, বিশ্বজনীন নাগরিকতা এবং মানুষের স্বাভাবিক সাম্যের আদর্শ প্রচার করেন। তাঁদের মতে, সব মানুষই যেহেতু সমান সেহেতু স্বাধীনতা হোল সাম্যভিত্তিক। তবে স্টোয়িক দার্শনিকগণ রাজনৈতিক দিক থেকে সাম্য সম্পর্কে আলোচনা করেননি। পরবর্তী সময়ে রোমান আইনবিদরা মানুষের স্বাভাবিক সাম্যের তত্ত্ব প্রচার করেন। পরে খ্রীষ্টান আদর্শ সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের আদর্শ প্রচারিত হয়। সেন্ট পল

স্টোয়িক দার্শনিকদের রচনায় সাম্য সম্পর্কে ধারণা

(St. Paul) প্রচার করেন যে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ইহুদী অথবা গ্রীক, বর্বর অথবা সুসভ্য মানুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। পরবর্তী সময়ে সাম্যের আদর্শ বিশেষভাবে প্রচারিত হয় লক্, ভল্টেয়ার (Voltaire), রুশো, জ্যাফারসন (Jefferson) এবং টম্পেন (Tompaine) প্রমুখের মাধ্যমে।

সাম্য

১৭৭৬ সালে ঘোষিত আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। এরপর ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সের জাতীয় সংসদ ঘোষণা করে যে, প্রত্যেক মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে এবং প্রত্যেকেই সমানভাবে অধিকার ভোগ করতে পারে। বস্তুতঃ সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময় উদীয়মান পুঁজিপতি শ্রেণী সাম্য ও স্বাধীনতার বাণী প্রচার করে জনসাধারণের সমর্থন ও সহানুভূতি লাভের চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে রীচি (Ritchie) বলেন যে, বৈষম্যের উত্তরাধিকার হিসেবে সাম্য সম্পর্কিত ধারণাটি জন্মলাভ করে। অন্যভাবে বলা যায়, প্রাচীন অভিজাততান্ত্রিক দাস-সমাজে অভিজাত ব্যক্তিরা প্রজা ও দাসদের সংগে তুলনা করে নিজেদের স্বাধীন ও পরস্পরের সঙ্গে সমান বলে প্রচার করতেন। পরবর্তীকালে এই বিশেষ অভিজাত শ্রেণীর বিশেষ সুযোগ-সুবিধা লাভের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে সাম্যের আদর্শ জন্মলাভ করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাম্যের ধারণা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীরা সর্বপ্রকার বিশেষ সুযোগসুবিধার বিলোপসাধন এবং ব্যক্তিগত কর্মক্ষেত্রে সর্বপ্রকার রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অবসান দাবি করতেন। এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাম্য সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণার উদ্ভব ঘটে। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে সাম্য সম্পর্কিত ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে সাম্য বলতে সকলকেই সমান সুযোগসুবিধা দানের কথা বলা হয়। ল্যাস্কির মতে, সাম্য বলতে বোঝায় বিশেষ সুযোগসুবিধার অনুপস্থিতি এবং প্রত্যেকের জন্য সমান সুযোগসুবিধা পাওয়ার অধিকার। রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ছাড়া এরূপ সমান সুযোগসুবিধা কখনই জনসাধারণ লাভ করতে পারে না। তবে মার্কসবাদিগণ মনে করেন যে, সমাজে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হলে কখনই সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এইভাবে যুগে যুগে সমাজ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাম্যের ধারণাও পরিবর্তিত হয়েছে।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে সাম্য সম্পর্কিত ধারণা

১৩। সাম্যের বিভিন্ন রূপ (Different Forms of Equality)

সাম্যের ধারণাকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—১. স্বাভাবিক সাম্য (Natural Equality), ২. সামাজিক সাম্য (Social Equality) এবং ৩. আইনগত সাম্য (Legal Equality)।

(১) স্বাভাবিক সাম্য বলতে জন্ম থেকেই প্রত্যেকে স্বাধীন এবং সমান অধিকারসম্পন্ন বোঝায়। অন্যভাবে বলা যায়, স্বাভাবিক সাম্য একথা বিশ্বাস করে যে,

জন্মগতভাবে মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নেই। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণায় স্বাভাবিক সাম্যের তত্ত্ব প্রচারিত হয়। বর্তমানে কিন্তু স্বাভাবিক সাম্য তত্ত্বকে অবাস্তব বলে বর্ণনা করা হয়। কারণ জন্মগতভাবে সব মানুষ দৈহিক এবং মানসিক দিক থেকে সমান হয় না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, প্রতিভা, কর্মদক্ষতা ইত্যাদি কখনই সমান হয় না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এই স্বাভাবিক বৈষম্যকে স্বীকার করে নিয়ে সাম্যের তত্ত্ব প্রচার করা হয়। বর্তমানে সাম্য বলতে সমাজে বিশেষ বিশেষ সুযোগসুবিধার অবসান এবং সকলের আত্মবিকাশের উপযোগী সমান সুযোগসুবিধা দানকেই বোঝায়।

স্বাভাবিক সাম্যের প্রকৃতি

(২) সামাজিক সাম্য বলতে সমাজের দৃষ্টিতে মানুষের সঙ্গে মানুষের সমতাকে বোঝায়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশ-মর্যাদা, অর্থ ও প্রতিপত্তির ভিত্তিতে কোন মানুষের সঙ্গে মানুষের যখন পার্থক্য নিরূপণ করা হয় না তখনই তাকে সামাজিক সাম্য বলা হয়। যে সমাজে ধর্ম, জাতি, বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে মানুষে মানুষে পার্থক্য নিরূপণ করা হয় সেই সমাজে সামাজিক সাম্যের অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে সামাজিক দিক থেকে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। তাই ঐ দেশে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বস্তুতঃ, ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য-বৈষম্য বিদ্যমান থাকায় সামাজিক ক্ষেত্রেও তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। কেবলমাত্র শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজেই সামাজিক সাম্যের অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

সামাজিক সাম্যের প্রকৃতি

(৩) আইনগত সাম্য বলতে বোঝায় আইনের দৃষ্টিতে সমানাধিকারের প্রতিষ্ঠা। রাষ্ট্র সকলকেই আত্মবিকাশের উপযোগী সমান সুযোগসুবিধা প্রদান করবে। কিন্তু শ্রেণী-বৈষম্যমূলক সমাজে রাষ্ট্র যেহেতু প্রভুত্বকারী শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত হয় সেহেতু এরূপ রাষ্ট্রের আইন কখনই সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। আইনগত সাম্যকে অনেকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন, যথা—ক. ব্যক্তিগত সাম্য, খ. রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য এবং গ. অর্থনৈতিক সাম্য।

আইনগত সাম্যের প্রকৃতি ও শ্রেণীবিভাগ

[ক] সমাজের মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তি যখন সমস্ত সামাজিক অধিকার সমানভাবে ভোগ করার সুযোগ লাভ করবে তখনই তাকে ব্যক্তিগত সাম্য বলে। আইন তথা রাষ্ট্র জাতি, ধর্ম, বর্ণ, অর্থ ও প্রতিপত্তির ভিত্তিতে নাগরিকদের কোন পার্থক্য নিরূপণ করবে না। আইনের অনুশাসনের মাধ্যমেই ব্যক্তিগত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ধনবৈষম্যমূলক সমাজে ব্যক্তিগত সাম্য কখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কারণ এরূপ সমাজে রাষ্ট্র প্রভুত্বকারী শ্রেণীকে বিশেষ সুযোগসুবিধা দান করে। কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজেই এরূপ সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

ব্যক্তিগত সাম্যের প্রকৃতি

[খ] রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকার ভোগের সমান সুযোগলাভকেই রাজনৈতিক সাম্য বলে অভিহিত করা হয়। অন্যভাবে বলা যায়—জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ ও বিত্তবান-বিত্তহীন নির্বিশেষে যখন দেশের প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক এবং সুস্থমস্তিষ্ক নাগরিক নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার ভোগ করে তখন তাকে রাজনৈতিক সাম্য

বলা হয়। এখানে সমস্ত নাগরিকই সমান সংখ্যক ভোটদানের অধিকারী। রাজনৈতিক সাম্য বলতে নির্বাচন করার সমান অধিকার, যোগ্যতা থাকলে নির্বাচিত হওয়ার সমান অধিকার ও যোগ্যতা থাকলে সরকারী চাকরি লাভের সমান অধিকার ইত্যাদি বোঝায়।

রাজনৈতিক সাম্যের প্রকৃতি

[গ] অর্থনৈতিক সাম্য বলতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সকলের সমান সুযোগলাভের অধিকারকে বোঝায়। অর্থনৈতিক সাম্য ছাড়া ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক ও আইনগত সাম্যের ধারণা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। ধনবৈষম্যমূলক সমাজে অর্থাৎ অর্থনৈতিক সাম্য-বিহীন সমাজে প্রত্যেকেই জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাই ম্যাথু আরনল্ড (Mathew Arnold) বলেছেন, ধনবৈষম্যমূলক সমাজে উচ্চ-শ্রেণী আপন স্বার্থসিদ্ধির কথা চিন্তা করে; মধ্যবিত্ত শ্রেণী নীচ মানোবৃত্তিসম্পন্ন হয় এবং নিম্ন পশুতে পরিণত হয়। এইভাবে কারো জীবন সুষমভাবে বিকশিত হতে পারে না। মার্কসবাদীরা অর্থনৈতিক সাম্যকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হলে অন্যান্য ক্ষেত্রে কখনই সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাঁরা অসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করার পক্ষপাতী। এরূপ সমাজে একদিকে ধনশালীদের বিপুল পরিমাণ ধনের অবস্থিতি অধিকাংশ মানুষকে ন্যূনতম জীবনধারণের সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত করে। তাই ল্যাস্কি বলেছেন, যে সমাজে আমার প্রতিবেশীরা না খেয়ে থাকে সেই সমাজে আমার পর্যাপ্ত আহার গ্রহণ করবার অধিকার নেই। এদিক থেকে বিচার করে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজেই সর্বপ্রকার সাম্য বিদ্যমান থাকে বলা যেতে পারে।

অর্থনৈতিক সাম্যের প্রকৃতি

১৪। বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থায় সাম্যের প্রকৃতি (Nature of Equality in different Social Systems)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাম্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার দাবিতে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৭৭৬) ও ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯) সংঘটিত হলেও তখন সাম্য সম্পর্কে যে ধারণা ছিল বর্তমানে সেই ধারণার যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সাম্য সকলের কাছেই কাম্য আদর্শ বলে বিবেচিত হলেও বিভিন্ন প্রকার সমাজব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রকার সাম্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, স্বাধীনতার মতোই সাম্য সম্পর্কিত ধারণাটিও সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো-নিরপেক্ষ নয় অর্থাৎ সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে তা সুগভীরভাবেই সম্পৃক্ত। ফলে, যে-সমাজে যেমন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সেই সমাজে সাম্যের প্রকৃতিও সেরূপ হতে বাধ্য।

সাম্য অর্থনৈতিক কাঠামো-নির্ভর

আদিম সাম্যবাদী সমাজে উৎপাদনের উপাদানসমূহের উপর কোনরূপ ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত ছিল না, সমাজের মধ্যে সাম্যের নীতি প্রবর্তিত ছিল। ঐ সমাজে অধিকার-ভোগী ও অধিকারবিহীন কোন মানুষ ছিল না। সমাজে স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের মতই মর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী ছিল। কিন্তু দাস-সমাজে এবং সামন্ত-সমাজে উৎপাদনের

দাস ও সামন্ত সমাজে সাম্যের প্রকৃতি

উপাদানসমূহের মালিকানা দাস-মালিক ও সামন্তশ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত থাকায় সমাজে অসাম্য-বৈষম্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ঐ দুটি সমাজে দাসরা এবং কৃষকরা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাম্য থেকে বঞ্চিত ছিল। রাষ্ট্র ঐ দুটি প্রভুত্বকারী শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত হোত বলে সমাজের অসংখ্য মানুষকে সর্বপ্রকার অধিকার ও সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত করে রাখা অনেক বেশী সহজ ছিল।

পুঁজিবাদী সমাজে রাজনৈতিক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা পরিমাণে সামাজিক সাম্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সামন্ত-তন্ত্রের সঙ্গে বিরোধ বাধলে পুঁজিপতিরা জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন ও সহানুভূতি লাভের জন্য রাজনৈতিক সাম্য ও সামাজিক সাম্যের কথা প্রচার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ব্রিটেন, ভারতবর্ষ ইত্যাদি পুঁজিবাদী সমাজে সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা সগৌরবে প্রচার করা হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনের চোখে সবাই সমান; আইন সকলকেই সমানভাবে সংরক্ষণ করে। এইভাবে আইনের অনুশাসন তথা আইনের দৃষ্টিতে সাম্য প্রতিষ্ঠার কথাও বলা হয়। আইন তথা রাষ্ট্র সমস্ত নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সমান সুযোগ প্রদান করে এবং সর্বপ্রকার বিশেষ সুযোগ-সুবিধার বিলোপ সাধন করে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, অর্থ, প্রভাবপ্রতিপত্তি ইত্যাদির ভিত্তিতে রাষ্ট্র নাগরিকের সঙ্গে নাগরিকের কোন রকম ভেদাভেদ করে না। এমন কি, কোন কোন পুঁজিপতি সমাজে আইনের দৃষ্টিতে সকল ধর্মকে সমান বলে বর্ণনা করে ধর্মীয় ক্ষেত্রেও সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। সর্বোপরি, প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন নাগরিককে সমভাবে এবং সমপরিমাণে ভোটাধিকার প্রদান করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা প্রচার করা হয়। এইভাবে পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্যের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু ঐ সব সমাজে অর্থনৈতিক সাম্যকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা বা অস্বীকার করা হয়। বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা মনে করেন যে, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক ও সামাজিক সাম্যের প্রতিষ্ঠাই যথেষ্ট। এর জন্য অর্থনৈতিক সাম্যের কোন প্রয়োজন নেই। বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্যের মূল কারণ যে অবাধ বা স্বাচ্ছন্দ্য নীতি তা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে, পুঁজিবাদ হোল স্বাভাবিক অবস্থা এবং উৎপাদনের উপাদানের মালিকরা বিশেষ গুণে গুণান্বিত। তাই স্বাভাবিকভাবেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগসুবিধা আইনসঙ্গতভাবেই তাঁদের প্রাপ্য। এইসব সুযোগসুবিধা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হলে গণতন্ত্রকে অস্বীকার করা হবে।

পুঁজিবাদী সমাজে সাম্যের প্রকৃতি

কিন্তু একথা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত না থাকায় আইনের দৃষ্টিতে সাম্য কার্যক্ষেত্রে মিথ্যায় পর্যবসিত হয়। কারণ পুঁজিবাদী সমাজে রাষ্ট্র পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে যেহেতু কাজ করে, সেহেতু এরূপ রাষ্ট্রের আইন কখনই সাম্যমূলক হতে পারে না। তা ছাড়া যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া যায়

অর্থনৈতিক সাম্য না থাকায় অন্যান্য সাম্য অর্থহীন

যে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে আইনের দৃষ্টিতে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব তাহলেও বলা যেতে পারে যে, ধনশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে পাঞ্জা কষে দরিদ্র ব্যক্তিরা কখনই নিজেদের সমান অধিকারের দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। তাই পুঁজিবাদী সমাজে অর্থনৈতিক সাম্যের অভাবে আইন পক্ষপাতমূলক হতে বাধ্য। এরূপ আইনের সাহায্যে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়তায় পুঁজিপতি শ্রেণী বিশেষ সুযোগসুবিধা সহজেই লাভ করতে পারে। সর্বোপরি, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য না থাকায় রাজনৈতিক ও সামাজিক সাম্য প্রহসনে রূপান্তরিত হয়। সমাজের অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রভুত্বকারী শ্রেণীর হাতে জনমত গঠনের মাধ্যমগুলি কেন্দ্রীভূত থাকায় তারা সেগুলিকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগায়। নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ-বিরোধী কোন মতামত প্রচার করতে তারা দেয় না। এমন কি প্রচারকৌশলে বিভ্রান্ত করে শ্রমিকশ্রেণীকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থতার কাজে লাগায়। বস্তুতঃ, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রাজনৈতিক সাম্যের আড়ালে পুঁজিপতিরা অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশেষ সুযোগসুবিধা ভোগ করে। সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা না থাকায় কার্যক্ষেত্রে তারা রাজনৈতিক ও সামাজিক সাম্যের অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগসুবিধাভোগী বিশেষ কোন প্রভুত্বকারী শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকে না। রাষ্ট্র এখানে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের স্বার্থে কাজ করে না বলে আইনের চোখে সাম্য বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এরূপ সমাজে জনসাধারণ নির্ভীকভাবে তাদের মনোনীত প্রার্থী নির্বাচন করতে পারে। উপযুক্ত যোগ্যতা থাকলে তারা নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবেও দাঁড়াতে পারে। অর্থনৈতিক দিক থেকে সবাই সমান সুযোগসুবিধা লাভ করে বলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারে। ফলে গ[illegible]ন্ত্র তত্ত্বসর্বস্ব নীতিকথার ঊর্ধ্বে উঠে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। এরূপ সমাজে ধর্ম, বর্ণ, জাতি ইত্যাদির ভিত্তিতে মানুষে মানুষে কোন ভেদবিচার করা হয় না। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'—এই নীতির ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এরূপ মানবতাবোধই সমাজতন্ত্রকে প্রকৃত গণতন্ত্রের স্তরে উন্নীত করে। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে অন্যসব ক্ষেত্রেও সাম্য বিরাজ করে। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ঠিক তার বিপরীত চিত্র লক্ষ্য করা যায়।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে সাম্যের প্রকৃতি

চতুর্দশ অধ্যায়

রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও কার্যাবলী

[Ends and Functions of the State]

১। রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Ends and Purposes of the State)

রাষ্ট্রের প্রকৃতির উপর তার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নির্ভর করে। রাষ্ট্রের প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যেমন বাদানুবাদের অন্ত নেই, তেমনি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেও তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং রাষ্ট্রের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন সর্ববাদীসম্মত অভিমত জ্ঞাপন করা অদ্যাবধি সম্ভব হয়নি।

রাষ্ট্রের লক্ষ্য সম্পর্কে মতবিরোধ

প্লেটো, অ্যারিস্টট্‌ল প্রমুখ গ্রীক দার্শনিকগণ 'সুন্দর মঙ্গলময় জীবনের প্রতিষ্ঠা' (good life)-কে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বলে মনে করতেন। পরবর্তী সময়ে আদর্শবাদী দার্শনিকগণ রাষ্ট্রকে একটি মহিমান্বিত প্রতিষ্ঠান বলে কল্পনা করে রাষ্ট্রকেই রাষ্ট্রের চরম লক্ষ্য (The state is an end in itself) বলে বর্ণনা করেছেন। অপরপক্ষে খ্রীষ্টধর্ম-প্রতিষ্ঠান (Church)-এর সদস্যগণ এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদিগণ সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, রাষ্ট্র একটি ক্ষতিকর কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান। চুক্তি-মতবাদী ইংরেজ দার্শনিক হব্‌সও অনুরূপ মত পোষণ করে বলেন যে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হোল শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করা। মার্কসবাদীদের মতে, শ্রেণী-স্বার্থ ও শ্রেণীসম্বন্ধ সংরক্ষণ করাই হোল রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য। ধনবৈষম্যমূলক সমাজে রাষ্ট্র ধনশালী শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে কাজ করে; এই রাষ্ট্র হোল শ্রেণীশাসন ও শ্রেণীশোষণের হাতিয়ার মাত্র।

লক, অ্যাডাম স্মিথ ও বেন্থামের অভিমত

জন লক্ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। তাঁর মতে, মানবসমাজের মঙ্গল সাধন করা রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও সম্পত্তির সংরক্ষণ করাই হোল তার চরমতর উদ্দেশ্য। অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা—১. সমাজে আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং বহিঃশক্তির আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করা, ২. সমাজস্থ প্রতিটি ব্যক্তিকে অন্যায় ও অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করা, এবং ৩. ব্যক্তিগত উদ্যোগে সম্পাদন করা সম্ভব নয় এমন সব কার্য সম্পাদন করা এবং জনগণের জন্য অত্যাবশ্যক প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠন ও সংরক্ষণ করা। হিতবাদী দার্শনিক বেন্থাম (Bentham)-এর মতে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাপেক্ষা অধিক কল্যাণসাধনই (greatest good of the greatest number) রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য। অনেকে আবার সমাজসেবা এবং ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠাকে রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা করেন।

জার্মান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ব্লুন্টসলি রাষ্ট্রের দ্বৈত উদ্দেশ্য আছে বলে মনে করেন। এই দুটি উদ্দেশ্য হোল—ক. প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য এবং খ. পরোক্ষ উদ্দেশ্য। জাতীয় জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন এবং জাতীয় শক্তির (might of the nation) সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণকে তিনি রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষাকে পরোক্ষ উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা করেছেন।

ব্লুন্টসলির অভিমত

মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী উইলোবি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং চরম—এই তিনভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, দেশে শান্তিশৃংখলা প্রতিষ্ঠা করা এবং রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষা করা হোল রাষ্ট্রের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। ব্যক্তিস্বাধীনতার পথ ব্যাপকভাবে সুগম করা (the widest possible degree of liberty) এবং অর্থনৈতিক, মানসিক ও নৈতিক কল্যাণ সাধন করাকে তিনি যথাক্রমে রাষ্ট্রের মাধ্যমিক ও চরম লক্ষ্য বলে বর্ণনা করেছেন। অধ্যাপক গার্নার-ও রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকে তিন-ভাগে বিভক্ত করেছেন। শান্তিশৃংখলা ও নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের প্রথম উদ্দেশ্য। সামগ্রিক কল্যাণসাধন ও জাতীয় অগ্রগতিকে তিনি রাষ্ট্রের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এবং নিজেকে মানবসভ্যতার উন্নতির কার্যে নিয়োজিত করে বিশ্বজনীন উদ্দেশ্য সাধন করাকে রাষ্ট্রের তৃতীয় উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা করেছেন।

উইলোবি, গার্নার প্রমুখের অভিমত

ল্যাস্কি প্রমুখ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ ঐসব দার্শনিক তত্ত্ব পরিহার করে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বাস্তবমুখী আলোচনার অবতারণা করেছেন। ঐসব বাস্তবমুখী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সম্পাদিত কার্যাবলীর আলোকে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। ল্যাস্কির মতে, রাষ্ট্র জনগণের সর্বাধিক পরিমাণ সামাজিক কল্যাণ সাধনের একটি সংগঠন মাত্র। এর কার্যাবলী মানুষের আচার-আচরণের ঐক্য সাধনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্র যে-সব নিয়ম তৈরি করে সেইসব নিয়মের গন্ডির মধ্যেই ব্যক্তিকে থাকতে হয়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ তার কার্যকলাপের ফলের উপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্র কোন্ কাজ করবে, কোন্ কাজ করবে না, তা পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। সুতরাং রাষ্ট্র মানবজীবনের সর্বাদিক নিয়ন্ত্রণ করার দাবি জানাতে পারে না। কারণ রাষ্ট্র এবং সমাজ এক ও অভিন্ন নয়। অধ্যাপক লিপসন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য আলোচনা করতে গিয়ে শান্তিশৃংখলা রক্ষা ও ন্যায়-বিচারের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে, নিরাপত্তা রক্ষা করা, শান্তিশৃংখলা বজায় রাখা এবং ন্যায়প্রতিষ্ঠা করা হোল রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। তিনি মনে করেন যে, নিরাপত্তার মধ্যে শৃংখলার জন্ম এবং শৃংখলা ন্যায়প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করে (Protection grows into order and order seeks to blossom into justice)।

ল্যাস্কি, লিপসন প্রমুখের অভিমত

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট অভিমত জ্ঞাপন করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য স্থান, কাল ও পাত্রভেদে বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। সাধারণভাবে জনকল্যাণ সাধনকে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য বলে মনে করা হয়। বাস্তবে কিন্তু বিপরীত চিত্র লক্ষ্য করা

যায়। মনুষ্য সমাজের ক্রমবিবর্তিত ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি পর্যালোচনা করলে একথা স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, সমাজ-বিবর্তনের একটি বিশেষ স্তরে সমাজের মধ্য থেকেই সামাজিক প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। এই সামাজিক প্রয়োজন হোল সমাজে প্রভুত্বকারী শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার প্রয়োজন। দাস-সমাজে রাষ্ট্র দাস-মালিকদের, সামন্ত-সমাজে রাষ্ট্র সামন্ত-প্রভুদের, ধনতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্র ধনিক-বণিক শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ ও কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার যন্ত্র হিসেবে কাজ করেছে। সুতরাং বলা যায়, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রচলিত শ্রেণীসম্পর্ক বজায় রাখাই রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। এরূপ সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্র কখনই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কল্যাণকামী প্রতিষ্ঠান বলে বিবেচিত হতে পারে না। কেবলমাত্র শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজেই রাষ্ট্র জনকল্যাণকামী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। এরূপ সাম্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থবিরোধী পুঁজিপতি শ্রেণীর পুনরুত্থানের পথ অবরুদ্ধ করা এবং সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতিকে নিশ্চিত করা হোল রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

সমাজতান্ত্রিকদের অভিমত

২। বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্রের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (A short history of the State Function in different ages)

রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধিকে কেন্দ্র করে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতো প্রাচীনকালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের মধ্যে সুতীব্র মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। সমাজের গর্ভ থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং সমাজের ক্রোড়েই তা লালিতপালিত হয়। সুতরাং সমাজের প্রকৃতির উপর রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ভরশীল। আবার রাষ্ট্রের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে তার কার্যাবলী পরিচালিত হয়। তাই বিভিন্ন যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিতে রাষ্ট্রের কার্যাবলীর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করাই বাঞ্ছনীয়।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ রাষ্ট্র ও সমাজকে অভিন্ন বলে মনে করতেন। তাই নাগরিক জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধনকে রাষ্ট্রের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হোত। নাগরিকদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন করাই ছিল গ্রীক নগর-রাষ্ট্রের (city-state) প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক।

প্রাচীন গ্রীক যুগে রাষ্ট্রের কার্যাবলী

কিন্তু রোমান যুগে এসে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি কিছুটা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। প্রথা, ধর্ম, পারিবারিক স্বাধীনতা ইত্যাদি কয়েকটি ক্ষেত্র রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত থাকলেও রাষ্ট্রের চরম নির্দেশ সকলকেই অবনতমস্তকে মান্য করতে হোত। বস্তুতঃ রোমান যুগে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর সীমানার পরিব্যাপ্তি রাষ্ট্রেরই ইচ্ছাধীন ছিল।

রোমান যুগে রাষ্ট্রের কার্যাবলী

রাষ্ট্রের কার্যাবলীকে সীমিত গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করার প্রচেষ্টা কার্যতঃ শুরু হয় মধ্যযুগে। এই যুগে খ্রীষ্টধর্ম ও টিউটন জাতির অভ্যুত্থানের ফলে রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্রের পরিধি সঙ্কুচিত হয়। তাছাড়া, মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্র প্রবর্তিত থাকায়

কালক্রমে সামন্তপ্রভুরা সার্বভৌম শক্তির কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়ালে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসংখ্য সরকার সামন্তপ্রভুর মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে বিভিন্ন সামন্তপ্রভুর হাতে সরকার বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে। এই সময় কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অধিকারের ধারণা গুরুত্বলাভ করার ফলে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ক্রমে সংকুচিত হতে থাকে।

মধ্যযুগে রাষ্ট্রের কার্যাবলী

ষোড়শ শতাব্দীতে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি ও জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটলে রাষ্ট্রের কার্যাবলী পুনরায় সম্প্রসারিত হয়। রাষ্ট্র নাগরিকদের অভিভাবক হিসেবে কাজ করতে শুরু করে। কিন্তু রাষ্ট্রের অভিভাবকত্বাধীনে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্রমশঃ সংকুচিত হতে থাকলে এর বিরুদ্ধে জনমানসে চরম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই প্রতিক্রিয়ার ফলে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের জন্ম হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য রাষ্ট্রের কার্যাবলীকে সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ করার কথা প্রচার করে কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অবাধ প্রতিযোগিতার কু-ফল মানবজীবনে চরম দুঃখদারিদ্র্যের জন্ম দেয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের অবাধ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার ফলে দেশের যাবতীয় সম্পদ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। আপামর-জনসাধারণ দারিদ্র্যের শেষ ধাপে গিয়ে পৌঁছায়। শুরু হয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন। শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের দাবি তীব্র আকার ধারণ করে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোষিত শ্রেণীর উন্নতিবিধানের জন্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার সংস্কারমূলক আইন প্রণীত হয়। সেই-সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভোটাধিকারের সম্প্রসারণ এবং সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের কার্যাবলী ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এইভাবে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী যুগের অবসান ঘটে।

ষোড়শ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রের কার্যাবলী

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী যুগের ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে সমষ্টিবাদী যুগের আবির্ভাব ঘটে। সমষ্টিবাদ রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধিকে সম্প্রসারিত করার কথা ঘোষণা করে। সমষ্টিবাদকে পূর্ণ-সমষ্টিবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদ (socialism) এবং আংশিক বা আধা-সমষ্টিবাদ—এই দুভাগে বিভক্ত করা হয়। উৎপাদনের সর্বক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রবাদ সম্পূর্ণ সমষ্টিগত নিয়ন্ত্রণ এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপের পক্ষপাতী। সমাজতন্ত্রবাদ সর্বক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অবসান চায়। কিন্তু আংশিক সমষ্টিবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে। আংশিক সমষ্টিবাদীরা জনকল্যাণকর কার্যাদি সম্পাদনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে অর্পণ করার পক্ষপাতী। এরূপ সমষ্টি-বাদের সমর্থকগণ বিশ্বাস করেন যে, পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করা ছাড়া ব্যক্তি তথা সমাজের কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। বস্তুতঃ আংশিক সমষ্টিবাদ জন-কল্যাণকর রাষ্ট্র (Welfare State)-এর নামান্তর মাত্র। কিন্তু আংশিক সমষ্টিবাদ সামাজিক কল্যাণ সাধনের জন্য রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্রের পরিধি সম্প্রসারণের পক্ষপাতী হলেও তা সমাজকল্যাণের জন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করার প্রয়োজন নেই বলে মনে করে। ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে পরিচালিত ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্প

বিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রের কার্যাবলী

ইত্যাদিরও বিরোধিতা এই মতবাদে করা হয় না। মার্কসবাদী লেখকদের মতে, সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে পুঁজিপতিদের স্বার্থে পরিচালিত রাষ্ট্র মাত্র। সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব থাকায় সমাজ শ্রেণী-বিভক্ত হয়ে পড়ে। এরূপ সমাজে রাষ্ট্র মূলতঃ বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য কাজ করে। কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের কার্যাবলী জনমুখী হতে পারে।

৩। রাষ্ট্রের কার্যাবলী (Functions of the State)

রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্পর্কে পরস্পর-বিরোধী অভিমত

রাষ্ট্রের কার্যাবলী প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে জন স্টুয়ার্ট মিল বলেন, রাষ্ট্রের প্রকৃত কার্যাবলী সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট অভিমত জ্ঞাপন করা অসম্ভব। কারণ বিভিন্ন সামাজিক অবস্থায় তা বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্রের কার্যাবলী সীমিত করা হোত এই বিশ্বাসে যে, অবাধ বা স্বাচ্ছন্দ্য নীতি অনুসৃত হলেই কেবলমাত্র সামাজিক কল্যাণ সাধিত হতে পারে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে ও নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হলেই জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলে মনে করা হয়। আবার সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণা অনুসারে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মধ্যে সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে জনকল্যাণ সাধিত হতে পারে। সুতরাং সামগ্রিকভাবে জনকল্যাণ সাধনই হোল রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ—এ বিষয়ে কোন মতবিরোধ নেই।

রাষ্ট্রের অবশ্যকরণীয় ও ইচ্ছাধীন কার্যাবলী

রাষ্ট্রের কার্যাবলীকে অনেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক, সংরক্ষণমূলক ও জনকল্যাণ-মূলক ইত্যাদি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেন। আমরা সর্বপ্রকার রাষ্ট্রের কার্যাবলীকে দুটি সাধারণ ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করতে পারি, যথা—রাষ্ট্রের অবশ্য-করণীয় কার্যাবলী (Essential Functions) এবং ইচ্ছাধীন কার্যাবলী (Optional Functions)। সার্বভৌম শক্তি হিসেবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য যে সব কার্য রাষ্ট্রকে সম্পাদন করতে হয় সেগুলিকে অবশ্য-করণীয় বা আবশ্যিক কার্যাবলী বলা হয়। আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা সংরক্ষণ, বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দেশের নিরাপত্তা রক্ষা, নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তি সংরক্ষণ, আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক স্থাপন, নাগরিকদের সুযোগসুবিধার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি রাষ্ট্রের আবশ্যিক কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

ইচ্ছাধীন কার্যাবলীর শ্রেণীবিভাগ

কিন্তু রাষ্ট্রের ইচ্ছাধীন কার্যাবলীর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও স্থায়িত্বের প্রশ্ন কোনভাবে জড়িত নয়। এরূপ কার্যাবলীর প্রধান লক্ষ্য হোল জনকল্যাণসাধন। রাষ্ট্র তার নিজস্ব সীমারেখার মধ্যে থেকেও জনকল্যাণসাধনে ব্যাপকভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারে। রাষ্ট্রের ইচ্ছাধীন কার্যাবলীকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—ক. সমাজতান্ত্রিক (Socialistic) এবং খ. অ-সমাজতান্ত্রিক (Non-Socialistic)। যেসব কার্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে বা বে-সরকারী ভাবে পরিচালিত হলে সমাজে নানাপ্রকার অন্যায়-অবিচারের প্রবল সম্ভাবনা থাকে, কিংবা যেগুলি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে অনেক বেশী সুদক্ষভাবে পরিচালিত হবে বলে মনে করা হয়, সেইসব কাজকে রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক

কাজ বলে বর্ণনা করা হয়। রেলপথ, বিমানপথ ইত্যাদির পরিচালনা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, ব্যবসাবাণিজ্যের পরিচালনা, নিয়োগব্যবস্থা সৃষ্টির প্রচেষ্টা, বার্ধক্য, বেকারাবস্থা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা, সম্পদ ও সুযোগের ন্যায্য বন্টন, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রবর্তন ইত্যাদি জনকল্যাণকামী আদর্শে অনুপ্রাণিত কার্যাবলীকে রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়।

রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক ও অ-সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলীর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নিরূপণ করা কষ্টকর। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় চরিত্রের ভিন্নতা হেতু এক দেশে যে সব কাজকে সমাজতান্ত্রিক কাজ বলা হয়, অন্য দেশে সেইসব কাজ অ-সমাজতান্ত্রিক কাজ বলে পরিগণিত হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, রেলপথ, বিমানপথ প্রভৃতির পরিচালনাকে কোন কোন রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা হলেও অন্যান্য দেশে তাকে অ-সমাজতান্ত্রিক কাজ বলে চিহ্নিত করা হয়। তবে একথা সত্য যে, বর্তমান বিশ্বে রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলী উত্তরোত্তর গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক ও অ-সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলীর পার্থক্য নিরূপণ করা কষ্টকর

অনেকে আবার রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে বিচার করে রাষ্ট্রের কার্যাবলী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, যথা—১. রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কার্যাবলী, ২. নাগরিক-অধিকার সংক্রান্ত কার্যাবলী এবং ৩. জনকল্যাণসাধন সংক্রান্ত কার্যাবলী।

রাষ্ট্রের তিন প্রকার কার্য

(১) সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে রাষ্ট্রকে কতকগুলি মৌলিক কার্য সম্পাদন করতে হয়। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, করধার্যের মাধ্যমে শাসনযন্ত্রের পরিচালনা, যুদ্ধ পরিচালনা ইত্যাদি রাষ্ট্রের মৌলিক কার্যাবলীর অন্তর্গত।

মৌলিক কার্য

(২) জন লকের মতে, মানুষের কতিপয় অধিকার সংরক্ষণের জন্যই রাষ্ট্রের পত্তন করা হয়েছিল। এইসব অধিকারের মধ্যে জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকারকেই তিনি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন। বর্তমানে গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার সম্প্রসারণের ফলে রাজনৈতিক অধিকার, যেমন—ভোটাধিকার ইত্যাদি এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার মতো সামাজিক অধিকার এবং কর্মের অধিকারের মতো অর্থনৈতিক অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করতে হয়। তাই অধ্যাপক ল্যাস্কি মন্তব্য করেছেন, রাষ্ট্র কর্তৃক সংরক্ষিত অধিকারের মানদণ্ডেই রাষ্ট্রের প্রকৃতি উপলব্ধি করা যায় (A State is known by the rights it maintains)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে রাজনৈতিক অধিকার এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্য

(৩) রাষ্ট্র এমন সব কার্য সম্পাদন করবে যাতে নাগরিকদের সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হয়। রাষ্ট্রের প্রথম দুটি কার্যকে 'অবশ্যকরণীয়' বা 'আবশ্যিক কার্য'' এবং শেষোক্ত কার্যকে 'ঐচ্ছিক' বা 'ইচ্ছাধীন কার্যে'র অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়।

জনকল্যাণকর কার্য

পরিশেষে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে নানাপ্রকার মতবিরোধ থাকলেও দেশের নিরাপত্তা, ঐক্য ও সংহতি রক্ষা এবং সর্বাধিক পরিমাণ জনকল্যাণ সাধন করাই যে রাষ্ট্রের প্রাথমিক কাজ সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। মার্কসবাদীরা মনে করেন যে, শ্রেণীবৈষম্যমূলক সমাজে রাষ্ট্র কখনই সর্বাধিক মানুষের কল্যাণ-সাধন করে না। এরূপ সমাজে রাষ্ট্র মুষ্টিমেয় ধনিক-বণিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। তাই জনসাধারণের অধিকারও এই রাষ্ট্রে সুরক্ষিত থাকে না। কেবলমাত্র শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই রাষ্ট্র প্রকৃত জনকল্যাণ সাধন করতে পারে।

শ্রেণীবৈষমামূলক সমাজে রাষ্ট্রের বৈষমামূলক কাজ

৪। রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ (Different Theories of State Functions)

আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলীকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। এই মতবিরোধের ফলে রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে প্রধানতঃ তিনটি মতবাদ প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। এই প্রধান তিনটি মতবাদ হোল—১. ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ, ২. সমাজতন্ত্রবাদ এবং ৩. রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণবাদ (Theory of State Regulation)। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ রাষ্ট্রের কার্যাবলীকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কথা প্রচার করে। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদ রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধিকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করার পক্ষপাতী। পরস্পর বিরোধী এই দুটি মতবাদের সমন্বয়সাধন করে রাষ্ট্রের জনহিতকর কার্যাবলীর তত্ত্ব প্রচার করেন রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণবাদের সমর্থকগণ।

৫। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism)

রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও কার্যাবলী বিষয়ক মতবাদগুলির মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ। সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে উনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপ এবং ইংল্যান্ডে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের জন্ম হয়। ধনতন্ত্রবাদের ব্যাপক সম্প্রসারণের জন্য অর্থনৈতিক তত্ত্ব হিসেবে এই মতবাদের সূচনা হলেও ধীরে ধীরে তা রাজনৈতিক ও সামাজিক মতবাদে রূপান্তরিত হয়। অনেকে তাই এই মতবাদকে 'অবাধ নীতি' বা 'স্বাচ্ছন্দ্য নীতি' (Laissez-faire) বলে অভিহিত করেছেন।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ রাজনৈতিক চিন্তা-জগতে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করলেও প্রাচীন গ্রীসের সিনিক (Cynic) ও স্টোয়িক (Stoic) দর্শনে এর সমর্থন পাওয়া যায়। স্টোয়িক দার্শনিকের মতে, ব্যক্তি নিজেই নিজের সুন্দর কাম্য জীবনের নির্ধারক। খ্রীস্ট দর্শনও তার প্রাথমিক পর্যায়ে রাষ্ট্র কর্তৃত্বের পরিবর্তে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে সমর্থন করেছিল। মধ্যযুগে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মযাজকগণ অনুরূপ অভিমত পোষণ করতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময় এই মতবাদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith), রিকার্ডো (Recardo)

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্‌গণ এবং হার্বার্ট স্পেন্সার, বেন্থাম, জেমস্‌ মিল, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ দার্শনিকদের হাতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই মতবাদ রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণে সর্বপ্রধান নিয়ামক হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করে।

মূল বক্তব্য

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা নৈরাজ্যবাদীদের মত রাষ্ট্রের অবলুপ্তি না চাইলেও রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধিকে সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ রাখাই যুক্তিসংগত বলে মনে করতেন। তাঁদের মতে, মানুষ তার নিজের ভালমন্দ সম্পর্কে অত্যন্ত বেশী সচেতন। তাই তার জীবনের উপর রাষ্ট্রের প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ যতই স্বল্প হয় ততই মঙ্গল। স্টিফেন লীকক (Stephen Leacock) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের বক্তব্য সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ অনুসারে ব্যক্তির নিজের স্বার্থেও ব্যক্তিজীবনে রাষ্ট্রের অস্ত্যর্থক (positive) হস্তক্ষেপ সমর্থনযোগ্য নয়। এমন কি রাষ্ট্র কর্তৃক অর্থনৈতিক কার্যাদি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ কিংবা নাগরিকদের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ যুক্তিযুক্ত নয়। জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর 'স্বাধীনতা সংক্রান্ত' (On Liberty) নামক বিখ্যাত পুস্তকে এই অভিমত পোষণ করেন যে, অপরের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত হলেই কেবলমাত্র বলপ্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্র ব্যক্তিকে নিবৃত্ত করতে পারবে। কিন্তু কোন ব্যক্তির মঙ্গল সাধনের জন্য তার উপর রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ করতে পারে না। কারণ 'নিজের উপর, নিজস্ব শরীর ও মনের উপর মানুষ হোল সার্বভৌম' (Over himself, over his body and mind the individual is sovereign)। অন্যভাবে বলা যায়, ব্যক্তির 'আত্মকেন্দ্রিক কার্যাবলী'তে (self-regarding activities) রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কিন্তু 'পরকেন্দ্রিক কার্যাবলী' (other-regarding activities) নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাষ্ট্রের আছে। কারণ এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কার্যাবলীর ফলাফল সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিকে ভোগ করতে হয়। স্পেন্সার তাঁর 'মানুষ বনাম রাষ্ট্র' (The Man versus the State, 1884) নামক গ্রন্থে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থনে বলেন যে, সরকারী কার্যকলাপের সীমিতকরণ শুধু যুক্তিসংগত নয়, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়ও বটে। তাঁর মতে, একটিমাত্র অধিকার আছে, তা হোল—অপরের সঙ্গে সমানভাবে স্বাধীনতা ভোগের অধিকার এবং রাষ্ট্রের কেবলমাত্র একটি কর্তব্য আছে, তা হোল—ব্যক্তির সেই অধিকার সংরক্ষণের কর্তব্য (The individual has but one right, the right of equal freedom with everybody else, and the State has but one duty, the duty of protecting that right.)। সিজউইক (Sidgwick)-ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে সমর্থন করে বলেন, একথা কতকাংশে সত্য যে, ব্যক্তিগত কল্যাণ সাধনের মাধ্যমেই সর্বসাধারণের কল্যাণ যথাযথভাবে সাধিত হতে পারে। এইভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিকগণ রাষ্ট্রের কার্যাবলীকে প্রধানতঃ বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশরক্ষা এবং আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা রক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চেয়েছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র হোল 'পুলিসী রাষ্ট্র' (Police State) মাত্র।

সপক্ষে যুক্তি (Argument for)ঃ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিগণ নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে নানাপ্রকার যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করেন।

(১) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থনে কান্ট, ফিক্‌টে, হামবল্ট (Humbolt), জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ দার্শনিকগণ নৈতিক যুক্তির অবতারণা করেন। তাঁদের মতে, অপরের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির কোনরূপ আত্মবিশ্বাস থাকতে পারে না। পরনির্ভরশীল ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিসত্তাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করতে পারে না। ব্যক্তিজীবনের উপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যক্তিপ্রতিভার স্বাভাবিক বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ। ব্যক্তি যেহেতু নিজের ব্যক্তিজীবনে কল্যাণ-অকল্যাণ নিজেই যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারে, সেহেতু ব্যক্তিজীবনে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ শুধু অকাম্যই নয়, নীতিগতভাবে তা অসমর্থনযোগ্যও বটে। ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায়গুলি অপসারিত করেই কেবলমাত্র রাষ্ট্র ব্যক্তি তথা সমাজের প্রতি তার নৈতিক কর্তব্যপালন করতে পারে।

নৈতিক যুক্তি

(২) দার্শনিক যুক্তির অবতারণা করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিগণ বলেন যে, ব্যক্তিকে নিয়েই রাষ্ট্র। ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রের কোন স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকতে পারে না। ব্যক্তির কল্যাণ সাধনের জন্যই রাষ্ট্রের অবস্থিতি। কিন্তু ব্যক্তিজীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের অর্থ ব্যক্তির অকল্যাণ সাধন করা। ব্যক্তিকে তার স্বাভাবিক মানবীয় অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি সঙ্কুচিত করা একান্ত প্রয়োজন।

দার্শনিক যুক্তি

(৩) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থনে অনেক সময় রাজনৈতিক যুক্তি প্রদর্শন করা হয়। যেহেতু নিজের উপর, নিজস্ব দেহ ও মনের উপর ব্যক্তি সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী, সেহেতু ব্যক্তিজীবনে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের অর্থ ব্যক্তির অধিকারে হস্তক্ষেপ করা। রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রের পরিধি সম্প্রসারণের অর্থ ব্যক্তিস্বাধীনতা সঙ্কুচিত করা। সুতরাং ব্যক্তিস্বাধীনতায় অযথা হস্তক্ষেপ না করাই রাজনৈতিক দিক থেকে বাঞ্ছনীয় বলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা মনে করেন।

রাজনৈতিক যুক্তি

(৪) হার্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিগণ নিজেদের মতবাদের সমর্থনে 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' (Survival of the fittest) নামক জীববিজ্ঞানের মূল সূত্রটিকে ব্যবহার করেছেন। এই সূত্র অনুসারে জীবজগতে কেবলমাত্র জীবনসংগ্রামে জয়ী জীবদেরই বাঁচার অধিকার আছে। আত্মরক্ষায় অক্ষম দুর্বল প্রাণীরা যেমন প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তেমনি মনুষ্যজগতেও অযোগ্য, অক্ষম ব্যক্তিদের বাঁচার কোন অধিকার থাকতে পারে না। সমাজে কেবলমাত্র বলশালী, বুদ্ধিমান, সুদক্ষ ব্যক্তিদেরই বেঁচে থাকার স্বাভাবিক অধিকার আছে। রাষ্ট্র অক্ষম, অযোগ্য ব্যক্তিদের রক্ষার ব্যবস্থা করলে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করা হবে। তাছাড়া, অক্ষম ও অযোগ্য ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত সমাজ গুণগত দিক থেকে কখনই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারবে না বলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা অভিমত পোষণ করেন।

জীববিজ্ঞানের যুক্তি

(৫) ফ্রান্সের ফিজিওক্র্যাটগণ (Physiocrats) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থনে অর্থনৈতিক যুক্তির অবতারণা করেন। বলা হয় যে, ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে ব্যবসা-বাণিজ্য তথা উৎপাদন, বন্টন, বিনিয়োগ প্রভৃতি পরিচালিত হলে পারস্পরিক অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পণ্যাদির উৎপাদন

অর্থনৈতিক যুক্তি

যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে এবং জিনিসপত্রের দাম স্বাভাবিকভাবে কম হবে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়ার ফলে অপচয়ের সম্ভাবনা থাকবে না। কিন্তু রাষ্ট্র যদি শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ করে দেয়, কার্যের সময়-সীমা স্থির করে দেয় কিংবা অন্য প্রকার বাধানিষেধ আরোপ করে তাহলে শিল্পপতিদের স্বাধীনতা খর্বিত হবে। স্বাভাবিকভাবে তাঁরা উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে চাইবেন না। ফলে সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হবে।

(৬) অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অতীতে রাষ্ট্র এমন সব আইন প্রণয়ন করেছে যা সামাজিক কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ সাধন করেছে। আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা অপেক্ষা ব্যক্তির স্বতঃপ্রণোদিত কার্যের মাধ্যমে অনেক বেশী সামাজিক কল্যাণ সাধিত হতে পারে বলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিগণ মনে করেন।

অভিজ্ঞতার যুক্তি

(৭) ব্যক্তি তার নিজস্ব প্রচেষ্টায় যতখানি সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে পারে রাষ্ট্রের পক্ষে তত্খানি করা সম্ভব নয়। কারণ সমাজের প্রয়োজনীয়তা যথার্থভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা রাষ্ট্রের নেই। রাষ্ট্র যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন করে সরকারী প্রশাসনের মাধ্যমে। কিন্তু সরকারী প্রশাসন বলতে কার্যক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের অপ্রতিহত প্রাধান্যকেই বোঝায়। আমলাতান্ত্রিক শাসন কখনই সু-শাসন হতে পারে না। আমলাদের দায়িত্বহীনতা, দীর্ঘসূত্রতা, জনকল্যাণকামী মনোবৃত্তির অভাব ইত্যাদির ফলে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কার্যক্ষেত্রে জনস্বার্থ উপেক্ষার নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়।

রাষ্ট্রের অক্ষমতার যুক্তি

বিপক্ষে যুক্তি (Arguments against): ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিগণ নিজেদের মতবাদের যাথার্থ্য প্রমাণ করার জন্য নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করলেও বর্তমানে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমালোচনা করা হয়।

(ক) রাষ্ট্রকে অশুভ বা অকল্যাণকর রূপে বর্ণনা করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিগণ ভুল করেছেন বলে সমালোচনা করা হয়। কোন কোন রাষ্ট্রের কিছু কিছু কার্য ব্যক্তি-জীবনের স্বার্থের পরিপন্থী হয়েছে বলে যে সব ধরনের রাষ্ট্রই ব্যক্তিস্বার্থবিরোধী কাজ করবে—এমন ধারণা অযৌক্তিক। বিংশ শতাব্দীর জনকল্যাণকামী ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির কার্যকলাপ একথাই প্রমাণ করে যে, রাষ্ট্র ব্যক্তির বন্ধু, দার্শনিক ও পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা নিষ্ঠা সহকারে পালন করছে। তাই বর্তমানে রাষ্ট্রকে ব্যক্তিজীবনের অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান বলে মনে করা হয়।

রাষ্ট্র অশুভ নয়

(খ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ব্যক্তিকে তার ভালমন্দ, শুভ-অশুভ নির্ধারণের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক বলে বর্ণনা করে সত্যের অপলাপ করেছে। কারণ বর্তমান সমস্যা-সঙ্কুল সমাজে বাস করে ব্যক্তি অনেক সময় তার ভালমন্দ সম্পর্কে বিচারশক্তি হারিয়ে ফেলে। তাছাড়া, প্রতিটি সমাজে অজ্ঞ, অশিক্ষিত এবং কু-সংস্কারাচ্ছন্ন লোকের সংখ্যা কম থাকে না। তাদের আপনাপন শুভাশুভ নির্ধারণের ক্ষমতা থাকে না। এমনকি শিক্ষিত হলেই যে ব্যক্তি নিজের ভালমন্দ যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারবে—

নিজ ভালমন্দের প্রকৃত বিচারক ব্যক্তি হতে পারে না

একথাও সর্বাংশে সত্য নয়। তাই জনগণকে শুভ পথে পরিচালিত করে প্রকৃত জনকল্যাণ সাধনের জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ একান্তভাবেই অপরিহার্য।

(গ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রচারকগণ ব্যক্তিজীবনে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপকে স্বাধীনতার সঙ্কোচন বলে মনে করেন। কিন্তু আইন ছাড়া যথার্থভাবে স্বাধীনতা রক্ষিত হতে পারে না। অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর মাত্র। তাই আইনকে স্বাধীনতার শর্ত বলা হয়।

আইন স্বাধীনতার পরিপন্থী নয়

(ঘ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 'অবাধনীতি' বা 'স্বাচ্ছন্দ্য নীতি' অনুসরণের কথা প্রচার করেন। কিন্তু এই নীতি অনুসৃত হলে সমাজের মধ্যে 'একচেটিয়া কারবার' (monopoly) বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হবে। একচেটিয়া পুঁজিপতিরা শেষ পর্যন্ত বিপুল পরিমাণ ভোগ্য পণ্যাদি উৎপাদনের পরিবর্তে মুনাফা শিকারে উন্মত্ত হয়ে উঠবে। এর কুফল জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলবে। তাছাড়া, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলি পরাজিত হয়ে প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়াবে। ফলে অবাধ নীতি কার্যক্ষেত্রে অর্থহীন হয়ে পড়বে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতার তত্ত্ব ভুল

(ঙ) সর্বোপরি, একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিষময় ফল সমগ্র সমাজকে ভোগ করতে হবে। পুঁজিপতিদের মুনাফালাভের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা সমাজে ব্যাপকভাবে ধনবৈষম্য ডেকে আনবে। সিজউইকের ভাষায়, এরূপ অবস্থা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ত্রুটি—সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশা, বেকারত্ব, হতাশা প্রভৃতি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাবে। এরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যদি হস্তক্ষেপ না করে তাহলে শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব, অর্থনৈতিক মন্দা প্রভৃতি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী স্বপ্নকে সুদূরপরাহত করে তুলবে।

বিরূপ অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া

(চ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের জারজ সন্তান হোল ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রগুলি প্রাথমিক পর্যায়ে বিশ্বের অর্থনৈতিক বাজার অন্বেষণের জন্য অবাধ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি এবং স্বদেশে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী রপ্তানির প্রতিযোগিতা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের সূচনা করে। বর্তমান আণবিক যুগে যুদ্ধ হোল সার্বিক যুদ্ধ। বলা বাহুল্য, সার্বিক যুদ্ধের অর্থই হোল সার্বিক ধ্বংস। সুতরাং পরোক্ষভাবে যুদ্ধকে আহ্বান জানায় বলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে একটি বিপজ্জনক মতবাদ বলে সমালোচনা করা হয়।

বিপজ্জনক মতবাদ

(ছ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা জীববিজ্ঞানের সূত্র ধরে যোগ্যতমেরই কেবল বাঁচার অধিকার আছে বলে প্রচার করেন। কিন্তু এই যুক্তি প্রাণিজগতের ক্ষেত্রে কার্যকরী হলেও মনুষ্যজগতের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে না। কারণ, জীবনসংগ্রামে কে যোগ্য, কে অযোগ্য, তা নির্ধারণের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির। সমান সুযোগসুবিধা না থাকলে মানুষের যোগ্যতা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। আর উপযুক্ত পরিবেশ

জীববিজ্ঞানের যুক্তি ভ্রান্ত

সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন। তাছাড়া, অযোগ্য, অপদার্থ ব্যক্তিদের বাঁচার কোন অধিকার নেই—এ কথা নৈতিক দিক থেকেও সমর্থনযোগ্য নয় বলে মনে করা হয়।

(জ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিগণ অভিজ্ঞতার যে যুক্তি প্রদর্শন করেন তাও সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। অতীতে রাষ্ট্র অনেক ক্ষতিকর আইন প্রণয়ন করে ব্যক্তিজীবনে অকল্যাণ সাধন করেছে বলে বর্তমান সময়ের সমস্ত রাষ্ট্র ক্ষতিকর হবে এমন কোন কথা নেই। অধ্যাপক গার্নার তাই যথার্থভাবেই মন্তব্য করেছেন যে, অতীতে রাষ্ট্র ভুল করেছে বলে ভবিষ্যতেও তার উপর আস্থা স্থাপন করা সম্ভব নয়—এরূপ কোন দৃষ্টিভঙ্গী থাকা সমীচীন নয়। আমরা বরং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে জনকল্যাণকারী প্রতিষ্ঠানরূপেই চিত্রিত করতে পারি।

অভিজ্ঞতার যুক্তিও অচল

(ঝ) রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিগণ রাষ্ট্রীয় অক্ষমতা ও অপদার্থতার যে যুক্তি প্রদর্শন করেন বাস্তবের নিরীখে তা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাঁদের প্রদর্শিত যুক্তি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সত্য হলেও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের ক্ষেত্রে কখনই প্রযুক্ত হতে পারে না। সোভিয়েত ইউনিয়ন, গণ-সাধারণতন্ত্রী চীন প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাফল্য একথাই প্রমাণ করেছে যে, সরকার যদি জনগণের সরকার হয়, জনকল্যাণ সাধনের ঐকান্তিক ইচ্ছা যদি সরকারের থাকে, তাহলে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ জনজীবনে বিরাট পরিবর্তন আনতে পারে। বস্তুতঃ, যে-সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য থাকে সেই সমাজে রাষ্ট্র ধনিক-বণিক শ্রেণীর স্বার্থে ব্যবহৃত হয়। এরূপ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যক্তিস্বাধীনতার হন্তারক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্কে এরূপ অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সত্যের অপলাপ করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

রাষ্ট্রীয় অক্ষমতার যুক্তিও ভিত্তিহীন

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও এর গুরুত্বে কোনমতেই অস্বীকার বা উপেক্ষা করা যায় না। ব্যক্তির আত্মনির্ভরশীলতার (self-reliance) কথা প্রচার করে, অত্যধিক রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করে এবং সমাজে ব্যক্তিকে যথার্থ মূল্য প্রদান করে এই মতবাদ শাশ্বত সত্যের ইঙ্গিত প্রদান করেছে। তবে একথা সত্য যে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে। এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বার্নস (Burns) বলেছেন, এই মতবাদ কার্যের 'সামাজিক কারণ এবং সামাজিক ফলাফল'কে (the social causes and social effects of action) উপেক্ষা করেছে। বস্তুতঃ, আধুনিক সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের যুগে প্রগতিশীল মানুষের কাছে আদর্শ হিসেবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের কোন আবেদনই নেই।

মূল্যায়ন

আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Modern Individualism) : নানাপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। এই মতবাদের বিরোধী মতবাদ হিসেবে সমষ্টিবাদ এবং আদর্শবাদ উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। ফলে

উৎপত্তি

রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হতে শুরু করে। এরূপ রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের জন্ম। জোড এরূপ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদকে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া বলে বর্ণনা করেছেন।

আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রচারকদের মধ্যে নরম্যান এঞ্জেল (Norman Angell) ও গ্রাহাম ওয়ালাস (Graham Wallas)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। নরম্যান এঞ্জেল তাঁর 'দি গ্রেট ইলিউশন' (The Great Illusion) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে এই অভিমত প্রদান করেছেন যে, মানুষ অর্থনৈতিক সমস্বার্থের ভিত্তিতে বহু সংঘ গঠন করে। এই সব সংঘ রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে অর্থনৈতিক সমস্বার্থের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলে। আন্তর্জাতিক সংগঠন গঠিত হলে রাষ্ট্রের কার্যকলাপ হ্রাস পাবে। ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধিতার পরিবর্তে শান্তি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হবে। গ্রাহাম ওয়ালাস তাঁর 'গ্রেট সোসাইটি' (Great Society) নামক পুস্তকে সমষ্টিচেতনার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে, সমষ্টিবাদের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি নির্ধারিত হওয়া উচিত। কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রীভূত এবং প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থায় সমষ্টিগত চেতনার উন্মেষ ঘটা সম্ভব নয়। তাছাড়া, নির্বাচনের পর জনপ্রতিনিধিদের উপর সাধারণ নির্বাচকের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তাই তিনি পেশাগত ভিত্তিতে নির্বাচকমণ্ডলীকে কয়েকটি সংঘে বিভক্ত করে সম-ক্ষমতাসম্পন্ন আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষে কেবলমাত্র তাদেরই প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থার কথা বলেছেন।

প্রকৃতি

উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সংঘস্বাতন্ত্র্যের সমর্থনে বক্তব্য উপস্থাপিত করে। দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদ পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরোধিতা করে। তৃতীয়তঃ, এই মতবাদ আদর্শবাদ এবং সমষ্টিবাদের ঠিক বিপরীত। চতুর্থতঃ, আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ জনমতকে নিষ্পেষণ যন্ত্র বলে আখ্যা দিয়ে ব্যক্তিকে রক্ষা করতে চায়। পঞ্চমতঃ, ব্যক্তিসত্তার যথার্থ সংরক্ষণ সাধনের জন্য এই মতবাদ ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের দাবি জানায়।

বৈশিষ্ট্য

জোড আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে প্রকৃত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ না বলে সংঘ স্বাতন্ত্র্যবাদ বলাই যুক্তিসংগত বলে মনে করেন। বস্তুতঃ এই মতবাদ উনবিংশ শতাব্দীর প্রকৃত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরোধী এবং বহুলাংশে বহুত্ববাদের সঙ্গে তুলনীয় বলে অনেকে অভিমত পোষণ করেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মূল্যায়ন করতে গিয়ে হার্বার্ট আফ্‌তেকার বলেছেন, "বুর্জোয়া মতবাদে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ওপর এত বিরাট গুরুত্ব দেওয়া হয় মার্কসবাদী তত্ত্বে তাকে সন্দেহভরে দেখা হয়। এই সন্দেহের কারণ দুটি : ১. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ হল তাদেরই বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই নয়, যারা উৎপাদনের উপকরণের মালিক। এর মধ্যে ব্যক্তিমানসের শক্তি ও সৃজনশীলতাকে বিকশিত করার কোন সত্যিকারের প্রচেষ্টার চেয়ে আরও বেশী রয়েছে দায়িত্বহীনতা ও সুখবাদী মনোভাব (hedonism)।

মূল্যায়ন

২. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ হল স্বগোত্রভজনের অংশীদার এবং আধুনিক জীবনধারার ব্যাপকভাবে সামাজিকীকৃত প্রকৃতির পরীপন্থী।...তদুপরি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সমাজে সমষ্টিগত প্রয়োজনের সঙ্গে সংঘাতে আসে। সেই কারণে ব্যবহারিকতা আরও বেশী করে নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। এইটিই আবার অপরাধের এবং অবসাদের বা অসুয়ার তীব্র অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে যা (ব্যক্তির) আচার-আচরণের সমাজ-বিরোধী রূপকে ও বিপর্যয়ের পৌনঃপুনিকতাকে প্ররোচিত করার মদত যোগায়।"

৬। সমাজতন্ত্রবাদ (The Socialist Theory) : সমাজতন্ত্রবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ (Origin and Development of Socialism)

'ওল্ড টেস্টামেন্ট' (Old Testament) এবং 'মোজেজ্ কর্তৃক প্রণীত অনুশাসন' (Mosaic Law)-এর মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু ওল্ড টেস্টামেন্টের মধ্যে যে সামাজিক অবস্থার চিত্র অঙ্কিত করা হয়েছে তার সঙ্গে আধুনিক সমাজতান্ত্রিক সমাজের কোন সাদৃশ্য নেই। আবার কেউ কেউ গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর 'গণরাজ্য'(The Republic) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় বলে অভিমত পোষণ করেন। বাস্তবে কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজ কিংবা সমাজতান্ত্রিক আদর্শ সম্পর্কে প্লেটোর কোনরূপ ধারণাই ছিল না। তিনি কেবলমাত্র অভিভাবক শ্রেণী (guardian class)-র জন্য যৌথ ভোগ ব্যবস্থা (Common Consumption) প্রবর্তনের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। অনেকে আবার মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টান আন্দোলনের মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদের উৎস নিহিত আছে বলে মনে করেন। কিন্তু সম্ভবতঃ তাঁরা একথা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, সন্ন্যাসনীতি (Principle of monasticism) সমাজতন্ত্রবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। মধ্যযুগের খ্রীষ্টধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সম্পত্তির যৌথ মালিকানাকে আদর্শ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে চিত্রিত করলেও শেষপর্যন্ত তা সমকালীন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যবস্থাকে স্বীকার করে নিয়েছে। কেউ কেউ চতুর্দশ এবং ষোড়শ শতাব্দীর হিংসাত্মক সমাজবিপ্লবগুলিকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বলে বর্ণনা করেছেন। ১৩৮১ সালে ইংল্যান্ডের কৃষক বিদ্রোহ, ১৫২৫ সালে জার্মানির কৃষক যুদ্ধ ইত্যাদি আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য সামাজিক উৎপাদনের যৌথ এবং সমবন্টনের দাবি হলেও ঐ সব আন্দোলনের নেতৃবর্গের যৌথ উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনরূপ ধারণাই ছিল না। সুতরাং প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় চিন্তানায়কদের মধ্যে আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের ধারণা প্রত্যক্ষ করা যায় না।

সমাজতন্ত্রবাদের প্রাচীন উৎস

সর্বপ্রথম ১৫১৬ সালে প্রকাশিত টমাস মোর (Thomas More)-এর 'ইউটোপিয়া' (Utopia) নামক গ্রন্থে যৌথ মালিকানাকে সমাজের সমগ্র উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার ভিত্তি বলে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু সমকালীন সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যে 'ইউটোপিয়া' বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করলেও পরবর্তীকালের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার উপর তা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করতে ব্যর্থ হয়।

ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্রবাদ

সমাজতন্ত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লব একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করেছে। যদিও ফরাসী বিপ্লব মূলতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিপ্লব হিসেবে পরিচিত- তথাপি এই বিপ্লবের তিনটি সুমহান আদর্শ—সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা—প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। ফরাসী বিপ্লবের প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে তদানীন্তন সমাজের নিম্ন শ্রেণীগুলি প্রচলিত সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠে। তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল যে, প্রচলিত সম্পত্তি ব্যবস্থাই (Property System) সামাজিক অসাম্যের মূল কারণ। ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম সমাজতান্ত্রিক নেতা বেবিউফ্ (Babeuf) সমাজের আমূল পরিবর্তনের জন্য বৈপ্লবিক পন্থায় সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানালেন। কিন্তু বেবিউফ্ এবং তাঁর সহযোদ্ধাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হোল। তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

ফরাসী বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রবাদ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ধ্যানধ্যারণার পরিব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে ব্যাপক আকার ধারণ করে। এই সময় ফরাসী দার্শনিক সাঁ সিমো (St. Simon) ও চার্লস্ ফুরিয়ার (Charles Fourier) এবং ইংরেজ দার্শনিক রবার্ট ওয়েন (Robert Owen) 'কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদ' (Utopian Socialism)-এর কথা প্রচার করেন। কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে, অবাধ নীতি (Doctrine of Laissez-faire) মানুষকে সমাজের স্বার্থ অপেক্ষা ব্যক্তির সঙ্কীর্ণ স্বার্থকে বড় বলে চিন্তা করতে শিক্ষা দেয়। তাই অবাধ নীতিই সমাজের সর্বপ্রকার অসাম্যের মূল কারণ। কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদীরা এমন একটি সুন্দর সমাজ গঠনের পক্ষপাতী যেখানে অবাধ নীতির কুফল থাকবে না। কিন্তু তাঁরা শ্রেণী-দ্বন্দ্ব বা শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্বে বিশ্বাসী নন। ক্ষমতা ও সম্পত্তির মালিকদের বিবেক-বুদ্ধির কাছে আবেদনের মাধ্যমেই তাঁদের ঈপ্সিত সমাজ গঠিত হবে বলে তাঁরা মনে করতেন। সমাজ পরিবর্তনের ভ্রান্ত নীতিই তাঁদের ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ। তাঁদের পরীক্ষামূলক সমবায় প্রতিষ্ঠান তথা সমবায় সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল সত্য কিন্তু আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের ক্রমবিকাশে তাঁদের ভূমিকা অনবদ্য হয়ে রইল। বলা বাহুল্য, কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তারাই সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক ভাবধারাকে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, এমনকি আমেরিকাতেও ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন।

কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদ

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডে সমাজতন্ত্রবাদ শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ইংল্যান্ডের 'চ্যার্টিস্ট আন্দোলন' (The Chartist Movement) সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সূত্রপাত করে। কিন্তু ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত 'কমিউনিস্ট ইস্তেহারেই' (Communist Manifesto) বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের মৌলিক নীতিগুলি ঘোষিত হয়। কার্ল মার্ক্স্ (Karl Marx) ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ (Frederick Engels) সমাজতন্ত্রবাদকে

মার্ক্স-এঙ্গেলস্ ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ

সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের জীবনবেদে রূপান্তরিত করেছেন।

৭। সমাজতন্ত্রবাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় (Fundamental Tenets of Socialism)

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে চরম প্রতিক্রিয়া হিসেবে সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব হয়। সমাজতন্ত্রবাদ একদিকে যেমন রাজনৈতিক তত্ত্ব ও আন্দোলন হিসেবে পরিচিত, অন্যদিকে তেমনি অর্থনৈতিক তত্ত্ব হিসেবেও সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদের একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্দেশ করা যথেষ্ট কষ্টকর। তাই অধ্যাপক জোড (Joad) বলেছেন, স্বল্প পরিসরে সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে ব্যাপক ধারণা দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁর মতে, সমাজতন্ত্র এমন একটি টুপির মত যা তার নিজের আকৃতি হারিয়ে ফেলেছে, কারণ প্রত্যেকেই তাকে পরিধান করছে। বস্তুতঃ রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ (State Socialism), সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ (Guild Socialism), যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ, মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ ইত্যাদি হোল সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ। বিভিন্ন প্রকার সমাজতন্ত্রের মধ্যে মূলতঃ কর্মপন্থা সম্বন্ধে মতাবরোধ থাকলেও সমাজতন্ত্রবাদ কতকগুলি সাধারণ মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন রূপ

সমাজতন্ত্র বলতে এমন একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজ-ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজতন্ত্রবাদ উৎপাদনের যৌথ পরিচালনা এবং উৎপাদিত সামগ্রীর প্রয়োজনভিত্তিক বন্টনের নীতিতে বিশ্বাসী। উৎপাদন এবং বন্টন ব্যবস্থা রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হবে। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে উৎপাদন, বিনিয়োগ ও বন্টন ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়ার ফলে পুঁজিপতিরা সর্বোচ্চ মুনাফালাভের জন্য শ্রমিক শ্রেণীকে তাদের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় বেকারত্ব, অর্ধাহার, চাকরির ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা ইত্যাদি জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রভুত্বকারী পুঁজিপতি শ্রেণীর সীমাহীন শোষণের ফলে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ব্যক্তিস্বাধীনতা হারিয়ে কার্যতঃ সর্বহারা শ্রেণীতে পরিণত হয়। এই শ্রেণী উৎপাদন ব্যবস্থার গতিকে অব্যাহত রাখলেও বিনিময়ে কিছুই পায় না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই, দেশের সমাজের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সবচেয়ে কম খেয়ে, কম পরে, কম শিখে, বাকী সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশী তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশী তাদের অসম্মান, কথায় কথায় তারা রোগে মরে, উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে মরে—জীবনযাত্রার জন্য যত কিছু সুযোগ-সুবিধে সবকিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে, উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।" সমাজের এই অসাম্য, বৈষম্য

সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রকৃতি

ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রবাদ শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোনপ্রকার ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে মালিকশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য থাকে না। এই ব্যবস্থায় সকলেই শ্রমিক এবং সমগ্র সমাজ হোল তাদের নিয়োগকর্তা। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মত ব্যক্তিগত মুনাফালাভের জন্য সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় না, সামাজিক প্রয়োজনেই উৎপাদন করা হয়। সমাজতন্ত্রে সেবার মনোভাব নিয়ে প্রত্যেকেই কাজ করে, ব্যক্তিগত লাভালাভের মনোভাব নিয়ে নয়।

সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে, সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রের অধীনে আনয়ন করে এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত করেই কেবল ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশের পথ প্রশস্ত করা সম্ভব। সুতরাং ব্যক্তির বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব ব্যক্তির পরিবর্তে রাষ্ট্রের হস্তে অর্পণ করা সমীচীন। এইভাবে রাষ্ট্রের কর্ম-পরিধিকে পরিব্যাপ্ত করে শোষণহীন সাম্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থার প্রবর্তনই সমাজতন্ত্রের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা

অধ্যাপক কোলে (G. H. D. Cole) সমাজতন্ত্রবাদের চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, যথা :

কোলের মতে সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

(১) সমাজতন্ত্রে পারস্পরিক মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ শ্রেণীহীন, বর্ণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় ;

(২) এই ব্যবস্থায় ধনী-দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য থাকে না ;

(৩) উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণগুলির মালিকানা সাধারণের হস্তে ন্যস্ত থাকবে এবং সেগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হবে ; এবং

(৪) প্রত্যেকে নিজের শক্তিসামর্থ্য অনুযায়ী সমাজ কর্তৃক ন্যস্ত দায়িত্ব নিষ্ঠা সহকারে পালন করবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বে সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং নৈতিক চেতনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। তাছাড়া, কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে (economic planning) আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা হয়।

সমাজতন্ত্রবাদের বৈশিষ্ট্য

সমাজতন্ত্রবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিকে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে :

(ক) সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে। সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধিত হলেই ব্যক্তির কল্যাণ সাধন সম্ভব বলে এই মতবাদ মনে করে। ব্যক্তির কল্যাণ সাধনের জন্য রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ একান্ত কাম্য। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে।

ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজের গুরুত্ব

(খ) ধনতন্ত্রবাদের অবসান সমাজতন্ত্রবাদের কাম্য। সমাজতন্ত্রবাদীরা পুঁজিপতিদের শ্রমিক-শ্রেণীর 'স্বাভাবিক শত্রু' (natural enemy) বলে মনে করেন।

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় সম্পদের অসম বন্টন ব্যবস্থার জন্য ধনিক শ্রেণী অধিকতর ধনশালী এবং দরিদ্র শ্রেণী অধিকতর দরিদ্র হতে থাকে। পুঁজিবাদী সমাজ ধনবৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে রাষ্ট্রব্যবস্থা কার্যতঃ প্রভুত্বকারী শ্রেণীর স্বার্থে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিপক্ষে কাজ করে। তাই সমাজতন্ত্র এই সমাজব্যবস্থার অবসান চায়।

ধনতন্ত্রবাদের অবসান

(গ) ধনতন্ত্রবাদের অবাধ-প্রতিযোগিতার নীতিকে সমাজতন্ত্রবাদ সমর্থন করে না। অবাধ প্রতিযোগিতা কেবলমাত্র সম-পর্যায়ভুক্ত ব্যক্তির মধ্যে চলতে পারে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শোষক ও শোষিতের মধ্যে প্রতিযোগিতার অর্থ হোল শোষিত শ্রেণীর অপমৃত্যু। তাছাড়া, এরূপ অসম প্রতিযোগিতার ফলে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি শ্রেণীর হাতে দেশের যাবতীয় সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশা, বেকারত্ব ইত্যাদি অসহনীয় অবস্থা বৃদ্ধি পায়।

অবাধ প্রতিযোগিতা অকাম্য

(ঘ) সমাজতন্ত্রবাদ সাম্যের পূজারী। কিন্তু সাম্য বলতে সকলেই সমান নয়, সকলের আত্মবিকাশের সমান সুযোগসুবিধা লাভকেই সাম্য বোঝায়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার উপর সমাজতন্ত্র অধিক গুরুত্ব আরোপ করে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা

(ঙ) সমাজতন্ত্রবাদ শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধনের পক্ষপাতী। কারণ ব্যক্তিগত সম্পত্তিই হোল শ্রেণী-বিন্যস্ত সমাজের মূল ভিত্তি। ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে পরিচালিত শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদির পরিবর্তে ঐসব ক্ষেত্রে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠাই সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন

৮। সমাজতন্ত্রবাদের সপক্ষে যুক্তি (Arguments for Socialism)

সমাজতন্ত্রবাদের সপক্ষে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করা হয়ঃ

(১) পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভিত্তি হোল অর্থনৈতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ যা মানুষের নৈতিক অপমৃত্যু ঘটায়। ব্যক্তিগত মুনাফালাভের জন্য পুঁজিপতিরা কালোবাজারী, অকাম্য প্রতিযোগিতা ইত্যাদি নীতি-বিগর্হিত কার্যে লিপ্ত হয়। ফলে, সমাজের মধ্যে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বৃদ্ধি পায়। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার এইসব কুফল অন্তর্হিত হয়। মানুষ অসহায় জীবন থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে সাম্যভিত্তিক সমাজে পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযুক্ত সুযোগলাভ করে।

নৈতিক যুক্তি

(২) যাঁরা সমাজতন্ত্রবাদের সপক্ষে দার্শনিক যুক্তি অবতারণা করেন তাঁদের মতে, সমাজকে বাদ দিয়ে ব্যক্তির কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না। সমষ্টির কল্যাণ সাধিত হলেই ব্যক্তির কল্যাণ স্বাভাবিকভাবেই সাধিত হতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ধনতন্ত্রবাদ সামগ্রিক কল্যাণের পরিবর্তে ব্যক্তির কল্যাণ সাধনকে প্রাধান্য দিয়ে ভুল করেছে। ব্যক্তি তার নিজস্ব ভালমন্দ সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। তাই প্রয়োজন সমাজ

দার্শনিক যুক্তি

তথা রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ। সুপরিকল্পিতভাবে রাষ্ট্র সমষ্টির কল্যাণ সাধন করতে সক্ষম। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেই কেবলমাত্র প্রকৃত সুন্দর ও সুখী সমাজের প্রবর্তন ঘটবে।

রাজনৈতিক যুক্তি

(৩) বৈষম্যমূলক ধনতান্ত্রিক সমাজে পরস্পর-বিরোধী দুটি শ্রেণী থাকে। এই দুটি শ্রেণী হোল শোষক শ্রেণী ও শোষিত শ্রেণী। সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভুত্বকারী শোষক শ্রেণীর স্বার্থেই রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালিত হয়। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত শ্রেণী তাদের সর্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এরূপ ব্যবস্থায় গণতন্ত্র অন্তঃসারশূন্য তত্ত্বকথায় পর্যবসিত হয়। কারণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা না থাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কখনই স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য না থাকায় জনগণের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থবহ হয়ে উঠে। প্রকৃত গণতন্ত্র এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

অর্থনৈতিক যুক্তি

(৪) ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতার নীতি প্রবর্তিত থাকার ফলে কাঁচামাল ও মূলধন সংগ্রহ, উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভের জন্য পুঁজিপতিরা নিজেদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। এরূপ প্রতিযোগিতা কালক্রমে একচেটিয়া পুঁজিবাদের জন্ম দেয়; একচেটিয়া পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য আপস-মীমাংসার মাধ্যমে স্বৈরাচারিতার প্রতিষ্ঠা করে। ফলে শ্রমিক শ্রেণী ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অর্থনৈতিক জীবন অনিশ্চিত অন্ধকারে তলিয়ে যায়। কিন্তু সমাজতন্ত্রে অবাধ ও অসাম্যমূলক প্রতিযোগিতার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তনের ফলে সমাজজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়; হাহাকারপূর্ণ অস্থির ও অনিশ্চিত জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বৈজ্ঞানিক যুক্তি

(৫) দুর্বল ও দরিদ্র জনগণকে নির্মমভাবে শোষণ করার জন্য ধনতন্ত্রবাদীরা 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' (survival of the fittest) তত্ত্ব খাড়া করে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের উপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছেন। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে, যোগ্যতমের উদ্বর্তন কেবলমাত্র সমান ক্ষমতাশালীদের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হতে পারে। অসম সমাজে যোগ্যতমের উদ্বর্তনের অর্থই হোল ধনশালী শ্রেণী কর্তৃক ধনহীন শ্রেণীর উপর উৎপীড়ন ও শোষণ। সাম্যভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক সমাজেই কেবলমাত্র গুণগত উৎকর্ষের যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব। এই সমাজে আত্ম-বিকাশের উপযোগী সমান সুযোগসুবিধা বর্তমান থাকায় গুণবান ব্যক্তিরা অতি সহজেই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হতে পারেন। তাই সমাজতান্ত্রিক সমাজে আত্মবিকাশের উপযোগী প্রকৃত পরিবেশ সৃষ্টির গুরুদায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে অর্পণ করা হয়।

সমাজতন্ত্রবাদের মূল্যায়ন (Evaluation of Socialism): ধনতন্ত্রবাদের সমর্থক ও প্রচারকেরা সমাজতন্ত্রবাদকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এর বিরুদ্ধে নানা-প্রকার যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছেন। নিম্নলিখিত যুক্তির সাহায্যে তাঁরা সমাজ-তন্ত্রবাদের অসারতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

[ক] সমালোচকদের মতে, সমাজতন্ত্র ব্যক্তির পরিবর্তে রাষ্ট্রকে অত্যধিক প্রাধান্য

দিয়ে কার্যক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতাকে খর্ব করে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিকে সমাজের অংশ মাত্র বলে বর্ণনা করে ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তাকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করা হয়েছে বলে সমালোচকরা মনে করেন। স্পেন্সার (Spencer)-এর মতে, সমাজতন্ত্র ব্যক্তিকে স্বাধীনতা প্রদানের পরিবর্তে তাদের রাষ্ট্রের ক্রীতদাসে পরিণত করে। তাই সমাজতন্ত্রবাদকে ব্যক্তিস্বাধীনতার চরম বিরোধী বলে বর্ণনা করা হয়।

ব্যক্তির পরিবর্তে রাষ্ট্রের প্রাধান্য সমর্থনযোগ্য নয়

কিন্তু এরূপ সমালোচনা ভিত্তিহীন। সমাজতন্ত্রবাদ কখনই ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। বরং পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তিকে ধনতন্ত্রবাদের কুফলমুক্ত করে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ সুগম করে। এরূপ সমাজে শোষক ও শোষিতের মধ্যে ব্যবধান না থাকায় ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠে। এই মনোভাব ব্যক্তিকে ব্যষ্টি-স্বার্থের পরিবর্তে সমষ্টির স্বার্থে কাজ করতে অনুপ্রেরণা যোগায়। সুতরাং সমাজতন্ত্র কখনই ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী নয়। মার্কসের মতে, সমাজতন্ত্রবাদের লক্ষ্য হোল এমন একটি সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তির পরিপূর্ণ ও স্বাধীন বিকাশসাধন সর্বপ্রধান নীতি হিসেবে কাজ করে। ল্যাস্কি (Laski)-র মতে, প্রত্যেকের ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সমাজকে দু'টি শর্ত পূরণ করতে হয়, যথা—১. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, এবং ২. চিন্তা ভাবনার জন্য অবসরের ব্যবস্থা। সমাজতন্ত্র এই দুটি শর্ত পূরণ করে ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভাকে সম্যকভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়।

সমালোচনা মূল্যহীন

[খ] সমালোচকদের মতে, সমাজতন্ত্রবাদ ন্যায়-প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজে সবাইকে সমান বলে মনে করা হয়। কিন্তু অদক্ষ, অলস ও অদূরদর্শী ব্যক্তিরা কখনই দক্ষ, পরিশ্রমী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের সমান বেতন, সুযোগসুবিধা ইত্যাদি দা[illegible] করতে পারে না। রেই (Rae)-এর মতে, সমাজতন্ত্র হোল এমন একটি ব্যবস্থা যার লক্ষ্য শ্রমিক শ্রেণীকে বিশেষ সুযোগসুবিধা প্রদান করা, যা তাদের আদৌ প্রাপ্য নয়। এইভাবে সমাজতন্ত্র সাম্য প্রতিষ্ঠার নামে ন্যায়বিচারকে (Justice) অস্বীকার করেছে।

ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয় না

কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে এই সমালোচনাটিও ভ্রান্ত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য সাম্য প্রতিষ্ঠা হলেও কখনই তা গুণগত উৎকর্ষকে উপেক্ষা করে না। সমাজতান্ত্রিক সমাজে একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং একজন সাধারণ শ্রমিক কখনই গুণগত দিক থেকে সমান বলে বিবেচিত হন না। কিন্তু সমাজতন্ত্র কৃত্রিম অসাম্যের মূলোৎপাটন করতে বদ্ধপরিকর। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সম্পদের মালিকানার ভিত্তিতে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয়, সমাজতন্ত্র তাকে কৃত্রিম অসাম্য বলে মনে করে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধনশালী ব্যক্তিরা পরিশ্রম না করেও বিলাস ব্যসনে দিনাতিপাত করতে পারে কিন্তু শ্রমজীবী শ্রেণী অমানুষিক পরিশ্রম করেও নিজের ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করতে পারে না। এই কৃত্রিম অসাম্য বিদূরিত করার জন্যই সমাজতান্ত্রিক

ভ্রান্ত সমালোচনা

সমাজে 'যে কাজ করবে না সে খেতেও পাবে না'—নীতি গৃহীত হয়েছে। প্রত্যেকেই তার কাজের আনুপাতিক হারে মজুরি লাভ করবে।

সমাজতন্ত্রবাদ শ্রমিক শ্রেণীকে বিশেষ সুযোগসুবিধা প্রদান করে বলে যে সমালোচনা করা হয় তাও সত্য নয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন, গণ-সাধারণতন্ত্রী চীন প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, ঐ সব রাষ্ট্রে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি শ্রেণীর বিশেষ সুযোগসুবিধার অবসান ঘটানো হলেও শ্রমিক শ্রেণীকে বিশেষ কোন সুযোগসুবিধা প্রদান করা হয়নি। বরং পুঁজিপতি শ্রেণীর অবাধ প্রতিযোগিতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত কৃত্রিম অসাম্যের মূলোৎপাটন করে ঐসব রাষ্ট্রে ব্যক্তিকে আত্মবিকাশের উপযোগী সমান সুযোগসুবিধা এবং সমান কাজের জন্য সমান পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্র শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতার বন্ধন সুদৃঢ় করতে সমর্থ হয়েছে। তাই বলা যায়, সমাজতন্ত্র কখনই ন্যায়বিচারের পরিপন্থী নয়; বরং তা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য শর্ত। বস্তুতঃ সমাজতন্ত্রবাদ মানুষকে ধনতন্ত্রবাদের মজুরি-দাসত্বের (wage slavery) হাত থেকে মুক্ত করে উৎপাদনের সঙ্গে তার অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তাকে উৎপাদন ব্যবস্থার মালিক করে তোলে।

[গ] সমালোচকদের মতে, সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার অবলুপ্তি ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রবাদ মানুষের কর্ম-উদ্দীপনার (incentive to work) ধ্বংসসাধন করে। ব্যক্তিগত মালিকানা থাকায় ধনতন্ত্রবাদে ব্যক্তি অধিকতর আগ্রহ ও উৎসাহের সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সম্পদের উপর সামাজিক মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ব্যক্তি উৎপাদন ব্যবস্থায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করে না। ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের বিলোপ সাধন [illegible] নয়

কিন্তু এই অভিযোগও ভিত্তিহীন এবং বাস্তব সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিক কখনই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করে না। কারণ সে জানে যে, সে পরিশ্রম করছে মালিকদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য, তার নিজের জন্য নয়। তাছাড়া, নানা প্রকার শাস্তির ভয়েই সে বাধ্য হয়ে উৎপাদনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় না। উৎপাদনের উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শ্রমিক কলকারখানার মালিকে পরিণত হয় এবং সমগ্র সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। তারা একথা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারে যে, সমগ্র সমাজের জন্য উৎপাদন করে তারা কার্যতঃ নিজেদের জন্যই উৎপাদন করছে। তাছাড়া ছাঁটাই, বেকারত্ব ইত্যাদির ভয় না থাকায় শ্রমিক নিশ্চিন্ত মনে একাগ্রচিত্তে উৎপাদন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কৃত্রিম শ্রমবিভাগ সমাজতন্ত্রে অনুপস্থিত থাকায় শ্রমিকরা নিজেদের মনোমত কার্যে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়। উৎপাদন কার্যে দক্ষতার আনুপাতিক হারে ন্যায্য পুরস্কার লাভ করে বলে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তারা উৎপাদনের উৎকর্ষ সাধনে আত্মনিয়োগ করে। ফলে উৎপাদন ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়।

সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, এই ব্যবস্থায় মুনাফালাভের সম্ভাবনা না থাকায় মানুষ কাজকর্মে উৎসাহ পায় না। কিন্তু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুনাফা লাভ করে সংখ্যালঘু মালিকরা। সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক শ্রেণী উপাদন ব্যবস্থায় সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী উপাদান হিসেবে কাজ করলেও মুনাফা বা লাভের অংশীদার তারা কখনই হতে পারে না। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিক-মালিকের ব্যবধান না থাকায় প্রত্যেকেই তার সামর্থ্য অনুযায়ী উৎপাদন করে এবং কার্যের আনুপাতিক হারে পুরস্কার লাভ করে। মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মুনাফা লাভের পরিবর্তে সমগ্র সমাজ উৎপাদনের মালিক হওয়ায় সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হতে পারে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তা কখনই সম্ভব হয় না।

[ঘ] ধনতন্ত্রবাদী অর্থনীতিবিদগণ সমাজতন্ত্রের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন যে সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্র উৎপাদন ব্যবস্থার চরম নিয়ন্ত্রক হওয়ার ফলে দেশের সম্পদের ন্যায়সংগত সদ্ব্যবহার হয় না। রাষ্ট্র সর্বদাই মন্থর গতিতে এবং যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত করে। রাষ্ট্রীয় পরিচালনার অর্থ আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য বৃদ্ধি, যা উৎপাদন ব্যবস্থার চরম সর্বনাশ ডেকে আনে।

রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সমালোচনা

কিন্তু এই অভিযোগ যে ভিত্তিহীন বর্তমান সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশের উৎপাদন সম্পদগুলি যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র এবং জনগণের যোথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমস্ত সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার সম্ভব। তাছাড়া, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অর্থ কখনই আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য বৃদ্ধি নয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমলাদের প্রাধান্য বৃদ্ধি এবং দুর্নীতি-পরায়ণতা প্রবাদবাক্যে পরিণত হলেও সমাজতান্ত্রিক সমাজে কমিউনিস্ট পার্টির সর্বব্যাপী প্রাধান্য আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য বৃদ্ধির মূলে কুঠারাঘাত করছে।

ভিত্তিহীন অভিযোগ

[ঙ] জেমস্ বার্নহাম (James Burnham) প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্ সমাজতন্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, সমাজতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা নয়। এই ব্যবস্থায় পুঁজিপতি শ্রেণী বিলুপ্ত হলেও 'পরিচালক শ্রেণী' (Managerial Class) নামে একটি নতুন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নকে 'পরিচালক শ্রেণীশাসিত সমাজের' প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলে মনে করেন।

[illegible]

আপাতদৃষ্টিতে এই সমালোচনা সত্য বলে মনে হলেও বাস্তবে কিন্তু তা সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ সোভিয়েত ইউনিয়ন, গণ-সাধারণতন্ত্রী চীন প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে উৎপাদনের উপায়সমূহকে সর্বহারা শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত করার জন্য কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ চেষ্টা করেন। এই সমাজে সর্বহারা শ্রেণী ছাড়া অন্য কোন শ্রেণীর প্রভাব নেই। পল্ সুইজি (Paul M. Sweezy)-র মতে সোভিয়েত ইউনিয়নে শাসক শ্রেণী বলে কোন শ্রেণীর অস্তিত্ব আদৌ প্রত্যক্ষ করা যায় না।

[illegible] সমালোচনা

[চ] সমাজতন্ত্রবাদকে গণতন্ত্রের পরিপন্থী বলে অনেকে মনে করেন। তাঁদের যুক্তি হোল সমাজতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় নির্দেশানুসারে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পরিচালিত হয়। কোন্ ব্যক্তি কতখানি ভোগ করবে, কি কাজ করবে, কতটুকু কাজ করবে ইত্যাদি সব বিষয়ে রাষ্ট্রের নির্দেশই চূড়ান্ত। তাই এই ব্যবস্থা ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে খর্ব করে। অথচ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও অধিকারের উপর ভিত্তি করে অন্যান্য স্বাধীনতা ও অধিকার গড়ে উঠে। সমাজতন্ত্রে ভোক্তাদের যেমন ভোগ্যদ্রব্য নির্বাচনের স্বাধীনতা থাকে না, তেমনি শ্রমিকদেরও বৃত্তি নির্বাচনের স্বাধীনতা থাকে না। এইভাবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্র কার্যতঃ ভিত্তিহীন হয়ে পড়ে। হায়েক (Heyek)-এর মতে, সমাজতন্ত্রবাদ মানুষকে দাসত্বের পর্যায়ে নিয়ে যায়।

গণতন্ত্রের পরিপন্থী

কিন্তু এই সমালোচনাটিও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ (Central Planning Authority) ভোক্তাদের ভোগ্যদ্রব্যের দাহিদা অনুসারেই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপন্ন করে। ধনতন্ত্রের মতো সমাজতন্ত্রে মুনাফা লাভ উৎপাদনের প্রধান লক্ষ্য না হওয়ায় রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যাদি উৎপাদনে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে না। সুতরাং সমাজতন্ত্রে ভোক্তাদের স্বাধীনতা থাকে না—এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য।

অবাস্তব সমালোচনা

পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থা শ্রমিকদের বৃত্তি নির্বাচনের স্বাধীনতা খর্ব করে বলে যাঁরা মনে করেন তাঁরা পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রকৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন। তাঁরা পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থাকে 'আবশ্যিক শ্রমদান ব্যবস্থা' (Compulsory Labour Service) বলে ভুল করেছেন। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিক স্বাধীন বৃত্তি নির্বাচনের স্বাধীনতা ভোগ করে না। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিক স্বাধীনভাবে তার মনোমত বৃত্তি নির্বাচন করতে পারে। এখানে কৃত্রিম শ্রমবিভাগ না থাকায় শ্রমিক যন্ত্রে পরিণত হয় না।

সুতরাং বলা যেতে পারে যে, সমাজতন্ত্র কখনই গণতন্ত্রের বিরোধিতা করে না। একথা বর্তমানে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য ও স্বাধীনতা না থাকলে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কখনই স্বাধীনতা থাকতে পারে না। সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেছে। জওহরলাল নেহরু এই মন্তব্য করেছেন, কেবলমাত্র ভোটাধিকারের মাধ্যমে ক্ষুধার্ত মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় না। অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ছাড়া রাজনৈতিক গণতন্ত্র অর্থহীন। অধ্যাপক ল্যাস্কিও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন। সুতরাং সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রবর্তন করে রাজনৈতিক ও সামাজিক গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে। কিন্তু উদারনৈতিক গণতন্ত্র অর্থনৈতিক সাম্য ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা না করে কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে গণতন্ত্রকে ব্যর্থ পরিহাসে রূপান্তরিত করেছে।

সমাজতন্ত্রেই প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে

৯। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণবাদ (Theory of State Regulation)

এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাতিন আমেরিকার উন্নতিকামী রাষ্ট্রগুলির অধিকাংশ এবং পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার উন্নত দেশগুলি বর্তমানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের কোনটিকেই এককভাবে গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করে। ঐ সব দেশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে সমন্বয়-সাধন করে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এই ব্যবস্থাকে অনেকে সমাজকল্যাণকর ব্যবস্থা, অনেকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (State Regulation System) ইত্যাদি বলে অভিহিত করেন। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণবাদ সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ উভয়কেই স্বীকার করে নেয়। জনকল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সম্পত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বলে এই মতবাদ বিশ্বাস করে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণবাদ এমন একটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চায় যেখানে সব কিছুই রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে পরিচালিত হবে। সেইসব শিল্পবাণিজ্য পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করতে পারবে যেগুলি বেসরকারী ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় বলে বিবেচিত হয় কিংবা যেগুলি ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় না। তবে সাধারণভাবে সর্বাধিক পরিমাণ জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ-সাধনের জন্য রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ অকাম্য বলে মনে করা হয়।

রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণবাদের অর্থ ও প্রকৃতি

(ক) জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের সংজ্ঞা : বর্তমানে উদারনৈতিক গণতন্ত্র কার্যতঃ গণতান্ত্রিক জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। কিন্তু জনকল্যাণকর রাষ্ট্র বলতে কি বোঝায় তা নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। কোলের মতে, জনকল্যাণকর রাষ্ট্র হোল এমন একটি সমাজ যেখানে প্রত্যেক নাগরিককে ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। আর্থার স্লেসিংগারের মতে, জনকল্যাণকর রাষ্ট্র হোল এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে সরকার সকল নাগরিকের জন্য কর্মসংস্থান (Employment), অর্থোপার্জন, শিক্ষালাভ, চিকিৎসার সুযোগ, সামাজিক নিরাপত্তা এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করে। হার্বার্ট ল্যামেন (Herbert Lehman) জনকল্যাণকর রাষ্ট্র বলতে সেই রাষ্ট্রকে বোঝাতে চেয়েছেন যেখানে জনসাধারণ তাদের ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারে এবং তাদের প্রতিভার উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করে। অধ্যাপক বেনহাম (Prof. Benham) মনে করেন, যে রাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে জনগণের সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয় তাকেই জনকল্যাণকর রাষ্ট্র বলে। হবম্যান (Hobman) জনকল্যাণকর রাষ্ট্রকে সমাজতন্ত্র ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমন্বয় সাধনের ফল বলে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে অস্টিন রেনীও (Austin Ranney) পূর্ণ সমাজতন্ত্র (perfect socialism) এবং পূর্ণ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের (perfect *laissez fair*) মধ্যবর্তী স্থানে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের অবস্থান বলে মনে করেন। ইবেনস্টাইন (Ebenstein) এর মতে, যে-রাষ্ট্র (১) প্রতিটি ব্যক্তির ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান (a minimum standard of living) নিশ্চিত করে, (২) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব ও উন্নতিবিধান করে, এবং

জনকল্যাণকর রাষ্ট্র বলতে কি বোঝায়

(৩) পূর্ণ-নিয়োগের (full employment) ব্যবস্থা করে তাকেই জনকল্যাণকর রাষ্ট্র বলে অভিহিত করা যায়।

(খ) **উৎপত্তি ও বিকাশ :** ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধিকে সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতেন। তাঁদের মতে, রাষ্ট্রের কার্য হবে মাত্র দুটি, যথা—(ক) আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখা এবং (খ) বহিঃশক্তির হাত থেকে দেশ রক্ষা করা। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্রের ধারণা ক্রমে ক্রমে জনপ্রিয়তা হারাতে শুরু করে। ধনতন্ত্রবাদের সর্বব্যাপী সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ধনতন্ত্রবাদের সমর্থক ও প্রচারকরা একথা উপলব্ধি করতে পারলেন যে, মুমূর্ষু ধনতন্ত্রবাদকে বাঁচাতে হলে পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পথ পরিত্যাগ করতে হবে। তাই তাঁরা জনকল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনসমর্থন লাভের জন্য সচেষ্ট হলেন। সর্বপ্রথম ইংল্যাণ্ডে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণাকে কার্যকর রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। রানী প্রথম এলিজাবেথের সময় ইংল্যাণ্ডে দরিদ্র ব্যক্তিদের কল্যাণ সাধনের জন্য একটি আইন প্রণয়ন করা হয়। উক্ত আইনে অক্ষম দরিদ্রদের কাজ দেওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে ফ্রান্সে তৃতীয় নেপোলিয়ন জনগণের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের সংস্কারমূলক কার্য সম্পাদনে ব্রতী হয়েছিলেন। উদাহরণ হিসেবে শ্রমজীবী মানুষের সংগঠনসমূহকে স্বীকৃতি প্রদান, মজুরির হার বৃদ্ধি, রাষ্ট্রীয় সাহায্যে অসুস্থতা-বীমা (state-aided sickness insurance) প্রচলন ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যায়। তৃতীয় নেপোলিয়নের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিসমার্ক জার্মানীতে অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, বার্ধক্য ও অক্ষমতার ক্ষেত্রে সামাজিক বীমা (social insurance) প্রকল্প প্রবর্তন করেন। ১৯০০ সালের পর গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা (Social Democrats) ঐ কর্মসূচীকে অধিকতর ব্যাপকভাবে অনুসরণ করতে থাকেন। ইংল্যাণ্ডে ডিকেন্স এবং কিংসলে, ডিসরেলী প্রমুখ ক্রিশ্চিয়ান সমাজতন্ত্রীরা জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের আদর্শকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করার জন্য প্রচেষ্টা চালান। অনেকে ডিসরেলীকে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের উদ্গাতা বলে বর্ণনা করেন। তাঁর পথ ধরে লয়েড জর্জ এবং তাঁর পরবর্তী সরকারগুলি রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রের পরিধি নির্ধারণের প্রয়াস পান। তারপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি রাষ্ট্র ঐ একই পথে অগ্রসর হতে থাকে। স্বাধীন ভারতবর্ষও জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের আদর্শ গ্রহণ করে। ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ অংশে বর্ণিত রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহের মধ্যে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের আদর্শ বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। সংবিধানের ৩৮নং ধারায় একথা বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র এমন একটি সমাজব্যবস্থার প্রবর্তনের জন্য চেষ্টা করবে যেখানে জাতীয় জীবনের সর্বত্র সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে। সংবিধানে একথা বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সচেষ্ট হবে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ এমনভাবে বণ্টিত হবে যাতে সর্বসাধারণের কল্যাণ সাধিত হয়। রাষ্ট্র এমন কর্ম-পরিবেশ সৃষ্টি করবে যার ফলে শ্রমিকরা জীবনযাত্রার, বিশ্রাম ভোগের ও সামাজিক এবং কৃষ্টিগত সুযোগ-

বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের নীতি গ্রহণ

সুবিধা পেতে পারে। এমন কি শিল্প-পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থাও রাষ্ট্রকে করতে হবে বলে সংবিধানের চতুর্থ অংশে ঘোষণা করা হয়েছে। এক কথায় বলা যায়, গণতান্ত্রিক সমাজবাদের আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে ভারতবর্ষ একটি প্রকৃত জনকল্যাণকর রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের দরবারে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে বলে অনেকে দাবি করেন।

(গ) **জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য :** মানুষ কেবলমাত্র বেঁচে থাকতে চায় না; সে চায় একটি সুন্দর ও সুখী জীবন। এই সুন্দর ও সুখী জীবনের প্রতিষ্ঠা কেবলমাত্র জনকল্যাণকর রাষ্ট্রেই সম্ভব বলে অনেকে মনে করেন। কারণ জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যই হোল সর্বসাধারণের কল্যাণ সাধন করা। উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে :

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও পূর্ণ সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যবর্তী পথে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের অবস্থান

১. জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের সমর্থকগণ পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতো রাষ্ট্রকে অকল্যাণকর বা ক্ষতিকর প্রতিষ্ঠান বলে মনে করেন না। বরং ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধনের জন্য রাষ্ট্রকে তাঁরা অপরিহার্য বলে বর্ণনা করেন। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের সমর্থক ও প্রচারকগণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মতো রাষ্ট্রের সর্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণের তত্ত্বে আস্থাশীল। অন্যভাবে বলা যায়, জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের সমর্থকগণ পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী কিংবা পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে একটি মধ্যপন্থা অনুসরণকেই কাম্য বলে মনে করেন।

জনকল্যাণকর রাষ্ট্র উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল

২. জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের সমর্থকগণ মার্কসবাদীদের মতো শ্রেণীসংগ্রাম কিংবা সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বের তত্ত্বে বিশ্বাসী নন। বরং তারা শ্রেণী-সমঝোতার নীতির প্রতি গভীরভাবে আস্থাশীল। টি. এইচ. মার্শালের মতে, জনকল্যাণকর রাষ্ট্র সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব যেমন নয়, তেমনি আবার তা বুর্জোয়া শ্রেণীর বিলোপ সাধনের পক্ষপাতী নয়। এরূপ রাষ্ট্র উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত বলে তা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা, নাগরিকদের রাজনৈতিক ও পৌর অধিকার-সমূহের স্বীকৃতি প্রদান, একাধিক দল প্রথার অবস্থিতি, শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক উপায়ে সরকারের পরিবর্তন, সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা, নিরপেক্ষ আদালতের অবস্থিতি প্রভৃতিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে।

নিয়ন্ত্রিত ও মিশ্র অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

৩. জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের প্রবক্তাগণ ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের সপক্ষে থাকলেও পূর্ণ-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতো তাঁরা অবাধ ব্যবসা বাণিজ্যের নীতিতে আস্থাশীল নন। তাই তাঁরা নিয়ন্ত্রিত অর্থব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী। তাছাড়া, মিশ্র অর্থব্যবস্থার (Mixed Economy) মাধ্যমে তাঁরা দেশের অর্থনীতিকে এমনভাবে পুনর্গঠিত করা সম্ভব বলে মনে করেন, যা পূর্ণস্বাতন্ত্র্যবাদী কিংবা পূর্ণ-সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

৪. অনেক সময় জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য দূর করার জন্য গতিশীল কর ব্যবস্থার প্রবর্তন, শিল্প-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণ, কিছু কিছু শিল্প-বাণিজ্যের জাতীয়করণ ইত্যাদি ব্যবস্থা গৃহীত হয়। তবে এইসব ব্যবস্থা গ্রহণের পশ্চাতে ধনতন্ত্রবাদের বিলোপ সাধনের কোন উদ্দেশ্য থাকে না। কেবলমাত্র নানা ধরনের সংস্কার সাধনের মাধ্যমে ধনতন্ত্রবাদকে সংকটের হাত থেকে রক্ষা করে তার স্থিতাবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়।

ধনতন্ত্রবাদের স্থিতাবস্থা রক্ষার ব্যবস্থা

(ঘ) **জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের কার্যাবলী :** আধুনিক জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের অনুসৃত নীতি হোল সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করা (the greatest good of the greatest number)। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জনকল্যাণকর রাষ্ট্রকে বিভিন্ন প্রকার গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয়। এরূপ রাষ্ট্রকে যেসব কার্য সম্পাদন করতে হয় সেগুলি হোল :

(১) আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা বজায় রাখা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশরক্ষা করা হোল জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের মৌলিক কার্য। তাছাড়া, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে আইনকানুন প্রণয়ন করতে হয়, বিচারব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হয়, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করতে হয় ইত্যাদি।

মৌলিক কার্য

(২) প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে গ্রহণ করতে হয়। জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে জনগণের অন্যতম পবিত্র মৌলিক অধিকার বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। তবে সামাজিক কল্যাণ সাধনের প্রয়োজনে রাষ্ট্র প্রয়োজন মনে করলে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ

(৩) পারিবারিক জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে গ্রহণ করতে হয়। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র অস্বাভাবিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের উদ্দেশ্যে পরিবার পরিকল্পনা (Family Planning) ব্যবস্থা গ্রহণ, উত্তরাধিকার, বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ প্রভৃতি বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে।

পারিবারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান

(৪) রাষ্ট্র উৎপাদকের যেমন স্বার্থ রক্ষা করবে, তেমনি আবার শ্রমিক, ভোক্তা প্রভৃতির স্বার্থ রক্ষার জন্য কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদিতে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

উৎপাদক, শ্রমিক ভোক্তা প্রভৃতির স্বার্থ সংরক্ষণ

(৫) রাষ্ট্র শুধুমাত্র উৎপাদন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করবে না, সেইসঙ্গে বণ্টন ব্যবস্থার উপরেও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারবে। বণ্টন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্র সমাজের মধ্যে ধনবৈষম্য হ্রাসের জন্য সচেষ্ট হবে। তাছাড়া, বিভিন্ন প্রকার গতিশীল কর আরোপ করে রাষ্ট্র ধনীদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ হতে বার্ধক্য ভাতা, বেকার ভাতা, অসুস্থতা ভাতা ইত্যাদি প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র জনসাধারণের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করে।

উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ

(৬) জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, শিক্ষার বিস্তার, বেকার সমস্যা ইত্যাদির সমাধানের জন্য রাষ্ট্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (Economic Planning) গ্রহণ করতে পারে।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ

(৭) সর্বোপরি, ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে পরিচালিত হতে পারে না এমন সব কার্য রাষ্ট্র সম্পাদন করে। জাতীয় মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ, রেলপথ, বিমানপথ, ডাক যোগাযোগ ইত্যাদির ব্যবস্থা করে যাতায়াতের উন্নতিবিধান, জাতীয় মুদ্রা ও ঋণ ব্যবস্থার পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কার্যাবলী পরিচালনার দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করতে হয়।

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পাদন

(ঙ) **সমালোচনা :** জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণার তথা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণবাদের বিপক্ষে নানা প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করা হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে এই মতবাদ রাষ্ট্রের হস্তে ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্পণ করে কার্যক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে খর্ব করেছে। আবার সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণবাদ ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে পরিচালিত শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির পরিচালন সংক্রান্ত কতকগুলি শর্ত নির্ধারণ করে সেগুলি কার্যক্ষেত্রে রূপান্তরিত করার দায়িত্ব ব্যক্তির হস্তেই অর্পণ করে। এর ফলে সাধারণ মানুষের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদীদের অভিযোগ

মার্কসবাদীদের মতে, জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণা হোল একটি বুর্জোয়া ধারণা এবং জনকল্যাণকর রাষ্ট্র হোল একটি বুর্জোয়া রাষ্ট্র। কারণ—প্রতিটি রাষ্ট্রই হোল শ্রেণী-রাষ্ট্র। সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রভুত্বকারী শ্রেণী নিজেদের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে রাষ্ট্রযন্ত্রকে কাজে লাগায়। ধনতন্ত্রবাদের বিশ্বব্যাপী সঙ্কটের যুগে মুমূর্ষু ধনতন্ত্রবাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের তত্ত্ব খাড়া করেছেন। জনকল্যাণ সাধনের উচ্চ পরাকাষ্ঠা দেখানো হলেও কার্যতঃ এই সব রাষ্ট্র বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত হয় বলে এখানে জনজীবনের কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয় না। বস্তুতঃ উৎপাদন, বন্টন ও বিনিয়োগ ব্যবস্থার উপর বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্য পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকার ফলে এরূপ রাষ্ট্রে জনকল্যাণ সাধনের কথা মিথ্যা পরিহাসে পরিণত হয়। এ. আর. দেশাই-এর মতে, জনকল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বিশেষ স্বার্থ লুকিয়ে থাকে। অনিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্রবাদের ক্ষয়ক্ষতি ও অদক্ষতাকে এড়াবার জন্য এবং শ্রেণীসংগ্রাম যাতে বিদ্রোহের আকারে আত্মপ্রকাশ করতে না পারে সেজন্য একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণী এরূপ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে পুঁজিবাদের কুফল সর্বত্র ভয়ঙ্করভাবে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে। এমন কি সর্বাপেক্ষা উন্নত পুঁজিবাদী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো তথাকথিত জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে জনগণের একটি বিরাট অংশ দারিদ্র্য-সীমার নীচে বাস করে এবং সেখানে বেকার সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ. আর. দেশাই দেখিয়েছেন, বর্তমানে মার্কিন শ্রমিকদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮ ভাগ হোল কাঠামোগত বেকারত্বের শিকার। ভারতের মতো জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রে সীমাহীন দুঃখ-দারিদ্র্য ও বেকারত্ব জনজীবনকে বিপর্যস্ত

মার্কসবাদীদের সমালোচনা

করে তুলেছে। জনকল্যাণ সাধনের জন্য 'সবুজ বিপ্লব', 'বিশ দফা কর্মসূচী', 'গরীবি হঠাও' প্রভৃতি কর্মসূচী ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও কার্যতঃ জনগণের কোন উন্নতিই সাধিত হয়নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ভারতবর্ষে ১৯৫১ সালে মাথাপিছু খাদ্যশস্য সরবরাহের দৈনিক পরিমাণ ছিল ১৬·৫৯ আউন্স। ১৯৬৫ সালে তা সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ১৬·৭৯ আউন্সে দাঁড়ায়। কিন্তু ১৯৭০ সালে অর্থাৎ 'সবুজ বিপ্লবে'র সময় তা হ্রাস পেয়ে ১৫·৭১ আউন্সে নেমে আসে। অনুরূপভাবে ভারতের বিভিন্ন প্রকার ভূমি সংস্কার আইনের মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজের কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়নি। যা হয়েছে তা হোল—পুরানো জমিদারদের একটি বৃহৎ অংশ ধনী ভূস্বামীতে রূপান্তরিত হয়েছে। তাই ম্যাথু কুরিয়ান ভারতবর্ষের ভূমি সংস্কারের ইতিহাসকে শাসক-শ্রেণীর 'ভণ্ডামী ও বিশ্বাসঘাতকতা' (hypocrisy and treachery)-র ইতিহাস বলে অভিহিত করেছেন। জনকল্যাণকর ভারত-রাষ্ট্রের জনকল্যাণের নজীর পাওয়া যায়ঃ একচেটিয়া কারবারগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য জীবনবীমা কর্পোরেশন, শিল্প-লগ্নী কর্পোরেশন (Industrial Finance Corporation), জাতীয় শিল্প বিকাশ কর্পোরেশন প্রভৃতির মতো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। অনুরূপ উদ্দেশ্যে জাতীয় ব্যাঙ্ক ও বীমা প্রতিষ্ঠানগুলিকেও কাজে লাগানো হচ্ছে। এইভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলি পুঁজিবাদের সম্প্রসারণে বিশেষভাবে সহায়তা করছে। সুতরাং বলা যায়, জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে জনগণের কল্যাণ সাধন করা সম্ভব নয় বলে মার্কসবাদীরা মনে করেন। তাঁদের মতে, জনকল্যাণকর রাষ্ট্র কার্যতঃ 'একচেটিয়া পুঁজিবাদের কার্য-নির্বাহক কমিটি' (Executive Committee of monopoly capitalism) হিসেবে কার্য করে মাত্র।

১০। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক (Inter-relation between Democracy and Socialism)

অনেকে সমাজতন্ত্রকে গণতন্ত্রের পরিপন্থী বলে প্রচার করেন। তাঁদের মতে গণতন্ত্র বলতে জনগণ কর্তৃক পরিচালিত শাসনব্যবস্থাকেই বোঝায়। কিন্তু গণতন্ত্রকে এরূপ সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারবিশ্লেষণ করে কেবলমাত্র রাজনৈতিক তত্ত্ব বলে বর্ণনা করা আদৌ সমীচীন নয়। ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র বলতে এমন একটি সমাজব্যবস্থা বোঝায় যেখানে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই সাম্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, যথার্থ গণতন্ত্র বলতে একটি বিশেষ সমাজব্যবস্থা, একটি বিশেষ রাষ্ট্রব্যবস্থা, একটি বিশেষ শাসনব্যবস্থা, এমন কি একটি বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেও বোঝায়। বার্নসের ভাষায়, আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র হলো এমন একটি সমাজব্যবস্থা যেখানে সকল মানুষ সমান না হোলেও এই অর্থে সম মর্যাদার অধিকারী যে এরূপ সমাজব্যবস্থায় প্রত্যেকেই সমাজের অবিচ্ছেদ্য এবং একান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। সমাজের অংশ হিসেবে প্রতিটি মানুষ সম মর্যাদা এবং আত্মবিকাশের উপযোগী সমান সুযোগসুবিধা লাভের অধিকারী। এইসব সুযোগসুবিধা না থাকলে ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভা সম্যকভাবে বিকশিত হতে পারে না। বলা বাহুল্য,

ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের উপরই সুন্দর সমাজগঠন নির্ভর করে। তাই সাম্যের উপর ভিত্তি করে যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে অভিহিত করা হয়। এরূপ রাষ্ট্রে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব জনগণের হস্তে অর্পিত থাকে। ধনী-নির্ধন, অভিজাত-অভাজন, স্ত্রী-পুরুষ প্রভৃতি নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ যখন রাষ্ট্রীয় কার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে তখনই গণতন্ত্র সার্থক হয়ে ওঠে। তাই বিবেকানন্দ বলেছেন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে-কোন শ্রেণীই নেতৃত্ব করুক না কেন, জনগণই হোল চূড়ান্ত ক্ষমতার উৎসস্থল। সুতরাং সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা হোল গণতন্ত্রের ইমারতের তিনটি প্রধান স্তম্ভ। কিন্তু সাম্য ও স্বাধীনতা কেবলমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে থাকলেই সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে না, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সাম্য ও স্বাধীনতাকে সম্প্রসারিত করতে হবে। সমাজে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হলে কখনই প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। যে-সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য-বৈষম্য বিদ্যমান, দেশের সম্পদ মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণাধীন, ব্যক্তিকে প্রতি-নিয়তই অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের সমস্যায় জর্জরিত থাকতে হয়, বেকারত্ব যেখানে মানুষকে অক্টোপাসের মত বেঁধে ফেলে, সেখানে মানুষ কখনই সুস্থ স্বাভাবিক গণ-তান্ত্রিক জীবনযাপন করতে পারে না। এরূপ গণতন্ত্র 'তথাকথিত' গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। বস্তুতঃ উপাদান ও বন্টনের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলেই কেবলমাত্র আদর্শ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এই অধ্যাপক ল্যাস্কি মন্তব্য করেছেন, 'অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ছাড়া রাজনৈতিক গণতন্ত্র অর্থহীন।'

উদারনৈতিক গণতন্ত্রে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা গণতন্ত্র বলতে কেবলমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠাকে বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জনগণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় এরূপ গণতন্ত্র কার্যক্ষেত্রে শোষক-শ্রেণীর গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। এরূপ গণতন্ত্রে রাষ্ট্র জনগণের স্বার্থে পরিচালিত না হয়ে ধনিক-বণিক শ্রেণীর স্বার্থে পরি-চালিত হয়। এরূপ গণতন্ত্রের গর্ভ থেকে পুঁজিবাদের জারজ সন্তান হিসেবে নয়া ফ্যাসীবাদ কখনও কখনও আত্মপ্রকাশ করতে পারে। ফলে রাজনৈতিক গণতন্ত্রও কার্যক্ষেত্রে পদদলিত হতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ তথাকথিত গণতন্ত্রের পীঠস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫০ সালে গৃহীত 'ম্যাক্ক্যারান আইন' (MacCaran Law)-এর সাহায্যে টেলিফোনে কথোপকথন এবং ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের যোগাযোগের উপর পুলিসী নিয়ন্ত্রণ বৈধ করা হয়।

উদারনৈতিক গণতন্ত্র প্রকৃত গণতন্ত্র নয়

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে আদর্শ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি হিসেবে কাজ করে। সমাজতন্ত্র শোষণহীন সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গণমুখী উৎপাদন ব্যবস্থা কার্যকরী করা হয়। এইভাবে সমাজতন্ত্র বৈষম্যমূলক সমাজের অবসানকল্পে মানুষের সুপ্ত প্রতিভাকে যথার্থভাবে

শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজই গণতন্ত্রের ভিত্তিভূমি

বিকশিত করার পরিবেশ সৃষ্টি করে। সুতরাং গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র পরস্পর-বিরোধী নয়, কেবলমাত্র একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবলমাত্র গণতন্ত্র সফল হয়ে উঠতে পারে।

উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র পরস্পরের পরিপূরক বলে অনেকের ধারণা কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত

তবে অনেকে মনে করেন যে, উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নেই অর্থাৎ একে অপরের পরিপূরক মাত্র। এই মতের সমর্থকরা মনে করেন যে, উদারনৈতিক গণতন্ত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করে। এইভাবে উভয়ের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমেই প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কিন্তু এই যুক্তিও সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য নয়। গণ-সাধারণতন্ত্রী চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ঐ সব রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আদর্শ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু কোন উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এককভাবে আদর্শ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় না। সুতরাং আদর্শ গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র অভিন্ন হলেও উদারনৈতিক গণতন্ত্র (যা পুঁজিবাদের নামান্তর মাত্র) কখনই আদর্শ গণতন্ত্র বলে বিবেচিত হতে পারে না।

১১। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদের সম্পর্ক
(Relation between Individualism and Socialism)

[এই অধ্যায়ের 'রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ'-এর 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ' শীর্ষক আলোচনা (৫ দেখ) এবং 'সমাজতন্ত্রবাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়' ও 'সমাজতন্ত্রবাদের সপক্ষে যুক্তি' শীর্ষক আলোচনার (৭ ও ৮ দেখ) সঙ্গে পরবর্তী আলোচনা যোগ করতে হবে।]

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই

সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ পরস্পর-বিরোধী দুটি রাজনৈতিক মতাদর্শ। কিন্তু বার্কারের মতে, উভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ উভয় মতবাদেরই লক্ষ্য ব্যক্তির কল্যাণসাধন। রাষ্ট্র যদি ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে তার নিজের হাতে ছেড়ে দেয়, তাহলে কখনই তার ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হতে পারে না। প্রকৃত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী কখনই সর্বপ্রকার রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করতে পারে না। ম্যাকআইভারের মতে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের (individuality) সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করার অর্থ কখনই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে সমর্থন করা নয়। জীব হিসেবে মানুষের যেমন সামাজিক জীবন (sociality) আছে, তেমনি আছে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। এই দুই-এর সংমিশ্রণেই মানবজীবনের পরিপূর্ণতা আসে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ব্যক্তি হিসেবে মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের কথা বলে আর সমাজতন্ত্রবাদ সামাজিক জীব হিসেবে ব্যক্তির কল্যাণের কথা বলে। সুতরাং উভয় আদর্শের মধ্যে কার্যতঃ কোনরূপ পার্থক্য নেই। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে জোড (C. E. M. Joad) বলেন, চূড়ান্তভাবে সমাজতন্ত্রবাদীদের

লক্ষ্যের সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের লক্ষ্যের কোন ভিন্নতা নেই। এঁদের প্রত্যেকেই ব্যক্তিকে চূড়ান্ত স্বাধীনতা প্রদান করতে চান। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, উদ্দেশ্যের দিক থেকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের কোন পার্থক্য বা বিরোধ নেই। কোন্ উপায়ে (means) ব্যক্তির চূড়ান্ত স্বাধীনতা আসবে সে বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ আছে। এই মতবিরোধ বিদূরিত করার জন্য উভয় মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উপর বার্নস জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, আমরা যদি এমন একটি আদর্শ (ideal)-এর কথা কল্পনা করতে পারি যা একই সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক, তাহলে সেটিই হবে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী আদর্শ (the effective ideal)। বর্তমানে জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রকে সমাজতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ফল বলে অনেকে মনে করেন। তবে একথা সত্য যে, চরম সংকটময় সময়ে মুমূর্ষু পুঁজিবাদকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বুর্জোয়া রাষ্ট্র-দার্শনিকরা জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার কথা প্রচার করেন। এরূপ রাষ্ট্রে শ্রেণীশোষণ ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব পুরোপুরিভাবে বিদ্যমান থাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের স্বার্থ পূর্বের মতই অরক্ষিত থাকে। কেবলমাত্র শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজেই সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধিত হতে পারে। তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সঙ্গে—যা ধনতন্ত্রবাদের নামান্তর মাত্র, সমাজতন্ত্রবাদের কখনই মিলন সাধিত হতে পারে না।

১২। রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের সীমারেখা (Limits of Political Control)

আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলীর মূল্যায়ণ করলে দেখা যায় যে, মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র জীবনের উপর রাষ্ট্রের প্রভাব কোন-না-কোন ভাবে পড়ছে। জনকল্যাণকামী ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ যতই সম্প্রসারিত হচ্ছে ব্যক্তিজীবনের উপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণ ততই পরিব্যাপ্ত হচ্ছে। কিন্তু রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের সীমারেখা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে—এ নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে বাদানুবাদের অন্ত নেই। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কোকার তাই বলেছেন, রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি নির্ধারণের সমস্যা রাজনৈতিক তত্ত্বে যে একটি জটিল সমস্যা সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নেই। তবে একথা সত্য যে, রাষ্ট্র অনেক কিছুকেই প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, যেমন—মতামত, ধর্ম, নৈতিকতা ইত্যাদি। যে সব কার্য রাষ্ট্রের করা উচিত নয় সেগুলিকেই রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের সীমারেখা বলে সাধারণভাবে মনে করা হয়।

রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সীমারেখা সম্পর্কে মতবিরোধ

(১) লুথার (Luther) থেকে শুরু করে ল্যাস্কি, ম্যাকআইভার পর্যন্ত আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ এ বিষয়ে একমত যে, নাগরিকদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে (Freedom of Speech) রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে খর্ব করতে বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ম্যাকআইভারের মতে, মত-প্রকাশের স্বাধীনতাকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ করা উচিত নয়, তা সে যে-কোন ধরনের মতামতই হোক না কেন। যে-কোন বিষয়ে প্রতিটি নাগরিকের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকা একান্ত

নাগরিকদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতায় রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারে না

প্রয়োজন। ল্যাস্কি বলেছেন, মানুষ যা চিন্তা করে তা প্রকাশ করতে না পারলে তার ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হতে পারে না। যেহেতু মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যে ভিন্নতা আছে, সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই তাদের মতামতের ভিন্নতা থাকবে। ল্যাস্কি মনে করেন, যাদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকে না, ক্রমে ক্রমে তারা চিন্তা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, আর যাদের চিন্তা করার ক্ষমতা নেই তারা কখনই সুনাগরিক বলে বিবেচিত হতে পারে না। এমন কি যেসব অভিমত প্রচলিত সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরোধী সেগুলিরও স্বাধীনভাবে প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ থাকা আবশ্যক। ম্যাকআইভারও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তির স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার খর্ব করার কোন ক্ষমতা রাষ্ট্রের থাকা অনুচিত বলে মনে করেন। কারণ বিভিন্ন মতামতের পারস্পরিক সংঘাতের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হতে পারে।

ল্যাস্কির মতে বিপ্লবী মতাদর্শ প্রচার করা হলেও প্রচারকদের শাস্তি দেওয়া সমীচীন নয়। অনেক সময় বিপ্লবী মতাদর্শ প্রচারের ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে—এই অজুহাতে সংশ্লিষ্ট আদর্শ প্রচারের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বা হস্তক্ষেপকে ল্যাস্কি অকাম্য বলে মনে করেন। তাঁর মতে, যদি বিপ্লবী কোন মতাদর্শের সমর্থনে বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ এগিয়ে আসে তাহলে বুঝতে হবে রাষ্ট্র কোথাও কিছু ভুল কাজ করছে। সাধারণ মানুষ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা চায় না, চায় শান্তি ও শৃঙ্খলা। যদি তারা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার পথে অগ্রসর হতে চায়, তাহলে বুঝতে হবে প্রচলিত সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা তাদের ব্যক্তিসত্তার বিকাশের উপযোগী নয়। এরূপ ক্ষেত্রে নাগরিকদের কাছ থেকে আনুগত্য দাবি করার কোন নৈতিক অধিকার তার নেই। ল্যাস্কির মতে, প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থা বিরোধী ধ্যানধারণার প্রতি সহনশীলতার মানদণ্ডেই [illegible] সংশ্লিষ্ট [illegible] পরিমাপ করা যায়।

তবে, নাগরিকদের যে কোন ধরনের মত [illegible] প্রকাশের [illegible] থাকবে না—এ যুক্তি অনেকে মেনে নিতে সম্মত নন। [illegible] যে মত প্রচলিত আইন অমান্য করতে, কিংবা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে [illegible] ইন্ধন যোগায় তাকে দমন করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। কেননা, [illegible] সেখানে আইন পরিবর্তনের সুযোগ থাকে সেখানে বলপ্রয়োগ বা বিপ্লবের মাধ্যমে আইন পরিবর্তনের লক্ষে প্রচলিত রাষ্ট্র কাঠামোকে আঘাত করার প্রচেষ্টাকে দমন করা উচিত বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়। কিন্তু এই যুক্তি সব সময় মেনে নেওয়া কঠিন। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বিরুদ্ধে কাজ করে। এ অবস্থায় সাংবিধানিক উপায়ে সমাজ পরিবর্তন আদৌ সম্ভব নয়। গণ আন্দোলন, বিশেষতঃ শ্রমিক আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করলে উদারনৈতিক গণতন্ত্র তথাকথিত গণতন্ত্রের মুখোশ খুলে ফেলে ফ্যাসিবাদী কায়দায় জনমতকে দমন করার চেষ্টা করে। বস্তুতঃ যতদিন পর্যন্ত শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রবর্তিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত জনসাধারণ স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের সুযোগ পায় না।

(২) ধর্ম মানুষের সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার। তাই এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। রাষ্ট্র বিশেষ কোন ধর্মের যেমন পৃষ্ঠপোষকতা করবে না, তেমনি আবার কোন ধর্ম-প্রচারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টিও করবে না। বার্কারের মতে, কোন রাষ্ট্র যদি আইনের মাধ্যমে ধর্মীয় মতামত প্রচারে বাধা সৃষ্টি করে, তা হলে হয় রাষ্ট্রের ব্যর্থতা নেমে আসবে, নয়তো তার ফল ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। গিলক্রিস্ট বলেছেন, রাষ্ট্র এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ পৃথক সংগঠন হিসেবে থাকবে। তবে একথাও সত্য যে, রাষ্ট্র মানুষের ধর্মবিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সমাজের ক্ষতিসাধনকারী ধর্মের প্রচারেও রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে না। যেসব ধর্ম সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট, যা মানবতার বিরোধী, তাকে নিয়ন্ত্রণ করা রাষ্ট্রের পবিত্র কর্তব্য।

ধর্ম

(৩) আইন ও নৈতিকতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হলেও জনগণের উপর জোর করে নৈতিকতা চাপিয়ে দেওয়ার কোন চেষ্টা রাষ্ট্র করবে না বলে সাধারণভাবে মনে করা হয়। ভাল মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা থেকেই মানুষের নীতিবোধ সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রীয় আইন কেবলমাত্র মানুষের বাহ্যিক আচার আচরণকেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু নীতিবোধ মানুষের বাহ্যিক আচরণ ছাড়াও অভ্যন্তরীণ চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এদিক থেকে আইনের সঙ্গে নৈতিকতার পার্থক্য অবশ্যই বিদ্যমান। তাই ম্যাকআইভার মন্তব্য করেছেন, নৈতিকতার কর্মক্ষেত্রকে রাষ্ট্রীয় আইনের কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করা উচিত নয়। তা ছাড়া রাষ্ট্রীয় আইনকে বলবৎ করার জন্য দমনমূলক শক্তি (Coercive Force) থাকে। কিন্তু নৈতিকতাকে কার্যকরী করার জন্য এরূপ কোন শক্তি থাকে না। মানুষের ন্যায় অন্যায়বোধই নৈতিকতার ভিত্তি। ম্যাকআইভারের মতে, আইনকে যথার্থ বলে মনে করি বলেই আমরা আইন মান্য করি—এ কথা সত্য নয়। বরং রাষ্ট্রীয় আইনকে মান্য করা সমীচীন বলে মনে করি বলেই আমরা আইন মেনে চলি। সুতরাং আইন কখনই নৈতিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তা ছাড়া নৈতিকতা ব্যক্তি-বিশেষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। কিন্তু আইন সর্বক্ষেত্রেই সমান। তাই একই প্রকার আইন কখনই বিভিন্ন প্রকার নৈতিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

নৈতিকতা

(৪) সমাজের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত আচারব্যবহার, রীতিনীতি ইত্যাদিকে প্রথা বলা হয়। রাষ্ট্র যেহেতু প্রথাকে সৃষ্টি করতে পারে না, সেহেতু তাকে নিয়ন্ত্রণ করার বা বাতিল করার কোন ক্ষমতা রাষ্ট্রের নেই। ম্যাকআইভার মনে করেন, রাষ্ট্র প্রচলিত প্রথাগুলিকে স্বীকৃতি দিতে পারে, কিংবা যে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় সেগুলি সৃষ্ট হয়েছে সেই অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে পরোক্ষভাবে তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তবে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর প্রথাগুলিকে আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করাই রাষ্ট্রের কর্তব্য। বাল্যবিবাহ, সতীদাহ ইত্যাদির ন্যায় ভারতীয় কু-প্রথাগুলিকে আইনের মাধ্যমে বিলুপ্ত করে রাষ্ট্র সমাজের কল্যাণসাধনই করেছে। অবশ্য রাষ্ট্র কেবলমাত্র জনসমর্থন লাভ করলেই কু প্রথার বিলোপ সাধন করতে পারে। কিন্তু ম্যাকআইভারের মতে, সমাজের মধ্যে মৌলিক প্রথাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ, পরিবর্তন কিংবা ধ্বংস করার ক্ষমতা রাষ্ট্রের নেই।

প্রথা

(৫) মানুষের সংস্কৃতিকেও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বাইরে রাখার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ দাবি তোলেন। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতি আছে যা ঐতিহ্য, আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, ধর্মীয় বিশ্বাস ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ম্যাকআইভার মনে করেন, সমাজের আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলির দ্বারা সংস্কৃতি যেমনভাবে রক্ষিত হতে পারে, রাষ্ট্রীয় আইন তেমনভাবে তা রক্ষা করতে পারে না। তাই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা বাঞ্ছনীয়, এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ আদৌ কাম্য নয়।

সংস্কৃতি

(৬) শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদির উপরও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অকাম্য বলে বিবেচিত হয়। শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সৃজনধর্মী চিন্তার উপর বাধানিষেধ আরোপ করা হলে তার স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ ব্যাহত হয়। এর ফলে জাতীয় শিল্প ও সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হবে। কিন্তু তাই বলে কুরুচিপূর্ণ অসামাজিক শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদির উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপিত না হলে দেশের নৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে যাবে—জাতির নৈতিক অপমৃত্যু ঘটবে।

শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদি

পরিশেষে একথা বলা যেতে পারে যে, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সঠিক সীমারেখা নির্ধারণের সমস্যা এখনও থেকে গেছে। তাই বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন বিষয়কে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করা হয়। তবে সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি উত্তরোত্তর যত বৃদ্ধি পাচ্ছে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ততই বিস্তৃত হচ্ছে।

উপসংহার

পঞ্চদশ অধ্যায়

মার্কসবাদ

[Marxism]

১। ভূমিকা (Introdoction)

লেনিন বলেছেন, মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গী ও শিক্ষামালার নামই হোল মার্কসবাদ। জার্মান চিরায়ত দর্শন, ইংরেজী চিরায়ত অর্থশাস্ত্র এবং ফরাসী সমাজতন্ত্র তথা সাধারণভাবে ফরাসী বিপ্লবী মতবাদ—উনবিংশ শতাব্দীর এই তিনটি প্রধান ভাবাদর্শগত প্রবাহের ধারাবাহক ও প্রতিভাধর পূর্ণতাসাধক হলেন মার্কস। যে মতামতের সমগ্রতা থেকে বিশ্বের সমস্ত সুসভ্য দেশের শ্রমিক আন্দোলনের তত্ত্ব ও কর্মসূচী হিসেবে আধুনিক বস্তুবাদ এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র পাওয়া যায়, তার অপূর্ব সঙ্গতি ও অখন্ডতার কথা মার্কসবাদের অতি বড় শত্রুরাও পর্যন্ত স্বীকার করে।

ভূমিকা

মার্কস ও তাঁর অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু এঙ্গেলস মানব-সমাজের উৎপত্তি, বিকাশ, প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান চালান। অনুসন্ধানের ফলে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সামাজিক পরিবর্তন কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়। বহিঃপ্রকৃতির পরিবর্তনের মতো কতকগুলি নিয়ম অনুসারে সমাজেরও পরিবর্তন ঘটে। এই সত্যের উপর ভিত্তি করে সমাজ সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব খাড়া করা সম্ভব। এই তত্ত্ব মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। "সমাজ সম্পর্কে ধর্মবিশ্বাস, জাতি (race), বীরপূজা, ব্যক্তিবিশেষের অভিরুচি, আকাশ কুসুমের স্বপ্ন ইত্যাদির ভিত্তিতে গড়া যেসব অস্পষ্ট ধারণা এতদিন প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে, মার্কসীয় তত্ত্ব সে-সবের বিরোধী।" মার্কস সেই সাধারণ তত্ত্বকে তাঁর সমসাময়িক সমাজের, বিশেষ করে পুঁজিবাদী ব্রিটেনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। এইভাবে পুঁজিবাদ সম্পর্কে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। কিন্তু মার্কস নিজেই এ কথা বলতেন যে, তাঁর অর্থনৈতিক তত্ত্বকে তাঁর ঐতিহাসিক ও সামাজিক তত্ত্ব থেকে কোনমতেই পৃথক করা চলে না। মার্কসবাদের অন্য একটি দিকের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সাহায্যে যে-জ্ঞান লাভ করা যায় তার দ্বারা বহিঃপ্রকৃতিকে পরিবর্তিত করা সম্ভব। অনুরূপভাবে সমাজকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করার ফলে যে জ্ঞান অর্জন করা যায়, সেই জ্ঞানকে সমাজের পরিবর্তন সাধন করার কাজে ব্যবহার করা সম্ভব, সুতরাং বলা যায়, মানুষ এবং জড় পদার্থ উভয়ের ক্ষেত্রে সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য নিয়মগুলিকে আশ্রয় করেই মার্কসীয় দর্শন বা বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠেছে। তাই তত্ত্ব হিসেবে মার্কসবাদের শেষ সীমারেখা টেনে দেওয়া হয়নি। যতোই ইতিহাসের অগ্রগতি ঘটে এবং মানুষ যত বেশী পরিমাণে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকে, ততোই মার্কসবাদ ক্রমাগত সমৃদ্ধ

মার্কসবাদের প্রকৃতি

হতে থাকে। তখন তাকে নতুন সংগৃহীত তথ্যগুলির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। মার্কস-এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর এদিক থেকে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন লেনিন, স্তালিন ও মাও সে-তুঙ। "মার্কসবাদ স্বীকৃতি দাবি করে সত্য হিসেবে, কোন বিমূর্ত সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে নয়। আর যেহেতু তা সত্য সেহেতু আজকের পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ ও অভিশাপের ত্রাণ থেকে মানবজাতিকে মুক্তিদানের কাজে মার্কসবাদকে প্রয়োগ করা সম্ভব এবং কর্তব্য। সেই পথেই সমস্ত নরনারীকে সমাজের এক উন্নততর স্তরে পরিণতি বিকাশের পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করবে।"

২ : মার্কসীয় চিন্তাধারার উৎস (Sources of Marxian Thought)

অনেকের মতে, মার্কসীয় চিন্তাধারার মধ্যে কোন মৌলিকত্ব নেই। কারণ মার্কস নানা সূত্র থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তাঁর মতবাদ প্রচার করেছেন। কিন্তু এ অভিযোগ ভিত্তিহীন। যদিও তিনি নানা সূত্র থেকে তাঁর মতবাদের মালমসলা সংগ্রহ করেছিলেন, তথাপি তিনি সেগুলিকে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যাখ্যা করেছেন। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে আলেকজান্ডার গ্রে (Alexander Gray) বলেছেন, এটা অভ্রান্ত সত্য যে, মার্কসীয় চিন্তাধারার উপাদানগুলি বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত হয়েছে। তিনি তাঁর চিন্তাধারার ইষ্টকগুলি বিভিন্ন অট্টালিকার অঙ্গন থেকে সংগ্রহ করে সেগুলিকে নিজের পছন্দমত প্রয়োগ করেছিলেন।

মার্কসবাদের বিভিন্ন প্রকার উৎস

প্রথমতঃ জার্মান দার্শনিক হেগেল (Hegel) এর দ্বন্দ্ববাদের (Dialectics) দ্বারা মার্কস যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু 'দ্বন্দ্বমূলক ভাববাদ'কে তিনি 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে' রূপান্তরিত করেন।

হেগেলের প্রভাব

দ্বিতীয়তঃ মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের 'বস্তুবাদ' আলোচনা করতে গিয়ে প্রায়শঃ দার্শনিক ফয়েরবাখের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, মার্কস ও এঙ্গেলসের বস্তুবাদের সঙ্গে ফয়েরবাখের বস্তুবাদের কোন পার্থক্য নেই। স্তালিনের মতে, "প্রকৃতপক্ষে মার্কস ও এঙ্গেলস ফয়েরবাখের বস্তুবাদের 'অন্তর্নিহিত সারভাগটুকু' গ্রহণ করে তাকে বস্তুবাদের বৈজ্ঞানিক দার্শনিক সিদ্ধান্তে বিকশিত করেন এবং তার ভাববাদী এবং ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় অংশগুলিকে বর্জন করেন।"

ফয়েরবাখের প্রভাব

তৃতীয়তঃ শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব (Theory of Class-struggle) তাঁরা ফরাসী সমাজতন্ত্রবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে মার্কসের নিজের উক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ : "আধুনিক সমাজে শ্রেণীর অস্তিত্ব ও তাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব আবিষ্কারের কৃতিত্ব আমার প্রাপ্য নয়। আমার অনেক আগেই বুর্জোয়া ঐতিহাসিকগণ শ্রেণীদ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক বিকাশ সম্বন্ধে বলে গেছেন এবং বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা শ্রেণীগুলির অর্থনৈতিক গঠন ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে গেছেন। নতুন করে আমি যা দেখিয়েছি তা হোল— ১. একমাত্র উৎপাদনের বিকাশের বিশেষ স্তরের সঙ্গেই শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব সংযুক্ত হয়ে আছে। ২. শ্রেণীসংগ্রাম নিজের প্রয়োজনের তাগিদেই সর্বহারার একনায়কত্বের

ফরাসী সমাজতন্ত্রীদের প্রভাব

সূচনা করে। ৩. আর একমাত্র এই একনায়কত্বই শ্রেণীভেদ বিলোপ করে এবং শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের অন্তর্বর্তী গঠনকার্য করে থাকে।"

কাবের প্রভাব

চতুর্থতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী কমিউনিস্টদের, বিশেষতঃ কাবে (Cabet)-র সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার আদর্শে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। কাবে এমন একটি সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা প্রচার করেছিলেন যেখানে সমস্ত অত্যাবশ্যক কার্য রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পাদিত হবে। কিন্তু কাবে-র আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েও মার্কস ঘোষণা করেন যে, সাম্যবাদী সমাজে রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকবে না। রাষ্ট্র তা আপনা থেকেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে (will wither away)।

ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রী ও অর্থনীতিবিদদের প্রভাব

পঞ্চমতঃ তিনি ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রী ও অর্থনীতিবিদদের প্রভাবকেও উপেক্ষা করতে পারেননি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রবার্ট ওয়েন (Robert Owen)-এর 'চরিত্রের উপর পরিবেশের প্রভাবতত্ত্ব', কিংবা টমসন (Thomson ও হজস্কিন (Hodgskin)-এর 'শ্রমিকই হোল মূল্যের উৎস'—এই তত্ত্বের দ্বারা তিনি যথার্থ প্রভাবিত হয়েছিলেন। আলেকজান্ডার গ্রে মার্কসের উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্বের (Theory of Surplus Value) উপর রিকার্ডো (Ricardo)-র প্রভাব আছে বলে মনে করেন। লেনিনের মতে, মার্কসের প্রতিভার বিশেষত্ব এই যে, তিনিই সর্বপ্রথম বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিপ্লব থেকে বিশ্ব ইতিহাসের শিক্ষা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। আর সেই শিক্ষা সঙ্গতিপূর্ণভাবে তিনিই প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। লেনিন আরো বলেন, "শোষিত শ্রেণী এতদিন আত্মিক দাসত্বের মধ্যে মোহগ্রস্ত হয়েছিল। একমাত্র মার্কসের দার্শনিক বস্তুবাদই সর্বহারা শ্রেণীকে এই মোহ থেকে মুক্তির পথ দেখাতে পেরেছে। পুঁজিবাদে সর্বহারা শ্রেণীর বাস্তব অবস্থান কোথায়—একমাত্র মার্কসীয় অর্থনৈতিক তত্ত্বই তা ব্যাখ্যা করতে পারে।"

৩। মার্কসবাদের কয়েকটি দিক (Some Aspects of Marxism)

মার্কসবাদের প্রতিপাদ্য বিষয়কে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে, যথা—১. দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, ২. ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, ৩. শ্রেণী ও শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব, ৪. উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব এবং ৫. বিপ্লব বিষয়ক তত্ত্ব।

৪। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism)

বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টির বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি

"মার্কসের সমস্ত তত্ত্ব বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টির উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই দৃষ্টি নিয়েই মার্কসবাদ বিশ্বকে বিচার করে, বিশ্বের গতির নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টা করে এবং যেহেতু মানুষ বহিঃসত্যেরই অংশ তাই মানব সমাজের গতির নিয়ম আবিষ্কারে সচেষ্ট হয়। মার্কসবাদ সমস্ত আবিষ্কার ও সমস্ত সিদ্ধান্তকে যাচাই করে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে এবং

যেসব তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত তথ্যের সঙ্গে খাপ খায় না সেগুলিকে সংশোধন ও বর্জন করে।”

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের অর্থ

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ইংরেজী প্রতিশব্দ হোল 'ডায়ালেকটিক্যাল মেটিরিয়েলিজম্'। 'ডায়ালেকটিক্স' কথাটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'ডায়ালিগো' থেকে—যার অর্থ হোল আলোচনা করা, তর্ক করা। প্রতিপক্ষের তর্কধারার অন্তর্নিহিত স্ববিরোধগুলিকে প্রকাশ করে দিয়ে এবং সেগুলিকে অতিক্রম করে সত্যে উপনীত হওয়ার উপায়কে প্রাচীনকালে বলা হোত 'ডায়ালেকটিক্স' বা 'দ্বন্দ্বতত্ত্ব'। মার্কসবাদের দৃষ্টিতে বস্তু বা বস্তুসত্তার অচেতন অংশ হোল আদি এবং মন বা বস্তুসত্তার সচেতন অংশ হোল তার পরবর্তী। এই সূত্র অনুসারে বস্তু বা বহিঃসত্তা হোল মন-নিরপেক্ষ অর্থাৎ তার অস্তিত্ব মনের উপর নির্ভরশীল নয়। প্রকৃতি সম্বন্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গীই হোল বস্তুবাদ।

ভাববাদী দর্শনের মূল কথা

বস্তুবাদের বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী ভাববাদ নামে পরিচিত। ভাববাদী দর্শনের মূল কথা হোল, মনই হোল আদি সত্তা এবং 'বস্তুর যদি আদৌ কোন সত্তা থাকে তা গৌণ'। আমাদের চোখের সামনে প্রতিনিয়ত যা ঘটছে তা সত্য নয়। অনাদি অনন্ত সত্য রয়েছে অনেক গভীরে। আমরা কখনই সত্যকে বা বিশ্বের 'দুর্জ্ঞেয়' রহস্যকে জানতে সমর্থ হই না। এই বিশ্বপ্রকৃতির ঊর্ধ্বে রয়েছে একটি সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ আধ্যাত্মিক শক্তি যাঁর নির্দেশে জগত-সংসার আবর্তিত হচ্ছে। জন্ম, স্থিতি, লয় ইত্যাদি তাঁরই লীলাখেলার অংশমাত্র। এইভাবে মানুষের দৃষ্টিকে বাস্তব সত্যের দিক থেকে দূরে সরিয়ে রাখার কথা ভাববাদ প্রচার করে। মানুষের মন এবং আত্মা মুক্ত ও অবিনশ্বর। এই মুক্ত আত্মাকে সংসারের দৈনন্দিন ক্ষুদ্র স্বার্থ-সংঘাত থেকে মুক্ত রাখাই মানুষের কর্তব্য। তাই ভাববাদী জীবন-দর্শনের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই বলে ভাববাদী দার্শনিকগণ মনে করেন।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের দুটি দিক

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ভাববাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ = বস্তুবাদ + দ্বন্দ্ববাদ। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ বলে অভিহিত করা হয়। টি. এ. জ্যাকন (T. A. Jackon)-এর ভাষায় বলা যায়, বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ হোল এমন এক বস্তুতত্ত্ব যা, ক. আধ্যাত্মিক এবং ভাববাদী ধারণা থেকে মুক্ত; খ. এই তত্ত্ব প্রাকৃতিক জগতকে (মানুষও যার অন্তর্ভুক্ত) বিকাশমান এবং রূপ পরিবর্তনের নিরন্তর ঘটনা প্রবাহ হিসেবে স্বীকার করে এবং গ. এই ঘটমান বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে সে তার নিজস্ব বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উপনীত হয়। বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ তার বিভিন্ন দিকের পারস্পরিক স্বরূপের পার্থক্য, বিবিধের মধ্যে ঐক্য এবং তার বিকাশ সম্পর্কিত বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পরিমাণের অংশসমূহকে পরীক্ষা করে দেখে। স্তালিনের মতে, পুরাকালের দার্শনিক হেরোক্লিটাস বলতেন, 'বহুর মধ্যে এক এই বিশ্বপ্রকৃতি তা কোনো মানুষ বা ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়, তা চিরকালই ছিল এবং থাকবে। এ যেন একটা বহ্নিশিখা যা নিয়মিতভাবে জ্বলছে আর নিভছে।' তাঁর এই উক্তি সম্পর্কে লেনিন মন্তব্য করেন, 'মোটামুটিভাবে এটি হোল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের গোড়ার কথার সুন্দর

বর্ণনা।' এই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ গড়ে উঠেছে মানুষের যুগ যুগ সঞ্চিত জ্ঞান-ভান্ডার এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। তাই এর আবেদন সর্বজনীন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অনুসারে, ১. প্রকৃতি ও তার ঘটনাবলীর মূল ভিত্তি হোল বস্তু এবং ২. দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিতেই এই সত্য ব্যাখ্যা করা যায়।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অনুসারে, (ক) প্রকৃতিগতভাবে আমাদের জগৎ হোল বস্তু বা পদার্থ। এইসব বস্তু অনড় বা অচল নয়; বরং তা গতিশীল অর্থাৎ প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে। হয় তাদের উত্থান ও বিকাশ ঘটছে, নয়তো তারা অধোগতি বা বিনাশের দিকে এগিয়ে চলেছে। জীবিত প্রাণের মত পৃথিবী নিজেই সতত-পরিবর্তনশীল। পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং একে অপরের উপর নির্ভরশীল। তাই সমাজের কোনো ঘটনাই বিচ্ছিন্নভাবে ঘটে না। যে-কোনো ঘটনার গতি একটা নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে চলে। সমাজের বিভিন্ন শক্তি ও বস্তুর অবস্থানকে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়েই তাকে বিচার করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মার্কসবাদী তত্ত্ব অনুসারে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হোল মালিক কর্তৃক শ্রমিক শোষণ। সমাজব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ছাড়া কখনই শোষণের পরিসমাপ্তি ঘটা সম্ভব নয়। কিন্তু কেউ যদি মনে করে যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে থেকে বিশেষ একটি কারখানার মালিক ব্যক্তিগতভাবে সৎ ও ধার্মিক, সে শ্রমিক শোষণ করে না, তাহলে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গীকে অবৈজ্ঞানিক এবং মার্কসবাদ-বিরোধী বলে মনে করা হয়। কারণ সেই কারখানার মালিককে সমাজ-নিরপেক্ষ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হিসেবে ধরা হয়েছে।

বস্তুময় জগতের পরিবর্তনশীল প্রকৃতি

(খ) বিশ্বের সমস্ত বস্তু, প্রাণী ও প্রকৃতির অস্তিত্ব কখনই মানব মন বা মানব-চেতনার উপর নির্ভরশীল নয়। মার্কসবাদ বস্তুকেই মৌলিক বলে মনে করে, মনকে নয়। মানুষের অনুভূতি, চেতনা, কল্পনা প্রভৃতি সবই বস্তুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে অর্থাৎ সেগুলি বস্তুর প্রতিফলন মাত্র। সেগুলিকে কোনভাবেই বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

কোনো কিছুই মানবচেতনার উপর নির্ভরশীল নয়

(গ) মার্কসবাদ মনে করে যে, জগৎ ও তার বিকাশের নিয়ম সম্পর্কিত সমস্ত জ্ঞানই মানুষ আয়ত্ত করতে পারে। প্রকৃতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে মানুষ এখনও সক্ষম না হলেও ক্রমে ক্রমে তার জ্ঞানের পরিধি যে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে—একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

মানুষ প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান আয়ত্ত করতে সক্ষম

পরিবর্তনের ধারাকে বিশ্লেষণ করার জন্য মার্কসবাদ যে বিচারপদ্ধতি প্রয়োগ করে তাকে দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে—প্রকৃতি ও তার বস্তুগুলি গতিশীল এবং সতত-পরিবর্তনশীল। তাদের এই পরিবর্তন ঘটে স্ব-বিরোধের ফলে। এই স্ব-বিরোধ বা নিজের আভ্যন্তরীণ বিরোধী-স্বভাবের দ্বন্দ্বের মাধ্যমে প্রকৃতি ও তার বস্তুগুলি তৃতীয় এক রূপে বিকশিত হয়। যেমন, হাইড্রোজেনের প্রাণ-সংহারক এবং অক্সিজেনের

দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

প্রাণ-সহায়ক সত্তার যৌগিক সংঘর্ষে তৃতীয় সত্তা হিসেবে জলের সৃষ্টি হয়। মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যথা :

কোন কিছুই পরিবেশ-নিরপেক্ষ নয়

[ক] প্রকৃতির কোনো বস্তু বা ঘটনাকে পরিবেশ-নিরপেক্ষভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। যে কোনো ঘটনাকে তার পরিবেশের মধ্যে রেখে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে।

[illegible]

[খ] প্রতিটি বস্তুই গতিশীল বা পরিবর্তনশীল। তাই বস্তুকে বিচার করতে হবে তার গতিশীলতার মানদণ্ডে। প্রাকৃতিক জগতে প্রতিনিয়তই যেমন নতুন নতুন বস্তু জন্মগ্রহণ করছে তেমনি আবার পুরাতন বস্তুর ধ্বংস সাধিত হচ্ছে। দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি বস্তুর জন্ম, বিকাশ ও ধ্বংসকে আলোচনা করলেও এ সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করে বিকাশমান বস্তু বা শক্তির উপর। সুতরাং মার্কসবাদ বিশ্বের কোনো সমাজব্যবস্থাকেই স্থিতিশীল বা অপরিবর্তনীয় বলে মনে করে না। তাই একের পর এক আদিম সাম্যবাদী সমাজ, দাস সমাজ, সামন্ত সমাজ ও বর্তমানে পুঁজিবাদী সমাজে পরিবর্তিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন

[গ] দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি অনুসারে বিকাশের অর্থই হল উন্নত থেকে উন্নততর স্তরে বিকাশ। এই সূত্র অনুসারে "কোনো একটি বস্তুতে তার অন্তর্নিহিত বা বাইরে থেকে প্রযুক্ত শক্তি বা গতির পরিমাণ ক্রমাগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বাড়তে বা কমতে থাকলে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়, যখন বস্তুটির অবস্থাগত এবং গুণগত পরিবর্তন হয়। একেই বলে পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন। যেমন ক্রমাগত উত্তাপ বাড়তে থাকলে জল একসময় বাষ্পে পরিণত হয়। আবার একই জল ক্রমে ঠান্ডা হতে হতে এক সময় জমে বরফ হয়ে যায়। বাষ্প ও বরফের অবস্থাগত ও গুণগত ধর্ম জল থেকে ভিন্ন। আবার এই গুণগত পরিবর্তন কিন্তু আস্তে আস্তে হয় না। পরিবর্তনের নির্দিষ্ট বিন্দুতে এসে তার বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটে।"

[illegible]

[ঘ] দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ একথাও বিশ্বাস করে যে, পুরাতনকে অস্বীকার না করলে নতুনের আবির্ভাব ঘটতে পারে না। বৈপ্লবিক উপায়েই কেবলমাত্র পুরাতনকে ধ্বংস করা যায়। তবে বিপ্লবের অর্থ কেবলমাত্র ধ্বংস নয়, বিপ্লব হোল উন্নততর নতুনের বিকাশ মাত্র। আবার পরবর্তী বিকাশের ফলে ক্রমে ক্রমে নতুন পুরাতন হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবে তখন তাকেও পরিবর্তিত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কখনও কখনও এও দেখা যায় যে, একটি ব্যবস্থাকে বাতিল কারী ব্যবস্থা ক্রমবিকাশের ফলে নিজেই বাতিল হয়ে যায়। তখন পুরাতন ব্যবস্থা আবার ফিরে আসতে পারে। তবে এক্ষেত্রে নতুন ব্যবস্থা পুরাতন ব্যবস্থা অপেক্ষা নিঃসন্দেহে উন্নততর হয়ে যায়। এই ব্যবস্থাকে 'অস্বীকৃতির অস্বীকৃতি' বা 'বাতিল কারীকে বাতিল' (negation of negation) করার নীতি বলে অভিহিত করা হয়। কার্ল মার্কস 'অস্বীকৃতির অস্বীকৃতি' নিয়মের ক্রিয়া দেখাতে গিয়ে বলেছেন, "একজন পুঁজিপতি কয়েকজন পুঁজিপতিকে ধ্বংস করে। এইভাবে কয়েকজন পুঁজিপতি অসংখ্য পুঁজিপতিকে সর্বস্বান্ত করে বা পুঁজির কেন্দ্রীকরণের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে চলে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের সমষ্টিগত প্রয়োগ সচেতনভাবে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রকৌশলের

কোনরূপ অস্তিত্ব না থাকায় বৈর-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটলেও সেখানে শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে দ্বন্দ্ব, গ্রাম ও শহরের মধ্যে দ্বন্দ্ব, মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রভৃতি থেকেই যায়, এরূপ দ্বন্দ্বকে বলা হয় অবৈর দ্বন্দ্ব। সমাজতন্ত্রকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে এরূপ দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানো সম্ভব।

মূল্যায়ন (Evaluation) : দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ধারণাটির গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে মার্কস এবং এঙ্গেলসের চিন্তা পরস্পর-বিরোধী ছিল কিনা এ নিয়ে পশ্চিমী দুনিয়ার 'মার্কস-বিশেষজ্ঞদের' মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। ক্যারিউ হান্ট (R. N. Carew Hunt), আঁরি লাভারব (Henri Lefebvre) প্রমুখের মতে, মার্কসই ছিলেন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রধান প্রবক্তা। পরবর্তী সময়ে এঙ্গেলস্ মার্কসের চিন্তাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন মাত্র। কিন্তু সিডনি হুক (Sidney Hook), আর. সি. টাকার (R. C. Tucker), জেড. এ. জর্ডান (Z. A. Jordan) প্রমুখ মনে করেন যে, মার্কস দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে বিশ্লেষণ পদ্ধতি হিসেবে আদৌ গড়ে তোলেননি। এঙ্গেলসই সর্বপ্রথম দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী তত্ত্বের অবতারণা করেন কিন্তু দুটি অভিমতই ভ্রান্ত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জন হফম্যান (John Hoffman), ভ্যালেন্টিনো গেররাটানা (Valentino Gerratana), টি. ওইজারম্যান (T. Oizerman) প্রমুখ গবেষক একথা প্রমাণ করেছেন যে, মার্কস প্রকৃতি-জগৎকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছিলেন।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের স্রষ্টা নিয়ে মতবিরোধ

দ্বিতীয়ত, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের পশ্চিমী সমালোচকবৃন্দ মনে করেন যে, দ্বন্দ্বতত্ত্বের আলোচনায় মার্কস-এঙ্গেলস কোন রকম অভিনবত্ব দাবি করতে পারেন না। এঁদের বহু পূর্বেই বিভিন্ন দার্শনিক দ্বন্দ্বতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। সমালোচকদের বক্তব্যের মধ্যে কিছুটা সত্যতা থাকলেও তাঁরা মার্কসীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের যথার্থ স্বরূপ যে উপলব্ধি করতে পারেননি তা তাঁদের অভিযোগ থেকেই প্রমাণিত হয়। কারণ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রতিষ্ঠায় অ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো প্রমুখ অর্থনীতিবিদের যেমন প্রভাব ছিল, তেমনি কাল্পনিক সমাজবাদী সাঁ-সিঁমো, ফুরিয়ে ও কাবে এবং নৃতত্ত্ববিদ মরগ্যান কিংবা ফরাসী ঐতিহাসিক গিজো, মিনিয়ের প্রভাবকে মার্কস এঙ্গেলস্ উপেক্ষা করতে পারেননি, তাছাড়া, পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠা লগ্নে দিদেরো, হলবাখ, লা মেৎরি, রোবিনে প্রমুখ বস্তুবাদী দার্শনিকের দ্বারা এঁরা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এমন কি, কান্ট, ফিকটে ও হেগেলের দর্শনও মার্কস-এঙ্গেলসকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। সর্বোপরি, লুডভিগ্ ফয়েরবাখের ভাববাদ-বিরোধিতা ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী মার্কসবাদের স্রষ্টাদের মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে এঙ্গেলস্ বলেছেন, "বিভিন্ন দিক থেকে ফয়েরবাখ্ হেগেলীয় দর্শন এবং আমাদের চিন্তাধারার একটি অন্তর্বর্তী যোগসূত্র হিসেবে কাজ করেছেন।" কিন্তু বিভিন্ন উৎস থেকে মালমসলা সংগ্রহ করলেও মার্কস-এঙ্গেলসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে গড়ে উঠেছে। এর সঙ্গে কাল্পনিক সমাজতন্ত্র, ভাববাদ কিংবা যান্ত্রিক বস্তুবাদের কোনরূপ তুলনাই করা চলে না। কারণ এঁদের বস্তুবাদ এসবেরই বিরোধিতা করে।

অভিনবত্বহীনতার অভিযোগ এবং তার উত্তর

তৃতীয়তঃ, আর্নেস্ট ব্লোচ (Ernest Bloch), সিডনি হুক (Sidney Hook), মের্লো পান্তি (Merleau Panty) প্রমুখ পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানী এই অভিমত পোষণ করেন যে, প্রকৃতি জগতে দ্বন্দ্বতত্ত্বকে প্রয়োগ করা যায় না ; কেবলমাত্র বিমূর্ত চিন্তা ও ভাব জগতেই এর প্রয়োগ সম্ভব। এরূপ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে স্ট্রাক্স (Straks), আন্দ্রেইভ (Andreyev) প্রমুখ বলেন যে, বস্তুজগতের মধ্যেই দ্বন্দ্বতত্ত্ব নিহিত থাকে এবং এর দ্বারাই বস্তুজগৎ নিয়ন্ত্রিত হয়। বস্তুতঃ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ যে বস্তুজগতের পরিবর্তনকে উপলব্ধি করার একমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তা এঙ্গেলস তাঁর 'প্রকৃতির দ্বন্দ্ব' (Dialectics of Nature, 1873-86) ও 'অ্যান্টি-ডুরিং' (Anti-Duehring, 1878)-এ প্রমাণ করেছেন। এদিক থেকে বিচার করে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের তৃতীয় সমালোচনাটিকেও গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করা যেতে পারে।

প্রকৃতি জগতে দ্বন্দ্বতত্ত্বের প্রয়োগ অসম্ভব বলে সমালোচনা এবং এর উত্তর

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের গুরুত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে এমিল বার্নস মন্তব্য করেন : দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সাহায্যে বিজ্ঞানের প্রত্যেক ক্ষেত্রে তথ্যগুলিকে পরিষ্কারভাবে জানা ও বোঝা সম্ভব নয়। মার্কসবাদ তার বেশী কিছু দাবি করে না বা খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলে না। তার কারণ, সেগুলি হল প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিশেষ অধ্যয়ন এবং অনুসন্ধানের বস্তু। তথ্যগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে অধ্যয়নের দ্বারাও যে বেশ কিছুটা বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করা যায় সে কথা মার্কসবাদ অস্বীকার করে না। কিন্তু মার্কসবাদ দাবি করে যে, তথ্যগুলিকে যদি তাদের পরস্পর-নির্ভরশীলতার পটভূমিতে এবং তাদের অগ্রগতির প্রবাহ, পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণমূলক পরিবর্তন ও অন্তর্দ্বন্দ্বের সমগ্র প্রক্রিয়ার আলোকে বিচার করা হয় তাহলে অনেকগুণ বেশী মূল্যবান বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধান মেলে ; তা অনেক বেশী সঠিক হয়।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের গুরুত্ব

সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। মানুষকে ব্যক্তি হিসেবে বিচার করলে, এমনকি সমগ্র সমাজকে একই স্থান ও কালের পরিধিতে অধ্যয়ন করলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তার প্রকৃতি খুবই সীমিত। অন্য সমাজ-সমষ্টি বা একই সমাজের ভিন্ন যুগের অবস্থা সম্বন্ধে সেই সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করা চলে না। মার্কসবাদ শুধু সমাজের বর্তমান রূপটিকে অধ্যয়ন করেই ক্ষান্ত হয় না (যদিও তা খুবই প্রয়োজনীয়), উপরন্তু সমাজের অতীত এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে সমাজের অগ্রগতির প্রক্রিয়াটিকেও বিশ্লেষণ করে। মার্কসীয় সমাজ-বিজ্ঞানের বিশিষ্ট অবদান এখানেই। মার্কসবাদের আলোকে মানুষ সচেতনভাবে এবং পরিবর্তনের বাস্তব প্রবাহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজেদের কর্মধারা পরিচালনা করতে সমর্থ হয়। মার্কসের কথায় "সেই প্রবাহ আমাদের চোখের সামনে দিয়েই এগিয়ে চলেছে।" আমরা একটু সচেষ্ট হলেই তাকে দেখতে পারি। মার্কসবাদের কাছে আমরা পাই কর্মের নির্দেশ। কোনো বিমূর্ত নীতি বা অতীতের কোনো স্থানুধর্মী ভাবধারার নিকট থেকে তা পাওয়া সম্ভব নয়।

উপসংহার

৫। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা (Historical Materialism or Materialistic Interpretation of History)

ডারউইন যেমন জীবজগতের বিবর্তন নীতি আবিষ্কার করেছিলেন, মার্কসও তেমনি মানব-ইতিহাসে বিবর্তনের মূল সূত্রটি বৈজ্ঞানিকভাবে আবিষ্কার করেছেন।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের অর্থ

মানুষের বিকাশ এবং মনুষ্য সমাজ ও তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিকাশের ইতিহাসে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রয়োগকেই ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলা হয়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কেবলমাত্র সমাজ ও তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির অতীত ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করেই তার কর্তব্য শেষ করে না ; এই তত্ত্ব ভবিষ্যৎ সমাজের কাঠামো কেমন হবে সে সম্পর্কেও ইঙ্গিত দেয়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সাহায্যে মার্কস ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, পুঁজিবাদের গর্ভ থেকে সমাজতন্ত্র জন্ম নেবে। তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে।

ইতিহাস সম্পর্কে বুর্জোয়া ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মার্কসবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গীর যথেষ্ট পার্থক্য আছে। বুর্জোয়া ঐতিহাসিকদের মতে, ইতিহাস হোল সময়ের যোগসূত্রে গ্রথিত কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার বিবরণ। বুর্জোয়া

ইতিহাস সম্পর্কে বুর্জোয়া ও মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী

ইতিহাসের মধ্যে প্রধানতঃ রাজায় রাজায় যুদ্ধ, কোন্ রাজা কতদিন রাজত্ব করেছেন, কোন্ রাজা কোন্ ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন, কোন্ রাজা কিভাবে রাজত্ব হারালেন ইত্যাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু মার্কসের মতে, ইতিহাসের কোনো ঘটনাই বিচ্ছিন্ন নয় ; বরং একটি ঘটনার সঙ্গে অন্যটির নিবিড় সম্পর্ক আছে। মার্কসবাদীরা ইতিহাসের প্রতিটি ঘটনাকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করেন।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল আলোচ্য বিষয় হোল সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করা। মানুষকে নিয়ে যেমন সমাজ গঠিত হয় তেমনি

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়

আবার মানুষের জন্যই সমাজের অস্তিত্ব বজায় থাকে। সুতরাং মানুষ ও সমাজ উভয়েই অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। বাঁচার জন্য মানুষের প্রয়োজন খাদ্য, পরিধেয়, বাসস্থান, উৎপাদনের উপকরণ ইত্যাদি। এই বাস্তব প্রয়োজনগুলি পূরণ করার জন্য মানুষকে উৎপাদন কার্যে অংশগ্রহণ করতে হয়। এই সব উৎপাদনের উপায় ও উৎপাদন পদ্ধতির উপর সমাজের বৈষয়িক জীবনযাত্রা নির্ভরশীল। সমাজের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের উপর তার বৈষয়িক জীবন অর্থাৎ সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটে। মার্কস মানব-ইতিহাস পর্যালোচনা করে প্রমাণ করেছেন যে, মানুষের প্রয়োজনীয় উৎপাদন এবং উৎপাদন পদ্ধতির প্রভাবে মনুষ্য সমাজের মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অর্থনীতিই হোল সমাজের ভিত্ এবং সেই ভিতের উপর দাঁড়িয়ে থাকে আইনব্যবস্থা, কলা, ধর্ম, সাহিত্য ইত্যাদি, যেগুলির সমন্বয়ে সমাজের ইমারত গঠিত হয়। ঐসব প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকে না, সেগুলির দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিতও হয়। সুতরাং মার্কসের মতে, উৎপাদন পদ্ধতিই হোল সবকিছুর মূল। এর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠে সমাজ এবং শ্রেণী-সম্পর্ক।

উৎপাদন বলতে বোঝায় প্রকৃতির বস্তু ও শক্তির উপর মানুষের শ্রম প্রয়োগ করে বৈষয়িক দ্রব্যাদি তৈরি করার প্রক্রিয়া। উৎপাদনের উপাদান হোল দুটি, যথা—প্রকৃতি এবং মানুষের শ্রমশক্তি। "উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানুষ শুধু প্রকৃতির উপরই কাজ করে না, একে অপরের উপর কাজ করে। কোনো-না-কোনো প্রকারের সহযোগিতা করেই এবং পরস্পরের কাজের ফল আদানপ্রদান করেই তারা উৎপাদন করে থাকে। উৎপাদন করতে হলে একের সঙ্গে অপরের নির্দিষ্ট সংযোগ ও সম্পর্ক বজায় রেখেই প্রকৃতির উপর তাদের কাজ অর্থাৎ উৎপাদন পরিচালিত হতে পারে।" তাই উৎপাদন বলতে সব সময়ই সামাজিক উৎপাদনকে বোঝায়। উৎপাদন পদ্ধতির (mode of production) দুটি দিক আছে। একটি হোল উৎপাদন শক্তি (forces of production) এবং দ্বিতীয়টি হোল উৎপাদন-সম্পর্ক (relation of production)। শ্রমিক ও তার শ্রমক্ষমতা, আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি হোল উৎপাদন শক্তি। স্তালিনের ভাষায়, "উৎপাদনের যে উপকরণগুলোর সাহায্যে বৈষয়িক দ্রব্যাদি উৎপাদিত হয়, যে জনগণ উৎপাদন অভিজ্ঞতা এবং শ্রমকৌশলের বলে উৎপাদনের উপকরণগুলি ব্যবহার করে এবং বৈষয়িক দ্রব্যাদি উৎপাদন করে এই সব কিছু নিয়ে সমাজের উৎপাদিকা-শক্তি গঠিত হয়।" উৎপাদন-সম্পর্ক হোল উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানুষে মানুষে তথা শ্রেণীতে শ্রেণীতে উৎপাদন-ভিত্তিক পারস্পরিক সংযোগ বা সম্পর্ক। স্তালিন বলেছেন, "বৈষয়িক মূল্যসমূহের উৎপাদনে মানুষকে পারস্পরিক কোনো-না-কোনো সম্পর্কের বন্ধনে, কোনো-না-কোনো উৎপাদন সম্পর্কে আবদ্ধ হতে হয়—শোষণ-সম্পর্ক রহিত মানুষ জনগণের পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতাও তার একটি রূপ হতে পারে, আবার দলন ও দাসত্বের সম্পর্কও এ বন্ধনের অন্য রূপ হতে পারে। আবার এ উৎপাদন সম্পর্ক এক স্তর হতে আর এক স্তরে রূপান্তরের অন্তর্বর্তীকালীনও হতে পারে। কিন্তু এ সম্পর্কের স্বরূপ যাই হোক না কেন, সকল সমাজব্যবস্থাতেই উৎপাদিকা শক্তির মতোই তা উৎপাদনের অপরিহার্য উপাদান।"

উৎপাদনের দুটি দিক—উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক

মার্কসের মতে, উৎপাদনের দুটি অংশের মধ্যে অর্থাৎ উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে সঙ্গতি বজায় থাকলেই উৎপাদন কার্য চলতে পারে। কিন্তু ক্রমবিকাশের ফলে উৎপাদন শক্তির উন্নতি সাধিত হলে উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে তার সঙ্গতি বিনষ্ট হয়। ফলে উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তন অর্থাৎ প্রচলিত সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে উঠে। অন্যভাবে বলা যায়, উৎপাদন-ব্যবস্থার দুটি অংশের মধ্যেকার দ্বন্দ্বই উৎপাদন-ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনে। উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে সমাজব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটে।

উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন সমাজের পরিবর্তন আনে

উৎপাদনের নিজস্ব কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে, ১ উৎপাদনের গতিশীলতা হোল তার প্রথম বৈশিষ্ট্য। উৎপাদন কখনও বহুদিন এক জায়গায় আটকে থাকে না। স্তালিন বলেছেন, "উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমাগত পরিবর্তিত ও উন্নত হয় আর এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-ব্যবস্থায়, সামাজিক ধারণায় ও রাজনৈতিক মতামতে ও প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন অপরিহার্য

উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য: গতিশীলতা

হয়ে পড়ে—সমগ্র সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করারও দরকার হয়। ⋯সমাজের উৎপাদন রীতি যে ধরনের তা ই প্রধানতঃ সমাজ, সমাজের চিন্তাধারা ও ভাবাদর্শ, সমাজের রাষ্ট্রনৈতিক মনোভাব ও ব্যবস্থাকে নিরূপণ করে।" সুতরাং সমাজ-বিকাশের ইতিহাস হোল মূলতঃ উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের ইতিহাস। স্তালিনের ভাষায়, "সমাজবিকাশের ইতিহাস বলতে সঙ্গে সঙ্গে বৈষয়িক মূল্যাদির উৎপাদকগণের ইতিহাস, শ্রমজীবী জনতার ইতিহাসকেই বোঝায়;⋯অতএব ইতিহাস-বিজ্ঞানের প্রধান কাজ হোল উৎপাদনের নিয়ম, উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের নিয়ম, উৎপাদন-সম্পর্ক এবং সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের নিয়মগুলো আলোচনা ও প্রকাশ করা।"

(২) উৎপাদনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হোল উৎপাদন-শক্তির সচল ও বৈপ্লবিক প্রকৃতি। সর্বপ্রথম যন্ত্রপাতির পরিবর্তন ও উন্নতির ফলে উৎপাদন-শক্তির পরিবর্তন ও বিকাশ শুরু হয়। মার্কসের মতে, বিকাশের বিশেষ বিশেষ স্তরে সমাজে বস্তুগত উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে প্রচলিত উৎপাদন-সম্পর্কের বিরোধ বাধে। অন্যভাবে বলা যায়, উৎপাদন-শক্তি এতদিন যে সম্পদ-সম্পর্কের (Property relation) মধ্যে কাজ করছিল তার সঙ্গে উৎপাদন-শক্তির বিরোধ বেধে যায়। "এই সম্পর্ক এখন উৎপাদন-শক্তির বিকাশের সহায়ক না হয়ে তার শৃঙ্খলে পরিণত হয়। তখনই একটি সমাজবিপ্লবের যুগের সূচনা হয়।" বিরোধের প্রাথমিক পর্যায়ে উৎপাদন-সম্পর্ক বিকশিত উৎপাদন-শক্তির কিছু অংশকে সাময়িক ধ্বংস করে নিজের প্রাধান্য বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে উৎপাদন-শক্তির পরিমাণগত বৃদ্ধির চাপে উৎপাদন-সম্পর্কের গুণগত বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। তখন উৎপাদন উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত হয়। "সুতরাং উৎপাদিকা-শক্তি যে উৎপাদন ব্যাপারে শুধু সর্বাপেক্ষা গতিশীল ও বিপ্লবী উপাদান তা-ই নয়, তা উৎপাদনের উন্নতিকেও নিরূপিত করে। উৎপাদিকা-শক্তির যে রূপ, উৎপাদনের পারস্পরিক সম্পর্কগুলোরও হবে সেই রূপ। উৎপাদন-সম্পর্ক স্থিরীকৃত হয় উৎপাদনের উপাদানসমূহের মালিকানার ভিত্তিতে অর্থাৎ জমি, বন, জঙ্গল, খনিজ সম্পদ, কাঁচামাল, উৎপাদনের যন্ত্র, উৎপাদনের স্থান ইত্যাদির মালিক কে তার ভিত্তিতে।

উৎপাদন-শক্তির সচল ও বৈপ্লবিক প্রকৃতি

প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত উৎপাদিকা শক্তির উন্নতি ও পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে যে উৎপাদন-সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরিবর্তন এবং উন্নতি সাধিত হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা যেতে পারে। আদিম যৌথ সমাজব্যবস্থায় উৎপাদন-সম্পর্কের ভিত্তি ছিল এই যে, উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিক ছিল সমগ্র সমাজ। এই যুগের উৎপাদিকা শক্তির প্রকৃতির সঙ্গে তার মোটামুটি সামঞ্জস্য আছে। পাথরের অস্ত্রাদি ও তার পরবর্তী যুগে তীরধনুকের প্রচলন হলে দেখা গেল যে, মানুষের পক্ষে একক চেষ্টায় বন্যজন্তু ও প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করা সম্ভব নয়। একত্র পরিশ্রম করার ফলে যারা কাজ করত তারা সকলে মিলেই ছিল উৎপাদনের উপকরণের ও উৎপন্ন দ্রব্যের মালিক। এরূপ সমাজে শ্রেণীবিভাগ ছিল না, ছিল না শ্রেণী-শোষণ। দাস-সমাজ-ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণগুলির, এমন কি দাসদেরও মালিক হোল দাস-মালিকরা।

ঐতিহাসিক উদাহরণ

এরূপ উৎপাদন-সম্পর্ক সে যুগের উৎপাদিকা-শক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। "পাথরের অস্ত্রের পরিবর্তে মানুষ তখন ধাতুনির্মিত অস্ত্র ব্যবহার করতে পারত: আদিম যুগের যে শিকারী কৃষিকার্য ও পশুচারণ জানত না, তার শোচনীয় দুর্দশার পরিবর্তে তখনকার মানুষ কৃষিকার্য, পশুচারণ এবং কারিগরির সঙ্গে পরিচিত এবং উৎপাদনের এই বিভিন্ন শাখায় তখন শ্রমবিভাগ প্রবর্তিত হয়েছে। ...এই সময়ে উৎপাদনের উপকরণগুলো অল্প সংখ্যক লোকের হাতে জমতে থাকে, আর যারা সংখ্যাল্প তাদের কবলে সংখ্যাগরিষ্ঠদের দমন এবং দাসে পরিণত হবার সম্ভাবনা দেখা যায়।" এরূপ সমাজে উৎপাদনের উপকরণ কিংবা উৎপাদনের ফলের উপর সমাজের কর্তৃত্বের পরিবর্তে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। "ধনী ও দরিদ্র, শোষক ও শোষিত, অধিকার-সম্পন্ন ও অধিকারহীন এবং তাদের মধ্যে দারুণ শ্রেণী-সংঘর্ষ—এই হোল দাসব্যবস্থার চিত্র।"

সামন্ত সমাজে সামন্ত-প্রভুরা উৎপাদনের উপাদানগুলির মালিক আর উৎপাদনরত শ্রমিক হোল ভূমিদাস বা সার্ফ—ভূস্বামী যাকে ক্রয়বিক্রয় করতে পারে, কিন্তু হত্যা করতে পারে না। সামন্তদের অধিকারের পাশাপাশি উৎপাদনের উপকরণ এবং ব্যক্তিগত শ্রমের ভিত্তিতে স্থাপিত নিজেদের ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কে কৃষক ও কারিগরদের সম্পত্তির অধিকারও স্বীকৃতিলাভ করে। উৎপাদন-ব্যবস্থার এইসব সম্পর্ক ঐ যুগের অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। তারপর লোহার ব্যবহার-কৌশল আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকার্য, উদ্যানবিদ্যা ইত্যাদির উন্নতি ঘটল। সেই সঙ্গে কারিগরদের ছোট ছোট নিজস্ব কারখানাও গড়ে উঠল। এই নতুন উৎপাদিকা-শক্তির পক্ষে প্রয়োজন ছিল শ্রমিককে উৎপাদনে উদ্যোগ দেখাতে হবে এবং কাজের জন্য আগ্রহী ও কাজে মনোযোগী হতে হবে। তাই সামন্তপ্রভুরা দাসদের বাতিল করে দিল। তার পরিবর্তে উৎপন্ন শস্যের একাংশ যারা জমিদারকে দেওয়ার জন্য আগ্রহী তাদের সঙ্গেই তারা কারবার করতে চাইল। এই ব্যবস্থায় শোষণ প্রায় দাস যুগের মতই থেকে গেল। তাই শোষক ও শোষিতের মধ্যে শ্রেণী-সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল।

পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় পুঁজিপতিরা হোল উৎপাদনের উপাদানগুলির মালিক, কিন্তু তারা শ্রমিকদের সর্বময় প্রভু নয়। মজুরি-শ্রমিকরা হোল সর্বহারা। তাদের একমাত্র সম্পদ হোল নিজেদের শ্রমশক্তি, যা বিক্রী করে তারা অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করে। আধুনিক যুগের উৎপাদিকা-শক্তির পক্ষে প্রয়োজন হোল যন্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী শ্রমিকের। তাই পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের বেছে নিল অধিকতর উৎপাদন করার জন্য। "কিন্তু উৎপাদিকা-শক্তিকে বিপুলভাবে বিকশিত করে ধনতন্ত্র এমন দ্বন্দ্বের জালে জড়িয়ে পড়েছে যা থেকে মুক্ত হবার ক্ষমতা তার নেই। উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়ে এবং তার দাম কমিয়ে ধনতন্ত্র প্রতিযোগিতাকে প্রখর করছে, ছোট ও মাঝারি ধরনের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার. দলকে নিঃশেষ করছে, তাদের সর্বহারায় পরিণত করছে এবং ক্রয়শক্তি হ্রাস করছে; ফলে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। অপরপক্ষে, উৎপাদন বাড়িয়ে এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে বিরাট বিরাট কলকারখানায় একত্র করে ধনতন্ত্র উৎপাদনকে যে এক সামাজিক বৈশিষ্ট্য দান করেছে, তার ফলে ধনতন্ত্রের নিজের ভিত্তিই ক্ষয় পাচ্ছে। কারণ উৎপাদন-প্রক্রিয়ার এই

সামাজিক প্রকৃতি দাবি করে যে, উৎপাদনের উপাদানগুলোও সামাজিক অধিকারে যাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এগুলো এখনও ব্যক্তিগত ধনতান্ত্রিক সম্পত্তি; এই অবস্থা উৎপাদন ক্রিয়ার সামাজিক প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খায় না। এর ফলে ধনতন্ত্রের গর্ভে বিপ্লব আসন্ন জন্মের অপেক্ষায় থাকে। এই বিপ্লবের উদ্দেশ্য হোল উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করা।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রচন্ড শ্রেণী-সংগ্রামের ফলে একদিন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়ন, গণ-সাধারণতন্ত্রী চীন প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনের উপাদানের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটিয়ে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে মানুষ মানুষকে শোষণ করে না। এরূপ উৎপাদন পদ্ধতিতে জনগণের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি হোল বন্ধুসুলভ সহযোগিতা। সুতরাং উৎপাদন-সম্পর্কের বিকাশ সমাজে উৎপাদিকা-শক্তি বিকাশের উপর এবং প্রধানতঃ উৎপাদনের উপকরণ বিকাশের উপর এতই নির্ভরশীল যে, উৎপাদিকা-শক্তির বিকাশ ঘটলে, দ্রুত কিংবা বিলম্বে উৎপাদন-সম্পর্কেও অনুরূপ পরিবর্তন ও বিকাশ ঘটে।

(৩) উৎপাদনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হোল পুরাতন উৎপাদন-ব্যবস্থার মধ্য থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎপাদন-শক্তির বিকাশ ঘটে এবং তার ফলে উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। মূলতঃ দুটি কারণে তা ঘটে। প্রথমতঃ কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে মানুষ তার ইচ্ছামত উৎপাদন যন্ত্র এবং উৎপাদন-সম্পর্কের কাঠামো নির্ধারণ করতে পারে না। কারণ প্রত্যেক মানুষ যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করে তখন তাকে পূর্বপুরুষদের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্ককে মেনে নিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ মানুষ যখন কোনো একটি উৎপাদন যন্ত্রের ও উৎপাদন শক্তির কোনো একটি উপাদানের উন্নতি সাধন করে তখন সেই উন্নতির সামাজিক ফলাফল কি ঘটবে তা সে চিন্তা করে না। সে কেবলমাত্র তার বর্তমান লাভ-অলাভের কথাই ভাবে। যেমন বুর্জোয়ারা যখন সামন্ত উৎপাদন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে কম খরচে অধিক উৎপাদনের লোভে কারখানা প্রথায় উৎপাদন শুরু করেছিল, তখন তারা একবারও ভাবেনি যে, এটাই একদিন তাদের মৃত্যু পরোয়ানা জারী করবে। তবে একথা সত্য যে, সমাজ-বিবর্তনের কোনো স্তরেই উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তন বিনা সংঘর্ষে সম্পন্ন হয় না। প্রতিটি স্তরেই শ্রেণীদ্বন্দ্ব বা শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংঘর্ষের মাধ্যমেই সমাজের অগ্রগতি সাধিত হয়। তাই মার্কস বলেছেন, "প্রতিটি পুরাতন সমাজের গর্ভে যখন নতুন সমাজের উদ্ভব হয়, শক্তি তখন ধাত্রী হিসেবে কাজ করে।" এইভাবে মার্কস তাঁর ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সমাজ-বিবর্তনের ধারা ব্যাখ্যা করেছেন।

পুরাতন উৎপাদন ব্যবস্থার গর্ভ থেকে উৎপাদন-শক্তির বিকাশ ও ফল

মূল্যায়ন (Evaluation) : ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রভাবে কমবেশী আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ প্রভাবিত হয়েছেন। সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশে অর্থনৈতিক উপাদানের ভূমিকা যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু সমালোচকরা

অর্থনৈতিক উপাদান একক উপাদান নয়

এই অভিমত পোষণ করেন যে, ইতিহাসের সমস্ত ঘটনাবলীর পশ্চাতে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উপাদানই এককভাবে কাজ করে না। তাঁদের মতে, মানুষের জীবন এবং কার্যাবলীর উপর অর্থনীতির মত ধর্ম, দর্শন, আবহাওয়া ইত্যাদির প্রভাবও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মুসলিমদের ভারত অভিযানের পশ্চাতে ধর্মীয় কারণ লুক্কায়িত ছিল বলে সমালোচকরা মনে করেন। অনুরূপভাবে ট্রয় নগরী ধ্বংসের পশ্চাতে অর্থনৈতিক কারণ অপেক্ষা অন্য কারণই ছিল প্রধান।

দ্বিতীয়তঃ, সমালোচকরা অর্থনীতিকে ভিত্ হিসেবে ধরে নিয়ে আদর্শ রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিকে উপরিকাঠামো হিসেবে মেনে নিতে সম্মত নন। তাঁরা মনে করেন যে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেমন আদর্শের জন্ম দেয় তেমনি আদর্শও নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্ম দিতে পারে। উদাহরণ হিসেবে তাঁরা ১৯১৭ সালের পরবর্তী সোভিয়েত রাশিয়ার অর্থনীতিকে সাম্যবাদী আদর্শের ফসল বলে চিহ্নিত করেন।

[illegible] ও ইমাব[illegible]
[illegible] সমালোচনা

তৃতীয়তঃ, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ একথাই বলে যে, উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিকানা যাদের হাতে থাকে তারাই সমাজে ক্ষমতার অধিকারী হয়। সমালোচকরা এই বক্তব্যের মধ্যে কিছুটা সত্য নিহিত আছে বলে মনে করলেও পুরোপুরি তা মেনে নিতে রাজী নন। মধ্যযুগের পোপের অপ্রতিহত প্রাধান্যের পশ্চাতে অর্থনৈতিক উপাদানের বিশেষ কোনো ভূমিকা ছিল না বলে সমালোচকরা দাবি করেন। বর্তমানে অনেক দেশে সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে যাঁরা শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন তাঁদের কর্তৃত্ব বৃদ্ধির পশ্চাতে অর্থনৈতিক উপাদানের ভূমিকা অত্যন্ত নগণ্য। তাই সমালোচকরা মনে করেন, অর্থনৈতিক উপাদান ছাড়াও সাহস, বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা ইত্যাদি মানুষকে ক্ষমতাশালী করে তুলতে পারে।

সর্বপ্রকার ক্ষমতায় উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর মালিকানা নয়

চতুর্থতঃ, সমালোচকদের মতে, উৎপাদনের উপকরণগুলির পরিবর্তন কেন সাধিত হয়—এই প্রশ্নের উত্তর ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু তা যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করতে না পারলে কখনই ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই সমালোচকরা ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকে অসম্পূর্ণ এবং অবৈজ্ঞানিক বলে সমালোচনা করেন।

উৎপাদনের উপকরণগুলির পরিবর্তনের কারণ মার্কসবাদ ব্যাখ্যা করেনি

কিন্তু সমালোচকদের উপরি-উক্ত সমালোচনাগুলি যথার্থ নয়। সমাজের ক্রমবিকাশের ধারাকে বিশ্লেষণ করলে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইতিহাসের সমস্ত ঘটনার পশ্চাতে কোনো-না-কোনো ভাবে অর্থনীতি প্রভাব বিস্তার করে। এই অর্থনীতি তথা উৎপাদন-পদ্ধতির উপর ভিত্তি করেই সমাজ ও সামাজিক-রাজনৈতিক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলি দাঁড়িয়ে থাকে। মার্কস ও এঙ্গেলসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, তাঁরা শুধু অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেই ইতিহাসের একমাত্র চালিকাশক্তি বলে মনে করেন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলির ভূমিকা সম্বন্ধে মোটেই অবহিত নন। কিন্তু এ অভিযোগ সত্য নয়।

উপসংহার

পরবর্তীকালে এক চিঠিতে এঙ্গেলস নিজে এই অভিযোগ খণ্ডন করে বলেছেন যে, অন্যান্য উপাদানগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য এবং অর্থনীতি কেবলমাত্র 'মূল-উপাদান', কিন্তু কখনই "একমাত্র উপাদান" নয়।

উপরি-উক্ত জবাব থেকেই বোঝা যায় যে, মার্কসবাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ ভিত্তিহীন। এটা মনে করার কোন কারণ নেই যে, মার্কসীয় তত্ত্ব অনুসারে ভিত (base বা infra-structure) সমস্ত পরিবর্তনের মূল এবং উপরিকাঠামো (super-structure)-র কোন ভূমিকা নেই। এরা পরস্পর পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং প্রভাবিত হয়।

৬। শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্ব (Theory of Class and Class-struggle)

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের কষ্টিপাথরে মানবসমাজের ক্রমবিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আদিম সাম্যবাদী সমাজের পর থেকে সমাজবিকাশের বিভিন্ন স্তরের সমগ্র ইতিহাসই হোল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস অর্থাৎ শোষক ও শোষিত, প্রভুত্বকারী ও তাদের পদানতের সংগ্রামের ইতিহাস। মার্কসের বহু পূর্ব থেকেই বুর্জোয়া দার্শনিক ও সমাজতত্ত্ববিদেরা সমাজে শ্রেণীভেদ ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। কিন্তু তারা শ্রেণীদ্বন্দ্বকে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করেছেন। সব সময় তাঁরা এই চেষ্টাই করে এসেছেন যাতে সর্বহারা শ্রেণী শ্রেণী-শোষণের রাজনৈতিক চরিত্রটি উপলব্ধি করতে না পারে। তাই তাঁরা সর্বহারা শ্রেণীকে রাজনৈতিক জগৎ থেকে দূরে থাকতে বারবার উপদেশ দিয়েছেন। ঐ সব বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা শ্রেণীদ্বন্দ্বকে স্বীকার করলেও সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বকে মানতে রাজী নন। শ্রেণীদ্বন্দ্ব বিপ্লবের স্তর পর্যন্ত যাতে না পৌঁছাতে পারে সেজন্য তাঁরা একথা প্রচার করেন যে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান-গুলির মাধ্যমেই শান্তিপূর্ণ উপায়ে শ্রেণীদ্বন্দ্বের অবসান ঘটানো সম্ভব। সুবিধাবাদী কিছু তাত্ত্বিকও অনুরূপভাবে শ্রেণীদ্বন্দ্বের স্বীকৃতিকে তার চূড়ান্ত বিন্দু পর্যন্ত নিয়ে যেতে চান না। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে মার্কস নিজেই বলেছিলেন, "আধুনিক সমাজে শ্রেণী-অস্তিত্ব ও তাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব আবিষ্কারের কৃতিত্ব আমার প্রাপ্য নয়। আমার অনেক আগেই বুর্জোয়া ঐতিহাসিকগণ শ্রেণীদ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক বিকাশ সম্বন্ধে বলে গেছেন এবং বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা শ্রেণীগুলির অর্থনৈতিক গঠন ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। নতুন করে আমি যা দেখিয়েছি তা হোল— ১. একমাত্র উৎপাদনের বিকাশের বিশেষ স্তরের সঙ্গেই শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব সংযুক্ত হয়ে আছে। ২. শ্রেণী-সংগ্রাম নিজের প্রয়োজনের তাগিদাতেই সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বের সূচনা করে ; এবং ৩. একমাত্র এই একনায়কত্বই শ্রেণীভেদ বিলোপ করে ও শ্রেণীহীন সমাজ পত্তনের অন্তর্বর্তী গঠনকার্য করে থাকে।" কিন্তু লেনিন বলেছেন, "মার্কসবাদকে শুধু শ্রেণীদ্বন্দ্বের তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার অর্থ হোল মার্কসবাদকে বিকৃত করা এবং তাকে বুর্জোয়াদের গ্রহণযোগ্য করে তোলা। একমাত্র

মার্কসবাদ ও শ্রেণী-দ্বন্দ্বের প্রকৃতি

তাকেই মার্কসবাদী বলা যায়, যে শ্রেণী-সংঘর্ষের স্বীকৃতিকে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যায়।"

কিন্তু প্রশ্ন হোল 'শ্রেণী' (Class) বলতে কি বোঝায় এবং কখনই বা শ্রেণীদ্বন্দ্বের সূত্রপাত হোল? সাধারণভাবে বলা যায়, "একই প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে—সমাজের এরূপ এক একটি অংশ হোল এক একটি শ্রেণী।" লেনিনের মতে, "শ্রেণীগুলি হোল এমন বড় বড় জনগোষ্ঠী যারা ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় তাদের অবস্থান, উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক (অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনের দ্বারা স্থিরীকৃত ও ব্যাখ্যাত), শ্রমের সামাজিক সংগঠনে তাদের ভূমিকায় এবং ফলতঃ সামাজিক সম্পদের যে অংশ তারা ব্যবহার করে তার পরিমাণে ও তা অর্জন করার পদ্ধতিতে পরস্পর থেকে পৃথক। শ্রেণীগুলি হোল এমন সব জনগোষ্ঠী সামাজিক-অর্থনৈতিক একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় পৃথক পৃথক স্থানের দরুন যার একটি অপরটির শ্রম আত্মসাৎ করতে পারে।" এইভাবে সমাজের একটি অংশ যদি সমস্ত জমি আত্মসাৎ করে নেয়, তাহলে আমরা পাই জমিদার ও কৃষক শ্রেণীকে। আবার সমাজের একটি অংশ যখন সমস্ত কলকারখানা, শেয়ার ও পুঁজির অধিকারী হয় এবং অন্য অংশ যখন তাদের জন্য খাটে, তখন আমরা পাই পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণীকে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে রাজা ও সামন্তপ্রভুদের জীবনযাত্রার ভিত্তি ছিল ভূমিদাসদের কাছ থেকে আদায় করা কর। ভূমিদাসরা দৈহিক পরিশ্রমের দ্বারা অথবা উৎপাদিত ফসলের অংশ কর হিসেবে প্রভুদের দিতে বাধ্য থাকত। শ্রেণী হিসেবে, সব সামন্তপ্রভুর স্বার্থ ছিল অভিন্ন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভূমিদাসদের পরিশ্রমের ফল যত বেশী সম্ভব ভোগ করা। এইসব প্রভু ছিল শোষক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত আর ভূমিদাসরা ছিল শোষিত। সমাজ-বিকাশের একটি বিশেষ স্তরে উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে সমাজে সম্পত্তিবান ও সম্পত্তিহীন—এই দুটি শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। সম্পত্তিশালী শ্রেণী উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিক হওয়ায় তারা সম্পত্তিহীন শ্রেণীকে অতি সহজেই উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করে তাদের শোষণ করতে থাকে। এইভাবে সমাজে পরশ্রমভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। আদিম সাম্যবাদী সমাজের পরবর্তী স্তরে সমাজের প্রয়োজনেই শ্রেণী-ভেদের সৃষ্টি হয়েছিল। দাস-সমাজের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে শ্রমবিভাগের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই শ্রমবিভাগের ফলে সমাজের অধিকাংশ মানুষকে অর্থাৎ দাসদের দৈহিক শ্রমে নিযুক্ত হতে হোল, আর মুষ্টিমেয় কয়েকজন অর্থাৎ দাস-মালিকরা সুবিধাভোগী শ্রেণীতে পরিণত হোল। সুতরাং দাস-সমাজেই সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে পরস্পর-বিরোধী দুটি প্রধান শ্রেণীর উৎপত্তি হয়। এই দুটি শ্রেণীর একটি হোল পরশ্রমভোগী বিলাসী শ্রেণী অর্থাৎ দাস-মালিক শ্রেণী এবং অপরটি দাসশ্রেণী। দাস-মালিকরা হোল শোষক এবং দাসরা হোল শোষিত। শ্রেণীর উৎপত্তি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এঙ্গেলস বলেছেন, "স্বাধীন মানুষ ও দাসের মধ্যে পার্থক্যের সঙ্গে যুক্ত হোল ধনী ও গরীবের পার্থক্য।" এই নতুন শ্রম-বিভাগ হোল সমাজের এক নতুন ধরনের শ্রমবিভাগ—যাকে শ্রেণীবিভাগ বলা হয়।

শ্রেণীর সংজ্ঞা ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের সূত্রপাত

প্রত্যেক সমাজে অবস্থিত শ্রেণীগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—ক. মুখ্য (basic) এবং খ. গৌণ (non-basic)। মুখ্য শ্রেণীগুলি হোল সমাজের সেই সব শ্রেণী যাদের বাদ দিয়ে উৎপাদন চলতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, দাস-সমাজে দাস-মালিক ও দাসরা, সামন্ত সমাজে সামন্তপ্রভুরা ও ভূমিদাসরা, বুর্জোয়া সমাজে পুঁজিপতি ও শ্রমিকশ্রেণী হোল মুখ্য শ্রেণী। এই তিনটি সমাজেই দাস-মালিকরা, সামন্ত প্রভুরা ও পুঁজিপতিরা উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিক। তারা শোষক-শ্রেণী হিসেবে পরিচিত। কিন্তু অন্যান্য তিনটি শ্রেণী উৎপাদনের মূল শক্তি হলেও উৎপাদনের ফল তারা ভোগ করতে পারে না। তাদের শ্রমশক্তিকে কাজে লাগিয়ে অর্থাৎ তাদের শোষণ করে শোষক-শ্রেণী বিলাস ব্যসনে দিনাতিপাত করে। প্রত্যেক শ্রেণীভিত্তিক সমাজে মুখ্য শ্রেণী ছাড়াও কতকগুলি গৌণ শ্রেণী থাকে। দাস সমাজে দাস-মালিক এবং দাস ছাড়াও ছিল স্বাধীন কৃষক ও কারিগরশ্রেণী। বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতি এবং শ্রমিক শ্রেণী ছাড়াও আছে কৃষক শ্রেণী, জমিদার শ্রেণী ইত্যাদি।

শ্রেণীর শ্রেণীবিভাগ

মার্কস ও এঙ্গেলস ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণ করেছেন যে, আদিম সাম্যবাদী সমাজের পরবর্তী স্তরগুলিতে সমাজ কেবলমাত্র শ্রেণীবিভক্তই হয়ে পড়েনি, সেই সব সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্বও চরমভাবে শুরু হয়। ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত 'কমিউনিস্ট ইস্তেহার' (Communist Manifesto)-এ তাঁরা ঘোষণা করেন, "আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। স্বাধীন মানুষ ও দাস, প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান, জমিদার ও ভূমিদাস, গিলড্-কর্তা ও কারিগর, এককথায় অত্যাচারী ও অত্যাচারিত শ্রেণী সর্বদাই পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে অবিরাম লড়াই চালিয়েছে, কখনও আড়ালে, কখনও-বা প্রকাশ্যে…।" আদিম সাম্যবাদী সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব না থাকায় সেই সমাজে কোনরূপ শ্রেণীভেদ বা শ্রেণীবিরোধ ছিল না। কিন্তু পরবর্তী সমস্ত স্তরে, যেমন—দাস-সমাজে, সামন্ত-সমাজে এবং পুঁজিবাদী-সমাজে শোষক শ্রেণীর সঙ্গে শোষিত শ্রেণীর সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী রূপে দেখা দিয়েছে।

সমস্ত সমাজের ইতিহাস শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস মাত্র

দাস-যুগে দাসদের পরিশ্রমের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী আত্মসাৎ করে, উদ্বৃত্ত উৎপাদন বিনিয়োগ করে, প্রতিবেশী গোষ্ঠীর সম্পদাদি লুঠ করে ক্রমে ক্রমে একটি ছোট অংশ সম্পদশালী হয়ে উঠে। কিন্তু সমাজের বৃহত্তম অংশ দাসদের অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বিষহ হয়ে উঠে। তারা সর্বপ্রকার অধিকার, এমন কি জীবনের অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়ে পশুর মত জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। ফলে দাস সমাজে দেখা দেয় অর্থনৈতিক স্বার্থদ্বন্দ্ব যা শ্রেণীদ্বন্দ্বের নামান্তর মাত্র। শোষক দাস-মালিকরা চায় তাদের শোষণের অধিকার চিরস্থায়ী করতে আর শোষিত দাসরা সর্বপ্রকার শোষণ ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে বদ্ধপরিকর। দাস-সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্ব যখন ব্যাপক আকার ধারণ করল তখন সমাজের মধ্য থেকেই গড়ে উঠল রাষ্ট্র। প্রচলিত শ্রেণী-শোষণকে বজায় রাখাই হোল রাষ্ট্রের প্রধানতম কাজ। শোষক-শ্রেণী এই যন্ত্রটি নিজেদের দখলে রেখে অব্যাহতভাবে শোষণ

দাস সমাজে শ্রেণী-সংগ্রামের রূপ

চালাতে শুরু করে। যেখানেই শোষিত জনগণ শোষণ-মুক্তির জন্য সংগ্রাম শুরু করেছে সেখানেই রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্যে শোষক-শ্রেণী সেই সংগ্রামকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ রোমে স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে যে দাস-বিদ্রোহ হয় তাকে নৃশংসভাবে দমন করার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

সামন্ত যুগেও সমাজ ছিল শ্রেণীবিভক্ত। এই সমাজে সামন্তপ্রভুরা শোষক আর ভূমি-দাসরা শোষিত। সেই যুগেও শোষণমুক্তির জন্য ভূমিদাসরা বার বার সামন্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়তায় সামন্তরা ভূমিদাস বিদ্রোহকে দমন করতে সমর্থ হয়েছে। ১৮৩১ সালে ইংল্যান্ডের জন্ বল্ এবং ওয়াট টাইলারের নেতৃত্বে যে কৃষক-বিদ্রোহ শুরু হয় তা সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে ভূমিদাসের শ্রেণী-সংগ্রামের অন্যতম উদাহরণ মাত্র। অনুরূপ ভূমিদাস বা কৃষক বিদ্রোহ জার্মানি, রাশিয়া এবং অন্যান্য দেশেও দেখা গেছে। প্রায় সর্বত্রই কৃষক বিদ্রোহকে রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্যে নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়েছিল।

সামন্ত সমাজে শ্রেণী সংগ্রাম

আধুনিক বুর্জোয়া সমাজেও উৎপাদনের উপকরণগুলি পুঁজিপতিদের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকায় শ্রমিক শ্রেণী প্রতিনিয়তই শোষিত হচ্ছে। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রচার করে যে বুর্জোয়া শ্রেণী একদিন সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছিল সেই বুর্জোয়া শ্রেণী তার বিপ্লবের সহযোগী বন্ধুদের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে পুঁজিবাদী শোষণব্যবস্থা কায়েম করল। এই যুগে বুর্জোয়াদের নির্মম শোষণের ফলে সমাজজীবনে নেমে এল দুঃখ, দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও অস্বাস্থ্যের অভিশাপ। জনগণকে শোষণ করার ফলে তাদের কুঁড়েঘরের পাশেই গড়ে উঠল মুষ্টিমেয় শোষকের বিলাস-ব্যসনের কল্পরাজ্য। শোষণের মাত্রা যতই বাড়তে থাকে জনগণের মধ্যে ততই ক্ষোভ আর অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সর্বপ্রকার শোষণের অবসান ঘটানোর জন্য শুরু হয় শ্রেণীসংগ্রাম। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রেণীসংগ্রামের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস বলেছেন, এই ব্যবস্থা শ্রেণীদ্বন্দ্বকে সরলতর করেছে। সমগ্র সমাজ দুটি প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী জোটে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। যে দুটি প্রধান শ্রেণী পরস্পরের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আছে তারা হোল বুর্জোয়া এবং সর্বহারা। এই শ্রেণীদ্বন্দ্বে জয়লাভ করার জন্য অর্থাৎ নিজেদের শোষণব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার জন্য শোষক-শ্রেণী রাষ্ট্রকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে থাকে। সর্বহারাশ্রেণীর আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য পুঁজিপতি শ্রেণী পুলিশ, মিলিটারী ইত্যাদিকে লেলিয়ে দেয়। অপরদিকে সর্বহারাশ্রেণীও ঐক্যবদ্ধভাবে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। তারা তিনভাবে শ্রেণীসংগ্রাম চালাতে থাকে, যথা—অর্থনৈতিকভাবে, আদর্শগত-ভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে। তাদের অর্থনৈতিক সংগ্রামের উদ্দেশ্য হোল শোষক শ্রেণীর কাছ থেকে আশু অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধাদি আদায় করা। তারা শ্রমিক সংঘকে বেছে নেয়। অর্থনৈতিক সংগ্রাম চালাতে গিয়ে শ্রমিক-শ্রেণী শ্রমিক সংঘ গঠন করে—ধর্মঘট, মিছিল, প্রতিবাদ সভা ইত্যাদি সংগঠিত করে। কিন্তু

বুর্জোয়া সমাজে শ্রেণী-সংগ্রাম ও তার বিভিন্ন রূপ

অর্থনৈতিক সংগ্রামের কতকগুলি সীমাবদ্ধতা আছে। এরূপ শ্রেণীসংগ্রাম যেহেতু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিতে পারে না সেহেতু এরূপ সংগ্রামের দ্বারা শোষণমুক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া, শ্রমিক আন্দোলন তীব্রতর আকার ধারণ করলে অনেক সময় মালিকশ্রেণী শ্রমিকদের কিছু কিছু দাবিদাওয়া মেনে নিয়ে কিংবা নেতাদের একাংশকে বিশেষ সুযোগসুবিধা দান করে আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে পারে। তাই মার্কসবাদীরা অর্থনৈতিক সংগ্রাম শুরু করার উপযোগিতা স্বীকার করলেও এরূপ সংগ্রামকে চূড়ান্ত শ্রেণীসংগ্রাম বলে স্বীকৃতি দিতে সম্মত নন। পুঁজিবাদী যুগে অর্থনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গেই আদর্শগত ও রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনার উপর মার্কসবাদীরা অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। পুঁজিবাদী সমাজের অব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিক অসন্তোষই যথেষ্ট নয়। শ্রমিকদের শ্রেণী-সচেতন হয়ে উঠতে হবে। লেনিন শ্রেণী-সচেতনতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, শ্রমিকরা যখন নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য পুঁজিপতি মালিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামকেই একমাত্র পথ বলে মনে করতে শিখে এবং সমস্ত শ্রমিকের স্বার্থকেই অভিন্ন বলে ভাবতে শিখে, তখনই তাদের শ্রেণী-সচেতন বলা যায়। লেনিনের মতে, এই শ্রেণী-সচেতনতা শেষ পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণীকে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সংগ্রাম চালাতে অনুপ্রেরণা যোগায়। মার্কস বলেছেন, চূড়ান্ত শ্রেণী-সচেতনতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য শ্রমিক-শ্রেণীকে আদর্শগত সংগ্রাম চালাতে হয়। আদর্শগত সংগ্রাম চালাতে গিয়ে শ্রমিক-শ্রেণীকে একটি সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গীর (world outlook) অধিকারী হতে হয়। শ্রমিকদের শ্রেণী-সচেতন ও বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী করে গড়ে তোলার জন্য মার্কসবাদে দীক্ষিত একটি রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন। এই দল গড়ে উঠবে সর্বাপেক্ষা শ্রেণী-সচেতন জঙ্গী সর্বহারাদের নিয়ে। বুর্জোয়াদের সঙ্গে আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করতে গিয়ে সর্বহারাশ্রেণীর রাজনৈতিক দলটি কৃষক পেটিবুর্জোয়ার এবং বুদ্ধি-জীবীদের বুর্জোয়া-চিন্তাধারা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করবে। কিন্তু মার্কসবাদীদের মতে, শ্রেণীসংগ্রামের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্তর হোল রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করা। শ্রেণী-সচেতন সর্বহারাদের একথা উপলব্ধি করতে হবে যে, শোষকশ্রেণী রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়তায় তাদের শোষণব্যবস্থা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে সমর্থ হচ্ছে। তাই অবস্থা অনুসারে তাদের রাজনৈতিক ধর্মঘট, বিক্ষোভ প্রদর্শন, পার্লামেন্টের নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং বিপ্লবের মাধ্যমে বুর্জোয়াদের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নিতে হবে। সর্বহারা শ্রেণীর এই রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে সর্বহারাশ্রেণীর রাজনৈতিক দলের হাতে। সর্বহারা-শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রাম ক্রমে ক্রমে বিপ্লবী সংগ্রামে পরিণত হতে বাধ্য। কারণ, বুর্জোয়া শ্রেণী রাষ্ট্রশক্তিকে নিজেদের কুক্ষিগত রাখার জন্য তাদের অধীনস্থ সশস্ত্র বাহিনীর সাহায্যে সর্বহারাশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রামকে ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টা করে। শ্রমিকশ্রেণী যতক্ষণ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রকে পরাজিত ও ধ্বংস করতে সমর্থ না হয়, ততক্ষণ শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কিন্তু পুরাতন রাষ্ট্রযন্ত্রকে পরাজিত ও ধ্বংস করাটাই যথেষ্ট নয়। শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে নিজস্ব

রাষ্ট্রযন্ত্রও গড়ে তোলা আবশ্যিক। পুঁজিপতিশ্রেণীর পরাজয়কে সম্পূর্ণ করার এবং আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শ্রেণীশত্রুদের মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজন হয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের। এরূপ রাষ্ট্র শ্রেণীশোষণের হাতিয়ার নয়—সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের সহায়ক। এরূপ রাষ্ট্রে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং শ্রেণীসংগ্রামের ফলে চূড়ান্তভাবে শোষণহীন মুক্তসমাজের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। বর্তমানে বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক মানুষ এরূপ মুক্তসমাজে বসবাস করছে।

সমালোচনা: নানাদিক থেকে শ্রেণী ও শ্রেণীসংগ্রামের মার্কসীয় তত্ত্বের সমালোচনা করা হয়ে থাকে।

প্রথমতঃ সমালোচকেরা অদ্যাবধি মানবসমাজের ইতিহাসকে শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস বলে মেনে নিতে সম্মত নন। তাঁদের মতে, এই তত্ত্ব মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের কুৎসিত দিকটিকেই বড় করে দেখায়। হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি ছাড়াও মানুষের মধ্যে যে প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসা আছে মার্কসীয় তত্ত্বের মধ্যে তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সমালোচকদের মতে, সমাজবিকাশের ইতিহাস যদি কেবলমাত্র শোষণ, অত্যাচার ও সংগ্রামের ইতিহাস হতো তা হলে বহুপূর্বেই মানবসভ্যতা বিলীন হয়ে যেত।

সমাজের ইতিহাস কেবলমাত্র শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস নয়

দ্বিতীয়তঃ মার্কসবাদীরা শ্রেণীদ্বন্দ্বকে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে ভুল করেছেন বলে সমালোচকেরা মনে করেন। কারণ অর্থনৈতিক স্বার্থ ছাড়াও নানা কারণে মানুষ মানুষের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। মার্কসবাদীরা সেইসব দিককে গুরুত্ব না দিয়ে ভুল করেছেন।

সমাজে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব ছাড়াও অন্যান্য দ্বন্দ্ব আছে

তৃতীয়তঃ সমালোচকদের মতে, মার্কসবাদীরা রাষ্ট্রকে শ্রেণীশোষণের হাতিয়ার হিসেবে বর্ণনা করে সত্যের অপলাপ করেছেন। কারণ আধুনিক জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রে সর্বহারাশ্রেণী রাষ্ট্রের সহযোগিতায় নিজেদের সার্বিক উন্নতি সাধনে সমর্থ হয়। সুতরাং রাষ্ট্র যে সব সময় অত্যাচার ও নিপীড়নের যন্ত্র হিসেবে কাজ করবে এমন কোনো কথা নেই।

রাষ্ট্র শ্রেণীশোষণের হাতিয়ার নয়

চতুর্থতঃ মার্কসবাদীরা শ্রেণীসংগ্রামে সর্বহারাদের বিজয়লাভ সম্পর্কে মাত্রাতিরিক্ত আশাবাদী হয়ে উঠেন বলে সমালোচকদের অভিযোগ। তাঁদের মতে, শ্রেণীসংগ্রামের ফলে সর্বহারাশ্রেণী যে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে পারবে এমন কোনো কথা নেই।

শ্রেণীসংগ্রামে সর্বহারা শ্রেণীর বিজয়লাভ সম্পর্কে মাত্রাতিরিক্ত আশাবাদিতা

পঞ্চমতঃ শ্রেণীসংগ্রামে সর্বহারাশ্রেণীর জয়লাভের পর শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা ঘটবে বলে মার্কসবাদীরা মনে করেন। কিন্তু সমালোচকেরা বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, সর্বহারাশ্রেণীর বিজয়লাভের পরেও নতুন সমাজের গর্ভ থেকে একটি নতুন সুবিধাভোগী শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটতে পারে।

শ্রেণীসংগ্রামের পরবর্তী সমাজে নতুন সুবিধাভোগী শ্রেণীর উদ্ভব

ষষ্ঠতঃ সমালোচকেরা মার্কসবাদীদের মতো সমাজের মধ্যে প্রধানতঃ দুটি শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকবে বলে বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে, শাসক এবং শাসিত শ্রেণী ছাড়াও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থিতিকে কোনোমতেই উপেক্ষা করা চলে না।

সমাজে দুটির বেশী শ্রেণীর অস্তিত্ব

শ্রেণী ও শ্রেণীসংগ্রামের মার্কসীয় তত্ত্বের বিরুদ্ধে সমালোচনা সত্ত্বেও এই তত্ত্বের বৈজ্ঞানিকতাকে কোনমতেই উপেক্ষা করা যায় না। বস্তুতঃ মানবসমাজের লিখিত ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি যুগেই সমাজ অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে প্রধানতঃ সুবিধাভোগী ও সুবিধাহীন—এই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আর একথাও ঠিকই যে, মার্কসবাদ অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। কিন্তু অন্যান্য দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করে না। এর সহজতম কারণ হোল অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বই সমাজের অন্যান্য দ্বন্দ্বের চরিত্রকে বহুলাংশে নির্ধারণ করে। তাছাড়া, একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, রুটির সমস্যা জীবনধারণের মূল সমস্যা, যদিও মার্কসবাদীরা মনে করেন যে, জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র (Welfare State) প্রতিষ্ঠার ফলে রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্কসীয় চরিত্র চিত্রণ অচল হয়ে যায়নি। তাঁদের মতে, জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র আসলে শ্রেণীশোষণের জন্য নির্মিত একটি পরিবর্তিত হাতিয়ার। যে মুহূর্তে অর্থনৈতিক সমস্যা তীব্রতা লাভ করে এবং শ্রেণীসংগ্রাম জোরদার হয়ে উঠে, সেই মুহূর্তে এই জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের সমস্ত গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল চেহারা পাল্টে যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও সেই সমাজে একটি নতুন সুবিধাভোগী দল সৃষ্টি হতে পারে, এমন সম্ভাবনাকে কোন মার্কসবাদীই অস্বীকার করেন না। পুঁজিবাদের উচ্ছেদ যেমন একটি দীর্ঘ এবং কঠোর সংগ্রামের ফল, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাও তেমনি একটি নতুন আন্দোলন। তাই এই আন্দোলনের মধ্যে সর্বদাই একটি আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়, আর সেটাই হোল এই সুবিধাভোগী শ্রেণী সৃষ্টির প্রবণতা রোধ করার একমাত্র উপায়। কিন্তু সমালোচকদের অভিযোগ থেকে সমাজতন্ত্রের তত্ত্বটিই ভুল—একথা কিছুতেই প্রমাণিত হয় না।

মূল্যায়ন

৭। উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব (Theory of Surplus Value)

মার্কসের মতে, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও শ্রমিকের শ্রম—এই তিনের সংমিশ্রণে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয় তা মূলতঃ সমস্তটাই মানুষের শ্রমের ফল। নতুন দ্রব্যের যে মূল্য হয় তা হোল—কাঁচামালের হারাহারি মূল্য + শ্রমযন্ত্রের হারাহারি মূল্য + বর্তমান শ্রমিকের শ্রমের সৃষ্ট নতুন মূল্য। কিন্তু শ্রম-শক্তির মূল্যের পরিমাণ এবং শ্রম প্রক্রিয়ায় সেই শ্রমশক্তি যে পরিমাণ মূল্য সৃষ্টি করে, তা কখনই সমান নয়। অন্যভাবে বলা যায়, "মোট শ্রম সময়ের মাত্র একটি অংশ কাজ করে শ্রমিক যে মূল্য সৃষ্টি করে, সেই মূল্য শ্রমিক ও তার পরিবারের জীবনধারণের উপায়ের মূল্যের সমান হয়। আবার আমরা জানি, শ্রমিক যে মজুরি পায় সেই মজুরির মূল্য তার ও তার পরিবারের জীবনধারণের উপায়ের মূল্যের সমান হয়। সুতরাং শ্রমসময়ের এই অংশে যে মূল্য সৃষ্টি হয় তাতেই শ্রমিকের মজুরি উসুল হয়ে

উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব

যায়। এর পর শ্রম-সময়ের বাকী অংশ কাজ করে শ্রমিক যে মূল্য সৃষ্টি করে, তা যায় তার নিয়োগকারী পুঁজিপতির পকেটে। শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্য অর্থাৎ মজুরি উসুল হয়ে যাওয়ার পর এই মূল্য পাওয়া যায় বলেই একে বলে উদ্বৃত্ত মূল্য। আর এই উদ্বৃত্ত মূল্যই হলো পুঁজিপতি শ্রেণীর মুনাফার উৎস। তাই মার্কস বলেছিলেন, "উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎপাদন হোল পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অলংঘনীয় নিয়ম (absolute law)।"

উদ্বৃত্ত মূল্যের মাধ্যমে শ্রমিক শোষণ

শ্রমিক নিজের মজুরির সমান মূল্য সৃষ্টি করতে যতক্ষণ কাজ করে সেই সময়কে, বলা হয় আবশ্যিক শ্রম-সময়। শ্রমিক যদি পুঁজিপতিদের অধীনে কাজ না করে নিজের খুশিমতো কাজ করতো, তা হলে তাকে এই সময়টুকু কাজ করতে হতো। কারণ তার ও তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে হলে যে মূল্য সৃষ্টি করতে হয় তার জন্য এইটুকু শ্রম অবশ্যই করতে হয়। আর, কোনো মজুরি না পেয়েও শুধু পুঁজিপতির জন্য উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করতে শ্রমিক যতক্ষণ ধরে কাজ করতে বাধ্য হয়, সেই সময়কে বলা হয় উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়। আর এদের যোগফলই হলো মোট শ্রম-সময়। সুতরাং মোট শ্রম-সময়=আবশ্যিক শ্রম-সময়+উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়। পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে চুক্তিমতো যে মজুরি ঠিক হয় তার মূল্য সবসময়ই উপরোক্ত সৃষ্ট মূল্যের চেয়ে কম হয়। এদের অন্তরকেই বলা হয় 'উদ্বৃত্ত মূল্য' অর্থাৎ মোট শ্রম-সৃষ্ট পণ্য মূল্য−মোট শ্রম সময়ের মজুরির মূল্য=উদ্বৃত্ত মূল্য। উৎপাদনের উপাদানের মালিকানার দৌলতে শ্রমিককে নিয়োগ করে যে পুঁজিপতি সে এই উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিবর্তে কোন প্রকার মূল্য না দিয়েই তা আত্মসাৎ করে মুনাফা কামায়।" এইভাবে শ্রমিকশ্রেণী উত্তরোত্তর শোষিত হতে থাকে। একসময় শ্রমিকরা কিন্তু পুঁজিপতির শোষণের স্বরূপটি আবিষ্কার করে ফেলে। ফলে শ্রেণী-সংগ্রাম চরম আকার ধারণ করে।

৮। বিপ্লবের উদারনৈতিক তত্ত্ব (Liberal Theory of Revolution)

ভূমিকা

বিপ্লবের প্রশ্নে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের মধ্যে অদ্যাবধি মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই বিপ্লবের সংজ্ঞা, প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, মূল্য প্রভৃতি নিয়ে পরস্পর-বিরোধী মতামত ও তত্ত্বের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করা যায়। বিপ্লব তথা সমাজ-পরিবর্তনের তত্ত্বগুলিকে বর্তমানে মোটামুটিভাবে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—১. বিপ্লবের উদারনৈতিক তত্ত্ব এবং ২. বিপ্লবের মার্কসীয় তত্ত্ব। বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা প্রচলিত সমাজের স্থিতাবস্থা বজায় রাখার প্রয়োজনে বিপ্লবের যে সংজ্ঞা ও প্রকৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, মার্কসবাদীরা তাকে বর্জন করে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন।

বিপ্লবের উদারনৈতিক তত্ত্ব ও তার সমালোচনা

সামন্ততান্ত্রিক যুগের শেষ পর্যায়ে বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হলে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা বিপ্লবের বাণী প্রচার করে জনসাধারণকে বুর্জোয়া বিপ্লবে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। ইংল্যান্ডে জন মিলটন ও জন লক, আমেরিকায় জেফারসন এবং ফ্রান্সে রুশো প্রমুখ বিপ্লবের বাণী প্রচার করেছিলেন। কিন্তু

পঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সমর্থকেরা প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজব্যবস্থা বলে প্রচার করতে থাকেন। তাঁদের মতে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভৃত উন্নতির ফলে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই যাবতীয় সমস্যার সমাধান সম্ভব। এমতাবস্থায় নতুন করে বিপ্লব তথা সমাজ পরিবর্তনের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। আর্থার সেলসিংগার (Arthur M. Schlesinger) মনে করেন যে, আধুনিক বিজ্ঞান শাসকশ্রেণীর হাতে এমন ক্ষমতা দিয়েছে যার ফলে গণ-বিপ্লব সেকেলে হয়ে পড়েছে। এইভাবে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা বিপ্লবকে যে অস্বাভাবিক ও অবাঞ্ছিত বলে মনে করেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁদের দেওয়া বিপ্লবের সংজ্ঞার মধ্যে। এল. জে. কার (L. J. Carr) তাঁর 'বিশ্লেষণমূলক সমাজতত্ত্ব' (Analytical Sociology) নামক গ্রন্থে বলেছেন, বিপ্লব হোল সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক সামাজিক পরিবর্তন। এরূপ সামাজিক পরিবর্তনের ফলে সমাজ-জীবন বিপর্যস্ত হয় বলে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা মনে করেন। ব্রিন্টনের মতে, বিধিবহির্ভূত ও হিংসাত্মক উপায়ে বিদ্যমান সরকারের পরিবর্তনকেই বিপ্লব বলা হয়। লিটার (Littre) প্রমুখ উদারনীতিবাদীরা বিপ্লব বলতে কেবলমাত্র সরকারী ক্ষমতার হস্তান্তরকেই বোঝাতে চান। বিপ্লবের বুর্জোয়া সংজ্ঞাগুলিকে একত্রিত করে হার্বার্ট আপথেকার বিপ্লবের একটি সাধারণ উদারনৈতিক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, বুর্জোয়া অভিধানে বিপ্লব বলতে হিংসাত্মক পদ্ধতিতে সরকার বা সংবিধানের এমন আকস্মিক পরিবর্তন বোঝায় যার কারণ প্রধানতঃ সংশ্লিষ্ট সমাজের মধ্যেই নিহিত থাকে। কিন্তু হার্বার্ট আপথেকার বিপ্লবের এই ধরনের সংজ্ঞাকে 'হলিউড মার্কা' সংজ্ঞা বলে পরিহাস করেছেন। কারণ বিপ্লবের এই সব সংজ্ঞা অত্যন্ত সংকীর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক। বিপ্লব বলতে কেবলমাত্র সরকার ও সংবিধানের পরিবর্তনকেই বোঝায় না; এর সীমানা ও পরিধি অনেক বেশী ব্যাপক। বিপ্লব সামগ্রিকভাবে সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের আমূল পরিবর্তন সাধন করে। তাছাড়া, বিপ্লবের হলিউড-মার্কা সংজ্ঞার মধ্যে একদিকে যেমন বিপ্লব ও হিংসাকে অভিন্ন করে দেখা হয়, অন্যদিকে তেমনি বিপ্লবের সঙ্গে 'প্রতিবিপ্লব' (counter revolution) কিংবা 'প্রাসাদ-বিপ্লবের' কোন পার্থক্য নির্দেশ করা হয় না। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে আপথেকার বলেছেন, আকস্মিক ও হিংসাত্মক উপায়ে বিদ্যমান সরকারের পরিবর্তনকে বিপ্লব বলে অভিহিত করলে ১৯১৭ সালের রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং ১৯৭৩ সালের আলেন্দেকে হত্যা করে ফ্যাসিবাদী সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব হবে না। কিন্তু এই দু'ধরনের সরকারের পরিবর্তন কেবলমাত্র শাসন-কর্তৃত্ব প্রয়োগকারীরই পরিবর্তন নয়, এর ফলে দুটি দেশে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। বুর্জোয়া বিপ্লবের তত্ত্বে এই মৌলিক পরিবর্তনের উপর আদৌ কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি।

বিপ্লবের উদারনৈতিক তত্ত্বের প্রবক্তারা বিদ্যমান সমাজের স্থিতাবস্থা (status-quo) বজায় রাখার উদ্দেশ্যে মার্কসীয় বিপ্লবতত্ত্বের বিরোধিতা করেন। আর তা করতে গিয়েই তাঁরা গণতন্ত্রকে হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োগ করেন। গ্রীক দার্শনিকদের সময়

থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বিপ্লবের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। প্লেটো বিপ্লব বলতে এমন একটি 'আদর্শ' রাষ্ট্র' (ideal state) প্রতিষ্ঠাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, যেখানে শ্রমবিভাগ ও কার্যের বিশেষীকরণের (specialization of functions) ভিত্তিতে সমাজ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত থাকবে। এরূপ করা হলেই কেবলমাত্র গ্রীক নগর-রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারবে বলে তিনি প্রচার করেন। প্লেটো বিপ্লবের পরিধিকে আর সম্প্রসারিত করেননি। এর পর অ্যারিস্টটল বিপ্লবের কারণ, মাত্রা (degrees) ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, বিপ্লব হোল রাষ্ট্রের সংবিধানের পরিবর্তন। এই অর্থে এক ধরনের সরকারের দ্বারা অন্য এক ধরনের সরকারের অপসারণ, এমন কি শাসকের পরিবর্তনকেও তিনি বিপ্লব বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে সম্পদের অসম-বণ্টনের মতো বস্তুগত উপাদান যেমন বিপ্লব ঘটায়, তেমনি আবার নেতৃবর্গের ক্ষমতালিপ্সা কিংবা আদর্শগত কারণেও বিপ্লব ঘটতে পারে। বিপ্লবের কারণগুলি সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদানের পর তিনি কিভাবে বিপ্লব রোধ করা সম্ভব তা আলোচনা করেছেন। কারণ তাঁর কাছে বিপ্লব হোল রাজনৈতিক বিয়োগান্তক ঘটনামাত্র। এইভাবে অ্যারিস্টটল প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্যই বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে সেন্ট অগাস্টাইন (St. Augustine) বিপ্লবকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজন হলে অন্যায়কারী শাসককে হত্যা করারও পরামর্শ দিয়েছিলেন। জন মিলটন স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজনে বিপ্লব করার কথা বলেন। তাঁর মতে, ক্ষমতাসীন শাসক-গোষ্ঠী জনগণকে যদি তাদের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে তাহলে তাদের পরিবর্তে নতুন সরকার গঠন করা উচিত।

প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রমুখের দৃষ্টিতে বিপ্লব

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কোন কোন দার্শনিক বিপ্লবের অধিকারকে তত্ত্বগতভাবে সমর্থন করেন। এইভাবে জন লক্ ১৬৮৮ সালের 'গৌরবময় বিপ্লবে'র সমর্থনে এগিয়ে আসেন। তাঁর মতে, মানুষের স্বাভাবিক অধিকার (natural rights) রক্ষায় ব্যর্থ হলে রাজার বিরুদ্ধে প্রজারা সঙ্গতভাবেই বিদ্রোহ করতে পারে। অনুরূপভাবে ফরাসী দার্শনিক রুশোর দর্শন ফরাসী বিপ্লবের প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল। আবার আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামীরা একথা ঘোষণা করেছিলেন যে, কোন সরকার যদি নাগরিকদের জীবন, স্বাধীনতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে বিপ্লবের মাধ্যমে সেই সরকারের পরিবর্তন সাধন করা প্রত্যেকের কর্তব্য। লক্ষণীয় বিষয় হোল—ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম কিংবা ফরাসী বিপ্লবের সমর্থনকারীরা কেবলমাত্র সরকারের পরিবর্তন সাধনের উপরেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। আর স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা তথা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই সরকার পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন। তাঁদের কেউই কিন্তু প্রচলিত সমাজব্যবস্থার সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেননি। এর কারণ হোল—তাঁরা মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা বলতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের

লক, রুশো প্রমুখের বিপ্লবকে সমর্থনের কারণ

অধিকার ও স্বাধীনতার কথা বলেননি। কেবলমাত্র সমাজের উৎপাদনের উপায়গুলি যে-শ্রেণীর হাতে সেই শ্রেণীর অধিকার ও স্বাধীনতার কথাই তাঁরা বলেছিলেন। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে হ্যারল্ড ল্যাস্কি যথার্থই বলেছেন, এটা ইতিহাসগতভাবে সত্য যে, নতুন শিল্পের ক্ষেত্রে মূলতঃ সম্পত্তি-মালিকদের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে উদারনৈতিক ধারা একটি বৌদ্ধিক বিপ্লব (an intellectual revolution) হিসেবে কাজ করেছিল।

বর্তমান যুগে বুর্জোয়া শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাই সিডনি হুক প্রমুখ আধুনিক লেখকরা গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে গণতান্ত্রিক দেশে জনগণের বিপ্লব করার অধিকারকে অস্বীকার করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই সত্যটি স্বীকার করে নিয়েও হুক মন্তব্য করেছেন যে, "গণতন্ত্রীরা ফ্যাসিবাদী, কমিউনিস্ট এবং অন্যান্য স্বৈরতান্ত্রিক দেশের বিপ্লবকে শুধু অভিনন্দনই জানায় না, তাকে উৎসাহিতও করে।" এই দিক থেকে বিচার করে বলা যায়, সিডনি হুক প্রমুখ উদারনীতিবাদীরা একদিকে যেমন ফ্যাসিবাদের সঙ্গে কমিউনিজমের কোন পার্থক্য নিরূপণ করেন না, অন্যদিকে তেমনি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকল্পে কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থাসহ যে-কোন স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধনের অধিকারের সপক্ষে দাঁড়ান। সুতরাং বলা যায়, আধুনিক যুগে বিপ্লবের তত্ত্ব আলোচিত হচ্ছে মূলতঃ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে কেন্দ্র করে এবং বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা প্রচলিত শোষণভিত্তিক সমাজব্যবস্থার স্থিতাবস্থা রক্ষার উদ্দেশ্যেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চরম বিরোধিতা করেন। তাঁদের মতে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে যে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে তাতে একদিকে যেমন ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়, অন্যদিকে তেমনি গণতন্ত্রের ধ্বংস সাধন করা হয়।

আধুনিক উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিপ্লবের বিরোধিতার কারণ

এইভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সমালোচনা করে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের আধুনিক সমর্থকেরা রাজনৈতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের পথে অগ্রসর হওয়া সমীচীন বলে মনে করেন। পুঁজিবাদের তীব্র সংকটের যুগে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে পুঁজিবাদকে রক্ষা করার জন্য এঁরা গণতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের মিলন ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের তত্ত্ব প্রচার করেন। সেইসঙ্গে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের তত্ত্ব প্রচারের মাধ্যমে এঁরা একথাই প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, আধুনিক উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই কেবলমাত্র আপামর জনসাধারণের কল্যাণ সাধিত হতে পারে। এরূপ রাষ্ট্র গণতন্ত্রের মহান্ নীতিগুলির সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সমন্বয় সাধন করে যে ব্যবস্থার জন্ম দেয় তা বিশেষ কোন শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে না; তা সর্বশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য নিরলসভাবে প্রয়াস চালায়। এইসব কারণে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সমর্থকেরা আধুনিক জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সর্বোত্তম রাষ্ট্রব্যবস্থা বলে চিত্রিত করেন। আর যেহেতু এই ব্যবস্থা সর্বোত্তম সেহেতু বৈপ্লবিক উপায়ে এর পরিবর্তন সাধন করার কোন

আধুনিক উদারনীতিবাদীরা শান্তিপূর্ণভাবে বৈধ উপায়ে সমাজ-পরিবর্তনের পক্ষপাতী

প্রয়োজনীয়তা নেই বলে এঁরা প্রচার করেন। এঁদের মতে, যে-সব দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সেই সব দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বৈধ উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কারণ এরূপ শাসনব্যবস্থায় গণ-সার্বভৌমিকতা বিদ্যমান থাকায় জনসাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন করতে পারে। ফলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মতো হিংসাত্মক পদ্ধতিতে সমাজের পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন হয় না। এইভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পর থেকে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলকে ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে অপসারিত করে জনতা দলকে ক্ষমতায় বসানোর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

কিন্তু বুর্জোয়া দার্শনিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বিপ্লবের মৌল প্রকৃতিকে উপেক্ষা করে তার আনুষঙ্গিক দিকগুলির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে ভুল করেছেন। সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই যে সমাজের মৌলিক চরিত্র নির্ধারণ করে দেয় সেকথা স্মরণ রাখলে বিপ্লবের সঙ্গে প্রতিবিপ্লব কিংবা সংস্কারের পার্থক্য নিরূপণ করা সহজ হয়ে যায়। বিপ্লবের পথ হিংসাত্মক হবে, না শান্তিপূর্ণ হবে; বৈধ হবে, না অবৈধ হবে; তার সঙ্গে বিপ্লবের মূল প্রকৃতির কোন সম্পর্ক নেই। কারণ বিপ্লব হোল সমাজের মধ্যে এক ধরনের উৎপাদন-সম্পর্কের বিলোপ সাধন এবং নতুন এক ধরনের উৎপাদন-সম্পর্কের প্রবর্তন। এই নতুন উৎপাদন-সম্পর্কের ভিত্তিতে নতুন করে গড়ে উঠে আইন ব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, মতাদর্শ ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সমর্থকেরা প্রচলিত বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে শ্রেণী-নিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা বলে যতোই প্রচার করুন না কেন, এর মাধ্যমে যে আপামর জনসাধারণের কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কল্যাণ সাধিত হতে পারে না তা অভিজ্ঞতা থেকেই বোঝা যায়। এরূপ সমাজে অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রভুত্বকারী পুঁজিপতি শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের মনোনীত এজেন্টদের দিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করে। তাই এখানে আইন, আদালত, পুলিস প্রভৃতি সবই উক্ত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। তৃতীয়তঃ বুর্জোয়া দার্শনিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা প্রচলিত শোষণভিত্তিক বুর্জোয়া সমাজের স্থিতাবস্থা রক্ষার উদ্দেশে, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা, শান্তিপূর্ণভাবে বৈধ উপায়ে অর্থাৎ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের কথা প্রচার করেন। বলা বাহুল্য, তা করতে গিয়ে তাঁরা মার্কসবাদীদের প্রচারিত বিপ্লবী তত্ত্বকে আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বিপ্লবের ক্ষেত্রে হিংসা অত্যাবশ্যক কিংবা শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিপ্লব একেবারেই অসম্ভব—এরূপ কোন কথা মার্কসবাদীরা বলেন না। চতুর্থতঃ বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ধারণা অনুযায়ী যে-কোনো ধরনের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম গণতন্ত্রসম্মত নয়। কিন্তু এই অভিমত মেনে নেওয়া যায় না। কারণ পুঁজিবাদী সমাজের নির্বাচিত সরকার পুঁজিপতিদের স্বার্থে আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ করে বলে জনসাধারণের স্বার্থ সেখানে রক্ষিত হয় না। তাই বাধ্য হয়েই জনসাধারণকে নানা ধরনের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে পা বাড়াতে হয়। পঞ্চমতঃ যেহেতু গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন, সেহেতু এখানে বিপ্লবের মাধ্যমে রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধনের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই বলে দাবি করা হয়। কিন্তু

সমালোচনা

গণতান্ত্রিক কর্মের বিচার হয় তার 'বৈধতা দিয়ে নয়, জনগণের ইচ্ছার সঙ্গে তার সঙ্গতি দিয়ে।' জনগণের বা অধিকাংশ মানুষের ইচ্ছার প্রাধান্যই হোল প্রকৃত গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে হার্বার্ট আপ্থেকার বলেছেন, জনগণের ব্যাপকতম অংশগ্রহণই যদি গণতন্ত্রের সংজ্ঞার মূল বিষয় হয়, তাহলে সমগ্র বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া ও তার পরিণতি আদৌ গণতন্ত্র-বিরোধী হতে পারে না। বিপ্লবী প্রক্রিয়া যতোই মৌলিক ধরনের হবে ততোই জনগণের ব্যাপকতম অংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজন হবে। সুতরাং বলা যায়, যে-বিপ্লবে সমাজের ব্যাপকতম অংশ জড়িত থাকে প্রকৃতিগতভাবে সেই বিপ্লব কখনই গণতন্ত্র-বিরোধী বা অগণতান্ত্রিক হতে পারে না।

৯। বিপ্লবের মার্কসীয় তত্ত্ব (Marxist Theory of Revolution)

আভ্যন্তরীণ ঘটনার সংঘাতে কোনো দেশের সরকার বা শাসনব্যবস্থায় আকস্মিক ও হিংসাত্মক পরিবর্তনকে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা বিপ্লব বলে অভিহিত করেন। কিন্তু বিপ্লবের এই সংজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে মার্কসীয় তত্ত্বের বিরোধী বলে হার্বার্ট আপ্থেকার মন্তব্য করেন। কারণ এরূপ সংজ্ঞা বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর মতে, বিপ্লব হোল, "এক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া যা এমন এক সামাজিক রূপান্তরের দিকে এগিয়ে যায় ও তাতে চূড়ান্তভাবে উপনীত হয় যেখানে একটি শাসকশ্রেণী অপরটি দ্বারা অপসৃত হয়, আর এই নতুন শ্রেণীটি পুরানোটির তুলনায় উন্নততর উৎপাদন ক্ষমতা ও সামাজিক দিক থেকে প্রগতিশীল সম্ভাবনাকে প্রতিফলিত করে।" সুতরাং বলা যায়, বিপ্লব হোল এমন একটি ঐতিহাসিক পদ্ধতি যার মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত হয় এবং যার মাধ্যমে একটা শাসকশ্রেণীকে উৎখাত করে নতুন একটা শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। এই নতুন শ্রেণী পুরাতন শ্রেণী অপেক্ষা প্রগতিশীল শক্তি। মার্কসের মতে, বিপ্লব হোল একটি সামাজিক ব্যাপার। এটি এমন একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া যার ফলে সমগ্র পুরাতন সমাজের পরিবর্তন সাধিত হয়। অর্থাৎ এটা হোল পুরাতন বন্ধ্যা সমাজব্যবস্থার পরিবর্তে নতুন প্রগতিশীল সামাজিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। মার্কস বলেছেন, পুরাতন সমাজব্যবস্থার গর্ভেই নতুন সমাজব্যবস্থার পূর্বশর্তগুলি নিহিত থাকে। পুরোনো বিশ্বাস, ধ্যানধারণা, অভ্যাস ইত্যাদি বিপ্লবের ফলেই পরিবর্তিত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, সমাজজীবনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই বিপ্লব আমূল পরিবর্তনের সূচনা করে।

বিপ্লবের সংজ্ঞা

সুতরাং বিপ্লব হোল এমন একটি পরিবর্তন যা পুরাতন সমাজব্যবস্থার ভিত্তিমূলে চরম আঘাত হেনে তার আমূল পরিবর্তন ঘটায়। এই অর্থে বিপ্লবের অর্থ হোল সমাজবিকাশের ক্ষেত্রে একটি গুণগত উল্লম্ফন, যার ফলে একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে অন্য একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। বিপ্লবের প্রধান বৈশিষ্ট্য হোল এক শ্রেণীর হাত থেকে অন্য একটি শ্রেণীর হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর। এখানেই বিপ্লবের সঙ্গে সব রকম ক্যু-দেতা বা প্রাসাদ বিপ্লবের মৌলিক পার্থক্য। কারণ প্রাসাদ-বিপ্লবের ফলে শাসক গোষ্ঠী বা ব্যক্তিবিশেষের পরিবর্তন ঘটে; ক্ষমতাসীন শ্রেণী ক্ষমতাচ্যুত হয় না। অবশ্য একথাও সত্য যে, এক শ্রেণীর

হাত থেকে অন্য শ্রেণীর হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটলেই সব সময় তাকে বিপ্লব বলা যায় না। সাময়িকভাবে প্রাধান্য অর্জন করে কোনও সেকেলে অর্থাৎ রক্ষণশীল শ্রেণী যদি ক্ষমতাসীন হয় তবে তাকে বিপ্লব না বলে প্রতিবিপ্লব বলাই সঙ্গত। কারণ এর দ্বারা পুরাতন শাসনক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে।

মার্কস ও এঙ্গেলসের মতে, "আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাস হোল শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস।" এই শ্রেণী-সংগ্রাম বা সামাজিক দ্বন্দ্বের পেছনে রয়েছে উৎপাদন-শক্তি এবং উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে দ্বন্দ্ব। যখন কোনো সমাজে উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে উৎপাদন-সম্পর্কের অসঙ্গতি দেখা দেয় তখন পুরাতন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে তার ধ্বংসস্তূপের উপর নতুন সমাজ গড়ে তোলার জন্য সমাজবিপ্লব ঘটে। কমিউনিস্ট ইস্তেহারে মার্কস এবং এঙ্গেলস বলেছেন, "উৎপাদন ও বিনিময়ের যে সব উপায়কে ভিত্তি করে বুর্জোয়া-শ্রেণী নিজেদের গড়ে তুলেছে, তাদের উৎপত্তি সামন্ত সমাজের মধ্যে। উৎপাদন ও বিনিময়ের এইসব উপায় বিকাশের একটা বিশেষ পর্যায়ে এল যখন সামন্ত সমাজের উৎপাদন ও বিনিময় শর্ত, সামন্ত কৃষি ও হস্তশিল্প কারখানার সংগঠন, এককথায় মালিকানার সামন্ত সম্পর্কগুলি আর কিছুতেই বিকশিত উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে খাপ খেল না। এইগুলি তখন শৃংখল হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে শৃংখল ভাঙ্গতে হতো এবং তা ভেঙ্গে ফেলা হলো। বলা বাহুল্য, এই শৃংখল ভেঙ্গে ফেলা হলো বুর্জোয়া বিপ্লবের মাধ্যমে।"

বিপ্লবের কারণ

"ইতিহাসের প্রধান প্রধান বুর্জোয়া বিপ্লব ঘটেছিল ১৬৪৮ সালে ইংল্যান্ডে, ১৭৭৬ সালে আমেরিকায়, ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে। কিন্তু এই তিনটি বিপ্লবের একটিতেও প্রলেতারিয়েত শ্রেণী হিসেবে বিকাশলাভ করেনি। এই সব বুর্জোয়া বিপ্লবে বুর্জোয়ারাই নেতৃত্ব করেছিল এবং শ্রমিকশ্রেণী ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পেছনে এসেছিল। এই বিপ্লবে কৃষকেরা বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রয়োজনমত ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত শক্তি হিসেবে ছিল। এই বুর্জোয়া বিপ্লবের ফলে যেখানেই বুর্জোয়াশ্রেণী প্রাধান্য পেয়েছে, সেখানেই সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক, পিতৃতান্ত্রিক ও প্রকৃতি-শোভন সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছে।" তাছাড়া "বুর্জোয়াশ্রেণী বিশ্ববাজারকে কাজে লাগাতে গিয়ে প্রতিটি দেশেরই উৎপাদন ও উপভোগে একটা বিশ্বজনীন চরিত্র দান করেছে।" সর্বোপরি "বুর্জোয়াশ্রেণী নিজের ছাঁচে" জগতকে গড়ে তুলেছিল। এইভাবে বুর্জোয়াশ্রেণী সেদিন একটি প্রগতিশীল শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের তুলনায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সমাজে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক বেশী অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। মার্কস ও এঙ্গেলস তাই বলেছিলেন "ইতিহাসের দিক থেকে বুর্জোয়া-শ্রেণী খুবই বিপ্লবী ভূমিকা নিয়েছে।"

বুর্জোয়া বিপ্লব ও তার তাৎপর্য

কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণীর এই প্রগতিশীল বিপ্লবী ভূমিকা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে শুরু করেছিল। সেইসঙ্গে বুর্জোয়াশ্রেণী ক্রমে ক্রমে প্রতিক্রিয়াশীলতার ধারক এবং বাহক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তাই মার্কস ও এঙ্গেলস কমিউনিস্ট ইস্তেহারে প্রলেতারীয় বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতা এবং

প্রলেতারীয় বিপ্লব ও তার তাৎপর্য

নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লবের তত্ত্ব প্রচার করেন। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রচলিত উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে উৎপাদন-শক্তির বিরোধ দেখা দিলে প্রলেতারীয় বিপ্লব আসন্ন হয়ে উঠে। এই পরিবর্তিত অবস্থায় বুর্জোয়াশ্রেণী প্রতিবিপ্লবী হয়ে উঠে এবং শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবী ভূমিকা পালনের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। বুর্জোয়াশ্রেণী গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে অসমাপ্ত রেখে মাঝপথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। এমতাবস্থায় শ্রমিকশ্রেণী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব নিজেদের হাতে তুলে নেয়। লেনিনের মতে, কমিউনিস্টরা বুর্জোয়া বিপ্লব শেষ করেই বসে থাকবে না। তারা অগ্রসর হবে প্রলেতারীয় বিপ্লবের দিকে এবং যতদিন পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে না পারবে ততদিন পর্যন্ত তারা বিপ্লবকে অব্যাহত রাখবে। বুর্জোয়া বিপ্লব রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং প্রচলিত ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিকে উৎপাদন ব্যবস্থার প্রধান মাধ্যম করে তোলে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বা প্রলেতারীয় বিপ্লব শুধু রাজনৈতিক শক্তি অধিকারের সঙ্গেই শেষ হয় না, বরং সেখান থেকেই তার শুরু হয়। ধনতান্ত্রিক সম্পত্তিকে সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তিতে পরিণত করতে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সম্পূর্ণ পৃথক সমাজসম্পত্তিতে পরিণত করতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন একটি রাজনৈতিক বিপ্লবের। এই বিপ্লব বুর্জোয়া শক্তিকে উচ্ছেদ করে সর্বহারার একনায়কত্বাধীনে রাজনৈতিক শাসন কায়েম করবে। তারপর সেই রাজনৈতিক শক্তির সহায়তায় সর্বহারাশ্রেণী সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন করবে এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় সমষ্টিগত, সমাজতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবে।

সুতরাং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছাড়া নিছক বিবর্তনের মাধ্যমে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ অসম্ভব। তবে একথা সত্য যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করে তোলার জন্য একটি প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবী পার্টির প্রয়োজন। উল্লেখযোগ্য যে, সর্বহারাশ্রেণী কোন্ ধরনের বিপ্লব করবে তা তাদের ইচ্ছার উপর ঠিক নির্ভর করে না; তা নির্ভর করে বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বের অবস্থার উপর। সর্বহারা শ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর শক্তি-সাম্যের উপর এবং দেশের মধ্যে ও বিশ্বে বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের সংঘাতের উপরেও তা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। তাই ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদিত হলেও ১৯৪৯ সালে চীনে গণ-বিপ্লব (People's Revolution) সংগঠিত হয়েছিল। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কি একটিমাত্র দেশে সম্পাদিত হতে পারে? লেনিন বলেছিলেন, ধনতন্ত্রবাদ থেকে একটি বা একাধিক রাষ্ট্র বিচ্যুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের শুরু। রাশিয়ার মহান্ অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিশ্বব্যাপী ধনতন্ত্রবাদ থেকে সমাজতন্ত্রবাদে রূপান্তরের যুগের শুরু। তারপর একের পর এক বহু দেশেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধিত হয়।

বিপ্লব হোল ইতিহাসের চালিকা শক্তি

উপরি-উক্ত আলোচনায় একথা স্পষ্ট যে, শ্রেণীসমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলেই বিপ্লব দেখা দেয়। সমাজের অগ্রগতির পক্ষে বিপ্লব অনিবার্য বলে মার্কসবাদীরা মনে করেন। তাই মার্কস বিপ্লবকে ইতিহাসের চালিকা শক্তি (Locomotive of History) বলে বর্ণনা করেছেন। ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মেই বিপ্লবের আবির্ভাব ঘটে। ইহুদী কবি

জোসেফ বলশোভার তাঁর 'বিপ্লব' নামক বিখ্যাত কবিতায় বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতা সম্পর্কে একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কন করেছেন। তিনি লিখেছেন:

"আমি আসি। কারণ, দেশের জনগণের বদলে
স্বৈরাচারীরাই সিংহাসন দখল করেছে;
আমি আসি। কারণ, শাসকেরা তাদের যুদ্ধের
প্রস্তুতির পাশাপাশি শান্তির রোমন্থন করে;
আমি আসি। কারণ, যে বন্ধন মানুষকে একত্রে
গ্রথিত করে তা এখন শিথিল;
আমি আসি। কারণ, মূর্খেরা মনে করে যে
তাদের তৈরি বেড়ার মধ্যেই প্রগতি আবদ্ধ থাকবে।"

মার্কসবাদীদের মতে, বিপ্লব কোনো ব্যক্তির ইচ্ছাতে ঘটে না, তা ঘটে, ইতিহাসের নিয়মে। বিপ্লবের জন্য দু'ধরনের শর্ত পূরণের কথা লেনিন বলেছেন, যথা—

বিপ্লবের পূর্বশর্ত

ক. বিষয়গত অবস্থা (Objective conditions) এবং
খ. বিষয়ীগত অবস্থা (Subjective conditions)। তিনি

বিপ্লবের বিষয়গত অবস্থা বা পরিস্থিতি সৃষ্টিকে 'বৈপ্লবিক পরিস্থিতি' (Revolutionary Situation) বলে বর্ণনা করেছেন। বিপ্লব সম্ভব করতে হলে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি অবশ্যই থাকতে হবে এবং বিভিন্ন দেশের নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী ঐ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ঐ পরিস্থিতির লক্ষণগুলি সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে গড়ে উঠে এবং ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে তা পরিবর্তিত হতে পারে। লেনিন বিষয়গত পরিস্থিতি বলতে তিনটি অবস্থাকে বোঝাতে চেয়েছেন:

১. দেশের মধ্যে নানা প্রকার সমস্যা এমন চরম আকার ধারণ করবে যে শাসক ও শোষক শ্রেণী কোনো-না-কোনো পরিবর্তন সাধন না করে তাদের শাসন ও শোষণমূলক ব্যবস্থাকে অব্যাহতভাবে চালাতে পারে না;

২. শোষিত শ্রেণীর দুঃখ-দারিদ্র্য তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করবে; এবং

৩ এমতাবস্থায় সাধারণ মানুষ স্বাধীন ঐতিহাসিক আন্দোলনে লিপ্ত হয়ে নিজেদের কাজকর্মে উল্লেখযোগ্যভাবে তৎপরতা বৃদ্ধি করবে। লেনিনের মতে বিপ্লবের বিষয়গত অবস্থার সৃষ্টি ছাড়া বিপ্লব অসম্ভব। তবে একথাও সত্য যে, প্রতিটি বৈপ্লবিক পরিস্থিতিই যে বিপ্লব ডেকে আনবে এমন কোনো কথা নেই।

১৮৫৯-৬১ এবং ১৮৭৯-৮০ সালে রাশিয়াতে বৈপ্লবিক পরিস্থিত থাকা সত্ত্বেও সেখানে বিপ্লব ঘটেনি। ১৯০৫ সালে রাশিয়াতে বৈপ্লবিক পরিস্থিত সৃষ্টির ফলে যে বিপ্লব হয়েছিল শেষ পর্যন্ত তারও পরাজয় ঘটে। সুতরাং কেবলমাত্র বিপ্লবের বিষয়গত উপাদান অর্থাৎ বৈপ্লবিক পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকলেই বিপ্লবের সাফল্য আসে না। এর জন্য প্রয়োজন বিপ্লবের বিষয়গত ও বিষয়ীগত শর্তসমূহের মধ্যে ঐক্যসাধন। বিপ্লবের বিষয়ীগত উপাদানগুলি হোল: ১. জনগণের বিপ্লবী চেতনা এবং সংগ্রামকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার মানসিক প্রস্তুতি ও দৃঢ়তা; ২. জনগণ তাদের অগ্রগামী বাহিনীর সংগঠন, যা বিপ্লবের বিজয়ের জন্য সংগ্রামে সক্ষম সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করতে সমর্থ; ৩. জনগণকে নেতৃত্বদানের জন্য এমন একটি পার্টির

অবস্থিত থাকবে, যে পার্টি অভিজ্ঞতা ও সংগ্রামে যথেষ্ট শিক্ষিত এবং সংগ্রামের নির্ভুল রণনীতি ও রণকৌশল নির্ণয়ে ও তাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে সক্ষম। উল্লেখযোগ্য যে, যদিও বিষয়গত পরিস্থিতি ইতিহাসে চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করে, তথাপি কোন কোন অবস্থায় বিষয়ীগত উপাদানগুলি বিপ্লবের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে। যখনই এবং যেখানেই বিপ্লবের বিষয়গত পরিস্থিতি যথেষ্ট পরিপক্ক হয়ে উঠে, তখনই বিষয়ীগত উপাদান এই ভূমিকা পালন করে। ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গত পরিস্থিতি যথেষ্ট পরিপক্ক হয়ে না উঠলে প্রগতিশীল শক্তিগুলির কোন প্রচেষ্টাই সমাজের রূপান্তর সাধন করতে পারে না। কিন্তু বিষয়গত পরিস্থিতি যদি বর্তমান থাকে তাহলে সমাজ-রূপান্তরের ফলাফল বিষয়ীগত উপাদানের উপর নির্ভর করে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-বিরোধী লেখকরা বিপ্লব সম্পর্কে মার্কসের বক্তব্যকে লেনিনের বক্তব্যের বিপরীত বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। তাঁদের অভিযোগ—মার্কস অর্থনৈতিক বিবর্তনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, কিন্তু লেনিন সংকল্প, চেতনা ও বিপ্লবী সংগ্রামের উপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু এই বক্তব্য সত্য নয়। তাঁরা উভয়েই নীতিগতভাবে বিষয়গত পরিস্থিতি এবং বিষয়ীগত উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রশ্ন সম্বন্ধে একই সমাধান দিয়েছেন। কেবলমাত্র ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য দেখা দিয়েছিল। মার্কস ও এঙ্গেলসের সময়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বশর্তগুলি যথাযথভাবে পরিষ্কার হয়ে উঠেনি। প্যারি কমিউনের পরাজয় এই বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের স্তরে সামগ্রিকভাবে বিষয়ীগত উপাদানের ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই নতুন ঐতিহাসিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লেনিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করার সংগ্রামে বিষয়ীগত উপাদানের উপর বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন।

আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দ্বন্দ্ব বিপ্লবের [illegible]

লেনিন একথাও মনে করতেন যে, একটি সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব (internal contradiction) যেমন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে, তেমনি আবার বাহ্যিক দ্বন্দ্বও বিপ্লবের গতিকে ত্বরান্বিত করে। বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার মধ্যে অসম-বিকাশ (uneven development) বাহ্যিক দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করে তোলে।

বিপ্লবের মূল্য

বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনের জন্য মানুষকে এবং সামগ্রিকভাবে সমাজকে যে-মূল্য দিতে হয় তাকে অতিরঞ্জিত করে জনসাধারণকে বিপ্লবের পথ থেকে সরে দাঁড়াতে আহ্বান জানান। বিপ্লবের বিরুদ্ধে তাঁদের যুক্তি হোল—যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লবের প্রয়োজন তা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিপ্লবের সময়কার ক্ষয়ক্ষতি যে নতুন সমাজ-ব্যবস্থায় পূরণ হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকেই সমর্থন করা জনগণের কর্তব্য বলে তাঁরা প্রচার করেন। কিন্তু ওই সব বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা একথা ভুলে যান যে, বিপ্লব ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই সংঘটিত হয়। পুরাতন সমাজব্যবস্থার মধ্যেকার দ্বন্দ্বই যে বিপ্লবকে অনিবার্য করে তোলে সে কথাটিকে

বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা সযত্নে এড়িয়ে যান। তাছাড়া, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য যে নতুন সমাজব্যবস্থার জন্ম দেয় সেই সমাজব্যবস্থার উন্নততর অর্থব্যবস্থা পূর্বেকার সমাজব্যবস্থার তুলনায় মানুষের যে সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত করে সেই সত্যটিকেও বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা গোপন করেন। সর্বোপরি, বিপ্লব করতে গিয়ে বিপ্লবী জনগণকে যে মূল্য দিয়ে হয় তার জন্য দায়ী বুর্জোয়া শাসক ও শোষক শ্রেণী। কারণ তারাই তো বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়তায় বিপ্লবীদের জীবন ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে। ঐ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে ওয়াই ক্লাসিন বলেছেন, "বিপ্লবের শত্রুরা বলে যে, বিপ্লবের ফলে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ও বহু মানুষের জীবনহানি ঘটে। ...কিন্তু যুক্তি দিয়ে বিচার করলে বিপ্লবের সমস্যা সমাধানের জন্য কোন সশস্ত্র সংগ্রাম বা গৃহযুদ্ধের প্রয়োজন হয় না। প্রতিবিপ্লবীরাই...বিপ্লবকে স্তব্ধ করার জন্য এবং তারা যা হারিয়েছে তার পুনরুদ্ধারের জন্য যুদ্ধের নৃশংসতা শুরু করে দেয়।"

বিপ্লব ও হিংসা

এল. জে. কার (L. J. Carr) প্রমুখ বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা বিপ্লব ও হিংসাকে সমার্থক বলে মনে করেন। কার বিপ্লবকে 'সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক ধরনের সামাজিক পরিবর্তন' বলে অভিহিত করেছেন। ঐসব মার্কসবাদ-বিরোধী তাত্ত্বিকরা বলেন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে কমিউনিস্টরা হিংসা বা বলপ্রয়োগকে প্রধান অবলম্বন বলে গ্রহণ করেন। মার্কস, লেনিন প্রমুখের উদ্ধৃতি তুলে ধরে, ঐ সব বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা নিজেদের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণের চেষ্টা করেন। মার্কস বলেছেন, 'একটি প্রাচীন সমাজ যখন নতুন ব্যবস্থার জন্ম দিতে প্রস্তুত, শক্তি তখন ধাত্রীমাতার কাজ করে।' লেনিনও অনুরূপ উক্তি করেছেন। তার মতে, হিংসাত্মক বিপ্লব ছাড়া বুর্জোয়া শ্রেণীর অপসারণ অসম্ভব। কিন্তু বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা মার্কস, লেনিন প্রমুখের বক্তব্যের কেবলমাত্র একটি দিক তুলে সত্যের অপলাপ করেছেন। কারণ মার্কস বলপ্রয়োগ বা হিংসাকে একটি সাধারণ নিয়ম হিসেবে দেখলেও ক্ষেত্র-বিশেষে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিপ্লব সম্ভব বলে মনে করতেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কুগেলমানের নিকট লেখা একটি পত্রে তিনি ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব বলে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর রাশিয়ার বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করে লেনিন শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ সম্পন্ন করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কেরেনস্কি সরকার শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি বলশেভিক পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করে এবং দমনপীড়নের সাহায্যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সব প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে চাইলে বাধ্য হয়েই লেনিন সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী গ্রহণ করেন। সুতরাং বলা যায়, শাসক ও শোষক শ্রেণী কখনই বিপ্লবী জনগণকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অধিকার করতে দিয়ে প্রস্তুত নয়। তারা বিপ্লবী শক্তিগুলিকে দমন করার জন্য হিংসাত্মক উপায় অবলম্বন করে। এমতাবস্থায় বাধ্য হয়েই বিপ্লবী শক্তিগুলি আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এবং শাসক শ্রেণীর হিংসাত্মক আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যই বলপ্রয়োগের আশ্রয় গ্রহণ করে। বস্তুতঃ শাসক ও

শোষক শ্রেণী কি পরিমাণ হিংসার আশ্রয় নিচ্ছে সেই বাস্তব অবস্থার উপর শাসিত ও শোষিত শ্রেণীর সংগ্রামের রূপ নির্ভর করে। তাই বিভিন্ন সময়ে বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী সাম্যবাদী আন্দোলনের রূপ নির্ধারিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

১০। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বনাম অ-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব (Socialist Revolution vs. Non-Socialist Revolution)

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারবিশ্লেষণ করে বিপ্লবকে প্রধানতঃ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং অ-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। উভয় ধরনের বিপ্লবের মধ্যে কিছু কিছু আপাত-সাদৃশ্য থাকলেও প্রকৃতি, উদ্দেশ্য প্রভৃতির দিক থেকে উভয়ের মধ্যে কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান।

সাদৃশ্য

উভয় প্রকার বিপ্লবের মধ্যে যে সব আপাত-সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় সেগুলি হোল :

ক. সমাজতান্ত্রিক এবং অ-সমাজতান্ত্রিক উভয় প্রকার বিপ্লবই ঘটেছিল ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মে। যখন বিকশিত উৎপাদন শক্তির সঙ্গে প্রচলিত উৎপাদন-সম্পর্কের বিরোধ দেখা দিয়েছিল তখন বিপ্লবের সৃষ্টি হয়েছিল।

খ. উভয় প্রকার বিপ্লবের ফলে প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়। বিশ্লেষণ করে বলা যায়, যেখানেই বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে সেখানেই পুরাতন সমাজের প্রভুত্বকারী শ্রেণীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রাধান্য খর্ব হয়েছে; নবজাগ্রত শ্রেণী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার নিয়ন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গ. উভয় ধরনের বিপ্লবে শক্তি বা বলপ্রয়োগ ঘটেছে। কোথাও পুরাতন শ্রেণী স্বেচ্ছায় ও শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। বরং সর্বক্ষেত্রেই তারা নির্মম, নিষ্ঠুর অত্যাচারের মাধ্যমে বিপ্লবের শক্তিগুলিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে।

ঘ. উভয় ধরনের বিপ্লবের সাফল্য যে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেছে তা নিঃসন্দেহে পূর্ববর্তী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা অপেক্ষা অনেক বেশী উৎকর্ষমণ্ডিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যে-বিপ্লবের ফলে দাস-ব্যবস্থার পরিবর্তে সামন্ত-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তা যেমন প্রগতিশীল, তেমনি সামন্ত ব্যবস্থার গর্ভ থেকে যে বুর্জোয়া সমাজ বিপ্লবের ফলে জন্মলাভ করে তা পূর্ববর্তী সমাজ থেকে নিশ্চিতভাবেই অনেক বেশী প্রগতিশীল। অনুরূপভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বুর্জোয়া সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে যে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করে তা পূর্ববর্তী সব ধরনের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা অপেক্ষা গুণগত দিক থেকে অনেক বেশী উৎকর্ষমণ্ডিত।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক এবং অ-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে কতকগুলি বাহ্য সাদৃশ্য

বৈসাদৃশ্য

থাকলেও উভয়ের মধ্যে কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। পার্থক্যগুলি হোল :

(১) সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হোল সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী জনসাধারণের বিপ্লব। কিন্তু অ-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবগুলি সমাজের সংখ্যালঘু অংশের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল। এমন কি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব-গুলির পশ্চাতে জনসাধারণের সমর্থন থাকলেও সেগুলির নেতৃত্ব ছিল সংখ্যালঘু

জনসমর্থনের ভিত্তিতে পার্থক্য

বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে। জনসাধারণ ঐ সব বিপ্লবে শ্রেণী-সচেতনভাবে যোগদান করে নি। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষ একটি বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে শ্রেণী-সচেতনভাবে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করে।

(২) অ-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবগুলি সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার পর সমাজ-অর্থনীতির ক্ষেত্রে কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয় না। কারণ পূর্ববর্তী সমাজের মতোই নতুন সমাজে উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা থেকেই যায়। ফলে সমাজের মধ্যে শ্রেণী-শোষণ ও শ্রেণীগত নিপীড়ন পূর্বের মতোই বহাল থাকে। অবশ্য একটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তা হোল—পূর্ববর্তী সমাজে যে শোষকশ্রেণী শ্রেণীশোষণ ও শ্রেণীশাসন চালাত তার পরিবর্তে নতুন শোষকশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রকৃতিগতভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এরূপ বিপ্লবের ফলে কোন বিশেষ শোষকশ্রেণী ক্ষমতা অর্জন করে না। সামগ্রিকভাবে শ্রমজীবী জনগণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এই বিপ্লবের পর উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার অবলুপ্তি ঘটিয়ে সামাজিক মালিকানার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে হার্বার্ট আপ্‌থেকার বলেছেন, "এই পরিপ্রেক্ষিতে ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণে যে গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয় তা সামন্তবাদ থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণে বা দাস-প্রথা থেকে সামন্ত প্রথায় উত্তরণে যে গুণগত পরিবর্তন বিধৃত হয় তা থেকে অনেক বেশী গভীর। কারণ, তা শোষণকে পুরোপুরিই নিশ্চিহ্ন করে।"

মৌলিক পরিবর্তন সাধনের প্রশ্নে পার্থক্য

(৩) সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্ববর্তী সমস্ত বিপ্লবে ক্ষমতাচ্যুত এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত শ্রেণী দুটির মধ্যে কোন-না-কোনভাবে আপসরফা হোত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাস-প্রথার উচ্ছেদ ঘটলেও দাস-মালিকরা গুরুত্বপূর্ণ জমিদার-শ্রেণী হিসেবে সর্বপ্রকার ক্ষমতা ও মর্যাদা নিয়ে যাতে টিকে থাকতে পারে সেজন্য বুর্জোয়াশ্রেণী তাদের সঙ্গে একটা সমঝোতা করে। "এই ধরনের বিপ্লবে ক্ষমতার হস্তান্তর একবার কায়েম হয়ে গেলে তারপর আপসই ছিল রীতি।" কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের পর শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে কোন রকম আপসরফা করে না। কারণ তাদের লক্ষ্য হোল সর্বপ্রকার শ্রেণীশোষণ ও শ্রেণীশাসনের অবসান ঘটিয়ে একটি মুক্ত সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন। বলা বাহুল্য, বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে আপস করা হলে এরূপ সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন অসম্ভব বলেই শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতাচ্যুত শোষকশ্রেণীর সঙ্গে কোনরকম সমঝোতার মধ্যে যায় না।

ক্ষমতাচ্যুত শ্রেণীর সঙ্গে আপসের প্রশ্নে পার্থক্য

(৪) সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করার পর শ্রমজীবী জনগণকে সমাজব্যবস্থার সমগ্র চরিত্র ও পুনর্গঠনের জন্য একেবারে প্রথম থেকেই কাজ শুরু করতে হয়। কারণ "সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তার পূর্বসূরী যে-কোনও বিপ্লবের চেয়ে নিবিড়তর এক রূপান্তর সাধন কামনা করে। সেটিই সর্বপ্রথম উৎপাদনের উপকরণের ওপর থেকে ব্যক্তিগত মালিকানা দূর করতে চায়, সেটিই সর্বপ্রথম এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা তৈরি করতে চায় যেখানে লাভের ইচ্ছা আর ব্যক্তিগত সম্পদবৃদ্ধির অর্থনীতির

সমাজব্যবস্থার পুনর্গঠনের প্রশ্নে পার্থক্য

কোনও গতিশীল উপাদান না হয়ে বরং ঐ অর্থনীতির প্রতিকূলতাই সৃষ্টি করে।" কিন্তু অসমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে যে-শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় তারা আমূল কোন পরিবর্তনের পক্ষপাতী নয় বলে তাদের নতুন করে সমাজ-অর্থনীতির পরিবর্তনের কাজে হাত দিতে হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, "বুর্জোয়া-শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রভুত্বে আরোহণ ইতিমধ্যেই বিরাজমান এক সামাজিক ব্যবস্থাকে অর্থাৎ ধনতন্ত্রকে প্রতিফলিত করে।" এই জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণী রাষ্ট্রকে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের উপযোগী করে প্রসারিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করে। এই কাজে তারা সাধারণত সামন্তবাদী অবশেষগুলির অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়। আফথেকার বলেছেন, "পরবর্তীকালে ধনতন্ত্র যখন বিশ্ববিস্তৃত হয় এবং বিশেষ করে যখন তা বাতিল-প্রায় হয়ে যাবার মুখে সমাজতন্ত্রের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়, তখন তা নিজের পরিসীমার বাইরে সামন্তবাদী শক্তিকে সক্রিয়ভাবে লালন করে এবং নিজের পরিসীমার ভেতরে কতকগুলি বিশেষ সামন্তবাদী মূল্যবোধের পুনরুত্থানে প্রয়াসী হয়।"

(৫) যে-কোন অ-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর ক্ষমতায় আসীন শ্রেণী তাদের শ্রেণী-শাসন চালাবার জন্য নতুন সমাজব্যবস্থায় অনেক সুযোগ্য নেতৃত্ব পেয়েছিল। কারণ ঐ শ্রেণী অতীতে শাসন পরিচালনায় অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করায় দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনে সমর্থ হয়েছিল। আফথেকার বলেছেন, 'সামন্তবাদ থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণের ক্ষেত্রে বা ধনতন্ত্রের বিজয়ের ক্ষেত্রে বুর্জোয়াশ্রেণী পূর্বাহ্নেই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিচালক ও প্রশাসক হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতাকে গ্রহণ করার সময় পুঁজিপতিরা রাষ্ট্রক্ষমতায় অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা আগে থেকেই পেয়েছিল।...এবং সেই কারণে সে নতুন সমাজব্যবস্থায় কূটনৈতিক, অর্থনীতিবিদ, পরিচালক, নেতা, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ হিসেবে কাজ করার মত যথেষ্ট সংখ্যক যোগ্য নেতা পেয়েছিল।" কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর যে শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় তাদের এরূপ কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতা থাকে না। কারণ ইতোপূর্বে বুর্জোয়া শাসনে তাদের অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয় না। তাছাড়া, যে প্রার্থিত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় তারা আত্মনিয়োগ করে তা এতই মৌলিক যে ক্ষমতাচ্যুত শ্রেণীর সাহায্য নিতে গেলে তার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না। তাই নিজেদের প্রচেষ্টায় তাদের নতুন সমাজে কাজে নামতে হয়। বলা বাহুল্য, এই সব কারণে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রাথমিক পর্যায়ে অভিজ্ঞ ও দক্ষ কূটনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, নেতা, শিক্ষক ইত্যাদির সমস্যা দেখা দেয়।

বিপ্লবোত্তর যুগে নেতৃত্বের প্রশ্নে পার্থক্য

(৬) অ-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর বিজয়ী শ্রেণী নিজেদের প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থাকেই চূড়ান্ত বলে মনে করে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথিকৃৎরা তা মনে করেন না। আফথেকার বলেছেন, "সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তার নিজের ভিতর থেকে এমন একটি ব্যবস্থা প্রবর্তনের কল্পনা করে যেখানে গতিশীলতা এবং পরিবর্তনশীলতা এক পরিবর্তনাতীত বিধান হিসেবে সক্রিয় থেকে যায়; পূর্বতন বিপ্লবগুলির মত তা

চূড়ান্ত সমাজব্যবস্থার প্রশ্নে পার্থক্য

নিজেকে চূড়ান্ত ও শেষ বলে গণ্য করে না। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এমন এক সমাজ-ব্যবস্থার উদ্ভবের সম্ভাবনা গড়ে তোলে যেখানে শ্রেণীবৈরিতা নেই, এ পর্যন্ত কোনও পরিবর্তন সাধনের ক্ষেত্রে এই শ্রেণী-বৈরিতার সমাধানই প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে থেকেছে। কিন্তু সমাজতন্ত্রে একে সরিয়ে দিয়ে আবির্ভূত হয়েছে প্রকৃতির ওপর পূর্ণ থেকে পূর্ণতর বিজয়লাভের অবিরাম উদ্যম এবং সেই সঙ্গে সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনার প্রক্রিয়া যথেষ্ট প্রকৌশলী অগ্রগতির মাধ্যমে এই শক্তিগুলি সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদের বিকাশকে নিশ্চিত করবে।"

শ্রেষ্ঠতাবাদের প্রশ্নে পার্থক্য

(৭) সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সর্বপ্রথম এমন একটি সমাজের জন্ম দেয় যা শ্রেষ্ঠতা-বাদের সমস্ত ধারণার বিরোধী। আফ্‌থেকার বলেছেন, "সমাজতন্ত্রে শ্রেষ্ঠতাবাদের বিরোধিতা সবচেয়ে নাটকীয়ভাবে প্রতিফলিত হয় শ্রেষ্ঠ জাতি-বাদের প্রতি নীতিগত বিরোধিতার মধ্যে। সকল সমাজতান্ত্রিক সমাজেই তা বে-আইনী করা হয়েছে।" কিন্তু অ-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবগুলি শ্রেষ্ঠতাবাদের বিরোধিতা করার পরিবর্তে তাকে অবলম্বন করেই সাফল্য-লাভ করে।

যুদ্ধ-সম্পর্কিত দৃষ্টি-ভঙ্গীগত পার্থক্য

(৮) সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে অ-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যতম পার্থক্য লুকিয়ে আছে তাদের যুদ্ধ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গীর ভিন্নতার মধ্যে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে যে সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তা সর্বপ্রকার যুদ্ধের বিরোধী। কিন্তু অ-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত সমাজ-ব্যবস্থা যুদ্ধের বিরোধিতা করে না। কারণ ঐসব সমাজব্যবস্থায় প্রভুত্বকারী শ্রেণী যুদ্ধের ভীতিকে বাঁচিয়ে রেখে তাদের শোষণ ব্যবস্থাকে স্থায়িত্বদানের জন্য সচেষ্ট হয়।

গণ সার্বভৌমিকতা প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে পার্থক্য

(৯) সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সর্বপ্রথম এমন একটি সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন করে যা "মানুষের জ্ঞান ও মানুষের কৃষ্টিকে সক্রিয়ভাবে সর্বজনীন করার প্রয়াসী।" এরূপ সমাজে "প্রাচুর্য ও ... স্তর একটি ব্যবস্থার ভিত্তিতে জনগণের সত্যিকারের ও সক্রিয় সার্বভৌমিকতা" গড়ে তোলা সম্ভব হয়। কিন্তু অসমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে তা সম্ভব হয় না।

নেতৃত্বের চরিত্রগত পার্থক্য

(১০) পরিশেষে বলা যায়, অ-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে জনকল্যাণের কোন মহৎ উদ্দেশ্য না থাকায় তার নেতৃবৃন্দ স্বার্থপরতার কুটিল আবর্তে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু সমাজতন্ত্রে তা ঘটে না। কারণ এখানে বিপ্লবের নেতৃত্ব দেয় এমন একটি পার্টি যাকে "সহ্য করতে হয়েছে নির্যাতন আর অভিযোগ, ঘরোয়া বেইমানি। আর দুর্নীতিকে অতিক্রম করে তা বেঁচে উঠেছে, এমন কি নিজের সদস্যদের ব্যাপক হত্যার পরেও তা রূপকথার সেই ফিনিক্স পাখীটির মত পুনর্জীবিত হয়েছে, যে পাখীটি আপন ভস্মরাশি থেকে নবজীবন লাভ করত। এই অধ্যবসায় তার প্রয়োজনকেই প্রতিফলিত করে। সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লব হল এক সচেতন বিপ্লব আর সেইজন্য তার নেতৃত্ব হবে উৎসর্গীকৃত, সংগঠিত, নীতিনিষ্ঠ এবং প্রায়ই বিজয়ী—এরকম তাকে হতেই হবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা বিপ্লব ও হিংসাকে সমার্থক বলে প্রচার করে জনমানসে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেন। কিন্তু মার্কসবাদীরা বিপ্লব ও হিংসাকে সমার্থক বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে, পুরানো শাসকশ্রেণী হিংসার আশ্রয় নিয়ে সংগ্রামী শক্তিকে পর্যুদস্ত করে শোষণব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে চায় বলেই এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে হিংসার আবির্ভাব ঘটে। সর্বহারাশ্রেণীর সর্বপ্রকার সংগ্রামকে ধ্বংস করার জন্য তারা হিংসার আশ্রয় নেয়। লেনিনের মতে শোষকদের প্রতিরোধ ধ্বংস করার জন্য এবং একটি সমাজতান্ত্রিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে বিপুল সংখ্যক জনগণকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সর্বহারাশ্রেণীর একটি কেন্দ্রীভূত ও সুসংহত বলপ্রয়োগের সংগঠন হিসেবে রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকারের তথা হিংসামূলক একটি সংগঠনের প্রয়োজন। সুতরাং প্রতিক্রিয়াশীলতার মধ্যেই হিংসার উৎস নিহিত থাকে। বিপ্লবে হিংসাত্মক পথ অবলম্বন করার বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে লেনিন ১৯১৭ সালে বলেছিলেন, "একটা ক্ষমতায় পরিণত হতে হলে শ্রেণীসচেতন মেহনতী মানুষকে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করতে হবে; যতক্ষণ জনসাধারণের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করা না হয়, ততক্ষণ ক্ষমতা দখলের বিকল্প কোন পথ নেই। ...সংখ্যালঘু মানুষ নিয়ে আমাদের ক্ষমতা দখলের সাহস না দেখানোই উচিত।" ঐ বছরের এপ্রিল মাসে তিনি একথাও ঘোষণা করেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত রাশিয়ার পুঁজিপতিরা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে হিংসা শুরু না করেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বলশেভিক পার্টি হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করবে না। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, হিংসাকে প্রতিরোধ করার জনাই বিপ্লবীরা হিংসার পথ বেছে নেবে বলে মার্কসবাদীরা মনে করেন।

বিপ্লব ও হিংসা

১১। মার্কসবাদে লেনিনের অবদান (Lenin's Contribution to Marxist)

মার্কসবাদ স্থিতিশীল মতবাদ নয়। যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে মার্কসবাদকে যুগোপযোগী করে নেওয়াই হোল মার্কসবাদীদের উদ্দেশ্য। তাই মার্কসবাদ বৈজ্ঞানিক মতবাদ। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে স্বয়ং লেনিন বলেছিলেন, "আমরা মার্কসের তত্ত্বকে এমন একটা কিছু মনে করি না যা পূর্ণাঙ্গ এবং অলঙ্ঘনীয়; বরং আমরা নিশ্চিত যে, এটি বিজ্ঞানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে। যদি সমাজতন্ত্রীরা জীবনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে চান, তাহলে তাঁদের একে অবশ্যই সমস্ত দিকে বিকশিত করে তুলতে হবে। তাই মার্কস ও এঙ্গেলস যে সব তত্ত্বের অবতারণা করে যান পরবর্তী সময়ে লেনিন, স্তালিন ও মাও সে-তুঙের হাতে সেগুলি আরও বিকাশলাভ করে।

মার্কসবাদ গতিশীল

মার্কসের ভাবশিষ্য লেনিন (১৮৭০-১৯২৪) একাধারে তাত্ত্বিক এবং অন্যদিকে বৈপ্লবিক সংগঠক ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম মার্কসবাদকে বাস্তবে প্রয়োগ করাতে সক্ষম হন। মার্কসের তত্ত্বে তাঁর অসীম আস্থা থাকলেও তিনি মার্কসবাদকে যুগের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য কিছুটা পরিবর্তিত করেন। স্তালিনের মতে, লেনিনবাদ শুধু মার্কসবাদকে

লেনিনবাদ বলতে কি বোঝায়

পুনরুজ্জীবিত করেছে তাই নয়, আরও অগ্রসর হয়ে গেছে—পুঁজিবাদ এবং শ্রমিকদের শ্রেণীসংগ্রামের নতুন অবস্থায় মার্কসবাদকে আরও পরিবর্ধিত করেছে। "লেনিনবাদ হোল সাম্রাজ্যবাদ এবং শ্রমিক বিপ্লবের যুগের মার্কসবাদ। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, লেনিনবাদ হোল সাধারণভাবে শ্রমিক-বিপ্লবের মতবাদ ও রণকৌশল এবং বিশেষভাবে এ হোল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের মতবাদ ও রণকৌশল।"

অনেকে মনে করেন যে, লেনিন মতবাদের চেয়ে কাজকর্মকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু একথা আদৌ সত্য নয়। লেনিন নিজেই বলেছেন, "বিপ্লবী মতবাদ না থাকলে কোন বিপ্লবী আন্দোলন সম্ভব হয় না।" অবশ্য মতবাদের সঙ্গে যদি বিপ্লবী কাজকর্মের যোগাযোগ না থাকে তা যেমন উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে, তেমনি বিপ্লবী মতবাদের আলোকে পথ উদ্ভাসিত না হলে কাজকর্মকেও অন্ধকারে পথ হাতড়াতে হয়। কিন্তু বিপ্লবী কাজকর্মের সঙ্গে গভীর যোগাযোগ রেখে যদি মতবাদকে গড়ে তোলা যায় তবে তা শ্রমিক আন্দোলনে প্রচন্ড শক্তিতে পরিণত হতে পারে। তাই লেনিন বলেছেন, "যে পার্টি সবচেয়ে অগ্রগামী মতবাদের দ্বারা পরিচালিত হয় সেই পার্টিই কেবল অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।"

তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে সমন্বয় সাধন

আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ হোল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বাহ্ন। এই অবস্থায় সর্বহারা বিপ্লবের প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনার রীতি, বিপ্লবের প্রকৃতি, তার পরিব্যাপ্তি ও গভীরতা, এমনকি সাধারণভাবে বিপ্লবের পরিকল্পনাই পরিবর্তিত হয়েছে। আগেকার মার্কসবাদীরা মনে করতেন যে, যেসব দেশে কলকারখানা বেশী পরিমাণে রয়েছে অর্থাৎ যেখানে জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হোল শ্রমিক, সেখানেই শ্রমিক-বিপ্লব শুরু হতে পারে। কিন্তু লেনিন এই তত্ত্বের বিরোধিতা ক'রে বলেন, যে দেশ কলকারখানায় অনেক উন্নত সেখানেই যে আগে বিপ্লব হবে এমন কোন কথা নেই। যেখানে সাম্রাজ্যবাদী শৃংখলের শক্তি সর্বাপেক্ষা দুর্বল সেখানেই বিপ্লব দেখা দিতে পারে। লেনিনের সমকালীন কতিপয় মার্কসবাদী মনে করতেন যে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং শ্রমিক বিপ্লবের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান রয়েছে। এই সুদীর্ঘ ব্যবধানের মধ্যে বুর্জোয়ারা ধনতন্ত্রকে উন্নত করে, আর শ্রমিকশ্রেণী ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, ঐসব মার্কসবাদীদের মতে, শিল্পে অনুন্নত দেশে যে বিপ্লব সংঘটিত হবে তা প্রকৃতিগতভাবে বুর্জোয়া বিপ্লব। এই বিপ্লবের ফলে শিল্পোন্নয়ন ঘটলে সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লব সাধিত হবে। লেনিন কিন্তু ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর মতে, অনুন্নত দেশে প্রথমে বুর্জোয়া বিপ্লব অনুষ্ঠিত হলেও এই বিপ্লবের নেতৃত্ব থাকবে সর্বহারাশ্রেণীর হাতে। তাঁর ভাষায়, 'প্রথমে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, জমিদারদের বিরুদ্ধে' সমগ্র কৃষক সমাজকে সঙ্গে নিয়ে (এবং যে পর্যন্ত বিপ্লব বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলে গণ্য হবে), তার পরে গরীব কৃষক আর আধা-শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়ে, সমস্ত শোষিত জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে এগুতে হবে; এবং এই অবস্থায় বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হবে।' এইভাবে

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে লেনিনের ভূমিকা

শিল্পে অনুন্নত রাশিয়ায় বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে লেনিন সক্ষম হয়েছিলেন।

লেনিন বিশ্বাস করতেন যে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হোল শ্রমিক-বিপ্লবের হাতিয়ার এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। ক্ষমতাচ্যুত শোষকশ্রেণীর সর্বপ্রকার প্রতিরোধকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে এবং শ্রমিক-বিপ্লবকে পরিপূর্ণ জয়লাভের দিকে পরিচালিত করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। লেনিনের মতে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রয়োজন হোল প্রধানতঃ তিনটি কারণে, যথা—১. বিপ্লবের ফলে ক্ষমতাচ্যুত ও সম্পত্তিচ্যুত পুঁজিপতি এবং জমিদার শ্রেণীর প্রতিরোধ ধ্বংস করা; ২. এমনভাবে নতুন সমাজ গঠনের কাজ চালাতে হবে যাতে করে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ শ্রমিকশ্রেণীর চতুর্দিকে সমবেত হয় এবং ৩. বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য বিপ্লবী সেনাবাহিনী গঠন করা। তাঁর মতে, বুর্জোয়া সমাজ-কাঠামোর ভিত্তির উপর শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় না। বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করে তাদের সৃষ্ট সমাজকাঠামোকে ধ্বংস করে প্রচন্ড শ্রমিক-বিপ্লবের মধ্য দিয়েই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। লেনিনের ভাষায়, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হোল বুর্জোয়াদের উপর শ্রমিকশ্রেণীর শাসন; এ শাসন বলপ্রয়োগের উপর প্রতিষ্ঠিত—আইনকানুনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। এ শাসনের প্রতি শোষিত মেহনতকারী জনসাধারণের সহানুভূতি আর সমর্থন থাকে।

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পর্কে লেনিন

মার্কসীয় তত্ত্বে লেনিনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান হোল তাঁর রাজনৈতিক দল বা পার্টি সম্পর্কিত অভিমত। তাঁর মতে, সর্বপ্রথম পার্টিকে হতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবর্তী বাহিনী। শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ অংশকে, তাদের অভিজ্ঞতা, বিপ্লবী প্রেরণা, শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শের প্রতি নিঃস্বার্থ নিষ্ঠাকে পার্টির মধ্যে টেনে নিতে হবে। পার্টি যাতে প্রকৃতপক্ষে অগ্রবর্তী বাহিনীতে পরিণত হতে পারে সেজন্য তাকে বিপ্লবী মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে হবে এবং বিপ্লবের তথা বিপ্লবী আন্দোলনের নিয়মকানুন সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। পার্টি শ্রমিকশ্রেণীকে পরিচালিত করবে; তা কেবল স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের লেজুড়ে পরিণত হবে না। পার্টিকে কেবল অগ্রবর্তী বাহিনী হিসেবে কাজ করলেই চলবে না; সেই সঙ্গে সমস্ত শ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থাকতে হবে। কারণ পার্টি হোল শ্রমিকশ্রেণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ। শ্রমিকশ্রেণী এই পার্টি সংহতি ও কঠোর নিয়মশৃঙ্খলার বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে। কিন্তু শৃঙ্খলার অর্থ এই নয় যে, পার্টির অভ্যন্তরে সমালোচনার কোনো স্থান থাকবে না। বস্তুতঃ পার্টির আভ্যন্তরীণ বিষয়ে সিদ্ধান্তাদি গৃহীত হবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির ভিত্তিতে। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব কায়েম করার পূর্বে এবং পরে পার্টির নিয়মশৃঙ্খলা একইভাবে মেনে চলতে হবে।

রাজনৈতিক দল সম্পর্কে লেনিনের অভিমত

লেনিনের মতে, সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিপ্লব অপরিহার্য। ১৯১৭ সালে তিনি তাঁর 'দ্বৈত ক্ষমতা তত্ত্ব' (The Dual Power Theory)-এ বলেন,

বিপ্লব সম্পর্কে লেনিনের অভিমত

"একটা ক্ষমতায় পরিণত হতে হলে শ্রেণীসচেতন মেহনতী মানুষকে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করতে হবে। যতক্ষণ জনসাধারণের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করা না হয়, ততক্ষণ ক্ষমতা দখলের বিকল্প কোন পথ নেই।... সংখ্যালঘু মানুষ নিয়ে আমাদের ক্ষমতা দখলের সাহস না দেখানোই উচিত।" ঐ বছরের এপ্রিল মাসে তিনি তাঁর "যুদ্ধের উপর খসড়া প্রস্তাব"-এ একথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত পুঁজিপতিরা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে হিংসা (violence) শুরু না করছে ততক্ষণ পর্যন্ত বলশেভিক পার্টি হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করবে না। সুতরাং কেবলমাত্র শোষকশ্রেণীর হিংসাকে প্রতিরোধ করার জন্যই বিপ্লবীরা হিংসাকে বেছে নেবে।

গণতন্ত্র সম্পর্কে লেনিন

গণতন্ত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেনিন বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে চরমভাবে সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, বুর্জোয়া গণতন্ত্র মুষ্টিমেয় শোষকের গণতন্ত্র মাত্র। এই গণতন্ত্র মুষ্টিমেয় বুর্জোয়াদের স্বার্থই রক্ষা করে। তিনি মনে করেন যে, সাধারণভাবে পুঁজিবাদ, বিশেষতঃ সাম্রাজ্যবাদ গণতন্ত্রকে মিথ্যায় (an illusion) পর্যবসিত করে। তবে লেনিন বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিরোধিতা করলেও সাধারণভাবে গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা প্রদর্শন করেছেন। কারণ পুঁজিপতিদের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে গণতন্ত্রের গুরুত্ব অসীম। তাঁর মতে, সর্বহারাশ্রেণীকে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের শিক্ষায় শিক্ষিত করতে না পারলে কখনই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধন সম্ভব নয়।

রাষ্ট্র সম্পর্কে লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গী

রাষ্ট্রের শ্রেণী-চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে লেনিন বলেন যে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে মীমাংসাতীত সংঘর্ষের ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। রাষ্ট্র শ্রেণীশোষণের হাতিয়ার-মাত্র। বিপ্লবের সাহায্যে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত না হলে শ্রেণীশোষণের অবসান ঘটবে না। বিপ্লবের পর বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অবসান ঘটবে এবং তার পরিবর্তে সর্বহারাশ্রেণীর রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হবে। তাঁর মতে, যতদিন পর্যন্ত সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত না হবে ততদিন পর্যন্ত এরূপ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আবশ্যিকভাবেই বর্তমান থাকবে। সাম্যবাদী তথা কমিউনিস্ট সমাজ গঠিত হওয়ার পর এরূপ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরও কোনও প্রয়োজন থাকবে না। তখন অপ্রয়োজনীয় বলে আপনা থেকেই রাষ্ট্র অবলুপ্ত হয়ে যাবে।

সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিনের অভিমত

বর্তমান যুগের সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি অতীতের সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দাস-ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে-ওঠা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ থেকে এখনকার সাম্রাজ্যবাদ যে ভিন্ন প্রকৃতির তা লেনিনই সর্বপ্রথম দেখালেন। তাঁর মতে, সাম্রাজ্যবাদ হলো ধনতন্ত্র বিকাশের সেই স্তর যে-স্তরে একচেটিয়া পুঁজিপতি ও ফিনান্স পুঁজির কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত, যে-স্তরে পুঁজি-রপ্তানি সুস্পষ্ট গুরুত্ব অর্জন করেছে, যে-স্তরে আন্তর্জাতিক ট্রাস্টগুলির মধ্যে পৃথিবীর ভাগবাটোয়ারা শুরু হয়ে গিয়েছে এবং যে-স্তরে বৃহৎ ধনতান্ত্রিক শক্তিবর্গের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চল-ভাগাভাগি সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিনের বক্তব্যকে অত্যন্ত সুন্দর ও সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেছেন

স্তালিন। তাঁর কথায়ঃ ১৯১৬ সালে লেনিন 'সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর' নামক বইটি লেখেন। এতে তিনি দেখান যে, সাম্রাজ্যবাদ হলো ধনতন্ত্রের উচ্চতম পর্যায়, এমন একটি পর্যায় যখন ধনতন্ত্র ইতিপূর্বেই প্রগতিশীল অবস্থা থেকে পরজীবী ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে এবং তিনি দেখালেন যে, মুমূর্ষু ধনতন্ত্রের রূপই হোল সাম্রাজ্যবাদ। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, ধনতন্ত্র সর্বহারা বিপ্লবের আঘাত ব্যতিরেকেই আপনা-আপনি সরে যাবে, ডাঁটার উপর ফুলের মত শুধু শুকিয়ে পচে যাবে। লেনিন সর্বদাই শিক্ষা দিতেন যে, ধনতন্ত্রকে খতম না করে শ্রমিক-শ্রেণীর বিপ্লব ঘটানো যাবে না। সুতরাং মুমূর্ষু ধনতন্ত্ররূপে সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা নির্ণয় করে লেনিন সঙ্গে সঙ্গে দেখালেন যে, "সাম্রাজ্যবাদ হোল সর্বহারাশ্রেণীর সমাজবিপ্লবের পূর্বাহ্ন।"

"লেনিন দেখালেন যে সাম্রাজ্যবাদের যুগে ধনতন্ত্রের জোয়াল আরও অত্যাচার-মূলক হয়ে উঠে, সাম্রাজ্যবাদের আমলে ধনতন্ত্রের বনিয়াদের বিরুদ্ধে সর্বহারাশ্রেণীর আক্রমণ বাড়তে থাকে এবং ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের বিভিন্ন উপাদান জমে উঠে।

"লেনিন দেখালেন যে, সাম্রাজ্যবাদের আমলে নানা দেশে ধনতন্ত্রের অসম বিকাশ এবং ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বগুলি বিশেষ তীব্র হয়ে উঠে এবং বিদেশী বাজার দখলের জন্য মূলধন রপ্তানি করার মতো উপযোগী ক্ষেত্রের জন্য, উপনিবেশের জন্য, কাঁচামালের উৎস দেশগুলিতে প্রভাব বিস্তারের জন্য যে-সংগ্রাম, তা আবার দুনিয়াকে ভাগাভাগি করার মতলবে মাঝে মাঝে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে।"

"লেনিন দেখালেন যে, ধনতন্ত্রের এই অসম বিকাশই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জনক এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই সাম্রাজ্যবাদের শক্তিহানি করবে এবং সাম্রাজ্যবাদী ফ্রন্টের দুর্বলতম স্থানটিতেই সাম্রাজ্যবাদের ভাঙ্গন ধরাবে।"

এই সমস্ত যুক্তি থেকে লেনিন সিদ্ধান্ত করলেন যে, "একস্থানে বা কয়েকটি স্থানে সাম্রাজ্যবাদী ফ্রন্টে ভাঙ্গন ধরানো সর্বহারাশ্রেণীর পক্ষে খুবই সম্ভব। প্রথমে কয়েকটি দেশে কিংবা একটি মাত্র দেশে পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব।" লেনিনের এই মতবাদ কার্যকরী হয়েছে রাশিয়াতে নভেম্বর বিপ্লবে। প্রথমে একটি মাত্র দেশে সর্বহারাদের বিপ্লব বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে।

কেউ কেউ মনে করেন যে, লেনিনবাদের প্রধান জিনিসই হোল কৃষক সমস্যা। তাঁদের মতে, কৃষকদের সমস্যা, তাদের ভূমিকা, তাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব ইত্যাদি হোল লেনিনবাদের নতুনত্ব। কিন্তু এই ধারণা সত্য নয়। স্তালিন বলেছেন, "লেনিনবাদের মূল সমস্যা, তার নতুনত্ব কৃষক সমস্যা নয়, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের সমস্যা, কি কি অবস্থার মধ্যে এই একনায়কত্ব অর্জন করা যায়, কোন্ কোন্ অবস্থায় একে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায় তার সমস্যা। ক্ষমতা-দখলের সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর সহযোগীর সমস্যা হিসেবে কৃষক সমস্যা হোল আনুষঙ্গিক সমস্যা মাত্র।" লেনিন শ্রমিকবিপ্লবে কৃষক সমস্যার গুরুত্ব সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। তিনি "কৃষকদের শ্রমিকশ্রেণীর সংরক্ষিত বাহিনী" বলে গণ্য করতেন। ক্ষমতা দখল করার পর কৃষির সঙ্গে শিল্পের যোগাযোগ

কৃষকদের ভূমিকা সম্পর্কে লেনিন

স্থাপনে এবং সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় বনিয়াদ হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সুদৃঢ় করার কাজে এই সংরক্ষিত বাহিনীকে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে বলে লেনিন মনে করতেন। কৃষকরা সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করার যোগ্য বলেই তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল।

জাতিসমস্যা সম্পর্কে লেনিন

আগেকার দিনে জাতিসমস্যাকে সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করে এটিকে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সমস্যা, এর সঙ্গে ধনিক শাসনের কোন সম্পর্কই নেই, এমন কি সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের সঙ্গেও তা সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন বলে প্রচার চালানো হোত। স্তালিন বলেছেন, তখন "মুখে না বললেও কার্যতঃ এটা ধরে নেওয়া হোত যে, উপনিবেশের মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ মৈত্রীবন্ধন ছাড়াই ইউরোপে শ্রমিকশ্রেণীর জয়লাভ সম্ভব; সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম না চালিয়েই শ্রমিক-সংগ্রাম থেকে দূরে থেকেও শান্তশিষ্টভাবে 'আপনা-আপনিই' উপনিবেশের সমস্যার, জাতিসমস্যার সমাধান করা যায়।" এমন কি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিনিধিবৃন্দও আইরিশ, হাঙ্গেরিয়ান, পোল প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতিসমূহের অধিকার-হীন জনসাধারণের ভাগ্য নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। এশিয়া ও আফ্রিকার কোটি কোটি মানুষ যে নিষ্ঠুর জাতিগত নিপীড়ন ভোগ করছে সেদিকে তাঁরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করেননি। আগেকার দিনে জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার-বলে ভুল ব্যাখ্যা করা হোত। এমন কি, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কোন কোন নেতা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলতে কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকেই বোঝাতেন।

কিন্তু লেনিন শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায়, ইউরোপীয়ান ও এশিয়াটিক সাম্রাজ্যবাদের গোলাম 'সভ্য' আর 'অসভ্য' জাতিগুলির মধ্যে পার্থক্যের প্রাচীর ধূলিসাৎ করে দেন। তিনি "জাতিসমস্যাকে, কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিশেষ সমস্যা থেকে রূপান্তরিত করেছেন সাধারণ আন্তর্জাতিক সমস্যায়; সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল থেকে পরাধীন দেশ আর উপনিবেশের নির্যাতিত জনসাধারণকে মুক্ত করার দুনিয়াজোড়া সমস্যায়।" লেনিনবাদ একথা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে যে, " 'জাতিগত সাম্য' সম্বন্ধে প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিগুলি যদি নির্যাতিত জাতিসমূহের মুক্তি-সংগ্রামকে প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করতে এগিয়ে না আসে তাহলে এসব প্রস্তাব অর্থহীন ও ধাপ্পাবাজিতে পরিণত হয়।" এইভাবে লেনিনবাদ "নির্যাতিত জাতিসমূহের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়, প্রকৃত জাতিগত সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে অস্তিত্বের জন্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নির্যাতিত জাতিসমূহের লড়াইকে সমর্থন করার প্রশ্ন এবং সত্যিকারের একটানা সাহায্য প্রদানের প্রশ্ন।" লেনিন মনে করতেন যে, একমাত্র শ্রমিক বিপ্লবের সঙ্গে যুক্তভাবে এবং তারই ভিত্তিতে জাতিসমস্যার সমাধান করা সম্ভব। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উপনিবেশ ও পরাধীন দেশের মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে বিপ্লবী সহযোগিতার দ্বারাই পশ্চিমের বিপ্লব জয়যুক্ত হতে পারে। জাতি-সমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে তিনি উপনিবেশ ও পরাধীন দেশের নির্যাতিত জনসাধারণের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকার এবং প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র

স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অধিকার বলে বর্ণনা করেছিলেন। এইভাবে লেনিন জাতিসমস্যাকে শ্রমিক বিপ্লবের সাধারণ সমস্যার অংশাবশেষ বলে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সমস্যার অংশবিশেষে পরিণত করেন।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সময় কমবেশী শান্তিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে শ্রমিক বাহিনীকে গড়ে তোলার ও শিক্ষিত করার প্রশ্নই বড় ছিল। তখন শ্রেণী-সংঘর্ষের প্রশ্ন, শ্রমিক-শ্রেণীকে বিপ্লবী লড়াই-এর জন্য তৈরি করার প্রশ্ন, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব কায়েম করার প্রশ্ন ইত্যাদিকে তখন জরুরী বলে মনে করা হয়নি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে শ্রমিক বিপ্লবের সময় এই প্রশ্নগুলি প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। এই সময় লেনিন রণনীতি ও রণকৌশল সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলসের চিন্তাধারাকে পুনরায় সজীব করে তোলেন। রণনীতি হোল—বিপ্লবের নির্দিষ্ট স্তরে শ্রমিকশ্রেণী কোথায় প্রথম আঘাত হানবে তা-ই স্থির করা, বিপ্লবের (মুখ্য ও গৌণ) মজুত বাহিনীর বিন্যাস পরিকল্পনা করা এবং বিপ্লবের নির্দিষ্ট স্তরে আগাগোড়া ঐ পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করার জন্য লড়াই চালানো। "আন্দোলনের জোয়ার-ভাটার, বিপ্লবের উত্থান-পতনের কালে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে শ্রমিকশ্রেণী কোন্ পন্থায় নিজেকে পরিচালিত করবে তা স্থির করা এবং পুরানো ধরনের সংগ্রাম ও সংগঠনের বদলে নতুন ধরনের সংগ্রাম ও সংগঠনের মাধ্যমে, পুরানো ধরনের আওয়াজের বদলে নতুন ধরনের আওয়াজের মারফত এই পন্থা অনুসরণ করা··· ইত্যাদির নামই রণকৌশল।" সুতরাং রণকৌশল হোল রণনীতিরই অঙ্গ, তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করাই হোল এর কাজ। লেনিনের মতে, বিপ্লবের স্তর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রণনীতির পরিবর্তন সাধিত হয়। তবে একটি নির্দিষ্ট স্তরে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তা মূলতঃ অপরিবর্তিতই থাকে। কিন্তু বিপ্লবের জোয়ার-ভাটা অনুযায়ী একই স্তরে রণকৌশলের পরিবর্তন ঘটতে পারে। লেনিন দৃঢ়ভাবে এই অভিমত পোষণ করতেন যে, রণনীতির ক্ষেত্রে নেতৃত্বের কাজ হোল বিপ্লবের বিকাশের একটি স্তরে বিপ্লবের প্রধান উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সংরক্ষিত বাহিনীগুলিকে ঠিকমতো কাজে লাগানো। রণকৌশলের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের কাজ হোল শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন ও লড়াই-এর সমস্ত ধরনকেই আয়ত্ত করা এবং একে এমনভাবে কাজে লাগানো যাতে হাতের কাছে যে নির্দিষ্ট শক্তি আছে তার সাহায্যে রণনীতিকে সফল করার পথে সবচেয়ে বেশী অগ্রসর হওয়া যায়। লেনিন বলতেন, "কেবলমাত্র অগ্রগামীদের দিয়ে জয়লাভ সম্ভব হয় না। সমগ্র শ্রেণী এবং বিপুল সংখ্যক জনসাধারণ যতক্ষণ না অগ্রগামীদের প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করছে অথবা কমপক্ষে অগ্রগামীদের পক্ষে সুবিধাজনক নিরপেক্ষতা অবলম্বন করছে, ততক্ষণ শুধুমাত্র অগ্রগামীদের চূড়ান্ত যুদ্ধে ঠেলে দেওয়া উচিত নয়। এ শুধু ভুল নয়, মস্ত অপরাধ। সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী এবং পুঁজিপতিদের দ্বারা নির্যাতিত মেহনতকারী বিরাট জনসমাজকে এই অবস্থায় আনতে হলে শুধু প্রচার এবং আন্দোলনই যথেষ্ট নয়, এর জন্য জনসাধারণের নিজস্ব রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা দরকার। সমস্ত বড় বড় বিপ্লবের এটাই হোল মৌলিক নিয়ম।"

রণনীতি ও রণকৌশল সম্পর্কে লেনিন

ষোড়শ অধ্যায়

গণতান্ত্রিক সমাজবাদ

[Democratic Socialism]

১। গণতান্ত্রিক সমাজবাদ (Democratic Socialism)

১৯০৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক' (The Communist International) প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। মার্কস-এঙ্গেলসের তত্ত্বকে অস্বীকার করে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের উদ্ভব ঘটে। এডওয়ার্ড বার্নস্টাইন (Edward Bernstein) হলেন গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রথম প্রবক্তা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে তিনি মার্কসীয় তত্ত্বের সমালোচনা করে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের তত্ত্ব প্রচার করেন। বর্তমানে ব্রিটেন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে গণতান্ত্রিক সমাজবাদী আদর্শ বিশেষ প্রসার লাভ করেছে। গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা ঊনবিংশ শতাব্দীর উদারনৈতিক মতবাদের প্রবক্তা গ্রীন ও হবহাউস এবং কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রবক্তা রবার্ট ওয়েন ও মরিসের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছেন।

ভূমিকা

গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বলতে এমন একটি রাজনৈতিক মতাদর্শকে বোঝায় যা গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সমন্বয় সাধনের নীতিতে বিশ্বাসী। অন্যভাবে বলা যায়, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলে মনে করে। এরূপ সমাজবাদের সমর্থক ও প্রচারকেরা মার্কসবাদের শ্রেণীসংগ্রাম, বিপ্লব, ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন, উদ্বৃত্ত মূল্য, রাষ্ট্রের অবলুপ্তি প্রভৃতি তত্ত্বকে অস্বীকার করে গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন।

গণতান্ত্রিক সমাজবাদের অর্থ

গণতান্ত্রিক সমাজবাদ মার্কসবাদকে গণতন্ত্রবিরোধী সর্বাত্মক মতবাদ বলে চিত্রিত করে এবং সেজন্য চিরাচরিত ধনতন্ত্রবাদেরও বিরোধিতা করে। তবে একথা সত্য যে, গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রকৃত স্বরূপ এবং কার্যধারার সুস্পষ্ট রূপরেখা তুলে ধরা যথেষ্ট কষ্টকর। তবে মোটামুটিভাবে আমরা গণতান্ত্রিক সমাজবাদের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির কথা উল্লেখ করতে পারি:

গণতান্ত্রিক সমাজবাদের বৈশিষ্ট্য

(১) গণতান্ত্রিক সমাজবাদের সমর্থকেরা গণতন্ত্রকে সমাজতন্ত্রের প্রাণশক্তি বলে বর্ণনা করেন। অশোক মেহতার ভাষায়, "গণতান্ত্রিক পরিবেশ ছাড়া সমাজতন্ত্রের ধারণা করা অসম্ভব। মানুষের দেহ থেকে প্রাণবায়ু ছিনিয়ে নিয়ে মানুষকে আমরা জীবিত বলতে পারি না। দেহ ও প্রাণ মিলেই মানুষ। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র উভয়কে ঐক্যবদ্ধ করেই আমরা আমাদের আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করতে পারি। আমরা এদের স্বতন্ত্র মনে করি না, উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারি না।" বস্তুতঃ

গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

গণতান্ত্রিক সমাজবাদের সমর্থকরা গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। তাই তাঁরা মার্কসবাদের বিরোধিতা করেন।

(২) ফ্রান্সিস উইলিয়াম (Francis William) এই অভিমত পোষণ করেছেন যে, সমাজতন্ত্রীরা রাজনৈতিক ব্যবস্থা অপেক্ষা মানব-সত্তাকে (human beings) অধিক প্রাধান্য দেন। তাই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। এর ফলে তাঁর মানসিক, নৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হতে পারে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী ব্যবস্থায় তা সাধিত হতে পারে না বলে গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা মনে করেন। কারণ ধনতন্ত্র যন্ত্রদানবের কাছে মানুষকে আত্মসমর্পণ করতে বলে এবং সাম্যবাদীরা মানুষের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের পরিবর্তে অর্থনৈতিক স্বার্থের বিকাশকেই চরম বলে মনে করেন। জওহরলাল নেহরুর মতো গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরাও এরূপ অভিমত দৃঢ়ভাবেই পোষণ করতেন।

ব্যক্তির মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধন

(৩) গণতান্ত্রিক সমাজবাদ শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে বলে মনে করে। গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা মার্কসবাদীদের মতো সমাজবিপ্লবের তত্ত্বে এবং কর্মধারায় আস্থাশীল নন। তাঁরা বিপ্লবের মাধ্যমে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠায় মার্কসবাদী তত্ত্বের বিরোধিতা করেন। নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থনলাভ করে এবং শ্রমিক সংঘ ও সমবায় সমিতিগুলির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে সাংবিধানিক উপায়ে একটি সমাজতান্ত্রিক দল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে বলে তাঁদের বিশ্বাস। বার্নস্টাইন ও তাঁর সমর্থকেরা বৈপ্লবিক উপায়ে ধনতন্ত্রবাদকে উৎখাত করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। বার্নস্টাইনের ভাষায়, "সাধারণতঃ যাকে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য বলা হয়, আমি তাকে বড় করে দেখি না। আমি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকেই সর্বেসর্বা মনে করি।" তাঁর কাছে দৈনন্দিন সংস্কার, পায়ের পর পা ফেলে এগিয়ে যাওয়াই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, হঠাৎ বিপ্লবের সম্ভাবনা একটি অহেতুক এবং আজগুবী ব্যাপার। বার্নস্টাইনের পর সমাজতন্ত্র উদারতন্ত্রের পরিপূরক হয়েই আত্মপ্রকাশ করল। বার্নস্টাইনের হাতে মার্কসের বিপ্লবী ভাবধারা শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আদর্শ হয়ে উঠল এবং তাকে মার্কস অপেক্ষা মিলের ভাবাদর্শেরই অধিকতর অনুগামী মনে হতে লাগল।

শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

(৪) গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা একথা বিশ্বাস করেন যে, "একমাত্র গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যেই সমাজতন্ত্র লালিত-পালিত হতে পারে এবং সমাজতন্ত্রের পথে গণতন্ত্র অপরিহার্য। তাঁরা সে রকম রাষ্ট্র সৃষ্টি এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ করতে চায় এবং একেই বলে রাষ্ট্রানুরাগ। সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের মধ্যে লাসালে ছিলেন সর্বপ্রথম রাষ্ট্রানুরাগী। তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে রোজা লুক্সেমবার্গ বলেছেন, "তিনি সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের সঙ্গে বিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।"

গণতান্ত্রিক সমাজবাদীদের রাষ্ট্রানুরাগ

তিনি রাষ্ট্রকে শ্রমিক শ্রেণীর সর্বাঙ্গীণ মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর ভাষায়, "যদি তোমরা রাষ্ট্রকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না কর তাহলে রাষ্ট্রই তোমাদের অগ্রগতির পথে প্রবল অন্তরায় হয়ে উঠবে।" তিনি শ্রমিকদের প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার দাবির কথা বলেছিলেন এবং সেই অধিকার আদায় করার জন্য সংগ্রাম করারও পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই অধিকার লাভ করে শ্রমিকশ্রেণী যদি শ্রেণীসচেতন হয়ে নিজেদের সংহতিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তাহলে শেষ পর্যন্ত তারা রাষ্ট্রশক্তিকে অধিকার করে নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির কাজে ব্যবহার করতে পারবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে লাসালে রাষ্ট্রকে কেবলমাত্র পাহারাদারের ভূমিকায় আবদ্ধ রাখতে চাননি, তিনি রাষ্ট্রের ইতিবাচক কার্যাবলীর উপরও সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এইভাবে গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা অতীতের প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর আঘাত না করেও সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলে মনে করেন। তাঁরা রাষ্ট্রকে শ্রেণীশোষণের হাতিয়ার হিসেবে মেনে নিতে সম্মত নন। যে-রাষ্ট্রে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার আছে, ব্যক্তিস্বাধীনতা আছে, যে-রাষ্ট্রে সরকার জনপ্রতিনিধিমূলক এবং যেখানে বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠান আছে, সে রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা সমর্থন করেন। জির্ন লোয়ারস প্রমুখ রাষ্ট্রানুরাগী সমাজতন্ত্রীরা ধনবাদী রাষ্ট্রকেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে বলে মনে করতেন। যে-রাষ্ট্রে স্বায়ত্তশাসনশীল বিভিন্ন সহযোগী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান থাকে, শ্রমিক ইউনিয়ন, গ্রাম পঞ্চায়েত, বিভিন্ন সমবায় সমিতি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে, তাকে গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা শ্রেণীরাষ্ট্র বলে স্বীকার করতে সম্মত নন। এরূপ সমাজবাদীরা একথা বিশ্বাস করেন যে, জনসাধারণ রাষ্ট্রকে ইতিবাচক করে গড়ে তুলতে না পারলেই তা নেতিবাচক থেকে যায় এবং তা হয়ে উঠে শ্রেণীরাষ্ট্র। এরূপ রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব।

(৫) গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধ, উদ্বৃত্ত মূল্য কিংবা শ্রেণীসংগ্রামের মার্কসীয় তত্ত্বকে সমর্থন করেননি। তাঁরা মার্কসীয় অর্থনৈতিক তত্ত্বকে তীব্র সমালোচনা করে মূলধনী জোটের উপর সামাজিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। বর্তমানে ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রবাদীরা সামাজিক অবস্থার উন্নতি বিধানের মাধ্যমে ধীরে ধীরে 'অনায়াসলব্ধ আয়' (unearend income)-এর উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। গণতান্ত্রিক সমাজবাদের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে মার্কিন সমাজবাদী নরম্যান টমাস (Norman Thomas) বলেছেন, বর্তমানে সমাজতন্ত্রবাদীরা জাতীয়করণ (Nationalisation)-এর পরিবর্তে 'সামাজিকীকরণ' (Socialisation) দাবি করেন। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রের পরিবর্তে শ্রমিক ও ভোক্তা প্রত্যক্ষভাবে শিল্প পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। অধ্যাপক ম্যাকগ্রীগর বলেছেন, "গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে আধুনিক গণতন্ত্রের দ্বারা শিল্পের কতখানি সামাজিকীকরণ করা প্রয়োজন তা নির্ণয় করা। যেখানে শিল্পের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে বা অতিরিক্ত

গণতান্ত্রিক সমাজবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি

ব্যক্তিস্বার্থের আধিপত্য ক্ষতিকর মনে হচ্ছে, সেখানে সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিকে জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণাধীন করার জন্যই গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা। শিল্পের সামাজিকীকরণ ব্যাপারে অবাধ আলাপ-আলোচনা করে জনসাধারণ সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সুতরাং গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র এইদিক থেকে সীমাবদ্ধ সমাজতন্ত্র, জনসাধারণের মতামতের উপরই তাকে নির্ভর করতে হয়।" গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা বলেন যে, "অনুন্নত দেশে শিল্পোন্নয়নের ধারা, মূলধন সমন্বয়ের গতি এবং জনসাধারণের স্বার্থত্যাগ সবকিছুই অবাধ আলোচনা ও জনসাধারণের মতামতের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। জবরদস্তিমূলক যৌথ খামার সৃষ্টি করে, শ্রমদান ও বাধ্যতামূলক শ্রমশিবির এবং গুপ্ত পুলিস-বাহিনী দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এতে অর্থনৈতিক উন্নতি হতে পারে; কিন্তু সামাজিক মুক্তি আসে না। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, জনসাধারণের বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাচাই ও নির্বাচন করার অধিকার স্বীকার করে নিতে হবে। জনসাধারণকে যদি বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মধ্যে বাছাই করে নিতে হয় তা হলে সমাজে প্রথমেই অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কারণ একমাত্র অর্থনৈতিক সাম্যের ভিত্তিতেই এই নির্বাচন অর্থপূর্ণ হতে পারে।"

এইভাবে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রচারকেরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি দিক থেকে বিচারবিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, "সর্বাত্মক মতবাদ সর্বদিক দিয়ে সমাজতন্ত্রী আদর্শের বিরোধী।" তাঁদের ভাষায়, "একমাত্র গণতন্ত্রী আদর্শের স্বীকৃতির মধ্য দিয়েই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং একমাত্র অর্থনৈতিক সমতার ভিত্তিতেই গণতন্ত্র গড়ে উঠতে পারে।"

ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ

জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৯৫৫ সালে অনুষ্ঠিত আভাদি সম্মেলন (Avadi Session)-এ 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থা (Socialistic Pattern of Society) প্রবর্তনের পক্ষপাতী বলে ঘোষণা করে। ১৯৬৪ সালে ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত ৬৮তম সম্মেলনেও জাতীয় কংগ্রেস ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার কথা পুনরায় দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করে।

সমালোচনা: বর্তমানে নানা দিক থেকে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের সমালোচনা করা হয়।

অবাস্তব মতবাদ

ক. গণতান্ত্রিক সমাজবাদের সমর্থক ও প্রচারকেরা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দেখেন, সমালোচকরা তাকে অবাস্তব চিন্তা বলে বর্ণনা করেন। কারণ বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় শাসকশ্রেণী নিজেদের স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছুই বোঝে না। এমতাবস্থায় সামাজিক, অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক সাম্য কখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাই সমালোচকরা গণতান্ত্রিক সমাজবাদকে 'সোনার পাথরবাটি'র মতই অবাস্তব বলে মনে করেন।

খ. গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তির মানসিক ও নৈতিক

উৎকর্ষ সাধন সম্পর্কে যে অভিমত পোষণ করেন মার্কসবাদীরা তাকেও ভ্রান্ত ধারণা বলে মনে করেন। কারণ সমাজে শ্রেণীবৈষম্য বিদ্যমান রেখে কিছু জনকল্যাণকর কার্য সম্পাদন ও কিছু কিছু শিল্পের জাতীয়করণের মাধ্যমে শ্রমজীবী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মানসিক উৎকর্ষ কখনই সাধন করা যায় না। সেজন্য প্রয়োজন সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের। তাছাড়া, ধনতন্ত্রকে বজায় রেখে কখনই জনসাধারণের মধ্যে যথার্থ নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, কারণ ধনতান্ত্রিক সমাজের নৈতিক ভিত্তি হোল স্বার্থপরতা, লোভ, সম্পত্তি অর্জন, অবাধ ও নির্মম প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। কিন্তু শ্রেণীশোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের নৈতিক ভিত্তি হোল সমাজের জন্য কাজ করা, ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে সামাজিক স্বার্থকে স্থান দেওয়া, পারস্পরিক সহযোগিতা ইত্যাদি। সুতরাং বলা যায়, নৈতিক ধ্যানধারণা যেহেতু সমাজ ও রাষ্ট্র-নির্ভর, সেহেতু যথার্থ নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন শ্রেণীহীন, শোষণহীন, মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার, যা গণতান্ত্রিক সমাজবাদীদের কাম্য নয়।

ব্যক্তির মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষের ধারণা ভুল

গ. গণতান্ত্রিক সমাজবাদ শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলে। কিন্তু মার্কসবাদীরা এরূপ চিন্তাকে সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক এবং অবৈজ্ঞানিক বলে সমালোচনা করেন। কারণ, অদ্যাবধি মানুষের লিখিত ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি সমাজেই শোষক এবং শোষিত এই দুটি শ্রেণীর অস্তিত্ব বিদ্যমান। দাস-সমাজে দাস-মালিকরা শোষক এবং দাসরা শোষিত, সামন্ত-সমাজে সামন্তরা শোষক ও ভূমিদাসরা শোষিত এবং ধনতান্ত্রিক সমাজে পুঁজিপতিরা শোষক ও শ্রমিকরা শোষিত। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী-সমঝোতার কথা চিন্তা করাই যায় না। কারণ ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শোষক শ্রেণী শোষিত শ্রেণীর অনুকূলে কাজ করতে গিয়ে কখনই নিজেদের স্বার্থ বিসর্জন দেয় না। বরং শোষিতশ্রেণী যখনই তাদের ন্যায্য অধিকার দাবি করেছে তখনই তাদের উপর নেমে এসেছে শোষকশ্রেণীর অত্যাচার ও নিপীড়ন। সুতরাং বৈষম্যমূলক সমাজে শোষকশ্রেণীর বিবেকের কাছে আবেদন-নিবেদন করা নিষ্ফল। তাই বাধ্য হয়েই বিভিন্ন যুগে সমাজবিপ্লব দেখা দিয়েছে। ১৭৭৬ সালে আমেরিকায় এবং ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত বুর্জোয়া বিপ্লব, কিংবা ১৯১৭ সালে রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব, ১৯৪৯ সালে চীন বিপ্লব ইত্যাদি মার্কসীয় সমালোচকদের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে। বস্তুতঃ শ্রেণীসংগ্রামের আবশ্যিকতা এবং শ্রেণীসংগ্রামের ফলে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা—উভয়ই প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত। সংসদীয় গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষ ততদিন পর্যন্তই রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারসমূহ ভোগ করতে পারে, যতদিন শাসকশ্রেণীর স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে। সুতরাং গণতান্ত্রিক সমাজবাদ যে ইতিহাসের গতিপ্রকৃতিকে অস্বীকার করে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

অনৈতিহাসিক ও অবৈজ্ঞানিক মতবাদ

ঘ. গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা রাষ্ট্রানুরাগী। তাঁরা রাষ্ট্রকে শ্রমিকশ্রেণীর সর্বাঙ্গীণ মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার পক্ষপাতী। কিন্তু মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে

রাষ্ট্র হোল শ্রেণীশোষণের হাতিয়ার মাত্র। রাষ্ট্র কখনই শ্রেণী-নিরপেক্ষ থেকে আপামর জনসাধারণের কল্যাণসাধন করতে পারে না। বৈষম্যমূলক সমাজে যে শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব থাকে সেই শ্রেণী নিজেদের স্বার্থে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে। তাই বুর্জোয়া সমাজে রাষ্ট্র কখনই শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতে পারে না। কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজেই রাষ্ট্র সর্বহারাশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতে পারে। সম্ভবতঃ গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের প্রকৃত চরিত্র উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

রাষ্ট্র-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী ভ্রান্ত

ঙ. গণতান্ত্রিক সমাজবাদের অর্থনৈতিক তত্ত্বটিকেও ভ্রান্ত বলে সমালোচনা করা হয়। সমাজের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন না করে যে-সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার কথা গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা বলেন কার্যতঃ তা মুমূর্ষু ধনতন্ত্রবাদকে বাঁচিয়ে রাখার একটি অভিনব কৌশল মাত্র। মার্কসবাদীদের মতে, দেশের অর্থনীতিকে পুঁজিপতিদের হাতে রেখে কখনই সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কারণ অর্থনৈতিক সাম্য ছাড়া রাজনৈতিক ও সামাজিক সাম্য মিথ্যা প্রতিপন্ন হতে বাধ্য।

অর্থনৈতিক তত্ত্বও ভুল

গণতান্ত্রিক সমাজবাদের উপরি-উক্ত সমালোচনা সত্ত্বেও বর্তমানে তা মার্কসবাদের প্রবল প্রতিপক্ষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। অবশ্য একথাও সত্য যে, বিশ্বের নির্যাতিত মানুষের কাছে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ অপেক্ষা মার্কসবাদের আবেদন অনেক বেশী।

২। মার্কসবাদ বনাম গণতান্ত্রিক সমাজবাদ (Marxism vs. Democratic Socialism)

গণতান্ত্রিক সমাজবাদ এবং মার্কসবাদ সমাজতন্ত্রবাদের দুটি বিভিন্ন রূপ হলেও এদের মধ্যে আদর্শ, কর্মপন্থা ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট পার্থক্য বর্তমান।

প্রথমতঃ মার্কসবাদ অর্থনীতিকে সমাজের ভিত বলে মনে করে। অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর রাষ্ট্রব্যবস্থা, ধর্ম, সংস্কৃতি দাঁড়িয়ে থাকে বলে মার্কসবাদীরা মনে করেন। এসব কিছুকেই তাঁরা ইমারত বা উপরি-কাঠামো বলে বর্ণনা করেন।

ভিত ও ইমারতের তত্ত্বগত পার্থক্য

কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা মার্কসবাদীদের ভিত ও ইমারতের তত্ত্বে আস্থাশীল নন।

দ্বিতীয়তঃ মার্কসবাদ বৈষম্যমূলক সমাজকে শ্রেণীসমাজ বলে বর্ণনা করে না। এরূপ সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী বলে তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন। মার্কস ও এঙ্গেলসের ভাষায়, "অদ্যাবধি যত সমাজ দেখা গিয়েছে তাদের ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস মাত্র।"

শ্রেণীদ্বন্দ্ব বিষয়ে পার্থক্য

কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলে মনে করেন। তাঁরা শ্রেণীদ্বন্দ্ব অপেক্ষা শ্রেণী-সমঝোতায় বেশী বিশ্বাসী।

তৃতীয়তঃ মার্কসবাদীরা সমাজবিপ্লবের মাধ্যমে সর্বহারার একনায়কত্ব কায়েম করে প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলে মনে করেন। সর্বহারাশ্রেণী বিপ্লবের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেই কেবলমাত্র নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

বিপ্লব বিষয়ে পার্থক্য

কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা সমাজবিপ্লবের তত্ত্বে আস্থাশীল নন। তাঁরা গণতান্ত্রিক উপায়ে অর্থাৎ রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার সাধনের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলে প্রচার করেন। এইভাবে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করে এবং শ্রমিক সংঘ ও সমবায় সমিতিগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে সাংবিধানিক উপায়ে একটি সমাজতান্ত্রিক দল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে বলে গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা অভিমত পোষণ করেন।

চতুর্থতঃ মার্কসবাদীরা রাষ্ট্রকে শ্রেণী-শোষণের হাতিয়ার হিসেবে বর্ণনা করেন। তাঁদের মতে, বৈষম্যমূলক সমাজে রাষ্ট্র কখনই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কল্যাণ সাধন করতে পারে না। কেবলমাত্র শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্র জনকল্যাণ সাধন করতে পারে।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিষয়ে পার্থক্য

কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা রাষ্ট্রকে শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচারবিশ্লেষণ করেন না। তাঁদের মতে, রাষ্ট্র শ্রমিকশ্রেণীর কল্যাণ বিধানের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে। তাঁরা বলপ্রয়োগের দ্বারা বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে উৎখাত করার নীতিতে বিশ্বাসী নন।

পঞ্চমতঃ মার্কসবাদীরা রাষ্ট্রের বিলুপ্ত হওয়ার (withering away of the State) তত্ত্বে আস্থাশীল। তাঁদের মতে, শ্রেণীহীন, শোষণহীন, মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে অপ্রয়োজনীয় বলে রাষ্ট্র আপনা থেকেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

রাষ্ট্রের বিলুপ্ত হওয়ার প্রশ্নে মতবিরোধ

কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা রাষ্ট্রের বিলুপ্ত হওয়ার তত্ত্বে বিশ্বাসী নন। তাঁরা রাষ্ট্রকে অপরিহার্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাঁচিয়ে রাখার পক্ষপাতী।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিষয়ে মতপার্থক্য

ষষ্ঠতঃ মার্কসবাদ ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন করে সম্পত্তির উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা সামাজিকীকরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। তাঁরা সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানাকে পুরোপুরিভাবে খর্ব করার পক্ষপাতী নন।

উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে একথা বলা যায় যে, মার্কসবাদ এবং গণতান্ত্রিক সমাজবাদ সমাজবাদের দুটি রূপ হলেও তাদের মধ্যে বৈসাদৃশ্যই অধিক পরিমাণে চোখে পড়ে।

সপ্তদশ অধ্যায়

রাষ্ট্র ও সর্বোদয় সম্পর্কে গান্ধী-তত্ত্ব

[Gandhi's Theory of the State and Sarvodaya]

১। ভূমিকা (Introduction)

প্রচলিত অর্থে 'রাজনৈতিক দার্শনিক' (Political Philosopher) বলতে যা বোঝায় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) তা ছিলেন না। রাজনৈতিক দর্শন সম্পর্কে তিনি সুসংবদ্ধ কোন আলোচনা করেননি। গান্ধীজী নিজেই বলেছেন, "গান্ধীবাদ বলে কোনো কিছু নেই…নতুন কোনো নীতি বা আদর্শের স্রষ্টা হিসেবে আমি কেবলমাত্র আমার নিজের মতো করে শাশ্বত সত্যকে আমাদের দৈনন্দিন জীবন ও সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে প্রয়োগের চেষ্টা করেছি।" বস্তুতঃ গান্ধীজীর ধ্যানধারণা, চিন্তা-ভাবনা ও কার্যাবলীর ভিত্তিতে তাঁর অনুরাগী ও অনুগামীরা 'গান্ধীবাদ' (Gandhism) নামে একটি রাজনৈতিক তত্ত্ব বা মতবাদ (Political Theory) খাড়া করেন।

গান্ধীজীর রাজনৈতিক দর্শন প্রসঙ্গে

গান্ধীজীর রাজনৈতিক দর্শন তথা চিন্তাধারার উপর ভাগবত গীতার প্রভাব যথেষ্ট পড়েছিল। গীতার 'কর্মযোগ' তাঁকে 'কর্মযোগী' করে তুলেছিল। তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের উপর জৈনধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের প্রভাবও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। জৈন সাধু ব্রেচারাজ স্বামী (Brecharji Swami)-র কাছে লন্ডন যাত্রার পূর্বে তিনি মদ্য, স্ত্রীলোক এবং মাংসের প্রতি অনাসক্ত থাকার শপথ নিয়েছিলেন। অনেকে মনে করেন যে, যীশু খ্রীষ্টের 'সারমন্ অন্ দি মাউন্ট' তাঁর চিন্তাধারার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাছাড়া, জন রাস্কিন (John Ruskin)-এর 'আনটু দিস্ লাস্ট' (Unto This Last) নামক পুস্তকখানির দ্বারা তিনি যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। রাস্কিনের কাছ থেকে তিনি প্রধানতঃ তিনটি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, যথা—
ক. সর্বসাধারণের কল্যাণ সাধনকারী অর্থনীতিই হোল সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অর্থনীতি ;
খ. একজন আইনজীবী ও একজন ক্ষৌরকারের পরিশ্রমের মূল্য সমান এবং
গ. শ্রমিকদের জীবন হোল মূল্যবান জীবন। রাস্কিনের মতো টলস্টয় (Tolstoi)-এর 'বৈকুণ্ঠ তোমার হৃদয়ে' (The Kingdom of God is within You) নামক পুস্তকখানির প্রভাবে গান্ধীজী অহিংস মন্ত্রে দীক্ষিত হন। ডঃ শশীভূষণ দাসগুপ্ত বলেছেন, "টলস্টয়, রাস্কিন, থোরো, মাৎসিনি, কার্পেন্টার প্রভৃতি অনেকের লেখাই গান্ধীজীকে এ বিষয়ে প্রেরণা যোগাইয়াছে।" গান্ধীজী তাঁর 'আত্মজীবনী'-তে বলেছেন, "আমার জীবনের উপর গভীর ছাপ আধুনিক জগতের তিনজন অঙ্কিত করিয়াছেন। রামচন্দ্র ভাই তাঁহার 'জীবন্ত সংস্পর্শ' দ্বারা, টলস্টয় তাঁহার 'বৈকুণ্ঠ তোমার হৃদয়ে' নামক পুস্তক দ্বারা এবং রাস্কিন 'আনটু দিস্ লাস্ট' নামে পুস্তক

গান্ধীজীর রাজনৈতিক চিন্তাধারার উৎসসমূহ

দ্বারা আমাকে চমৎকৃত করিয়াছেন।" "জীবন-ব্রত" নামক গ্রন্থে গান্ধীজী বলেছেন, "আমি টলস্টয়ের একটা প্রবন্ধ পাঠ করি। উহাই আমাকে প্রথমে ঝাঁকুনি দিয়া জাগাইয়া দেয় যে, নিজ হাতে কাজ করা মানুষের পক্ষে কেমন অনিবার্য। এত স্পষ্ট করিয়া একথা জানার পূর্বেও রাস্কিনের 'আনটু দিস্ লাস্ট' বইখানা পড়িয়া কার্যতঃ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। ইংরেজীতে 'ব্রেড লেবার' শব্দের প্রতিশব্দ স্বরূপেই গুজরাটীতে 'জাত মেহনত' শব্দটা ব্যবহার করিতেছি। 'ব্রেড লেবার' শব্দের শব্দগত তরজমা হইতেছে 'রুটির জন্য মজুরি।' নিজের পেটের ভাতের জন্য যে প্রত্যেক মনুষ্যেরই মজুরি করা উচিত, শরীরকে খাটাইয়া খাটাইয়া ক্লিষ্ট করা উচিত, ইহাই ঈশ্বরের নিয়ম, এই কথাটা টলস্টয়ের নিজের নহে, একজন খুব অপরিচিত রাশিয়ান লেখক বুর্নোর (?) ; তাঁহাকে টলস্টয় প্রসিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন ও নিজের করিয়া লইয়াছেন। আমি এই কথা গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে দেখিতে পাই। যে ব্যক্তি অযজ্ঞ তাহার উপর এই কঠিন শাপ দেওয়া হইয়াছে—'যে ব্যক্তি যজ্ঞ না করিয়া খায়, সে চুরির অন্ন খায়।' এখানে যজ্ঞ অর্থ কায়িক শ্রম, অথবা রুটির জন্য মজুরি খাটা এবং আমার মতে ইহাই সম্ভব।"

২। রাষ্ট্র সম্পর্কে গান্ধী-তত্ত্ব (Gandhi's Theory of the State)

গান্ধীজীর রাষ্ট্রচিন্তার উপর টলস্টয়ের প্রভাব

গান্ধীজীর রাষ্ট্রচিন্তার উপর টলস্টয়ের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্তের ভাষায়, "রাষ্ট্রচিন্তাতেও টলস্টয়ের সহিত গান্ধীজীর গভীর মিল ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকিতেই গান্ধীজী টলস্টয়ের সকল বইয়ের মারফতে টলস্টয়ের এই রাষ্ট্র-চিন্তার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন।"

টলস্টয়ের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র

'আমাদের যুগের দাসত্ব' (The Slavery of our Times) বইখানিতে টলস্টয় হিংসা ও বলপ্রয়োগকে বৈধ করার অস্ত্র হিসেবে রাষ্ট্রকে চিত্রিত করেছেন। রাষ্ট্রপ্রণীত আইনসম্পর্কে তাঁর অভিমত হোল এই যে, 'আইনসমূহ হইল কতকগুলি বিধি—যে বিধিগুলিকে তৈরি করিয়া লয় সেইসব লোকই যাহারা সুগঠিত হিংসা ও বলপ্রয়োগের দ্বারাই শাসন করে।" তিনি হিংসাকে তথা হিংসার প্রতীক রাষ্ট্রকে নিন্দা করেছেন। রাষ্ট্রহীন সমাজের চিত্র অঙ্কিত করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "...আমাদের যুগে প্রায় সমস্ত বিচিত্র ধরনের কাজের ব্যাপারে জনগণ নিজেদের জীবনের ব্যবস্থা নিজেরাই অনেক বেশী ভাল করিতে পারে, তাহাদের শাসকবর্গ তাহাদের জন্য যে ব্যবস্থা করিতে পারে নিজেরা তাহা অপেক্ষা ঢের বেশি ভালভাবে করিতে পারে। শাসকবর্গের বিন্দুমাত্র সাহায্য না লইয়া অনেক সময় শাসকবর্গের বাধা সত্ত্বেও জনগণ সর্বপ্রকারের সামাজিক দায়িত্বভার সুসম্পন্ন করিতেছে ; যেমন, শ্রমিকের সংঘ, সমবায়-সমিতিসমূহ, রেলওয়ে কোম্পানি, কর্মী সমিতি ও কর্মচারী সমিতি, অন্যান্য সংঘ (Syndicate) প্রভৃতি। জনসাধারণের কাজের জন্য যদি অর্থ-সংগ্রহের প্রয়োজন হয় তবে এ-কথা আমরা কেন ধরিয়া লইব যে বিবিধ প্রকারের করধার্য করা ছাড়া ইহা আর হইবার নহে ? এই কর্মভারগুলি যদি প্রকৃতপক্ষেই প্রয়োজনীয় হয় তবে কেন স্বাধীন দেশবাসীগণই

কোনো প্রকার বলপ্রয়োগ ব্যতীত স্বেচ্ছায় প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবে না ? এবং কর আদায়ের দ্বারা যে কাজ করা হয় সেইসব কাজ নিজেরাই করিতে পারিবে না ? কেন মনে করিব যে বলপ্রয়োগ ব্যতীত কোনো সালিসীর সম্ভাবনা নাই ? বিবাদকারী উভয়পক্ষেরই বিশ্বাসভাজন লোকের দ্বারা বিচারের ব্যবস্থা চিরকালই ছিল এবং চিরকালই থাকিবে। ইহার জন্য কোনো বল-প্রয়োগের প্রয়োজন নাই। দীর্ঘ-দিনের দাসত্ববন্ধনের দ্বারা আমরা এমনভাবে হীন হইয়া গিয়াছি, আমরা এখন আর কল্পনাই করিতে পারি না যে, বল-প্রয়োগ ব্যতীত শাসনকার্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু বল-প্রয়োগ ব্যতীত শাসন-পরিচালনা সম্ভব নয়, একথা সত্য নয়। রাশিয়ার যেসব অধিবাসীর দল দূর দূর অঞ্চলে চলিয়া যাইতেছে সরকার তাহাদের পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকেন ; কিন্তু তাহারা সেখানে গিয়া নিজেদের করের ব্যবস্থা করে—শাসনব্যবস্থা করে—বিচার-ব্যবস্থা করে—পুলিসের ব্যবস্থা করে, যে পর্যন্ত সরকার বাহাদুরের জোরজবরদস্তি গিয়া তাহাদের শাসনব্যবস্থা তছনছ করিয়া না তোলে সে পর্যন্ত তাহারা বেশ সমৃদ্ধিই লাভ করিতে থাকে। এইভাবেই আমরা দেখিতে পাই, জনগণ তাহাদের সর্বসম্মতির দ্বারা ব্যবহারের জন্য জমিবণ্টনের ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারিবে না—এরূপ ধরিয়া লইবারও কোনো যুক্তি নাই।" অনেকে বলপ্রয়োগের দ্বারা রাষ্ট্রকে পরাজিত করার কথা বললে টলস্টয় বলেন, "বলপ্রয়োগের দ্বারা দাসত্ব রোধ করিবার সকল চেষ্টাই হইল আগুনের দ্বারা আগুন নেভানোর চেষ্টা, জলের দ্বারা জল নিবারণের চেষ্টা, একটা গর্ত খুঁড়িয়া আর একটা গর্ত বুজাইবার চেষ্টা।" বস্তুতঃ টলস্টয় অসহযোগ, কর বন্ধের আন্দোলন এবং বল-প্রয়োগের দ্বারা রক্ষা করার জন্য কোন অবস্থাতেই রাষ্ট্রের নিকট আবেদন-নিবেদন না করার মাধ্যমে রাষ্ট্রের শক্তি খর্ব করার কথা বলেছেন।

টলস্টয়ের রাষ্ট্র-চিন্তার গভীর প্রভাব গান্ধীজীর উপর যে বিশেষভাবে পড়েছিল সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। পশুবলের প্রতি গান্ধীজীর চরম অশ্রদ্ধা এবং অহিংসার নীতিতে দৃঢ় আস্থা তাঁর উপর টলস্টয়ের প্রভাবেরই ফল। গান্ধীজীর 'হিন্দ স্বরাজ' (Hind Swaraj) নামক পুস্তকখানির মধ্যে রাষ্ট্র-সম্বন্ধীয় চিন্তার প্রথম প্রকাশ ঘটে। "তাঁহার পরে যত দিন গিয়াছে, জীবনের সকল পরীক্ষানিরীক্ষার ভিতর দিয়া সত্যের সহিত আরও যত ঘনতর যোগ ঘটিয়াছে 'স্বরাজে'র আদর্শ তাঁহার মনে ততই ব্যাপক সংজ্ঞা ও তাৎপর্য লাভ করিয়াছে। জীবন-সায়াহ্নে সেই স্বরাজের আদর্শই পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে তাঁহার সর্বোদয়ের আদর্শের মধ্যে।"

গান্ধীজীর দৃষ্টিতে রাষ্ট্র

রাষ্ট্রের প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে গান্ধীজী বলেছিলেন, "রাষ্ট্রের ক্ষমতাবৃদ্ধিকে আমি সর্বাধিক ভয়ের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া থাকি ; তাহার কারণ এই, যদিও রাষ্ট্র আপাতদৃষ্টিতে শোষণ কমাইয়া দিয়া মানুষের মঙ্গল করে, কিন্তু মানুষের ব্যক্তিত্বকে মারিয়া ফেলিয়া রাষ্ট্র মানুষ জাতির সর্বাপেক্ষা সর্বনাশ সাধন করিয়া থাকে, মানুষের এই ব্যক্তিত্বই যে মানুষের সকল উন্নতি-প্রগতির মূল কারণ।" তিনি আরো বলেছেন, "রাষ্ট্র হইল কেন্দ্রীভূত-ভাবে এবং সুগঠিতভাবে হিংসা ও বলের প্রয়োগ। ব্যক্তি-মানুষের একটা আত্মা আছে ;

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে গান্ধীজীর অভিমত

কিন্তু রাষ্ট্র একটি আত্মা-বিহীন যন্ত্রমাত্র বলিয়া সহিংস বল-প্রয়োগ হইতে ইহাকে আর কিছুতেই টানিয়া দূরে সরাইয়া লওয়া যায় না, এই সহিংস বলপ্রয়োগেই ইহার অস্তিত্ব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই, রাষ্ট্র যদি বলের দ্বারা পুঁজিবাদকে দমিত করিয়া দিতে যায়, তবে হিংসার জবরদস্তির কুণ্ডলীর মধ্যে ইহা আপনিই জড়াইয়া পড়িবে, ইহা অহিংসাকে আর কোনোদিনই জাগাইয়া তুলিতে পারিবে না। যে জিনিসটি আমার একেবারে অমনঃপূত তাহা হইল আসুরিক বলের উপরে গ্রথিত কোনো প্রতিষ্ঠান—আর রাষ্ট্র হইল ঠিক তাহাই। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রতিষ্ঠানই থাকা আবশ্যক।"

গান্ধীজী রাষ্ট্রকে 'নিজেই নিজের লক্ষ্য' (an end in itself) বলে মনে করতেন না। তাঁর মতে, রাষ্ট্র হোল সকলের সর্বাপেক্ষা অধিক কল্যাণ সাধনের উপায় মাত্র। রাষ্ট্রের কার্যাবলীর মধ্যে পবিত্র বলে কোন কিছু নেই। মানুষের দুর্বলতার জন্য রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি। তিনি রাষ্ট্রের উপর এতই বীতশ্রদ্ধ ছিলেন যে, রাষ্ট্রীয় শক্তির অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করার কথা তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছিলেন।

রাষ্ট্র নিজেই নিজের লক্ষ্য নয়

রাষ্ট্র চরম সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী—এই তত্ত্বে গান্ধীজী আস্থাশীল ছিলেন না। পরিপূর্ণ নৈতিক কর্তৃত্বের উপর ভিত্তিশীল জনগণের সার্বভৌমিকতায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে, একজন ব্যক্তি অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি যতটুকু সীমিত আনুগত্য প্রদর্শন করে রাষ্ট্রের প্রতি তার বেশী আনুগত্য প্রদর্শনের কোনো প্রয়োজন নেই। মানুষের নীতিবোধে আঘাতকারী আইন অমান্য করাকে তিনি নাগরিকের অধিকার এবং পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করতেন।

রাষ্ট্র চরম সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নয়

গান্ধীজী রাষ্ট্রের বহুবিধ কার্যাবলীর তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি থোরোর মতই বলতেন, সেই রাষ্ট্র সর্বাপেক্ষা ভাল যা সর্বাপেক্ষা কম শাসন করে। তিনি রাষ্ট্রের অধিকাংশ কাজকে স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে অর্পণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর নিজের ভাষায়, "স্বায়ত্তশাসনের অর্থ হইল সরকারের নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবার জন্য একটা নিরন্তর চেষ্টা। সে সরকার জাতীয় সরকারই হোক, আর বিদেশী সরকারই হোক। স্বরাজ গভর্নমেন্ট তৈয়ার করিয়া জনগণ কেবলই যদি জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের নিয়ন্ত্রণের জন্য সেই (কেন্দ্রীয়) সরকারের দিকেই তাকায় তবে ইহা অত্যন্ত একটা দুঃখের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে।" তবে তিনি একথা স্বীকার করেছেন যে, এমন কতকগুলি বিষয় আছে যেগুলি রাজনৈতিক ক্ষমতা ছাড়া সম্পাদিত হতে পারে না, সেই সঙ্গে এমন কতকগুলি বিষয় আছে বলে তিনি মনে করেন যেগুলি আদৌ রাজনৈতিক শক্তি দ্বারা সম্পাদিত হতে পারে না। গান্ধীজীর মতে, সর্বাপেক্ষা কম শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্পাদিত হওয়া উচিত। তাঁর বিশ্বাস, অহিংস রাষ্ট্রে অপরাধ ও বলপ্রয়োগ ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাবে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, অপরাধ একেবারেই থাকবে না। তিনি একথা বিশ্বাস করতেন যে, অহিংস রাষ্ট্রেও সমাজ-বিরোধী কিছু কিছু লোক থাকবে যারা হিংসার পথ অবলম্বন করবে এবং আইনভঙ্গ করবে। এমন কি, অহিংস রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও কিছু কিছু সহিংস

রাষ্ট্রের কার্যাবলী বিষয়ে গান্ধীজীর অভিমত

সংস্থা অহিংস সরকারের পতন ঘটানোর জন্য সচেষ্ট হবে। এমতাবস্থায় অহিংস সরকারের কর্তব্য হোল তাদের ধ্বংস করা। কারণ কোনো সরকারই দেশের মধ্যে নৈরাজ্য সৃষ্টি হতে দিতে পারে না।

বস্তুতঃ মহাত্মা গান্ধী 'রাষ্ট্রহীন গণতন্ত্র' (Stateless democracy)-কেই কাম্য বলে মনে করতেন। কারণ এরূপ ব্যবস্থায় সামাজিক জীবন স্ব-নিয়ন্ত্রিতভাবেই পরিচালিত হয়। তাঁর ভাষায়, "এরূপ রাষ্ট্রে প্রত্যেকে তার নিজের শাসক হিসেবে কাজ করে। সে এমনভাবে নিজেকে পরিচালিত করে যাতে সে তার প্রতিবেশীর পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। এরূপ আদর্শ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের অবস্থিতি না থাকায় কোন রাজনৈতিক শক্তি থাকে না।" বস্তুতঃ সত্যাগ্রহী গ্রামসমূহের সমবায় প্রতিষ্ঠাকে গান্ধীজী আদর্শ গণতন্ত্র বলে মনে করতেন। গান্ধীজীর ঈপ্সিত আদর্শ গণতান্ত্রিক সমাজ কেবলমাত্র অহিংসার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে বলে তাঁর বিশ্বাস। তিনি বলেছিলেন, "আমি যে গণতন্ত্রের পরিকল্পনা করিয়াছি, অহিংসার দ্বারা যে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—সেখানে বিশ্বাসী সকলের জন্য একই রকমের স্বাধীনতা থাকিবে; সেখানে প্রত্যেক লোকই তাহার নিজের প্রভু।" এই সমাজের সর্বক্ষেত্রেই সাম্য এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ থাকবে। প্রতিটি ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুযায়ী সমাজের সেবা করার পূর্ণ সুযোগ লাভ করবে। এরূপ সমাজে সর্বপ্রকার শোষণের অবসান ঘটবে। গান্ধীজী 'মুনাফার জন্য উৎপাদন' তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। "একটা 'আবস্ট্র্যাক্ট' রাষ্ট্রের উন্নতি নয়, একটি দেশের বা সমাজের ভিতরকার প্রতিটি মানুষের উন্নতিই গান্ধীজীর কাম্য বলিয়া তিনি সব অবস্থাতেই ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রিত করিয়া যথাসম্ভব জনগণের নিজেদের মধ্যে ছড়াইয়া দিবার পক্ষপাতী ছিলেন। সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতাকে সমাজজীবনের একেবারে নিম্নস্তর হইতে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং গড়িয়া তুলিতে হইবে সর্বোদয়ের ভিত্তিতে; তবে আর শক্তি হিংসাত্মক বল-প্রয়োগের সমর্থক হইয়া উঠিবে না।"

রাষ্ট্রহীন গণতন্ত্র ও তার স্বরূপ

অবশ্য গান্ধীজী নিজেই একথা স্বীকার করেছেন যে, তাঁর আদর্শ সমাজ পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। তাঁর ভাষায়, "একটি সরকার সম্পূর্ণভাবে অহিংস হতে পারে না, কারণ তা সর্বসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে। বর্তমানে আমি এরূপ একটি স্বর্ণ-যুগের কথা কল্পনা করতে না পারলেও সেই সমাজ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সম্পর্কে আমি গভীরভাবে বিশ্বাসী এবং সেজন্য আমি কাজও করছি।" আদর্শ অহিংস সমাজ এবং মনুষ্য প্রকৃতির বাস্তব রূপের মধ্যে বোঝাপড়ার ফলে অহিংস বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কাঠামো স্থিরীকৃত হবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

প্রচলিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রতি গান্ধীজীর বিরূপতার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত বলেন, "গান্ধীজীর স্বরাজ চিন্তার মূলেও রহিয়াছে প্রতিটি ব্যক্তিমানুষ; তাহাকে যন্ত্রে পরিণত হইতে না দিয়া অপর সকলের সঙ্গে যোগে কি করিয়া তাহার মানুষ্য জীবনের সহজ বিকাশ ও পরিণতির সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যাইতে পারে স্বরাজচিন্তার ইহাই গোড়ার কথা। জগতের প্রচলিত রাষ্ট্রবিধি সম্পর্কে গান্ধীজীর

প্রচলিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রতি গান্ধীজীর বিরূপতার কারণ

মৌলিক বিরূপতার কারণও এই, রাষ্ট্রের লক্ষ্য কেবলই ক্ষমতা ও শক্তিকে কেন্দ্রীভূত-ভাবে বাড়াইয়া তোলা ; ইহা মূলতঃ হিংসা-প্রণোদিত, অতএব অগ্রহণীয়, দ্বিতীয়তঃ ইহা মানুষের ব্যক্তিত্বকে নানা ফন্দিফিকিরে কেবলই পিষিয়া মারিয়া ফেলিতে চায়, তাহাকে নিরবধি শোষণ করিতে চায়।"

গান্ধীজী কি নৈরাজ্যবাদী দার্শনিক

রাষ্ট্রের প্রতি চরম বিরূপতার জন্য ডঃ গোপীনাথ ধাওয়ান (Dr Gopinath Dhawan), জর্জ উডকক্ (George Woodcock), ড. বিনয় সরকার (Dr Benoy Sarkar) প্রমুখ পণ্ডিতগণ গান্ধীজীকে একজন নৈরাজ্যবাদী দার্শনিক বলে অভিহিত করেন। কিন্তু পি. স্প্রাট (P. Sprat), ড. পাওয়ার (Dr Power), ড. বিমানবিহারী মজুমদার প্রমুখ এই অভিমত মেনে নিতে সম্মত নন। আমরা অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর ভাষায় মন্তব্য করতে পারি, "রাষ্ট্র সম্পর্কে গান্ধীজীর ধারণার সঙ্গে নৈরাজ্যবাদী কিংবা সাম্যবাদী কোনো ধারণার সম্পূর্ণ মিল নেই।"

সমালোচনা : আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণের অনেকেই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গান্ধীজীর রাষ্ট্র-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গীর তীব্র সমালোচনা করেন।

শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব

(১) মার্কসবাদী লেখকদের মতে, গান্ধী শ্রেণী-শোষণের হাতিয়ার হিসেবে রাষ্ট্রকে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। শ্রেণীগত দৃষ্টিকোণ থেকে গান্ধীজী রাষ্ট্রকে বিচারবিশ্লেষণ করতে না পারার জন্য তাঁর মতবাদ গতানুগতিক মতবাদের ঊর্ধ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি।

অহিংস আন্দোলন সঠিক পথ নয়

(২) গান্ধীজীর কর্মসূচীর একটি বড় অংশ অধিকার করেছিল অহিংস আন্দোলন। 'বৈপ্লবিক উপায়ে ক্ষমতা দখলে'র প্রচেষ্টাকে গান্ধীজী নিন্দা করে ভুল করেছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। কারণ কেবলমাত্র অহিংস সত্যাগ্রহের মাধ্যমে বুর্জোয়া রাজনৈতিক শক্তিকে যে খর্ব করা যায় না ইতিহাসই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার অবাস্তব চিন্তা

(৩) গান্ধীজী নৈতিকতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে ভুল করেছিলেন বলে সমালোচকদের ধারণা। নৈতিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তাঁর কল্পিত 'রামরাজ্য' বা 'আদর্শ সমাজ' অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অবশ্য এরূপ সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে গান্ধীজী নিজেই সন্দিহান ছিলেন।

রাষ্ট্র সম্পর্কে স্ববিরোধী ধারণা

(৪) গান্ধীজীর রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণা স্ববিরোধী। কারণ তিনি একদিকে 'রাষ্ট্রহীন গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন, অপরদিকে রাষ্ট্রের হাতে সর্বাপেক্ষা কম ক্ষমতা দেওয়ার কথা প্রচার করেছেন। অহিংস রাষ্ট্রে অপরাধ-প্রবণতা এবং বলপ্রয়োগের ঘটনা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে বলে তিনি মনে করতেন। প্রশ্ন হোল, রাষ্ট্রহীন গণতন্ত্রই যদি তাঁর কাম্য হয় তবে রাষ্ট্রের হাতে কম ক্ষমতা দেওয়ার কিংবা অহিংস রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন উঠে কি করে ?

(৫) তিনি ব্যক্তি-মানুষের উপর অত্যধিক আস্থা স্থাপন করে সমাজের ঊর্ধ্বে ব্যক্তিকে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু ব্যক্তি সমাজের ঊর্ধ্বে নয়, বরং সমাজ ব্যক্তির ঊর্ধ্বে। এদিক থেকে গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করা যেতে পারে।

ব্যক্তি-মানুষের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, গান্ধীজীর রাষ্ট্র-সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে অনেকেই মার্কসীয় দর্শনের সাদৃশ্য আছে বলে মনে করেন। কিন্তু এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ মার্কসবাদীরা শোষণমূলক রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার কথা প্রচার করেন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাকে তাঁরা আদৌ উপেক্ষা করেন না। তাছাড়া, পদ্ধতিগত দিক থেকেও উভয় মতবাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

৩। রাষ্ট্র সম্পর্কে গান্ধীবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য (Difference between Gandhian and Marxian approach of the State)

কেউ কেউ মনে করেন যে, রাষ্ট্র সম্পর্কে গান্ধীবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। রাষ্ট্র সম্পর্কে উভয় দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য হোল ঃ

উভয় দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য

(ক) শক্তি বা ক্ষমতার সমস্যাকে গান্ধীজী শ্রেণীগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করেননি। কিন্তু রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় তত্ত্ব শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গীর উপর সর্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্ব আরোপ করে। মার্কসীয় দৃষ্টিতে রাষ্ট্র হোল শ্রেণীশোষণের হাতিয়ার মাত্র। কিন্তু গান্ধীজী মনে করতেন, রাষ্ট্র কোন শ্রেণীর স্বার্থে কাজ করে না।

দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য

(খ) মার্কসবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, বুর্জোয়াশ্রেণী গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয় এবং তারা স্বেচ্ছায় কখনই রাজনৈতিক ক্ষমতা সর্বহারাশ্রেণীর হস্তে অর্পণ করবে না। তাই প্রয়োজন হয় বিপ্লবের। কিন্তু গান্ধীজীর মতে, যে-কোন অবস্থাতেই বলপূর্বক ক্ষমতা দখল করা নীতিগত দিক থেকে অন্যায় এবং এরূপ ক্ষমতা দখল করেও দরিদ্রের কোন উন্নতিই সাধিত হতে পারে না। অহিংসা আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব বলে গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন। তাঁর ভাষায়, "আমি যখন জেলে ছিলাম তখন আমি কার্লাইল-লিখিত 'ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস' পাঠ করিয়াছি ; পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আমাকে রাশিয়ার বিপ্লবের কথা কিছু কিছু বলিয়াছেন। কিন্তু আমার এই বিশ্বাস, এই সংগ্রামগুলি হিংসার অস্ত্র দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল বলিয়া এগুলি ইহাদের গণতান্ত্রিক আদর্শলাভ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে।"

পদ্ধতিগত পার্থক্য

(গ) মার্কসবাদীদের মতে, "সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব" (Dictatorship of the proletariat) কিংবা "রাষ্ট্রের বিলীন হওয়ার" (withering away of the State) তত্ত্বে গান্ধীজী বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই সর্বহারা-শ্রেণীর একনায়কত্বের সময় সাময়িকভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রী-ভবনের প্রশ্নকে তিনি অবাস্তব বলে মনে করতেন।

রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে পার্থক্য

সুতরাং উভয় দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য যে আছে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

৪। সর্বোদয় সম্পর্কে গান্ধী-তত্ত্ব (Gandhi's Theory of Sarvodaya)

'সর্বোদয়' শব্দটির স্রষ্টা গান্ধীজী। তাঁর ভাবী সমাজের কল্পনা যে ধ্রুব পদের মধ্যে বিধৃত তা হচ্ছে সর্বোদয়। ১৯০৮ সালে জোহানেসবার্গ থেকে ডারবান-এ যাওয়ার পথে জন্ রাস্কিনের 'আনটু দিস্ লাস্ট' পুস্তকখানা তিনি পাঠ করেন, যা তাঁর জীবনে যাদুমন্ত্রের ন্যায় ক্রিয়া করে। পরে তিনি গুজরাটীতে পুস্তকটির ভাবানুবাদ করেন। নাম দেন 'সর্বোদয়'। পুস্তকখানা পড়ার পর কয়েকটি জিনিস তাঁর কাছে 'দিবালোকের ন্যায়' স্পষ্ট হয়। পরের দিন সকাল থেকেই সেই অনুসারে আচরণ করতে কৃতনিশ্চয় হন। এ বিষয়ে গান্ধীজী নিজেই বলেছেন, "যে সমস্ত গভীর বিশ্বাস আমার হৃদয়ে নিহিত ছিল, এই বইটিতে আমি তাহারই কতকগুলি প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইয়াছিলাম। সেই-জন্য এই বইটি আমার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং উহার নির্দেশ অনুযায়ী আচরণও আমাকে দিয়া করাইয়া লইয়াছিল।"

গান্ধীজীর সর্বোদয় চিন্তার উৎস

'সর্ব' এবং 'উদয়'—এই দুটি শব্দের সমন্বয়েই 'সর্বোদয়' শব্দটি গঠিত। সর্বোদয় কথাটির আক্ষরিক অর্থ হোল 'সকলের কল্যাণ' (uplift of all)। রাস্কিনের 'আনটু দিস্ লাস্ট' পুস্তকখানির প্রভাবে প্রভাবিত হয়েই গান্ধীজী সর্বোদয় তত্ত্ব প্রচার করেন। গান্ধীজী বলেছেন, "সর্বোদয়ের সিদ্ধান্ত আমি এই রকম বুঝিয়াছি ঃ

সর্বোদয়ের অর্থ

"(১) সকলের ভালতেই নিজের ভাল রহিয়াছে।"

"(২) উকিল ও নাপিতের কাজের মূল্য একই রকম হওয়া চাই, কেন না জীবিকা উপার্জনের অধিকার উভয়েরই সমান।"

"(৩) সাধারণ মজুর কৃষকের জীবনই আদর্শ জীবন।"

সুতরাং সর্বোদয় বলতে গান্ধীজী সর্বসাধারণের কল্যাণের কথাই বলেছেন; বিশেষ কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর কথা বলেননি। গান্ধীজীর সর্বোদয়ের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে ভারতম্ কুমারাপ্পা (Bharatam Kumarappa) বলেছেন, সকলের কল্যাণ সাধন, এই অর্থে সর্বোদয় গান্ধীজীর আদর্শ সমাজব্যবস্থার কথাই বলেছে। সর্বোদয়ের ভিত্তি হোল সর্বব্যাপী ভালবাসা। সর্বোদয় সমাজে রাজপুত্র ও কৃষক, হিন্দু ও মুসলমান, স্পর্শযোগ্য (touchable) ও অস্পৃশ্য, শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায়, সাধু ও শয়তান সকলেই সমান। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী শোষিত বা অত্যাচারিত হবে না। এরূপ সমাজের সকলেই সদস্য বলে পরিগণিত হবে, উৎপাদনের জন্য সকলেই শ্রম করবে এবং সবলেরা দুর্বলদের রক্ষা করবে। এইভাবে সর্বোদয় সমাজে সকলের কল্যাণ সাধিত হবে। গান্ধীজীর এই সর্বোদয় দর্শন গড়ে উঠেছে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের উপর ভিত্তি করে।

দেশের মধ্যে সু-উচ্চ নৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করাই সর্বোদয়ের প্রধান লক্ষ্য। গান্ধীজী মনে করতেন, সত্য (truth), অহিংসা (non-violence) এবং সৎ উপায় (purity of means) অবলম্বনের মাধ্যমে সর্বোদয় সমাজের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তিনি এরূপ সমাজের সাফল্যের জন্য 'লোকশক্তি'কে জাগ্রত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

সর্বোদয়ের লক্ষ্য

সর্বোদয়ের মূল কথা হোল আত্মত্যাগ (Self-sacrifice)। প্রত্যেক ব্যক্তিকে অপরের স্বার্থে নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রত্যেকেই নিজের জীবনকে শুধু 'দেওয়ার জন্যই' উৎসর্গ করবে, 'নেওয়ার জন্য' নয়। কোনো কিছুর বিনিময়ে পাওয়ার আশা কেউ করবে না।

আত্মত্যাগ

গান্ধীজীর ভাষায়,

"প্রত্যেক রাজ্যেই—
প্রজার পালন হবে সৈনিকের ব্রত,
পাদরী করিবে তারে শিক্ষায় নিরত।
উকিলের ব্রত হবে তারে ন্যায় দান,
বৈদ্যের কর্তব্য তার শাস্ত্রের বিধান।
তারেই করিতে দান, নিজের ভান্ডারে
সঞ্চয় করিবে বৈশ্য পণ্যের সম্ভারে।"

গ্রাম ও গ্রামীণ মানুষের পুনর্বাসনের উপর সর্বোদয় অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। গান্ধীজী গ্রামকে ভারতীয় জীবনের কেন্দ্রবিন্দু বলে মনে করতেন। সুদীর্ঘ কাল ধরে গ্রামীণ লোকেরা যেভাবে শোষিত ও বঞ্চিত হয়েছে সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি তার অবসান করতে চেয়েছেন।

গ্রামীণ উন্নতি

গান্ধীজীর সর্বোদয় সমাজে সাধারণ মানুষেরাই গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের নির্বাচিত করবে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন করবে থানা পঞ্চায়েতের সদস্যদের। কিন্তু এইসব নির্বাচন দলীয় রাজনীতির ভিত্তিতে হবে না। রাজনৈতিক দল, পেশাদার রাজনীতিবিদ্, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন, ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ইত্যাদিকে গান্ধীজী কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। তাঁর কল্পিত আদর্শ সমাজে এসবের কোনো স্থান নেই। সর্বোদয় সমাজের সমর্থকেরা মনে করেন রাজনৈতিক দলগুলি হোল জনগণের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী। সর্বোদয়ের আদর্শ একথা বিশ্বাস করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সত্য, সততা, অহিংসা এবং ভ্রাতৃত্ববোধে বিশ্বাসী না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজের অগ্রগতি সাধিত হতে পারে না। সর্বোদয় সমাজের মূল নীতি হবে, "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"। সর্বোদয় সমাজের ভিত্তি হবে সত্য এবং অহিংসা। এরূপ সমাজে নৈতিকতা বিবর্জিত কোনো কাজ কেউ সম্পাদন করবে না, সমাজের মধ্যে শ্রেণী-বিদ্বেষের অস্তিত্ব থাকবে না। সর্বোদয় সমাজের শাসক পর্ণ-কুটিরে বাস করে আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। তাঁর কাজ হবে সাধারণভাবে বাস করা এবং মহান চিন্তা করা। এরূপ সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন বলে কোনো কিছু থাকবে না, থাকবে সকলের শাসন।

সর্বোদয় সমাজের ভিত্তি

সর্বোদয় সমাজ সঙ্কীর্ণতা, আঞ্চলিকতাবোধ ও ধর্মান্ধতা মুক্ত হবে। রাষ্ট্র হবে ধর্ম-নিরপেক্ষ। এইভাবে গান্ধীজীর সর্বোদয় চিন্তার মাধ্যমে যতখানি রাজনৈতিক আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় তার থেকে অনেক বেশী সন্ধান পাওয়া যায় সামাজিক ও ধর্মীয় আদর্শের।

সমালোচনা ঃ বর্তমানে নানাদিক থেকে গান্ধীজীর সর্বোদয়-তত্ত্বের সমালোচনা করা যায় ঃ

(১) সমালোচকেরা গান্ধীজীর সর্বোদয় চিন্তাকে একটি অবাস্তব চিন্তা এবং সর্বোদয় সমাজকে একটি অবাস্তব সমাজ বলে বর্ণনা করেন। সর্বোদয় সমাজকে অবাস্তব বলে বর্ণনা করা হয় এইজন্যই যে, প্রতিটি সমাজ গড়ে উঠে মানুষকে নিয়ে। আর মনুষ্যপ্রকৃতির মধ্যে যে পশুসুলভ প্রবৃত্তি রয়েছে তাকে কোনমতেই উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু গান্ধীজী মানুষের কাছ থেকে যতটুকু আশা করা উচিত তার অনেক বেশী চেয়েছিলেন। মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই স্বার্থপর। কিন্তু গান্ধীজী এইসব স্বার্থপর মানুষের কাছে স্বার্থত্যাগী হওয়ার আশা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, এরূপ আশা করা অবাস্তবতার পেছনে ছোটা মাত্র। গান্ধীজী অবশ্য এরূপ আদর্শ সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলে বিশ্বাস করলেও অবিলম্বে তা প্রতিষ্ঠিত হবে না—একথা ভালভাবেই জানতেন। তাই তিনি বলেছিলেন, "বর্তমানে আমি এরূপ একটি স্বর্ণযুগের কথা কল্পনা করতে না পারলেও সেই সমাজ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সম্পর্কে আমি গভীরভাবে বিশ্বাসী এবং সেজন্য আমি কাজও করছি।"

অবাস্তব তত্ত্ব

(২) সর্বোদয় সমাজে 'দলহীন গণতন্ত্র' (Partyless Democracy) প্রতিষ্ঠিত হবে বলে গান্ধীজী মনে করতেন। কিন্তু সমালোচকেরা দলহীন গণতন্ত্রকে অলীক বলে মনে করেন। কারণ শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী-স্বার্থের রক্ষক হিসেবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অবস্থান ও বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং রাজনৈতিক দল ছাড়া প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

দলহীন গণতন্ত্রের সমালোচনা

(৩) গান্ধীজীর সর্বোদয় তত্ত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনকে সমালোচনা করা হয়েছে এবং সকলের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থাকেই শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, কোনো একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সকলেই ঐকমত্যে উপনীত হতে পারে না। বলা বাহুল্য, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সকলের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার কথা আদৌ চিন্তা করা যায় না। তাছাড়া, গণতন্ত্রের মূল কথাই হোল সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। গান্ধীজী তাঁর সর্বোদয় তত্ত্বে এই সত্যটিকে উপেক্ষা করে ভুল করেছেন বলে সমালোচকদের ধারণা।

সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনকে সমালোচনা করা ভুল

(৪) গান্ধীজীর ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের তত্ত্বটি গ্রহণযোগ্য হলেও তিনি যেভাবে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেছেন তা সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ এর ভৌগোলিক ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা সমাজের সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধান করা যায় না। উপরন্তু, এর ফলে আঞ্চলিকতা এবং প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণ মনোভাব সমাজকে বিশৃঙ্খলার মধ্যে ঠেলে দিতে পারে।

ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণের দুর্বলতা

(৫) সর্বোদয় প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। কিন্তু সমালোচকেরা মনে করেন যে, আধুনিক সমাজের মধ্যে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের প্রবর্তন শুধু অসম্ভবই নয়, অকাম্যও বটে।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের প্রবর্তন অসম্ভব

(৬) গান্ধীজীর সর্বোদয় চিন্তায় মধ্যে শ্রেণী-দ্বন্দ্বের পরিবর্তে শ্রেণী সমঝোতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মার্কসবাদীদের মতে, বৈষম্যমূলক সমাজে শ্রেণী-দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। গান্ধীজী এই বাস্তব সত্যটিকে উপেক্ষা করে কার্যতঃ ইতিহাসকেই অস্বীকার করেছেন।

ইতিহাসকে অস্বীকার

(৭) গান্ধীজীর ঈপ্সিত সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে সত্য এবং অহিংসার মাধ্যমে। কিন্তু যে-সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ এক এবং অভিন্ন নয়, সেই সমাজে সত্য এবং অহিংসার স্থান কোথায়? ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রতিটি সমাজে শাসকশ্রেণী সহিংসভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে নিজেদের পদানত করে রেখেছে। ঐসব শাসকশ্রেণীর বিবেকের কাছে আবেদন-নিবেদন করে শোষিত শ্রেণী কখনই তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। তাই বিভিন্ন যুগে ঘটেছে সমাজবিপ্লব। এমনকি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেও গান্ধীজীর অহিংস নীতির পাশাপাশি চলেছিল সহিংস সংগ্রাম।

সত্য ও অহিংসা তত্ত্বের অবাস্তবতা

এইভাবে গান্ধীজীর সর্বোদয় আদর্শের মধ্যে নানাপ্রকার ত্রুটিবিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলেও অনেকেই এরূপ আদর্শকে উন্নত সমাজগঠনের অপরিহার্য সোপান বলে মনে করেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

সংবিধান বা শাসনতন্ত্র

[Constitution]

১। সংবিধানের সংজ্ঞা (Definition of Constitution)

প্রতিটি সংগঠন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কতকগুলি সাধারণ নিয়মকানুনের প্রয়োজন। এই সব নিয়মকানুন না থাকলে সংগঠনের উদ্দেশ্যসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে না। রাষ্ট্র হোল মানুষের রাজনৈতিক সংগঠন। মানুষের রাজনৈতিক জীবনকে পরিপূর্ণ বিকাশের পথে এগিয়ে দেওয়াই হোল রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। এই উদ্দেশ্যের সাফল্য নির্ভর করে কতকগুলি রাজনৈতিক নিয়মকানুন সৃষ্টি ও তাদের যথাযথ প্রয়োগের উপর। এইসব নিয়মকানুন না থাকলে রাষ্ট্রীয় জীবনে বিশৃংখলা দেখা দেবে; দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি ব্যাহত বা বিনষ্ট হবে। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় মৌলিক নিয়মকানুনসমূহের সমষ্টিকে সংবিধান বা শাসনতন্ত্র বলা হয়।

সংবিধানের সংজ্ঞা

কিন্তু সংবিধানের একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্দেশ করা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের পক্ষে অদ্যাবধি সম্ভব হয়নি। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টট্ল (Aristotle)-এর মতে, সংবিধান হোল রাষ্ট্রের চরম কর্তৃত্বের শৃংখলাবদ্ধকরণ। উল্‌সে (Woolsey)-এর ভাষায়, সংবিধান হোল সেই সব নীতির একত্রীকরণ যেগুলি অনুসারে সরকারের ক্ষমতা, জনসাধারণের অধিকার এবং শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়ে থাকে। ব্রাইস (Bryce) বলেন, সংবিধান হোল সেইসব আইনকানুন ও রীতিনীতির সমষ্টি, যেগুলি রাষ্ট্রের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। গিলক্রিস্ট (Gilchrist)-এর মতে, সংবিধান হোল কতকগুলি লিখিত বা অলিখিত নিয়ম যেগুলির দ্বারা সরকার গঠিত হয়, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বন্টিত হয় এবং ঐ সব বিভাগের কার্যক্ষেত্র নির্দিষ্ট করা হয়। ফাইনার (Finer) সংবিধান বলতে মূল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাকে বোঝাতে চেয়েছেন। লোয়েনস্টাইনের মতে, সংবিধান হোল রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার একটি প্রধান যন্ত্র মাত্র। বেঞ্জামিন অ্যাক্‌জিন সংবিধানকে 'দলিল' বলে বর্ণনা করলেও তিনি একথা স্বীকার করেন যে, সংবিধান সব সময়ই যে 'দলিল' হবে এমন কোন কথা নেই। প্রথাগত নিয়মকানুন অনেক সময় সুনির্দিষ্টভাবে গৃহীত হলে তা সংবিধান হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করে।

পরস্পর-বিরোধী সংজ্ঞা

সাম্প্রতিককালে মার্কসবাদীরা সংবিধানকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বলেন যে, ধনবৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সংবিধান হোল ধনিক-বণিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে সৃষ্ট কতকগুলি নিয়মকানুন। এই নিয়মকানুন রাষ্ট্রের প্রতিটি বিভাগের কার্যক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে এবং কিভাবে এইসব বিভাগ পরিচালিত হবে

তার নির্দেশ দেয়। বস্তুতঃ একটি রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্রের প্রতিফলন সেই রাষ্ট্রের সংবিধানের উপর পড়ে। তাই প্রতিটি রাষ্ট্রের সংবিধান বিচারবিশ্লেষণ করলে সেই রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণীর শ্রেণীচরিত্র সহজেই উপলব্ধি করা যেতে পারে।

উপরি-উক্ত পরস্পর-বিরোধী সংজ্ঞাগুলি আলোচনা করলে সংবিধানের প্রকৃত স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠে। তা হোল—সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি মৌলিক নীতিকে সংবিধান বা শাসনতন্ত্র (Constitution) বলা হয়।

অনেক সময় আবার ব্যাপক ও সংকীর্ণ—উভয় অর্থে সংবিধান কথাটির প্রয়োগ দেখা যায়। ব্যাপক অর্থে সংবিধান বলতে কোন দেশের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী লিখিত ও অলিখিত সর্বপ্রকার নিয়মকানুনকে বোঝায়। লিখিত নিয়মকানুন বলতে আইন এবং অলিখিত নিয়মকানুন বলতে প্রথা, প্রচলিত রীতিনীতি, আচারব্যবহার প্রভৃতি বোঝায়। যদিও প্রথা, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি আইনের মত আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়, তথাপি প্রতিটি দেশের শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে এগুলির ভূমিকা বা গুরুত্বকে কোনভাবেই অস্বীকার বা উপেক্ষা করা যায় না। তাই কোন দেশের সংবিধানকে যথার্থভাবে বুঝতে হলে সেই দেশের অলিখিত নিয়মকানুনগুলিকে সমভাবে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করতে হবে।

ব্যাপক অর্থে সংবিধান

অনেকে কিন্তু এই ব্যাপক অর্থে সংবিধানকে গ্রহণ করতে সম্মত নন। তাঁদের মতে, সংবিধান হোল সেই সব লিখিত মৌলিক আইনকানুন যেগুলির দ্বারা সরকারের গঠন, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সংগঠন, ক্ষমতা ও সম্পর্ক নির্ণয় এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকদের সম্পর্ক প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়। যে সব রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সংকীর্ণ অর্থে সংবিধান কথাটি প্রয়োগ করার পক্ষপাতী, তাঁরা সাংবিধানিক আইন (Constitutional Law)-কে আইনসভা-প্রণীত সাধারণ আইন (Ordinary Law) অপেক্ষা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, সাধারণ আইন পরিবর্তনের জন্য যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, সেই পদ্ধতি অনুসারে সংবিধান পরিবর্তন করা যায় না। সংবিধান পরিবর্তন করার জন্য এক্ষেত্রে "বিশেষ পদ্ধতি" (Special Procedure) অনুসরণ করার কথা তাঁরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন।

সংকীর্ণ অর্থে সংবিধান

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যে-সব দেশে সংকীর্ণ অর্থে সংবিধানকে গ্রহণ করা হয়েছে, সেই সব দেশেরও প্রথা, রীতিনীতি, বিচারালয়ের রায় প্রভৃতি আলোচনা না করলে শাসনব্যবস্থার প্রকৃত স্বরূপ যথার্থভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে রাজনৈতিক দল, রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ নির্বাচন, কংগ্রেসের (কেন্দ্রীয় আইনসভা) কমিটি ব্যবস্থা প্রভৃতির কোন উল্লেখ নেই। এগুলি মূলতঃ শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি, বিচারালয়ের রায় প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তাই কোন সংবিধানের প্রকৃত স্বরূপ জানতে হলে তার সামগ্রিক বিচারবিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন।

সামগ্রিক বিচারের মাধ্যমে সংবিধানের স্বরূপ উপলব্ধি সম্ভব

২ । সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Constitution)

সংবিধানের শ্রেণীবিভাগের প্রশ্নে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অনেকে গতানুগতিকভাবে সংবিধানকে প্রধানতঃ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, যথা—১. লিখিত ও অলিখিত সংবিধান এবং ২. সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান। কিন্তু লোয়েনস্টাইন সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারবিশ্লেষণ করে সংবিধানকে, ক. মৌলিক ও মৌলিকতাহীন সংবিধান, খ. নীতি-সংবন্ধ ও নিরপেক্ষ সংবিধান এবং গ. আদর্শনিষ্ঠ, নামীয় ও শব্দগত বিচারে উত্তীর্ণ সংবিধান—এই তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। কোভাকস্ প্রমুখ মার্কসবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সংবিধানকে প্রধানতঃ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করার পক্ষপাতী, যথা—১. বুর্জোয়া সংবিধান এবং ২. শ্রমিকশ্রেণীর সংবিধান।

সংবিধানের গতানুগতিক ও আধুনিক শ্রেণীবিভাগ

(১) লিখিত ও অলিখিত সংবিধান (Written and Unwritten Constitution) : অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সংবিধানকে লিখিত ও অলিখিত এই দুভাগে বিভক্ত করার পক্ষপাতী। যে-দেশের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত মৌলিক নীতিগুলির অধিকাংশ বা সবগুলি একটি বা কয়েকটি দলিলে লিপিবদ্ধ করা থাকে তাকে লিখিত সংবিধান বলে। কোন এক সময় এইসব শাসনতান্ত্রিক মৌলিক নীতিগুলিকে লিপিবদ্ধ করার জন্য একটি সংবিধান পরিষদ (Constituent Assembly) বা কনভেনশন (Convention) আহূত হয়। এই পরিষদ বা কনভেনশন সংবিধান প্রস্তুত করে আনুষ্ঠানিকভাবে সেটি ঘোষণা করে।

লিখিত সংবিধান বলতে কি বোঝায়

উল্লেখযোগ্য যে, লিখিত সংবিধানের বিধানগুলি প্রথা, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে না। ভারতবর্ষ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশের সংবিধান লিখিত সংবিধানের উদাহরণ।

অপরদিকে শাসন সংক্রান্ত মৌলিক নীতিগুলি যখন প্রথা, আচারব্যবহার, রীতি-নীতি, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে, তখন তাকে অলিখিত সংবিধান (Unwritten Constitution) বলা হয়। অলিখিত সংবিধানে শাসন-সংক্রান্ত মৌলিক নীতিগুলিকে কোন সংবিধান পরিষদ বা কনভেনশন আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে না। এরূপ সংবিধান রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্ট হয়। ইংল্যান্ডের সংবিধান অলিখিত সংবিধানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অলিখিত সংবিধান বলতে কি বোঝায়

(২) সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান (Flexible and Rigid Constitution) : লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানগণ সংবিধানকে লিখিত ও অলিখিত—এই দু'ভাগে বিভক্ত করাকে অবৈজ্ঞানিক এবং অযৌক্তিক বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, সংশোধন পদ্ধতির পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে সংবিধানকে সুপরিবর্তনীয় (Flexible) এবং দুষ্পরিবর্তনীয় (Rigid)—এই দুভাগে বিভক্ত

সুপরিবর্তনীয় সংবিধান বলতে কি বোঝায়

করাই বিজ্ঞানসম্মত; অধ্যাপক ডাইসি (Dicey)-কে অনুসরণ করে বলা যায়, আইনসভা যে পদ্ধতি অনুসরণ করে দেশের সাধারণ আইন প্রণয়ন ও পরিবর্তন করে সেই পদ্ধতি অনুসারে যদি সংবিধান পরিবর্তিত বা সংশোধিত হয় তবে সেই সংবিধানকে সুপরিবর্তনীয় সংবিধান বলা যায়। এরূপ সংবিধানের ধারাগুলি পরিবর্তনের জন্য কোন 'বিশেষ পদ্ধতি' (Special Procedure) অবলম্বন করার প্রয়োজন হয় না। অন্যভাবে বলা যায় যে, আইনসভা যখন সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সংবিধান সংশোধন করতে পারে, তখন তাকে সুপরিবর্তনীয় সংবিধান বলে। গ্রেট ব্রিটেন, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশের সংবিধান এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলতে কি বোঝায়

অপরদিকে সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতি অনুসারে যে সংবিধানকে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায় না, তাকে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলা হয়। এরূপ সংবিধানের যে-কোন অংশের পরিবর্তনের জন্য 'বিশেষ পদ্ধতি' অনুসরণ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

(৩) **মৌলিক ও মৌলিকতাবিহীন সংবিধান (Original and Derivative Constitution)**: লোয়েনস্টাইন সংবিধানকে মৌলিক ও মৌলিকতাবিহীন—এই দুভাগে বিভক্ত করেছেন। যে-সব সংবিধানের মধ্যে মৌলিকত্ব রয়েছে অর্থাৎ যে সব সংবিধান রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কে একটি কার্যকরী পন্থা প্রকৃত সৃজনশীল উপায়ে নির্ধারণ করে সেগুলিকে তিনি মৌলিক সংবিধান বলে অভিহিত করেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের সংবিধান এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

মৌলিক সংবিধানের সংজ্ঞা

কিন্তু যে-সব দেশের সংবিধান অন্যান্য রাষ্ট্রের সংবিধানের অনুকরণে তৈরি হয় অর্থাৎ যাদের মধ্যে স্বকীয়তা নেই, সেগুলিকে মৌলিকতাবিহীন সংবিধান বলা হয়। ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশের সংবিধান মৌলিকতাবিহীন সংবিধানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মৌলিকতাবিহীন সংবিধানের সংজ্ঞা

৪) **নীতিসংবদ্ধ ও নিরপেক্ষ সংবিধান (Idiologically Pragramatic and Neutral Constitution)**: কতকগুলি নীতি বা আদর্শকে ভিত্তি করে যে-সব সংবিধান রচিত হয়, তাদের নীতিসংবদ্ধ সংবিধান বলা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন, গণ-সাধারণতন্ত্রী চীন প্রভৃতি দেশের সংবিধান এরূপ সংবিধানের উদাহরণ।

নীতিসংবদ্ধ সংবিধানের সংজ্ঞা

কিন্তু যে সব সংবিধান বিশেষ কোন রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি অনুরক্ত না থেকে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিগুলির বিরোধকে আইনমাফিক উপায়ে সংযত করে, তাদের আদর্শ-নিরপেক্ষ সংবিধান বলে আখ্যা দেওয়া হয়। প্রচলিত সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সংরক্ষণ করে দেশের মধ্যে স্থিতাবস্থা বজায় রাখাই হোল এই সংবিধানের উদ্দেশ্য। ফ্রান্সের তৃতীয় ও চতুর্থ রিপাবলিকের সংবিধান, ফেডারেল রিপাবলিক অব্ জার্মানির বর্তমান সংবিধান ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

নিরপেক্ষ সংবিধানের সংজ্ঞা

(৫) **আদর্শনিষ্ঠ, নামীয় ও শব্দগত বিচারে উত্তীর্ণ সংবিধান (Normative, Nominal and Semantic Constitution) :** লোয়েনস্টাইন তত্ত্বগত দিক থেকে সংবিধানকে আদর্শনিষ্ঠ, নামীয় এবং শব্দগত বিচারে উত্তীর্ণ—এই তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। যখন কোন রাষ্ট্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিগুলি সাংবিধানিক নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হয়, তখন সেই রাষ্ট্রের সংবিধানকে আদর্শনিষ্ঠ সংবিধান বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, যখন কোন দেশের সাংবিধানিক জগৎ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক জগতের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য থাকে না, তখনই সংবিধানকে আদর্শনিষ্ঠ সংবিধান বলে অভিহিত করা হয়।

আদর্শনিষ্ঠ সংবিধানের সংজ্ঞা

কিন্তু সাংবিধানিক আদর্শগুলির সঙ্গে যখন সামাজিক ও রাজনৈতিক জগতের বিশেষ কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন সেই সংবিধানকে নামীয় সংবিধান বলা হয়।

নামীয় সংবিধানের সংজ্ঞা

শব্দগত বিচারে উত্তীর্ণ সংবিধান হোল সেই সংবিধান যা তত্ত্বের ধার না ধেরে ক্ষমতাকেন্দ্রগুলিকে ক্ষমতাশীল রাখতে সাহায্য করে। লোয়েনস্টাইন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সংবিধানকে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে বর্ণনা করেন।

শব্দগত বিচারে উত্তীর্ণ সংবিধানের সংজ্ঞা

(৬) **বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণীর সংবিধান (Bourgeois and Working Class Constitution) :** কোভাকস্ সংবিধানকে প্রধানতঃ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন, যথা—ক. বুর্জোয়া সংবিধান এবং খ. শ্রমিকশ্রেণীর সংবিধান। যে সংবিধান বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে, তাকে বুর্জোয়া সংবিধান এবং যে সংবিধান শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে, তাকে শ্রমিকশ্রেণীর সংবিধান বলে তিনি অভিহিত করেছেন।

বুর্জোয়া ও শ্রমিক শ্রেণীর সংবিধানের সংজ্ঞা

৩। লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের পার্থক্য (Distinction between Written and Unwritten Constitution)

লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা সহজ হয়। এই পার্থক্যগুলি হোল : (১) সংবিধান পরিষদ বা কনভেনশন কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে লিখিত সংবিধান ঘোষিত হয়। কিন্তু অলিখিত সংবিধান এইভাবে ঘোষিত হয় না। প্রথা, আচারব্যবহার, রীতিনীতি, বিচারালয়ের রায় প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে এরূপ সংবিধান গড়ে উঠে।

লিখিত সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয়

(২) লিখিত সংবিধানে সাংবিধানিক আইন হোল দেশের সর্বোচ্চ আইন। তাই সরকার-সৃষ্ট আইন যদি সংবিধান-বিরোধী হয় তবে তা বাতিল হয়ে যায়। তাছাড়া লিখিত সংবিধান পরিবর্তন ও সংশোধন করতে হলে 'বিশেষ পদ্ধতি' অনুসরণ করতে হয়; সাধারণ আইন-প্রণয়নের পদ্ধতি অনুসারে এরূপ সংবিধান

সংশোধন করা যায় না। বলা বাহুল্য যে, লিখিত সংবিধান চরিত্রগতভাবে দুষ্পরিবর্তনীয় (Rigid) হয়ে থাকে। কিন্তু অলিখিত সংবিধানের বিধানগুলি সুপরিবর্তনীয় (Flexible) হওয়ার জন্য সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতি অনুসারে আইনসভা কর্তৃক সেগুলি অতি সহজেই সংশোধিত বা পরিবর্তিত হতে পারে। তাই মর্যাদা ও গুরুত্বের দিক থেকে বিচার করে অনেকে লিখিত সংবিধানকে অলিখিত সংবিধান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন।

লিখিত সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় কিন্তু অলিখিত সংবিধান সুপরিবর্তনীয়

(৩) লিখিত সংবিধান যেহেতু দেশের সর্বোচ্চ আইন, সেহেতু সরকার সব সময় সংবিধান অনুসারে কাজ করতে বাধ্য থাকে। খেয়ালখুশিমতো সরকারের পক্ষে কোন আইন প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। কিন্তু অলিখিত সংবিধানে যেহেতু আইনসভা রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী সেহেতু সরকার যে-কোন আইন যে-কোন সময় প্রণয়ন করতে পারে। অন্যভাবে বলা যায় যে, লিখিত সংবিধানে সাংবিধানিক আইন এবং সাধারণ আইনের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয়; কিন্তু অলিখিত সংবিধানে এরূপ কোন পার্থক্য নির্ণয় করা হয় না।

লিখিত সংবিধানে সাংবিধানিক আইন ও আধুনিক আইনের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয়; কিন্তু অলিখিত সংবিধানে তা করা হয় না

(৪) লিখিত সংবিধানে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী নির্দিষ্ট করা থাকে। ফলে এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজ করতে পারে না। তাছাড়া সরকারের কোন বিভাগ যদি গণ্ডি-বহির্ভূত সংবিধান-বিরোধী কোন কাজ করে তবে সে বিষয়ে যে-কোন ব্যক্তি আদালতের শরণাপন্ন হতে পারে। দেশের সর্বোচ্চ আদালত উক্ত বিভাগের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষা করতে সমর্থ। কিন্তু অলিখিত সংবিধানে বিচার বিভাগের হস্তে কার্যতঃ এরূপ কোন ক্ষমতা অর্পণ করা হয় না। আইন বিভাগ যেসব আইন প্রণয়ন করে সেগুলিকে বাতিল করার কোন ক্ষমতা বিচার বিভাগের থাকে না।

লিখিত সংবিধানে বিচার বিভাগের প্রাধান্য দেখা যায় কিন্তু অলিখিত সংবিধানে আইন বিভাগের প্রাধান্য দেখা যায়

কিন্তু লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা অবৈজ্ঞানিক এবং অযৌক্তিক বলে অনেকে মনে করেন। অধ্যাপক গেটেল (Gettel)-এর মতে, লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের মধ্যে পার্থক্য মাত্রাগত, মূলগত নয় ("One of degree rather than of kind")। কারণ প্রথমতঃ পৃথিবীর প্রতিটি লিখিত সংবিধান আলোচনা করলে দেখা যায় যে ঐ সকল সংবিধানেরও বহু অলিখিত অংশ আছে যেগুলি প্রথা, আচারব্যবহার, রীতিনীতি প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লিখিত সংবিধানে কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতি, দল-প্রথা, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের ক্ষমতা, কেবিনেট ব্যবস্থা প্রভৃতির উল্লেখ না থাকলেও সেগুলি প্রথা, রীতিনীতি প্রভৃতির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।

লিখিত সংবিধানের অলিখিত অংশ থাকে; আবার অলিখিত সংবিধানেরও লিখিত অংশ থাকে

আবার অলিখিত সংবিধানেরও কিছু কিছু লিখিত অংশ থাকে। যেমন ইংল্যান্ডের

সংবিধান অলিখিত হলেও ১২১৫ সালের 'মহাসনদ' (The Great Charter of 1215), ১৬৮৯ সালের 'অধিকারের বিল' (The Bill of Rights, 1689), ১৯১১ ও ১৯৪৯ সালের 'পার্লামেন্ট আইন' (Perliamentary Acts of 1911 and 1949) প্রভৃতি সংবিধানের লিখিত অংশ।

দ্বিতীয়তঃ অনেকের মতে, অলিখিত সংবিধান যেহেতু প্রথাভিত্তিক সেইহেতু লিখিত সংবিধানের মত আইনসভার কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করার কোন ক্ষমতা তার নেই। কিন্তু এই অভিযোগও সত্য নয়। কারণ অনেক সময় প্রথাগুলি আইন অপেক্ষা অধিকতর কার্যকরী হতে পারে। যেমন, ইংল্যান্ডে প্রথাগত নিয়ম আছে যে, বৎসরে অন্ততঃ একবার পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করতে হবে। যদি এই প্রথাকে অমান্য করা হয় তাহলে সরকারের বার্ষিক আয়ব্যয় নির্বাহ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে শাসনক্ষেত্রে বিপর্যয় নেমে আসবে। সুতরাং প্রথাভিত্তিক আইন সব সময় আইনসভা-প্রণীত আইন অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ—একথা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই।

অলিখিত সংবিধানের প্রথা, রীতিনীতি প্রভৃতি লিখিত সংবিধানের আইন-সভাপ্রণীত আইনের মতই গুরুত্বপূর্ণ

তৃতীয়তঃ সংবিধান লিখিত হলে ব্যক্তিস্বাধীনতা অধিক পরিমাণে সংরক্ষিত হয় বলে অনেকের ধারণা। কিন্তু তাও সত্য নয়। কারণ ব্যক্তিস্বাধীনতার সংরক্ষক সংবিধান নয়। সচেতন জনগণই ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রকৃত রক্ষক। ইংল্যান্ডের সংবিধান অলিখিত হলেও ইংরেজরা অন্য কোন দেশের জনগণ অপেক্ষা কম স্বাধীনতা ভোগ করে না। তাছাড়া, অনেকে মনে করেন যে, শ্রেণীবৈষম্যমূলক সমাজে সংবিধান যেহেতু ধনিকশ্রেণীর দ্বারা রচিত ও ঘোষিত হয় সেহেতু এরূপ সংবিধান লিখিত হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র জনসাধারণ বাস্তবে বিশেষ কোন স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না।

সংবিধানে লিখিত হলে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষিত হয়—একথা সত্য নয়

৪। লিখিত সংবিধানের গুণাগুণ (Merits and Demerits of Written Constitution)

গুণ ঃ লিখিত সংবিধানের কতকগুলি গুণ অতি সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এগুলি হোল ঃ

(ক) লিখিত সংবিধান সংবিধান-পরিষদ বা অনুরূপ কোন বিশেষ সংস্থা কর্তৃক প্রণীত হয়। অনেক আলাপ-আলোচনা, তর্কবিতর্কের পর এরূপ সংবিধান ঘোষিত হয় বলে সংবিধানের বিধানগুলি সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট ও বোধগম্য হয়। ফলে সরকার ও জনসাধারণ উভয়েই নিজ নিজ অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত থাকেন।

সংবিধানের বিধান-গুলি সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট এবং বোধগম্য

(খ) লিখিত সংবিধান অলিখিত সংবিধান অপেক্ষা অনেক বেশী স্থায়ী। নিজ খেয়াল-খুশীমতো কিংবা আবেগপ্রবণ জনগণের চাপে পড়েও সরকার সহজে সংবিধান পরিবর্তন করতে পারে না। এই পরিবর্তনের জন্য "বিশেষ পদ্ধতি' অনুসরণের প্রয়োজন।

স্থায়িত্ব

(গ) জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ লিখিত সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকে। যেহেতু এরূপ সংবিধান সহজে পরিবর্তন করা যায় না সেহেতু ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ইচ্ছা করলেই স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে না বা জনগণের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। অন্যভাবে বলা যায় যে, গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখার জন্য লিখিত সংবিধানের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে

(ঘ) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সাফল্য বহু পরিমাণে নির্ভর করে লিখিত সংবিধানের উপর। কারণ এরূপ শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বন্টন সংবিধান অনুসারে করা হয়। সংবিধান লিখিত অবস্থায় না থাকলে ক্ষমতার প্রশ্নে যে-কোন সময় কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের বিরোধ উপস্থিত হতে পারে। তাছাড়া, কেন্দ্র খেয়ালখুশি মতো রাজ্যসরকারগুলির ক্ষমতা নিজ কুক্ষিগত করতে পারে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে যায়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সাফল্যের জন্য লিখিত সংবিধান প্রয়োজন

দোষ বা ত্রুটি: লিখিত সংবিধানের সর্বাপেক্ষা প্রধান ত্রুটি হোল এর দুষ্পরিবর্তনীয়তা। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে সংবিধান পরিবর্তন করা সহজসাধ্য হয় না বলে অনেক সময় এরূপ সংবিধানের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ-আন্দোলন বা বিক্ষোভ দেখা দিতে পারে। ফলে সরকারের অস্তিত্ব বজায় রাখা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

দুষ্পরিবর্তনীয়তার জন্য গণ-বিক্ষোভ দেখা দিতে পারে

মৌলিক অধিকারসমূহ সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হলেই যে জনসাধারণ পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে এমন কোন কথা নেই। শ্রেণী-বৈষম্যমূলক সমাজে জনগণের রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাবে কার্যতঃ মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তাছাড়া, জনগণের সদাজাগ্রত দৃষ্টি এবং আত্মসচেতন মনোভাবই স্বাধীনতার প্রকৃত রক্ষাকবচ। ইংল্যান্ডের সংবিধান অলিখিত বলে ইংরেজরা অন্য জাতি অপেক্ষা কম স্বাধীনতা ভোগ করে একথা কোনোভাবেই বলা যায় না।

শ্রেণীবৈষম্যমূলক সমাজে লিখিত সংবিধান জনগণের স্বাধীনতা রক্ষা করতে অক্ষম

৫। অলিখিত সংবিধানের গুণাগুণ (Merits and Defects of Unwritten Constitution)

গুণ: ১ অলিখিত সংবিধানের সর্বাপেক্ষা বড় গুণ হোল এর নমনীয়তা। পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য এরূপ সংবিধান সহজে পরিবর্তন করা যায়। ফলে ক্ষমতাসীন দল জনমতের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করে অতি সহজেই সংবিধান পরিবর্তন করে সরকারের অস্তিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হয়। গণবিক্ষোভ বা গণবিদ্রোহ প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

সুপরিবর্তনীয়তার জন্য গণবিক্ষোভ প্রকাশ পায় না

(২) অলিখিত সংবিধান সুপরিবর্তনীয় হওয়ার জন্য দেশের আপৎকালীন অবস্থায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দ্রুত গ্রহণ করা সম্ভব হয়। ফলে এরূপ সংবিধান একদিকে যেমন জনপ্রিয় হয়ে উঠে, অন্যদিকে তেমনি জাতীয় প্রয়োজনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

আপৎকালীন অবস্থায় বিশেষ উপযোগী

দোষ : কিন্তু অলিখিত সংবিধানের ত্রুটিগুলিও উপেক্ষা করা যায় না।

(১) এরূপ সংবিধান সহজে পরিবর্তনশীল বলে শাসকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যে-কোন সময় সংবিধান সংশোধন করতে পারে। আবার জনসাধারণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কিংবা তাদের ভাবাবেগ ও উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য অকারণে বার বার সংবিধান সংশোধিত হলে সংবিধানের মূল উদ্দেশ্যগুলি অনেক সময় পরিবর্তিত হয়ে যায়। ফলে কল্যাণকর না হয়ে সংবিধান অকল্যাণকর হয়ে পড়ে।

সুপরিবর্তনীয়তা-জনিত ত্রুটি

(২) অলিখিত সংবিধান আবার অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট বলে অনেকে অভিমত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, এরূপ সংবিধান অস্পষ্ট হওয়ার জন্য জনগণ নিজেদের অধিকারের সীমারেখা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে অজ্ঞ থাকে। ফলে সরকার যথেচ্ছভাবে তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলেও জনগণ তার প্রতিবিধানের জন্য অগ্রসর হতে পারে না। জনগণের এই অজ্ঞতার সুযোগে ক্ষমতাসীন দল বা গোষ্ঠী প্রশাসনকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়। অলিখিত সংবিধান গণতন্ত্র-বিরোধী বলে অনেকে মনে করেন।

অস্পষ্টতা জনিত ত্রুটি : গণতন্ত্র বিরোধী

(৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার পক্ষে অলিখিত সংবিধান বিশেষভাবে অকাম্য। কারণ কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন সম্পর্কিত নীতিগুলি যদি সুস্পষ্টভাবে সংবিধানে লিখিত না থাকে তাহলে যে-কোন সময় উভয় সরকারের মধ্যে বিরোধ উদ্ভূত হতে পারে। তাছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারগুলির ক্ষমতা ধীরে ধীরে নিজ কুক্ষিগত করে নিতে পারে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা এক-কেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় রূপান্তরিত হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার উপযোগী নয়

(৪) অলিখিত সংবিধান শাসনতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নিরূপণ করে না। অনেকের মতে, এর ফলে বিচার বিভাগ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কারণ বিচার বিভাগ তখন সংবিধান অনুসারে বিচারকার্য সম্পাদন না করে প্রচলিত রীতিনীতি, প্রথা প্রভৃতি অনুসারে বিচারকার্য পরিচালনা করে।

শক্তিশালী বিচার বিভাগ

উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, লিখিত কিংবা অলিখিত কোন সংবিধানই সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি সভ্য দেশে সংবিধানকে লিখিত অবস্থায় গ্রহণ করার প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বস্তুতঃ সংবিধান লিখিত ও সুস্পষ্ট হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে লিখিত সংবিধানকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার মত ব্যবস্থা সব সংবিধানের

উপসংহার

মধ্যেই রাখা প্রয়োজন। অন্যথায় সংবিধান প্রাণহীন জড় পদার্থের পর্যায়েই থেকে যাবে।

৬। সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Flexible and Rigid Constitutions)

সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য নিরূপণ করা যেতে পারে। পার্থক্যগুলি হোল ঃ

(১) সুপরিবর্তনীয় সংবিধানে আইনসভা সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতে সংবিধান সংশোধন করতে পারে। কিন্তু দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানে সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতে সংবিধান সংশোধন করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধনের জন্য 'বিশেষ পদ্ধতি' অনুসরণ করতে হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, সুপরিবর্তনীয় সংবিধান সংশোধনের জন্য আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনই যথেষ্ট। কিন্তু দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান সংশোধনের জন্য সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট অপেক্ষা অনেক বেশী ভোটের প্রয়োজন।

সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতিগত পার্থক্য

(২) সুপরিবর্তনীয় সংবিধানে সাংবিধানিক আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নিরূপণ করা হয় না। কিন্তু দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানে সাধারণ আইন ও সাংবিধানিক আইনের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয়। তাছাড়া, এরূপ সংবিধানে সাধারণ আইন অপেক্ষা সাংবিধানিক আইনের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অনেক বেশী।

সাংবিধানিক ও সাধারণ আইনের মধ্যে মর্যাদাগত প্রশ্নে পার্থক্য

(৩) সুপরিবর্তনীয় সংবিধানে সাধারণ আইন ও সাংবিধানিক আইনের উৎস এক এবং অভিন্ন। কিন্তু দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানে সাংবিধানিক আইনের উৎস সাধারণ আইনের উৎসের মত নয়।

উভয় প্রকার আইনের উৎস এক নয়

(৪) দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানমাত্রই লিখিত হয়। কিন্তু সুপরিবর্তনীয় সংবিধান লিখিত ও অলিখিত দুই-ই হতে পারে।

দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান লিখিত

(৫) সুপরিবর্তনীয় সংবিধানে আইনসভাই সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী। কারণ উক্ত সংবিধানে আইনসভার কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোন উচ্চতর আইন থাকে না। কিন্তু দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানে আইনসভাকে সংবিধানের নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে আইন প্রণয়ন করতে হয়। এক্ষেত্রে সংবিধান হোল সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী।

সুপরিবর্তনীয় সংবিধানে আইনসভা সার্বভৌম

(৬) সুপরিবর্তনীয় সংবিধানে যেহেতু আইনসভাই সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী, সেহেতু আইনসভা-প্রণীত আইনের যাথার্থ্য নিরূপণ করার ক্ষমতা বিচার বিভাগের থাকে না। কিন্তু দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানে বিচার বিভাগের প্রাধান্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। আইনসভা সংবিধান-বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করলে বিচার বিভাগ তা বাতিল করে দিতে পারে।

দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানে বিচার বিভাগের প্রাধান্য কিন্তু সুপরিবর্তনীয় সংবিধানে আইনসভার প্রাধান্য

(৭) দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ লিপিবদ্ধ করা থাকে বলে অনেকে এরূপ সংবিধানকে গণতান্ত্রিক সংবিধান বলে অভিহিত করেন। অপরপক্ষে সুপরিবর্তনীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলি লিখিত অবস্থায় না থাকার জন্য এরূপ সংবিধানকে অগণতান্ত্রিক সংবিধান বলে আখ্যা দেওয়া হয়।

দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান গণতান্ত্রিক : সুপরিবর্তনীয় সংবিধান অগণতান্ত্রিক

কিন্তু লাওয়েল (Lowell)-এর মতে, "সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের মধ্যে পার্থক্য মাত্রাগত পার্থক্যমাত্র, মূলগত কোন পার্থক্য নয়। বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, কোন একটি সংবিধান সুপরিবর্তনীয় বা দুষ্পরিবর্তনীয় তা সংশোধন-পদ্ধতির মাপকাঠিতে বিচার করে বলা যায় না। কারণ দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানেও প্রথা, আচারব্যবহার, রীতিনীতি, বিচারালয়ের রায় প্রভৃতি তত্ত্বগতভাবে সংবিধানের পরিবর্তন করতে সক্ষম না হলেও বাস্তবে এগুলি সংবিধানের যথেষ্ট পরিবর্তন সাধন করতে পারে। সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হলে ঐগুলির সাহায্যে সংবিধান পরিবর্তনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। তখন এরূপ সংবিধান প্রকৃত অর্থে আর দুষ্পরিবর্তনীয় থাকে না।

উভয় প্রকার সংবিধানের মধ্যে মূলগত কোন পার্থক্য নেই

তাছাড়া সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোল কোন দেশের সংবিধান পরিবর্তন করা হবে কিনা তা সংশোধন-পদ্ধতির উপর যতখানি নির্ভরশীল তদপেক্ষা অনেক বেশী নির্ভর করে সমাজের প্রভাবশালী শ্রেণীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর। সংবিধান তাঁদের স্বার্থের অনুপন্থী হলে অতি বড় সুপরিবর্তনীয় সংবিধানেরও পরিবর্তন সাধন করা হয় না। আবার সংবিধান তাদের স্বার্থের পরিপন্থী হলে অতি বড় দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানও বারংবার পরিবর্তিত হতে পারে। এক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধনের আইনগত বা সংবিধান পরিবর্তনের পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, শাসকশ্রেণীর প্রয়োজনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অতি-মাত্রায় দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানেরও প্রথম দশটি সংশোধন অতি দ্রুত সম্পাদিত হয়েছিল।

৭। সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের গুণাগুণ (Merits and Defects of Flexible Constitutions)

গুণাগুণ : সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের দোষগুণ স্বভাবেই বিদ্যমান। এরূপ সংবিধানের উল্লেখযোগ্য গুণাবলী হোল :

(১) দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে এরূপ সংবিধানকে সহজে পরিবর্তন করা যায়। লর্ড ব্রাইস (Bryce)-এর মতে, বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা রাস্তার দিকে সম্প্রসারিত হলে যেমন সেগুলি অপসারিত করে যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা করা সম্ভব, তেমনি সুপরিবর্তনীয় সংবিধানকে জরুরী অবস্থায় সাময়িকভাবে পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও অবনমিত করে সময়োপযোগী করে নেওয়া সম্ভব। সংক্ষেপে

যুগোপযোগী করা সম্ভব

বলা যায় যে, পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করাই হোল এরূপ সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

(২) সমাজ যেমন পরিবর্তনশীল, তেমনি পরিবর্তশীল মানুষের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তাভাবনা ইত্যাদি। জনগণের মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য যদি সংবিধান পরিবর্তন করা না হয়, তবে তাদের মনের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ একদিন বিক্ষোভ এবং গণবিপ্লবের আকার ধারণ করতে পারে। এর ফলে রাষ্ট্র ও সরকারের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এদিক থেকে বিচার করে সুপরিবর্তনীয় সংবিধান বিক্ষোভ বা গণবিপ্লবের হাত থেকে সরকারকে রক্ষা করে দেশে শান্তিশৃংখলা প্রভৃতি বজায় রাখতে সক্ষম বলে মনে করা হয়।

বিক্ষোভ বা গণবিপ্লবের সম্ভাবনা থাকে না

দোষ ঃ কিন্তু সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের কয়েকটি ত্রুটি বিশেষ লক্ষণীয়, যথা ঃ

(ক) সহজে পরিবর্তনযোগ্য হওয়ার জন্য সুপরিবর্তনীয় সংবিধান অস্থায়ী বলে বিবেচিত হয়। সুদক্ষ রাজনীতিবিদরা সংবিধানকে হাতের পুতুলের মত যথেচ্ছভাবে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে সহজেই ব্যবহার করতে পারেন।

অস্থায়ী

(খ) তাছাড়া, জনগণ আবেগ ও উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে অনেক সময় সংবিধান সংশোধন করার দাবি জানাতে পারে। যেহেতু সংবিধান সংশোধন করা সহজসাধ্য, সেহেতু কেবলমাত্র জনগণকে সন্তুষ্ট করার জন্য শাসকগোষ্ঠী অনেক সময় সংবিধান সংশোধন করে অনেক মৌলিক নীতির পরিবর্তন সাধন করতে পারে।

সংবিধানের মৌলিক নীতিগুলি সহজে পরিবর্তিত হতে পারে

(গ) সুপরিবর্তনীয় সংবিধানে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রয়োজনমত সংবিধান সংশোধন করে নাগরিকদের অধিকারগুলি খর্ব করতে পারে। এর ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ যেমন বিনষ্ট হতে পারে, তেমনি নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিও বিলুপ্ত হতে পারে। তাই এরূপ সংবিধানকে অনেকে অগণতান্ত্রিক সংবিধান বলে অভিহিত করেন।

অগণতান্ত্রিক

৮। দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের গুণাগুণ (Merits and Defects of Rigid Constitution)

দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের গুণাগুণ উভয়ই সমভাবে বিদ্যমান। এরূপ সংবিধানের উল্লেখযোগ্য গুণাবলী হোল ঃ

(১) দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের সর্বাপেক্ষা প্রধান গুণ হল এর স্থায়িত্ব। সংবিধান রচিত হওয়ার পর তাকে সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা যায় না। ফলে জনসাধারণের ভাবাবেগ বা উচ্ছ্বাস কিংবা ক্ষমতাসীন দলের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে এরূপ সংবিধান সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের মত অতি সহজে আদৌ পরিবর্তন করা যায় না।

স্থায়িত্ব

(২) দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান লিখিত হয় বলে সাংবিধানিক নিয়মগুলি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হতে বাধ্য। তার ফলে শাসন পরিচালনার ভিত্তি অধিক পরিমাণে সুদৃঢ় হয়। এরূপ সংবিধান সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হওয়ার জন্য সরকার ও জনসাধারণ নিজ নিজ অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত থাকেন। ফলে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি খর্ব করা সহজসাধ্য হয় না। তাই অনেকে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানকে গণতন্ত্রের উপযোগী সংবিধান বলে বর্ণনা করেন।

গণতন্ত্রের পক্ষে বিশেষ উপযোগী

(৩) দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানে সাধারণ আইন ও সাংবিধানিক আইনের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয় এবং সাধারণ আইন অপেক্ষা সাংবিধানিক আইনকে অধিকতর মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। সে কারণে জনসাধারণ এরূপ সংবিধানকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেন।

সাধারণ আইন ও সংবিধানিক আইনের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ

(৪) দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে একান্তভাবেই প্রয়োজনীয়। যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন সংবিধানে লিখিত থাকে। সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছামত রাজ্যসরকারগুলির স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ করতে পারে না। কিন্তু সংবিধান সুপরিবর্তনীয় হলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলির স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট করে সমস্ত ক্ষমতা নিজে কুক্ষিগত করতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় উপযোগী

ত্রুটি : কিন্তু দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান একেবারে ত্রুটিমুক্ত বলে মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। এর ত্রুটিগুলি হোল :

ক. দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান পরিবর্তন করা সহজসাধ্য নয় বলে পরিবর্তিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে সক্ষম হয় না। ফলে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ, বিক্ষোভ প্রভৃতি আন্দোলন বা বিদ্রোহের আকার ধারণ করতে পারে। এর ফলে একদিকে দেশের শান্তিশৃঙ্খলা, অগ্রগতি প্রভৃতি যেমন ব্যাহত হয়, তেমনি রাষ্ট্র ও সরকারের অস্তিত্বও বিপন্ন হতে পারে। অনেক সময় আবার এরূপ সংবিধান জনকল্যাণকর সংস্কার সাধনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।

দুষ্পরিবর্তনীয়তা-জনিত ত্রুটি

খ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের মত দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানসমূহ সহজে পরিবর্তনযোগ্য নয় বলে এরূপ সংবিধান কার্যত বিচার বিভাগের হস্তের ক্রীড়নক হয়ে দাঁড়ায়: কারণ সংবিধানকে যুগোপযোগী করার জন্য বিচার বিভাগ সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করে। তাছাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচারপতিগণ কংগ্রেস-প্রণীত আইনের যৌক্তিকতা (reasonableness) বিচার করতে পারেন। অর্থাৎ কোন আইন ন্যায়সংগত বা যুক্তিসংগত কিনা তা বিচার করার ক্ষমতা তাঁদের আছে। কোন আইনকে তাঁরা যদি যুক্তিসংগত বলে মনে না করেন তবে তা বাতিল করে দিতে পারেন। কিন্তু কোন আইন ন্যায়সংগত বা যুক্তিসংগত কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিচারকদের সামাজিক অবস্থান ও মানসিক গঠন যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাব

বিচার বিভাগের অস্বাভাবিক প্রাধান্য

বিস্তার করে। বলা বাহুল্য, যেহেতু বিচারপতিগণ স্বভাবতই রক্ষণশীল মনোবৃত্তি-সম্পন্ন হন, সেহেতু সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদর্শনের সময়ও তাঁদের সেই সংকীর্ণ ও প্রগতি-বিরোধী মনোভাবের প্রতিফলন বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে আইনসভার কার্যে নানারূপ বাধা সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁরা সামাজিক অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত করেন।

উপসংহার

সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের মধ্যে ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষ্য করে অধ্যাপক ল্যাস্কি (Laski) উভয় প্রকার সংবিধানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, কোন একটি দেশের সংবিধান যেমন ব্রিটেনের সংবিধানের ন্যায় অত্যধিক সুপরিবর্তনীয় হওয়া উচিত নয়, তেমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের মত অত্যধিক দুষ্পরিবর্তনীয় হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়। সংবিধান পরিবর্তনের জন্য আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতি যথেষ্ট বলে তিনি মনে করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সংবিধানের গুণাগুণ তার সুপরিবর্তনীয়তা বা দুষ্পরিবর্তনীয়তার উপর নির্ভর করে না, গুণাগুণ নির্ভর করে সংবিধানের প্রকৃতি, চরিত্র এবং যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সাফল্য সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয় তার উপর। সংবিধানকে বিচার করতে হবে কোন্ ভবিষ্যৎ নীতি ও কর্মসূচীকে সংবিধান বাস্তবে রূপদান করতে চায় তার ভিত্তিতে। সংবিধান সুপরিবর্তনীয় বা দুষ্পরিবর্তনীয় যাই হোক না কেন, প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীগুলি তাকে ব্যবহার করে তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য। আবার যে-রাষ্ট্রে জনগণ প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী সেখানে সংবিধান যেরূপই হোক না কেন, জনগণ তাকে ব্যবহার করে সামাজিক অগ্রগতির হাতিয়ার হিসেবে। তাই বলা যেতে পারে যে, বর্তমান যুগে সুপরিবর্তনীয়তা বা দুষ্পরিবর্তনীয়তা সম্পর্কে বিতর্ক প্রায় অর্থহীন।

ঊনবিংশ অধ্যায়

সরকার ও তার বিভিন্ন রূপ

[Government and its different Forms]

১। সরকারের শ্রেণীবিভাগ ও তার সমস্যা (Classification of Government and its Problems)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জন্মলগ্ন থেকেই সরকারী কাঠামোর শ্রেণীবিভাজনের প্রচেষ্টা চলেছে। সরকারের শ্রেণীবিভাজনকে কেন্দ্র করে প্রাচীন ও আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল উদ্দেশ্য ও সংখ্যার দিক থেকে সরকার বা শাসনব্যবস্থাকে স্বাভাবিক (Normal) এবং বিকৃত (Perverted)—এই দু' ভাগে বিভক্ত করেছেন। জনকল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে যে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় তাকে তিনি 'স্বাভাবিক শাসনব্যবস্থা' এবং জনকল্যাণ সাধনের পরিবর্তে কেবলমাত্র শাসক-গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে পরিচালিত শাসনব্যবস্থাকে 'বিকৃত শাসনব্যবস্থা' বলে বর্ণনা করেছেন। আবার সংখ্যার দিক থেকে বিচার করে তিনি শাসনব্যবস্থাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন, যথা—একজনের শাসন, কয়েকজনের শাসন এবং বহুজনের শাসন। একজনের শাসনের স্বাভাবিক রূপ হোল রাজতন্ত্র (Monarchy) এবং বিকৃত রূপ হোল স্বৈরতন্ত্র (Tyranny)। জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত কয়েকজনের শাসনকে অভিজাততন্ত্র (Aristocracy) এবং শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থে পরিচালিত এরূপ শাসনকে তিনি মুখ্যতন্ত্র বা ধনিকতন্ত্র (Oligarchy) বলে অভিহিত করেছেন। আবার বহুজনের শাসন যখন জনকল্যাণে নিয়োজিত হয় তখন তাকে নিয়মতন্ত্র (Polity) এবং কেবলমাত্র শাসকশ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত এরূপ শাসনব্যবস্থাকে গণতন্ত্র বা জনতাতন্ত্র (Democracy) বলা হয়। তাঁর মতে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও নিয়মতন্ত্র হোল সরকারের স্বাভাবিক রূপ এবং স্বৈরতন্ত্র, ধনিকতন্ত্র ও গণতন্ত্র হোল বিকৃত রূপ।

সরকারী কাঠামোর গতানুগতিক শ্রেণীবিভাজন

অ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিভাজন

কিন্তু অ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিভাজন গুণগত বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তে সংখ্যাগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল বলে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ এরূপ শ্রেণীবিভাজনের সমালোচনা করেছেন।

বর্তমানে ম্যারিয়ট (Marriott) তিনটি নীতির উপর ভিত্তি করে সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। প্রথমতঃ ক্ষমতা বন্টনের নীতির ভিত্তিতে তিনি সরকারকে এককেন্দ্রিক (Unitary) এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal)—এই দু'ভাগে বিভক্ত করেন। দ্বিতীয় নীতি অনুসারে সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির ভিত্তিতে তিনি সরকারকে সুপরিবর্তনীয় (Flexible) এবং দুষ্পরিবর্তনীয় (Rigid)—এই দু'ভাগে এবং তৃতীয় নীতি অনুসারে আইন বিভাগের সঙ্গে শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে সরকারকে মন্ত্রিপরিষদ-পরিচালিত

ম্যারিয়টের শ্রেণীবিভাজন

(Parliamentary) এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত (Presidential)—এই দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন।

কিন্তু ম্যারিয়ট অপেক্ষা লীকক (Leacock)-এর শ্রেণীবিভাগ অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়। লীকক সরকারকে মূলতঃ দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন, যথা—ক. স্বৈরতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্র এবং খ. গণতন্ত্র। তিনি গণতন্ত্রকে আবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ—এই দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। তাঁর মতে, পরোক্ষ গণতন্ত্রের দু'টি রূপ আছে, যথা,—সসীম বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র এবং সাধারণতন্ত্র। ক্ষমতা বন্টনের ভিত্তিতে এদের প্রত্যেককে তিনি এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়—এই দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রতিটিকে আবার ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ভিত্তিতে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—মন্ত্রিপরিষদ-পরিচালিত এবং রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসনব্যবস্থা।

লীককের শ্রেণীবিভাজন

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অনেকেই লীককের শ্রেণীবিভাজনকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে, সরকারকে মূলতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে, যথা—১. স্বৈরতন্ত্র, ২. একনায়কতন্ত্র এবং ৩. গণতন্ত্র। স্বৈরতন্ত্র তিন প্রকার হতে পারে, যথা—ক. রাজতন্ত্র, খ. সামরিক তন্ত্র এবং গ. অভিজাততন্ত্র। একনায়কতন্ত্রও তিন ধরনের হতে পারে, যেমন—ক. ব্যক্তিগত, খ. দলগত এবং গ. শ্রেণীগত। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ গণতন্ত্রকে দু'ভাগে বিভক্ত করেন, যথা—সাধারণতন্ত্র এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। এদের প্রত্যেককে আবার এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়—এই দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। এককেন্দ্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রতিটিকে মন্ত্রিপরিষদ-পরিচালিত এবং রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসনব্যবস্থায় বিভক্ত করা যেতে পারে।

সরকারের আধুনিক শ্রেণীবিভাজন

কিন্তু অতি-সাম্প্রতিককালের বাস্তবধর্মী রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ সরকারী কাঠামোর ভিত্তিতে সরকারের উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাজনকে অসম্পূর্ণ এবং অবৈজ্ঞানিক বলে মনে করেন। ডেভিড ইস্টন, অ্যালান বল, অ্যালমন্ড এবং পাওয়েল প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ এই অভিমত পোষণ করেন যে, কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দিকে দৃষ্টি রেখে সরকারের শ্রেণীবিভাজনের মধ্যে রাষ্ট্রচরিত্রের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। তাছাড়া, গতানুগতিকভাবে সরকারের শ্রেণীবিভাজনের সমস্যাও অনেক বলে তাঁরা অভিমত পোষণ করেন।

সরকারী কাঠামোর ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাজনের অসুবিধা

প্রথমতঃ কাঠামোগতভাবে বিভিন্ন দেশের সরকারের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও কাঠামোর গর্ভগত উপাদানের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে। ভারতবর্ষ ও গ্রেট ব্রিটেনে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকলেও তাদের কার্যাবলীর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, বহুদলীয় ব্যবস্থা, লিখিত ও কিছু পরিমাণে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান, রাষ্ট্রপতির পরোক্ষ নির্বাচন ইত্যাদি হোল ভারতবর্ষের সংসদীয় ব্যবস্থার অপরিহার্য অংগ। কিন্তু ব্রিটেনে এককেন্দ্রিক কাঠামো,

কাঠামোর কার্যগত উপাদানের মধ্যে পার্থক্য

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা, অলিখিত সংবিধান, উত্তরাধিকার সূত্রে রাজা বা রানীর ক্ষমতালাভ ইত্যাদি ব্রিটিশ সংসদীয় শাসনব্যবস্থার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নামের সাদৃশ্য থাকলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক পদ্ধতিতে তাদের ভূমিকা বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। ভারতবর্ষ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শাসক 'রাষ্ট্রপতি' (President) নামে পরিচিত হলেও উভয়ের মধ্যে ক্ষমতাগত ক্ষেত্রে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি প্রকৃত অর্থেই শাসন বিভাগের প্রধান। কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রপতি 'নামসর্বস্ব শাসক' মাত্র। তাঁর সঙ্গে ব্রিটেনের রাজা বা রানীকেই তুলনা করা চলে। ভারতের রাষ্ট্রপতি তত্ত্বগতভাবে বহু ক্ষমতার অধিকারী হলেও কার্যক্ষেত্রে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রকৃত অধিকারী প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদ। এদিক থেকে বিচার করে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে মার্কিন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তুলনা করা চলে বলে অনেকে অভিমত পোষণ করেন।

নামের সাদৃশ্য সত্ত্বেও ভূমিকাগত পার্থক্য

তৃতীয়তঃ অনেক সময় সরকারের শ্রেণীবিভাজন মূল্যমান-নিরপেক্ষ (valuefree) হয় না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সরকারের শ্রেণীবিভাজনের সময় ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতামতের ভিত্তিতে বিভিন্ন সরকারকে বিশ্লেষণ করেন। ফলে সরকারের শ্রেণীবিভাজনের আলোচনা কার্যক্ষেত্রে সরকারের দোষত্রুটি আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়।

সরকারের শ্রেণী বিভাজন মূল্যমান-নিরপেক্ষ নয়

চতুর্থতঃ কোন কোন শাসনব্যবস্থার শ্রেণীবিন্যাসের সময় সমস্যা দেখা দিতে পারে, যেমন—সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসনব্যবস্থা সংসদীয় শাসনব্যবস্থা অথবা রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত—তা নির্ধারণ করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। কারণ এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত একজন রাষ্ট্রপতি নেই। ৩৭ জন সদস্যকে নিয়ে প্রেসিডিয়াম সভা গঠিত। প্রেসিডিয়ামের সভাপতিকে রাষ্ট্রপতি বলে ঘোষণা করা হলেও তাঁর বিশেষ কোন ক্ষমতা বা পদমর্যাদা নেই। আবার মন্ত্রিপরিষদ সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক নির্বাচিত এবং তার নিকট দায়িত্বশীল থাকলেও সুপ্রীম সোভিয়েতের অধিবেশন না থাকলে তাঁকে প্রেসিডিয়াম সভার নিকট দায়িত্বশীল থাকতে হয়। সর্বোপরি, সমস্ত রাজনৈতিক কাঠামোর উপর কমিউনিস্ট পার্টির সর্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণ এতই বেশী যে, পার্টির ভূমিকার মূল্যায়ন ছাড়া সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি বিশ্লেষণ অসম্ভব।

বিশেষ শাসনব্যবস্থাকে বিশেষ কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না

২। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা (Unitary Government)

ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে সরকার বা শাসনব্যবস্থাকে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়—এই দুভাগে বিভক্ত করা হয়। যখন কোন শাসনব্যবস্থায় সরকারের সকল ক্ষমতা একটি মাত্র ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে তখন তাকে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা (Unitary Government) বলা হয়। এরূপ শাসনব্যবস্থায় কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়া অন্য কোন সরকারের স্বাতন্ত্র্য ও প্রাধান্য থাকে না।

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা কাকে বলে

অবশ্য শাসনকার্যের সুবিধার জন্য অনেক সময় কেন্দ্রীয় সরকার এক বা একাধিক আঞ্চলিক সরকার গঠন করতে পারে। কিন্তু সেই সব আঞ্চলিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশেই পরিচালিত হয়। এমন কি এইসব আঞ্চলিক সরকারের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল। অধ্যাপক ডাইসি (Dicey) এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থাকে 'একটি মাত্র কেন্দ্রীয় শক্তি কর্তৃক চূড়ান্ত আইনগত কর্তৃত্বের স্বাভাবিক ব্যবহার' (The habitual exercise of supreme legislative authority by one central power) বলে বর্ণনা করেছেন। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

৩। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Features of Unitary Government)

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার কতকগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে। এগুলি হোল :

(ক) এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সকল প্রকার কার্য কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা পরিচালিত হয়। অবশ্য শাসনকার্যের সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কতকগুলি আঞ্চলিক সরকারের প্রতিষ্ঠা করতে পারে। কিন্তু এই সব সরকারের কোন স্বাতন্ত্র্য থাকে না। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠা সহকারে পালন করাই হোল এদের প্রধান কর্তব্য।

সর্বক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য

(খ) এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সংবিধানের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় আইনসভা সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। অন্যভাবে বলা যায়, কেন্দ্রীয় আইনসভা যে-কোন ধরনের আইন প্রণয়ন করতে পারে এবং এই আইনসভার কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের সর্বত্র সম্প্রসারিত। বলা বাহুল্য, সংবিধানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার ফলে কেন্দ্রীয় আইনসভা ইচ্ছামত সংবিধান সংশোধন করতে পারে।

সংবিধানের প্রাধান্যের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রাধান্য

(গ) এরূপ শাসনব্যবস্থায় সংবিধান লিখিত বা অলিখিত হতে পারে। ফ্রান্স, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত কিন্তু ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত।

সংবিধান লিখিত বা অলিখিত হতে পারে

(ঘ) এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সংবিধান সুপরিবর্তনীয় অর্থাৎ সহজে পরিবর্তনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। সংবিধান চরিত্রগতভাবে দুষ্পরিবর্তনীয় না হওয়ার ফলে কেন্দ্রীয় আইনসভা সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতি অনুসারে সংবিধান সংশোধন করতে পারে। এরূপ সংবিধান সংশোধনের জন্য 'বিশেষ পদ্ধতি' অনুসরণের প্রয়োজন হয় না।

সংবিধান সুপরিবর্তনীয়

(ঙ) এরূপ শাসনব্যবস্থায় যেহেতু সংবিধান অনুসারে কেন্দ্র ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত হয় না, সেহেতু ক্ষমতা বণ্টন সংক্রান্ত বিষয়ে উভয়

প্রকার সরকারের মধ্যে বিরোধের কোন প্রশ্নই উঠে না। তাই সংবিধানের রক্ষাকর্তা ও ব্যাখ্যাকর্তা হিসেবে আদালতের কোন গুরুত্ব থাকে না। অন্যভাবে বলা যায় যে, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় বিচার বিভাগ অত্যন্ত দুর্বল; কার্যতঃ তা আইন বিভাগের অধস্তন বিভাগ হিসেবেই কাজ করে।

আদালতের গুরুত্বহীনতা

৪। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার গুণাগুণ (Merits and Demerits of Unitary Government)

গুণ: এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার কতকগুলি গুণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এগুলি হোল:

(১) এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন ও শাসনকার্য পরিচালনা ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের অত্যধিক প্রাধান্য থাকার ফলে সমগ্র দেশে একই প্রকার আইন এবং একই প্রকার শাসন-পদ্ধতি অনুসৃত হয়। ফলে শাসনকার্য পরিচালনায় কোন জটিলতার সৃষ্টি হয় না।

শাসনকার্যে জটিলতার সৃষ্টি হয় না

(২) এরূপ শাসনব্যবস্থায় কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য থাকায় কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে কোনরূপ বিরোধের সম্ভাবনা থাকে না। ফলে একটি শক্তিশালী সরকারের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। বলা বাহুল্য, সরকার শক্তিশালী হলে যুদ্ধ, জাতীয় সংকট প্রভৃতি আপৎকালীন অবস্থায় দ্রুত ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

শক্তিশালী সরকারের প্রতিষ্ঠা সম্ভব

(৩) এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সংবিধানের প্রাধান্যের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই সংবিধান চরিত্রগতভাবে সুপরিবর্তনীয় হয়। কেন্দ্রীয় আইনসভা এরূপ সংবিধান অতি সহজেই সংশোধন করে পরিবর্তিত সমাজের সঙ্গে শাসনব্যবস্থার সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে।

পরিবর্তিত সমাজের সঙ্গে শাসনব্যবস্থার সামঞ্জস্য বিধান

(৪) এই প্রকার শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার প্রধান হওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক সন্ধি, চুক্তি প্রভৃতির শর্তাবলী বিনা বাধায় পূরণ করা সম্ভব। কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি উভয়েই নিজ নিজ এলাকায় চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধিকারী হলে আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য পরিচালনার ন্যায় আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে উভয় প্রকার সরকারের মধ্যে তীব্র মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে: তার ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতীয় সরকারের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দায়দায়িত্ব পালন করা সহজ

(৫) এরূপ শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে দু'প্রকারের সরকার না থাকায় জনসাধারণকে সরকার পরিচালনার ব্যয়ভার অনেক কম বহন করতে হয়। তাই এরূপ শাসনব্যবস্থা অত্যধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

সরকার পরিচালনার ব্যয় কম

(৬) অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রূপায়ণের পক্ষে এরূপ শাসনব্যবস্থা বিশেষ উপযোগী। একটিমাত্র শক্তিশালী সরকারের অস্তিত্ব থাকার ফলে সরকার নিজ ইচ্ছানুযায়ী সমগ্র দেশের উন্নতি বিধানের জন্য ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে এবং তা কার্যকরী করতে সক্ষম হয়। তাছাড়া প্রশাসনিক ব্যয় কম হওয়ার জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা খাতে অনেক বেশী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা সম্ভব।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রূপায়ণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী

দোষ : কিন্তু এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় উপরি-উক্ত গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও নানা-দিক থেকে এর সমালোচনা করা হয়।

(ক) এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সর্বক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকারের অত্যধিক প্রাধান্য থাকার ফলে আঞ্চলিক সরকারগুলি কার্যত অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। অথচ একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, ভাষা, ধর্ম, কৃষ্টি প্রভৃতির ভিন্নতা প্রায় প্রতিটি দেশেই থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব রূপায়ণের জন্য স্বায়ত্তশাসন ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকারগুলির স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা না থাকার ফলে জনগণের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার উপেক্ষিত হয়। তাই এরূপ শাসনব্যবস্থাকে অগণতান্ত্রিক বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

অগণতান্ত্রিক

(খ) এরূপ শাসনব্যবস্থায় সমগ্র দেশের শাসনকার্য একটি মাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। সেক্ষেত্রে একই প্রকার আইনের সাহায্যে বা একই প্রকার শাসননীতি অনুসরণের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান অসম্ভব। তাছাড়া, সমগ্র দেশের নানাবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা একটি মাত্র সরকারের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। তাই অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারের অক্ষমতা প্রকাশ পায়। এই সব কারণে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা সুশাসনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে বলে অনেকে অভিযোগ করেন।

সুশাসনের পথে অন্তরায় স্বরূপ

(গ) বর্তমান রাষ্ট্রের আয়তন ও জনসংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সরকারের কার্যাবলীও বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া, বর্তমানে জনকল্যাণকামী ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ বহু রাষ্ট্রে গৃহীত হওয়ার ফলে সরকারকে জনকল্যাণ সাধনে সর্বদাই ব্যাপৃত থাকতে হয়। কিন্তু এই বিপুল পরিমাণ কার্যভার বহন করা একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে অসম্ভব। তাই এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বৃহদায়তন রাষ্ট্রের পক্ষে অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়।

বৃহদায়তন রাষ্ট্রের পক্ষে অনুপযুক্ত

(ঘ) এরূপ শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণ অধিক পরিমাণে শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। ফলে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার সম্যক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে না

(ঙ) এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্র সমস্ত প্রকার শাসনকার্য পরিচালনা করে।

কিন্তু বিপুল পরিমাণ কার্য একটি মাত্র সরকারের পক্ষে যথাযথভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। তাই এরূপ সরকারকে আমলাদের উপর অত্যধিক পরিমাণে নির্ভর করতে হয়। বলা বাহুল্য, আমলাদের প্রাধান্য বৃদ্ধির অর্থ জনস্বার্থ উপেক্ষিত হওয়া। এরূপ শাসনব্যবস্থা কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয় বলে অনেকে মতপোষণ করেন।

আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য বৃদ্ধি

উপরি-উক্ত ত্রুটিগুলি থাকার জন্য এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা অকাম্য বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু কোন শাসনব্যবস্থাই সকল অবস্থায় সমভাবে কাম্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। তাই বলা যেতে পারে যে, এরূপ শাসনব্যবস্থা ভৌগোলিক ও জাতিগত ঐক্যসমন্বিত ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তাছাড়া, যে সব রাষ্ট্রের জনগণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন নয়, সেইসব রাষ্ট্রে এই প্রকার শাসনব্যবস্থা কাম্য বলে বিবেচিত হয়।

৫। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা (Federal Government)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রকৃত সংজ্ঞা নিরূপণ করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। এ নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অধ্যাপক ডাইসির মতে, জাতীয় ঐক্য ও শক্তির সঙ্গে অঙ্গরাজ্যগুলির অধিকারের সামঞ্জস্য বিধানের রাষ্ট্রনৈতিক উপায়কে যুক্তরাষ্ট্র বলা হয়। মন্তেস্কুর ভাষায় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা হোল এমন একটি চুক্তি যার দ্বারা একই ধরনের কতকগুলো রাষ্ট্র একটি বৃহত্তর রাষ্ট্রের সদস্য পদ গ্রহণ করতে সম্মত হয়। অধ্যাপক কে. সি. হোয়ার বলেন, যুক্তরাষ্ট্র হোল এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে সংবিধান অনুসারে সমগ্র দেশের সরকার এবং আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে এমনভাবে ক্ষমতা বণ্টিত হয় যাতে উভয় প্রকার সরকারই স্ব-স্ব এলাকায় স্বাধীনভাবে কার্য সম্পাদন করতে পারে। কিন্তু উপরি-বর্ণিত সংজ্ঞাগুলির কোনটিই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা নয়। বর্তমানে বার্চ (Birch)-প্রদত্ত সংজ্ঞাটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়। তাঁর মতে, যুক্তরাষ্ট্র বলতে এমন একটি শাসনব্যবস্থা বোঝায় যেখানে একটি সাধারণ সরকার ও কতকগুলি আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে এরূপভাবে ক্ষমতা বণ্টিত হয় যে তারা প্রত্যেকে স্ব-স্ব এলাকায় একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে এবং তাদের প্রত্যেকে শাসন বিভাগীয় প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে জনগণকে শাসন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যান্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি রাষ্ট্রে এই ধরনের শাসনব্যবস্থা রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায়

৬। যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য (Features of Fedreation)

যুক্তরাষ্ট্রের সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করলে এই প্রকার শাসনব্যবস্থায় নিম্নলিখিত মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায় :

(১) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণের ফলে দুই প্রকার সরকারের অস্তিত্ব থাকে, যথা—কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকার। দুটি বিপরীতমুখী

মনোভাবের সমন্বয় সাধনের ফলে এই দু'প্রকার সরকারের উদ্ভব হয়। এই দুটি মনোভাব হোল—ক. জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার মনোভাব এবং খ. অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব বজায় রাখার মনোভাব। দেশরক্ষার প্রয়োজনীয়তা, অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা ভোগের আকাঙ্ক্ষা, রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাদৃশ্য, ভৌগোলিক সান্নিধ্য, ভাষা ও সংস্কৃতিগত ঐক্য প্রভৃতি কারণে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার মনোভাব গড়ে উঠতে পারে। এই মনোভাব গড়ে উঠার পেছনে একটি 'কেন্দ্রাভিগামী শক্তি' (Centripetal Force) কাজ করে, যার ফলে একটি সাধারণ জাতীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের সৃষ্টি হয়। আবার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, ভাষাগত প্রভৃতি পার্থক্যের জন্য আঞ্চলিকভাবে স্বতন্ত্র সরকার প্রতিষ্ঠার মনোভাব জন্মলাভ করে। সুতরাং একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির সহাবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

দু'প্রকার সরকারের অস্তিত্ব

(২) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের অস্তিত্ব থাকায় উভয়ের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে ক্ষমতার বণ্টন একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় ক্ষমতার প্রশ্নে উভয় প্রকার সরকারের মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দিতে পারে। তাই এরূপ শাসনব্যবস্থায় সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত হয়। কোন্ সরকারের কি ক্ষমতা থাকবে তা সংবিধান অনুযায়ী নির্ধারিত হয় এবং উভয় প্রকার সরকার এ বিষয়ে সংবিধানের নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য। সাধারণতঃ জাতীয় স্বার্থের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি, যেমন—প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, মুদ্রাব্যবস্থা প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে অর্পিত হয় এবং স্থানীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি, যথা—শিক্ষা, স্থানীয় শান্তিরক্ষা, কৃষি, জলসেচ প্রভৃতি বিষয়সমূহ আঞ্চলিক সরকারগুলির হস্তে সমর্পিত হয়।

উভয় প্রকার সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন

(৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় যেহেতু সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত হয়, সেহেতু সংবিধানকে সরকারী ক্ষমতার উৎসস্থল বলে বর্ণনা করা হয়। এরূপ শাসনব্যবস্থায় সংবিধানের প্রাধান্য একান্ত প্রয়োজনীয়। অন্যথায় ক্ষমতার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। তাছাড়া, সুযোগ পেলে কেন্দ্রীয় সরকার আঞ্চলিক সরকারগুলির ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে পারে। তাই যুক্তরাষ্ট্রের স্বরূপ বজায় রাখার জন্য সংবিধানের প্রাধান্য একান্ত প্রয়োজন।

সংবিধানের প্রাধান্য

(৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সংবিধানকে লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় করে গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে কোন্ সরকারের ক্ষমতার গণ্ডি কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত সে সম্পর্কে সরকারগুলির কোন সুস্পষ্ট ধারণা থাকে না। ফলে শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে নানাপ্রকার জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে।

লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান

আবার যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য সংবিধান কেবলমাত্র লিখিত হলেই চলবে না,

তাকে দুষ্পরিবর্তনীয়ও হতে হবে। কারণ সহজে সংবিধান সংশোধন বা পরিবর্তন করা সম্ভব হলে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলি নিজেদের প্রয়োজন মত বারবার সংবিধান সংশোধন করতে পারে। ফলে সংবিধানের পবিত্রতা ও প্রাধান্য বিনষ্ট হয়। তাই এরূপ শাসনব্যবস্থায় সংবিধান সংশোধনের জন্য, 'বিশেষ পদ্ধতি' (Special Procedure) অনুসৃত হয়। এই বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে সংবিধান সংশোধনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার উভয়েরই সম্মতি প্রয়োজন। এককভাবে কোন সরকার সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতে সংবিধান সংশোধন করতে পারে না।

(৫) যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধিকারী। উভয় প্রকার সরকার সংবিধান অনুযায়ী কার্য পরিচালনা করতে বাধ্য। কিন্তু সংবিধান কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতার পরিধি নিয়ে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে বিরোধ হতে পারে। এই বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান একান্ত প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান ব্যাখ্যার ক্ষমতা একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালতের হস্তে অর্পণ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতকে স্বাধীনভাবে কার্য করার অধিকার প্রদান করতে হয়; তা না হলে তার নিরপেক্ষতা বিনষ্ট হয়। বলা বাহুল্য, নিরপেক্ষতা না থাকলে আদালত কোন একটি বিশেষ সরকারের ইচ্ছানুযায়ী সংবিধানের ব্যাখ্যা করতে পারে। ফলে অন্যান্য সরকারের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়; বস্তুতঃ সাংবিধানিক আইনসমূহের যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করে সংবিধানের প্রাধান্য রক্ষা করাই হোল যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের প্রধান কর্তব্য। তাই এরূপ আদালতকে সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা ও অভিভাবক বলে বর্ণনা করা হয়।

স্বাধীন ও নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের অবস্থিতি

উপরি-উক্ত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা অনেকে উল্লেখ করেন। এগুলি হোল :

(৬) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দু'প্রকার সরকারের অস্তিত্ব থাকায় নাগরিকদের উভয় প্রকার সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হয়। এই দ্বৈত-আনুগত্য প্রদর্শন করার ফলে নাগরিকেরা একদিকে যেমন সমগ্র দেশের নাগরিক, অন্যদিকে তেমনি নিজ নিজ অঞ্চলের নাগরিক বলে বিবেচিত হয়। এই ব্যবস্থাকে দ্বৈত নাগরিকত্ব (Dual Citizenship) বলা হয়। তবে অনেকে দ্বি-নাগরিকত্বকে যুক্তরাষ্ট্রের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য বলে গ্রহণ করতে সম্মত নন।

দ্বি-নাগরিকত্ব

(৭) অনেকে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভাকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে বর্ণনা করেন। আইনসভা দুটি কক্ষবিশিষ্ট হলে সাধারণতঃ উচ্চ কক্ষে অঙ্গরাজ্যসমূহের প্রতিনিধিরা থাকেন এবং নিম্ন কক্ষটি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। অনেকের মতে, দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা যুক্তরাষ্ট্রের আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য নয়।

৭। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয় শর্তাবলী (Necessary conditions for the formation of federation)

অধ্যাপক ডাইসির মতে, যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য দুটি শর্ত পূরণের প্রয়োজন, যথা—ক. কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র পাশাপাশি এমনভাবে অবস্থান করবে যাতে

সেইসব রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে সহজেই একটি জাতীয় ভাব গড়ে উঠতে পারে ; এবং খ. সেইসব রাষ্ট্রের জনসাধারণ পারস্পরিকভাবে মিলিত হতে চাইলেও তারা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে মিলিত হতে চাইবে না ('desire union but not untiy')। অন্যভাবে বলা যায়, ভৌগোলিক দিক থেকে সান্নিধ্যহেতু যখন কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের জনগণ সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে, কিন্তু সেইসঙ্গে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে তারা নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে, তখনই একটি যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। ডাইসি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলেছেন যে, জাতীয় ঐক্য ও শক্তির সঙ্গে অঙ্গ-রাজ্যগুলির অধিকারের সামঞ্জস্য-বিধানের রাষ্ট্রনৈতিক কৌশলই হোল যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভবের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে স্ট্রং (Strong) বলেছেন, জাতীয় সার্বভৌমত্বের সঙ্গে অঙ্গ-রাজ্যগুলির সার্বভৌমত্বের বাহ্য অসামঞ্জস্য দাবির মধ্যে সমন্বয় সাধনের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, কেন্দ্রাতিগ শক্তি (Centrifugal force) ও কেন্দ্রাভিগামী শক্তি (Centripetal force)-র সহাবস্থানের ফলেই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। কেন্দ্রাভিগামী শক্তি জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার মনোভাব সৃষ্টি করে এবং কেন্দ্রাতিগ শক্তি আঞ্চলিকভাবে স্বতন্ত্র সরকার প্রতিষ্ঠার মনোভাবের জন্ম দেয়। অধ্যাপক হোয়ার (K. C. Wheare)-ও মনে করেন যে, কয়েকটি জনসম্প্রদায় বা রাষ্ট্র যখন মিলন চাইলেও নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে সম্পূর্ণভাবে একীভূত হতে চায় না, তখনই যুক্তরাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে (Communities or states must desire to be united, but not to be unitary)।

ডাইসির মতে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য দুটি শর্ত প্রয়োজন

রাজনৈতিকভাবে মিলনের প্রয়াস বিভিন্ন কারণে সৃষ্টি হতে পারে, যথা :

(ক) ভৌগোলিক সান্নিধ্য হেতু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির জনগণের মধ্যে আত্মীয়তার মনোভাব গড়ে ওঠে। এই মনোভাব জাতীয় ঐক্যসাধনের পথ প্রশস্ত করে। কিন্তু ভৌগোলিক দূরত্ব এই জাতীয় মনোভাব গঠনের পরিপন্থী। বলা বাহুল্য, জাতীয় ঐক্যসাধনের আকাঙ্ক্ষা না থাকলে যুক্তরাষ্ট্র কখনই গঠিত হতে পারে না। তাই ভৌগোলিক সান্নিধ্যকে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের অন্যতম উপাদান বলে মনে করা হয়। ভারতবর্ষ, সুইজারল্যান্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা গঠিত হওয়ার পশ্চাতে অঙ্গরাজ্যগুলির ভৌগোলিক সান্নিধ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

রাজনৈতিক মিলনের প্রয়াসের কারণ

ভৌগোলিক সান্নিধ্য

(খ) অঙ্গরাজ্যগুলির জনগণের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সাদৃশ্য যুক্তরাষ্ট্র গঠনের অন্যতম উপাদান।

সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাদৃশ্য

(গ) বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা চাপের হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি অঙ্গরাজ্যগুলির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছাকে জোরদার করে তোলে।

বহিঃশত্রুর আক্রমণ

(ঘ) যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পূর্বে কোনো-না-কোনো প্রকার রাজনৈতিক সম্পর্ক অঙ্গরাজ্যগুলির জনগণের মধ্যে একই রাষ্ট্রের অধীনে সম্মিলিত হওয়ার মনোভাব গড়ে তোলে।

পারস্পরিক রাজনৈতিক সম্পর্ক

অর্থনৈতিক কারণ

(ঙ) অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা ভোগের আকাঙ্ক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে পারস্পরিকভাবে মিলিত হতে সাহায্য করে।

(চ) বৈদেশিক বা ঔপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে।

মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা

স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ইচ্ছার কারণ

রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার ইচ্ছা সাধারণভাবে কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যেমন :

(১) যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পূর্বে অঙ্গরাজ্যগুলি যদি স্বতন্ত্র উপনিবেশ বা রাষ্ট্র হিসেবে স্বাতন্ত্র্য ভোগ করে থাকে তাহলে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করেও তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিতে সম্মত হয় না।

স্বাতন্ত্র্যভোগের ইচ্ছা

অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিন্নতা

(২) আবার অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বার্থের সংঘাত থাকলে তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে চায় না।

ভৌগোলিক ব্যবধান

(৩) কোন কোন ক্ষেত্রে ভৌগোলিক ব্যবধান অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার মনোভাব গড়ে তোলে।

জাতি, ধর্ম ইত্যাদির ভিন্নতা

(৪) জাতি, ধর্ম, ভাষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভিন্নতা অঙ্গরাজ্যগুলির জনগণের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার মনোভাব গড়ে তোলে।

সামাজিক ব্যবস্থার ভিন্নতা

(৫) সামাজিক ব্যবস্থার ভিন্নতাও অনেক সময় অঙ্গরাজ্যগুলির জনগণের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার প্রবণতা সৃষ্টি করে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, অধ্যাপক হোয়ার মনে করেন যে, যুক্তরাষ্ট্র গঠনের উপরি-উক্ত উপাদানগুলির অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হতে নাও পারে।

সুযোগ্য নেতৃত্ব

ডাইসি যুক্তরাষ্ট্রকে 'এককেন্দ্রিকতার পথে অন্যতম পর্যায়' (a stage on the road to unity) বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে অস্থায়ী ব্যবস্থা বলে মনে করতেন। কিন্তু অধ্যাপক ল্যাস্কি (Laski) প্রমুখ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ ডাইসির এই অভিমত সমর্থন করেন না।

৮। যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্রসমবায় (Federation and Confederation)

যখন একাধিক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য নিজেদের সার্বভৌমিকতা বিসর্জন না দিয়ে চুক্তির মাধ্যমে একটি কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা গঠন করে তখন তাকে রাষ্ট্র-সমবায় (Confederation) বলে অভিহিত করা হয়। এরূপ সমবায় গঠিত হওয়ার ফলে সমবায়ী রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না। কারণ সমবায়ী রাষ্ট্রগুলি ইচ্ছা করলে যে-কোন সময় সমবায় থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। ১৮১৫-১৮৬৭ সালের জার্মান রাষ্ট্র, ১৯০৭-১৯১৮ সালের মধ্যে আমেরিকার ফেডারেশন এবং সাম্প্রতিককালের উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংস্থা (North Atlantic Treaty Organisation,

রাষ্ট্রসমবায় বলতে কি বোঝায়

NATO, 1949), দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা (South-East Asia Treaty Organisation, SEATO) প্রভৃতি রাষ্ট্র-সমবায়ের উদাহরণ।

যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-সমবায়ের মধ্যে পার্থক্য (Difference between a Federation and a Confederation) ঃ যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-সমবায়কে অভিন্ন মনে করলে ভুল করা হবে। উভয়ের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পার্থক্যগুলি হোল ঃ

রাষ্ট্র-সমবায়ে সমবায়ী রাষ্ট্রগুলি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী

(১) যুক্তরাষ্ট্রে অংগরাষ্ট্রগুলি কিছু পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য ভোগ করলেও তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু রাষ্ট্র-সমবায়ের প্রতিটি সমবায়ী রাষ্ট্র স্বাধীন এবং সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

রাষ্ট্র সমবায় গঠনের ফলে কোন নতুন জাতি বা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয় না

(২) যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হওয়ার ফলে একটি নতুন জাতি এবং একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। কিন্তু রাষ্ট্র-সমবায় প্রতিষ্ঠার ফলে এরূপ কোন নতুন জাতি বা নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে না।

চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র সমবায় সৃষ্টি

(৩) চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র সমবায় গঠিত হয়। তাই একে কোনরূপ আইনসংগত সংস্থা বলে অভিহিত করা যায় না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র কোনরূপ চুক্তির ফলে সৃষ্ট নয়। যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি হোল সাংবিধানিক আইন। লিখিত সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলি যাবতীয় কার্য পরিচালনা করতে বাধ্য থাকে। এই অর্থে রাষ্ট্র-সমবায়কে আইনসংগত সংস্থা বলে অভিহিত করা যায় না।

রাষ্ট্র-সমবায়ে বিচার বিভাগের প্রাধান্য থাকে না

(৪) যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানের প্রাধান্য থাকার ফলে সংবিধানের অভিভাবক ও ব্যাখ্যাকর্তা হিসেবে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু রাষ্ট্র-সমবায়ে সংবিধানের প্রাধান্য না থাকায় কোন শক্তিশালী বিচার বিভাগের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না।

রাষ্ট্র সমবায়ে কেন্দ্রীয় সংগঠন নাগরিকদের উপর প্রত্যক্ষভাবে কর্তৃত্ব করতে পারে না

(৫) যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র রাষ্ট্রের নাগরিকদের উপর প্রত্যক্ষভাবে কর্তৃত্ব করতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র-সমবায়ে নাগরিকদের উপর কেন্দ্রীয় সংগঠন প্রত্যক্ষভাবে কর্তৃত্ব করতে পারে না। কারণ সদস্য রাষ্ট্রগুলির নাগরিক ভিন্ন কেন্দ্রীয় সংগঠনের নিজস্ব কোন নাগরিক থাকে না। ফলে কেবলমাত্র সদস্য রাষ্ট্রগুলির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সংগঠনের আদেশ, নির্দেশ প্রভৃতি কার্যকরী করা যেতে পারে।

রাষ্ট্র সমবায়ে সমবায়ী রাষ্ট্রগুলির বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার আছে

(৬) যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিক সরকারগুলি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নয়। তাই যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার তাদের নেই। কিন্তু রাষ্ট্র-সমবায়ে সমবায়ী রাষ্ট্রগুলি যেহেতু সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং স্বেচ্ছায় রাষ্ট্র-সমবায়ে যোগদান করে, সেহেতু তারা যে-কোন সময় ইচ্ছা করলে বিচ্ছিন্ন হতে পারে। এই অধিকার সমবায়ী রাষ্ট্রগুলির সম্পূর্ণ আইনসংগত অধিকার।

(৭) সমবায়ী রাষ্ট্রগুলি স্বেচ্ছায় রাষ্ট্র-সমবায় পরিত্যাগ করতে পারে বলে প্রকৃতিগতভাবে এরূপ সমবায় স্বল্পস্থায়ী হয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলির এই অধিকার না থাকায় তা সাধারণতঃ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে।

রাষ্ট্র সমবায় স্বল্পস্থায়ী হয়

(৮) যুক্তরাষ্ট্রে অনেক সময় দ্বি-নাগরিকত্ব থাকে অর্থাৎ একই সংগে তারা সমগ্র দেশের এবং যে-কোন একটি অঙ্গরাজ্যের নাগরিক হতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র-সমবায়ের যেহেতু নিজস্ব নাগরিক থাকে না, সেহেতু দ্বৈত-নাগরিকত্বের কোন প্রশ্নই আসে না।

রাষ্ট্র সমবায়ে দ্বৈত-নাগরিকত্বের প্রশ্নই আসে না

৯। এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য
(Distinction between Unitary and Federal Government)

যখন কোন শাসনব্যবস্থায় সরকারের সকল ক্ষমতা একটিমাত্র ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে তখন তাকে এককেন্দ্রিক সরকার বলা হয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র হোল এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে সংবিধান অনুসারে সমগ্র দেশের সরকার বা জাতীয় সরকার এবং আঞ্চলিক বা রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে এমনভাবে ক্ষমতা বন্টিত হয় যাতে উভয়প্রকার সরকারই স্ব স্ব এলাকায় স্বাধীনভাবে কার্য সম্পাদন করতে পারে। এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করলে উভয় প্রকার সরকারের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। পার্থক্যগুলি হোল :

(১) এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সকল প্রকার কার্য কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা পরিচালিত হয়। অবশ্য শাসনকার্যের সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অনেক সময় কতকগুলি আঞ্চলিক সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। কিন্তু এইসব আঞ্চলিক সরকারের কোন স্বাতন্ত্র্য থাকে না। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠা সহকারে পালন করাই হোল এদের প্রধান কর্তব্য। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দুই প্রকার সরকারের অস্তিত্ব থাকে, যথা—কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকার বা রাজ্যসরকার। দুটি বিপরীতধর্মী মনোভাবের সমন্বয় সাধনের ফলে এই দু'প্রকার সরকারের উদ্ভব ঘটে। এ দুটি মনোভাব হোল—ক. জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার মনোভাব এবং খ. অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব বজায় রাখার মনোভাব। সুতরাং স্বাধীন সত্তাবিশিষ্ট দুই প্রকার সরকারের সহাবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজ্যসরকারগুলির স্বাতন্ত্র্য থাকে না কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্য সরকারগুলির স্বাতন্ত্র্য থাকে

(২) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বন্টিত হয়। কোন্ সরকারের কি কি ক্ষমতা থাকবে তা সংবিধান অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। সাধারণতঃ জাতীয় স্বার্থের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি, যেমন—প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে অর্পিত হয় এবং স্থানীয় বা আঞ্চলিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি, যথা—শিক্ষা, স্থানীয় শান্তিরক্ষা, কৃষি,

যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বন্টিত হয়, কিন্তু এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজ্য সরকারগুলির কোন স্বতন্ত্র ক্ষমতা থাকে না

জলসেচ প্রভৃতি বিষয় রাজ্য সরকারগুলির হস্তে থাকে। উভয় সরকারই নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারে।

কিন্তু এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় জাতীয় এবং স্থানীয়—সর্ব বিষয়েই কেন্দ্রীয় সরকারের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য থাকে। অনেক সময় অবশ্য স্থানীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি রাজ্য সরকারের দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু রাজ্যগুলি এক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কার্য সম্পাদন করতে পারে না। কেন্দ্রের নির্দেশেই তাদের কাজ করতে হয়।

(৩) এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সংবিধানের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় আইনসভা সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। তাই কেন্দ্রীয় আইনসভা যে-কোন ধরনের আইন প্রণয়ন করতে পারে এবং আইনসভার কর্তৃত্ব দেশের সর্বত্র সম্প্রসারিত থাকে।

এককেন্দ্রিক শাসনে সংবিধানের প্রাধান্য থাকে না; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানের প্রাধান্য থাকে

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সাংবিধানের প্রাধান্য বিশেষভাবে স্বীকৃত। সংবিধান অনুসারে উভয় প্রকার সরকারকে স্ব স্ব এলাকার মধ্যে থেকে কাজ করতে হয়। কোন আইনসভাই সংবিধান-বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করতে পারে না। অন্যভাবে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান হোল কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতার উৎসস্থল।

(৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধানের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য সংবিধানকে লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় করে গড়ে তোলা হয়। এরূপ সংবিধানকে সহজে পরিবর্তন করা যায় না। সংবিধান সংশোধনের জন্য 'বিশেষ পদ্ধতি' অনুসরণ করতে হয়। এই বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে সংবিধান সংশোধনের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য—উভয় প্রকার সরকারের সম্মতি প্রয়োজন। এককভাবে কোন সরকার সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতে সংবিধান সংশোধন করতে পারে না।

যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয়; কিন্তু এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় তা নয়

কিন্তু এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সংবিধান লিখিত বা অলিখিত দুইই হতে পারে। তাছাড়া, সংবিধান অতি সহজেই পরিবর্তন করা সম্ভব। প্রকৃতিগতভাবে দুষ্পরিবর্তনীয় না হওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এককভাবে সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতে সংবিধান সংশোধন করতে পারে। এরূপ শাসনব্যবস্থায় সংবিধান সংশোধনের জন্য 'বিশেষ পদ্ধতি' অনুসরণের প্রয়োজন হয় না।

(৫) এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সংবিধানের প্রাধান্য না থাকায় সংবিধানের রক্ষাকর্তা ও ব্যাখ্যাকর্তা হিসেবে আদালতের গুরুত্বই থাকে না। এরূপ শাসনব্যবস্থায় আদালত অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতিসম্পন্ন হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় আইনসভা-প্রণীত কোন আইনকে বাতিল করার ক্ষমতা আদালতের থাকে না।

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় আদালত অত্যন্ত দুর্বল, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের আদালত অত্যন্ত শক্তিশালী

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় আদালত যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে থাকে। সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের উপর ন্যস্ত থাকে। তাই সংবিধান-বিরোধী কোন আইন প্রণীত হলে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সেই আইন বাতিল করে দিতে পারে।

(৬) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দুই প্রকার সরকারের অস্তিত্ব থাকায় নাগরিকদের উভয় সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হয়। এই দ্বৈত-আনুগত্য প্রদর্শনের ফলে নাগরিকদের দ্বৈত-নাগরিকতা বা দুটি নাগরিকতা থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রে দ্বৈত-নাগরিকতা থাকে কিন্তু এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় নাগরিকদের একটি নাগরিকত্ব থাকে

কিন্তু এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় নাগরিকদের কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি অখন্ড আনুগত্য প্রদর্শন করতে হয়। তাই এরূপ শাসনব্যবস্থায় দ্বৈত-নাগরিকতার কোন প্রশ্নই আসে না।

পরিশেষে, বলা যায় যে, এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য নির্ভর করে দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তিত হলেও কার্যক্ষেত্রে শাসনক্ষমতা অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রভুত্বকারী শ্রেণীর হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে। ফলে কোন রাজ্যে এই শ্রেণীর স্বার্থবিরোধী কোন সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে সেই সরকারের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার বিমাতৃসুলভ আচরণ করে। এমন কি নানা অজুহাতে সেই সরকারের পতন ঘটাতে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বিধাবোধ করে না। এইভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র কার্যতঃ এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র আদর্শ শাসনব্যবস্থা হিসেবে বিভিন্ন জাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে সমর্থ। সর্বোপরি, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠে। এরূপ সমাজে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের স্বরূপ

১০। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার গুণাগুণ (Merits and Demerits of Federal form of Government)

গুণ: সাম্প্রতিককালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন—এর গুণগত উৎকর্ষের কথাই প্রমাণ করে। এরূপ শাসনব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য গুণাবলী হোল:

(১) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দু'প্রকার সরকারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, যথা—কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকার। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব বিসর্জন না দিয়েও একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এর ফলে অতি সহজেই রাজ্যগুলি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানা সুযোগসুবিধা ভোগ করতে পারে। বলা বাহুল্য, একটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ঐক্যবদ্ধ না হলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও রাজ্যগুলি দুর্বলই থেকে যায়। তাদের দুর্বলতার সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তাদের অধিকার কেড়ে নিতে পারে। তার ফলে রাজ্যগুলির স্বাধীন অস্তিত্ব বিনষ্ট হয়ে পড়ে। তাই বর্তমানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি নিজের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তরাষ্ট্র গঠন করতে বিশেষ আগ্রহী।

দুর্বল রাজ্যগুলি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে

(২) বহু-জাতি-অধ্যুষিত দেশের পক্ষে এরূপ শাসনব্যবস্থা একান্ত কাম্য বলে অনেকে মত পোষণ করেন। কারণ এরূপ শাসনব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকারগুলি স্বাধীন সত্তাবিশিষ্ট বলে তারা অতি সহজেই বিভিন্ন জাতির ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি সংরক্ষণ করতে পারে। এইভাবে প্রতিটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃত হওয়ার ফলে একদিকে যেমন প্রতিটি জাতি নিজ নিজ সরকারের মাধ্যমে নিজ নিজ ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি প্রভৃতির চরম বিকাশ সাধন করতে পারে, অন্যদিকে তেমনি একটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকার ফলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতার বন্ধন সুদৃঢ় হতে পারে। এক কথায় বলা যায় যে, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করতে সক্ষম হওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা বর্তমানে অত্যধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আনয়ন করে

(৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় রাজ্য সরকারগুলির উপর স্থানীয় সমস্যাসমূহ সমাধানের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই সব সমস্যা সম্পর্কে সরকারগুলি বিশেষভাবে অবহিত থাকায় সেগুলির সমাধানের জন্য দ্রুত ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব। সমগ্র দেশের সব সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অর্পণ করা হলে তার পক্ষে স্থানীয় বা আঞ্চলিক সমস্যাবলীর সমাধানের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় না। ফলে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিতে পারে।

আঞ্চলিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব

(৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় অঙ্গরাজ্যগুলির নিজ নিজ স্বতন্ত্র সংবিধান ও সরকার থাকে বলে জনগণ অধিক পরিমাণে আইন প্রণয়নে এবং শাসনকার্য পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পায়। ফলে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। বলা বাহুল্য, গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য জনগণের রাজনৈতিক চেতনা একান্ত প্রয়োজন। অন্যভাবে বলা যায়, এরূপ শাসনব্যবস্থা গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে।

গণতন্ত্রসম্মত শাসনব্যবস্থা

(৫) সংবিধান অনুসারে অঙ্গরাজ্যগুলির হস্তে ক্ষমতা অর্পিত হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছামত কোন কাজ করতে পারে না অর্থাৎ শাসন-ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারে না। কেন্দ্রীয় সরকার শাসন-ক্ষমতার অপব্যবহারের চেষ্টা করলে রাজ্য সরকারগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের শরণাপন্ন হয়। আদালত সংবিধান বিরোধী ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দিয়ে তার স্বৈরাচারিতার পথ রোধ করতে পারে।

কেন্দ্রীয় সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধ করে

(৬) লর্ড ব্রাইসের মতে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় আঞ্চলিক ভিত্তিতে আইন-প্রণয়ন ও শাসনকার্য পরিচালনা বিষয়ে নিত্যনতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো সম্ভব। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল ভাল হলে উক্ত আইন বা শাসন-বিষয়ক নীতিগুলি সমগ্র দেশে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় এরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো বিপজ্জনক।

শাসনতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো সম্ভব

(৭) এরূপ শাসনব্যবস্থায় সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত হওয়ার ফলে উভয় প্রকার সরকার সুনির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে থেকে নিজ নিজ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে এবং দক্ষতা সহকারে পালন করতে পারে। ফলে শাসনকার্যে বিশেষ উৎকর্ষ আসে।

ক্ষমতা বণ্টনের ফলে শাসনকার্যে উৎকর্ষ আসে

(৮) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণের ফলে অন্তর্বিপ্লবের আশঙ্কা কম থাকে। ব্যাখ্যা করে বলা যায় যে, এককেন্দ্রিক সরকারে ক্ষমতা একটি মাত্র সরকারের হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকার ফলে সামরিক বাহিনী কিংবা কোন বিদ্রোহী গোষ্ঠী অতি সহজেই ক্ষমতা দখল করে সরকারের পতন ঘটাতে পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় অনেকগুলি সরকারের হস্তে ক্ষমতা থাকার জন্য একই সময়ে সব রাজ্য সরকারের পতন ঘটানো সহজসাধ্য নয়।

বিপ্লবের আশঙ্কা থাকে না

দোষ: যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের উপরি-উক্ত গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও নানাভাবে এর সমালোচনা করা হয়।

(ক) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধান অনুসারে কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত হওয়ার ফলে এরূপ শাসনব্যবস্থা এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা অপেক্ষা দুর্বল হতে বাধ্য। কারণ এরূপ ক্ষমতা বণ্টনের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারের কিংবা রাজ্যসরকারগুলির নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার প্রশ্নে বিরোধ উপস্থিত হতে পারে। এই বিরোধের ফলে সরকার দুর্বল হয়ে পড়ে। এই দুর্বলতা বিশেষভাবে প্রকাশ পায় বৈদেশিক নীতি অনুসরণের ব্যাপারে। বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে রাজ্যসরকারগুলির সম্মতি প্রয়োজন। কিন্তু রাজ্য সরকারগুলি এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থন ও সহযোগিতা না করে অনেক সময় তার বিরোধিতা করে। ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সরকারের দুর্বলতা যেমন প্রকাশ পায় তেমনি মর্যাদাও অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রকৃতিগতভাবে দুর্বল

(খ) এরূপ শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির পৃথক পৃথক সরকার থাকার ফলে ক্ষমতা বণ্টনের ব্যাপারে এবং বিভিন্ন সরকারের ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ জটিলতার সৃষ্টি হয়। সরকারগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ জটিলতাকে অধিকতর পরিমাণে বাড়িয়ে তোলে। তাছাড়া, জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে রাজ্য-সরকারগুলির অভিমত প্রয়োজন হয় বলে কোন বিশেষ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত হয়। অনেক সময় আবার কোন একটি বিশেষ কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব কোন্ সরকারের সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অযথা সময়ের অপচয় হয়। এর ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দ্রুত ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এই সব কারণে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা আপৎকালীন অবস্থায় বিশেষ কার্যকরী হয় না বলে অনেকে মনে করেন।

এরূপ শাসনব্যবস্থা জটিল ও মন্থর গতিসম্পন্ন

(গ) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধান লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় হওয়ার ফলে রাজ্যসরকারগুলির বিনা সম্মতিতে কেন্দ্রীয় সরকার এককভাবে সংবিধান সংশোধন করতে পারে না। অথচ যুগের পরিবর্তনের সংগে সংগে সংবিধানকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে না নিলে তা কখনই জাতীয় অগ্রগতির সহায়ক হতে পারে না। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় স্বার্থে সংবিধান পরিবর্তনের কোন প্রস্তাব করলে রাজ্য সরকারগুলির নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশংকায় কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ এরূপ প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে পারে। ফলে সংবিধান সংশোধন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই এরূপ শাসনব্যবস্থাকে জাতীয় অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক বলে মনে করা হয়।

জাতীয় অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে

(ঘ) এরূপ শাসনব্যবস্থা একই সঙ্গে কেন্দ্র এবং যে-কোন একটি রাজ্য সরকারের প্রতি নাগরিকদের আনুগত্য থাকার ফলে স্বাভাবিকভাবেই আঞ্চলিক স্বার্থরক্ষার জন্য তারা রাজ্য সরকারের প্রতি অধিক পরিমাণে আনুগত্য প্রদর্শন করে। কারণ তারা জানে যে, কেন্দ্রীয় সরকার অপেক্ষা রাজ্য সরকার তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি রক্ষায় অধিক সহায়তা করে। এই মনোবৃত্তি হতে অনেক সময় যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কোন একটি রাজ্য বা কতিপয় রাজ্য একত্রিত হয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে। এমন কি অনেক সময় তারা গৃহযুদ্ধের পথেও অগ্রসর হতে পারে। ফলে সরকারের স্থায়িত্ব বিপন্ন হতে পারে।

বিচ্ছিন্নতাকামী মনোবৃত্তির সৃষ্টি

(ঙ) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অপর একটি ত্রুটি হোল ব্যয়-বাহুল্য। এরূপ শাসনব্যবস্থায় অনেকগুলি সরকার থাকার ফলে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য অত্যধিক পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়।

ব্যয়বহুল

(চ) এরূপ শাসনব্যবস্থায় অনেকগুলি রাজ্য সরকারের অস্তিত্ব থাকায় পরস্পর-বিরোধী আইন প্রণীত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। এরূপ হলে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মধ্যে সমন্বয়সাধন অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে দেশে নানারকম অশান্তি, গোলযোগ প্রভৃতির আশঙ্কা থাকে; শাসনকার্যও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা কঠিন হয়ে পড়ে।

পরস্পর বিরোধী আইন প্রণীত হতে পারে

উপরি-উক্ত ত্রুটিগুলি থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি বিশ্বের বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তার কারণ হোল, এরূপ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব বিসর্জন না দিয়েও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে একটি শক্তিশালী সরকার গঠনের মাধ্যমে নিজেদের রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করতে পারে। তাছাড়া, বহুজাতি-অধ্যুষিত রাষ্ট্রে এরূপ শাসনব্যবস্থা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

১১। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সাফল্যের শর্তাবলী
(Conditions for the success of a Federation) :

প্রতিটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রাতিগ (Centrifugal) এবং কেন্দ্রাভিগামী

(Centripetal)—এই দুই পরস্পর-বিরোধী নীতির সমন্বয়ে গঠিত। অন্যভাবে বলা যায়, ঐক্যবন্ধ হয়েও একীভূত না হওয়ার নীতি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ভিত্তিভূমি। বাস্তবক্ষেত্রে এই দুটি পরস্পর-বিরোধী নীতির সমন্বয় সাধন করতে পারলেই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সাফল্য আসে। এই দুটি নীতির সমন্বয়সাধন তথা যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য কতকগুলি শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন। শর্তগুলি হোল :

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের শর্তাবলী

(১) যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে ভৌগোলিক সান্নিধ্য একান্ত প্রয়োজন, কারণ এই সান্নিধ্য ছাড়া ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব হয় না। ফলে রাজ্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় হয় না।

ভৌগোলিক সান্নিধ্য

(২) যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত রাজ্যগুলি যদি জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয় তবেই তাদের মধ্যে সংহতি বা ঐক্য সাধিত হয়। এরূপ সংহতি সাধিত হলে যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে এই সমজাতীয় মনোভাব গড়ে না উঠলে পারস্পরিক হিংসা, দ্বেষ, অমূলক সন্দেহ প্রভৃতি জাতীয় সংহতি বিনষ্ট করে যুক্তরাষ্ট্রকে দুর্বল করে দেয়।

সংহতিবোধ

(৩) যুক্তরাষ্ট্রের সকল অঙ্গরাজ্যে একই প্রকার শাসনব্যবস্থা প্রচলিত থাকা প্রয়োজন। কোন রাজ্যে স্বৈরতন্ত্র, কোথাও বা সাধারণতন্ত্র প্রচলিত থাকলে তাদের মধ্যে বিরোধ বাধার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে।

শাসনব্যবস্থায় সাম্য

(৪) অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে জনসংখ্যা ও আর্থিক দিক থেকে যদি অস্বাভাবিক পার্থক্য থাকে তাহলে অঙ্গরাজ্যগুলির অধিকাংশের স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ, যে রাজ্যটি জনবল ও অর্থবলে অন্যান্য রাজ্য অপেক্ষা অনেক বেশি বলীয়ান সে অন্যান্যর উপর কর্তৃত্ব করতে শুরু করে। বলহীন রাজ্যগুলি অনেক সময় অনন্যোপায় হয়ে বলশালী রাজ্যটির নেতৃত্ব স্বীকার করে নেয়।

জনবল ও ধনবলের সাম্য প্রয়োজন

(৫) যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে সামাজিক রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, প্রথা প্রভৃতি মোটামুটিভাবে এক ধরনের হলে তাদের মধ্যে বিবাদবিসম্বাদের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে গুরুতর পার্থক্য থাকলে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে অনেক সময় গৃহবিবাদের সূত্রপাত হয়। এমন কি এই গৃহবিবাদ বিচ্ছিন্নতাকামী আন্দোলনের রূপ ধারণ করে যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলে।

সামাজিক ব্যবস্থাগত ঐক্য

(৬) যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষে এবং মন্ত্রিসভায় অঙ্গরাজ্যগুলির সমান সংখ্যক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকা উচিত। তা না হলে যে-সব রাজ্য অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করে তাদের মনে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিতে পারে বা যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের পথে নানাপ্রকার বাধার সৃষ্টি করতে পারে।

আইনসভায় সমান সংখ্যক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা

(৭) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধান অনুসারে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত থাকা বাঞ্ছনীয়। এরূপ আদালতের রায় উভয় প্রকার সরকারকেই মেনে নিতে হবে। আদালতের এরূপ প্রাধান্য স্বীকৃতিলাভ করলেই সরকারগুলির মধ্যে বিরোধ বা পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটবে, যুক্তরাষ্ট্র সাফল্য অর্জন করবে।

নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের প্রাধান্য

(৮) অনেকের মতে, অঙ্গরাজ্যগুলির প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার যদি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয় তবেই যুক্তরাষ্ট্র সফল হতে পারে। কিন্তু কেন্দ্র বিশেষ বিশেষ রাজ্যের প্রতি যদি পক্ষপাতমূলক আচরণ করে, তবে রাজ্যগুলির মধ্যে কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণের জন্য অসন্তোষ ধূমায়িত হতে পারে। কেন্দ্রীয় আনুকূল্য লাভে বঞ্চিত রাজ্যগুলি স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে দ্বিধাবোধ করে, কেন্দ্রের নির্দেশ পালনে অসম্মতি প্রকাশ করে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

কেন্দ্রীয় সরকারকে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হতে হবে

(৯) জাতীয়তাবোধ ও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যবোধের সমন্বয় সাধন করে যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হোল নাগরিকদের শিক্ষা দীক্ষা, রাজনৈতিক চেতনা, কর্মদক্ষতা প্রভৃতির ব্যাপক প্রসার। নাগরিকরা যদি উভয়প্রকার সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের শিক্ষালাভ না করে, তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ যদি না ঘটে, তাহলে কখনই যুক্তরাষ্ট্র সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে না।

নাগরিকদের শিক্ষা-দীক্ষা, রাজনৈতিক চেতনা প্রভৃতির প্রসার

(১০) অধ্যাপক হোয়ার প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে, যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য উপযুক্ত নেতৃত্বের প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যদি রাজ্যের জনগণের আস্থাভাজন না হয় তাহলে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক কখনই মধুর হতে পারে না।

উপযুক্ত নেতৃত্ব

(১১) সর্বোপরি যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে সম্পত্তির উপর সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই কেবলমাত্র প্রবর্তন প্রয়োজন। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই কেবলমাত্র বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে সক্ষম। কারণ এই সমাজে জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃত হওয়ায় এবং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি কার্যকরী হওয়ায় অঙ্গরাজ্যগুলির জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহযোগিতার মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠে। তাছাড়া, এই ব্যবস্থায় শাসনকার্য পরিচালনায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ যুক্তরাষ্ট্রকে সাফল্যের তীরপ্রান্তে উপনীত করে। সুতরাং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরিবর্তে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি—এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

অর্থনৈতিক সাম্য

১২। ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralization of Power)

কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ হিসেবে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ তত্ত্ব প্রচারিত হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হওয়ার ফলে বিগত চার

শতাব্দী ধরে আধুনিক সমাজে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ একটি সাধারণ রাজনৈতিক নিয়মে পরিণত হয়েছে বলা যেতে পারে। কিন্তু ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে নানা প্রকার সমস্যার সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের ফলে একদিকে যেমন কেন্দ্রীয় সরকার স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনি আঞ্চলিক ও অন্যান্য সরকারী সংস্থাগুলি ক্ষমতা হারিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উপগ্রহে পরিণত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে কেন্দ্রীকরণের কুফলগুলি বিশেষভাবে প্রকটিত হতে শুরু করে। ঐ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাষ্ট্রের কার্যাবলী এবং ক্ষমতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্র তথা কেন্দ্রীয় সরকার সর্বক্ষেত্রেই অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে দাঁড়ায়। শান্তি ও যুদ্ধের সময় সমভাবেই কেন্দ্রীয় সরকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এমনকি সমাজজীবনের মনস্তাত্ত্বিক দিকটিকেও চরমভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। ফলে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলিতে স্বাভাবিক-ভাবেই আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য অস্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায়। আমলাতন্ত্রের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি অত্যন্ত প্রকটিত হয়ে উঠতে শুরু করে। গণতন্ত্র তত্ত্বসর্বস্ব নীতিকথায় পর্যবসিত হয়। তাই গান্ধী বলেছেন, ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ গণতন্ত্রের শত্রু। বস্তুতঃ, অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, যার হাতে যত বেশী ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে সে তত বেশী পরিমাণে ক্ষমতার অপব্যবহার করে। তাই হেনরী অ্যাডামস্ (Henry Adams) ক্ষমতাকে বিষের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

ক্ষমতা-কেন্দ্রীকরণের কুফল

ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলির হাত থেকে গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হলে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ একান্তভাবেই অপরিহার্য বলে জেফারসন (Jefferson), ল্যাস্কি, গান্ধী প্রমুখ মনীষিবৃন্দ মনে করেন। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বলতে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বিভাজন ও বন্টন বোঝায়। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ নীতি অনুসারে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্থাৎ আইন প্রণয়ন ও আইন বলবৎকরণের ক্ষমতা অঙ্গরাজ্যগুলির এবং অন্যান্য অধস্তন স্থানীয় সংস্থাগুলির হাতে প্রদত্ত হবে; তবে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বলতে কখনই ক্ষমতার হস্তান্তর (delegation of powers) বোঝায় না। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হোল ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই ব্যবস্থায় প্রতিটি সরকার ও অধস্তন কর্তৃপক্ষ নিজ নিজ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নীতি নির্ধারণ করে এবং সেগুলিকে কার্যকর করে।

ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ

ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ল্যাস্কি বিকেন্দ্রীকরণের সপক্ষে তিনটি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন:

বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা

প্রথমতঃ সাধারণের জীবনকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করা সম্ভব তখনই যদি আইন প্রণয়নে প্রত্যেক ব্যক্তির উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ থাকে। কারণ সেক্ষেত্রে আইনের ফলাফল সম্পর্কে প্রত্যেকেরই যথেষ্ট আগ্রহ থাকে। কিন্তু আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে যদি জনসাধারণের অংশগ্রহণের কোনরূপ সুযোগসুবিধা না থাকে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তারা আইনের

জনগণের সহযোগিতা ও সমর্থন শাসন-কার্যে সাফল্য আনে

ফলাফল সম্পর্কে উদাসীন থাকে। স্বভাবতই এরূপ জনসাধারণ আইন-প্রণেতাদের সঙ্গে কোনরূপ প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করে না। ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ থাকলে জনগণ যেমন আইনের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য প্রদর্শন করে না, তেমনি আবার তারা সরকারের সঙ্গে আন্তরিকভাবে সহযোগিতাও করে না। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হলে কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র লক্ষ্য করা যায়। এই ব্যবস্থায় জনসাধারণ নিজেরাই যেহেতু আইন প্রণয়ন করে, সেই হেতু তারা আইন যাতে বাস্তবে কার্যকরী হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে। ফলে শাসনকার্য কোনভাবেই 'মুষ্টিমেয়ের শাসন' (Elite rule)-এ পরিণত হয় না। জনগণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে উঠে।

নতুন নতুন উদ্ভাবনী প্রতিভার সম্যক বিকাশ সম্ভব

দ্বিতীয়তঃ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ জনগণকে শাসনকার্য বিষয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার সুযোগ করে দেয়। এর ফলে নতুন নতুন উদ্ভাবনী প্রতিভার বিকাশ সম্ভব হয়। যদিও অনেকক্ষেত্রে এইসব পরীক্ষানিরীক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় তথাপি এইসব ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করে জনসাধারণ পরবর্তী পর্যায়ে অনেক বেশী দৃঢ়তা ও সতর্কতার সঙ্গে নীতি নির্ধারণ ও তা বলবৎকরণে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। এইভাবে ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণের সাহায্যে সামাজিক অগ্রগতি সাধিত হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ হ্রাস পায়

তৃতীয়তঃ আধুনিক রাষ্ট্রের আকৃতি যেমন বিরাট, তেমনি সমস্যাও বিপুল। নানাবিধ সমস্যাকে সমাধান করা এককভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সম্ভব নয় বলে সাধারণভাবে মনে করা হয়। কারণ বিপুল পরিমাণ সমস্যা সমাধানের জন্য যে জ্ঞান ও তৎপরতা প্রয়োজন কেন্দ্রীয় সরকারের তা থাকে না। তাই প্রয়োজন ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণের। এই ব্যবস্থায় জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব থাকে কেন্দ্রের হাতে। আঞ্চলিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে নীতিনির্ধারণ করে রাজ্য সরকারগুলি এবং স্থানীয় সমস্যাগুলির সমাধানের দায়িত্ব অর্পিত হয় স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর। এইভাবে ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব না থাকায় শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। বলা বাহুল্য, ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণের ফলেই গণতন্ত্র বাস্তবায়িত হয়। জন স্টুয়ার্ট মিলও স্থানীয় সমস্যার সমাধান, শাসনব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা, এবং নাগরিকদের গুণাবলী বিকাশের জন্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণকে একটি শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন।

ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণের প্রকারভেদ

ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ প্রধানতঃ দু'ধরনের হতে পারে, যথা—ক. রাজনৈতিক (Political) এবং খ. প্রশাসনিক (Administrative)। রাজনৈতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ বলতে বোঝায় সরকারের নতুন বিভাগ (unit) সৃষ্টি করে তার হাতে নীতিনির্ধারণের দায়িত্ব অর্পণ করা। আবার জনসাধারণকে প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রদান করা হলেও তাকে রাজনৈতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ বলা হয়। কিন্তু প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ভৌগোলিক (Geographical) কিংবা কর্মভিত্তিক (Functional) হতে পারে। জেলা (District), মহকুমা (Sub-division) ইত্যাদি সৃষ্টি করে ঐ সব অঞ্চলের

প্রশাসনিক কার্যের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করা হলে তাকে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ বলে অভিহিত করা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, স্থানীয় সমস্যাবলীর সমাধান করার দায়িত্ব যখন স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করা হয় তখন তাকে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ বলা হয়। অবশ্য এক্ষেত্রেও স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে উর্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকেই কাজ করতে হয়। সামগ্রিকভাবে এইসব কর্তৃপক্ষের তদারকের দায়িত্ব উর্ধতন কর্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত থাকে। অনেক সময় ঐরূপ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মভিত্তিক হতে পারে। অন্যভাবে বলা যায়, বিশেষ বিশেষ কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব বিশেষ বিশেষ কর্মভিত্তিক সংস্থা, যেমন—বিশ্ববিদ্যালয়, বার-অ্যাসোসিয়েশন, মেডিকেল কাউন্সিল ইত্যাদির হাতে অর্পণ করা হয়।

ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করার কোন অবকাশ নেই সত্য, কিন্তু এর সমস্যাগুলিকেও কোনমতেই উপেক্ষা করা যায় না। ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণের সমস্যাকে ল্যাস্কি প্রধানতঃ দুটি দিক থেকে আলোচনা করেছেন, যথা—ভৌগোলিক সমস্যা (Geographical Problem) এবং কর্মগত সমস্যা (Functional Problem)। যে সব বিষয় প্রকৃতিগতভাবে স্থানীয় চরিত্রবিশিষ্ট সেগুলির সমাধানের দায়িত্ব স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত থাকবে। এই স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দায়িত্বশীল থাকলেও তারা স্বাধীনভাবে কাজ করবে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আরোপিত সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে তারা নতুন নতুন বিষয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালাতে পারে। অন্যভাবে বলা যায়, স্থানীয় বিষয়গুলির উপর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত থাকবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা সাধারণ চরিত্রবিশিষ্ট হবে এবং সেই ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতা হবে না। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত বিষয় তদারক করতে পারলেও তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এই ভৌগোলিক ক্ষমতার বিভাজনের ফলে বিভিন্ন বিষয়ের সমাধান একইভাবে সম্ভব হবে না। কারণ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ যেমন বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত তেমনি জনগণের অংশগ্রহণও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম। বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য জনগণের পারস্পরিক খোলাখুলি আলোচনা বিশেষ গুরুত্বলাভ করবে। ল্যাস্কির মতে, "সমস্যাটা কেবল ভৌগোলিক প্রকৃতির নয়," তা কর্মগতও বটে। ল্যাস্কি বলেছেন, "অবশ্য এটাও বিশেষ প্রয়োজনীয় যে, লন্ডন, ম্যানচেস্টার, নিউইয়র্ক, বার্লিন ও প্যারিস তাদের সকল স্থানীয় ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন থাকবে না বা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দায়িত্বশীলও থাকবে না ; এই সমস্ত ব্যাপারে নতুন কিছু করার জন্য তাদের কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে নতুন ক্ষমতাও চাইতে হবে না। কিন্তু ঠিক সেই সঙ্গে আবার কর্মানুযায়ী বিকেন্দ্রীকরণ সমস্যাও বর্তমান ; ল্যাঙ্কাশায়ার, কানসাস্, বা ব্যাডেন শহরের যেমন স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা থাকবে, তেমনি কার্পাস শিল্পের মত বিভিন্ন পেশাগত স্বার্থসংগঠনগুলোর উপযুক্ত স্বাধীন পরিচালন ব্যবস্থাও থাকবে ; উপযুক্ত রক্ষাকবচ-সহ তাদের কর্মক্ষেত্রে নিজ নিজ ব্যাপার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তারা নিয়মকানুন প্রবর্তন করতে

বিকেন্দ্রীকরণের সমস্যা : ভৌগোলিক ও কর্মগত সমস্যা

পারবে, যেমন ভিয়েনা, লিভারপুল বা টোকিও তাদের স্থানীয় ব্যাপারে করতে পারে। সমস্ত আইনকে কেবল ভৌগোলিকভাবে প্রয়োগ করলে এবং তার জন্য সমস্ত আইন-শাস্ত্রকে সেইভাবে গড়ে তুললে সমাজের অন্যান্য স্বার্থকে অবহেলা করা হবে। যতদিন না আমরা রাষ্ট্রের আইনকানুনকে বিভিন্ন সময়ের উপযোগী ও প্রভাবশালী সংগঠন-গুলোর সঙ্গে উপরোক্তভাবে সংশ্লিস্ট করতে পারছি, ততদিন সেগুলো সুষ্ঠু কার্যাবলী হবে না। সমাজ-নিয়ন্ত্রণকারী রাষ্ট্র, সমাজের অন্যানা পরিবর্তন, বিশেষ করে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে যেতে পারছে না বলেই আধুনিক সভ্যতা অনেকখানি জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে।

কিন্তু মার্কসবাদী লেখকরা এই অভিমত পোষণ করেন যে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে তত্ত্বগতভাবে ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণের নীতি গৃহীত হলেও বাস্তবে নীতিটির অকার্যকারিতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কারণ বুর্জোয়া রাষ্ট্রে ধনিক-বণিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজন হয় উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ। বলা বাহুল্য, কেন্দ্রীভূত উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার সৃষ্টি করে। ফলে বিকেন্দ্রীকরণের প্রশ্নটি মিথ্যা বা অলীক বলে প্রমাণিত হয়। কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা (Democratic Centralism) নীতির মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ এবং স্থানীয় স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয়েছে। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা বলতে কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের সহাবস্থানকেই বোঝায়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে জাতীয় ঐক্য ও আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনের হাতিয়ার হিসেবে এই নীতিটিকে গ্রহণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহ গঠনের সময় নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, ঊর্ধ্বতন সংস্থার নিকট অধস্তন সংস্থাগুলির দায়িত্বশীলতা, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে স্থানীয় নেতৃত্বের সমন্বয় সাধন, সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য ও আদর্শের প্রতি কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলির অখন্ড আনুগত্য ইত্যাদির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে।

১৩। আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রপ্রবণতা (Centralising Tendencies in Modern Federation)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মূল নীতি হোল—আঞ্চলিক সরকারগুলি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন না দিয়েও একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়। সংবিধান অনুসারে উভয় প্রকার সরকার নিজ নিজ শাসন প্রয়োগ করে। কিন্তু বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো ও কার্যগত ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রে উত্তরোত্তর কেন্দ্রীয় সরকার অত্যধিক পরিমাণে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিকভাবেই রাজ্য সরকারগুলির স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব এর ফলে বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের এই সাম্প্রতিক গতিকে 'কেন্দ্রপ্রবণতা' (Centralisation) বলে আখ্যা দেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রের এরূপ কেন্দ্রপ্রবণতা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। বিভিন্ন উপাদান ও শক্তির সমন্বয়ে এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

কেন্দ্রপ্রবণতা বলতে কি বোঝায়

কে. সি. হোয়ারের মতে, এই কেন্দ্রপ্রবণতার প্রধান কারণ হোল—১. যুদ্ধ (War) ২. অর্থনৈতিক সংকট (Economic Depression), ৩. রাষ্ট্রের সমাজ-সেবামূলক কার্যের সম্প্রসারণ (Growth of Social Services) এবং ৪. পরিবহণ ও শিল্পের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক বিপ্লব (Mechanical revolution in Transport and Industry)। লিপসন (Lipson)-এর মতে, সম-অধিকারের রাজনৈতিক দাবি, আর্থিক বাজারের সম্প্রসারণ, সামাজিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্থায়িত্বের দাবি, সামরিক প্রস্তুতিজনিত শঙ্কা এবং জেট বিমান, মহাকাশচারী রকেট ও পারমাণবিক যুগে যুদ্ধের কলাকৌশলগত পরিবর্তন প্রভৃতি কারণে বর্তমান বিশৃঙ্খলাপূর্ণ রাজনীতির সঙ্গে ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণের নীতি অসংগতিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। তিনি একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, কার্যতঃ বর্তমান সমাজের সমস্ত প্রধান প্রধান শক্তি ঐক্যবদ্ধভাবে এককেন্দ্রিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

হোয়ারের অভিমত

(১) বর্তমান শতাব্দীর যুদ্ধ হোল সামগ্রিক যুদ্ধ। এরূপ ব্যয়বহুল যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সমগ্র দেশের জনবল, ধনবল ও আর্থিক সম্পদের দ্রুত বিনিয়োগ একান্ত প্রয়োজন। এই সব দ্রুতগতিতে এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের ক্ষমতা রাজ্যগুলির নেই। স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধ পরিচালনার গুরুদায়িত্ব এসে পড়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার অত্যধিক পরিমাণে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তাছাড়া সম্ভাব্য যুদ্ধের মোকাবিলা করার এবং জাতীয় সংহতি রক্ষার জন্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা প্রয়োজন। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের সংবিধানেই এই প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে অর্পণ করা হয়েছে। সাধারণ অবস্থায় সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকলেও যুদ্ধের সময় কেন্দ্রীয় সরকারের এই ক্ষমতা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। তখন কার্যতঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এককেন্দ্রিক সরকারে পরিণত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রায় যুক্তরাষ্ট্র কার্যক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়। তাই লিপসন যুদ্ধকে কেন্দ্রীয়করণের অন্যতম বৃহৎ উপাদান (great centraliser) বলে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং বলা যায় যে, প্রকৃত যুদ্ধের অবস্থা কিংবা যুদ্ধের ভীতি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এককেন্দ্রিক প্রবণতা সৃষ্টি করে।

যুদ্ধ বা যুদ্ধের ভীতি

(২) ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফল হিসেবে বর্তমানে জনগণের মধ্যে ব্যাপক দারিদ্র্য, বেকারত্ব, দুর্ভিক্ষ, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, আর্থিক মন্দা প্রভৃতি অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে। রাজ্যগুলির সীমিত অর্থনৈতিক ক্ষমতার দ্বারা এই সব সমস্যার সমাধান করা অসম্ভব। এই অর্থনৈতিক সংকট থেকে দেশকে মুক্ত করার দায়িত্ব স্বভাবতঃই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত হয়। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছে। তিরিশের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রুজভেল্টের 'নিউ ডিল' (New Deal) আইনের কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আর্থিক সংকট

(৩) বর্তমানে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের (Welfare State) ধ্যানধারণা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরকারের কার্যাবলীও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্যরক্ষা,

চিকিৎসার বন্দোবস্ত, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করা প্রতিটি সরকারের অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য। এইসব কল্যাণকর কার্যের জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ও দক্ষতার প্রয়োজন তা রাজ্য সরকারগুলির নেই। তাছাড়া, জনকল্যাণকর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারগুলির হস্তে ন্যস্ত থাকলে রাজ্য সরকারগুলি নিজ নিজ পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী পরস্পর-বিরোধী আইন প্রণয়ন করতে পারে। ফলে জাতীয় সংহতি বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এইসব কারণে স্বভাবতই সমাজসেবামূলক কার্যাবলী সম্পাদনের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে অর্পিত হয়। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলির উপর প্রাধান্য-প্রতিপত্তি বিস্তার করতে সমর্থ হয়।

সমাজসেবামূলক কার্যাবলীর প্রসার

(৪) বর্তমানে পরিবহন ব্যবস্থা ও শিল্পের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হওয়ার ফলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা সহজসাধ্য হয়ে পড়েছে। সেই সঙ্গে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্যাবলী স্থানীয় সমস্যা না থেকে জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। সুষ্ঠু শিল্পনীতি প্রণয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির বনিয়াদকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া, প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবনীয় উন্নতির ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও আর্থিক লেনদেনের মাত্রা সম্প্রসারিত হয়েছে। এমতাবস্থায় একমাত্র জাতীয় সরকারই এইসব কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে বলে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পরিবহন ও শিল্পের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক বি[illegible]

(৫) আধুনিক জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা একান্ত অপরিহার্য বলে মনে করা হয়। সমগ্র দেশে একই প্রকার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা চালু করা না হলে সমভাবে জনকল্যাণ সাধন করা সম্ভব নয়। কিন্তু দেশব্যাপী অখণ্ড পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ও সুদক্ষ নেতৃত্ব প্রয়োজন রাজ্য সরকারগুলির তা নেই। তাই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে অর্পণ করা হয়। এইভাবে অখণ্ড পরিকল্পনা পরিচালনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সংবিধানবহির্ভূতভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

(৬) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধান ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিচার বিভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার বৃদ্ধিসাধন করেছে। অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হওয়ার ফলে সংবিধান সংশোধন ছাড়াই কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সম্প্রসারিত হয়েছে। এরূপ পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রভাব বিচারপতিদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে পুরাতন সংবিধানের সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য বিচারপতিরা কেন্দ্রীয় সরকারের সপক্ষে রায়দান করেন। উদাহরণ স্বরূপ ১৮২৪ সালে গিবনস্ বনাম অগডেন মামলায় মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের রায়দানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

কেন্দ্রীয় সরকারের সপক্ষে বিচার বিভাগের রায়দান

(৭) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বের রাজনীতি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাগুলিতে

কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সম্প্রসারিত করেছে। সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার মধ্যে ঠান্ডা লড়াই-জনিত পরিবেশ, উভয় শিবিরের মধ্যে আঞ্চলিক সামরিক জোট গঠন, পারমাণবিক অস্ত্র সম্প্রসারণের সুতীব্র প্রতিযোগিতা, মহাকাশ অভিযানজনিত উৎকণ্ঠা ইত্যাদির ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করার ক্ষমতা রাজ্য সরকারগুলির না থাকায় স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অপ্রতিহতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বের পরিবর্তিত রাজনীতি

(৮) কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আধুনিক যুগে যুক্তরাষ্ট্রসমূহের কেন্দ্রপ্রবণতার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেন যে বিংশ শতাব্দীতে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা একচেটিয়া অর্থব্যবস্থায় পরিণত হওয়ার ফলেই যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রপ্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ধনতন্ত্রের একচেটিয়া রূপ হোল কেন্দ্রীভূত উৎপাদন ও বন্টনব্যবস্থা। এই কেন্দ্রীভূত উৎপাদন ও বন্টন-ব্যবস্থা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার সৃষ্টি করে। সর্বোপরি, অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের জন্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব

উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির চারিত্রিক পুনর্বিন্যাস যুক্ত-রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রাভিগামী শক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থাকে পরিবর্তিত করেছে। তবে একথা সত্য যে, যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কেন্দ্রপ্রবণতা লক্ষ্য করা গেলেও যুক্তরাষ্ট্রের আপাতদৃষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি।

১৪। যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ (Prospect of Federalism)

আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অনেকেই অভিমত পোষণ করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। এঁদের মতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা অদূর-ভবিষ্যতে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় রূপান্তরিত হবে। কিন্তু কে. সি. হোয়ার প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ এই অভিমত পোষণ করেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ-রাজ্যগুলির গুরুত্ব, আত্মসচেতনতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া ও সুইজারল্যান্ডের ক্যান্টনগুলির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মতবিরোধ

যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উপরি-উক্ত দু'টি মতেরই পেছনে যে কিছুটা সত্যতা আছে তা অস্বীকার করা যায় না। একথা সত্য যে, বর্তমান বিশ্বের পরিবর্তিত সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ছাড়া যেমন কোন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব নয়, তেমনি আবার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতি বিকাশের স্বাধীনতা এবং বিশেষ বিশেষ অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার অধিকারেরও স্বীকৃতি প্রয়োজন। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হলেই কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকার ; কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল

সাফল্য আসতে পারে। কেবলমাত্র সেই যুক্তরাষ্ট্রেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আসতে পারে যা আত্মনিয়ন্ত্রণ ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। বলা বাহুল্য, এর জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রয়োজন। অধ্যাপক হোয়ার মনে করেন যে, যদি যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে তাহলে যুক্তরাষ্ট্র কখনই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারবে না। কিন্তু যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর মূল স্রষ্টা যে পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থা—একথা তিনি স্বীকার করতে সম্মত নন। তাছাড়া, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাতে কোন কোন অঞ্চলের বিকাশ সাধিত হবে এবং কোন কোন অঞ্চলের বিকাশ ব্যাহত হবে—একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এর ফলে অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ, ঈর্ষা প্রভৃতি বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে সৌভ্রাত্রমূলক মনোভাব একান্ত অপরিহার্য। বলা বাহুল্য, সৌভ্রাত্রমূলক মনোভাব এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব কেবলমাত্র তখনই অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে গড়ে উঠতে পারে যখন ঐকান্তিকভাবে তারা উপলব্ধি করতে পারে যে, তাদের সকলের আত্মবিকাশের উপযোগী সমান সুযোগসুবিধা রয়েছে এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্ক যথার্থ সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বলা বাহুল্য, পুঁজিবাদী যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে এই মনোভাব গড়ে উঠতে পারে না। তাই পুঁজিবাদী যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ আলোকোজ্জ্বল নয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশের কোন সঙ্গত কারণ নেই।

১৫। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার (Presidential Government)

গার্নারকে অনুসরণ করে বলা যায় যে, রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার হোল এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে শাসন বিভাগ আইন বিভাগের প্রভাবমুক্ত হয়ে সংবিধান অনুসারে কার্য পরিচালনা করে। আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করে। রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থায় কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এগুলি হোল :

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

(১) সংসদীয় শাসনব্যবস্থার মত রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক বা নামসর্বস্ব কোন রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন না। রাষ্ট্রপতি হলেন দেশের প্রকৃত শাসক। মন্ত্রি-পরিষদের দ্বারা তিনি পরোক্ষভাবে দেশ শাসন করেন না। তত্ত্বগত ভাবে এবং বাস্তবে রাষ্ট্রপতি প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। তাই রাষ্ট্রপতিকে রাষ্ট্রের এবং শাসন বিভাগের প্রধান বলে অভিহিত করা হয়।

রাষ্ট্রপতি দেশের প্রকৃত শাসক

(২) রাষ্ট্রপতি সংবিধান অনুসারে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হন। সম্পাদিত কার্যাবলীর জন্য তাঁকে জনগণের নিকট দায়িত্বশীল থাকতে হয়। একমাত্র অক্ষমতা, সংবিধানভঙ্গ, দুর্নীতি বা দেশদ্রোহের অপরাধ ছাড়া কার্যকালের মেয়াদ পরিসমাপ্তির পূর্বে তাঁকে কোনভাবেই পদচ্যুত করা যায় না। আবার পদচ্যুত করতে হলে বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।

কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে রাষ্ট্রপতিকে সাধারণভাবে পদচ্যুত করা যায় না

(৩) রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ থাকার ফলে রাষ্ট্রপতি যেমন আইন বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন না, তেমনি আইন বিভাগও রাষ্ট্রপতির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। রাষ্ট্রপতি এবং তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলী আইনসভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে পারেন না এবং প্রশ্নোত্তরে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। আইন বিভাগও অনুরূপ রাষ্ট্রপতি বা তাঁর মন্ত্রিসভার উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না কিংবা তাঁদের পদচ্যুত করতে পারে না। রাষ্ট্রপতি অবশ্য আইনসভায় বাণী (message) প্রেরণ করতে পারেন। কিন্তু আইনসভা রাষ্ট্রপতি-প্রেরিত বাণীকে গুরুত্ব নাও দিতে পারে। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রপতি আইনসভাকে ভেঙে দিতেও পারেন না।

আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ পরস্পর নিরপেক্ষ

(৪) এরূপ শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। আইনসভার নিকট মন্ত্রিগণের কোন দায়দায়িত্ব থাকে না। তাঁরা রাষ্ট্রপতির নির্দেশে কার্য পরিচালনা করেন। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন এবং রাষ্ট্রপতির বিরাগভাজন হলে সেই মন্ত্রীকে তিনি মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করতে পারেন। সম্পাদিত কার্যাবলীর জন্য মন্ত্রিপরিষদ রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকেন। বস্তুতঃ এরূপ শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতির অধস্তন কর্মচারী ছাড়া আর কিছুই নয়।

মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতির অধস্তন কর্মচারীমাত্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অবশ্য লাতিন আমেরিকার কয়েকটি দেশ, ফিলিপিনস্ প্রজাতন্ত্র, লাইবেরিয়া, দঃ কোরিয়া প্রভৃতি দেশে এরূপ শাসনব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করা যায়।

উদাহরণ

১৬। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের গুণাগুণ (Merits and Demerits of Presidential Government)

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের গুণাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য:

(১) রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থায় শাসন-বিভাগের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হলেন রাষ্ট্রপতি। গৃহবিপ্লব, যুদ্ধ প্রভৃতি আপৎকালীন বা জরুরী অবস্থায় এরূপ শাসনব্যবস্থা বিশেষ কার্যকরী। কারণ শাসনবিভাগের যাবতীয় ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রপতির হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকার ফলে তিনি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে পারেন। এইসব সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তাঁকে আইনসভার নির্দেশের উপর নির্ভর করতে হয় না বলে তিনি সময়োপযোগী এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিপদকালীন অবস্থার মোকাবিলা করতে পারেন।

আপৎকালীন অবস্থার পক্ষে বিশেষ কার্যকর

(২) স্থায়িত্ব হোল এরূপ শাসনব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য গুণাবলীর অন্যতম। আইনসভার সমর্থনের উপর রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ নির্ভর করে না বলে সংবিধান-নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্য রাষ্ট্রপতি স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারেন। তাই সংসদীয় শাসনের মত

স্থায়িত্ব

এরূপ শাসনব্যবস্থায় ঘন ঘন সরকারের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। ফলে শাসনকার্যে একদিকে যেমন নিরবচ্ছিন্নতা বজায় থাকে, অন্যদিকে তেমনি সরকার প্রশাসনিক কার্য নিশ্চিন্তে সম্পাদন করতে পারে।

(৩) সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনের উপর মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব নির্ভর করে বলে মন্ত্রিগণ দলীয় সমর্থন লাভের জন্য সব সময়ে ব্যস্ত থাকেন। অনেক সময় তাঁরা দলীয় সমর্থন অটুট রাখার জন্য দুর্নীতি, স্বজনপোষণ প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসনব্যবস্থায় সরকারের স্থায়িত্ব আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল নয় বলে মন্ত্রিগণ দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ না করে নিশ্চিন্তভাবে সরকারী কার্যে মনোনিবেশ করতে পারেন।

দলপ্রথার কুফল থাকে না

(৪) অনেকের মতে, বহুদলীয় রাষ্ট্রের পক্ষে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার বিশেষ উপযোগী। কারণ এরূপ রাষ্ট্রে অনেকগুলি পরস্পর-বিরোধী দলের অস্তিত্ব থাকার ফলে অনেক সময় আইনসভার কোন দল এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সমর্থ না হওয়ায় সম্মিলিত সরকার গঠিত হয়। সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় যেহেতু সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনের উপর, সেহেতু এরূপ ক্ষেত্রে কোন একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় আইনসভার দলগুলি ঐকমত্যে উপস্থিত হতে পারে না। ফলে সরকারের স্থায়িত্ব বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থায় আইনসভার সমর্থনের উপর সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে না বলে বহুদলীয় রাষ্ট্রের পক্ষে এরূপ শাসনব্যবস্থা অনেক বেশী কাম্য বলে মনে করা হয়।

বহুদলীয় রাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষ উপযোগী

(৫) রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ থাকার ফলে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ একে অপরের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কার্য পরিচালনা করতে পারে। শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। সরকার যেমন আইনসভার প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কার্য সম্পাদন করতে পারে, তেমনি আইনসভাও স্বাধীনভাবে সরকারী ভুলত্রুটির সমালোচনা করে সরকারকে সঠিক পথে চলতে বাধ্য করে। আবার অনেকে মনে করেন যে, ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ থাকার ফলে এরূপ শাসনব্যবস্থায় জনগণের স্বাধীনতা অধিক পরিমাণে রক্ষিত হয়।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের সুবিধা

(৬) রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন। সাধারণতঃ রাষ্ট্রপতি সুদক্ষ লোকদের উপর এক একটি বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করেন। অনেক সময় যোগ্য মনে করলে রাষ্ট্রপতি নিজ দলের নয় এমন ব্যক্তিকেও মন্ত্রিপরিষদে স্থান দেন। এই সব সুদক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হওয়ার ফলে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে এবং সুদক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালিত হয় এবং শাসনকার্যে বিশেষ উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়।

শাসনকার্যে উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের সপক্ষে উপরি-উক্ত যুক্তিগুলির অবতারণা করা হলেও

উক্ত শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। এই প্রকার শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করা হয়ঃ

(ক) রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ নীতি গৃহীত হওয়ার ফলে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করতে পারে। ফলে সরকারের উভয় বিভাগের মধ্যে যে-কোন সময় বিরোধ দেখা দিতে পারে। আইন বিভাগ-প্রণীত আইনকে শাসন বিভাগ কার্যকরী করতে না চাইলে স্বাভাবিকভাবেই উভয় বিভাগের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে। এরূপ হলে জাতীয় স্বার্থ সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাছাড়া, উভয় বিভাগের মধ্যে মধুর সম্পর্ক না থাকার ফলে অযথা মূল্যবান সময়ের অপচয় হতে পারে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অযথা কালক্ষেপ হতে পারে।

ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণের কুফল

(খ) শাসন বিভাগের উপর আইন বিভাগের কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকার ফলে শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্রপতি যে-কোন সময় স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারেন। একবার নির্বাচিত হলে তাঁকে সাধারণতঃ পদচ্যুত করা যায় না। তাছাড়া, একজন মাত্র ব্যক্তির হাতে শাসন বিভাগের সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকার ফলে রাষ্ট্রপতির স্বৈরাচারী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। বলা বাহুল্য, এরূপ ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের অপমৃত্যু অনিবার্যভাবেই ঘনিয়ে আসে।

রাষ্ট্রপতির স্বৈরাচারী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল

(গ) রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থায় আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে বিরোধের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকায় বিচার বিভাগের প্রাধান্য অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। উভয় বিভাগের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে গিয়ে আইনের ব্যাখ্যা প্রদান, ক্ষমতার প্রশ্নে বিরোধ নিষ্পত্তি প্রভৃতির মাধ্যমে বিচার বিভাগের প্রাধান্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়।

বিচার বিভাগের অস্বাভাবিক প্রাধান্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা

(ঘ) এরূপ শাসনব্যবস্থায় আইন প্রণয়নের জন্য আইন বিভাগ কয়েকটি কমিটিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং কমিটিগুলি স্বতন্ত্রভাবে আইন প্রণয়ন করে। প্রয়োজনীয় আইন প্রণীত হওয়ার পর কমিটিগুলিকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়। এর ফলে একদিকে যেমন আইন প্রণয়নের ব্যাপারে কমিটিগুলির দায়িত্ব বিভক্ত হয়ে পড়ে, অন্যদিকে তেমনি কোন একটি প্রণীত আইনের জন্য কে দায়ী তা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব হয় না। এক কথায় বলা যায় যে, এরূপ শাসনব্যবস্থায় দায়িত্ব বিভক্ত হওয়ার ফলে দায়িত্বের অবস্থান নির্ণয় করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য।

দায়িত্বের অবস্থান নির্ণয় কষ্টসাধ্য

(ঙ) অনেকের মতে রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থায় কমিটিগুলির দ্বারা আইন প্রণীত হয় বলে অনেক সময় জাতীয় স্বার্থের পরিবর্তে আঞ্চলিক স্বার্থে বা কোন বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থে আইন প্রণীত হতে পারে। এর ফলে দেশের স্বার্থ সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

অনেক সময় জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষিত হয়

(চ) রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির পদে কোন ব্যক্তি একবার নির্বাচিত হলে সাধারণতঃ কার্যকাল পরিসমাপ্তির পূর্বে তাঁকে অপসারিত করা যায় না। ফলে অযোগ্য ও অপদার্থ কোন ব্যক্তি উক্ত পদে নির্বাচিত হলেও জাতীয় জরুরী অবস্থায় জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে তাকে অপসারিত করা সম্ভব নয়।

জরুরী অবস্থার উপযোগী নয়

বর্তমানে অবশ্য দলপ্রথার উদ্ভব ও বিকাশের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত রাষ্ট্রপতি-শাসিত রাষ্ট্রেও আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সংযোগ রক্ষা এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে জাতীয় আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণ করা অনেকাংশে সম্ভব হয়েছে।

উপসংহার

১৭। সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ-পরিচালিত সরকার (Parliamentary or Cabinet Government)

ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ নীতির উপর ভিত্তি করে গণতান্ত্রিক সরকারগুলিকে মূলতঃ দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা—রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার এবং সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ পরিচালিত সরকার। যে শাসন-ব্যবস্থায় আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং শাসন বিভাগের স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতা আইন বিভাগের উপর নির্ভরশীল তাকে সংসদীয় সরকার বলা হয়। কিন্তু ব্যাপক অর্থে সংসদীয় সরকারের উপরি-উক্ত সংজ্ঞা প্রদান করা হলেও বর্তমানে এরূপ শাসনব্যবস্থায় সংসদের প্রাধান্যের পরিবর্তে মন্ত্রিপরিষদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই অনেকে এরূপ শাসনব্যবস্থাকে মন্ত্রিপরিষদশাসিত সরকার বলে অভিহিত করেন। অনেক সময় আবার এরূপ শাসনব্যবস্থাকে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা বা সংসদ চালিত শাসনব্যবস্থা বলা হয়।

সংসদীয় সরকারের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

সংসদ-চালিত বা মন্ত্রিপরিষদ-শাসিত সরকারের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যথা :

(১) সংসদ-চালিত শাসনব্যবস্থার প্রথম বৈশিষ্ট্য হোল একজন নামসর্বস্ব (Titular) বা নিয়মতান্ত্রিক (Constitutional) শাসকের অবস্থিতি। আইনগতভাবে দেশের যাবতীয় কার্য রাষ্ট্রপ্রধান সম্পাদন করেন। কিন্তু বাস্তবে তাঁর নামে মন্ত্রিপরিষদ শাসনকার্য পরিচালনা করে। অন্যভাবে বলা যায়, রাষ্ট্রপ্রধান আইনগতভাবে দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হলেও বাস্তবে তিনি কোন কার্য সম্পাদন করেন না। তিনি রাজত্ব করেন কিন্তু দেশ শাসন করেন না। তিনি রাষ্ট্রের প্রধান, কিন্তু সরকারের প্রধান নন।

রাষ্ট্রপ্রধান নামসর্বস্ব শাসক

(২) এরূপ শাসনব্যবস্থায় সরকারী নীতি ও কার্যাবলীর জন্য মন্ত্রিপরিষদ সংসদ বা আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকে। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, যে সব রাষ্ট্রে আইনসভার দুটি কক্ষ থাকে সেখানে জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত নিম্নকক্ষের নিকট মন্ত্রিপরিষদ দায়িত্বশীল থাকে। এর ফলে মন্ত্রিপরিষদ প্রত্যক্ষভাবে জনপ্রতিনিধিকক্ষের নিকট এবং পরোক্ষভাবে জনগণের নিকট দায়িত্বশীল থাকে।

মন্ত্রিপরিষদ আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকে

(৩) আইনসভার নিকট মন্ত্রিপরিষদের দায়িত্ব আবার দু'ধরনের হতে পারে, যথা—ব্যক্তিগত দায়িত্ব এবং যৌথ দায়িত্ব। ব্যক্তিগত দায়িত্ব বলতে বোঝায় প্রতিটি বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিজ বিভাগের কার্যাবলীর জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন। কিন্তু সরকারী নীতি ও কার্যাবলীর জন্য মন্ত্রিগণ যখন যৌথভাবে বা সামগ্রিকভাবে আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকেন তখন সেই দায়িত্বকে যৌথ দায়িত্ব বলা হয়। যেহেতু মন্ত্রিপরিষদের বিনা সম্মতিতে কোন একজন মন্ত্রী এককভাবে কার্য সম্পাদন করতে পারেন না সেহেতু উক্ত মন্ত্রীর ভুলত্রুটির জন্য সমগ্র মন্ত্রিপরিষদকেই দায়ী হতে হয়। অবশ্য অনেক সময় কোনও একজন মন্ত্রী নিজ সম্পাদিত কার্যাবলীর জন্য এককভাবে দায়ী বলে প্রমাণিত হলে সেক্ষেত্রে আইনসভা কেবলমাত্র সেই মন্ত্রীকে পদচ্যুত করতে পারে।

যৌথ দায়িত্ব

(৪) সংসদ-শাসিত শাসনব্যবস্থার অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হোল—আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার ফলে এক বিভাগ অন্য বিভাগকে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃবৃন্দই মন্ত্রিপরিষদের সদস্য। স্বাভাবিকভাবে মন্ত্রিগণ আইন বিভাগের উপর অতি সহজেই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। ফলে মন্ত্রিপরিষদ যে সব কার্য সম্পাদন করে তার পেছনে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠদের সমর্থন থাকে।

আইনবিভাগ ও শাসন বিভাগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

(৫) অনেকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বকে সংসদ-চালিত সরকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন। আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বা নেত্রীকেই প্রধানমন্ত্রীর পদ প্রদান করা হয়। যদিও তত্ত্বগতভাবে তিনি সমক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য, তথাপি কার্যক্ষেত্রে তিনি অন্যান্য মন্ত্রী অপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী। আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অবিসম্বাদিত নেতা বা নেত্রী হিসেবে তিনি তাঁর দলের সকলের বা সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থাভাজন এবং প্রিয়জন বলে পরিচিত। স্বাভাবিকভাবে সরকারী নীতি নির্ধারণে এবং কার্য পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর মতামতই প্রাধান্যলাভ করে। বস্তুতঃ প্রধানমন্ত্রী হলেন সংসদীয় শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ প্রকৃত শাসক। তাঁর নির্দেশে এবং পরামর্শে নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাই প্রধানমন্ত্রীর চারিত্রিক দৃঢ়তা, সুনাম, যোগ্যতা প্রভৃতির উপর সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে।

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব

(৬) শক্তিশালী ও সুগঠিত এক বা একাধিক বিরোধী দলের অস্তিত্ব সংসদ-চালিত শাসনব্যবস্থার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বিরোধী পক্ষের ভূমিকা পালন করে। সরকারের ভুলত্রুটির সমালোচনা করে বিরোধীপক্ষ সরকারকে সংযত থাকতে এবং জনকল্যাণকর কার্যে আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য করে। অন্যভাবে বলা যায়, বিরোধী দল থাকার ফলে সরকার পক্ষ স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে না। এদিক থেকে বিচার করে বিরোধী দলকে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রাণ বলা যেতে পারে। তাই জেনিংস প্রমুখেরা বিরোধীপক্ষকে সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্যের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত বলে বর্ণনা করেছেন।

শক্তিশালী বিরোধী দলের অস্তিত্ব

কিন্তু সংসদীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে অনেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁরা মনে করেন যে, ধনতন্ত্রের সঙ্গে সংসদীয় গণতন্ত্রের একটি কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে। রজনী পামদত্তের মতে, সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই বুর্জোয়া শ্রেণী সামন্ততান্ত্রিক ও মধ্যযুগীয় বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর জন্মগত অধিকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করেছিল। তবে এরূপ শাসনব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে ধনিকের শাসন প্রবর্তিত না হলেও তা অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে সংগঠিত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক নীতিসমূহের স্বীকৃতি সত্ত্বেও কার্যতঃ এমন একটি রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠে যার মাধ্যমে ধনিকশ্রেণী নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

অন্য একটি অভিমত

১৮। সংসদ-চালিত সরকারের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Parliamentary form of Government)

সাম্প্রতিককালে সংসদ-চালিত সরকারের অত্যধিক জনপ্রিয়তা এরূপ শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষের ঘোষণা করে। সংসদ-চালিত সরকারের প্রধান প্রধান সুবিধাগুলি হোল :

(১) এরূপ শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুসৃত হয় না বলে আইন বিভাগের সঙ্গে শাসন বিভাগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। উভয় বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে শাসন বিভাগ আইন বিভাগকে জনকল্যাণ সাধনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উপদেশাদি প্রদান করতে পারে। তাছাড়া, উভয় বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সম্প্রীতি থাকার ফলে আইন বিভাগ-প্রণীত আইনগুলিকে শাসন বিভাগ যথাযথভাবে কার্যকরী করে। ফলে দেশে সুশাসন সম্ভব হয়।

আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

(২) সংসদ-চালিত শাসনব্যবস্থায় নিজ সম্পাদিত কার্যাবলীর জন্য মন্ত্রিপরিষদ আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকে। তাই মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছাচারী হয়ে জনস্বার্থবিরোধী কোন কাজ করতে অগ্রসর হলে আইনসভা মন্ত্রিপরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারে। বলা বাহুল্য, অনাস্থা প্রস্তাবের ভয়ে মন্ত্রিসভা সংযত থাকতে বাধ্য হয়; তাছাড়া আইনসভায় জনপ্রতিনিধিরা থাকার ফলে আলোচনা-সমালোচনা, তর্ক-বিতর্ক প্রভৃতির মাধ্যমে জনমতের গতি-প্রকৃতি সরকার সহজেই অনুধাবন করতে পারে এবং জনমতের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে সরকারী নীতি নির্ধারণ করতে পারে।

মন্ত্রিসভার স্বেচ্ছাচারিতা রোধ

(৩) সংসদীয় শাসনব্যবস্থার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হোল—একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব। একাধিক দল থাকার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বিরোধী পক্ষের ভূমিকা গ্রহণ করে। সরকারী পক্ষ সরকারী নীতি, কার্যাবলী প্রভৃতির ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে জনমতকে নিজ সমর্থনে রাখার চেষ্টা করে। অপরদিকে বিরোধী পক্ষ সরকারী নীতি ও কার্যাবলীর সমালোচনা করে জনমতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। এইভাবে পরস্পর-বিরোধী একাধিক মত, আলোচনা, কর্মপন্থা প্রভৃতি থাকায় জনগণ স্বাভাবিকভাবে সচেতন হয়ে উঠে।

রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার

(৪) এরূপ শাসনব্যবস্থা চরিত্রগতভাবে নমনীয় ও পরিবর্তনশীল হওয়ার জন্য জাতীয় প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সহজেই সরকারী নীতি ও নেতৃত্বকে পরিবর্তন করা সম্ভব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গ্রেট ব্রিটেনে চেম্বারলেনের পরিবর্তে চার্চিলের নেতৃত্বে সম্মিলিত (Coalition) মন্ত্রিসভা গঠনের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইভাবে জাতীয় জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য, তথা সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এরূপ শাসনব্যবস্থা বিশেষভাবে সমর্থনযোগ্য।

জাতীয় প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব

(৫) সংসদ-চালিত শাসনব্যবস্থার অন্যতম গুণ হোল এর স্থায়িত্ব। সাধারণতঃ আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করে বলে এরূপ সরকার সহজেই আইনসভার সক্রিয় সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ করে। ফলে সরকার দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।

স্থায়িত্ব

(৬) সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারী দলের সমর্থকদের আতিশয্য এবং বিরোধী দলের সমর্থকদের প্রতিকূলতার মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। আলাপ-আলোচনা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সরকারী কার্য পরিচালিত হয় বলে এরূপ শাসনব্যবস্থায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়।

সু-শাসন সম্ভব

(৭) অনেকের মতে, এরূপ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব। রাজাকে নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসেবে রেখে মন্ত্রিপরিষদ প্রকৃত শাসক হিসেবে দেশের শাসনকার্যাদি পরিচালনা করতে পারে।

রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব

কিন্তু পূর্বোক্ত গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও সংসদীয় শাসনব্যবস্থার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এগুলি হোল :

(ক) সংসদ-শাসিত শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হোল দলপ্রথা। ভিন্ন ভিন্ন আদর্শে উদ্বুদ্ধ রাজনৈতিক দলগুলি রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের জন্য একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠে। আইনসভার ভিতরে ও বাইরে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেক সময় অভদ্র আচরণে রূপান্তরিত হয়। সরকারী দল ও বিরোধী দলগুলির মধ্যে বাক্-যুদ্ধ, পারস্পরিক বিরূপ সমালোচনা, নিন্দা, অপপ্রচার, এমন কি ব্যক্তিগত আক্রমণ রাজনৈতিক আকাশকে বিষাক্ত করে তোলে। ফলে দেশের শান্তিশৃংখলা বিনষ্ট হয় এবং প্রশাসনিক কাজ উপেক্ষিত হয়।

দল প্রথার বিষময় ফল দৃষ্ট হয়

(খ) এরূপ শাসনব্যবস্থায় অনেকগুলি রাজনৈতিক দল সরকার গঠনের চেষ্টা করে। অনেক সময় দলগুলির মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে কোন একটি দল এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সমর্থ হয় না। ফলে একাধিক দলের সম্মিলিত (Coalition) সরকার গঠিত হতে দেখা যায়। কিন্তু পরস্পর-বিরোধী দলগুলির মধ্যে সাময়িকভাবে বোঝাপড়া করে মন্ত্রিসভা গঠিত হলেও শেষ পর্যন্ত অন্তর্বিরোধ মন্ত্রিসভাকে দুর্বল করে দেয়, মন্ত্রিসভা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। ফলে বারংবার নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য জনগণকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হয়। এর ফলে জনগণ অনেক সময় সংসদীয় শাসনের উপর বিরক্ত হয়ে উঠে।

বহুদলীয় শাসন-জনিত ত্রুটি

(গ) অনেকের মতে, সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ না থাকার ফলে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা যে-কোন সময় বিনষ্ট করার জন্য আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে 'অশুভ আঁতাত' গড়ে উঠতে পারে।

ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষে ক্ষতিকর

(ঘ) সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় দলীয় রাজনীতির প্রাধান্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃবর্গ মন্ত্রিসভা গঠন করেন। স্বাভাবিকভাবেই আইনসভার অধিকাংশ সদস্যের উপর মন্ত্রিসভার নিয়ন্ত্রণ ব্যাপকভাবে বিস্তার-লাভ করে। দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে মন্ত্রিগণ যে-কোন বিরোধী সমালোচনার কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিতে পারেন। কারণ দল থেকে বহিষ্কৃত ব্যক্তির রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অপমৃত্যু ঘটে। তাই দলের প্রতিটি সদস্য দলীয় নীতি ও কার্যকে অন্ধভাবে সমর্থন করতে বাধ্য থাকেন। এর ফলে কার্যতঃ মন্ত্রিসভার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেকে এই অবস্থাকে 'নয়া স্বৈরাচার' (Neo-Despotism) বলে অভিহিত করেছেন।

নয়া স্বৈরাচারের উদ্ভব ঘটতে পারে

(ঙ) অনেকের মতে, এরূপ শাসনব্যবস্থায় নিজ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মন্ত্রিপরিষদকে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনের উপর নির্ভর করতে হয় বলে মন্ত্রিগণ অনেক সময় স্বজনপোষণ করেন এবং দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠতে পারেন। ফলে জনকল্যাণ সাধনের পরিবর্তে এরূপ শাসনব্যবস্থা দলীয় স্বার্থসিদ্ধির দিকে অধিকতর মনোযোগী হয়ে উঠতে পারে।

দুর্নীতিপরায়ণ শাসন

(চ) সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দ মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। কিন্তু জনপ্রিয়তা কখনই সুশাসনের মাপকাঠি হতে পারে না। বরং কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রশাসনিক কার্য পরিচালনার জন্য মন্ত্রিগণকে আমলাদের উপর যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করতে হয়। ফলে সংসদীয় শাসন কার্যতঃ আমলাতান্ত্রিক শাসনে রূপান্তরিত হয়। সি. কে অ্যালেনের মতে, স্বৈরতন্ত্র শাসন বিভাগকে নিজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির যন্ত্রে পরিণত করে। অনেকের মতে, শ্রেণী-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সকলেই বিভিন্ন সরকারী বিভাগের দৌরাত্ম্য মেনে নিতে বাধ্য হয়। "কিন্তু বিশ্লেষণ করে দেখা যাবে, আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতি এবং এই যন্ত্রের গঠন উভয়ই বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থের উপযোগী।"

আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য বৃদ্ধি

(ছ) সংসদীয় শাসনে জনমতের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়। "কিন্তু ধনিক রাষ্ট্রে জনসাধারণ স্বাধীন আবহাওয়ায় মতামত গঠন বা প্রকাশের সুযোগ পায় না। জনমত গঠনের বিভিন্ন বাহন, যথা—সংবাদপত্র, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, রেডিও, সিনেমা, মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতি ধনিকেরাই নিয়ন্ত্রণ করে। অতএব ধনিক স্বার্থের অনুকূলে তত্ত্ব প্রচার ও পরিবেশন করা এবং ধনিকের স্বার্থবিরোধী মত প্রচারে সহস্র অসুবিধার সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। এই অবস্থার মধ্যে সত্যিকারের জনমত গঠন কিংবা ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য।" "মোট কথা সংবিধানের আইন অনুযায়ী নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনক্ষমতা লাভ করার অধিকার সেই সকল রাজনৈতিক

ধনিক রাষ্ট্রে জনমত গঠনের বাহনগুলির উপর ধনিক শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ

দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে যারা ধনতন্ত্রের মূল নীতি মেনে নেয়। ধনতন্ত্র-বিরোধী কোন দলের অধিকার ধনিক শ্রেণী মেনে নিতে পারে না।" বস্তুতঃ সংসদীয় "গণতন্ত্রে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই যে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম গ্রহণ করে কোন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে জয়লাভ করলে, তারা কোন অগণতান্ত্রিক বাধার সম্মুখীন হবে না।"

উপরি-উক্ত সমালোচনা সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, বর্তমানে সংসদীয় গণতন্ত্রের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরূপ শাসনব্যবস্থার অনেকগুলি ত্রুটি সংশোধনযোগ্য। আবার জনগণ রাজনৈতিক ভাবে সচেতন থাকলে মন্ত্রিপরিষদ কিংবা আমলাগণ কখনই স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে না। কারণ সচেতন জনগণ আইনসভার মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করে তার স্বৈরাচারিতার পথ রোধ করতে পারে। কিন্তু অ্যালেন, ল্যাস্কি প্রমুখ পন্ডিতগণ সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আদৌ আশাবাদী নন। তাঁরা যে কেবল সংসদীয় "গণতন্ত্রের কতকগুলি বিকৃতি লক্ষ্য করেছেন তা-ই নয়, আরও ভয়াবহ পরিণামের আশঙ্কা তাঁরা প্রকাশ করেছেন। এ আশঙ্কা অমূলক নয়। কারণ যে শক্তি পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্রকে বিপন্ন এবং বিকৃত করছে, সে শক্তি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ধ্বংস সাধনেও উদ্যোগী হতে পারে।"

উপসংহার

১৯। সংসদীয় সরকারের সাফল্যের শর্তাবলী (Conditions for the success of Parliamentary Government)

সাম্প্রতিককালে সংসদীয় গণতন্ত্র বা মন্ত্রিসভা-পরিচালিত সরকারের দিকে বিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই যে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা সাফল্য অর্জন করবে এমন কোন কথা নেই। এরূপ শাসনব্যবস্থার সাফল্যের জন্য কতকগুলি প্রয়োজনীয় শর্ত একান্ত প্রয়োজন। যথা ঃ

(১) সংসদীয় শাসনব্যবস্থার সাফল্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হোল শক্তিশালী এবং সুগঠিত বিরোধী দলের অস্তিত্ব। কারণ, বিরোধী দলগুলি যদি দুর্বল এবং অসংগঠিত হয়, তাহলে সরকারী পক্ষ তাদের সমালোচনায় কর্ণপাত করে না। ফলে জনগণের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার পরিবর্তে সরকারী দল নিজ সমর্থকদের স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটতে পারে।

শক্তিশালী ও সুগঠিত বিরোধী দলের অস্তিত্ব

(২) অনেকের মতে, দেশের মধ্যে যদি দুটি সম-ক্ষমতাশালী বা প্রায় সম-ক্ষমতাশালী এবং সুগঠিত দল থাকে তাহলেই কেবল সংসদীয় শাসনব্যবস্থা সফল হতে পারে। যে দল সরকার গঠন করে সে দল সদাসর্বদা সতর্কভাবে সরকারী নীতি নিয়ন্ত্রণ ও কার্য পরিচালনা করে থাকে। সরকারী দল একথা ভালভাবেই জানে যে, তাদের সামান্য ভুলত্রুটি কিংবা জনস্বার্থ-বিরোধী কার্যের সুযোগ নিয়ে শক্তিশালী বিরোধী দল জনমতকে সপক্ষে টেনে নিতে পারে। তার ফলে পরবর্তী নির্বাচনে সরকারী দলের পরাজয় ঘটবে। সুতরাং শক্তিশালী ও সুগঠিত একটিমাত্র বিরোধী দল থাকলে সরকারী দল কখনও স্বৈরাচারী হয়ে জনগণের স্বার্থ এবং অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে সাহসী হয় না। তাছাড়া, দ্বি-দলীয় শাসনব্যবস্থা থাকলে

দ্বি দলীয় ব্যবস্থা

যে-কোন একটি দল এককভাবে সরকার গঠন করতে পারবে। বহুদলীয় শাসনের মত এখানে বহুদলের সমন্বয়ে গঠিত একটি দুর্বল সম্মিলিত সরকার (Coalition Government) গঠনের কোন প্রশ্নই আসে না।

(৩) সংসদীয় শাসনব্যবস্থার সাফল্যের অন্যতম শর্ত হোল সুযোগ্য নেতৃত্বের অবস্থিতি। দেশের নেতৃবৃন্দ যদি অমায়িক, সহানুভূতিশীল, আদর্শনিষ্ঠ, সচ্চরিত্র, দৃঢ়চেতা, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন এবং দূরদর্শী না হন তাহলে তাঁরা দেশের সমকালীন সমস্যাবলীর সমাধানের যথাযথ পথনির্দেশ করতে পারবেন না। এমন কি তাঁদের মতামত জনগণের উপরে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করবে না। বস্তুতঃ সুযোগ্য নেতৃত্ব সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি।

সুযোগ্য নেতৃত্ব

(৪) সংসদীয় শাসনের মূল ভিত্তি হোল জনমত। কিন্তু জনগণ যদি অজ্ঞ, অশিক্ষিত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয় তাহলে দেশের মধ্যে সুস্থ ও সবল জনমত কখনই গড়ে উঠতে পারে না। তাই বলা হয় যে সুস্থ ও সবল জনমত গঠনের জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষার। এই শিক্ষা পুঁথিগত হলেই চলবে না, একে মানুষের রাজনৈতিক জ্ঞান-বিকাশের সহায়ক হতে হবে। কারণ রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত জনগণই কেবল নিজ বিবেকবুদ্ধি অনুসারে বিচারবিশ্লেষণ করে ভোটাধিকার যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারে।

সুশিক্ষার বিস্তার

(৫) যেহেতু সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিস্তম্ভ হোল জনমত, সেহেতু সুষ্ঠু ও স্বাধীন জনমত গঠন ও প্রকাশের ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। যদি জনমতের মাধ্যমগুলি, বিশেষতঃ সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা প্রভৃতি সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হয় তাহলে স্বাভাবিক-ভাবেই সরকারী দল বিশেষ সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারে। তাছাড়া, অনেক সময় দেখা যায় যে সরকারী পক্ষ বিরোধী দলগুলিকে জনমত গঠনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। বলা বাহুল্য, তা করা হলে সংসদীয় গণতন্ত্রের অপমৃত্যু অনিবার্য।

সুষ্ঠু ও স্বাধীন জনমত গঠন ও প্রকাশের ব্যবস্থা

(৬) সর্বোপরি একটি কথা বলা যেতে পারে যে, গণতন্ত্রের প্রধানতম শত্রু হোল দারিদ্র্য। দারিদ্র্য-পীড়িত জনসাধারণ সর্বদাই অন্নসংস্থানের জন্য সচেষ্ট থাকে। তাদের পক্ষে দেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক বিষয়ে মাথা ঘামাবার কোন সুযোগ থাকে না। সুতরাং দারিদ্র্য ও শোষণের হাত থেকে যে সমাজ মুক্ত নয় সেই সমাজে সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্যের কথা কল্পনাই করা যায় না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ধনবৈষম্যমূলক সমাজে সংখ্যালঘিষ্ঠ ধনিকবণিক শ্রেণীর দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ শোষিত হওয়ার ফলে সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যর্থ হতে পারে।

গণতন্ত্রের প্রধানতম শত্রু দারিদ্র্য

২০। মন্ত্রিপরিষদ-পরিচালিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের পার্থক্য (Distinction between Parliamentary and Presidential forms of Government)

ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ নীতির উপর ভিত্তি করে গণতান্ত্রিক সরকারগুলিকে মূলতঃ দুভাগে ভাগ করা হয়, যথা—মন্ত্রিপরিষদ-পরিচালিত সরকার এবং রাষ্ট্রপতি-শাসিত

সরকার। প্রকৃতিগতভাবে উভয় সরকারই গণতান্ত্রিক। উভয় প্রকার শাসন-ব্যবস্থাতেই সরকার একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়। এসব দিক থেকে বিচার করে উভয় প্রকার সরকারের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এদের মধ্যে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই অধিক। যথা ঃ

রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতা বিষয়ে পার্থক্য

(১) মন্ত্রিপরিষদ-পরিচালিত শাসনব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হোল একজন নামসর্বস্ব (Titular) বা নিয়মতান্ত্রিক শাসকের অবস্থিতি। আইনগতভাবে দেশের যাবতীয় কার্য রাষ্ট্রপ্রধান সম্পাদন করেন। কিন্তু বাস্তবে তাঁর নামে মন্ত্রিপরিষদ শাসনকার্য পরিচালনা করে। অন্যভাবে বলা যায়, রাষ্ট্রপ্রধান আইনগতভাবে দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হলেও বাস্তবে তিনি কোন কার্য সম্পাদন করেন না। তিনি রাষ্ট্রের প্রধান, কিন্তু সরকারের প্রধান নন, তিনি তাই দেশও শাসন করেন না।

অপরদিকে রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক বা নামসর্বস্ব কোন রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন না। রাষ্ট্রপতি হলেন দেশের প্রকৃত শাসক। মন্ত্রিপরিষদের দ্বারা তিনি পরোক্ষভাবে দেশশাসন করেন না। তত্ত্বগতভাবে এবং বাস্তবে তিনি প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। তাই রাষ্ট্রপতিকে রাষ্ট্রের এবং শাসন বিভাগের প্রধান বলে অভিহিত করা হয়।

দায়িত্বের প্রশ্নে পার্থক্য

(২) মন্ত্রিপরিষদ-পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় সরকারী নীতি ও কার্যাবলীর জন্য মন্ত্রিপরিষদ প্রত্যক্ষভাবে আইনসভার নিকট এবং পরোক্ষভাবে জনগণের নিকট দায়িত্বশীল থাকে। আইনসভার নিকট মন্ত্রি-পরিষদের দায়িত্ব দু'প্রকারের হতে পারে, যথা—ব্যক্তিগত দায়িত্ব এবং যৌথ দায়িত্ব।

কিন্তু রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। তাই নিজ সম্পাদিত কার্যাবলীর জন্য তাঁকে আইনসভার পরিবর্তে জনগণের নিকট দায়িত্বশীল থাকতে হয়।

প্রকৃত শাসকের পদচ্যুতির প্রশ্নে পার্থক্য

(৩) মন্ত্রিপরিষদ-পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদকে আইনসভার নিকট দায়ী থাকতে হয় বলে আইনসভা অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাস করে কার্যকালের মেয়াদ পরিসমাপ্তির পূর্বেই মন্ত্রিপরিষদকে পদচ্যুত করতে পারে। মন্ত্রিপরিষদ যতদিন পর্যন্ত আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করে ততদিন পর্যন্ত মন্ত্রিগণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন।

অপরদিকে রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থায় আইনসভার নিকট রাষ্ট্রপতিকে দায়িত্ব-শীল থাকতে হয় না বলে আইনসভা অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাস করে তাঁকে পদচ্যুত করতে পারে না। আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন রাষ্ট্রপতির পক্ষে থাকুক বা না থাকুক, তাতে কিছু যায় আসে না। তবে একমাত্র অক্ষমতা, সংবিধানভঙ্গ, দুর্নীতি বা দেশদ্রোহের অপরাধে আইনসভা রাষ্ট্রপতিকে তাঁর কার্যকালের মেয়াদ পরিসমাপ্তির পূর্বে পদচ্যুত করতে পারে। অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতিকে তাঁর কার্যকালের মেয়াদ পরিসমাপ্তির পূর্বে পদচ্যুত করতে হলে 'ইমপিচমেন্ট' পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।

(৪) সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ নীতি না থাকার জন্য আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। তার ফলে এক বিভাগ অন্য বিভাগকে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃবৃন্দই মন্ত্রিপরিষদের সদস্য। স্বাভাবিকভাবেই মন্ত্রিগণ আইন বিভাগের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হন।

ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ ব্যাপারে পার্থক্য

কিন্তু রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ থাকার ফলে রাষ্ট্রপতি যেমন আইন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না, তেমনি আইন বিভাগও রাষ্ট্রপতির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। রাষ্ট্রপতি ও তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলী আইনসভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে পারেন না কিংবা প্রশ্নোত্তরে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। অনুরূপভাবে, আইন বিভাগও রাষ্ট্রপতি বা তাঁর মন্ত্রিসভার উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না কিংবা পদচ্যুত করতে পারে না। রাষ্ট্রপতি অবশ্য আইনসভায় 'বাণী' (message) প্রেরণ করতে পারেন। কিন্তু আইনসভা রাষ্ট্রপতি-প্রেরিত বাণীকে গুরুত্ব নাও দিতে পারে। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রপতি আইনসভাকে ভেঙ্গে দিতেও পারেন না।

(৫) মন্ত্রিপরিষদ-পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ সাধারণতঃ আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে গঠিত হয়। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বা নেত্রীকেই প্রধানমন্ত্রীর পদ প্রদান করা হয়। এরূপ শাসনব্যবস্থায় তত্ত্বগতভাবে মন্ত্রীরা সকলেই সমমর্যাদাসম্পন্ন হলেও কার্যক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর প্রাধান্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। তিনিই হলেন সংসদীয় শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ প্রকৃত শাসক। তাঁর নির্দেশে এবং পরামর্শে নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাই প্রধানমন্ত্রীর চারিত্রিক দৃঢ়তা, সুনাম, যোগ্যতা, দক্ষতা প্রভৃতির উপর সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে।

মন্ত্রিসভার পদমর্যাদা বিষয়ে পার্থক্য

অপরদিকে রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি নিজেই মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণকে যেহেতু রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন, সেহেতু রাষ্ট্রপতির প্রিয়ভাজন ব্যক্তিরাই মন্ত্রিসভায় স্থানলাভ করেন। আবার, কোন মন্ত্রী রাষ্ট্রপতির বিরাগভাজন হলে তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় নিতে হয়। মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতির নির্দেশে কার্য পরিচালনা করেন এবং সম্পাদিত কার্যাবলীর জন্য তাঁরা রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকেন। বস্তুতঃ এরূপ শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতির অধস্তন কর্মচারী ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইংল্যান্ড, ভারতবর্ষ, কানাডা প্রভৃতি দেশের শাসনব্যবস্থা মন্ত্রিপরিষদ-চালিত শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অবশ্য লাতিন আমেরিকার কিছু দেশ, ফিলিপিনস্ প্রজাতন্ত্র, লাইবেরিয়া, দঃ কোরিয়া প্রভৃতি দেশে এইরূপ শাসনব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করা যায়।

উদাহরণ

বিংশ অধ্যায়

রাজনৈতিক ব্যবস্থা

[Political Systems]

১। রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাজন (Definition and Classification of Political Systems)

রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংজ্ঞা

সরকারের শ্রেণীবিভাজনের নানাপ্রকার অসুবিধার জন্য ডেভিড ইস্টন (David Easton), অ্যালান বল (Alan Ball), অ্যালমন্ড ও পাওয়েল (Almond and Powell) প্রমুখ অত্যাধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ সরকারের শ্রেণী-বিভাজনের পরিবর্তে রাজনৈতিক ব্যবস্থার (Political System) শ্রেণী-বিভাজনকে বৈজ্ঞানিক ও বাস্তবসম্মত বলে মনে করেন। রাজনৈতিক ব্যবস্থা হোল কোন সমাজের সেই সব ঘাত-প্রতিঘাতের ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্তের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। সমাজের সর্বপ্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপ এবং আনুষ্ঠানিক (formal) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের গঠন, চরিত্র ও ক্রিয়াকলাপের সমন্বয়ে রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠে। ইস্টনের মতে, ব্যবস্থার সব অংশই পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। তাই যে-কোন একটি বিশেষ অংশের পরিবর্তন ঘটলে তার প্রভাব সামগ্রিকভাবে সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর পড়ে।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাজনের প্রশ্নে দৃষ্টিভঙ্গি

রাজনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাজনের প্রশ্নে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মরিস দ্যুভারজার (Maurice Durverger) রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বহুত্ববাদী (Pluralist) ও কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণমুখী (Monolithic)—এই দুভাগে বিভক্ত করেছেন। অ্যালমন্ড (G. A. Almond) কাঠামো ও সংস্কৃতির (Structure and Culture) দিক থেকে বিচারবিশ্লেষণ করে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে, ক. ইঙ্গ-আমেরিকান ব্যবস্থা (Anglo- American System), খ. কন্টিনেন্টাল ইউরোপীয় ব্যবস্থা (Continental European System), গ. প্রাক্-শিল্পোন্নত ব্যবস্থা (Pre-Industrial System) এবং ঘ. সর্বাত্মক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় (Totalitarian Political System) বিভক্ত করেছেন। 'কম্পারেটিভ পলিটিক্স' (Comparative Politics) নামক পুস্তকে অ্যালমন্ড এবং পাওয়েল (Almond and Powell) আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে দুভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা—সচল আধুনিক ব্যবস্থা (Mobilized Modern System) এবং প্রাক্-সচল আধুনিক ব্যবস্থা (Pre-mobilized Modern System)। সচল আধুনিক ব্যবস্থাকে তারা 'গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা' (Democratic System) ও কর্তৃত্ববাদক ব্যবস্থা (Authori-

অ্যালমণ্ড এবং পাওয়েল কর্তৃক শ্রেণীবিভাজন

tarian System)—এই দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আবার ক. উচ্চ উপ-ব্যবস্থা স্বাধিকার (High Sub-sytem Autonomy), খ. সীমাবদ্ধ উপ-ব্যবস্থা স্বাধিকার (Limited Sub-system Autonomy), এবং গ. নিম্ন উপ-ব্যবস্থা স্বাধিকার (Low Sub-System Autonomy)—এই তিন ভাগে বিভক্ত বলে তাঁরা মনে করেন। কর্তৃক-ব্যঞ্জক ব্যবস্থাকে তাঁরা চার ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা—১. বৈপ্লবিক সর্বাত্মক ব্যবস্থা (Radical Totalitarian System), ২. রক্ষণশীল সর্বাত্মক ব্যবস্থা (Conservative Totalitarian System), ৩. রক্ষণশীল কর্তৃত্ব-ব্যঞ্জক ব্যবস্থা (Conservative Authoritarian System), এবং ৪. আধুনিকীকৃত কর্তৃত্ব-ব্যঞ্জক ব্যবস্থা (Mordernising Authoritarian System)। প্রাক্-সচল আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে তাঁরা ক. প্রাক্-সচল কর্তৃত্ব-ব্যঞ্জক (Premobilised Anthoritarian System) ব্যবস্থা এবং খ. প্রাক্-সচল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় (Premobilised Democratic System) বিভক্ত করেছেন।

অ্যালমন্ড এবং পাওয়ালের আধুনিক ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাজনকে নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে সুন্দরভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে:
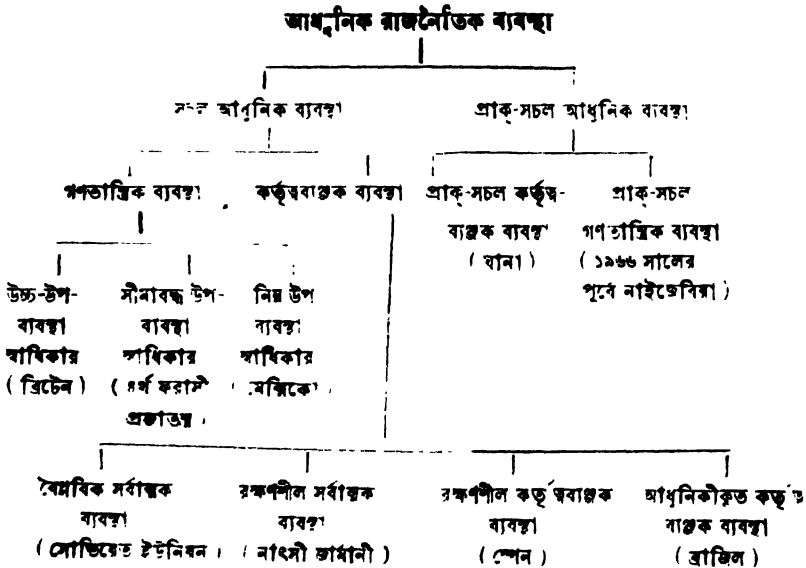
অ্যালান বল রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা—

অ্যালান বল কর্তৃক শ্রেণীবিভাজন

১. উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Liberal Democratic System), ২. সর্বাত্মক ব্যবস্থা (Totalitarian System) এবং ৩. স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Autocratic System)। এই তিন প্রকার রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সরকার থাকতে পারে।

অ্যালান বল নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টিকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ
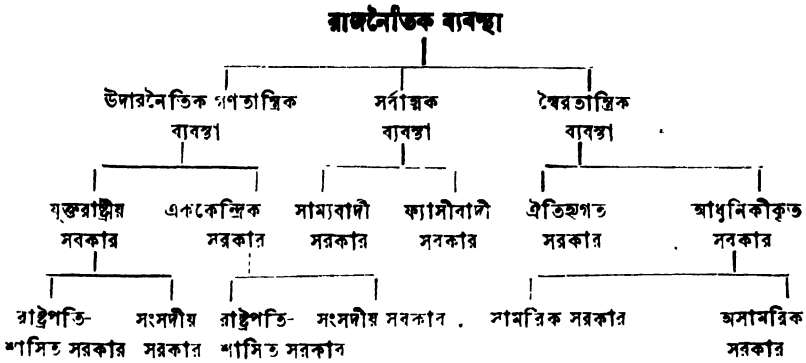
আমরা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে মোটামুটিভাবে চারভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করতে পারি, যথা ঃ

১. উদারনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা, ২. স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা, ৩. ফ্যাসীবাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং ৪. সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা।

২। উদারনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা (Liberal Political System)

উদারনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

জীন ব্লন্ডেল (Jean Blondel)-এর মতে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সংজ্ঞা প্রদান করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। তথাপি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। অ্যালান বলের মতে এই বৈশিষ্ট্যগুলি হোল ঃ

(ক) উদারনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের জন্য দলগুলি পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে অবাধ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে পারে।

(খ) ক্ষমতালাভের জন্য রাজনৈতিক দলগুলি অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় এবং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সমস্ত দলই কতকগুলি প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করে।

(গ) রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পদগুলিতে প্রবেশের এবং নিয়োগের পদ অধিকতর উন্মুক্ত।

(ঘ) ব্যাপক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ সরকারী সিদ্ধান্তকে যথেষ্ট প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়। শ্রমিক সংঘ সহ অন্যান্য স্বেচ্ছামূলক সংগঠনগুলিকে সরকার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে না।

(চ) বাক্-স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার না হওয়ার

স্বাধীনতা সহ অন্যান্য পৌর স্বাধীনতা (Civil Liberties) সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ও রক্ষিত হয়।

(ছ) একটি 'নিরপেক্ষ আদালতে'র (Independent Judiciary) অস্তিত্ব থাকে ; এবং

(জ) দূরদর্শন, বেতার, সংবাদপত্র প্রভৃতি গণসংযোগের মাধ্যমগুলির উপর সরকারের একচেটিয়া কর্তৃত্ব থাকে না এবং সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে তাদের সরকারকে সমালোচনা করার স্বাধীনতা থাকে।

তাছাড়া, ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণ, সংখ্যালঘুর অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা ইত্যাদিও উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা হয়।

অবশ্য সমস্ত উদারনৈতিক ব্যবস্থায় উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি নাও থাকতে পারে। বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা এবং গণসংযোগের মাধ্যমসমূহের, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা সমস্ত উদারনৈতিক ব্যবস্থায় সমভাবে স্বীকৃত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় দ্বি দলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকলেও সেখানে নাগরিক অধিকারের অস্তিত্ব নেই। অনেক সময় অসম-ক্ষমতাশালী অনেকগুলি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও কার্যক্ষেত্রে একটিমাত্র দলের অপ্রতিহত প্রাধান্য বহুদলীয় ব্যবস্থাকে একদলীয় ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করতে পারে। সুতরাং রাজনৈতিক দলের সংখ্যার ভিত্তিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাজন বাঞ্ছনীয় নয় বলে অনেকে অভিমত পোষণ করেন। আবার সব উদারনৈতিক ব্যবস্থায় নির্বাচন অবাধভাবে অনুষ্ঠিত হয় না। নির্বাচনে দুর্নীতি, কারচুপি, শাসক দলের ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদির অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। এমন কি ক্ষমতাসীন দল দেশের সার্বভৌমত্ব ও ঐক্য রক্ষার নামে অনেক সময় প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী দলের কণ্ঠরোধ করতে পারে। এক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতার তত্ত্ব মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হয়।

উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতিগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে অ্যালমন্ড এবং পাওয়েল এই ব্যবস্থাকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন, যথা—১ উচ্চ উপ-ব্যবস্থা স্বাধিকার (High Sub-system autonomy), ২. সীমাবদ্ধ উপ-ব্যবস্থা স্বাধিকার (Limited Sub-system autonomy) এবং ৩. নিম্ন উপ ব্যবস্থা স্বাধিকার (Low Sub-system autonomy)।

উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাজন

যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ও গণসংযোগের মাধ্যমগুলি একে অপরের থেকে পৃথকভাবে কাজ করে এবং যেখানে 'ব্যাপকভাবে বণ্টিত অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক সংস্কৃতি' (widely distributed participant political culture) বর্তমান থাকে তাকে উচ্চ উপ-ব্যবস্থা স্বাধিকার বলা হয়। গ্রেট ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই শ্রেণীর উদাহরণ।

উচ্চ উপ-ব্যবস্থা স্বাধিকার

অপরপক্ষে, যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ও গণসংযোগের মাধ্যমগুলি একে অপরের উপর নির্ভরশীল, তাকে সীমাবদ্ধ উপ-ব্যবস্থা স্বাধিকার বলে অভিহিত করা হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ ফরাসী প্রজাতন্ত্র, দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর ইতালী, ওয়েমার জার্মানী

সীমাবদ্ধ উপ-ব্যবস্থা স্বাধিকার

ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ঐ সব দেশে ক্যাথলিক চার্চ (Catholic Church) কেবলমাত্র একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী হিসেবে কাজ করে না, সেই সঙ্গে এর একটি ক্যাথলিক রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংঘ এবং ক্যাথলিক গণ-সংযোগের মাধ্যম রয়েছে। সীমাবদ্ধ উপ-ব্যবস্থা স্বাধিকারে রাজনৈতিক সংস্কৃতি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে খণ্ডিত আকার (fragmentation of political culture) ধারণ করে।

নিম্ন উপ-ব্যবস্থা স্বাধিকার

একদলীয় প্রভুত্বকারী ব্যবস্থা (one party-dominant system) অথবা প্রভুত্ব-মুখী দলীয় ব্যবস্থাকে (hegemonic party) নিম্ন উপ-ব্যবস্থা স্বাধিকারের অন্তর্ভুক্ত বলে অ্যালমন্ড এবং পাওয়েল মনে করেন। মেক্সিকো এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

৩। স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা (Autocratic Political System)

উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সর্বাত্মক ব্যবস্থার মধ্যবর্তী স্থানে স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার অবস্থান হলেও এই ব্যবস্থার সঙ্গে সর্বাত্মক ব্যবস্থার কিছুটা সাদৃশ্য আছে বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ ও বিশ্লেষণ যথেষ্ট কষ্টসাধ্য বলে অ্যালান বলের ধারণা। মোটামুটিভাবে স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথা তিনি উল্লেখ করেন। বৈশিষ্ট্যগুলি হোল :

স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

(১) স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অবাধ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা, যেমন—রাজনৈতিক দল ও নির্বাচনের উপর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়।

(২) এরূপ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সাম্যবাদ বা ফ্যাসীবাদের মত কোন প্রভুত্বকারী রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকে না। তবে জাতিত্ব (racialism) ও জাতীয়তাবাদ (nationalism) রাজনৈতিক সংহতি (political uniformity) রক্ষার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

(৩) 'রাজনৈতিক' (political) কথাটির সংজ্ঞা এখানে সীমিত।

(৪) 'রাজনৈতিক' শাসকবর্গ রাজনৈতিক সঙ্গতি ও আনুগত্য লাভের জন্য বল-প্রয়োগের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

(৫) স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিক-অধিকার অত্যন্ত সীমিত। গণসংযোগের মাধ্যম ও বিচার বিভাগের উপর সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

(৬) এরূপ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ঐতিহ্যগত কোন রাজনৈতিক গোষ্ঠী বা আধুনিকীকরণের প্রয়াসের মাধ্যমে উদ্ভূত মুষ্টিমেয় ব্যক্তি (modernising elite) কিংবা সামরিক অভ্যুত্থান বা ঔপনিবেশিকদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ফলে উদ্ভূত বিশেষ কোন নেতার হস্তে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্পিত থাকে, এবং

(৭) একটি সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠী রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের উপর একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে।

অ্যালান বল স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা— ক. ঐতিহ্যগত (Traditional) স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং খ. আধুনিকীকৃত (Modernising) স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা। যে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব চিরাচরিতভাবে বিশেষ একজন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হস্তে ন্যস্ত থাকে তাকে ঐতিহ্যগত স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলা হয়। ইরান, সৌদি আরব, জর্ডান, ভুটান ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আবার যে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামাজিক বিন্যাস ও শাসন কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে সামরিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধন করে আধুনিকীকরণের চেষ্টা করা হয় তাকে আধুনিকীকৃত স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে অভিহিত করা যায়। নাইজিরিয়া, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, আলজিরিয়া ইত্যাদি হোল আধুনিকীকৃত স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অ্যালান বলের মতে, স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে 'তৃতীয় বিশ্বে'র (the third world) পরিবর্ত (alternative) বলে মনে করা আদৌ সঙ্গত নয়।

স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাজন

কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সর্বাত্মক ব্যবস্থার সমীপবর্তী বলে মনে করলেও অ্যালান বল প্রমুখ লেখকরা উভয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে মূলগত পার্থক্যকে অস্বীকার করেননি। অনেকে আবার স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অস্থায়ী বা স্বল্পস্থায়ী বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু অ্যালান বলের মতে, এই ধারণাও ভ্রান্ত। রাজনৈতিক ব্যবস্থার কোন সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট শ্রেণীবিন্যাস সম্ভব নয় বলে তিনি মনে করেন।

৪। ফ্যাসীবাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থা (Fascist Political System)

অ্যালান বল ফ্যাসীবাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সর্বাত্মক ব্যবস্থা বলে মনে করেন। তাঁর মতে, সর্বাত্মক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থায়ও বর্তমান থাকে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হোল :

ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

(ক) এরূপ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি ও সমাজের যাবতীয় কার্যাবলীকে তত্ত্বগতভাবে সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত বলে মনে করা হয়।

(খ) রাজনৈতিক ও আইনগতভাবে একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের সর্বব্যাপী প্রভুত্ব লক্ষ্য করা যায়। সমস্ত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ওই একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই পরিচালিত হয় এবং একমাত্র উক্ত দলই প্রতিযোগিতা, নিয়োগ এবং বিরোধিতার একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে।

(গ) তত্ত্বগতভাবে একটি ব্যাপক রাজনৈতিক আদর্শ রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত যাবতীয় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

(ঘ) বিচার বিভাগ ও গণসংযোগের মাধ্যমগুলিকে সরকার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং নাগরিক অধিকারসমূহকে চরমভাবে খর্ব করে ; এবং

(ঙ) সর্বাত্মক ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থায় জনগণকে সুসংগঠিত করে শাসকগোষ্ঠী নিজেদের শাসনের প্রতি জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে এবং গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে

গোষ্ঠী-শাসনকে সজ্জিত করার জন্য সচেষ্ট হয়। জনগণের সম্মতি ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে এরূপ শাসনব্যবস্থা বৈধতা লাভ করে।

অ্যালান বল-বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও ফ্যাসীবাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থার কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে ঃ

বিশেষ বৈশিষ্ট্য

প্রথমতঃ ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থা সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে একটি প্রতি-বিপ্লবী (Counter-revolutionary) ব্যবস্থা মাত্র। ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপর একচেটিয়া পুঁজিপতিদের প্রাধান্য বৃদ্ধিতে এই ব্যবস্থা সহায়তা করে। শিল্পবাণিজ্য ও কৃষিক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থায় স্বীকৃত।

দ্বিতীয়তঃ ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রভুত্বকারী কায়েমী স্বার্থের রক্ষক বাছাই-করা মুষ্টিমেয় (elite) ব্যক্তির হাতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব কেন্দ্রীভূত থাকে। এই সব ব্যক্তির উর্ধ্বে অবস্থান করেন দলের সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী একজন মাত্র নেতা। জার্মানি ও ইতালিতে হিটলার ও মুসোলিনী বলতে যথাক্রমে নাৎসী পার্টি ও ফ্যাসিস্ট পার্টিকেই বোঝাতো। এরূপ ব্যবস্থায় পার্টি ও সর্বোচ্চ নেতাকে অভিন্ন বলে মনে করা হয়।

তৃতীয়তঃ এরূপ ব্যবস্থায় বলপূর্বক বা সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষমতাসীন দল ছাড়া অন্য সব দলের অস্তিত্ব বিলোপ করা হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও একাধিক রাজনৈতিক দল ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থায় থাকে না।

চতুর্থতঃ ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তিকে বলি দেওয়া হয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতা এখানে মূল্যহীন। এরূপ ব্যবস্থায় মানবিকতার কোন স্থান নেই।

পঞ্চমতঃ হিংস্রতা (Violence) ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। ফ্যাসীবাদী দল হিংসা, সন্ত্রাস, ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে।

ষষ্ঠতঃ ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থা সামরিকবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী শাসনের নামান্তর মাত্র। এই ব্যবস্থার সমর্থকেরা যুদ্ধকে মানবজীবনের অগ্রগতির সোপান এবং শান্তিকে 'কাপুরুষের স্বপ্ন' বলে প্রচার করেন। এঁরা জাতীয় রাষ্ট্রের সম্প্রসারণের জন্য যুদ্ধকে একান্তভাবে কাম্য বলে মনে করেন। মুসোলিনী (Mussolini)-র ভাষায়, স্ত্রী-লোকের নিকট মাতৃত্ব যেমন অপরিহার্য, পুরুষের নিকট যুদ্ধও তেমনি অপরিহার্য। সাম্রাজ্যবাদকে তিনি মানবজীবনের 'শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় নিয়ম' বলে মনে করতেন।

সপ্তমতঃ ফ্যাসীবাদ আন্তর্জাতিকতার বিরোধী। আন্তর্জাতিকতার (inter-nationalism) পরিবর্তে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদই ফ্যাসীবাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম সূচক।

মুসোলিনীর ইতালি এবং হিটলারের জার্মানি ফ্যাসীবাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। অনেকে অবশ্য ফ্রাঙ্কো (Franco)-শাসিত স্পেনে ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থা ছিল বলে মনে করেন। কিন্তু ফ্রাঙ্কোর 'ফালান্‌জ্' (Falange) দল সর্বপ্রকার রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধিকারী হলেও বিভিন্ন পেশাদারী সংস্থা, চার্চ ইত্যাদির স্বাধীনতা চরমভাবে ক্ষুণ্ন করা হয়নি। বরং জেনারেল ফ্রাঙ্কো সৈন্যবাহিনী ও চার্চের সমর্থনকে অবলম্বন করে তাঁর স্বৈরাচারী শাসন সুরক্ষিত করার চেষ্টা করেছিলেন। মতাদর্শের ভিত্তিতে নিজ সমর্থনে জনমত গঠনের কোন চেষ্টাই তিনি করেননি।

৫। সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা (Socialist Political System)

অ্যালান বল প্রমুখ পশ্চিমী দুনিয়ার রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে সর্বাত্মক রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। কারণ সর্বাত্মক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি আপাতঃদৃষ্টিতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বর্তমান থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল ও একটিমাত্র আদর্শের অস্তিত্ব থাকে। সেই দলের অপ্রতিহত প্রাধান্য সর্বক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। রাষ্ট্রে একটিমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় বলে অনেকে মনে করেন। তাছাড়া, ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে রাষ্ট্র ও সমাজের স্বার্থের ভিন্নতা আছে বলে এরূপ ব্যবস্থায় মনে করা হয় না। বিশেষ একটি আদর্শের প্রতি জনগণের সম্মতি ও সমর্থন থাকায় এরূপ শাসনব্যবস্থা বৈধতা লাভ করে।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সর্বাত্মক ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করা ঠিক নয়

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এইসব বৈশিষ্ট্য আপাতদৃষ্টিতে ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনীয় বলে মনে হলেও উভয় প্রকার রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। সোভিয়েত ইউনিয়ন, গণসাধারণতন্ত্রী চীন প্রভৃতির সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পশ্চিমী দুনীয়ার রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ, বিশেষতঃ মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ, ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে অভিন্ন বলে বর্ণনা করে উভয় প্রকার রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে 'সর্বাত্মক ব্যবস্থা' (totalitarian system) বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্য কোন কোন পশ্চিমী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী উভয় ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য আছে বলে স্বীকার করলেও সেই পার্থক্য নামেমাত্র বলে তাঁরা মনে করেন। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী যে অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং পক্ষপাতদোষে দুষ্ট তা বলাই বাহুল্য। বস্তুতঃ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলেই একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে যে, ফ্যাসীবাদ অগণতান্ত্রিক, ব্যক্তিকেন্দ্রিক, মানবতাবাদ-বিরোধী ও আন্তর্জাতিকতাবাদের পরিপন্থী একটি সর্বাত্মক ব্যবস্থা মাত্র। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ঠিক এর বিপরীত। তাই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সংকীর্ণ অর্থে সর্বাত্মক ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে এবং মনে হতে পারে যে, ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে এই ব্যবস্থার কোন পার্থক্য নেই। তাই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে 'সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা'(Socialist System) বলেই অভিহিত করা সমীচীন।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হোল :

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

(ক) সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি হোল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। 'সর্বহারার একনায়কত্ব' (Dictatorship of the proletariat) প্রতিষ্ঠিত হলেই কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এদিক থেকে বিচার করে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠাকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠনের পূর্ব-শর্ত বলে মনে করা যেতে পারে।

(খ) মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চরম উদ্দেশ্য হোল শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উদারনৈতিক স্বৈরতান্ত্রিক কিংবা

ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থার মত শ্রেণীশোষণ থাকে না। তাই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে 'মুক্ত-ব্যবস্থা' বলে বর্ণনা করা হয়। এরূপ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একটি মাত্র শ্রেণীর প্রাধান্য থাকে। সেই শ্রেণী হোল শ্রমিক-কৃষকের শ্রেণী—সর্বহারা শ্রেণী। এই ব্যবস্থায় একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থের সংরক্ষক হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টিই এই ব্যবস্থায় একমাত্র দল হিসেবে স্বাভাবিক কারণেই আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। সুতরাং ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থার মত এখানে বলপ্রয়োগ ও সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে বিরোধী দলের অস্তিত্বের বিলোপ সাধন করা হয় না এবং অপ্রয়োজনীয় বলেই অন্য কোন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয় না।

(গ) অবশ্য একথা সত্য যে, সমাজতান্ত্রিক আদর্শ-বিরোধী মুষ্টিমেয় ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা এরূপ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় থাকলেও তা কোনভাবেই ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনীয় নয়। কারণ, ফ্যাসীবাদী দল সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত এবং বাছাই-করা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীন। এই ব্যবস্থায় শ্রেণীদ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও সমস্ত বিরোধী দলকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নির্মূল করা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর স্বার্থকে উপেক্ষা করে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের স্বার্থে সামগ্রিক-ভাবে ফ্যাসীবাদী ও উদারনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা মুষ্টিমেয়ের স্বার্থকে উপেক্ষা করে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত হয়।

(ঘ) সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। শোষণের মাধ্যম হিসেবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার এরূপ ব্যবস্থায় স্বীকৃত নয়।

(ঙ) সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিপূজার কোন স্থান নেই। এখানে ব্যক্তির পরিবর্তে সামগ্রিকভাবে সমাজকে বড় বলে মনে করা হয়। একক-নেতৃত্বের পরিবর্তে সামগ্রিক নেতৃত্ব এই ব্যবস্থাকে পরিচালিত করে। সর্বক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির অপ্রতিহত প্রাধান্য থাকলেও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার (Democratic Centralism) মাধ্যমে প্রতিটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(চ) সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় রাষ্ট্রের পরিবর্তে আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাস এরূপ ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। তাই এই ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও সৌভ্রাত্রের প্রতিষ্ঠাকল্পে কাজ করে।

(ছ) সামরিকবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার চিরশত্রু। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেক রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সামরিকবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে। ভিয়েতনাম ও গণসাধারণতন্ত্রী চীনের কথা এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

(জ) সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করার পরিবর্তে ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণের পীঠস্থান হিসেবে কাজ করে। অর্থনৈতিক সাম্য ও স্বাধীনতা না থাকলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অধিকার মূল্যহীন হয়ে পড়ে বলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থকগণ মনে করেন। তাই তাঁরা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অর্থ-নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সাম্য ও স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে তোলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন, গণসাধারণতন্ত্রী চীন প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংবিধানের

দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে, ঐ সব সংবিধানে সর্বপ্রকার নাগরিক অধিকার স্বীকৃতিলাভ করেছে।

সুতরাং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে অভিহিত করা যেতে পারে। উদারনৈতিক ব্যবস্থার মতো এখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে গণতন্ত্রের সমাধি খনন করা হয় না। আবার স্বৈরতান্ত্রিক কিংবা ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থার মত গণতন্ত্রকে টুঁটি টিপে হত্যা করা হয় না। তাই বর্তমান বিশ্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ছত্রচ্ছায়ায় এসে দাঁড়িয়েছে।

উপসংহার

৬। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বনাম স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Liberal Democratic System vs. Authoritarian System)

উদারনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপরীত। স্বাভাবিকভাবেই উভয়ের মধ্যে পার্থক্যগুলি অতি সহজেই নিরূপণ করা যায়। পার্থক্যগুলি হোল:

(ক) উদারনৈতিক ব্যবস্থায় একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের জন্য অর্থাৎ সরকার গঠনের জন্য দলগুলি পরস্পরের সঙ্গে অবাধ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়।

কিন্তু স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অবাধ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা থাকে না। রাজনৈতিক দল ও নির্বাচনের উপর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়।

(খ) ক্ষমতালাভের জন্য রাজনৈতিক দলগুলি প্রকাশ্যভাবে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। প্রতিযোগিতার সময়ে প্রত্যেকটি দল কতকগুলি প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করে।

কিন্তু স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রকাশ্য প্রতিযোগিতার সুযোগ না থাকায় প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত পদ্ধতির ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলগুলির পারস্পরিক প্রতিযোগিতার কোন প্রশ্নই উঠে না। তাই অনেক সময় শ্বাসরোধকারী স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উৎখাত করার জন্য গোপনে গোপনে বিশেষ কোন রাজনৈতিক দল প্রচেষ্টা চালাতে পারে। অন্যভাবে বলা যায়, উদারনৈতিক ব্যবস্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সরকার পরিবর্তন সম্ভব, কিন্তু স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তা সম্ভব হয় না বলে অনেক সময় বিপ্লবের সম্ভাবনা কিংবা সামরিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা থাকে।

(গ) উদারনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পদগুলিতে প্রবেশের ও নিয়োগের পথ মোটামুটিভাবে উন্মুক্ত।

কিন্তু স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ঠিক এর বিপরীত চিত্র লক্ষ্য করা যায়। স্বৈরাচারী শাসক আপন মনোমত ব্যক্তিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সরকারী পদে নিয়োগ করেন। তাঁর বিরোধিতা করে রাজনৈতিক পদে সমাসীন হওয়া আদৌ সম্ভব নয়।

(ঘ) উদারনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যাপক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

কিন্তু স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটি সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠী রাজনৈতিক ক্ষমতাকে

নিজেদের কুক্ষিগত করে রাখে। রাজনৈতিক ক্ষমতার উপর তাদের একচেটিয়া অধিকার রক্ষার জন্য তারা নির্বাচন অনুষ্ঠানের কোন ব্যবস্থাই করে না।

(ঙ) উদারনৈতিক ব্যবস্থায় নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা স্বীকৃত। নাগরিকগণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অধিকার মোটামুটিভাবে এখানে ভোগ করতে পারে। সরকার এই সব অধিকারে অকারণে হস্তক্ষেপ করলে নিরপেক্ষ বিচার বিভাগের সহায়তায় জনগণ নিজেদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

কিন্তু স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিক অধিকার অত্যন্ত সীমিত। গণসংযোগের মাধ্যম ও বিচার বিভাগের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত কঠোর।

(চ) উদারনৈতিক ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারী সিদ্ধান্তকে যথেষ্ট প্রভাবিত করতে পারে। শ্রমিক সংঘ ও অন্যান্য স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে না।

কিন্তু স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সর্বক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকায় এই সব গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান সরকারী সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে না।

(ছ) উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সমর্থকেরা মনে করেন যে এরূপ ব্যবস্থার ভিত্তি হোল জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি।

অপরপক্ষে স্বৈরতন্ত্রের পশ্চাতে গণ-সমর্থন থাকে না। জনগণের সমর্থন ও সহানুভূতি অপেক্ষা স্বৈরতন্ত্র সামরিক বাহিনী বা বিশেষ একটি গোষ্ঠীর সমর্থন ও সহানুভূতির উপর অধিক পরিমাণে নির্ভরশীল থাকে।

তবে মার্কসবাদী লেখকদের মতে, উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও কার্যক্ষেত্রে সংখ্যালঘু ধনিক-বণিক শ্রেণীর স্বার্থে তাদের দ্বারাই পরিচালিত হয় বলে জনস্বার্থ এখানে উপেক্ষিতই হয়। এরূপ ব্যবস্থায় রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হলেও অর্থনৈতিক অধিকার উপেক্ষিত হয়। ফলে গণতন্ত্র তত্ত্বসর্বস্ব নীতিকথার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। তাছাড়া, উদারনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রভুত্বকারী শ্রেণীর হাতে থাকায় তাদের স্বার্থ-বিরোধী কোন বামপন্থী দলকে অবাধে নির্বাচনী প্রচার চালাতে দেওয়া হয় না। নির্বাচনে কারচুপি, সরকারী প্রশাসনের অপব্যবহার ইত্যাদি এই ব্যবস্থায় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। গণসংযোগের মাধ্যমগুলির উপর প্রভুত্বকারী শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ ব্যাপকভাবে থাকায় প্রচার কৌশলে বা মিথ্যা প্রচারে জনগণকে বিভ্রান্ত করা অত্যন্ত সহজ। অনেক সময় জনশৃঙ্খলা ও দেশের সংহতির নাম করে জনসংযোগের মাধ্যমগুলির উপর অযৌক্তিকভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। ফলে এরূপ ব্যবস্থায় গণতন্ত্র প্রহসনে পর্যবসিত হয়। বলা বাহুল্য, এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হলে উদারনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য থাকে না।

৭। উদারনৈতিক ব্যবস্থা বনাম ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থা (Liberal Democratic System vs. Fascist System)

উদারনৈতিক ব্যবস্থার সমর্থকেরা ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থাকে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক

ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত বলে মনে করেন। উভয় ব্যবস্থার মধ্যে বৈপরীত্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় ঃ

(ক) উদারনৈতিক ব্যবস্থায় একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকে। রাজনৈতিক দলগুলি রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের জন্য প্রকাশ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়।

কিন্তু ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ও আইনগতভাবে একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। একটি ব্যাপক রাজনৈতিক আদর্শ যাবতীয় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে। বলপূর্বক বা সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষমতাসীন দল ছাড়া অন্যান্য দলের অস্তিত্ব বিলোপ করা হয়।

(খ) উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগ ও গণসংযোগের মাধ্যমগুলি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে।

কিন্তু ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থায় বিচার বিভাগ একটিমাত্র দলের অত্যাচারী ও পৈশাচিক শাসনকে বৈধকরণের হাতিয়ার মাত্র। গণসংযোগের মাধ্যমগুলি একটিমাত্র দলের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে এবং সেই দলের নির্দেশে পরিচালিত হয়।

গ) উদারনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি ও সমাজকে সরকারের সঙ্গে অভিন্ন বলে প্রচার করা হয় না।

অপরপক্ষে ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থায় ব্যক্তি ও সমাজের যাবতীয় কার্যাবলীকে তত্ত্বগত ভাবে সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত বলে মনে করা হয়।

(ঘ) উদারনৈতিক ব্যবস্থায় নাগরিক অধিকারসমূহ বিশেষতঃ রাজনৈতিক অধিকারসমূহ স্বীকৃতিলাভ করে। ব্যাপক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

কিন্তু ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থায় নাগরিক অধিকার খর্বিত হয়। ব্যাপক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে কোন অবাধ, সুষ্ঠু ও দুর্নীতিমুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় না। অনেক সময় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও সেই নির্বাচন বন্দুকের নলের মুখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের প্রহসন মাত্র।

(ঙ) উদারনৈতিক ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী-সহ অন্যান্য স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারী সিদ্ধান্তকে যথেষ্ট প্রভাবিত করতে পারে।

অপরপক্ষে ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থায় এই সব গোষ্ঠী সরকারী সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে না।

(চ) উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সমর্থকেরা মনে করেন যে, এরূপ ব্যবস্থায় প্রকৃত জনমতের উপর ভিত্তি করে জনপ্রিয় সরকার গঠিত হয়। এই সরকারের উপর জনগণের নিয়ন্ত্রণ সর্বদাই থাকে।

কিন্তু ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রভুত্বকারী কায়েমী স্বার্থের রক্ষক বাছাই-করা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব কেন্দ্রীভূত থাকে। এই সব ব্যক্তির ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন দলের সর্বোচ্চ নেতা। তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি কখনই ভুল করতে পারেন না। এইভাবে ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থায় ব্যক্তিপূজা প্রাধান্য লাভ করে। তাই এই ব্যবস্থাকে অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে সমালোচনা করা হয়।

(ছ) উদারনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

কিন্তু ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থায় বাছাই-করা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব কেন্দ্রীভূত থাকে। এই সব ব্যক্তির ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন দলের সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী একজন মাত্র নেতা। দল ও দলের সর্বোচ্চ নেতাকে এই ব্যবস্থায় অভিন্ন বলে মনে করা হয়।

(জ) উদারনৈতিক ব্যবস্থায় মোটামুটিভাবে জনগণের স্বাধীন মতামতের উপর ভিত্তি করে সরকার দাঁড়িয়ে থাকে।

কিন্তু হিংস্রতা ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। ফ্যাসীবাদী দল হিংসা, সন্ত্রাস, ভীতিপ্রদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে।

(ঝ) উদারনৈতিক ব্যবস্থার সমর্থকেরা শান্তিবাদের পূজারী। যুদ্ধকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করেন বলে তাঁদের দাবি।

কিন্তু ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থা সামরিক ও সাম্রাজ্যবাদী শাসনের নামান্তর মাত্র। এই ব্যবস্থার সমর্থকেরা যুদ্ধকে মানবজীবনের অগ্রগতির সোপান এবং শান্তিকে 'কাপুরুষের স্বপ্ন'' বলে প্রচার করেন। এঁরা জাতীয় রাষ্ট্রের সম্প্রসারণের জন্য যুদ্ধকে একান্তভাবে কাম্য বলে মনে করেন।

তবে মার্কসবাদী লেখকেরা মনে করেন যে, ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থার মতই উদারনৈতিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রভুত্বকারী কায়েমী স্বার্থের সংরক্ষকরাই রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধিকারী হয়। উভয় ব্যবস্থাই সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে একটি প্রতি-বিপ্লবী ব্যবস্থা মাত্র। উভয় ব্যবস্থাতেই সর্বহারা শ্রেণী নির্মমভাবে শোষিত ও অত্যাচারিত হয়। লেনিনের মতে, ফ্যাসীবাদ একচেটিয়া পুঁজির সন্ত্রাসমূলক একনায়কত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। মার্কসবাদীদের মতে, উদারনৈতিক ব্যবস্থার সংকট ঘনীভূত হলেই তা ক্রমে ক্রমে ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হতে পারে।

৮। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বনাম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Liberal Democratic System vs Socialist System)

উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাদৃশ্য নেই। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থকেরা, বিশেষতঃ পাশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থার মত সর্বাত্মক ব্যবস্থা বলে মনে করেন। কিন্তু তাঁদের এই ধারণা যে কতখানি ভ্রান্ত এবং পক্ষপাতদোষে দুষ্ট তা উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করলে দিবালোকের মতই স্পষ্ট হয়ে উঠে। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান পার্থক্যগুলি হোল :

(ক) উদারনৈতিক ব্যবস্থায় একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য রাজনৈতিক দলগুলি পরস্পরের সঙ্গে অবাধ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। এরূপ প্রতিযোগিতার সময় সমস্ত দলই কতকগুলি প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করে। মার্কসবাদী লেখকদের মতে, বিভিন্ন

প্রকার শ্রেণীস্বার্থের অস্তিত্ব থাকায় উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রেণীস্বার্থের সংরক্ষক হিসেবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটে।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রেণীশোষণ না থাকায় সমাজের মধ্যে কেবলমাত্র একটি শ্রেণীর প্রাধান্য থাকে। সেই শ্রেণী হোল শ্রমিক-কৃষকের শ্রেণী অর্থাৎ সর্বহারা শ্রেণী (Proletariat Class)। স্বাভাবিকভাবে এরূপ ব্যবস্থায় শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থের সংরক্ষক হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টিই একমাত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থার মত এখানে বলপ্রয়োগ বা সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে বিরোধী দলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করা হয় না।

(খ) উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পদগুলিতে প্রবেশের এবং নিয়োগের পথ অধিকতর উন্মুক্ত।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি সর্বপ্রকার রাজনৈতিক নিয়োগের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা। কোন্ পদে কাকে নিয়োগ করা হবে সে বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

(গ) উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ সরকারী সিদ্ধান্তকে যথেষ্ট প্রভাবিত করতে পারে। শ্রমিক সংঘ, শিক্ষক সমিতি প্রভৃতি চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলিকে সরকার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে না।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি সরকারী সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে না। এইসব গোষ্ঠীর উপর সরকার অত্যন্ত কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে।

(ঘ) উদারনৈতিক ব্যবস্থায় দূরদর্শন, বেতার, চলচ্চিত্র, সংবাদপত্র প্রভৃতি গণসংযোগের মাধ্যমগুলির উপর সরকারের একচেটিয়া কর্তৃত্ব থাকে না এবং সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে তারা সরকারকে সমালোচনা করতে পারে।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণসংযোগের মাধ্যমগুলির উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত বেশী। সমাজতান্ত্রিক আদর্শবিরোধী কোন প্রচার চালাবার অধিকার এই সংঘ-সংস্থাগুলির থাকে না। তবে এ কথা সত্য যে উদারনৈতিক ব্যবস্থায় তত্ত্বগতভাবে গণসংযোগের মাধ্যমগুলি মোটামুটি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারলেও বাস্তবে এগুলিকে শাসকশ্রেণী নিজেদের স্বার্থেই ব্যবহার করে।

(ঙ) উদারনৈতিক ব্যবস্থায় একটি 'নিরপেক্ষ আদালত' থাকে বলে দাবি করা হয়।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদালত কখনই নিরপেক্ষ চরিত্রসম্পন্ন হয় না। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সমর্থকরা মনে করেন যে, উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার যেহেতু ধনিক-বণিক শ্রেণীর স্বার্থে কাজ করে, সেহেতু আদালত কখনই নিরপেক্ষ হতে পারে না। কার্যক্ষেত্রে তা প্রচলিত শ্রেণী-সম্পর্ক বৈধকরণের হাতিয়ার হিসেবেই কাজ করে। অ্যালান বল প্রমুখ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণও নিরপেক্ষ আদালতের ধারণাকে 'আধা-অলীক' কাহিনী বলে বর্ণনা করেছেন।

(চ) উদারনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণের রাজনৈতিক অধিকারের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অর্থনৈতিক অধিকার এরূপ ব্যবস্থায় উপেক্ষিত হয়।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক অধিকারকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধিকার বলে মনে করা হয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হলে রাজনৈতিক অধিকার বাস্তবে মূল্যহীন হয়ে পড়ে বলে সমাজতন্ত্রের সমর্থকগণ মত প্রকাশ করেন।

(ছ) উদারনৈতিক ব্যবস্থায় ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যেকে বিবেক অনুযায়ী যেমন ধর্মাচরণ ও ধর্মীয় প্রচার করতে পারে, তেমনি ধর্মবিরোধ প্রচারের স্বাধীনতাও প্রত্যেকের থাকে।

(জ) উদারনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা স্বীকৃত। তাই উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকায় সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সংখ্যালঘিষ্ঠ ধনশালী ব্যক্তিদের দ্বারা শোষিত হয়।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

(ঝ) উদারনৈতিক ব্যবস্থায় অনেক সময় ব্যক্তিপূজা প্রাধান্য পায়। বিশেষ একজন রাজনৈতিক নেতা বা নেত্রীকে কেন্দ্র করে নির্বাচন পরিচালিত হয়।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিপূজার কোন স্থান নেই। এখানে ব্যক্তির পরিবর্তে সামগ্রিকভাবে সমাজকে বড় বলে মনে করা হয়। একক-নেতৃত্বের পরিবর্তে সামগ্রিক নেতৃত্ব এই ব্যবস্থাকে পরিচালিত করে।

(ঞ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন প্রভৃতির ন্যায় উদারনৈতিক দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদের ফেরিওয়ালা হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করে চলেছে।

কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদ সর্বপ্রকার সামরিকবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের চিরশত্রু। সাম্রাজ্যবাদের সমাধি রচনা করাই হোল সমাজতন্ত্রবাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

সুতরাং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে অভিহিত করা যেতে পারে। উদারনৈতিক ব্যবস্থার মতো এখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে প্রহসন করা হয় না। তাই বর্তমানে বিশ্বের এক তৃতীয়াংশেরও অধিক মানুষ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ছত্রচ্ছায়ায় এসে সমবেত হয়েছে।

৯। স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা বনাম ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থা (Autocratic System vs. Fascist System)

কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সর্বাত্মক ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থার সমীপবর্তী বলে মনে করলেও অ্যালান বল প্রমুখ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ উভয়-প্রকার রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক পদার্থগুলিকে অস্বীকার করেননি।

স্বৈরতান্ত্রিক ও ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থার মধ্যে সাদৃশ্যগুলি হোল :

(ক) উভয় ব্যবস্থাতেই অবাধ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা অনুপস্থিত থাকে।

রাজনৈতিক দল, নির্বাচন ইত্যাদির উপর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। একটি সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠী কিংবা কোন একজন ব্যক্তি রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের উপর একচেটিয়া একাধিপত্য বিস্তার করে।

(খ) উভয় প্রকার রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই বিচার বিভাগ এবং গণসংযোগের মাধ্যমগুলির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়।

(গ) উভয় ব্যবস্থাতেই নাগরিক অধিকারসমূহ খর্বিত হয়। ব্যক্তিস্বাধীনতা মূল্যহীন হওয়ার ফলে উভয় ব্যবস্থাকে অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে অভিহিত করা হয়।

(ঘ) উভয় ব্যবস্থাতেই ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর পুঁজিপতিদের প্রাধান্য বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়।

(ঙ) উভয় ব্যবস্থাতেই বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সরকার জনগণের রাজনৈতিক আনুগত্যলাভের চেষ্টা করে।

স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেলেও উভয়-প্রকার রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে:

(ক) স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন প্রভুত্বকারী রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকে না। তবে জাতিত্ব ও জাতীয়তাবাদ অনেক সময় রাজনৈতিক সংহতি রক্ষার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

কিন্তু ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থায় তত্ত্বগতভাবে একটি ব্যাপক রাজনৈতিক আদর্শ রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত যাবতীয় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে।

(খ) স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক শাসকবর্গ রাজনৈতিক সংহতি ও আনুগত্য লাভের জন্য কেবলমাত্র বলপ্রয়োগের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে।

কিন্তু ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থায় জনগণকে সুসংগঠিত করে শাসকগোষ্ঠী নিজেদের শাসনের প্রতি জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে এবং অনেক সময় গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গোষ্ঠীশাসনকে সজ্জিত করার চেষ্টা করে। জনগণের সম্মতি ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে এরূপ শাসন-ব্যবস্থা বৈধতা লাভ করে বলে অ্যালান বল প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা অভিমত পোষণ করেন।

(গ) স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় 'রাজনৈতিক' কথাটির সংজ্ঞা অত্যন্ত সীমিত। একটি সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠী রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে।

কিন্তু ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ও আইনগতভাবে একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের সর্বব্যাপী প্রাধান্য ও প্রভুত্ব লক্ষ্য করা যায়। উক্ত দলই প্রতিযোগিতা, নিয়োগ এবং বিরোধিতার একমাত্র স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। গোষ্ঠীশাসন এখানে রাজনৈতিক মতাদর্শের জারক রসে পরিপুষ্ট হয়।

তবে এ কথা সত্য যে, স্বৈরতান্ত্রিক ও ফ্যাসীবাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা গেলেও উভয় ব্যবস্থাই প্রকৃতিগতভাবে অগণতান্ত্রিক এবং মানবতা-বাদ বিরোধী। বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই উভয় ব্যবস্থা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখে। উভয় ব্যবস্থাতেই শাসকশ্রেণী মুষ্টিমেয়ের স্বার্থে শাসনকার্য পরিচালনা করে।

১০। স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা বনাম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা
(Autocractic System vs. Socialist System)

উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সর্বাত্মক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমীপবর্তী বলে মনে করেন। কিন্তু তাঁদের এই অভিমত ভ্রান্ত ও পক্ষপাতদোষে দুষ্ট। উভয় প্রকার রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে আপাতঃদৃষ্টিতে সামান্য কিছু সাদৃশ্য থাকলেও প্রকৃতপক্ষে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। তাই এই দুই ব্যবস্থাকে পরস্পরের বিপরীত বলে বর্ণনা করাই বাঞ্ছনীয়।

স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বাহ্য সাদৃশ্যগুলি হোল :

(ক) উভয় ব্যবস্থাতে রাজনৈতিক দল, . নির্বাচন প্রভৃতি অবাধ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত।

(খ) অনেকের মতে, স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার মত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ জনগণের রাজনৈতিক আনুগত্যলাভের জন্য কিছু পরিমাণে বলপ্রয়োগ করে।

(গ) উভয় ব্যবস্থাতেই নাগরিক অধিকার অত্যন্ত সীমিত। গণ-সংযোগের মাধ্যমগুলি এবং বিচারবিভাগের উপর সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণ বিশেষভাবে লক্ষণীয় বলে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সমর্থকগণ মনে করেন।

কিন্তু স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সাদৃশ্য বর্ণনা পক্ষপাতদোষে দুষ্ট। ধনতন্ত্রবাদের সমর্থকগণই উভয় রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে অভিন্ন বলে মনে করেন। বাস্তবে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার ঠিক বিপরীত ব্যবস্থা হোল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যগুলি হোল :

(ক) স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন প্রভুত্বকারী রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকে না। অবশ্য সংকীর্ণ জাতিত্ববোধ ও জাতীয়তাবাদ অনেক সময় এই ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক সঙ্গতি রক্ষার ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি হোল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেই কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

(খ) ঐতিহ্যগত স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব চিরাচরিতভাবে বিশেষ একজন ব্যক্তি কিংবা বিশেষ একটি গোষ্ঠীর হস্তে ন্যস্ত থাকে। আবার আধুনিকীকৃত স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামাজিক বিন্যাস ও শাসন-কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে সামরিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করা হয়।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুরানো শ্রেণী-সম্পর্কের পরিবর্তন সাধন করে শোষণহীন সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার মত এখানে শ্রেণীশোষণ থাকে না। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা হোল মুক্ত ব্যবস্থা। এরূপ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কেবলমাত্র শ্রমিক-কৃষকের একটি মাত্র শ্রেণীর প্রাধান্য থাকে। অন্য কোন শ্রেণীর প্রাধান্য এরূপ ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ করা যায় না।

(গ) স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটি সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠী রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের উপর একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে। এই গোষ্ঠী সংখ্যালঘু ধনিক-বণিক শ্রেণীর

স্বার্থেই রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে প্রয়োগ করে। সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও বিরোধী দলকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে এই গোষ্ঠী নির্মূল করার চেষ্টা করে।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বিশেষ কোন গোষ্ঠী বা বিশেষ কোন ব্যক্তির হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে না। সর্বহারা শ্রেণী এবং এই শ্রেণীর প্রতিভূ কমিউনিস্ট পার্টির হস্তেই রাজনৈতিক ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। এই ব্যবস্থায় একাধিক রাজনৈতিক দল স্বাভাবিকভাবেই থাকে না। সুতরাং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিকে নির্মূল করার প্রচেষ্টার কথা আজগুবি ধারণা মাত্র। তবে একথা সত্য যে, সংখ্যালঘু বুর্জোয়া শ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার যে-কোন প্রচেষ্টাকেই এই ব্যবস্থায় কঠোর হস্তে দমন করা হয়।

(ঘ) স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার স্বীকৃত।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার এই ব্যবস্থায় স্বীকৃত হয় না।

(ঙ) স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফ্যাসীবাদের ন্যায় ব্যক্তিপূজা চলে।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিপূজার কোন স্থান নেই। ব্যক্তির পরিবর্তে সামগ্রিকভাবে সমাজকে বড় বলে মনে করা হয়। একক নেতৃত্বের পরিবর্তে সামগ্রিক নেতৃত্ব এই ব্যবস্থাকে পরিচালিত করে।

(চ) স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক শাসকবর্গ রাজনৈতিক সংহতি ও আনুগত্য লাভের জন্য বলপ্রয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার' নীতির ভিত্তিতে প্রতিটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বলে সরকারের প্রতি জনসাধারণ শ্রদ্ধাপূর্ণ স্বাভাবিক আনুগত্য প্রদর্শন করে।

(ছ) স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিক অধিকার অত্যন্ত সীমিত। গণ-সংযোগের মাধ্যম ও বিচার বিভাগের উপর সরকারের সুকঠোর নিয়ন্ত্রণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

অপরপক্ষে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অধিকার খর্ব করার পরিবর্তে ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণের পীঠস্থান হিসেবে কাজ করে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য ও স্বাধীনতা না থাকলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অধিকার মূল্যহীন হয়ে পড়ে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের অধিকারসমূহকে বাস্তবে অর্থবহ করে তোলা হয়।

(জ) স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেক সময় সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও জাতিত্ববোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আন্তর্জাতিকতার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। সামরিকবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ অনেক ক্ষেত্রে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গী হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় রাষ্ট্রের পরিবর্তে আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী। সামরিকবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের চিরশত্রু হিসেবে সমাজতন্ত্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও সৌভ্রাত্রের প্রতিষ্ঠাকল্পে নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালায়।

পূর্বোক্ত পার্থক্যের ভিত্তিতে এ কথা সহজেই বলা যেতে পারে যে, স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রকৃতিগতভাবে অগণতান্ত্রিক, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আদর্শ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পীঠস্থান।

১১। ফ্যাসীবাদী বনাম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Fascist System vs. Socialist System)

অ্যালান বল প্রমুখ পশ্চিমী দুনিয়ার রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সর্বাত্মক রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থা এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সর্বাত্মক ব্যবস্থার অন্তর্গত বলে তাঁরা মনে করেন। উভয় প্রকার রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে বাহ্যতঃ কতকগুলি সাদৃশ্য রয়েছে বলে পশ্চিমী দুনিয়ার রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ উভয়ের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নিরূপণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

আপাতঃদৃষ্টিতে ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে সব সাদৃশ্য রয়েছে সেগুলি হোল ;

(ক) উভয় প্রকার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একটিমাত্র রাজনৈতিক দল ও একটিমাত্র আদর্শের অস্তিত্ব থাকে। সেই দলের অপ্রতিহত প্রাধান্য সর্বক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে একটিমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

(খ) উভয় প্রকার রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই ব্যক্তিস্বার্থ এবং রাষ্ট্র ও সমাজের স্বার্থ অভিন্ন বলে মনে করা হয়।

(গ) উভয় রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে বিশেষ একটি আদর্শের প্রতি জনগণের সম্মতি ও সমর্থন থাকায় উভয় শাসনব্যবস্থাই বৈধতা লাভ করে।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার এইসব বৈশিষ্ট্য আপাতদৃষ্টিতে ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনীয় বলে মনে হলেও উভয় প্রকার রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। সোভিয়েত ইউনিয়ন, গণসাধারণতন্ত্রী চীন প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পশ্চিমী দুনিয়ার রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ, বিশেষতঃ মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে অভিন্ন বলে বর্ণনা করে উভয় প্রকার রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে 'সর্বাত্মক ব্যবস্থা' বলে অভিহিত করেছেন ; অবশ্য কোন কোন পশ্চিমী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী উভয় প্রকার রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য আছে বলে স্বীকার করলেও সেই পার্থক্য নামমাত্র বলে তারা মনে করেন। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী যে অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং পক্ষপাতদোষে দুষ্ট তা বলাই বাহুল্য। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সংকীর্ণ অর্থে সর্বাত্মক ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এবং মনে হতে পারে যে, ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কোনরূপ পার্থক্য নেই। বস্তুতঃ উভয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। সেগুলি হোল :

[ক] ফ্যাসীবাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থা সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে একটি প্রতিবিপ্লবী (Counter-revolutionary) ব্যবস্থা মাত্র। এই ব্যবস্থায় ব্যবসাবাণিজ্যের উপর একচেটিয়া পুঁজিপতিদের প্রাধান্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি

পায়। শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষিক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা এই ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ।

অপরপক্ষে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে। এই বিপ্লবের ফলে সর্বহারা একনায়কত্ব কায়েম হয়। এই ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিপতিদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

[খ] ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রভুত্বকারী কায়েমী স্বার্থের রক্ষক বাছাই-করা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব কেন্দ্রীভূত থাকে। এই সব ব্যক্তির ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন দলের সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী একজন মাত্র নেতা। এই ব্যবস্থায় পার্টি ও সর্বোচ্চ নেতাকে অভিন্ন বলে মনে করা হয়।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে সর্বহারা শ্রেণীর হাতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকে। এই শ্রেণী কমিউনিস্ট পার্টির মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে। ফ্যাসীবাদের মত এই ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বার্থে তাদের দ্বারা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব পরিচালিত হয় না। পার্টি ও নেতাকে অভিন্ন বলেও মনে করা হয় না। যে-কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি অনুসরণ করা হয়। তাই ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থাকে অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী বলে বর্ণনা করা হয় কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে গণতন্ত্রের পীঠস্থান হিসেবে চিত্রিত করা হয়।

[গ] ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থায় বলপূর্বক বা সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ছাড়া অন্যান্য দলের অস্তিত্ব বিলোপ করা হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও এই ব্যবস্থায় সরকারী দল ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দল স্বীকৃতি পায় না।

অপরপক্ষে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা বাহুল্য, এই সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে একাধিক রাজনৈতিক দলেরও প্রয়োজনীয়তা থাকে না। স্বাভাবিকভাবেই কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া অন্য রাজনৈতিক দলের প্রভাব বিলুপ্ত হয়।

[ঘ] ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তিকে বলি দেওয়া হয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতা এখানে মূল্যহীন। এই ব্যবস্থায় মানবিকতারও কোন মূল্য নেই।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করার পরিবর্তে তাকে সংরক্ষণ করার পীঠস্থান হিসেবে কাজ করে। অর্থনৈতিক সাম্য ও স্বাধীনতা না থাকলে রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের স্বাধীনতাকে বাস্তবায়িত করে তোলা হয়।

[ঙ] হিংস্রতা ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থার অপরিহার্য অংগ। ফ্যাসিস্ট দল হিংসা, ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে জনসমর্থন লাভের চেষ্টা করে।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার বন্ধন-মুক্তির ফলে

সর্বহারা শ্রেণী কমিউনিস্ট দলকে তাদের অতি আপনজন বলে মনে করে এবং এই দলের প্রতি তাদের অকৃত্রিম সমর্থন ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করে।

[চ] ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থা সামরিকবাদ-ও সাম্রাজ্যবাদের নামান্তর মাত্র। এই ব্যবস্থার সমর্থকেরা যুদ্ধকে মানবজীবনের অগ্রগতির সোপান এবং শান্তিকে 'কাপুরুষে স্বপ্ন' বলে প্রচার করেন। এঁরা জাতীয় রাষ্ট্রের সম্প্রসারণের জন্য যুদ্ধকে একান্ত-ভাবে কাম্য বলে মনে করেন। ফ্যাসীবাদের জনক মুসোলিনী সাম্রাজ্যবাদকে মানবজীবনের 'শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় নিয়ম' বলে ঘোষণা করতেন।

অপরপক্ষে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থকেরা সামরিকবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে চিরশত্রু বলে চিহ্নিত করেছেন। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিরলস ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালাবার জন্য সমাজতন্ত্রের প্রবক্তাগণ আহ্বান জানিয়েছেন।

[ছ] ফ্যাসীবাদ আন্তর্জাতিকতার মহান আদর্শের পরিপন্থী। আন্তর্জাতিকতার পরিবর্তে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদই ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান সূচক।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে আন্তর্জাতিকতার সুমহান আদর্শে আস্থাশীল। তাই এই ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও সৌভ্রাত্রের বন্ধন সুদৃঢ় করার কাজে নিষ্ঠা সহকারে প্রচেষ্টা চালায়।

[জ] ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থায় ব্যক্তিপূজা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকে। 'মুসোলিনী কোন অন্যায় করতে পারেন না'—এই ছিল ফ্যাসীবাদী ইতালীর অদ্ভুত শ্লোগান।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিপূজার কোন স্থান নেই। এখানে ব্যক্তির পরিবর্তে সমগ্র সমাজকে বড় বলে মনে করা হয়। একক-নেতৃত্বের পরিবর্তে সামগ্রিক নেতৃত্ব এই ব্যবস্থাকে পরিচালিত করে। সর্বক্ষেত্রেই কমিউনিস্ট পার্টির প্রাধান্য থাকলেও 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা'র মাধ্যমে প্রতিটি সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়।

সুতরাং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থাকে অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে অভিহিত করা যেতে পারে। ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থায় অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে গণতন্ত্রকে টুঁটি টিপে হত্যা করা হয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার জারক রসে গণতন্ত্রের মহান আদর্শ পরিপুষ্ট হয়ে উঠে।

একবিংশ অধ্যায়

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ

[Different Organs of Government]

সরকারের কার্যাবলীকে মূলত তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা—আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্য, শাসন সংক্রান্ত কার্য এবং বিচার সংক্রান্ত কার্য। এই তিন প্রকার কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব সরকারের তিনটি বিভাগের উপর অর্পণ করা হয়। সাধারণভাবে বলা যায়, আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করে, শাসন বিভাগ আইন বিভাগ-প্রণীত আইনকে কার্যকরী করে এবং বিচার বিভাগ আইন ভঙ্গকারীর শাস্তি বিধান করে। সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইন বিভাগকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। কারণ আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন না করলে অন্য দুটি বিভাগ স্বাভাবিকভাবেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে।

সরকারের তিনটি প্রধান বিভাগ

১। আইনসভার কার্যাবলী (Functions of the Legislative)

আইনসভা সরকারের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হলেও এতদিন পর্যন্ত আইনগত দিক থেকে তার ভূমিকা ও কার্যাবলীর মূল্যায়ন করা হোত। ফলে আইনসভা সম্পর্কিত বিচারবিশ্লেষণ সাংবিধানিক পরিবেশের সংকীর্ণ বেড়াজাল অতিক্রম করতে সমর্থ হয় নি। তাই বর্তমানে আইনগত ও রাজনৈতিক দিক থেকে আইনসভার পর্যালোচনা করা যুক্তিসঙ্গত বলে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ অভিমত পোষণ করেন। সব রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আইনসভার ক্ষমতা, কার্যাবলী ও পদমর্যাদা সমান নয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রকৃতিগত ভিন্নতার জন্য আইনসভার গঠন, কার্যাবলী ইত্যাদির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। আবার অনুরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেও আইনসভার ভূমিকা ও মর্যাদা বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের আইনসভা গঠনগত দিক থেকে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট হলেও তাদের ভূমিকা ও পদমর্যাদার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। ১৯৩৬ সালে প্রণীত স্ট্যালিন-সংবিধান অনুসারে সুপ্রীম সোভিয়েত (সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় আইনসভা) প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী এবং তার উভয় কক্ষই সম-ক্ষমতাসম্পন্ন কিন্তু কার্যতঃ সুপ্রীম সোভিয়েতের কোন ভূমিকাই নেই। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্ত বৈধকরণের হাতিয়ার হিসেবেই তা কাজ করে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনে যথাক্রমে কংগ্রেস (Congress) ও পার্লামেন্ট (Parliament) দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট হলেও দুটি কক্ষ সমক্ষমতাসম্পন্ন নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার উচ্চকক্ষ সিনেট (Senate) ব্রিটেনের উচ্চকক্ষ লর্ড সভা (House of Lords) অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিশালী।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি অনুসারে আইনসভার কার্যাবলীর ভিন্নতা

আইনসভার উচ্চকক্ষের প্রকৃতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নে সুপ্রীম সোভিয়েতের দ্বিতীয় কক্ষ 'জাতিপুঞ্জের সোভিয়েত' (Soviet of Nationalities) বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজের (nationalities) প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু ব্রিটেনের লর্ড সভা কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ হিসেবে এবং 'প্রতিক্রিয়াশীলদের দুর্গ" হিসেবে কাজ করে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আইনসভাগুলির সম্পাদিত কার্যাবলীর ক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন-ব্যবস্থায় (Presidential Forms of Government) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ থাকার ফলে আইন বিভাগ শাসন বিভাগের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষ, গ্রেট ব্রিটেন প্রভৃতি সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় (Parliamentary Forms of Government) আইনসভার উপর শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকতে দেখা যায়। তত্ত্বগতভাবে এরূপ শাসনব্যবস্থায় আইনসভা প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হলেও কার্যক্ষেত্রে শাসন বিভাগের সর্বতোমুখী প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতির ভিত্তিতে, তত্ত্বগত ও বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আইনসভার ভূমিকা পর্যালোচনা বাঞ্ছনীয়

সুতরাং বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতির ভিত্তিতে তত্ত্বগত ও বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আইনসভার ভূমিকা পর্যালোচনা করাই বাঞ্ছনীয় এবং বিজ্ঞানসম্মত। অ্যালান বল (Alan Ball)-এর মতে, সাংবিধানিক কাঠামো দলীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির তারতম্য, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আইনসভার প্রকৃতি ও ভূমিকা নির্ধারণ করে। তাই রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই আইনসভার কার্যাবলী আমাদের আলোচনা করতে হবে।

অ্যালান বল উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইনসভার কার্যাবলীকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন, যথা—শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কার্য, আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্য এবং প্রতিনিধিত্বমূলক কার্য (representative functions)। আমরা আইনসভার কার্যাবলীকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করতে পারি।

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্য

(১) আইন প্রণয়ন করাই হোল আইন বিভাগের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। দেশের সংবিধানের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে এবং জনমতের গতি-প্রকৃতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে আইনসভা নতুন আইন প্রণয়ন করে, পুরাতন আইন সংশোধন করে এবং অপ্রয়োজনীয় আইন বাতিল করতে পারে। বর্তমান দিনে আইনসভাই আইনের সর্বপ্রকার উৎস। তবে বিভিন্ন দেশে আইনসভায় বিল উত্থাপনের এবং আইন প্রণয়নের পদ্ধতির ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ভারতবর্ষ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন প্রভৃতি দেশে কেবলমাত্র নিম্নকক্ষে বিল উত্থাপিত হতে পারে। কিন্তু সুইজারল্যান্ডে আইনসভার যে-কোন কক্ষে বিল উত্থাপন করা যায়। আবার ব্রিটেনে মন্ত্রিসভাই বিল উত্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তার ভূমিকা পালন করে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন কমিটি কিংবা

কংগ্রেসের সদস্যরা বিল উত্থাপন করার অধিকারী। উল্লেখযোগ্য যে, কোন দেশের আইনসভা আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে চরম ক্ষমতার অধিকারী নয়। সংবিধান ও আইনের গণ্ডির মধ্যে থেকেই আইনসভাকে আইন প্রণয়ন কার্য সম্পাদন করতে হয়।

(২) আইন প্রণয়ন করা আইন বিভাগের প্রধান কাজ হলেও কার্যক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত কমিটিগুলিই আইন প্রণয়ন করে। আইনসভার সাধারণ সদস্যদের আইন প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাবই এর কারণ। তবে একথা সত্য যে, কমিটিগুলি আইনের খসড়া রচনা করলেও আইনসভায় গৃহীত না হলে তা আইন বলে বিবেচিত হয় না। আইনের খসড়া বা বিল আইনসভায় উপস্থাপিত হওয়ার পর তার উপর ব্যাপক আলোচনা চলে। গণতন্ত্রে প্রতিটি আইনকে জনমতের প্রতিফলন বলে মনে করা হয়। তাই আইন প্রণয়নে জনপ্রতিনিধিদের আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য প্রতিটি রাষ্ট্রে আইনসভার সদস্যরা আলোচনার সমান সুযোগসুবিধা পান না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিংবা পঞ্চম ফরাসী প্রজাতন্ত্রের আইনসভার সদস্যরা আলোচনার যথেষ্ট সুযোগ পান; কিন্তু ব্রিটেনে মুলতবী প্রস্তাব, গিলোটিন, আলোচনা বন্ধের প্রস্তাব ইত্যাদির মাধ্যমে বিরোধী পক্ষের সদস্যদের আলোচনার সুযোগসুবিধা হ্রাসের চেষ্টা করা হয়। অবশ্য একথা ঠিক যে, আইনসভায় আলোচনার সময়সীমা যুক্তিসঙ্গতভাবে পূর্বাহ্নেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া উচিত। তা না হলে সরকার পক্ষ ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে অযৌক্তিক বাক্-বিতন্ডায় অমূল্য সময়ের অপব্যয় ঘটবে।

আলোচনামূলক কাজ

(৩) আইনসভার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্য হোল শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করা। তবে শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন দেশে এরূপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মাত্রাগত তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। ভারতবর্ষ, গ্রেট ব্রিটেন প্রভৃতি সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় তত্ত্বগতভাবে মন্ত্রিসভা সম্পাদিত কার্যাবলীর জন্য আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকে। আইনসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিগণকে পদত্যাগ করতে হয়। বাস্তবে কিন্তু মন্ত্রিসভাই আইন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ থাকার ফলে তত্ত্বগতভাবে আইনসভা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। অবশ্য কার্যক্ষেত্রে নানাভাবে আইনসভা শাসন বিভাগের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে; যেমন—সিনেটের অনুমোদন ছাড়া মার্কিন রাষ্ট্রপতি সন্ধি স্বাক্ষর, চুক্তি সম্পাদন, উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি করতে পারেন না।

শাসনসংক্রান্ত কাজ

(৪) অনেক সময় আইন বিভাগ বিচার সংক্রান্ত কার্যাবলীও সম্পাদন করে। নিজ সদস্যদের আচার-আচরণের বিচার, আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আনীত গুরুতর অভিযোগের বিচার, নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধের বিচার ইত্যাদি আইনসভার বিচার সংক্রান্ত কার্যাবলীর অন্তর্গত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির নির্দিষ্ট কার্যকাল পরিসমাপ্তির পূর্বে কংগ্রেস ইমপিচমেন্টের (Impeachment) মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে অপসারিত করতে পারে। গ্রেট ব্রিটেনের লর্ড সভা দেশের সর্বোচ্চ আপীল আদালত হিসেবে কাজ করে।

বিচারসংক্রান্ত কাজ

(৫) গণতন্ত্রে সরকারী অর্থ যেহেতু জনগণের অর্থ সেহেতু এই অর্থের যাতে অপচয় না হয় সেজন্য অর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়। আইন বিভাগ বিগত বৎসরের সরকারী আয়-ব্যয়ের পর্যালোচনা, পরবর্তী বৎসরের জন্য ব্যয়-বরাদ্দকরণ প্রভৃতির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে কার্যকরী করে তোলে। আইনসভার অনুমতি ছাড়া নতুন কর (Tax) ধার্য কিংবা পুরাতন কর-ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা যায় না। গ্রেট ব্রিটেন ও ভারতবর্ষে সরকারী গণিতক কমিটি (Public Accounts Committee , ব্যয়-নিয়ন্ত্রক ও মহাহিসাব পরীক্ষক (Comptroller and Auditor-General) এবং আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটি (Estimate Committee)-র মাধ্যমে পার্লামেন্ট সরকারী আয়-ব্যয় ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

অর্থসংক্রান্ত কার্য

(৬) কোন কোন রাষ্ট্রে আইন বিভাগ সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকর্তা হিসেবে কাজ করে। সুইজারল্যান্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা (Federal Assembly) এরূপ ক্ষমতার অধিকারী। আবার ভারতবর্ষ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশের আইনসভা সংবিধান সংশোধন করতে পারে। তবে আইনসভার সংবিধান সংশোধন করার ক্ষমতা সর্বত্র সমান নয়। সুইজারল্যান্ডে গণভোট (Referendum) ও গণ-উদ্যোগের (Initiative) ব্যবস্থা থাকায় সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে আইনসভার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয় না। বেলজিয়ামে নির্বাচিত একটি বিশেষ পরিষদের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন করা যায়। ভারতীয় সংবিধানের সুনির্দিষ্ট কতকগুলি অংশ সংশোধনের জন্য রাজ্যগুলির সম্মতি প্রয়োজন। তবে সব দেশেই সংবিধান সংশোধনের জন্য আইন সভাকে 'একটি বিশেষ পদ্ধতি' (special procedure) অনুসরণ করতে হয়।

সাংবিধানিক ক্ষমতা

(৭) বিভিন্ন উদারনৈতিক রাষ্ট্রের আইনসভাকে নির্বাচন সংক্রান্ত কতকগুলি কার্য সম্পাদন করতে হয়। সুইজারল্যান্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ (Federal Council) এর সদস্যদের নির্বাচিত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কোনও প্রার্থী নির্বাচক সংস্থার সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করতে না পারলে প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে প্রথম তিনজন প্রার্থীর মধ্যে যে কোন একজনকে প্রতিনিধি সভা (House of Representatives) রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করতে পারে। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পার্লামেন্ট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নির্বাচনসংক্রান্ত কার্য

(৮) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইনসভার সদস্যগণ বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। অনেক সময় তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একই বিষয় নিয়ে আলোচনা, বিতর্ক ইত্যাদি করেন। সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে সেইসব আলোচনা প্রচারিত হওয়ার ফলে জনগণের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায়। জনগণ সরকারী ক্রিয়াকলাপের উপর সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারে।

রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটায়

(৯) দেশের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিবর্গ নিজ নিজ অঞ্চলের জনগণের অভাব-অভিযোগ ও সমস্যাবলী সম্পর্কে আইনসভায় আলোচনা করেন। এই সব আলোচনার

ভিত্তিতে সরকার প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করে। এইভাবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসভা একদিকে যেমন জনমত প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, অন্যদিকে তেমনি সরকার ও নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে সংযোগসাধনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। স্যামুয়েল বীয়ার (S. Beer) ব্রিটেনের কমন্স সভার সংযোগসাধনের কার্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সরকার ও বিরোধী দল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সমর্থন লাভের জন্য পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিত্তিতে সংযোগসাধনের কার্য সম্পাদন করে।

সংযোগ সাধনের কাজ

(১০) আধুনিক আইনসভাগুলি অনেক সময় বিভিন্ন প্রকার অনুসন্ধান কার্যের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করে। কোন কোন দেশে সমকালীন অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সমস্যাবলী সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত হওয়ার জন্য আইনসভা কমিশন বা কমিটি নিয়োগ করে। আবার সরকারী ব্যবস্থার দুর্নীতি তদন্তের জন্যও এরূপ কমিটি বা কমিশন গঠিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিক্সনের ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারী তদন্তের জন্য সিনেটের বিচার সম্পর্কিত কমিটি এবং ভারতবর্ষে বিগত জরুরী অবস্থায় ক্ষমতার অপব্যবহার ও নিপীড়ন বিষয়ে তদন্ত করার জন্য শাহ কমিশন নিয়োগের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কমিটি, কমিশন নিয়োগ ইত্যাদি

(১১) কোন কোন দেশে বিচারপতিদের অপসারিত করার ক্ষমতা আইনসভার হস্তে ন্যস্ত থাকে। ভারতবর্ষে আইনসভার উভয় কক্ষে দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্ট এবং হাইকোর্টের বিচারপতিদের অপসারিত করতে পারেন। ব্রিটেনের পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের দাবিতে রাজা বা রানী বিচারপতিদের অপসারিত করেন।

বিচারকদের পদচ্যুত করা

পরিশেষে বলা যায় যে, আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের আইনসভা তত্ত্বগতভাবে পূর্বোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করলেও বাস্তবে নানা কারণে আইন বিভাগের গুরুত্ব বহুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। আইনসভার প্রাধান্যের পরিবর্তে বর্তমানে অধিকাংশ উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উপসংহার

২। আইনসভার সংগঠন (Organisation of the Legislature)

সাংগঠনিক দিক থেকে আইনসভাকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়,—ক. এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা (Unicameral Legislature) এবং খ. দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা (Bicameral Legislature)। যে সব আইনসভার দুটি কক্ষ বা পরিষদ থাকে সেগুলিকে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বলে। দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার নিম্নকক্ষ (Lower House) বা জনপ্রিয় কক্ষ (Popular Chamber) জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। কিন্তু উচ্চকক্ষে (Upper

আইনসভা এক-কক্ষবিশিষ্ট বা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট হতে পারে

House) বা দ্বিতীয় কক্ষে (Second Chamber) সাধারণতঃ প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবর্গ থাকেন না।

উচ্চকক্ষে প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নীতি অনুসৃত হতে দেখা যায়। গ্রেট ব্রিটেনে অভিজাত ব্যক্তিদের নিয়ে লর্ড সভা (House of Lords) গঠিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিটি অঙ্গরাজ্য ২ জন করে প্রতিনিধি সিনেটে (Senate) নির্বাচিত করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতিটি ইউনিয়ন রিপাবলিক (Union Republic) ৩২ জন, প্রতিটি স্বয়ং-শাসিত রিপাবলিক (Autonomous Republic) ১১ জন, প্রতিটি স্বয়ং-শাসিত অঞ্চল (Autonomous Region) ৫ জন এবং প্রতিটি জাতীয় অঞ্চল (National Area) ১ জন করে প্রতিনিধি সোভিয়েত জাতিপুঞ্জে (Soviet of Nationalities) নির্বাচিত করে। ভারতবর্ষের রাজ্যসভায় (Council of States) কিন্তু সম-প্রতিনিধিত্বের নীতি অনুসৃত হয় না।

উচ্চকক্ষের প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে বিভিন্ন নীতি

যে সব রাষ্ট্রে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে সেই সব রাষ্ট্রে আইনসভার উচ্চকক্ষের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা বিষয়ে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ব্রিটেনে লর্ড সভা অপেক্ষা কমন্স সভা (House of Commons) অনেক বেশী শক্তিশালী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি-সভা অপেক্ষা উচ্চকক্ষ সিনেট অনেক বিষয়ে অধিক ক্ষমতা ভোগ করে। আবার সোভিয়েত ইউনিয়নে সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় কক্ষই (ইউনিয়নের সোভিয়েত ও জাতিপুঞ্জের সোভিয়েত) সমক্ষমতাসম্পন্ন।

উচ্চকক্ষের ক্ষমতার প্রশ্নে পার্থক্য

৩। দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি
(Argument for and against Bi-cameral Legislature)

আইনসভা এক-কক্ষবিশিষ্ট অথবা দ্বিকক্ষ-সমন্বিত হবে—এ নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। বেন্থাম আবে সিঁয়ে (Abbe Sieyes), ল্যাস্কি, ফ্র্যাংকলিন (Franklin) প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার বিরোধী এবং এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার সমর্থক। অপরদিকে লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce), জন স্টুয়ার্ট মিল, লেকী (Lecky), হেনরী মেইন, লর্ড অ্যাক্টন (Lord Acton), দ্যুগুই (Duguit), গেটেল প্রমুখেরা এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার নানা প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখ করে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

আইনসভার সংগঠনের প্রশ্নে মতবিরোধ

সাধারণতঃ এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার সপক্ষে যে সব যুক্তি প্রদর্শিত হয় সেগুলি দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার বিপক্ষে যুক্তি। আবার দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার সপক্ষে যে সব যুক্তির অবতারণা করা হয় সেগুলি এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার বিপক্ষে যুক্তি।

সপক্ষে যুক্তি ঃ দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার সপক্ষে অর্থাৎ এক-কক্ষবিশিষ্ট আইন সভার বিপক্ষে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শিত হয় ঃ

(১) লর্ড ব্রাইসের মতে, অসংযত, স্বৈরাচারিতা ও দুর্নীতিপরায়ণতা হোল

প্রত্যেক আইনসভার অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি। তা প্রতিরোধ করার জন্য সম-ক্ষমতাসম্পন্ন একটি দ্বিতীয় কক্ষের প্রয়োজন। এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় স্বৈরাচারী আইন প্রণীত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। আইনসভায় সম-ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি কক্ষ থাকলে একে অপরের স্বৈরাচারিতা রোধ করে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে। তাই লর্ড অ্যাক্টন বলেছেন, আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষ হোল ব্যক্তিস্বাধীনতার একটি প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা।

নিম্নকক্ষের স্বৈরাচারিতা রোধ করে

(২) এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ভাবাবেগ, সাময়িক উত্তেজনা কিংবা জনমতের চাপে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী অবিবেচনাপ্রসূত আইন প্রণয়ন করতে পারে। আইনসভা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট হলে উভয় কক্ষে আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে সুচিন্তিত ও জনকল্যাণকামী আইন প্রণীত হতে পারে। লেকীর মতে, দ্বিতীয় কক্ষের নিয়ন্ত্রণমূলক, সংস্কারমূলক এবং সংযতকারী ক্ষমতা একে অপরিহার্য করে তুলেছে।

সুচিন্তিত আইন প্রণয়ন সম্ভব

(৩) গণতন্ত্রে প্রতিনিয়তই জনমতের পরিবর্তন ঘটে। এক-কক্ষবিশিষ্ট আইন সভার সদস্যদের নির্বাচন একই সময়ে অনুষ্ঠিত হয় বলে পরিবর্তিত জনমতের সঙ্গে তা সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার দুটি কক্ষের নির্বাচন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হয় বলে প্রবহমান জনমতের সুষ্ঠু প্রতিফলন আইনসভার মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনমতের সুষ্ঠু প্রতিফলনের জন্য দ্বিতীয় কক্ষের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

জনমতের সুষ্ঠু প্রতিফলন সম্ভব

(৪) আইনসভায় সংখ্যালঘু স্বার্থের যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা না থাকলে গণতন্ত্রে সাফল্য আসতে পারে না। এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা প্রত্যক্ষ নির্বাচন ভিত্তিক বলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করতে ব্যর্থ হয়। স্বাভাবিকভাবেই তাদের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়। দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার উচ্চকক্ষ সাধারণতঃ মনোনয়ন বা পরোক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে গঠিত হয় বলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেক প্রতিনিধি সেখানে স্থান পান। তাই দ্যুগুই মন্তব্য করেছেন, সেই আইনসভা শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হবে হবে যার এক কক্ষ সমগ্র জনগণের এবং অন্য কক্ষ বিভিন্ন গোষ্ঠীর (group) প্রতিনিধিত্ব করবে।

সংখ্যালঘুদের স্বার্থের সংরক্ষণ

(৫) আইনসভায় জ্ঞানী, গুণী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা যত বেশী থাকবেন আইনসভার উৎকর্ষ ততই বৃদ্ধি পাবে। অনেক সময় প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ক্লেশ ও বিড়ম্বনা এড়াতে চান বলে এই সব ব্যক্তি নির্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতে চান না। এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা প্রত্যক্ষ নির্বাচনভিত্তিক বলে আইন সভায় এই সব যোগ্য ব্যক্তির স্থান হয় না। কিন্তু দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার উচ্চ কক্ষে মনোনয়নের মাধ্যমে তাঁরা অতি সহজেই স্থানলাভ করতে পারেন।

বিজ্ঞজনের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ

(৬) এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় প্রায় সমদৃষ্টিসম্পন্ন প্রতিনিধিবর্গ থাকেন বলে আইন প্রণয়নের সময় বিতর্ক এক রকম হয় না বললেই চলে। ফলে জনসাধারণের রাজনৈতিক জ্ঞানের বিকাশ ঘটে না। কিন্তু দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার দুটি কক্ষে আইন প্রণয়নের সময় যে আলাপ-আলোচনা, তর্কবিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় তা সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচারিত হয়। ফলে জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার ঘটে।

রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার ঘটে

(৭) অনেকের মতে, বর্তমানে আইনসভার কার্যাবলী ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় একটি মাত্র কক্ষের দ্বারা যাবতীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। আইনসভা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট হলে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইন প্রণয়নের দায়িত্ব উচ্চকক্ষের হাতে অর্পণ করে নিম্নকক্ষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুচিন্তিত আইন প্রণয়ন করায় মনোনিবেশ করতে পারে।

কার্যবৃদ্ধির ফলে দ্বিতীয় কক্ষের প্রয়োজন

(৮) জাতীয় স্বার্থ ও আঞ্চলিক স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উপর যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে। এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় আঞ্চলিক স্বার্থের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা সম্ভব হয় না। তাই তা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার পক্ষে অনুপযোগী। অপরপক্ষে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার নিম্নকক্ষে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জাতীয় স্বার্থ এবং উচ্চ কক্ষে মনোনীত প্রতিনিধিগণ আঞ্চলিক স্বার্থ রক্ষা করতে পারেন। তাই এরূপ আইনসভা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার পক্ষে অপরিহার্য বিবেচিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার পক্ষে অপরিহার্য

(৯) গেটেলের মতে, আইনসভা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট হলে উভয় কক্ষই একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করতে সর্বদা ব্যস্ত থাকে। শাসন বিভাগের উপর আইন বিভাগের মাত্রাতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ না থাকায় শাসন বিভাগ স্বাধীনভাবে কার্য সম্পাদনের দ্বারা সুশাসন প্রবর্তন করতে পারে।

শাসন বিভাগের প্রাধান্যের জন্য প্রয়োজন

(১০) সমাজতন্ত্রবাদীরা বিশেষ ক্ষেত্রে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার সমর্থক হলেও পাশ্চমী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে যে সব কারণে আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষের প্রবর্তন করা হয় তাঁরা তার তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁদের মতে, বহুজাতিসমন্বিত রাষ্ট্রে প্রতিটি জাতি যাতে নিজ নিজ জাতীয় ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে পারে সেজন্য দ্বিতীয় কক্ষের প্রয়োজন। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নে সম-প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত দ্বিতীয় কক্ষের অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

সমাজতন্ত্রবাদীদের যুক্তি

বিপক্ষে যুক্তি ঃ দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার সমালোচনা করে এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির অবতারণা করা হয় ঃ

(ক) গণতন্ত্র যেহেতু জনগণের দ্বারা জনগণের শাসন, সেহেতু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসভা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়েই গঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এদিক

থেকে বিচার করে এক-কক্ষাবিশিষ্ট আইনসভাকে গণতন্ত্রের অনুপন্থী বলে মনে করা হয়। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দ্বি-কক্ষাবিশিষ্ট আইনসভায় বিশেষ শ্রেণী এবং বিশেষ স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের নামে কার্যতঃ ধনশালী ও রক্ষণশীল শ্রেণীর সংকীর্ণ স্বার্থরক্ষার জন্য উচ্চকক্ষের প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাই এরূপ আইনসভাকে অগণতান্ত্রিক ও প্রগতি-বিরোধী বলে অভিহিত করা হয়।

অগণতান্ত্রিক গঠন

(খ) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষের প্রয়োজন—এ যুক্তিও অভ্রান্ত নয়। কিন্তু সংবিধানে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সর্বাপেক্ষা বেশী রক্ষিত হতে পারে। এক-কক্ষাবিশিষ্ট আইনসভায় এইভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

সংখ্যালঘুর স্বার্থ রক্ষার জন্য উচ্চকক্ষ প্রয়োজনীয়

(গ) সুচিন্তিত আইন প্রণয়নের জন্য দ্বিতীয় কক্ষের প্রয়োজন—এ কথা সত্য নয়। বর্তমানে এক-কক্ষাবিশিষ্ট আইনসভায় যে-কোন বিলকে আইনে রূপান্তরিত হতে গেলে কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। প্রতিটি পর্যায়ে বিলটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচারবিবেচনা করা হয়। তাছাড়া বিলটির উপর আইনসভায় যে তর্কবিতর্ক, আলাপ-আলোচনা হয় তা সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচারিত হয় বলে বিলটির পক্ষে বা বিপক্ষে অতি সহজেই জনমত গঠিত হতে পারে। জনমতের গতি-প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখেই বিলটিকে আইনে রূপান্তরিত করা হবে কিনা সে বিষয়ে আইনসভা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভাতেও সুচিন্তিত আইন প্রণয়ন সম্ভব

(ঘ) এক-কক্ষাবিশিষ্ট আইনসভা নিজ সম্পাদিত কার্যাবলীর জন্য এককভাবে দায়ী থাকে বলে সেক্ষেত্রে দায়িত্বের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা সহজ। কিন্তু আইনসভা দ্বি-কক্ষাবিশিষ্ট হলে একে অপরকে দোষারোপ করে নিজ দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে দায়িত্বের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা যথেষ্ট কঠিন।

দায়িত্বের অবস্থান নির্ণয় করা কঠিন

(ঙ) গণতন্ত্র দলীয় শাসনব্যবস্থা হওয়ার জন্য আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষে সদস্যদের মনোনয়ন বা পরোক্ষ নির্বাচনে দলীয় রাজনীতিই প্রাধান্য লাভ করে। নিম্নকক্ষে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলভুক্ত ব্যক্তিরা দ্বিতীয় কক্ষে স্থান পান। তাই অধিকাংশ সময় প্রকৃত যোগ্য এবং জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা দ্বিতীয় কক্ষে মনোনীত হতে পারেন না।

দ্বিতীয় কক্ষে জ্ঞানীদের স্থান হয় না

(চ) দ্বি-কক্ষাবিশিষ্ট আইনসভার উভয় কক্ষে একই রাজনৈতিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার ফলে নিম্নকক্ষ কর্তৃক প্রণীত জনস্বার্থ-বিরোধী আইনের বিরোধিতা করার পরিবর্তে উচ্চকক্ষ নির্দ্বিধায় তা সমর্থন করে। ফলে কার্যতঃ দ্বিতীয় কক্ষ অনাবশ্যক হয়ে পড়ে। আবার আইনসভার সমক্ষমতা সম্পন্ন উভয় কক্ষের সদস্যবৃন্দ যদি জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন তাহলে অনেক সময় দুটি কক্ষে পরস্পর-বিরোধী দুটি রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে উভয় কক্ষের মধ্যে তীব্র মতবিরোধের

অনাবশ্যক এবং ক্ষতিকারক

ফলে কাম্য ও জনকল্যাণকামী আইন প্রণীত হতে পারে না, আইন প্রণয়নের ব্যাপারে অচলাবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। তাই আবে সিঁয়ে মন্তব্য করেছেন, "দ্বিতীয় কক্ষ যদি প্রথম কক্ষের সঙ্গে একমত হয় তাহলে তা অনাবশ্যক ; আর যদি ভিন্নমত পোষণ করে তাহলে তা ক্ষতিকারক।"

(ছ) যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা একান্ত অপরিহার্য বলে বর্তমানে মনে করা হয় না। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই অঙ্গরাজ্যগুলির স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। সংবিধান অনুসারে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের মাধ্যমে আঞ্চলিক স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেন্দ্র যদি নিজ ক্ষমতার গণ্ডি অতিক্রম করে রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করে তাহলে দ্বিতীয় কক্ষ তার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করতে পারে না। সেক্ষেত্রে প্রতিবিধানের দায়িত্ব নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের উপর অর্পিত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য অপরিহার্য নয়

(জ) উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা অপ্রয়োজনীয়। একটি অপ্রয়োজনীয় কক্ষের সদস্যদের বেতন, ভাতা ইত্যাদির পেছনে অযথা বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয়। তাই অপচয়মূলক দ্বিতীয় কক্ষ রাখার কোন যুক্তি নেই বলে অনেকে মতপোষণ করেন।

অপচয়মূলক

(ঝ) অনেকের মতে, আইনসভা এক-কক্ষবিশিষ্ট হলে প্রয়োজনীয় এবং কাম্য বিষয়ে যতখানি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব, দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় তা সম্ভব হয় না। বিশ্বের অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দ্বিতীয় কক্ষ প্রথম কক্ষ অপেক্ষা কম শক্তিশালী। আর্থিক বিষয়গুলিতে উচ্চকক্ষের মতামতের কোন মূল্য নেই। অথচ এরূপ একটি কক্ষের প্রবর্তনের ফলে কাম্য ও প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মূল্যবান সময়ের অচয় অকাম্য বলে মনে করা হয়।

ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় না

(ঞ) আইন হোল জনগণের ইচ্ছার প্রকাশ। একই আইন সম্পর্কে জনগণের যেহেতু দু'প্রকার ইচ্ছা থাকতে পারে না সেহেতু দু'প্রকার ইচ্ছা প্রকাশের জন্য আইন সভার দুটি কক্ষের কোন প্রয়োজনীয়তাও নেই। যে আইনসভা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবে তাকে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ফ্রাংকলিন তাই দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভাকে 'বিপরীতগামী অশ্ব ও অশ্বযানের' সঙ্গে তুলনা করেছেন।

ঐক্যবদ্ধ ইচ্ছার প্রকাশ ব্যাহত হয়

দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হলেও বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রের আইনসভা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট। অধ্যাপক গেটেল দ্বি-কক্ষ ব্যবস্থাকে 'রাজনৈতিক বিবর্তনের একটি অধ্যায়' (a transitional stage in political development) বলে অভিহিত করেছেন।

উপসংহার

৪। আধুনিক প্রবণতাঃ আইনসভার ক্ষমতার অবসান (Modern Trend : Decline of Assemblies)

উনবিংশ শতাব্দীর আইনসভার সার্বভৌমিকতা এবং প্রভুত্ব রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় হ'লেও বিংশ শতাব্দীতে আইনসভার ক্ষমতার অবসান একরকম প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে বলা যেতে পারে। বস্তুতঃ বর্তমান বিশ্বের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থার গতি-প্রকৃতি আলোচনা করলে একথা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, আইনসভাগুলির ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পরিবর্তে শাসন বিভাগের প্রাধান্য অপ্রতিহতভাবে বেড়ে চলেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মেলবোর্ন (Melbourne) এবং পীল (Peel)-এর সময়ে ইংল্যান্ডের কমন্সসভা যে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী ছিল বর্তমানে সেই ক্ষমতার ব্যাপক অবসান ঘটেছে। তাই অধ্যাপক হোয়ার (Wheare) মন্তব্য করেছেন, বর্তমান শতাব্দীতে যদি আইনসভাগুলির মর্যাদা ও কার্যকারিতার বিষয়ে সমীক্ষা চালান হয় তা হলে দেখা যাবে— দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সর্বক্ষেত্রেই আইনসভাগুলির ক্ষমতার অবসান ঘটেছে। লর্ড ব্রাইস বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের কার্যাবলী পর্যালোচনা করে আইনসভার ক্ষমতা-হ্রাসের কতকগুলি সাধারণ কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। এই কারণগুলি হোল :

বিংশ শতাব্দীতে আইনসভার ক্ষমতার অবসান

(১) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র সাম্যনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই যে-কোন ব্যক্তি আইনসভার প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হতে পারেন। আইন প্রণয়নের জন্য যেসব কলাকৌশলগত জ্ঞানের প্রয়োজন তা' এইসব সাধারণ মানের প্রতিনিধিদের মধ্যে থাকে না। সাধারণতঃ তাঁরা এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব শাসনবিভাগের হস্তে অর্পণ করে নিশ্চিন্ত থাকেন। এর ফলে আইনবিভাগের পরিবর্তে শাসনবিভাগের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়।

প্রতিনিধিদের বিশেষ জ্ঞানের অভাব

(২) বর্তমানে জন-কল্যাণকামী রাষ্ট্রগুলির কার্যাবলী অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য সমস্ত বিষয়ে যথাসময়ে আইন প্রণয়ন করা আইন বিভাগের পক্ষে সম্ভব হয় না। তা ছাড়া, আর্থিক সংকট, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্রমবর্ধমান চাপ ইত্যাদি প্রতিটি রাষ্ট্রেই নিত্যনতুন সমস্যার সৃষ্টি করে। এককভাবে কোন আইনসভার পক্ষে সেই সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। তাই আইন বিভাগ শাসন বিভাগের হাতে নিজ ক্ষমতার একটি বৃহৎ অংশ অর্পণ করে। রামসে ম্যুর (Ramsay Muir) এর ভাষায়, আইনসভার বিপুল পরিমাণ কাজের চাপ বৃদ্ধির ফলে মন্ত্রিসভার একনায়কত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আইনসভার কার্যাবলীর উত্তরোত্তর বৃদ্ধিসাধন

(৩) অনেকের মতে, আইনসভার সদস্যদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি প্রদানের ফলে তাদের মর্যাদা এবং স্বাধীনতা বহুল পরিমাণে খর্বিত হয়। সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় আইনসভার দরিদ্র সদস্যরা নিজেদের আসন সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে মন্ত্রীদের নির্দেশ অবনতমস্তকে মেনে নেন। তাঁরা একথা যথার্থভাবেই জানেন যে, মন্ত্রীদের নির্দেশ অমান্য করার অর্থ

আইনসভার সদস্যদের স্বার্থপর মনোবৃত্তি

হোল পরবর্তী নির্বাচনে আইনসভার সদস্য হিসেবে মনোনয়ন না পাওয়া। এইভাবে আইনসভার সদস্যদের এরূপ মানসিকতা শাসন বিভাগের অস্বাভাবিক ক্ষমতাবৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে।

(৪) দলীয় ব্যবস্থার আবির্ভাব এবং দলীয় শৃঙ্খলার কঠোরতা আইনসভার প্রাধান্যের পরিবর্তে শাসন বিভাগের ক্ষমতা ও প্রাধান্যকে সম্প্রসারিত করেছে।

দলীয় ব্যবস্থার উদ্ভব

নির্বাচনী এলাকার বিশালায়তন এবং নির্বাচনে বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় প্রভৃতির জন্য দল-নিরপেক্ষভাবে কোনও ব্যক্তির পক্ষে নির্বাচনে জয়লাভ করা সহজ নয়। তাই দলীয় ছত্রচ্ছায়ায় তাদের সমবেত হতে হয়। অনেক সময় দলনেতাদের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হোলেও দলের সাধারণ সদস্যদের তা মুখ বুজে মেনে নিতে হয়। তাছাড়া, সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি অনুসারে যে দল নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে সেই দলই সরকার গঠন করবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃবর্গ মন্ত্রিসভায় স্থানলাভ করেন। ফলে শাসন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত দলীয় নেতাদের কোন নির্দেশকেই উপেক্ষা বা অস্বীকার করার ক্ষমতা আইনসভার সদস্যদের থাকে না। কারণ দলীয় নেতাদের নেতৃত্বকে উপেক্ষা করার অর্থ উপেক্ষাকারীর রাজনৈতিক অপমৃত্যু। এইভাবে সংসদীয় গণতন্ত্রে দলীয় সংহতি ও শৃঙ্খলা থাকায় আইনসভা কার্যক্ষেত্রে শাসন বিভাগের অনুগত ভৃত্যে পরিণত হয়েছে।

(৫) গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা দলীয় ব্যবস্থার নামান্তর বলে বিবেচিত হওয়ার ফলে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জ্ঞানী, গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা আইনসভার সদস্য হতে চান না।

আইনসভার সদস্যদের অযোগ্যতা

ফলে অনেক সময় অযোগ্য ব্যক্তিরা আইনসভার সদস্যপদ লাভকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেন। স্বাভাবিকভাবেই এই সব সদস্যদের উপর জনসাধারণের যেমন আস্থা থাকে না, তেমনি আইনসভার দৈনন্দিন গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পর্কেও সদস্যদের কোন উৎসাহ থাকে না। কোন রকমে কালাতিপাত করাই আইনসভার সদস্যদের দৈনন্দিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে আইন বিভাগের কর্তৃত্বের পরিবর্তে শাসন বিভাগের প্রাধান্য স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায়।

(৬) বর্তমানে জনমত গঠনে ও শিক্ষা বিস্তারে আইনসভা পূর্বের মত ভূমিকা পালনে অক্ষম হয়ে পড়েছে। কারণ বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবনীয়

জনমত গঠনে আইনসভার ব্যর্থতা

উন্নতির ফলে সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন প্রভৃতি জনমত গঠন ও জনশিক্ষার বাহন হিসেবে আইনসভা অপেক্ষা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর ফলে আইনসভার মর্যাদা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

(৭) জরুরী অবস্থার সময়ে যতখানি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা প্রয়োজন ততখানি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আইনসভাগুলি ব্যর্থ হয়। পারস্পরিক আলাপ-

জরুরী অবস্থার পক্ষে অনুপযোগী

আলোচনা, তর্কবিতর্ক ইত্যাদিতে আইনসভা অমূল্য সময়ের অযথা অপব্যয় করে। তাই জরুরী অবস্থার দ্রুত ও কার্যকরী মোকাবিলা করার জন্য প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রের আইন বিভাগ অপেক্ষা শাসন বিভাগের হাতে অধিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

(৮) বর্তমানে প্রতিটি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন বিভাগ স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে শাসন বিভাগের হস্তে নিয়মকানুন তৈরী করার এবং নির্দেশ (Ordinance) জারি করার ক্ষমতা অর্পণ করেছে। একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আইনসভার অধিবেশন বসে বলে অন্যান্য সময়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা শাসন বিভাগের হস্তে ন্যস্ত থাকে। এর ফলে কার্যতঃ শাসন বিভাগকেই কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করতে হয়। শাসন বিভাগ-প্রণীত এইরূপ আইনকে অর্পিত ক্ষমতা-প্রসূত আইন (Delegated Legislation) বলে অভিহিত করা হয়। অর্পিত ক্ষমতা-প্রসূত আইনের পরিধি যতই পরিব্যাপ্ত হয় শাসন বিভাগের প্রাধান্য ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

অর্পিত ক্ষমতা-প্রসূত আইনের আধিক্য

(৯) উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ কোনো-না-কোনোভাবে জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের সংগে জড়িত থাকে। এর ফলে জনসাধারণ শাসন বিভাগের উপর অধিকতর আস্থা স্থাপন করে। তা ছাড়া, ভারতবর্ষ, গ্রেট ব্রিটেন প্রভৃতি সংসদীয় গণতন্ত্রে শাসন বিভাগই নীতি নির্ধারণ করে এবং তা প্রয়োগ করে। এক্ষেত্রে আইনসভার সদস্যদের বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা না থাকায় জনসাধারণ স্বাভাবিকভাবেই আইনসভার সদস্য অপেক্ষা মন্ত্রিমণ্ডলীকে তাদের আশা-ভরসার কেন্দ্রবিন্দু বলে মনে করে। জনসাধারণের এই মানসিকতা আইনসভার ক্ষমতা ও মর্যাদা হ্রাসের অন্যতম কারণ।

জনসংযোগের অভাব

(১০) বর্তমান বিশ্বের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে রাজনৈতিক দল ছাড়াও বিভিন্ন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী এবং পেশাদারী সংগঠনগুলি জনসাধারণের সাধারণ সমস্যা ও সেগুলির সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে সরকারের সংগে আলাপ-আলোচনা করে। ফলে সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে সংযোগ সাধনের মাধ্যম হিসেবে আইনসভার গুরুত্ব বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ইত্যাদির প্রাধান্য বৃদ্ধি

৫। আইনসভার বর্তমান অবস্থা (Present Position of the Legislature)

আইনসভার ক্ষমতা ও মর্যাদার অবসান প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় লক্ষ্য করা গেলেও চূড়ান্তভাবে আইনসভার ক্ষমতার অবসান ঘটেছে—একথা আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অনেকেই মেনে নিতে রাজী নন। অধ্যাপক বিয়ার (B.er)-এর মতে, আইনসভার ক্ষমতার পরিবর্তে শাসনবিভাগের চূড়ান্ত ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়েছে একথা সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি মনে করেন, গ্রেট ব্রিটেনে গতানুগতিক প্রতিনিধিত্বের পাশাপাশি কার্যকরী প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। তাই শাসন বিভাগের ক্ষমতা অপ্রতিহতভাবে বৃদ্ধি পেতে পারছে না। বস্তুতঃ, অনেক দেশেই কিছু কিছু আইনসভার ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হলেও সর্বক্ষেত্রেই তা হয়নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস এখনও তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব শুধু বজায় রাখেনি, উত্তরোত্তর তা সম্প্রসারিত করে চলেছে। অধ্যাপক হোয়ারের মতে, কংগ্রেস পূর্বের মতই নিজেকে

আইনসভার বর্তমান অবস্থা

শক্তিশালী রাখতে সমর্থ হয়েছে। অ্যালান বল (Allan Ball) এই অভিমত পোষণ করেন যে, আইনসভা কখনই শাসন করেনি। তাই আইনসভার সুনির্দিষ্ট কার্যাবলীর ভিত্তিতেই কেবলমাত্র তার ক্ষমতা হ্রাসের বিষয়টি আলোচিত হতে পারে। তাঁর মতে, আইনসভার প্রতিনিধিত্বমূলক এবং সংযোগ সাধনের বাহন হিসেবে আইনসভার কাজের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করা বাঞ্ছনীয়। তবে একথা সত্য যে, উদার-নৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইনসভা তার পূর্ব-মর্যাদার অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছে। বর্তমান আইনসভাকে আলাপ-আলোচনা এবং তর্কবিতর্কের প্রধান কেন্দ্রস্থল হিসেবে গণ্য করাই সমীচীন বলে অনেকে মনে করেন।

৬। শাসন বিভাগ (The Executive) : শাসন বিভাগের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ (Definition and classification of the Executive)

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে আইন বিভাগের পরিবর্তে শাসন বিভাগের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্যাপক অর্থে শাসন বিভাগ বলতে রাষ্ট্রের প্রধান পরিচালক (Chief Executive) থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কার্যে নিযুক্ত সাধারণ কর্মচারী পর্যন্ত সকলকেই বোঝায়। শাসন বিভাগের গঠন ও কার্যাবলীর ভিত্তিতে শাসন বিভাগকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা—ক. শাসন বিভাগের রাজনৈতিক অংশ (political executive) এবং খ. অ-রাজনৈতিক অংশ (non-political executive)। শাসন বিভাগের রাজনৈতিক অংশকে আবার সাধারণভাবে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—সরকারের শীর্ষ পদাধিকারী এবং সহযোগী রাজনৈতিক পদাধিকারী। বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় শীর্ষ পদাধিকারী প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রপতি, চ্যান্সেলার, রাজা ও রানী ইত্যাদি নামে পরিচিত। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ উত্তরাধিকারসূত্রে, কেউ বা মনোনয়নের মাধ্যমে, আবার কেউ বা নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা লাভ করতে পারেন। সাধারণভাবে বলা যায় শাসনবিভাগের রাজনৈতিক অংশ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হন এবং সম্পাদিত কার্যাবলীর জন্য জনসাধারণের নিকট দায়িত্বশীল থাকেন। প্রশাসনিক কার্যে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত কর্মচারীরা শাসন বিভাগের অরাজনৈতিক অংশের অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এরা রাষ্ট্রকৃত্যক বা রাষ্ট্রভৃত্যক (Civil Servants) নামে পরিচিত। অনেক সময় এদের আমলা (bureaucrat) বলেও অভিহিত করা হয়। যাঁরা সংকীর্ণ অর্থে শাসন বিভাগ কথাটি প্রয়োগের পক্ষপাতী তাঁদের মতে, সরকারী কর্মচারীগণ শাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেবলমাত্র রাষ্ট্রের প্রধান শাসক এবং প্রশাসনিক বিষয়ে নীতিনির্ধারণকারী প্রধান কর্মসচিবদের নিয়ে শাসন বিভাগ গঠিত।

শাসনবিভাগের রাজনৈতিক অংশকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—একক পরিচালক (Single Executive) ও বহু-পরিচালক (Plural Executive), নামসর্বস্ব শাসক (Titular Executive) ও প্রকৃত শাসক (Real Executive) এবং উত্তরাধিকারসূত্রে মনোনীত (Hereditary) ও নির্বাচিত (Elected) শাসক।

[১] **একক-পরিচালক ও বহুপরিচালক** (**Single Executive and Plural Executive**) : শাসন বিভাগ একক-পরিচালকদের দ্বারা কিংবা বহু-পরিচালকের

দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। শাসন বিভাগীয় যাবতীয় কার্য যখন একজন মাত্র পরিচালকের নির্দেশে এবং নেতৃত্বে পরিচালিত হয় তখন তাঁকে একক-পরিচালক বলে অভিহিত করা হয়। চরম রাজতন্ত্র (Absolute Monarchy) একক-পরিচালকের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। হিটলার ও মুসোলিনী-পরিচালিত একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা একক-পরিচালকের শাসনব্যবস্থা। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহেও একক-পরিচালকের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি হলেন একক-পরিচালক। মন্ত্রিসভা তাঁরই অধীনস্থ কর্মচারী মাত্র। রাষ্ট্রপতি নিজ কার্যাবলীর জন্য কংগ্রেসের নিকট দায়িত্বশীল থাকেন না এবং কংগ্রেস তাঁকে সাধারণতঃ পদচ্যুতও করতে পারে না। ইংল্যান্ড ও ভারতবর্ষের মত মন্ত্রিপরিষদ পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ (Cabinet) হোল প্রকৃত শাসক। আপাতঃদৃষ্টিতে এরূপ শাসনব্যবস্থাকে বহু-পরিচালক ব্যবস্থা বলে মনে হলেও কার্যতঃ তা একক-পরিচালকের শাসন। কারণ সম্পাদিত কার্যাবলীর জন্য মন্ত্রিপরিষদ যৌথভাবে দায়িত্বশীল থাকেন। এই যৌথ দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করেছে। তাছাড়া, প্রধানমন্ত্রীর (Prime Minister) নেতৃত্বে ও নির্দেশে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত ও পরিচালিত হয়। তাই মন্ত্রিপরিষদ-পরিচালিত শাসন ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীই কার্যক্ষেত্রে একক-পরিচালক হিসেবে কার্য সম্পাদন করেন। তিনিই হলেন দেশের প্রকৃত শাসন-ক্ষমতার অধিকারী।

একক-পরিচালকের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

গুণাগুণ (Merits and Demerits): একক-পরিচালক-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থার সপক্ষে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির অবতারণা করা হয়:

একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, সরকারের সাফল্যের জন্য ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন। একক-পরিচালক-পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় একজন মাত্র ব্যক্তির হস্তে শাসন বিভাগীয় যাবতীয় ক্ষমতা অর্পিত থাকে বলে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব। যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ গোলযোগ প্রভৃতি জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত-গ্রহণের প্রয়োজন। একক-পরিচালকের শাসনে এরূপ সিদ্ধান্ত সহজেই গৃহীত হতে পারে।

গুণ

একক-পরিচালকের শাসনব্যবস্থায় স্বেরাচারিতার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। শাসন বিভাগের সমস্ত ক্ষমতা একজন মাত্র ব্যক্তির হস্তে থাকায় তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করে স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারেন। এক্ষেত্রে তাঁকে বাধা দেওয়ার কোন উপায় থাকে না।

দোষ

একজন মাত্র ব্যক্তির পরিবর্তে শাসন বিভাগীয় প্রকৃত ক্ষমতা যদি সম-ক্ষমতাসম্পন্ন বহুজন ব্যক্তির হস্তে অর্পিত থাকে তবে তাদের বহু-পরিচালক (Plural Executive) বা সমষ্টিগত শাসক (Collective Executive) বলা হয়। প্রাচীনকালে এথেন্স, স্পার্টা ও প্রজাতান্ত্রিক রোমে বহু-পরিচালকের শাসন প্রবর্তিত ছিল। আধুনিককালে সুইজারল্যান্ড ও সোভিয়েত ইউনিয়নে এরূপ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত রয়েছে। সুইজারল্যান্ডে সাতজন সমক্ষমতাসম্পন্ন কাউন্সিলার নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ (Federal Council) গঠিত। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সব সদস্যই সমান ক্ষমতার অধিকারী। কোন বিষয়ে

বহু পরিচালকের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সিদ্ধান্তের পক্ষে ও বিপক্ষে সমান ভোট প্রদত্ত হলে সভাপতি একটি 'নির্ণায়ক ভোট' (Casting vote) প্রদান করতে পারেন। সোভিয়েত ইউনিয়নেও বহু-পরিচালকের শাসন প্রবর্তিত রয়েছে। এখানে শাসন বিভাগীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হোল সমক্ষমতাসম্পন্ন ৩৭ জন সদস্য নিয়ে গঠিত প্রেসিডিয়াম সভা (Presidium)। প্রেসিডিয়ামের সভাপতি অন্যান্য সদস্যদের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা ও পদমর্যাদার অধিকারী নন।

গুণ

বহু-পরিচালিত শাসনব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা বড় গুণ হোল দেশের সর্বোচ্চ শাসন-ক্ষমতা একজনের হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে না বলে স্বৈরাচারিতার সম্ভাবনা থাকে না। দ্বিতীয়তঃ শাসন-পরিচালকের সংখ্যা একাধিক হওয়ায় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব। কারণ একজনের ভুল সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে অন্যান্যরা তা শুধরে দিতে পারেন।

দোষ

কিন্তু এরূপ শাসনে জরুরী অবস্থার সময় দ্রুত ও কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর মতপার্থক্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় অচলাবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। ফলে শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে না।

উপসংহার

সাম্প্রতিককালে বহু পরিচালক পরিচালিত শাসন-কর্তৃপক্ষ অপেক্ষা একক-পরিচালক শাসনব্যবস্থাকেই অধিক কাম্য বলে মনে করা হয়। অনেকের মতে—একজন ব্যক্তির উপর শাসনভার অর্পণ করে একটি নির্দিষ্ট-সময়ের জন্য তাঁকে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। সেইসঙ্গে তিনি যাতে স্বৈরাচারী হয়ে জনস্বার্থ-বিরোধী কাজ করতে না পারেন সেজন্য প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

অবশ্য অনেকে আবার এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, একাধিক পরিচালক-পরিচালিত শাসনব্যবস্থা অনেক বেশী গণতান্ত্রিক। ব্যক্তি-বিশেষের হাতে অধিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হলে তা জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী হওয়াই স্বাভাবিক।

[২] **নামসর্বস্ব শাসক ও প্রকৃত শাসক** (Titular Executive and Real Executive): কোন কোন রাষ্ট্রে শাসন বিভাগীয় প্রধান তত্ত্বগতভাবে শাসন-বিভাগের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হলেও বাস্তবে তিনি শাসন কার্য পরিচালনা করেন না। তাঁর নামে শাসনকার্য অন্যের দ্বারা পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে তত্ত্বগতভাবে যিনি শাসন বিভাগীয় প্রধান তাঁকে নামসর্বস্ব শাসক এবং বাস্তবে যাঁরা শাসনকার্য পরিচালনা করেন তাঁদের প্রকৃত শাসক বলে অভিহিত করা হয়। গ্রেট ব্রিটেনের রাজা বা রানী এবং ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি (President) নামসর্বস্ব শাসকের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এঁদের নামে যাবতীয় শাসনকার্য সম্পাদিত হলেও কার্যক্ষেত্রে এঁরা 'রাজত্ব করেন কিন্তু দেশশাসন করেন না' (rigns but does not govern). কারণ, উভয় দেশেই শাসনকার্যাদি প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদের দ্বারাই পরিচালিত হয়। তাই প্রধানমন্ত্রীকেই প্রকৃত শাসক বলে চিহ্নিত করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাজা বা রানী এবং রাষ্ট্রপতি কোন কার্যই সম্পাদন করতে পারেন না।

নামসর্বস্ব শাসক ও প্রকৃত শাসক

[৩] **উত্তরাধিকারসূত্রে মনোনীত ও নির্বাচিত শাসক** (Hereditary and Elected Executive) **:** অনেক সময় প্রধান শাসক উত্তরাধিকারসূত্রে মনোনীত হন। এক্ষেত্রে তাঁকে উত্তরাধিকারসূত্রে মনোনীত শাসক বলে অভিহিত করা হয়। ব্রিটেনের রাজা বা রানী এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তবে গণতান্ত্রিক আদর্শের ধ্যানধারণা পরিব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাধিকারসূত্রে মনোনীত শাসকের প্রতি মানুষের অনাসক্তি প্রকট আকার ধারণ করছে। ইংল্যান্ডের রাজা বা রানী শাসন বিভাগীয় প্রধান হলেও কার্যক্ষেত্রে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত মন্ত্রিসভাই শাসন বিভাগের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে।

উত্তরাধিকারসূত্রে মনোনীত শাসক

সাধারণতঃ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের শাসন বিভাগের রাজনৈতিক অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হয়। ভারতবর্ষ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিগণ নির্বাচক সংস্থার (Electoral College) দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। সুইজারল্যান্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদকেও আইনসভা নির্বাচিত করে। ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের মন্ত্রিপরিষদকে আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হতে হয়।

নির্বাচিত শাসক

৭। শাসন বিভাগের কার্যাবলী (Functious of the Executive)

উনবিংশ শতাব্দীতে মনে করা হোত যে, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশরক্ষা এবং আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখাই হোল শাসন বিভাগের কাজ। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রভাব ক্ষীয়মাণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্রের পরিধি অস্বাভাবিকভাবেই সম্প্রসারিত হয়েছে। রাষ্ট্রের কার্যাবলী বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই শাসন বিভাগের কর্মপরিধি বিস্তৃতিলাভ করেছে। আধুনিক রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ যে-সব কার্য সম্পাদন করে সেগুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হোল : .

(ক) আইন বিভাগ যে-সব আইন প্রণয়ন করে শাসন বিভাগ সেইসব আইন কার্যকরী করে। আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদানের জন্য বিচারালয়ের সম্মুখে উপস্থিত করা, বিচারালয়ের রায় অনুসারে অপরাধীকে শাস্তি দানের ব্যবস্থা করা প্রভৃতির মাধ্যমে শাসন বিভাগ দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করে। তাছাড়া, অধস্তন সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি এবং পদচ্যুতি বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ, জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য অর্ডিন্যান্স জারি প্রভৃতি শাসন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শাসন বিভাগের পক্ষে স্বরাষ্ট্র দপ্তর (Home department) এইসব কাজ করে।

আভ্যন্তরীণ শাসন-কার্য পরিচালনা

(খ) বর্তমানে কোন রাষ্ট্রই নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে দাবি করতে পারে না। তাই রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন। শাসন বিভাগের প্রধানই বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। নিজ রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধিকে অন্য রাষ্ট্রে প্রেরণ, অন্য রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধি গ্রহণ, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন, কোন্ রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা হবে কিংবা

পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কার্যাবলী

কোন্ রাষ্ট্রের সঙ্গে এরূপ সম্পর্ক ছিন্ন করা প্রয়োজন প্রভৃতি নির্ধারণ করা শাসন বিভাগের পররাষ্ট্র সম্পর্কিত কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এই সব কাজের দায়িত্ব পররাষ্ট্র দপ্তরের (Department of External Affairs) উপর অর্পিত হয়।

(গ) দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষার গুরুদায়িত্ব শাসন বিভাগের উপর ন্যস্ত থাকে। সাধারণভাবে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে রাষ্ট্রপ্রধান সৈন্য-বাহিনীর গঠন, পরিচালনা, যুদ্ধ পরিচালনা বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ এবং দেশরক্ষার প্রয়োজনে অসামরিক শক্তিকে কাজে লাগানো প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করেন। রাষ্ট্রপ্রধান প্রয়োজনবোধে সামরিক আইনও জারি করতে পারেন। যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব প্রতিরক্ষা দপ্তরের (Defence Department) উপর ন্যস্ত থাকে।

সামরিক কার্যাবলী

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ-পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগীয় প্রধান আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন, স্থগিত রাখতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় মনে করলে আইনসভা ভেঙ্গে দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন। রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মতি ছাড়া আইনসভা আইন প্রণয়নই করতে পারে না। ভারতের রাষ্ট্রপতি ও ব্রিটেনের রাজা এবং রানী পার্লামেন্টের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে আইন বিভাগের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেন। আবার পার্লামেন্টের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালে তাঁরা জরুরী আইন বা অর্ডিন্যান্স (Ordinance) জারি করতে পারেন। তবে পার্লামেন্টের অধিবেশন শুরু হলে এরূপ আইনকে আইনসভার অনুমোদন লাভ করতে হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বর্তমান থাকার ফলে রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষভাবে আইন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না, তবে পরোক্ষভাবে তিনি আইন বিভাগের কার্যাবলীকে যথেষ্টভাবে প্রভাবিত করতে পারেন। বর্তমান দিনে আইনসভার কার্যাবলী বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আইনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়গুলি নির্ধারণের দায়িত্ব আইনসভা শাসন বিভাগের হস্তে অর্পণ করে। শাসন বিভাগ-প্রণীত এরূপ আইনকে 'অর্পিত ক্ষমতা-প্রসূত আইন' (Delegated Legislation) বলে অভিহিত করা হয়। প্রতিটি উদারনৈতিক গণতন্ত্রে অর্পিত ক্ষমতা-প্রসূত আইনের মাধ্যমে শাসন বিভাগ আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছে।

আইন সংক্রান্ত কার্যাবলী

(ঙ) অধিকাংশ উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগীয় প্রধান বিচারপতিদের নিয়োগ করেন। বিচারালয় কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা প্রদর্শন, শাস্তির পরিমাণ হ্রাস প্রভৃতি বিচার সংক্রান্ত কার্যাবলী রাষ্ট্রপ্রধান সম্পাদন করেন। তাছাড়া, শাসন বিভাগের কোন কর্মচারীর অন্যায় আচরণ কিংবা নীতির বিচার ও শাস্তিদান, কোন সরকারী কর্মচারীকে অন্যায়ভাবে পদচ্যুত করা হয়েছে কিনা তার বিচার ইত্যাদি শাসন বিভাগ করে থাকে। এরূপ বিচারকে শাসন বিভাগীয় বিচার (Administrative Justice) বলা হয়। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে এরূপ শাসন বিভাগীয় বিচারব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে।

বিচার সংক্রান্ত কার্যাবলী

(চ) আধুনিক জনকল্যাণকামী ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনস্বাস্থ্য, জনশিক্ষা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি; অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন প্রভৃতি জনকল্যাণকর কার্যাদি শাসন বিভাগই সম্পাদন করে।

জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী

(ছ) সরকারের যাবতীয় কার্য সম্পাদনের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ-সংগ্রহের দায়িত্ব প্রধানতঃ শাসন বিভাগের। অবশ্য আইনসভার অনুমোদন না পেলে শাসন বিভাগ অর্থব্যয় করতে পারে না। কর সংগ্রহ ও ব্যয়বরাদ্দ করা ছাড়াও শাসন বিভাগকে সরকারী কোষাগারের হিসাব পরীক্ষা করতে হয়। অর্থদপ্তর (Finance Department)-এর হাতে এই ক্ষমতা অর্পিত থাকে।

অর্থসংক্রান্ত কার্যাবলী

বর্তমান রাষ্ট্রের কার্যাবলী উত্তরোত্তর বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শাসন বিভাগও অত্যধিক ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে। সংসদীয় আইনব্যবস্থায় আইন বিভাগের প্রাধান্যের পরিবর্তে শাসন বিভাগের অপ্রতিহত ক্ষমতা বৃদ্ধি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এমন কি রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থাতেও দলীয় শাসনের মাধ্যমে শাসন বিভাগ আইন বিভাগকে বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়েছে।

উপসংহার

৮। অ-রাজনৈতিক প্রশাসন বা আমলাতন্ত্র (Non-Political Administration or Bureaucracy)

আমলাতন্ত্রের অর্থ (Meaning of Bureaucracy): রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কার্যে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত কর্মচারীরা হোল শাসনবিভাগের অ রাজনৈতিক অংশ। তাঁরা রাষ্ট্রকৃত্যক বা রাষ্ট্রভৃত্যক (Civil Servant) নামে পরিচিত। সাধারণভাবে এদের 'আমলা' বলে অভিহিত করা হয়। এদের পরিচালিত প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে 'আমলাতন্ত্র' (Bureaucracy) বলা হয়। আমলাতন্ত্র বা ব্যুরোক্রেসী শব্দটি ফরাসী শব্দ 'ব্যুরো' (Bureau) এবং গ্রীক শব্দ 'ক্রেটিন' (Kratein) থেকে উদ্ভূত হয়েছে। 'ব্যুরো' শব্দের অর্থ 'লেখার টেবিল' এবং 'ক্রেটিন' শব্দের অর্থ 'শাসন'। অর্থাৎ শব্দগত অর্থে ব্যুরোক্রেসী বলতে 'টেবিল-শাসনব্যবস্থা' বোঝায়। কিন্তু আমলাতন্ত্রের সুনির্দিষ্ট এবং সর্বজনগ্রাহ্য কোন সংজ্ঞা নিরূপণ করা অদ্যাবধি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই অনেকে নিন্দাসূচক অর্থে 'আমলাতন্ত্র' কথাটি প্রয়োগ করেন। আবার কেউ কেউ 'মূল্যমান-নিরপেক্ষ' অর্থে 'আমলাতন্ত্র' কথাটি ব্যবহার করার পক্ষপাতী। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা' (Encyclopaedia Britannica)-তে আমলাতন্ত্র বলতে বিভিন্ন দপ্তরের হস্তে শাসনবিভাগীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এবং বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের স্থায়ী কর্মচারিগণের অনাবশ্যক হস্তক্ষেপকে বোঝান হয়েছে। অ্যালমন্ড ও পাওয়েল-এর মতে আমলাতন্ত্র বলতে এমন একটি ব্যাপক সংগঠনকে (elaborate organization) বোঝায় যার মাধ্যমে শাসকবর্গ (rulers) বা বিধি-প্রণেতারা (rule-makers) নিজেদের সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার চেষ্টা করেন। মোটামুটিভাবে

আমলাতন্ত্র বলতে কি বোঝায়

আমলাতন্ত্র বলতে আমরা অভিজ্ঞ, নিরপেক্ষ এবং স্থায়ী সরকারী কর্মচারীবৃন্দ কর্তৃক পরিচালিত প্রশাসনিক ব্যবস্থাকেই বুঝি। আমলাতন্ত্রের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে অধ্যাপক গার্নার (Garner) মন্তব্য করেছেন, আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকারের কার্যাবলী মূলতঃ স্থায়ী সরকারী কর্মচারিগণ কর্তৃক সম্পাদিত হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারী নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

৯। আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Features of Bureaucracy)

উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়, যথা :

(ক) স্থায়িত্ব হোল আমলাতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। একটি নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা পর্যন্ত আমলা বা সরকারী কর্মচারিগণ স্ব-পদে অধিষ্ঠিত থেকে প্রশাসনিক কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারে। সাধারণতঃ দুর্নীতিপরায়ণতা, অযোগ্যতা কিংবা চাকরির শর্তাবলী ভঙ্গের প্রমাণিত অভিযোগ ছাড়া তাদের পদচ্যুত করা যায় না।

স্থায়িত্ব

(খ) আধুনিক গণতন্ত্র দলীয় শাসন বলে ঘন ঘন সরকারের পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। সরকারের এরূপ উত্থান-পতনের মধ্যে প্রশাসনিক কার্যে নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষার দায়িত্ব আমলাদের।

প্রশাসনিক কার্যে নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষা

(গ) আমলাতন্ত্রের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হোল নিরপেক্ষভাবে প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন করা। বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করতে পারে কিন্তু রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে সরকারী নীতিসমূহকে বাস্তবে রূপায়িত করা আমলাদের কর্তব্য। তবে মার্কসবাদীদের মতে, আমলারা কখনই রাজনীতি-নিরপেক্ষ বা অঙ্গীকারহীন (Uncommitted) হয় না। আমলাতন্ত্র শাসকশ্রেণীর একটি অংশ হিসেবে সামগ্রিক ভাবে তার কাছেই অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে। বুর্জোয়া রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আমলারা কায়েমী স্বার্থের রক্ষাকর্তা হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ শোষণভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় তারা শোষকশ্রেণীর শাসন ও শোষণ ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। নিরপেক্ষতা তাদের একটা মুখোশ মাত্র। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমগ্র প্রশাসনব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ।

নিরপেক্ষতা

(ঘ) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমলাদের অজ্ঞাতনামা থেকে প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন করতে হয়। লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে রাজনৈতিক প্রশাসকদের নামে তাদের কার্য সম্পাদন করতে হয়। তাই প্রশাসনিক কার্যের সুনাম বা দুর্নামের অংশীদার তাদের হতে হয় না।

অজ্ঞাতনামা থাকা

(ঙ) অজ্ঞাতনামা থেকে কার্য সম্পাদন করতে হয় বলে সম্পাদিত কার্যাবলীর জন্য আমলাদের জনগণ কিংবা আইনসভার নিকট জবাবদিহি করতে হয় না। সম্পাদিত কার্যাবলীর জন্য তারা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর নিকট দায়িত্বশীল থাকে। উল্লেখযোগ্য যে, সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় আমলাদের কার্যাবলীর জন্য মন্ত্রিগণকে আইনসভার নিকট জবাবদিহি করতে হয়।

দায়িত্বশীলতা

(চ) সুকঠোর নিয়মানুবর্তিতা আমলাতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। নিয়মানুবর্তিতা না থাকলে বিপুল পরিমাণ প্রশাসনিক কার্যাবলী সম্পাদন করা কিংবা বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সম্পাদিত কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন করা সম্ভব নয়। তাই আমলাদের কঠোর নিয়মশৃংখলা মেনে চলতে হয়।

নিয়মানুবর্তিতা

(ছ) সাধারণতঃ বিশেষ যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে আমলাদের নিয়োগ করা হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে অবশ্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার পরিবর্তে শিক্ষাগত যোগ্যতা, বিশেষ শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পদ-প্রার্থীদের যোগাযোগের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সাধারণ ক্ষেত্রে বিশেষ সংস্থার অনুমোদন এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মতি ছাড়া সরকারী কর্মচারীরা নিযুক্ত হতে পারে না। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমলাদের কার্যকালের মেয়াদ, বেতন, ভাতা, বদলী, পদোন্নতি প্রভৃতি নির্দিষ্ট চুক্তির মাধ্যমে স্থিরীকৃত হয়। সাধারণতঃ দুর্নীতিমূলক আচরণ, অক্ষমতা, চাকরির শর্তাবলী ভঙ্গের অপরাধ ছাড়া তাদের পদচ্যুত করা হয় না।

নিয়োগ, কার্যকাল ইত্যাদি

(জ) জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রসমূহের উদ্দেশ্য হোল সর্বাধিক পরিমাণে জনকল্যাণ সাধন করা। সরকারের বিপুল পরিমাণ জনকল্যাণকর কার্যাদি সম্পাদনের দায়িত্ব আমলাদের হস্তে অর্পিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই জনকল্যাণ সাধনকেই প্রধান কাজ হিসেবে তারা গ্রহণ করে। ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber)-এর মতে, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার করা আমলাদের প্রকৃতি-বিরোধী।

জনকল্যাণ সাধন

(ঝ) আমলাদের নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে থেকে সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয়। কোন্ শ্রেণীর আমলা কোন্ কোন্ কাজ সম্পাদন করবে তা সুনির্দিষ্টভাবে পূর্বাহ্নেই স্থিরীকৃত থাকে।

নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন

১০। আমলাতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Bureaucracies)

মার্লি ফেনসড (M. Fainsod) আমলাতন্ত্রকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা—ক. প্রতিনিধিত্বমূলক আমলাতন্ত্র (Representative Bureaucracy), খ. একদলীয় রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্র (Party-State Bureaucracy), গ. সামরিক-শাসিত আমলাতন্ত্র (Military-dominated Bureaucracy), ঘ. এক-ব্যক্তি-শাসিত আমলাতন্ত্র (Ruler-dominated Bureaucracy) এবং ঙ. আমলা-শাসিত আমলাতন্ত্র (Ruling Bureaucracy)।

আমলাতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ

প্রতিনিধিত্বমূলক আমলাতন্ত্র দলীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু বহু-দলীয় ব্যবস্থায় কোন একটি দল স্থায়ী সরকার গঠন করতে ব্যর্থ হলে আমলাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। চতুর্থ প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্স ও বর্তমান ইতালিতে এই ধরনের আমলাতন্ত্রের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

প্রতিনিধিত্বমূলক আমলাতন্ত্র

এক-দলীয় রাষ্ট্রে আমলাদের দলীয় কর্মীদের নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে কাজ করতে হয়। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ফ্যাসিবাদী ইতালীর মত সর্বাত্মক দলীয় ব্যবস্থার আমলাতন্ত্র এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তবে প্রভুত্বকারী দলীয় ব্যবস্থার আমলাতন্ত্রকেও অনেকে অনুরূপ প্রকৃতি-বিশিষ্ট বলে মনে করেন।

একদলীয় রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্র

সামরিক-শাসিত আমলাতন্ত্রে সামরিক বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ অসামরিক সরকারী কর্মচারীদের উপর নিজের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করে। চিলি, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি সামরিক বাহিনী-শাসিত রাষ্ট্রে এরূপ আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সামরিক-শাসিত আমলাতন্ত্র

এক-ব্যক্তি শাসিত আমলাতন্ত্রে শাসক নিজেই আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে নিজের ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে আমলারা প্রধান শাসকের নির্দেশ কার্যকরী করার হাতিয়ার মাত্র।

এক-ব্যক্তি-শাসিত আমলাতন্ত্র

আমলা-শাসিত আমলাতন্ত্রের আমলারাই হোল প্রশাসনের মূল স্তম্ভ। ফেনসডের মতে প্রধানতঃ ঔপনিবেশিক শাসনে এরূপ আমলাতন্ত্রের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের আমলারা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তবে সদ্য-স্বাধীনতা প্রাপ্ত রাষ্ট্রেও রাজনৈতিক প্রশাসকদের অনভিজ্ঞতার সুযোগে আমলারা প্রশাসনিক ব্যাপারে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়।

আমলা-শাসিত আমলাতন্ত্র

১১। আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব (Importance of Bureaucracy)

আমলাতন্ত্র আধুনিক শাসন ব্যবস্থায় অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। সরকারের সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা—ক. শাসন বিভাগের রাজনৈতিক অংশ, যেমন রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিমন্ডলী ইত্যাদি এবং খ. শাসন বিভাগের অ-রাজনৈতিক অংশ, যেমন স্থায়ী সরকারী কর্মচারীবৃন্দ বা আমলাগণ। রাজনৈতিক প্রশাসকগণ সরকারী নীতিসমূহ নির্ধারণ করেন এবং অ-রাজনৈতিক প্রশাসকগণ গৃহীত নীতি-সমূহকে বাস্তবে প্রয়োগ করেন। সাম্প্রতিককালে নানা কারণে রাজনৈতিক ও অ-রাজনৈতিক প্রশাসকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের সীমারেখা বিলুপ্ত হওয়ার পথে। বর্তমানে আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব নানা কারণে অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি

(১) ঊনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্র ছিল পুলিসী রাষ্ট্র (Police State)। তখন রাষ্ট্রের কার্যাবলী সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তখন মনে করা হোত যে, বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে দেশরক্ষা করা এবং আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা বজায় রাখাই হোল রাষ্ট্রের প্রধানতম কাজ। কিন্তু বর্তমানে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ধ্যানধারণা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের কার্যাবলী বিপুল পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যক্তির অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নতির জন্য রাষ্ট্রকে নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল কার্য

রাষ্ট্রের কার্যাবলী বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমলাতন্ত্রের গুরুত্ববৃদ্ধি

সম্পাদন করতে হয়। এইসব ভিন্নমুখী কার্য যথাযথভাবে সম্পাদন করা মুষ্টিমেয় রাজনৈতিক প্রশাসকদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই তাদের নির্ভর করতে হয় বহু-সংখ্যক স্থায়ী এবং অনুগত সরকারী কর্মচারীদের উপর।

রাজনৈতিক প্রশাসকদের জ্ঞানের অভাব

(২) তাছাড়া, আইন প্রণয়ন কিংবা সরকারী নীতি নির্ধারণের জন্য যে পরিমাণ কলাকৌশলগত জ্ঞান (Technical Expertise) এবং নৈপুণ্যের প্রয়োজন তা আইন-সভার অধিকাংশ সদস্যের কিংবা সব মন্ত্রীর থাকে না। তাই তাঁরা সরকারের সাধারণ নীতি কিংবা আইনের মৌল নীতিসমূহ নির্ধারণ করে সেগুলিকে পরিপূর্ণতা দানের দায়িত্ব স্থায়ী, অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ এবং দূরদর্শী আমলাদের উপর অর্পণ করেন। ফলে সব রাষ্ট্রে বিশেষতঃ উন্নতিকামী রাষ্ট্রসমূহে, আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

অভিজ্ঞ রাজনৈতিক প্রশাসকবৃন্দের অভাব

(৩) রাজনৈতিক প্রশাসকদের কার্যকাল রাজনৈতিক জয়পরাজয়ের উপর নির্ভরশীল বলে অধিকাংশক্ষেত্রেই জনসাধারণকে সন্তুষ্ট রাখার কাজে তাঁরা ব্যস্ত থাকেন। প্রশাসনিক কার্যে মনোনিবেশ করার মত সময় তাঁদের থাকে না। তাছাড়া, রাজনৈতিক উত্থানপতনের উপর রাজনৈতিক প্রশাসকদের কার্যকালের মেয়াদ নির্ভরশীল বলে সুদীর্ঘকাল ধরে প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই আমলাদের উপর নির্ভর করা ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর থাকে না।

রাজনৈতিক প্রশাসকগণ শাসনকার্যে নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষায় অক্ষম

(৪) সুশাসনের জন্য প্রয়োজন শাসনকার্যে নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখা। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তিত হয়। আজ যে সরকার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, আগামীকাল সেই সরকার ক্ষমতায় নাও থাকতে পারে। তাই রাজনৈতিক প্রশাসকদের পক্ষে শাসনকার্যে নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। স্বাভাবিক ভাবেই এই গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব অ-রাজনৈতিক প্রশাসক বা আমলাদের হস্তে ন্যস্ত হয়।

সরকারী আইন নীতি প্রভৃতির রূপায়ণে আমলাদের ভূমিকা

(৫) সর্বোপরি, আইনসভা-প্রণীত শাসন, শাসন বিভাগ কর্তৃক রচিত নীতি এবং বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়িত না হলে সেগুলি মূল্যহীন হয়ে যায়। তার ফলে সরকারের মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহ অকার্যকর থেকে যায়। অথচ একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, সরকারী আইন, নীতি প্রভৃতির বাস্তব রূপায়ণ নির্ভর করে সরকারী কর্মচারীদের আন্তরিকতা, কর্মদক্ষতা এবং সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার উপর। তাই বর্তমানে আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব এবং প্রাধান্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক ফাইনার (Finer) বলেছেন, স্থায়ী সরকারী কর্মচারীগণের সাহায্য ছাড়া আধুনিক সরকারের অস্তিত্ব রক্ষা করা অসম্ভব।

১২। আমলাতন্ত্রের কার্যাবলী (Functions of Bureaucracy)

আধুনিককালে আমলাতন্ত্রকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়।

আমলাতন্ত্রের কার্যাবলী নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে ঃ

সরকারী নীতি ও আইন বলবৎকরণ সংক্রান্ত কার্য

(ক) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নীতি ও আইন এবং বিচার বিভাগীয় সিম্ধান্তসমূহকে বাস্তবে কার্যকরী করা হোল স্থায়ী সরকারী কর্মচারী বা আমলাদের প্রধান কার্য। সরকারী নীতি, আইনকানুন ইত্যাদি কতদূর পর্যন্ত কার্যকরী করা হবে তা নির্ভর করে আমলাতন্ত্রের দক্ষতা, দৃঢ়তা ও ঐকান্তিক ইচ্ছার উপর। এর অভাব ঘটলে সরকারের উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

শাসনকার্যে নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষা সংক্রান্ত কার্য

(খ) সুশাসনের জন্য প্রয়োজন শাসনকার্যে নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষা করা। কিন্তু আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের রাজনৈতিক প্রশাসকগণ কখনই নিরবচ্ছিন্নভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারেন না। রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ফলে নিত্যনতুন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। সরকারের এই পরিবর্তনশীলতা বা স্থায়িত্বের অভাব শাসনকার্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। তাই শাসনকার্যে নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখার জন্য স্থায়ী সরকারী কর্মচারীদের একান্ত প্রয়োজন। রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে আমলারা নিরবচ্ছিন্নভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে দেশের অগ্রগতি অব্যাহত রাখে।

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্য

(গ) আইন প্রণয়ন করা হোল আইন বিভাগের কাজ। সরকারী কর্মচারিগণ প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়ন করতে পারে না সত্য, কিন্তু বাস্তবে তারা আইন প্রণয়ন কিংবা নীতি নির্ধারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রের কার্যাবলী বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সরকারকে বহুবিধ জটিল বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে হয়। কিন্তু আইন প্রণয়নের জন্য যে দূরদর্শিতা, দক্ষতা ও প্রশাসনিক কলাকৌশলগত জ্ঞানের প্রয়োজন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক প্রশাসকদের তা থাকে না। তাই তাঁদের নির্ভর করতে হয় আমলাদের উপর। তাছাড়া, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইন বিভাগ আইনের মূল-নীতিসমূহ নির্ধারণ করে সেগুলির পরিপূর্ণতা দানের দায়িত্ব শাসন বিভাগের হস্তে অর্পণ করে। এইভাবে আইন প্রণয়ন ব্যাপারে শাসন বিভাগের ভূমিকা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কার্যক্ষেত্রে এই ক্ষমতা আমলারাই ব্যবহার করে। সরকারী প্রশাসন বিভাগ আইনকে বাস্তবে কার্যকরী করার সময় নির্দেশ, আদেশ বা নিয়মকানুন তৈরি করে আইনের ফাঁক পূরণ করে। এইভাবে আমলারা আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করে। এইসব আইনকে 'অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন' (Delegated Legislation) বা 'প্রশাসনিক দপ্তরপ্রণীত আইন' (Departmental Legislation) বলে অভিহিত করা হয়।

রাজনৈতিক প্রশাসকদের পরামর্শদান সংক্রান্ত কার্য

(ঘ) নীতি নির্ধারণ বা আইন প্রণয়নের সময় রাজনৈতিক প্রশাসকগণ অভিজ্ঞ এবং কলাকৌশলগত জ্ঞানসম্পন্ন আমলাদের সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করেন। তাছাড়া, আইনসভায় বিতর্কের সময় মন্ত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। এই সময় প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সরবরাহ করে আমলারা মন্ত্রীদের সাহায্য করে। অনেক সময় কোন্ প্রশ্নের কি জবাব হবে তা আমলারাই স্থির করে দেয়। এইভাবে রাজনৈতিক

প্রশাসকদের নানা বিষয়ে পরামর্শ দান করে আমলারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(ঙ) অ্যালমন্ড এবং পাওয়েল (Almond and Powell)-এর মতে, বিভাগীয় ন্যায়-বিচার (administrative justice) ও বিভাগীয় আদালতের (administrative tribunal) সম্প্রসারণের ফলে আমলাদের কিছু পরিমাণে বিচার সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করতে হয়। বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রে অনেক বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার সাধারণ আদালতে হয় না। এই সব বিচারকার্য প্রশাসনিক সংস্থাসমূহের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। যেমন ভারতবর্ষে শিল্প-সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য শিল্প-সংক্রান্ত ট্রাইব্যুনাল (Industrial Tribunal), ভাড়া সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ভাড়া-নিয়ন্ত্রক (Rent Controller) প্রভৃতি বিচার বিভাগ রয়েছে।

বিচার সংক্রান্ত কার্য

(চ) সংবাদ ও তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। সাংবাদিকগণ, বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী, রাজনৈতিক দল এবং জনসাধারণকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকারী নীতি ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহের সংবাদ ও তথ্যাদির জন্য আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভর করতে হয়। তাছাড়া সরকারের আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ আমলাতন্ত্রের তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ করে।

সংবাদ ও তথ্য সরবরাহ সংক্রান্ত কার্য

(ছ) আমলাতন্ত্রের অন্যতম প্রধান কার্য হল আভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনা করা। সরকারের আইন ও নীতিসমূহ যাতে যথাযথভাবে বাস্তবে রূপায়িত হয় সেদিকে ঊর্ধ্বতন আমলাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। তাছাড়া, বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে এবং বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারিগণ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলীর মধ্যে ঐক্য বা সমন্বয় সাধন করা আমলাতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য কার্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্মচারিগণ যেমন অধঃস্তন কর্মচারিদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে, তেমনি অধঃস্তন কর্মচারিগণ সম্পাদিত কার্যাবলী সম্পর্কে ঊর্ধ্বতন আমলাদের অবহিত রাখে। এই-ভাবে সর্বশ্রেণীর আমলাদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও আন্তরিকতার উপর সরকারী নীতি ও কার্যাবলীর সাফল্য বহু পরিমাণে নির্ভর করে। মিটিং, কনফারেন্স, আন্তঃবিভাগীয় কমিটি প্রভৃতির মাধ্যমে এই সমন্বয় কার্য সম্পাদিত হয়।

আভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনা সংক্রান্ত কার্য

(জ) প্রতিটি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রকার স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী থাকে, যেমন—শ্রমিক সংঘ, ব্যবসায়ী সংঘ, শিক্ষক সংঘ ইত্যাদি। এই সব গোষ্ঠী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চাপ সৃষ্টি করে সরকারী সিদ্ধান্তসমূহ নিজেদের অনুকূলে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। নিজেদের দাবি পূরণের জন্য এই সব গোষ্ঠী আমলাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। আমলাতন্ত্র একদিকে যেমন এই সব গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করে, অন্যদিকে তেমনি তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, দরকষাকষি প্রভৃতির মাধ্যমে সরকার ও গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটি গ্রহণ-যোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতে উভয় পক্ষকে সাহায্য করে। এইভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠী-

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী-সমূহের নিয়ন্ত্রণ ও পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের সমন্বয় সাধন

স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা এবং সমন্বয় সাধন করা আমলাতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ কার্য বলে বিবেচিত হয়।

(ঝ) রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংরক্ষণ ও স্থায়িত্বদানের ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। অ্যালান বলের মতে, উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্র্য, জাতিগত ও গোষ্ঠীগত ভিন্নতা, শিল্পায়নের অনুপস্থিতি, দলীয় সংহতির অভাব প্রভৃতি আমলাতন্ত্রের ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। বিগত কয়েক বৎসর ধরে জার্মানি ও ফ্রান্সে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা চললেও আমলাতন্ত্র উভয় দেশের রাজনৈতিক স্থায়িত্বকে বিনষ্ট হতে দেয়নি।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংরক্ষণ ও স্থায়িত্ব দান

সুতরাং বলা যেতে পারে যে, উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্রের ধারণা হোল বহুমুখী কার্য সাধনের ধারণামাত্র। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রশাসনিক কাঠামো গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত বলে সাম্যবাদী দল সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে স্থিতাবস্থা বজায় রাখে। সর্বক্ষেত্রেই সাম্যবাদী দলের সর্বব্যাপী প্রাধান্য আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তির বিস্তার সাধনের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, গণসাধারণতন্ত্রী চীন প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থা উপরি-উক্ত মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে।

উপসংহার

১৩। আমলাতন্ত্রের ত্রুটি (Defects of Bureaucracy)

উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমলারা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ আমলাতন্ত্রের কতকগুলি মারাত্মক ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন। (১) আমলারা সাধারণতঃ জনগণের স্বার্থ ও অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে উদাসীন থাকে। নিজেদের কর্তৃত্ব ও গুরুত্ব ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে তাদের প্রকৃত আগ্রহ থাকে না।

জনস্বার্থ সম্পর্কে উদাসীন

(২) আমলারা রুটিন-মাফিক কাজ করতে অভ্যস্ত। রুটিনের বাইরে কাজ করে কোন সমস্যার সমাধান করা আমলাদের প্রকৃতি-বিরোধী। এর ফলে সরকারী কাজে গতি-সঞ্চারের একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। যান্ত্রিক মনোভাব আমলাদের কাজকর্মকে নিষ্প্রাণ করে তোলে।

রুটিন-মাফিক কাজ

(৩) আমলাতন্ত্রের দীর্ঘসূত্রতা ও গড়িমসি মনোভাব প্রায় প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। 'লাল ফিতার বাঁধন' থেকে কাগজপত্রের মুক্তি পেতে দীর্ঘ সময় লাগে। যেখানে দ্রুত কাজ করা প্রয়োজন সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হওয়ার জন্য কাজ ঢিলেঢালাভাবে চলে।

দীর্ঘসূত্রতা

(৪) বিভাগীয় মনোভাব এবং সামগ্রিকভাবে সরকারের নীতি ও লক্ষ্য বিবেচনায় অক্ষমতা আমলাতন্ত্রের কাজকে দেশের মূল কর্মধারার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে। স্ট্রস (Strauss)-এর মতে, বিভাগীয় মনোভাব আমলাতন্ত্রের অন্যতম প্রধান ত্রুটি।

বিভাগীয় মনোভাব

(৫) আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা ও প্রভাববৃদ্ধিকে গণতন্ত্রের পক্ষে বিপদের কারণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়। গণতন্ত্রের অর্থ জনগণের শাসন। আমলাতন্ত্রের বিস্তার ও ক্ষমতাবৃদ্ধির ফলে গণতন্ত্র আমলাতন্ত্রে পরিণত হচ্ছে। অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এর বিরুদ্ধে সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করেছেন। অ্যালান বলের মতে, উদারনৈতিক গণতন্ত্রে সরকার ক্রমে ক্রমে মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির শাসনে রূপান্তরিত হতে পারে।

গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক

১৪। আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ (Control of Bureaucracy)

আমলাতন্ত্রের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলির জন্যই বর্তমানে প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করা হয়। তাই অ্যালান বল মন্তব্য করেছেন, প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমলাতন্ত্রকে তিনটি উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে বলে তিনি মনে করেন। এই তিনটি উপায় হোল : ক. আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ (internal control), খ. রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ (political control) এবং গ. আইনগত নিয়ন্ত্রণ (legal control)।

নিয়ন্ত্রণের তিনটি উপায়

আমলাতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ আমলাদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এবং সামাজিক অবস্থানের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা, শৃঙ্খলাবোধ, ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিন্যস্ত কাঠামো (heirarchical structure) ইত্যাদির দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। সমস্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারীদের সংখ্যা, পদোন্নতি, বেতন, ভাতা ইত্যাদি অর্থ-বিভাগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারতবর্ষ, ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি উদারনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার মত সোভিয়েত ইউনিয়ন ইত্যাদি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও অর্থবিভাগের এরূপ নিয়ন্ত্রণ সর্বজনবিদিত। সুতরাং অর্থবিভাগ ইচ্ছা করলেই আমলাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাছাড়া, আমলাদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ-পদ্ধতি ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের পক্ষপাত-দোষে দুষ্ট মনোবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। স্বীয় কর্মে অবহেলা, জনস্বার্থবিরোধী কাজ প্রভৃতির জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমেও তাদের নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ

আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার দ্বিতীয় পদ্ধতি হোল রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ। এরূপ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বলতে আইনসভা, সরকার, রাজনৈতিক দল এবং চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা বুঝায়। আমলাদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা আইন বিভাগের হস্তে ন্যস্ত থাকে। তবে আইনসভার হাতে আমলাদের নিয়োগ বা নিয়োগ-অনুমোদনের ক্ষমতা থাকলে নিয়ন্ত্রণ কার্য সহজসাধ্য হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস আমলাদের অতি সহজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষ এবং গ্রেট ব্রিটেনের আইন বিভাগ আমলাদের নিয়োগ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করতে পারলেও নিয়োগ বা নিয়োগের অনুমোদনের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। তবে আইন বিভাগ সাধারণতঃ সিলেক্ট কমিটি (Select Committee), সরকারী হিসাব রক্ষক কমিটি (Public Accounts

রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ

Committee) ইত্যাদির মাধ্যমে আমলাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে তাদের কিছুটা পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নের মত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমলাদের রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি (Central Committee) এবং 'গণ-নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাসমূহ' (Organs for People's Control)-এর মাধ্যমে আমলারা প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

আইনগত নিয়ন্ত্রণ

আইনসম্মত উপায়েও আমলাদের নিয়ন্ত্রিত করা যায়। কর্তব্য কাজে অবহেলা, দুর্নীতিপরায়ণতা ইত্যাদির বিচার সাধারণ আইনের সাহায্যে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের মাধ্যমে সম্পাদিত হোলে আমলাদের অতি সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তবে অ্যালান বল মনে করেন যে, অনেক সময় দুর্নীতি এবং নৈপুণ্যতার মধ্যে সহজে পার্থক্য নিরূপণ করা সহজ নয় বলে সাধারণ আদালতের মাধ্যমে আমলাদের কৃতকর্মের বিচার করা সমীচীন নয়। তাই বর্তমানে অনেক রাষ্ট্রে আমলাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের পর্যালোচনা করার জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান বা কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রকিউরেটর-জেনারেল (Procurator-General), ব্রিটেনে 'ওম্‌বুড্‌স্‌ম্যান' (Ombudsman) এবং ভারতবর্ষে লোকপাল (Lokpal) নিয়োগের কথা এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে একথা সত্য যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমলারা দুর্নীতি-পরায়ণ হতে বাধ্য। কারণ আমলারা রাষ্ট্রের প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ করে। তাদের সামাজিক অবস্থান, শিক্ষা ও নিয়োগপদ্ধতি একদিকে যেমন তাদের শাসক-শ্রেণীর নিকট দায়বদ্ধ করে রাখে, অন্যদিকে তেমনি জনস্বার্থ সম্পর্কে তাদের উদাসীন করে তোলে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজে আমলাতন্ত্র সামগ্রিকভাবে জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে সমাজ-গঠনের কাজে অংশগ্রহণ করে। তাই সমাজতান্ত্রিক সমাজে আমলাতন্ত্র জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করে না, জনগণই আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে।

১৫। বিচার বিভাগ (The Judiciary)

বিচার বিভাগ রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে কার্যাদি সম্পাদন করে। তাই বিচার বিভাগকে রাজনৈতিক ব্যবস্থা-নিরপেক্ষ বলে মনে করা সমীচীন নয়। অ্যালান বলের মতে, বিচারপতি এবং বিচারালয় সমগ্র রাজনৈতিক পদ্ধতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশমাত্র। তিনি আরো বলেন যে, বিচারপতিদের বিচারক্ষমতা কখনই রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিচারপতিদের নিরপেক্ষতা 'আধা-অলীক কাহিনী' (Semi-fiction) ছাড়া আর কিছুই নয়। সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিচারপতিদের নিরপেক্ষ চরিত্রের উপর আদৌ জোর দেওয়া হয় না। বরং সেখানে বিচার বিভাগ সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অংগ হিসেবে সাম্যবাদী সমাজগঠনের সপক্ষে কাজ করে। সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বার্থরক্ষার পবিত্র দায়িত্ব পালন করাই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচারপতিদের প্রাথমিক কর্তব্য। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিরোধী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদানের মাধ্যমেই বিচারপতিরা তাঁদের রাজনৈতিক দায়িত্ব

বিচার বিভাগ রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংশমাত্র

পালন করেন। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি অনুসারেই বিচার বিভাগের কার্যাবলী স্থিরীকৃত হয়। তাই বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের ভূমিকাও বিভিন্ন হতে বাধ্য। রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে বিচার বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই বিচার বিভাগের কার্যাবলী ও ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা বাঞ্ছনীয় বলে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ অভিমত পোষণ করেন।

১৬। বিচারপতিদের নিয়োগ এবং স্বাধীনতা (Recruitment and Independence of the Judges)

প্রতিটি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের গুরুত্ব অসীম। ব্যক্তি-স্বাধীনতার সংরক্ষণ, আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তি বিধান, সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষা করা ইত্যাদি হোল বিচার বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই সব কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে বিচার বিভাগ গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে। তাই বিচার বিভাগকে অনেকে গণতন্ত্ররূপ সৌধের অন্যতম ভিত্তিস্তম্ভ বলে বর্ণনা করেছেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) মন্তব্য করেছেন, বিচার বিভাগের কর্মদক্ষতা অপেক্ষা সরকারের উৎকর্ষ বিচারের অন্য কোন শ্রেষ্ঠ মানদন্ড নেই। কিন্তু গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য নির্ভীক, নির্লোভ, দুর্নীতিমুক্ত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগের প্রয়োজন। বিচারপতিগণ যদি দুর্নীতিপরায়ণ এবং নিরপেক্ষতাবর্জিত হন তা হলে ন্যায়বিচার কখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। গোখেল তাই মন্তব্য করেছেন, বিচারপতিগণ যদি দুর্নীতিপরায়ণ এবং বিকৃত মনোবৃত্তিসম্পন্ন হন তাহলে ন্যায়বিচার পদদলিত হতে বাধ্য। এমতাবস্থায় অন্যায়কারীরাই কেবল টিকে থাকে এবং দুর্বল ও দরিদ্র ব্যক্তিরা তাদের শিকারে পরিণত হয়। ন্যায়বিচারের বাতি নিভে গেলে ভয়াবহ অন্ধকারের সৃষ্টি হয়—গণতন্ত্র শূন্যগর্ভ তত্ত্বকথায় পর্যবসিত হয়। এই সব কারণে বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার প্রয়োজনীয়তা

অনেকের মতে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা মূলতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে :

[ক] সুযোগ্য বিচারপতিগণই কেবলমাত্র সুষ্ঠুভাবে বিচারকার্য সম্পাদন করতে পারেন। আইনজ্ঞ, সৎ, সাহসী এবং দলীয় রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কহীন ব্যক্তিরা যদি বিচারপতি পদে সমাসীন থাকেন তাহলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। বিচারপতিদের সুনির্দিষ্ট যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগের ব্যবস্থা না থাকলে অনেক সময় অযোগ্য ও দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিরা বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হতে পারেন। সেক্ষেত্রে পক্ষপাতহীন রায় দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের কোন সুনির্দিষ্ট যোগ্যতার উল্লেখ সংবিধানে না থাকায় সিনেট নিজেদের মনোমত ব্যক্তিকে বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ করতে পারে। ভারতবর্ষে সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদপ্রার্থীকে বিশেষ কতকগুলি যোগ্যতার অধিকারী হতে হয়।

বিচারপতিগণের যোগ্যতা

[খ] বিচারপতিগণের নিয়োগ-পদ্ধতির উপর বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বহুলাংশে নির্ভরশীল। প্রধানতঃ তিনটি পদ্ধতি অনুসারে বিচারপতিগণ নিযুক্ত হতে পারেন, যথা—১. জনগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচন, ২. আইনসভা কর্তৃক নির্বাচন এবং ৩. শাসন বিভাগ কর্তৃক মনোনয়ন।

বিচারপতিদের নিয়োগ পদ্ধতি

(১) জনগণ কর্তৃক বিচারপতিগণের নির্বাচনকে অনেকে গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের অপরিহার্য শর্ত বলে মনে করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি অংগ রাজ্যে, সুইজারল্যান্ডের কতিপয় ক্যান্টনে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে গণ-আদালতের বিচারপতি ও অ্যাসেসরদের নিয়োগের ক্ষেত্রে উক্ত পদ্ধতি অনুসৃত হতে দেখা যায়। কিন্তু অধ্যাপক ল্যাস্কি (Laski), গার্নার (Garner) প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ এই পদ্ধতিকে সমর্থন করেননি। কারণ প্রথমতঃ বিচারপতিগণকে নির্বাচন করার জন্য যে যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রয়োজন তা জনসাধারণের থাকে না। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনসাধারণ ভাবাবেগ ও দলীয় প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে অযোগ্য প্রার্থীদের বিচারপতিপদে নির্বাচিত করে। দ্বিতীয়তঃ জনগণ কর্তৃক বিচারপতিদের নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা থাকলে বিচারপতিগণ সর্বদাই জনগণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য বিচারকার্য সম্পাদন করবেন। পুনর্নির্বাচনের আশায় বিচারপতিগণ ন্যায়-নীতিবোধের পথ পরিত্যাগ করেন। তৃতীয়তঃ, কোন ব্যক্তি জনপ্রিয় হোলেই যে সুবিচারক হবেন এমন কোন কথা নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, জনপ্রিয় ব্যক্তিগণ ভাল রাজনীতিবিদ হতে পারেন, কিন্তু সুবিচারক হন না। চতুর্থতঃ, আধুনিক গণতন্ত্রের অর্থ হোল দলীয় শাসন। বিচারপতিগণকে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হতে হোলে যে-কোন প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের সমর্থনপুষ্ট হতে হয়। ফলে তাঁরা সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের কোন কর্মী, সভ্য বা সমর্থকের অপরাধের পক্ষপাতহীন বিচার করতে সমর্থ হন না।

জনগণ কর্তৃক নির্বাচন

তবে গণতন্ত্রকে সাফল্যমন্ডিত করতে হোলে বিচার-বিভাগের উপর জনগণের নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন। সে দিক থেকে জনগণ কর্তৃক বিচারপতিদের নির্বাচনের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে। অবশ্য এই পদ্ধতির যে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে তা অস্বীকার করা যায় না। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এই ব্যবস্থাকে ত্রুটিমুক্ত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। উপযুক্ত ব্যক্তিগণই যাতে নির্বাচিত হন সেজন্য জনগণ এবং কমিউনিস্ট পার্টি সদা-সতর্ক দৃষ্টি রাখে। সাধারণতঃ এই সব রাষ্ট্রে আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণই বিচারক পদে নির্বাচিত হন।

(২) আইনসভা কর্তৃক বিচারপতিগণের নির্বাচনকে অনেকে গণতন্ত্র-সম্মত বলে মনে করেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন, সুইজারল্যান্ড, আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের বিচারপতিগণের নিয়োগের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়। কিন্তু কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী উক্ত পদ্ধতিকে ত্রুটিপূর্ণ এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার পরিপন্থী বলে মনে করেন। কারণ এরূপ নির্বাচনের ফলে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মনোনীত ব্যক্তিরা বিচারক পদে নির্বাচিত হন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা সদা-সর্বদা আইনসভার

আইনসভা কর্তৃক নির্বাচন

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য বিচারকার্য পরিচালনা করেন। ফলে ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করা সব সময় তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাছাড়া, আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা নিজ দলের সমর্থকদের বিচারপতিপদে নির্বাচিত করেন। তাই অনেক সময় সুযোগ্য ব্যক্তিরা বিচারপতি হিসেবে নির্বাচিত হতে পারেন না।

(৩) প্রথম দুটি পদ্ধতি ত্রুটিমুক্ত নয় বলে শাসন বিভাগ কর্তৃক বিচারপতিগণের নিয়োগ পদ্ধতি অনেকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন। শাসন বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত হোলে বিচারপতিগণ রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী বা জনমতের প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সম্পাদন করতে সক্ষম হবেন বলে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর ধারণা। এই পদ্ধতি অনুসারে, সর্বোচ্চ শাসন কর্তৃপক্ষ বিচারপতিদের নিযুক্ত করবেন। তবে নিয়োগের পূর্বে অন্যান্য বিচারপতি কিংবা বিচারপতিগণের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি সংস্থার সঙ্গে তিনি পরামর্শ করবেন। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে, বিচার বিভাগীয় মন্ত্রীর সুপারিশক্রমেই বিচারপতিদের নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। তবে উক্ত মন্ত্রীর প্রস্তাব ঊর্ধ্বতন বিচারপতিদের নিয়ে একটি স্থায়ী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। ভারতবর্ষ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি রাষ্ট্রে ঊর্ধ্বতন আদালতের বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে শাসন বিভাগ কর্তৃক নিয়োগের পদ্ধতি অনুসৃত হয়।

শাসন বিভাগ কর্তৃক নিয়োগ

তবে এই পদ্ধতি অনুসরণের সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। শাসন বিভাগের কার্যে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ করা হলে সেক্ষেত্রে উক্ত বিচারপতি স্বাভাবিকভাবেই শাসন বিভাগ-নিরপেক্ষ হয়ে বিচার কার্য পরিচালনা করতে পারেন না। তাছাড়া, অবসর গ্রহণের পর যদি বিচারপতিদের শাসন বিভাগীয় কোন পদে কিংবা কূটনীতিবিদ হিসেবে নিয়োগ করার পথে কোন বাধা না থাকে, তাহলে বিচারপতিগণ ভবিষ্যতে সরকারের আনুকূল্য লাভের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে সরকারের সপক্ষে বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারেন। ফলে নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

[গ] বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য বিচারপতিদের কার্যকালের স্থায়িত্ব একান্ত প্রয়োজন। হ্যামিলটন (Hamilton)-এর মতে, বিচারপতিগণের পদের স্থায়িত্ব শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষের অন্যতম পরিচায়ক। যদি স্বল্পকালের জন্য বিচারপতিগণ নির্বাচিত বা মনোনীত হন তা হলে তাঁরা সুষ্ঠুভাবে বিচারকার্য সম্পাদনে মনোনিবেশ করতে পারেন না। সদাসর্বদাই নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁরা ব্যস্ত থাকেন। ফলে ন্যায়বিচার উপেক্ষিত হয়। কিন্তু কার্যকালের স্থায়িত্ব থাকলে বিচারপতিগণ নিশ্চিন্তচিত্তে নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কার্যে আত্মনিয়োগ করতে পারেন। তাছাড়া কার্যকাল স্বল্প হলে বিচারপতিগণ দুর্নীতি-পরায়ণ হয়ে উঠতে পারেন। তাই বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রে বিচারপতিদের একটি নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা পর্যন্ত স্থায়ীভাবে নিয়োগের নীতি গৃহীত হয়।

বিচারপতিগণের কার্যকাল

[ঘ] বিচারপতিদের অপসারণ করার পদ্ধতির উপর বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ কিংবা জনসাধারণ যদি

নিজেদের ইচ্ছামত যে-কোন সময় বিচারপতিদের পদচ্যুত করতে পারেন, তাহলে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশংকায় বিচারপতিগণ সর্বদাই সন্ত্রস্ত থাকেন। এমতাবস্থায় স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সম্পাদন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই কেবলমাত্র অক্ষমতা, অযোগ্যতা, দুর্নীতি-পরায়ণতা, সংবিধান ভঙ্গ কিংবা গুরুতর অপরাধ অনুষ্ঠানের অভিযোগ প্রমাণিত হলেই বিচারপতিদের পদচ্যুত করা উচিত বলে মনে করা হয়। তবে তাঁদের বিরুদ্ধে যে-কোন অভিযোগের বিচার সাধারণ আদালতে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। বিচারপতিদের অপসারণের জন্য বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণের প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও গ্রেট ব্রিটেনে বিশেষ অভিযোগ-প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে বিচার-পতিদের পদচ্যুত করা যায়। ব্রিটেনের পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের যৌথ আবেদনক্রমে রাজা বা রানী বিচারপতিদের পদচ্যুত করতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসের জনপ্রতিনিধি সভা অভিযোগ আনয়ন করে এবং সিনেট সেই অভিযোগ বিচার করে। ভারতবর্ষে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের মোট সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে কোন বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রস্তাব গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতি তাঁকে পদচ্যুত করতে পারেন।

বিচারপতিদের অপসারণ

[ঙ] বিচারপতিগণের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগসুবিধার উপর বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বহু পরিমাণে নির্ভরশীল। বিচারপতিগণ যদি স্বল্প বেতন ও ভাতা পান তাহলে দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়ে তাঁরা বিচারকার্য সম্পাদন করতে পারেন না। তাছাড়া, বেতন, ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা যদি আকর্ষণীয় না হয় তাহলে প্রথিতযশা আইনজীবিগণ বিচারপতিপদে নিযুক্ত হতে অস্বীকার করেন। ফলে বিচার বিভাগের দক্ষতা হ্রাস পায়। অনেকের মতে, বিচারপতিগণের বেতন, ভাতা ইত্যাদি বাবদ যে অর্থ ব্যয়িত হয় তা আইনসভার অনুমোদন-সাপেক্ষ রাখা সমীচীন নয়। এমনকি স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকা কালে ... দের বেতন, ভাতা ইত্যাদির পরিবর্তন সাধন আদৌ কাম্য নয়।

বিচারপতিদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি

[চ] বিচারপতিগণের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য বিচার বিভাগকে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার কথা অনেকে ঘোষণা করেন। তা না করা হলে বিচার বিভাগ কখনই ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষক হিসেবে কার্য সম্পাদন করতে পারবে না। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য অত্যাবশ্যক।

বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণ

পূর্বোক্ত পদ্ধতিগুলি বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষার পক্ষে অপরিহার্য হলেও যথেষ্ট নয়। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নির্ভরশীল বলে সাধারণভাবে মনে করা হয়। প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় শাসকশ্রেণী নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সম-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ করে। তাই বিচারপতিদের মধ্যে শ্রেণীকেন্দ্রিক মানসিকতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং

উপসংহার

বিচারপতিদের নিয়োগ কোন অবস্থাতেই রাজনীতির প্রভাবমুক্ত নয়। তাই তাঁদের প্রদত্ত রায় কখনই নিরপেক্ষ হতে পারে না। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে বিচার বিভাগের যে নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতার কথা বলা হয় অ্যালান বলের মতে তা 'আধা-অলীক কাহিনী' (Semi-fiction) মাত্র। বস্তুতঃ বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিচার বিভাগও বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন ও শোষণ ব্যবস্থাকে বৈধকরণের হাতিয়ার মাত্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ অদ্যাবধি এমন কোনও রায় দেয়নি যা বিত্তশালী শ্রেণীর রাজনৈতিক আদর্শের বিরোধী। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে শোষণ না থাকায় বিচার বিভাগ সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মেহনতী মানুষের স্বার্থে কাজ করে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগ তথাকথিত নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতার মুখোশ এঁটে বিচারকার্য সম্পাদন করে না। বিচারপতিগণ জনসাধারণ ও কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা নির্বাচিত ও নিয়ন্ত্রিত হন বলে কখনই তাঁরা জনস্বার্থ-বিরোধী রায় দিতে পারেন না।

১৭। বিচার বিভাগের কার্যাবলী ও ভূমিকা (Function and Role of the Judiciary)

বিচার বিভাগের কার্যাবলীর বিস্তৃত আলোচনা ছাড়া তার ভূমিকার সঠিক মূল্যায়ন করা অসম্ভব। বিচার বিভাগ রাজনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ বলে বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের ভূমিকাও বিভিন্ন রকম হতে বাধ্য। অ্যালান বলের মতে, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের কার্যাবলীর পরিমাণ বিশেষীকরণের মাত্রার (degree of specialization) উপর নির্ভরশীল। পশ্চিম জার্মানীতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য যেমন আদালত আছে, তেমনি পৃথক প্রশাসনিক আদালত ও জেলা সাংবিধানিক আদালতও (District Constitutional Courts) রয়েছে। কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনে পৃথক পৃথক দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত থাকলেও কোন স্বতন্ত্র সাংবিধানিক আদালতের অস্তিত্ব নেই। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় বিচার বিভাগকে যে সব কার্য সম্পাদন করতে হয়, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় বিচার বিভাগকে সেই সব কার্য সম্পাদন করতে হয় না।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিন্নতা হেতু বিচার বিভাগের ভূমিকার ভিন্নতা

অ্যালান বল বিচারবিভাগের সাংবিধানিক কাজকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। তিনি এরূপ কাজকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা—ক. বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা (Judicial Review) ও সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কার্য, খ. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরোধ মীমাংসা সংক্রান্ত কার্য, গ. রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সংরক্ষণ ও সমর্থন সংক্রান্ত কার্য এবং ঘ. নাগরিক-অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্য। এছাড়াও বিচার বিভাগের কতিপয় কার্য রয়েছে, যেমন—ঙ. আইনের ব্যাখ্যা প্রদান ও আইন প্রণয়ন, চ. ন্যায়-বিচারের প্রতিষ্ঠা, ছ. পরামর্শদান ইত্যাদি।

অ্যালান বলের শ্রেণীবিভাগ

(ক) আইনসভা-প্রণীত কোন আইন কিংবা শাসন বিভাগের কোন আদেশ

(order) যখন সংবিধানের বিরোধী হয় তখন সেই আইন বা আদেশকে বাতিল করে দেওয়ার যে ক্ষমতা বিচার বিভাগের হাতে থাকে তাকে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা (Judicial Review) বলা হয়। সংবিধান-বিরোধী আইন বা নির্দেশ বাতিল করে দিয়ে বিচার বিভাগ সংবিধানের পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার গুরুদায়িত্ব পালন করে। তাছাড়া, অনেক সময় বিচার বিভাগ সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে কোন বিরোধ নিষ্পত্তি কিংবা কোন আইনের বৈধতা বিচার করতে পারে। তবে সমস্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের পর্যালোচনা ও সংবিধান ব্যাখ্যার সমান ক্ষমতা থাকে না। ব্রিটেনে পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতা থাকার জন্য বিচার বিভাগ পার্লামেন্ট-প্রণীত কোন আইনকে সংবিধান-বিরোধী বলে ঘোষণা করতে কিংবা বাতিল করতে পারে না। সুইজারল্যান্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত (Federal Tribunal) ক্যান্টনের আইনকে সংবিধান-বিরোধী বলে বাতিল করতে পারলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত আইনসভা-প্রণীত কোন আইনকে সংবিধানের পরিপন্থী বলে বাতিল করতে পারে না। সংবিধানের ব্যাখ্যার দায়িত্বও যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের হস্তে ন্যস্ত হয়নি। সোভিয়েত ইউনিয়নেও কেন্দ্রীয় সুপ্রীম কোর্টের হস্তে এই সব ক্ষমতা অর্পণ করা হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট এ বিষয়ে সর্বাধিক ক্ষমতার অধিকারী। ১৮০৩ সালে মারবারি বনাম ম্যাডিসনের মামলায় প্রধান বিচারপতি মার্শাল (Marshal) রায়দানকালে এই অভিমত প্রদান করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট সংবিধান-বিরোধী যে-কোন আইন বাতিল করার চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। কোন আইনের বৈধতা বিচার করতে গিয়ে সুপ্রীম কোর্ট 'আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি' (Due Process of Law) অনুসারে বিচারকার্য সম্পাদন করতে পারে। তাছাড়া, সুপ্রীম কোর্টের হস্তে সংবিধান ব্যাখ্যার চূড়ান্ত ক্ষমতাও অর্পিত হয়েছে। বিচারপতি হিউজ (Hughes)-এর মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ভারতবর্ষের সুপ্রীম কোর্ট মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের মত 'আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি' অনুসারে বিচারকার্য সম্পাদন করতে পারে না। তবে সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে থেকেও ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট আইনের সাংবিধানিকতা বিচার করতে এবং সংবিধানের ব্যাখ্যা করতে পারে। অবশ্য একথা সত্য যে, কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই বিচার বিভাগ প্রচলিত শ্রেণীসম্পর্ক ব্যবস্থার বিরোধিতা করে না।

বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ও সংবিধানের ব্যাখ্যা

(খ) বিচার বিভাগের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা করা। আইন বিভাগের সঙ্গে শাসন বিভাগের কিংবা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে রাজ্য সরকারের অথবা বিভিন্ন রাজ্য সরকারের মধ্যে এই বিরোধ বাধতে পারে। আদালতের প্রধান কাজ হোল সংবিধান ব্যাখ্যার মাধ্যমে কিংবা সাংবিধানিক উপায়ে এই সব বিরোধের নিষ্পত্তি করা। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারের বিরোধ দেখা দিলে বিচার বিভাগ সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির সপক্ষে

বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা

রায়দান করে। মেরিল্যান্ড মামলায় (১৮২১) মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের প্রদত্ত রায়ের কথা এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আবার আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে বিচার বিভাগ শাসন বিভাগের সপক্ষে রায়দান করে। অবশ্য অ্যালান বল মনে করেন যে, সাংবিধানিক আদালত সমস্ত বিরোধে কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে না।

(গ) বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সংরক্ষণ করা এবং তার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা বিচার বিভাগের অন্যতম কার্য। রাজনৈতিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিচার বিভাগের অন্যতম কর্তব্য প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে অর্থাৎ বিদ্যমান শ্রেণী-সম্পর্ককে রক্ষা করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানি এবং ভারতবর্ষের বিচার বিভাগ সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের হাত শক্তিশালী করছে। অনেক সময় সরকারী নীতি ও কার্যাবলীর উপর বৈধতার ছাপ দিয়ে বিচার বিভাগ রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা রক্ষা করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি যখন ম্যাকআর্থারের অঙ্গুলিসংকেতে পরিচালিত হচ্ছিল তখন ডেনিস মামলার (১৯৫১) রায়দান কালে মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট একজন আত-পরিচিত কমিউনিস্ট নেতাকে প্রাণদন্ডে দন্ডিত করে। কিন্তু মার্কিন রাজনীতি থেকে ম্যাকআর্থারের প্রভাব বিলুপ্ত হওয়ার পর সেই মার্কিন সুপ্রীম কোর্টই এই অভিমত প্রদান করে যে, বলপ্রয়োগ না করে মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে পরিবর্তিত করার হুমকি প্রদানের অপরাধে কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া যায় না।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংরক্ষণ ও সমর্থন সংক্রান্ত কায

(ঘ) সমস্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগ নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতার রক্ষাকর্তা হিসেবে কার্য করে। যে দেশে লিখিত সংবিধান রয়েছে সেখানে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগকে সংবিধানের গন্ডির মধ্যে থেকে কাজ করতে হয়। সরকার যদি সংবিধানে লিপিবদ্ধ নাগরিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করে তাহলে বিচার বিভাগ সেই অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে অগ্রসর হয়। উদাহরণ স্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতবর্ষের সুপ্রীম কোর্টের কথা বলা যেতে পারে। এই দুই রাষ্ট্রে সরকার যদি সংবিধান-বহির্ভূতভাবে নাগরিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করে তাহলে সুপ্রীম কোর্ট সরকারের আইন বা কার্যাবলীকে অবৈধ ঘোষণা করে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব পালন করে। তবে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে বিচার বিভাগ কখনই সমাজের প্রভুত্বকারী শ্রেণীর স্বার্থের বিরোধিতা করে না। প্রচলিত শ্রেণীসম্পর্ককে বজায় রাখাই বিচার বিভাগের অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত কায

(ঙ) বিচার বিভাগ আইনসভা-প্রণীত আইনের ব্যাখ্যা করে এবং যথাযথভাবে তা প্রয়োগের ব্যবস্থা করে। এ ক্ষেত্রে আইন বলতে আইনসভা-প্রণীত আইন, সাংবিধানিক আইন ও প্রথাগত আইনকে বোঝায়। বিচার বিভাগ যদি কোন আইনকে কিংবা আইনের ভাষাকে অস্পষ্ট বা পরস্পর-বিরোধী বলে মনে করে তাহলে বিচারপতিগণ আইন-প্রণেতাদের ধ্যান-ধারণা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। আবার অনেক সময়

আইনের ব্যাখ্যা প্রদান ও আইন প্রণয়ন

বিচারকার্য সম্পাদন করতে গিয়ে প্রচলিত আইন যথেষ্ট নয় বলে বিচারপতিরা মনে করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে বিচারাধীন কোন মামলার রায়দান কালে তাঁরা আইনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। আইনের এই ব্যাখ্যা পরবর্তী সময়ে নজীর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এইভাবে বিচারকগণ প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে নতুন আইনের সৃষ্টি করেন। এই সব আইনকে 'বিচারক-প্রণীত আইন' (Judge-made Laws) বলা হয়।

(চ) ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা বিচার বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন। আদালতের সম্মুখে আনীত যে-কোন বিরোধের নিষ্পত্তি করতে গিয়ে বিচারপতিদের বাস্তব ঘটনাবলী সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হয়। এই উদ্দেশ্যে নথিপত্র, সাক্ষ্যপ্রমাণ ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ করা হয়। দেওয়ানী এবং ফৌজদারী উভয় প্রকার মামলাতেই বিচার বিভাগকে সত্যানুসন্ধানের মাধ্যমে অপরাধীর শাস্তিবিধান করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পবিত্র কর্তব্য পালন করতে হয়। কিন্তু মার্কসবাদী লেখকদের মতে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রে বিচার বিভাগ কখনই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। কারণ বুর্জোয়া রাষ্ট্র হোল শ্রেণী-শোষণের হাতিয়ার। শ্রেণী-শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য আইন বিভাগ, পুলিস, মিলিটারী, বিচার বিভাগ ইত্যাদি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে। তাছাড়া, এরূপ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিচারপতিরা প্রধানতঃ উচ্চমধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আসেন বলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারেন না। সুতরাং বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলিতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নামে কার্যক্ষেত্রে বিচারপতিরা ন্যায়বিচারের প্রহসন করেন মাত্র। তাই অ্যালান বল বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতাকে 'আধা-অলীক কাহিনী' বলে অভিহিত করেছেন।

ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা

(ছ) কোন কোন দেশে বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগকে পরামর্শ দান করে থাকে। ভারতবর্ষের সুপ্রীম কোর্ট সাংবিধানিক বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে পারে। তবে তিনি সুপ্রীম কোর্ট-প্রদত্ত পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য নন।

পরামর্শদানের ক্ষমতা

(জ) সাম্প্রতিককালে বিচার বিভাগ অন্যান্য কয়েকটি কার্যও সম্পাদন করে, যথা—কর্মচারী ও অভিভাবক নিয়োগ, লাইসেন্স প্রদান, মৃত ব্যক্তি বা নাবালকের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, দেউলিয়া প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আদায়কারীর ভূমিকা পালন ইত্যাদি।

অন্যান্য কার্যাবলী

সুতরাং বিচার বিভাগের ভূমিকা রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগ নিরপেক্ষতার আড়ালে বিদ্যমান শ্রেণীসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য প্রতিনিয়তই চেষ্টা করে। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের উপর জনগণের নিয়ন্ত্রণ সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার ফলে বিচারপতিদের পক্ষে জনস্বার্থবিরোধী রায় দেওয়া সম্ভব হয় না। তাছাড়া, এরূপ ব্যবস্থায় বিচারপতিদের মানসিকতারও পরিবর্তন ঘটায় ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।

উপসংহার

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র

[Democracy and Dictatorship]

১। গণতান্ত্রিক আদর্শের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (Origin and Development of the Ideal of Democracy)

'গণতন্ত্র' (Democracy) এমন একটি শব্দ যা যুগ যুগ ধরে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা-জগতে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রনীতিবিদেরা 'গণতন্ত্র' শব্দটিকে বিভিন্ন অর্থে এবং ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেছেন। বর্তমানে অনেকেই আধুনিক গণতন্ত্রকে ধনতন্ত্রবাদের নামান্তর বলে বর্ণনা করে একে সমাজতন্ত্রের বিপরীত একটি প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শ হিসেবে চিত্রিত করেন। সাম্যবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত ব্যক্তিরা কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকেই প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজ বলে বর্ণনা করা সমীচীন বলে মনে করেন। কিন্তু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থকেরা সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে 'গণতন্ত্রের শত্রু' বলে চিহ্নিত করেন। গণতন্ত্র সম্বন্ধে এই সব পরস্পর-বিরোধী মতামত প্রচলিত থাকার ফলে গণতন্ত্রের একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্দেশ করা অদ্যাবধি সম্ভব হয়নি।

গণতন্ত্র সম্বন্ধে পরস্পর-বিরোধী অভিমত

'গণতন্ত্র' শব্দটির প্রথম প্রয়োগ দেখা যায় খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে। সর্বপ্রথম গ্রীকরা এই শব্দটি ব্যবহার করেন। 'গণতন্ত্র' শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হোল 'ডিমোক্রেসী' (Democracy)। 'ডিমস্' (Demos) এবং 'ক্রেটোজ' (Kratos)—এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে 'ডিমোক্রেসী' বা গণতন্ত্র কথাটির উৎপত্তি। 'ডিমস্'-এর অর্থ 'জনগণ' (people) এবং 'ক্রেটোজ'-এর অর্থ শাসন বা কর্তৃত্ব (authority), অর্থাৎ গণতন্ত্র কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হোল 'জনগণের শাসন বা কর্তৃত্ব'। 'গণতন্ত্র' শব্দটি সর্বপ্রথম ইতিহাসে স্থানলাভ করে গ্রীক ঐতিহাসিক থুসিডাইডস্ (Thucydides)-এর 'পেলোপোনেসীয় যুদ্ধের ইতিহাস' (History of Peloponnesian War) পুস্তকখানির মধ্যে। থুসিডাই-ডসের মতে, পেরিক্লিস—সরকারের এমন একটি রূপ হিসেবে গণতন্ত্রের কথা কল্পনা করেছিলেন, যেখানে সকল মানুষই আইনের ক্ষেত্রে সাম্য ভোগ করবে এবং যেখানে কর্মচারীরা শ্রেণীগত ভিত্তি অপেক্ষা গুণগত ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন।

প্রাচীন গ্রীসের গণতন্ত্র

কিন্তু এরূপ গণতন্ত্রের আদর্শ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পেরিক্লিসের পরবর্তী সময়ে গণতন্ত্র শব্দটিকে কেউ আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এবং অ্যারিস্টট্ল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে সুনজরে দেখেননি। অ্যারিস্টট্ল গণতন্ত্রকে সরকারের 'বিকৃত রূপ' (perverted form) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অ্যারিস্টট্লের পরবর্তী সময়ে গণতন্ত্রকে কার্যতঃ জনতাতন্ত্রের (mob-rule) সঙ্গে অভিন্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। এমন কি গ্রীক ঐতিহাসিক পলিবিয়াসও (Polybius, 204-122 B. C.) তাঁর সময়ে নির্বাচিত আইনসভাগুলিকে 'গণতান্ত্রিক' (demokratia) বলে বর্ণনা করতে দ্বিধাবোধ করেছিলেন। বস্তুতঃ এথেনীয়রা

প্লেটো ও অ্যারিস্টট্লের সময়ে গণতন্ত্র

যাকে গণতন্ত্র বলত সেখানেও ক্রীতদাস, স্ত্রীলোক প্রভৃতি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল; এইভাবে প্রায় দু'হাজার বৎসরের অধিক কাল ধরে গণতন্ত্র শাসনব্যবস্থার কাম্য রূপ হিসেবে রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের মনকে আকৃষ্ট করতে পারেনি।

পামার (Palmar)-এর মতে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এসে গণতান্ত্রিক ধারণা পশ্চিম ইউরোপের কতকগুলি দেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে শুরু করে। বস্তুতঃ বর্তমানে যে অর্থে 'গণতন্ত্র' শব্দটির প্রয়োগ করা হয় তা ধনতান্ত্রিক যুগের সূত্রপাত থেকেই ব্যাপকতা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সমর্থ হয়। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার সময় উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণী 'সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা'র গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রচার করতে শুরু করে। ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব এবং আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের ফলে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের (Liberal Democracy) আবির্ভাব ঘটে। এইভাবে গণতন্ত্র মধ্যযুগীয় ভাবধারার সংকীর্ণ গন্ডি অতিক্রম করে একটি উদারনৈতিক রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে বিশ্বের রাজনৈতিক চিন্তাজগতে আলোড়নের সৃষ্টি করে। জন স্টুয়ার্ট মিল, হার্বার্ট স্পেন্সার, টমাস জেফারসন, আব্রাহাম লিংকন, বার্কার, গ্রীন প্রমুখ উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সমর্থনে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। এর পর ১৯১৭ সালের মহান্ অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর উদারনৈতিক গণতন্ত্রের পরিবর্তে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে গণতন্ত্র নিজেকে অন্তের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়। বর্তমানে গণতন্ত্র বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আদর্শ হিসেবে নিজের স্থান সুদৃঢ় করে নিতে পেরেছে।

আধুনিক গণতন্ত্র

২। গণতন্ত্রের অর্থ ও প্রকৃতি (Meaning and nature of Democracy)

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নিরূপণের প্রশ্নে অদ্যাবধি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অনেকে 'জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা'কে গণতন্ত্র বলে অভিহিত করেন। কেউ কেউ আবার এরূপ সংকীর্ণ অর্থে গণতন্ত্র শব্দটির প্রয়োগ অকাম্য বলে মনে করেন। তাঁরা গণতন্ত্রকে 'একটি আদর্শ' হিসেবে' (as an Ideal), 'একটি জীবনাদর্শ' (as a Way of Life) বলে বর্ণনা করেন। বার্নস (Burns)-এর ভাষায়, আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র হোল এমন একটি সমাজব্যবস্থা যেখানে সকল মানুষ সমান না হলেও এই অর্থে সমান যে, তাদের প্রত্যেকেই সমাজের অবিচ্ছেদ্য ও একান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে আস্থাশীল ব্যক্তিরা গণতন্ত্রকে কেবলমাত্র 'একটি জীবনাদর্শ' হিসেবে তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে ইচ্ছুক নন। তাঁরা গণতন্ত্রকে বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারবিশ্লেষণ করেন। তাদের মতে, গণতন্ত্র বলতে এমন একটি সমাজব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। এঁরা গণতন্ত্রকে কেবলমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত সাম্যমূলক সমাজব্যবস্থা বলে গ্রহণ করতে

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নিয়ে মতবিরোধ

সম্মত নন। এঁদের মতে, সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হলে গণতন্ত্র তত্ত্বসর্বস্ব নীতিকথার ঊর্ধ্বে কোনদিন উঠতে পারবে না। ল্যাস্কি (Laski)-র ভাষায়, "অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ছাড়া রাজনৈতিক গণতন্ত্র অর্থহীন।" বস্তুতঃ অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে মানুষকে মুক্ত করতে না পারলে তার কাছে রাজনৈতিক গণতন্ত্র হাস্যকর বলেই মনে হবে।

যাই হোক, গণতন্ত্রকে মোটামুটিভাবে তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা যেতে পারে, যথা—ক. শাসনব্যবস্থা বা সরকারের রূপ হিসেবে গণতন্ত্র (Democracy as a Form of Government), খ. জীবনাদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র (Democracy as a Way of Life) এবং গ. আদর্শ গণতন্ত্র (Ideal Democracy) বা প্রকৃত গণতন্ত্র (Real Democracy)।

তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে গণতন্ত্রের আলোচনা

৩। গণতন্ত্রের প্রকারভেদ (Different Forms of Democracy)

সাধারণভাবে গণতন্ত্রকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা—ক. প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (Direct Democracy) এবং খ. পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র (Indirect or Representative Democracy)।

[ক] প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (Direct Democracy): প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলতে সেই শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে এবং সক্রিয়ভাবে শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। এই শাসনব্যবস্থায় নাগরিকগণ বৎসরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হয়ে আইন প্রণয়ন, শাসন-বিষয়ক নীতি-নির্ধারণ, সরকারী আয়ব্যয় কার্যও সম্পাদন করে। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আইনগত সার্বভৌমিকতা এবং রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নিরূপণ করা হয় না। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে এইরূপ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রবর্তিত ছিল। বর্তমানে কিন্তু এরূপ শাসনব্যবস্থার অস্তিত্ব বিলুপ্তপ্রায়। সুইজারল্যান্ডের কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্যান্টনে (Canton) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সরকার পরিচালনায় এইরূপ শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে।

সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

আধুনিককালে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিলুপ্তির পশ্চাতে কতকগুলি কারণ রয়েছে। বলা যেতে পারে যে, প্রাচীনকালে গ্রীস ও রোমের নগর-রাষ্ট্রগুলি (City-States) ছিল ক্ষুদ্র আকৃতি-বিশিষ্ট। সেই সব নগর-রাষ্ট্রের জনসংখ্যাও ছিল অত্যল্প। জনগণের অধিকাংশ, যেমন—ক্রীতদাস, স্ত্রীলোক এবং শ্রমিকদের—নাগরিক বলে স্বীকৃতি প্রদান করা হোত না। ফলে স্বল্প সংখ্যক জনগণ অতি সহজেই একটি নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে সমবেত হয়ে রাষ্ট্রপরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারত। তদানীন্তন যুগের সমস্যাবলীও ছিল সংখ্যায় অল্প এবং প্রকৃতিগতভাবে সহজ ও সরল। তাই সাধারণ নাগরিকেরা অতি সহজেই সেইসব সমস্যার সমাধান করতে পারত। কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্রের আকৃতিগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যার বিপুল বিস্তার প্রত্যক্ষ

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের বিলুপ্তির কারণ

গণতন্ত্রের প্রবর্তন অসম্ভব করে তুলেছে। তাছাড়া, সমকালীন সমস্যাবলী সংখ্যায় এত বেশী এবং চরিত্রগতভাবে এত জটিল যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে সেইসব সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সর্বোপরি, মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা তাকে এতই জর্জরিত করে তুলেছে যে, সাধারণ মানুষ রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়ে মনোনিবেশ করতে পারছে না। এইসব কারণে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়েছে।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের গুণ

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সমর্থনে অনেকে নানাপ্রকার যুক্তির অবতারণা করেন। বলা হয় যে, গণতন্ত্রের অর্থ যদি 'জনগণের শাসন' হয়, তাহলে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রকেই প্রকৃত গণতন্ত্র বলে অভিহিত করা যায়। এরূপ গণতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুণ হোল জনগণ প্রত্যক্ষভাবে সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। ফলে রাষ্ট্র পরিচালনা বিষয়ে জনগণের মধ্যে যেমন উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়, তেমনি তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা এবং দেশাত্মবোধ বৃদ্ধি পায়। অনেকের মতে, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে প্রত্যেকে শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় বলে সরকারের বিরুদ্ধে কারো কোনো অভিযোগ থাকে না। তাই এরূপ শাসনব্যবস্থা বিপ্লব বা গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত বলে মত প্রকাশ করা হয়।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের দোষ

কিন্তু প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি হোল—বৃহদায়তন রাষ্ট্রের পক্ষে এই প্রকার শাসনব্যবস্থা অকার্যকর ও অকাম্য। বিপুলায়তন রাষ্ট্রে জনগণ সংখ্যায় অনেক বেশী হওয়ার জন্য কোন একটি বিশেষ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে নানা প্রকার মতামত প্রকাশিত হতে পারে। পরস্পর-বিরোধী মতগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে শাসনকার্য পরিচালনা করা সেক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্র পরিচালনার মত জটিল কার্য সম্পাদন করার জন্য যে রাজনৈতিক জ্ঞান ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন সাধারণ নাগরিকের মধ্যে তা প্রত্যক্ষ করা যায় না। ফলে অনেক সময় এরূপ শাসনব্যবস্থায় জনস্বার্থ-বিরোধী কার্যাবলী সম্পাদিত হতে পারে। তৃতীয়তঃ সাধারণ মানুষ যখন সরকারের যাবতীয় কার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে তখন তারা নিজেদের সম্পর্কে অতিরিক্ত উচ্চাশা পোষণ করতে শুরু করে। একে অপরের চেয়ে কোন অংশে ছোট নয়—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে জনসাধারণ যখন কোন কাজ করতে চায় তখনই বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠে। বলা বাহুল্য, এই বিপথগামিতার অর্থ হোল শাসনকার্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি। বস্তুতঃ সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য যে শিক্ষা, কর্তব্যপরায়ণতা এবং দেশাত্মবোধের প্রয়োজন তা সকলের মধ্যে থাকে না। ফলে এরূপ শাসনকার্য কার্যতঃ ব্যর্থ হয়ে পড়তে বাধ্য।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে-কোন যুক্তিরই অবতারণা করা হোক না কেন, এরূপ শাসনব্যবস্থার উপযোগিতার কথা বিবেচনা করে বর্তমানে অনেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য গণভোট, গণ-উদ্যোগ, পদচ্যুতি প্রভৃতির ন্যায় প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

[খ] পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র (Indirect or Representative Democracy) : জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill)-এর মতে, পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র বলতে এমন একটি শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে "সমগ্র জনসাধারণ বা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনক্ষমতা ব্যবহার করে।" সুতরাং বলা যায় যে, পরোক্ষ গণতন্ত্রে জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সম্পাদিত কার্যাবলীর জন্য জনগণের নিকট দায়িত্বশীল থাকেন। তাঁরা নির্বাচকদের ইচ্ছা অনুসারেই সরকারী নীতি নির্ধারণ এবং সেগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে থাকেন। বস্তুতঃ সরকারের আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ জনমতের অনুকূলেই সর্বদা কাজ করে। কারণ জনমতের বিরুদ্ধাচরণ করার অর্থই হোল পরবর্তী নির্বাচনে সরকারী দলের রাজনৈতিক বিপর্যয়কে আহ্বান করা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পরোক্ষ গণতন্ত্রে সরকারী কার্যাবলী যতই জনমত অনুসারে পরিচালিত হোক না কেন, কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ক্ষমতাসীন দল বা কোন ব্যক্তি জনমতের বিরুদ্ধাচরণ করলেও সে ক্ষেত্রে পরবর্তী নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া নির্বাচকগণের গত্যন্তর থাকে না। পরোক্ষ গণতন্ত্রের এইসব ত্রুটিবিচ্যুতি দূরীকরণের জন্য বর্তমানে কয়েকটি প্রতিষেধাত্মক ব্যবস্থা গৃহীত হতে দেখা যায়। এগুলিকে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ (Direct Democratic Checks) বলা হয়।

পরোক্ষ গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

বৈশিষ্ট্য

পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় ; যথা—

(১) পরোক্ষ গণতন্ত্রে জনগণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে না। তারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে সরকারী কার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে।

(২) পরোক্ষ গণতন্ত্রে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য সরকারকে নির্বাচিত হতে হয়।

(৩) সরকার সম্পাদিত কার্যাবলীর জন্য নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট দায়িত্বশীল থাকেন।

(৪) নির্বাচন যথাসম্ভব অবাধ প্রতিযোগিতামূলক হয়। প্রতিটি নির্বাচক যাতে স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারে এবং প্রতিটি নির্বাচন-প্রার্থী যাতে বিনা বাধায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন সেজন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়।

(৫) পরোক্ষ গণতন্ত্রে একাধিক রাজনৈতিক দলের অবস্থিতি অপরিহার্য বলে অনেকে মনে করেন।

(৬) শাসন বিভাগের কর্মকর্তাগণকে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হতে হয় অথবা আইনসভায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্য থেকে মনোনীত হতে হয়।

(৭) এরূপ শাসনব্যবস্থায় আইনগত সার্বভৌমিকতা এবং রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয়।

বর্তমানে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র অপেক্ষা পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই আধুনিক পৃথিবীতে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অবলুপ্ত বললেই চলে।

উপসংহার

৪। শাসনব্যবস্থা বা সরকারের একটি রূপ হিসেবে গণতন্ত্র (Democracy as a Form of Government)

উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সমর্থকেরা সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকেই গণতন্ত্র বলে প্রচার করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরলোকগত রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকন (Abraham Lincoln)-এর মতে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা হোল সেই শাসনব্যবস্থা যা 'জনগণের মঙ্গলার্থে', জনগণ কর্তৃক পরিচালিত, জনগণের শাসন' (Government of the people, by the people and for the people)। কিন্তু লিংকন-প্রদত্ত সংজ্ঞাটির ব্যাখ্যা প্রদানের প্রশ্নে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

শাসনব্যবস্থার একটি রূপ হিসেবে গণতন্ত্র

'জনগণের শাসন' বলতে অনেকে সরকারের প্রতি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বা স্বাভাবিক আনুগত্য প্রদর্শনকে বোঝাতে চান। কিন্তু সুইজি (Sweezy) প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে জনগণের শাসন বলতে বোঝায়—১. জনগণই হোল শাসনব্যবস্থার উৎসস্থল এবং ২. জনগণ ও সরকার একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কহীন নয়, বরং অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কযুক্ত। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়। কারণ জনসাধারণ একনায়কের প্রতি তাদের স্বাভাবিক বা স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য প্রদর্শন করতে পারে। কিন্তু এরূপ সরকার গঠনে জনগণের কার্যতঃ কোন ভূমিকা থাকে না। তাই এরূপ শাসনব্যবস্থাকে 'জনগণের শাসন' বলে অভিহিত করা যায় না।

জনগণের শাসনের অর্থ

দ্বিতীয়তঃ 'জনগণ কর্তৃক পরিচালিত শাসন' (Government by the people) এই অংশটির ব্যাখ্যা নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। প্রাচীনকালে গ্রীকগণ 'জনগণ কর্তৃক পরিচালিত শাসন' বলতে বহুজন কর্তৃক পরিচালিত শাসনকেই বোঝাতেন। অথচ প্রাচীন গ্রীসে স্ত্রীলোক, ক্রীতদাস ও শ্রমজীবী মানুষেরা শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সিলী-র মতে, গণতন্ত্র হোল সেই শাসনব্যবস্থা যাতে প্রত্যেকের অংশগ্রহণ করার অধিকার আছে। কিন্তু বর্তমানে বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যার ফলে জনগণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। তাই তারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে দেশ শাসন করে। তাছাড়া, দেশের প্রতিটি মানুষ কখনই শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে না। যেমন উন্মাদ, অপরাধী, নাবালক প্রমুখ ব্যক্তিদের সর্বদেশেই শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। সুতরাং গণতন্ত্র বলতে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনকেই বোঝায়। ডাইসি-কে অনুসরণ করে বলা যায়, যে শাসনব্যবস্থায়

জনগণ কর্তৃক পরিচালিত শাসনের অর্থ

তুলনামূলকভাবে জনসংখ্যার একটি গরিষ্ঠ অংশের হস্তে শাসনক্ষমতা অর্পিত থাকে তাকে গণতন্ত্র বলে অভিহিত করা হয়। লর্ড ব্রাইসের মতে, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা দেশের সকলের হস্তে অর্পিত হলেও কার্যতঃ তা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনে পর্যবসিত হয়। সুতরাং গণতন্ত্র বলতে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনকেই বোঝায়।

লিংকন-প্রদত্ত গণতন্ত্রের সংজ্ঞার তৃতীয় অংশ হোল 'জনগণের জন্য' (for the people)। এর অর্থ হোল গণতান্ত্রিক সরকার সকলের স্বার্থে কাজ করবে। এরূপ সরকার কোন বিশেষ ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণীস্বার্থের জন্য কাজ করবে না। আপামর জনসাধারণের কল্যাণবিধান করাই এরূপ সরকারের প্রাথমিক কর্তব্য।

'জনগণের মঙ্গলার্থে' বলতে কি বোঝায়

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, কেবলমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য থাকলেই আপামর জনসাধারণের কল্যাণবিধান করা সম্ভব হয় না। গণতন্ত্রকে বাস্তবে কার্যকরী করে তোলার জন্য রাজনৈতিক সাম্যের মত অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন। মার্কসবাদীরা মনে করেন যে, ধনবৈষম্যমূলক সমাজে প্রকৃত গণতন্ত্র কখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কারণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্যের অভাবে রাজনৈতিক সাম্য ও স্বাধীনতা দিবাস্বপ্নের মতোই অলীক বা মিথ্যা বলে প্রতিভাত হয়।

বর্তমানে গণতন্ত্রকে 'জনমত পরিচালিত শাসনব্যবস্থা' বলে বর্ণনা করা হয়। কারণ জনগণের মতামত, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রকাশ ঘটে জনমতের মাধ্যমে। তাই জনমতকে অস্বীকার করার ক্ষমতা কোন সরকারের নেই। জনমত-বিরোধী কোন আইন যাতে প্রণীত না হয় সেদিকে সরকারকে সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। জনস্বার্থ-বিরোধী কোন আইন প্রণীত হওয়ার অর্থ প্রতিকূল জনমতের সম্মুখীন হওয়া। তার ফলে পরবর্তী নির্বাচনে সরকারপক্ষের পরাজয় অনিবার্য হয়ে পড়ে। তাই গণতন্ত্রে জনমতকে বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়।

গণতন্ত্রের প্রকৃতি

অনেক সময় গণতন্ত্রকে শাসিতের 'সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত সরকার' বলে আখ্যা দেওয়া হয়। এরূপ শাসনব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় বা দল সরকার পরিচালনা করবে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় বা দল সরকারী নীতি ও কার্যাবলীর গঠনমূলক সমালোচনা করে সরকারকে সংযত রাখবে। সংখ্যালঘিষ্ঠ বিরোধীপক্ষ যেমন সরকারকে শাসনকার্য পরিচালনায় সাহায্য ও সহযোগিতা করবে, তেমনি সরকারও বিরোধী পক্ষের মতামতকে শ্রদ্ধার চোখে দেখবে। এইভাবে সরকার ও বিরোধীপক্ষের অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, পারস্পরিক বোঝাপড়া ইত্যাদির মাধ্যমে গণতন্ত্রের সাফল্য আসতে পারে। তাই বার্কার গণতন্ত্রকে 'আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পরিচালিত শাসনব্যবস্থা' (a system of government by discussion) বলে বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলতে এমন একটি শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে সমস্ত ক্ষমতার উৎসস্থল হোল জনসাধারণ। এই ক্ষমতা তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রয়োগ করে। সংক্ষেপে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি

হোল : ১. আইনের দৃষ্টিতে সাম্য, ২. ভোটাধিকারের সাম্য, ৩. নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রতিনিধি নির্বাচন, ৪. সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের প্রবর্তন এবং ৫. রাজনৈতিক কার্যকলাপ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা। তাছাড়া, সামাজিক কল্যাণ সাধনকেও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে অনেকে মনে করেন। উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি যে-শাসনব্যবস্থায় থাকে না তাকে অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলে অভিহিত করা হয়।

৫। 'একটি জীবনাদর্শ' বা 'আদর্শ' হিসেবে গণতন্ত্র (Democracy as a Way of Life or as an Ideal)

পাশ্চমী গণতন্ত্রের সমর্থকেরা গণতন্ত্রকে 'একটি জীবনাদর্শ হিসেবে', 'একটি আদর্শ'' হিসেবে চিত্রিত করেন। বার্নসের মতে, আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র হোল এমন একটি সমাজব্যবস্থা যেখানে সকল মানুষ সমান না হলেও এই অর্থে সমান যে, তাদের প্রত্যেকেই সমাজের অবিচ্ছেদ্য এবং প্রয়োজনীয় অংশ। আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র বলতে একটি সামাজিক পরিবেশ (social atmosphere), একটি মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী (attitude of mind), একটি দর্শন (a philosophy) এবং একটি সামগ্রিক সংস্কৃতি বা জীবনধারাকে (a whole culture) বোঝায়। এরূপ গণতান্ত্রিক সমাজে প্রত্যেকে তার নিজস্ব গুণ ও ইচ্ছা অনুসারে সুন্দর ও স্বাধীন জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে এবং অন্যকেও অনুরূপ জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে সাহায্য করে। এরূপ গণতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তি স্বাধীনভাবে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগাতে পারে।

একটি জীবনাদর্শ হিসেবে গণতন্ত্রের অর্থ

ইবেনস্টিন-এর মতে জীবনাদর্শ হিসেবে গণতন্ত্রের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে, যথা :

(১) এরূপ গণতন্ত্রে মানুষের সর্বপ্রকার পারস্পরিক সম্পর্ক বিচারবুদ্ধির (Reason) উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। জীবনাদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা জ্ঞানার্জন করতে পারি। বিজ্ঞানের মতই রাজনীতিতে 'চরম সত্য' (absolute truth) বলে কোন কিছু নেই। তাই সত্যোপলব্ধির জন্য সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কোনও একটি বিতর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার একান্ত প্রয়োজন। এককভাবে কোন ব্যক্তির চিন্তাভাবনা যেহেতু সম্পূর্ণ অভ্রান্ত হতে পারে না, সেহেতু পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই সত্যাসত্য নির্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যভাবে বলা যায়, আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক (Rational empiricism) আলোচনা কাম্য বলে মনে করে।

যুক্তিপূর্ণ ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে সত্যাসত্য নির্ণয়

(২) ইবেনস্টিনের মতে, ব্যক্তির উপর গুরুত্ব (emphasis on the individual) প্রদানের প্রশ্নে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সঙ্গে ফ্যাসীবাদী মতাদর্শের যথেষ্ট পার্থক্য

রয়েছে। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সমর্থকগণ মনে করেন যে, ব্যক্তির সেবা করা ছাড়া সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। ব্যক্তির এই তিনটি পবিত্র অধিকার রক্ষার পরিবর্তে কোন সরকার যদি তা ধ্বংস করতে উদ্যোগী হয় তাহলে জনসাধারণ সেই সরকার পরিবর্তন করে নতুন সরকারের প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

ব্যক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ

(৩) উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রবক্তারা রাষ্ট্রকে যন্ত্রতুল্য বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, রাষ্ট্রের কাজ হোল কেবলমাত্র শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা; রাষ্ট্র কর্তৃক শান্তি-শৃঙ্খলা পরিপূর্ণভাবে রক্ষিত হলে ব্যক্তি তার উচ্চতর লক্ষ্যে (higher ends) উপনীত হওয়ার জন্য কাজ করতে পারে। রাষ্ট্র কখনই নিজের লক্ষ্য হতে পারে না (The state is not end in itself)। ব্যক্তির কল্যাণ সাধনের পথ প্রশস্ত করাই তার কাজ। এইভাবে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক তত্ত্ব রাষ্ট্র অপেক্ষা সমাজের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। যখন সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তখনই কেবলমাত্র রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারে, অন্যথায় নয়।

রাষ্ট্র অপেক্ষা সমাজের উপর গুরুত্ব আরোপ

(৪) আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হোল স্বতঃস্ফূর্ততা (Volunteryism)। গণতান্ত্রিক সমাজে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে, প্রতিটি গোষ্ঠী অন্যান্য গোষ্ঠীর সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করবে এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে। ভালমন্দ নির্ধারণে ব্যক্তি যাতে তার যুক্তিবাদী মনকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পারে সেজন্য গোষ্ঠীগুলি সহযোগিতা করবে। এইভাবে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বমূলক স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার মাধ্যমে সুন্দর গণতান্ত্রিক সমাজজীবনের প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সমর্থকগণ মনে করেন।

স্বতঃস্ফূর্ততা

(৫) উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক সমাজ কতকগুলি স্বতঃপ্রবৃত্ত সংঘের (Voluntary Associations) সমন্বয়ে গঠিত হয়। রাষ্ট্রও এই প্রকার একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংঘ, কারণ জনগণের সম্মতি থেকেই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের উদ্ভব ঘটে। গতানুগতিক উদারনৈতিক মতবাদ অনুসারে, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক এবং ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক রাষ্ট্রীয় আইন অপেক্ষা ঊর্ধ্বতন আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। সুতরাং ব্যক্তির মৌলিক অধিকারগুলি সংরক্ষণ করাই হোল রাষ্ট্রের প্রাথমিক কাজ। ব্যক্তির অধিকার সৃষ্টির কোন ক্ষমতা রাষ্ট্রের নেই। ইবেনস্টিনের মতে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিরোধীরা অভিযোগ করেন যে, ঊর্ধ্বতন আইনের ধারণা সরকারকে শাসিতের সম্মতির উপর নির্ভরশীল করে তোলে বলে তা বিপ্লব বা নৈরাজ্যের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। কিন্তু জন লক (John Locke) গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে, সরকার যদি জনগণকে চরম কষ্টের মধ্যে ঠেলে দেয়, তা হলে সেই সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকার জনগণের আছে। তাছাড়া, সরকারের সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য জনসাধারণ বিদ্রোহ করে না। সর্বোপরি, জনগণের সম্মতির

ঊর্ধ্বতন আইনের শাসন

উপর প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকার জনগণের থাকায় তারা কার্যক্ষেত্রে বিদ্রোহ করে না। কারণ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার অর্থ নিজেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা।

(৬) গণতান্ত্রিক সমাজে লক্ষ্য (end) এবং লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উপায় (means)—এই দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নিরূপণ করা যায় না। ইবেনস্টিন বলেন, বাস্তব অবস্থায় যেটি লক্ষ্য, সেটিই আবার লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উপায় হয়ে দাঁড়ায়। কোন কোন ব্যক্তি শিক্ষাকে তার নিজের লক্ষ্য বলে মনে করেন, কিন্তু অন্যরা শিক্ষাকে একটি ডিগ্রী (Degree) লাভের উপায় বলে মনে করেন। আবার ডিগ্রী লাভকে চাকরিলাভের উপায় বলে অনেকে বর্ণনা করেন। কিন্তু চাকরিলাভ নিজেই নিজের লক্ষ্য হতে পারে না। সমাজসেবার বৃহত্তর লক্ষ্যের উপায় হিসেবে তাকে বর্ণনা করা যায়।

লক্ষ্য এবং উপায় অভিন্ন

(৭) আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র সকল মানুষের সাম্য নীতিতে আস্থাশীল। ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য প্রত্যেকেরই সমান সুযোগ-সুবিধা লাভের অধিকার থাকা প্রয়োজন। অন্যভাবে বলা যায়, আদর্শ গণতন্ত্র প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক অসাম্যকে (natural inequality) অস্বীকার করে না। জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচারশক্তি ইত্যাদি সব মানুষের সমান নয়। এই স্বাভাবিকভাবেই গুণগত উৎকর্ষের দাবি গণতন্ত্র স্বীকার করে নেয়। কিন্তু গুণগত উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিচারের জন্য প্রত্যেকেরই আত্মোপলব্ধির সমান সুযোগ-সুবিধা থাকতে হবে। এই সমান সুযোগ-সুবিধা না থাকলে সমাজের মধ্যে মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান ব্যক্তিই কেবল তাদের ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারে। জীবনাদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র তাই প্রত্যেককে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে, 'সব মানুষ সমান'—এই নীতিকে বাস্তবায়িত করে। গণতান্ত্রিক সমাজে প্রত্যেকেই সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে তার সাধ্যমত সামাজিক কর্তব্য পালন করে সামাজিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করে।

সকল মানুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা

(৮) সহনশীলতা, প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসা—আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্রের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। একজন প্রকৃত গণতান্ত্রিক মানুষ সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি, প্রতিটি জাতি, প্রতিটি আদর্শের মানুষকে ভালবাসবে এবং তার প্রতি সহানুভূতিশীল হবে। এইভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সমাজের সংহতি রক্ষিত হবে।

সহনশীলতা ও সহমর্মিতা

আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র বর্তমান ধনতান্ত্রিক বিশ্বের কোন রাষ্ট্রেই বাস্তবায়িত হয়নি। অবশ্য অনেকে দাবি করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ব্রিটেন প্রভৃতি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এরূপ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু তাদের এই দাবি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। বস্তুতঃ ঐ সব রাষ্ট্রে শাসনব্যবস্থার একটি রূপ হিসেবেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র এখনও তাত্ত্বিক আলোচনার পর্যায়েই থেকে গেছে।

আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র তাত্ত্বিক আলোচনার পর্যায়েই থেকে গেছে

৬। আদর্শ গণতন্ত্র বা প্রকৃত গণতন্ত্র (Ideal Democracy or True Democracy)

আদর্শ গণতন্ত্র বা প্রকৃত গণতন্ত্র বলতে এমন একটি সমাজব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাম্য বিরাজ করে। আদর্শ গণতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তি কর্তৃক ব্যক্তি শোষিত হয় না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য-বৈষম্যের অবসান ঘটার ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য অতি সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এরূপ গণতন্ত্রের সমর্থকরা মনে করেন যে, শাসনব্যবস্থার একটি রূপ হিসেবে গণতন্ত্র বাস্তবে কখনই সাফল্য-মণ্ডিত হতে পারে না যদি সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য বর্তমান থাকে। বৈষম্য-মূলক সমাজব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র শ্রেণী কখনই রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করতে পারে না। কার্যক্ষেত্রে এরূপ গণতন্ত্র 'মুষ্টিমেয় বাছাই-করা ব্যক্তি'র (elite) শাসনে রূপান্তরিত হয়। আবার আদর্শ হিসেবে গণতান্ত্রিক তত্ত্বটি অর্থনৈতিক সাম্যের উপর গুরুত্ব না দেওয়ার জন্য কার্যক্ষেত্রে তাও অবাস্তব তত্ত্ব হিসেবে সমালোচিত হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, ধনতান্ত্রিক সমাজে যে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব বর্তমান তা কখনই প্রকৃত বা আদর্শ গণতন্ত্র নয়। অপরপক্ষে সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে প্রবর্তিত গণতন্ত্রই হোল প্রকৃত গণতন্ত্র। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার অসাম্য-বৈষম্যের অবসান ঘটায় অর্থাৎ শোষণহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা ঘটায় কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সর্বাধিক পরিমাণে অংশগ্রহণ গণতন্ত্রকে সফল করে তোলে।

প্রকৃত গণতন্ত্রের স্বরূপ

৭। উদারনৈতিক গণতন্ত্র (Liberal Democracy)

উদারনৈতিক গণতন্ত্রকে সাধারণভাবে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা— ক. ঐতিহ্যগত উদারনৈতিক গণতন্ত্র (Classical Liberal Democracy) এবং খ. আধুনিক উদারনৈতিক গণতন্ত্র (Modern Liberal Democracy)। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের আদর্শ ও ধ্যানধারণা একদিনে গড়ে উঠেনি। মোটামুটিভাবে বলা যায়, সপ্তদশ শতাব্দীতে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটে। কিন্তু গিলবার্ট ম্যুরে (Gilbert Murray) বলেছেন, ঐতিহ্যগত গণতন্ত্রের দুটি প্রধান নীতির স্রষ্টা হলেন প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকরা। এই দুটি নীতি হোল—চিন্তার স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা। অবশ্য প্রাচীন গ্রীসের নাগরিকরাই কেবলমাত্র এই দুটি অধিকার ভোগ করত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীন গ্রীসে ক্রীতদাস, স্ত্রীলোক, শ্রমিক প্রভৃতিকে নাগরিকতা প্রদান করা হয়নি। যাই হোক, পরবর্তী সময়ে খ্রীষ্টধর্ম সর্বসাধারণকে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদানের সপক্ষে বক্তব্য রাখে। এরপর মধ্যযুগে খ্রীষ্টধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের (Church) সঙ্গে রাষ্ট্রের বিরোধ বাধলে চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অধিকতর গুরুত্বলাভ করে। স্পিনোজা (Spinoza) এই স্বাধীনতাকে বাস্তবায়িত করার জন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য দাবি করেন। ফ্রান্স, জার্মানি ও ইংল্যান্ডে প্রোটেস্টান্টদের সঙ্গে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের

উদারনৈতিক গণতন্ত্রের উৎপত্তির ইতিহাস

বিরোধ বাধলে ধর্মীয় স্বাধীনতার তত্ত্ব ব্যাপকভাবে গুরুত্ব অর্জন করে। হবস্, লক্, গ্যালিলিও (Galileo), হারভে (Harvey) প্রমুখ দার্শনিকদের রচনার মধ্যে ধর্মীয় স্বাধীনতার আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। এইভাবে নবম শতাব্দী থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের তত্ত্ব বাস্তবে রূপায়িত হয়। তবে সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে দ্বন্দ্বের সময় ধনতন্ত্রবাদ উদারনৈতিক গণতন্ত্রের তত্ত্বকে সংগ্রাম পরিচালনার সর্বপ্রকার আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে।

ঐতিহ্যগত উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রধান নীতিসমূহ (Basic Principles of Classical Liberal Democracy) : হবহাউস (Hobhouse)-এর মতে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সংগ্রাম পরিচালনার সময় ঐতিহ্যগত উদারনৈতিক গণতন্ত্রকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে। এরূপ গণতন্ত্রের মৌলিক নীতিগুলি হোল :

(ক) উদারনৈতিক গণতন্ত্র বিশ্বাস করে যে, মানুষ মানুষের দ্বারা শাসিত হয় না। আইনের দ্বারা সে শাসিত হয়। যারা আইন তৈরি করে তারা তাদের ইচ্ছামত আইনের পরিবর্তন সাধন করতে পারে; এমন কি তারা আইনের অপপ্রয়োগও করতে পারে। তাই অযৌক্তিকভাবে আইনপ্রণেতারা ব্যক্তির সম্পত্তি কেড়ে নিতে পারে কিংবা বিনা বিচারে যে-কোন ব্যক্তিকে শাস্তিদান করতে বা মৃত্যুদন্ড দিতে পারে। এমতাবস্থায় মানুষের পৌর স্বাধীনতা (Civil Liberty) রক্ষার প্রয়োজনে সকলের ঊর্ধ্বে আইনকে স্থাপন করা অত্যাবশ্যক বলে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সমর্থকেরা প্রচার করেন।

আইনের শাসন

(খ) ঐতিহ্যগত উদারনৈতিক গণতন্ত্র অবাধ-বাণিজ্যের স্বাধীনতা (Fiscal Liberty) দাবি করে; সমাজের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীই যেহেতু সামাজিক সম্পদের উৎপাদনকারী সেহেতু অর্জিত অর্থসম্পদ কিভাবে ব্যয়িত হবে সে বিষয়ে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার তাদের আছে। যারা অবাধ বাণিজ্যের স্বাধীনতা ভোগ করে, স্বাভাবিকভাবেই তারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকারী। তাদের সম্পত্তি ও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হলে তা শোষণের নামান্তর হবে।

অবাধ ব্যবসাবাণিজ্যের স্বাধীনতা

(গ) ঐতিহ্যগত উদারনৈতিক গণতন্ত্র ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে মানবজীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক বলে মনে করে। ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার বলতে এরূপ গণতন্ত্রের সমর্থকরা স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ, ধর্মীয় স্বাধীনতা ইত্যাদিকে বোঝাতে চান।

ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার

(ঘ) এরূপ গণতন্ত্রের সমর্থকেরা মনে করেন যে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলের সামাজিক স্বাধীনতা থাকবে। সামাজিক স্বাধীনতার মধ্যে শিক্ষার স্বাধীনতা, ভোটদাতাদের স্বাধীনতা ইত্যাদিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে তাঁরা মনে করেন।

সামাজিক স্বাধীনতা

(ঙ) ঐতিহ্যগত গণতন্ত্র অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। বলা বাহুল্য, উদারনৈতিক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে

সাম্য প্রতিষ্ঠাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলে বর্ণনা করেননি। সম্পত্তির ক্রয়বিক্রয়, হস্তান্তর, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা ইত্যাদিকেই তাঁরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলে মনে করতেন।

অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা

(চ) ঐতিহ্যগত উদারনৈতিক গণতন্ত্র পারিবারিক স্বাধীনতা (domestic-freedom)-কে অপরিহার্য বলে বর্ণনা করেছে। বিশেষতঃ সম্পত্তি ও বিবাহের ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার উপর তাঁরা অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

পারিবারিক স্বাধীনতা

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ইত্যাদির গুরুত্ব স্বীকার

(ছ) উদারনৈতিক গণতন্ত্র জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, স্থানীয় ও প্রশাসনিক স্বাতন্ত্র্য, জাতিগত সমতা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী।

শান্তি ও সহযোগিতার নীতি

(জ) ধনতন্ত্রবাদের বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণের জন্য উদারনৈতিক গণতন্ত্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও সহযোগিতার কথা প্রচার করে।

(ঝ) রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং গণ-সার্বভৌমিকতা হোল ঐতিহ্যগত উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ। মধ্যবিত্ত-শ্রেণী তাদের নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও গণসার্বভৌমিকতার কথা প্রচার করে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও গণ-সার্বভৌমিকতা

বেন্থাম (Bentham), জেমস্ মিল (James Mill), জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) প্রমুখ দার্শনিকগণ উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সপক্ষে নানারকম যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেন। কিন্তু এরূপ গণতন্ত্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের নামান্তর হওয়ায় তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তাছাড়া, সমাজতন্ত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ধনতন্ত্রবাদের চরম সংকট দেখা দিলে ঐতিহ্যগত উদারনৈতিক গণতন্ত্রের আদর্শের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। বিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্র তার ঐতিহ্যগত রূপ পরিত্যাগ করে আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করে।

আধুনিক উদারনৈতিক গণতন্ত্র (Modern Liberal Democracy) ঃ জন ডিউয়ে (John Dewey), মরিস র‍্যাফেল কোহেন (Morris Raphael Cohen) প্রমুখের মতে, উদারনৈতিক গণতন্ত্র হোল একটি 'মনোভাব' (attitude) এবং একটি 'কর্মসূচী' (programme)। সামাজিক কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য যুক্তিপূর্ণ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগকেই 'মনোভাব' বলা হয়। 'কর্মসূচী' হিসেবে উদারনৈতিক গণতন্ত্র তিনটি নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। প্রথমতঃ সংযোগ বিষয় সম্বন্ধে জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ সাধনের পথগুলি এমনভাবে উন্মুক্ত রাখতে হবে যাতে প্রতিটি মানুষ অবহিত থাকতে পারে। রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার জনগণের থাকবে এবং তারা নির্বাচনের সময় নিজেদের মনোমত দলকে নির্বাচিত করতে পারবে। দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজন হলে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণ এবং কোন কোন শিল্প-বাণিজ্যের জাতীয়করণের মাধ্যমে সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধান সম্ভব বলে উদারনৈতিক গণতন্ত্র মনে করে। তৃতীয়তঃ, শিক্ষা বিস্তার এবং প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের

আধুনিক উদারনৈতিক গণতন্ত্র বলতে কি বোঝায়

মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনব্যবস্থাকে কার্যকরী করা সম্ভব বলে এরূপ গণতন্ত্রের সমর্থকেরা মনে করেন।

উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে :

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ

(১) উদারনৈতিক গণতন্ত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে। এরূপ গণতন্ত্রের সমর্থকেরা গণতন্ত্রকে 'জনগণের মঙ্গলার্থে, জনগণ কর্তৃক পরিচালিত, জনগণের শাসন' (Government of the people, by the people and for the people) বলে বর্ণনা করেন। তাঁদের মতে জনগণকে সর্বপ্রকার রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎসস্থল করা হলে গণতন্ত্র সফল হতে পারে। জনগণের শাসন বলতে কার্যক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনকে বোঝায়। আধুনিককালে রাষ্ট্রের জনসংখ্যা এবং আয়তন দুই-ই বিপুলাকৃতি ধারণ করায় জনগণের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করা অসম্ভব। তাই তারা নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং এইসব প্রতিনিধির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। গণতান্ত্রিক সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্তৃক নির্বাচিত হলেও কার্যক্ষেত্রে তা আপামর জনসাধারণের মঙ্গলার্থে কাজ করে। এরূপ সরকার কোন বিশেষ ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর স্বার্থে কাজ করবে না। অন্যভাবে বলা যায়, গণতন্ত্র হোল 'জনমত-পরিচালিত শাসনব্যবস্থা'।

নাগরিকদের রাজনৈতিক ও পৌর অধিকারের স্বীকৃতি

(২) উদারনৈতিক গণতন্ত্র যেহেতু জনমত-পরিচালিত শাসনব্যবস্থা সেহেতু সুষ্ঠু ও সবল জনমত গঠনের জন্য প্রত্যেকের স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের অধিকার, সভাসমিতি করার অধিকার, সরকারী কার্যাবলীর সমালোচনা করার অধিকার ইত্যাদি স্বীকৃতিলাভ করে। অন্যভাবে বলা যায়, উদারনৈতিক গণতন্ত্রে নাগরিকদের পৌর অধিকার, যেমন—জীবনের অধিকার, চিন্তা ও মতপ্রকাশের অধিকার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার, পরিবার গঠনের অধিকার, ধর্মের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, সামাজিক সাম্যের অধিকার ইত্যাদি এবং ভোটদানের অধিকার, নির্বাচিত হওয়ার অধিকার ইত্যাদি রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারতবর্ষ ইত্যাদি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধানে এইসব অধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

একাধিক দলপ্রথা

(৩) উদারনৈতিক গণতন্ত্র একাধিক দলপ্রথায় আস্থাশীল। একাধিক রাজনৈতিক দল না থাকলে জনগণের বিভিন্ন প্রকার আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হতে পারে না বলে এরূপ গণতন্ত্রের সমর্থকরা মনে করেন। তাঁদের মতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের সমাকালীন সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করায় নাগরিকদের রাজনৈতিক জ্ঞান যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি আবার বিরোধী দল ক্ষমতাসীন দলের সমালোচনা করে তার স্বৈরাচারী মনোবৃত্তিকে প্রতিহত করে গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে। একদলীয় রাষ্ট্রে গণতন্ত্র কখনই থাকতে পারে না বলে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সমর্থকেরা মনে করেন।

(৪) উদারনৈতিক গণতন্ত্র শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক উপায়ে সরকার পরিবর্তন সম্ভব বলে মনে করে। সরকার-নির্বাচনের চরম ক্ষমতা জনগণের হস্তে অর্পিত থাকায় যে-কোন সময় তারা একটি সরকারের পরিবর্তন সাধন করে অন্য একটি সরকারকে ক্ষমতায় বসাতে পারে। সুতরাং বৈপ্লবিক উপায়ে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অধিকারের যে-কোন প্রচেষ্টাকে উদারনৈতিক গণতন্ত্র জনস্বার্থ-বিরোধী বলে অভিহিত করে।

শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক উপায়ে সরকার পরিবর্তন

(৫) উদারনৈতিক গণতন্ত্র সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারকে গণতন্ত্রের সাফল্যের চাবিকাঠি বলে মনে করে। এরূপ গণতন্ত্রের সমর্থকেরা মনে করেন, যেহেতু গণতন্ত্র জনগণের শাসন, সেহেতু গণ-সার্বভৌমিকতার বাস্তবায়নের জন্য সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার একান্ত প্রয়োজন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের সমানভাবে ভোট প্রদানে অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করা হয়।

সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার

(৬) উদারনৈতিক গণতন্ত্র ন্যায়বিচার (Justice) প্রতিষ্ঠার উপর অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব আরোপ করে। আইনের অনুশাসন (Rule of Law) গণতান্ত্রিক ইমারতের অন্যতম সুদৃঢ় স্তম্ভ বলে বিবেচিত হয়। আইনের দৃষ্টিতে সাম্য এবং আইন সকলকেই সমভাবে রক্ষা করবে (Equality before the Law and Equal Protection of Laws)—এই দুটি হোল গণতান্ত্রিক সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নীতি।

ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা

(৭) ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটি 'নিরপেক্ষ আদালতে'র হস্তে অর্পণ করা হয়। এরূপ আদালত একদিকে যেমন গণতান্ত্রিক সংবিধানের রক্ষাকর্তা ও ব্যাখ্যাকর্তা হিসেবে কাজ করবে, অন্যদিকে তেমনি নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি সংরক্ষণ করে গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখবে।

নিরপেক্ষ আদালত

(৮) ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে উদারনৈতিক গণতন্ত্র নাগরিকদের একটি পবিত্র মৌলিক অধিকার বলে মনে করে। ব্যক্তির হস্তে সম্পত্তির অধিকার না থাকলে নাগরিকরা কর্মে উৎসাহ পাবে না। ফলে দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি ব্যাহত হবে বলে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সমর্থকেরা মনে করেন। অবশ্য সাম্প্রতিককালে কোন কোন উদারনৈতিক রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের উপর কিছু কিছু বাধানিষেধ আরোপ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার

(৯) উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি সহজেই সরকারী সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে। এরূপ ব্যবস্থায় আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ, এমন কি বিচার বিভাগের মাধ্যমেও সেইসব গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে।

স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর সহজেই প্রভাব বিস্তার

(১০) উদারনৈতিক গণতন্ত্র শাসন বিভাগের স্বেচ্ছামূলক ক্ষমতা ও হস্তক্ষেপ রোধ

করার জন্য আইন বিভাগকে ব্যবহার করতে চায়। তবে আইনসভাও যাতে কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থরক্ষার হাতিয়ারে পরিণত হতে না পারে সেজন্য সংখ্যালঘুর প্রতিনিধিত্বের উপর জোর দেওয়া হয়। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, পেশাগত প্রতিনিধিত্ব, বহুমুখী ভোটাধিকার ইত্যাদির মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়।

সংখ্যালঘুর প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা

(১১) উদারনৈতিক গণতন্ত্রে সরকারের দ্রুত উত্থান-পতন ঘটে বলে আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। আমলারা রাজনীতি-নিরপেক্ষ থেকে প্রশাসনিক কাজকর্ম সম্পাদন করে শাসনকার্যে নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখে। অনেকে তাই উদারনৈতিক গণতন্ত্রকে 'আমলা-শাসিত গণতন্ত্র' বলে অভিহিত করেন।

আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য বৃদ্ধি

(১২) জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের ধ্যান-ধারণা সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে আধুনিক উদারনৈতিক গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি পরিব্যাপ্ত হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য দূর করার জন্য গতিশীল কর ব্যবস্থার প্রবর্তন, শিল্প-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ,রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণ, কিছু কিছু শিল্প-বাণিজ্যের জাতীয়করণ ইত্যাদি ব্যবস্থা অনেক রাষ্ট্রেই গৃহীত হয়েছে।

জনকল্যাণকামী নীতি গ্রহণ

সমালোচনা ঃ উদারনৈতিক গণতন্ত্রকে নানা কারণে সমালোচনা করা যেতে পারে ঃ

(১) উদারনৈতিক গণতন্ত্র অর্থনৈতিক সাম্যকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে রাজনৈতিক সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ গঠন করতে চায়। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য-বৈষম্য থাকলে রাজনৈতিক সাম্য কখনই বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে না। ল্যাস্কির মতে, অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ছাড়া রাজনৈতিক গণতন্ত্র অর্থহীন। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, সমাজে অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রভুত্বকারী শ্রেণী সর্বদাই রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অধিকার করে রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগায়। উদারনৈতিক গণতন্ত্র তাই কার্যক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় ধনিক-শ্রেণীর শাসনে পরিণত হয়। বস্তুতঃ উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অধিকাংশ মানুষ ক্ষুধার হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় না বলে তাদের ভোটাধিকার মূল্যহীন হয়ে দাঁড়ায়।

অর্থনৈতিক সাম্য উপেক্ষিত

(২) উদারনৈতিক গণতন্ত্রকে 'জনমত-পরিচালিত শাসনব্যবস্থা' বলে অভিহিত করা যায় না। কারণ এরূপ সমাজ শ্রেণীবিভক্ত থাকায় ধনিক-শ্রেণীর স্বার্থে জনমতকে প্রভাবিত করা হয়। জনমত যখন ধনিক-শ্রেণীর স্বার্থের বিরোধিতা করতে শুরু করে তখন তার প্রকাশের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। তাছাড়া, ধনবৈষম্যমূলক সমাজে জনমত গঠন ও প্রকাশের মাধ্যমগুলি ধনিক-শ্রেণীর কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হয় বলে এ সবের মাধ্যমে প্রকৃত জনমত প্রতিফলিত হতে পারে না। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধনিকের স্বার্থবিরোধী মত প্রচারে শত-সহস্র অসুবিধার সৃষ্টি করা হয়। জনসাধারণ স্বাধীন আবহাওয়ায় মতামত গঠন ও প্রকাশের সুযোগ পায় না। অধ্যাপক ল্যাস্কি তাই বলেছেন, "যে

সুষ্ঠু জনমত গঠিত হয় না

সমাজে অর্থনৈতিক অসাম্য বর্তমান থাকে সেই সমাজে জনমত তার দাবিকে নৈতিক দিক থেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় না। অর্থনৈতিক অসাম্যের বিকৃত স্বার্থদ্বন্দ্ব তার ন্যায়ের পরিধিকে সীমাবদ্ধ করে দেয়।" এমতাবস্থায় এরূপ গণতন্ত্রকে 'জনমত পরিচালিত শাসনব্যবস্থা' বলা যায় না।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অস্বীকৃত

(৩) উদারনৈতিক গণতন্ত্রে নাগরিকদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সামাজিক স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু ল্যাস্কি প্রমুখ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ মনে করেন যে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা মূল্যহীন হয়ে পড়তে বাধ্য। অন্ন সংস্থানের জন্য মানুষের দিবারাত্র ঘুরে বেড়াতে হলে, কিংবা বেকারত্বের জ্বালায় জ্বলতে হলে তার মনে রাষ্ট্র-পরিচালনায় অংশগ্রহণের কোন প্রবৃত্তিই জাগে না। বার্কার (Barker) -এর ভাষায় বলা যায়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরাধীন শ্রমিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কখনোই স্বাধীন হতে পারে না। তাছাড়া, পুঁজিবাদী উদারনৈতিক গণতন্ত্রে আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন রাজনৈতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় প্রবণতা বৃদ্ধি করে, কারণ মুষ্টিমেয় শোষকের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বার্থরক্ষার জন্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও মুষ্টিমেয়ের শাসন একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং বলা যায় যে, উদারনৈতিক গণতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। তাই এই ব্যবস্থায় যৌথ সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণের স্বাধীনতা স্বীকৃতিলাভ করে না।

শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক দল স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না

(৪) বার্কার প্রমুখ উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সমর্থকগণের মতে, একদলীয় ব্যবস্থা চরিত্রগতভাবে অগণতান্ত্রিক। অন্যভাবে বলা যায়, যে-রাষ্ট্রে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে না তাকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে অভিহিত করা যায় না। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ একটি রাজনৈতিক দল বিশেষ একটি শ্রেণীর অধিক-সচেতন ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়। তাই দলীয় ব্যবস্থাকে কখনই শ্রেণী-নিরপেক্ষ বলা যায় না। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে একাধিক শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকে বলে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে একাধিক রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটে। এরূপ সমাজব্যবস্থায় শ্রেণীশোষণ ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব বর্তমান থাকায় পরস্পর-বিরোধী রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে অর্থনৈতিক ক্ষমতা ধনিক-শ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে বলে রাজনৈতিক ক্ষমতাকেও তারা কুক্ষিগত করে রাখতে চায়। ধনিক-শ্রেণীর স্বার্থের বিরোধী কোন রাজনৈতিক দলকে স্বাধীনভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয় না। তাই শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা দখলের তত্ত্ব নিছক বাগাড়ম্বর হিসেবেই থেকে যায়। শ্রমিক-শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শেষ পর্যন্ত বিপ্লবের আশ্রয় গ্রহণ করে।

ন্যায়বিচারের ধারণা শ্রেণীকেন্দ্রিক

(৫) উদারনৈতিক গণতন্ত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়; কিন্তু ন্যায়বিচারের ধারণা সম্পূর্ণভাবে শ্রেণীকেন্দ্রিক। প্রতিটি সমাজে প্রভুত্বকারী শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি সাধন করে ন্যায়বিচারের ধারণা গড়ে উঠে। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকায় আইন, আদালত ইত্যাদি ধনিক-বণিক শ্রেণীর স্বার্থবিরোধী কোন কাজ করতে পারে না। ফলে আইনের দৃষ্টিতে সাম্য এবং আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার কার্যক্ষেত্রে হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়।

(৬) উদারনৈতিক গণতন্ত্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কে জোর গলায় প্রচার চালানো হয়। কিন্তু অ্যালান বল বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে 'আধা-অলীক কাহিনী' (Semi-fiction) বলে সমালোচনা করেছেন। কারণ প্রতিটি দেশের বিচার বিভাগ হোল সেই দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ মাত্র। উদারনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য বর্তমান থাকায় তা কখনই সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর স্বার্থে কাজ করে না। এমতাবস্থায় যে বিচার বিভাগের কাজ আইনসভা-প্রণীত আইন অনুযায়ী বিচারকার্য সম্পাদন করা, সেই বিচার বিভাগ কিভাবে নিরপেক্ষ চরিত্রসম্পন্ন হতে পারে? তাছাড়া, অনেক সময় আইন বিভাগ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বিচার বিভাগের ক্ষমতা খর্ব করে শাসন বিভাগের ক্ষমতার বৃদ্ধিসাধন করে। বর্তমানে উদারনৈতিক গণতন্ত্রে শাসন বিভাগের 'স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা'র সম্প্রসারণ এবং প্রশাসনিক-আদালতের আবির্ভাব আইনের অনুশাসন তথা ন্যায়-বিচারের ধারণাকে অকার্যকর করে দিয়েছে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা আধা-অলীক কাহিনী মাত্র

(৭) সংখ্যালঘিষ্ঠ ও সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার জন্য উদারনৈতিক গণতন্ত্রে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, বহুমুখী ভোটাধিকার ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়। কিন্তু এই সব ব্যবস্থা অবলম্বনের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রতিনিধিত্বের কোন ব্যবস্থা করা হয় না। মার্কসবাদীদের মতে, উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিজেই যেখানে সংখ্যালঘু শ্রেণীর গণতন্ত্র, সেখানে নতুন করে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্বের এই ব্যবস্থা বাহুল্য মাত্র। এ সবের উদ্দেশ্য জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ

(৮) অনেক সময় উদারনৈতিক গণতন্ত্রে গতিশীল কর-ব্যবস্থার প্রবর্তন, কিছু কিছু শিল্প-বাণিজ্যের জাতীয়করণ ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য হ্রাসের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সমাজে প্রচলিত ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে এ সব ব্যবস্থার মাধ্যমে কখনই ধনবৈষম্য দূর করা যায় না। বস্তুতঃ ধনবৈষম্য বিদূরিত করার জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা বিলোপ এবং উৎপাদন ও বন্টনের ক্ষেত্রে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা একান্ত প্রয়োজন।

জনকল্যাণকর ব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রেণীবৈষম্য দূর করা সম্ভব নয়

পরিশেষে বলা যায় যে, ধনতন্ত্রবাদের সংকট তীব্রতর আকার ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে ধনতন্ত্রবাদ নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য কিছু কিছু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের নামে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। তবে একথাও সত্য যে, স্বৈরাচারী অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চেয়ে উদারনৈতিক ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের কাছে

উপসংহার

বেশী কাম্য। কারণ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এরূপ ব্যবস্থায় জনগণ কিছুটা স্বাধীনতা ভোগ করে এবং শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সুযোগ পায়। তবে প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজেই সম্ভব।

৮। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (Arguments for and against Liberal Democratic Government)

ভূমিকা

'গণতন্ত্র' কথাটি যুগ যুগ ধরে রাজনৈতিক চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীকে কেন্দ্র করে যুগে যুগে মনীষিবর্গ ও রাষ্ট্রনীতিবিদেরা বিতর্কের ঝড় তুলেছেন। এরূপ শাসনব্যবস্থার সপক্ষে এবং বিপক্ষে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন যুক্তিতর্কের অবতারণা করা সত্ত্বেও গণতন্ত্র গ্রহণীয় কিংবা বর্জনীয় সে সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের পক্ষে অদ্যাবধি সম্ভব হয়নি। অ্যারিস্টট্ল, জন স্টুয়ার্ট মিল, বেন্থাম, মেয়োর, টকভিল, স্পেন্সার, ল্যাস্কি, বার্কার, ব্রাইস প্রমুখ রাষ্ট্রনীতিবিদেরা গণতন্ত্রকে 'সর্বশ্রেষ্ঠ শাসন' বলে প্রমাণ করার জন্য নানা প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। অপরদিকে উইলি, লেকী, কার্লাইল, ফাগুয়েট, নীটসে, ট্রিটসকে, প্রেসকট, হল প্রমুখ পন্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গণতন্ত্রকে চরমভাবে সমালোচনা করে এই শাসনব্যবস্থার অসারতা প্রমাণ করা চেষ্টা করেন।

সপক্ষে যুক্তি (Arguments for): উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সপক্ষে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করা হয়:

সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার অনুপন্থী

(১) 'সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা'—এই তিনটি আদর্শের উপর ভিত্তি করে গণতন্ত্রের ইমারত দাঁড়িয়ে থাকে। গণতন্ত্রে সকলেই সমান; সমানাধিকারের নীতিটি শুধু তত্ত্বগতভাবে নয়, বাস্তবেও গৃহীত হতে দেখা যায়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী-দরিদ্র, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই আইনের চোখে সমান এবং সকলেই আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার সুযোগ পায় বলে প্রত্যেকে নিজ নিজ ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে। অন্যভাবে বলা যায়, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার ভোগ করতে পারে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও সার্বিক কল্যাণ সাধন সম্ভব

(২) বেন্থাম (Bentham)-এর মতে, শাসক ও শাসিতের স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সর্বাধিক জনগণের সর্বাধিক মঙ্গলসাধনের সমস্যাই হোল সুশাসনের প্রধান সমস্যা। শাসিতকে শাসকের পদে উন্নীত করা সম্ভব হলে এই সমস্যার সমাধান করা সহজ হয়। একমাত্র গণতন্ত্রেই শাসিত শাসকের পদে অধিষ্ঠিত হতে পারে এবং সর্বাধিক জনকল্যাণ সাধিত হতে পারে। তাই জেমস্ মিল (James Mill) গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে 'আধুনিককালের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার' বলে অভিহিত করেছেন।

(৩) ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য প্রয়োজন আত্মশাসন। জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে কেবলমাত্র সুশাসনই সরকারের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, জনগণের মানসিক উৎকর্ষ সাধন করাও সরকারের পবিত্র কর্তব্য। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় জনগণ শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায় বলে একদিকে যেমন তাদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটে, অন্যদিকে তাদের মধ্যে তেমনি আত্মশাসন ও আত্মপ্রত্যয়বোধ জাগ্রত হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, গণতন্ত্রে আত্মশাসনের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হয়।

আত্মশাসনের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হয়

(৪) বার্কারের মতে, গণতন্ত্রে ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। রাজনৈতিক সত্যের উপলব্ধির জন্য পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা এবং ভাববিনিময়ের প্রয়োজন। একমাত্র গণতন্ত্রেই তা সম্ভব। তাই গণতন্ত্রকে 'পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা' বলে অভিহিত করা হয়।

ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব

(৫) গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ধনী-দরিদ্র, অভিজাত-অভাজন, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক এবং সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া নির্বাচনের সময় সমকালীন সমস্যাবলী সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলির আলোচনা-সমালোচনার ফলে জনগণ রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠে; তাদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ও চারিত্রিক উন্নতি সাধিত হয়।

রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির সহায়ক

(৬) অনেকের মতে, একমাত্র গণতন্ত্রই জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করতে পারে। কারণ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেকেই অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সকলের স্বার্থ সমভাবে রক্ষিত হয় বলে জনসাধারণ এরূপ শাসনব্যবস্থাকে একান্তভাবে নিজেদের শাসন বলে মনে করে। ফলে তাদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগরিত হয়। এই গণতান্ত্রিক চেতনা যতই গভীরতা লাভ করবে জনগণ ততই ব্যক্তিস্বার্থ অপেক্ষা সামগ্রিক স্বার্থকেই প্রাধান্য দিবে। শেষ পর্যন্ত দেশপ্রেম জাতীয় স্বার্থের বেড়াজাল অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিস্তারলাভ করবে। জন্মগ্রহণ করবে আন্তর্জাতিকতার সুমহান আদর্শ যা যুদ্ধের সম্ভাবনাকে বিদূরিত করে বিশ্বব্যাপী স্থায়ী শান্তি ও সৌভ্রাত্রের স্বপ্নকে সার্থক করে তুলবে।

দেশপ্রেম জাগরিত হয়

(৭) গণতন্ত্র জনমত-পরিচালিত শাসনব্যবস্থা বলে সরকার জনমতের ভয়ে সাধারণতঃ স্বৈরাচারী হতে পারে না। ক্ষমতাসীন দল বা গোষ্ঠী একথা যথার্থভাবেই জানে যে, জনমতের বিরুদ্ধাচরণের অর্থ হোল পরবর্তী নির্বাচনে নিজেদের রাজনৈতিক ভাগ্যবিপর্যয়কে সাদরে আহ্বান করা। তাছাড়া, বর্তমানে অনেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সরকারকে সংযত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সরকারের স্বৈরাচারিতা রোধ করে

(৮) অনেকের মতে, স্থায়িত্ব হোল গণতন্ত্রের অন্যতম উল্লেখযোগ্য গুণ। জনগণের সম্মতির উপর এরূপ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত বলে সরকারের প্রতি জনগণ অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদর্শন করে। ফলে এরূপ শাসনব্যবস্থা যথেষ্ট পরিমাণে স্থায়িত্বলাভ করে।

স্থায়িত্ব

(৯) জনগণের হাতে সরকার পরিবর্তনের ক্ষমতা থাকায় কোনও গণতান্ত্রিক সরকার জনস্বার্থ-বিরোধী কাজ করতে থাকলে জনগণ অতি সহজেই ব্যালটের মাধ্যমে সেই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেদের পছন্দমত সরকার গঠন করতে পারে। জনগণের অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের আকার ধারণ করতে পারে না। এইভাবে ব্যালটের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সরকারের পরিবর্তন সম্ভব হওয়ায় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কাম্য বলে অনেকে মনে করেন।

বিপ্লবের সম্ভাবনা কম

বিপক্ষে যুক্তি (Arguments against) ঃ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পক্ষে নানাপ্রকার যুক্তি-তর্কের অবতারণা করা হলেও বিরুদ্ধবাদিগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এর সমালোচনা করেন।

(ক) যে-কোন শাসনব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে শাসকবর্গের যোগ্যতা, দক্ষতা, দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তার উপর। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়। কিন্তু জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সাধারণতঃ অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয় বলে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গও অনুরূপ চরিত্রসম্পন্ন হয়। ফলে এরূপ শাসনব্যবস্থা কার্যতঃ অক্ষম ও অশিক্ষিতের শাসনে পর্যবসিত হয়। কার্লাইল গণতন্ত্রকে 'মূর্খদের জন্য মূর্খদের দ্বারা মূর্খদের শাসন' বলে ব্যঙ্গ করেছেন। লেকী (Lecky) গণতন্ত্রকে সর্বাপেক্ষা দরিদ্র, সর্বাপেক্ষা অজ্ঞ এবং সর্বাপেক্ষা অকর্মণ্য ব্যক্তির শাসন বলে অভিহিত করেছেন।

অক্ষম ও অশিক্ষিতের শাসন

(খ) গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণ অজ্ঞ এবং অশিক্ষিত হয় বলে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক জ্ঞানের অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। জনগণের অজ্ঞতার সুযোগে কতিপয় স্বার্থপর অথচ চতুর এবং বাক্‌পটু নেতা তাদের বিভ্রান্ত করে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তাছাড়া, রাজনৈতিক জ্ঞানের অভাব থাকায় নির্বাচনের সময় উৎকোচ গ্রহণ, উৎকোচ প্রদান, নির্বাচনে কারচুপি প্রভৃতি নীতিবিগর্হিত ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে সমাজের নৈতিকতার মান ক্রমশঃ বিনষ্ট হতে শুরু করে। গণতন্ত্র আদর্শভ্রষ্ট হয়ে নৈতিকতাবর্জিত শূন্যগর্ভ তত্ত্বকথায় পর্যবসিত হয়।

নৈতিক অবনতি ঘটায়

(গ) অনেকের মতে, গণতন্ত্রে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের স্থান নেই। এরূপ শাসনব্যবস্থায় দলীয় রাজনীতির প্রাধান্য থাকায় সৎ ও যোগ্য অথচ রাজনীতি-বিমুখ ব্যক্তিরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সম্মত হন না। অনেক সময় নির্বাচনে বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় করতে সমর্থ না হওয়ায় সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিরা ভোটযুদ্ধে পরাজিত হন। তাই তাঁরা ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতির উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন।

সৎ ও যোগ্য ব্যক্তির স্থান নেই

(ঘ) হেনরী মেইন, লেবঁ (Le Bon) প্রমুখ লেখকগণ গণতন্ত্রকে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, চারুকলা প্রভৃতির বিরোধী বলে সমালোচনা করেন। তাঁদের মতে, সাধারণ মানুষ অজ্ঞ ও অশিক্ষিত বলে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, চারুকলা ইত্যাদির গুরুত্ব যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। তাই এগুলির বিকাশ সাধনে তারা সচেষ্ট হয় না। লেবঁর মতে, "সভ্যতার অগ্রগতির পক্ষে এটা খুব সৌভাগ্যের বিষয় যে, বিজ্ঞান ও শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারগুলি হওয়ার পর জনসাধারণ রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে।" অনেকের মতে রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষমতা, মর্যাদা ও প্রতিপত্তির অধিকারী হন। স্বাভাবিকভাবেই শিল্পী, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকেরা রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। ফলে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদির বিরোধী

(ঙ) প্রেস্কট হল (Prescott Hall), এলেন আয়ারল্যান্ড (Alleyane Ireland) প্রমুখ জীববিজ্ঞানিগণ জীববিজ্ঞানের দিক থেকে গণতন্ত্রের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, গণতন্ত্র ব্যক্তির গুণগত পার্থক্যকে অস্বীকার করে। জন্মগতভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের যেখানে পার্থক্য থাকে সেখানে 'সব মানুষ সমান'—এই তত্ত্ব প্রচার করে গণতন্ত্র সত্যের অপলাপ করেছে। তাছাড়া, সাম্যনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করে বলেই তা বিশেষভাবে অবৈজ্ঞানিক এবং অকাম্য।

জীববিজ্ঞানের দিক থেকে সমালোচনা

(চ) হেনরী মেইনের মতে, স্থায়িত্বের অভাব গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান ত্রুটি। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, জনগণ কর্তৃক পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকার ফলে শাসনকার্য যথাযথভাবে পরিচালনা করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় না। লেকীর মতে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় স্থায়িত্বহীনতার এটিই হোল প্রধান কারণ।

স্থায়িত্বের অভাব

(ছ) এরূপ শাসনব্যবস্থায় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রতিটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বলে যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ, আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ প্রভৃতি জরুরী অবস্থার পক্ষে তা বিশেষ অনুপযোগী বলে বিবেচিত হয়। তর্কবিতর্ক, ভোটাভুটি প্রভৃতির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অযথা মূল্যবান সময়ের অপচয় হয়। আবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও সর্বপ্রকার আনুষ্ঠানিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে সময়ের প্রয়োজন।

জরুরী অবস্থার পক্ষে অনুপযোগী

(জ) দলপ্রথা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলির রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের দ্বন্দ্ব অনেক সময় সংঘর্ষে রূপান্তরিত হয়ে দেশের শান্তিশৃঙ্খলা বিনষ্ট করে। তাছাড়া, সরকারী দল পুনরায় ক্ষমতালাভের জন্য সরকারী প্রশাসন এবং অর্থকে কাজে লাগায়। আবার, বহুদলীয় রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলগুলির পরস্পর-বিরোধী প্রচারকার্যে বিভ্রান্ত হয়ে জনগণ মিথ্যা প্রচারের শিকারে পরিণত হয়। সর্বোপরি, সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন-পুষ্ট রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করলেও কার্যতঃ দলের মুষ্টিমেয় প্রভাবশালী

দলীয় শাসনের কুফল

নেতৃবৃন্দই সমস্ত সরকারী ক্ষমতা কুক্ষিগত করে ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থে সরকারকে ব্যবহার করেন।

ব্যয়বহুল

(ঝ) অনেকে গণতন্ত্রকে ব্যয়বহুল শাসনব্যবস্থা বলে সমালোচনা করেন। জনমত গঠন, নির্বাচন অনুষ্ঠান, প্রচারকার্য প্রভৃতির পেছনে গণতন্ত্রে যে বিপুল পরিমাণ অর্থের অপচয় হয়, অন্য কোন শাসনব্যবস্থায় তা হয় না।

আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য বৃদ্ধি

(ঞ) গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জন-প্রতিনিধিবর্গ সরকার গঠন করলেও শাসন-কার্য পরিচালনার জন্য যে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের সে জ্ঞান থাকে না। তাছাড়া, ক্ষমতাসীন হয়েও অধিকাংশ সময় গণ-দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য ব্যস্ত থাকার ফলে তাঁরা শাসনকার্যে মনোনিবেশ করতে পারেন না। স্বাভাবিকভাবেই আমলাদের উপর তাঁদের অত্যধিক পরিমাণে নির্ভর করতে হয়। কিন্তু আমলাদের প্রাধান্য বৃদ্ধির অর্থই হোল দীর্ঘসূত্রতা এবং জনস্বার্থ উপেক্ষিত হওয়া।

রক্ষণশীল শাসনব্যবস্থা

(ট) গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অজ্ঞ ও অশিক্ষিতের শাসন বলে জন-প্রতিনিধিরা গতানুগতিকতার উর্ধ্বে উঠতে পারেন না। নতুন নতুন চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণা, আবিষ্কার প্রভৃতিকে জনগণ এবং তাদের প্রতিনিধিরা সাদরে গ্রহণ করতে পারেন না। ফলে এরূপ শাসনব্যবস্থা কার্যতঃ প্রগতি-বিরোধী চরম রক্ষণশীল শাসনব্যবস্থায় পরিণত হয়।

সংখ্যালঘুর স্বার্থ উপেক্ষিত হয়

(ঠ) অনেকের মতে, গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন হওয়ার জন্য সংখ্যালঘিষ্ঠেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করতে সমর্থ হয় না। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, আইনসভায় যাদের প্রতিনিধি থাকে না তাদের অভাব-অভিযোগে কেউ কর্ণপাত করে না। তাদের স্বার্থ ক্রমাগত উপেক্ষিত হয়।

পুঁজিবাদকে প্রশ্রয় দেয়

(ড) অনেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় গণতন্ত্রকে 'পুঁজিবাদীদের দুর্গ' বলে অভিযুক্ত করেন। তাঁদের মতে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে গণতন্ত্র রাজনৈতিক এবং কিছু পরিমাণে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করলেও অর্থনৈতিক সাম্যের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে না। অথচ একথা সর্বজন-বিদিত যে, অর্থনৈতিক সাম্য ছাড়া রাজনৈতিক ও সামাজিক সাম্য মিথ্যা বা অলীক বলে প্রতিপন্ন হতে বাধ্য। বস্তুতঃ পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক সমাজে দেশের ধনসম্পদের উপর পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণ থাকার ফলে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে তাঁরা শাসনযন্ত্রকে ব্যবহার করেন। অনেক সময় আবার জনপ্রতিনিধিবর্গ জনগণের নির্দেশে পরিচালিত না হয়েধনশালীপুঁজিপতিদের নির্দেশে পরিচালিত হন। এইভাবে গণতন্ত্র কার্যক্ষেত্রে ধনিক-বণিকতন্ত্রে পরিণত হয়।

উপসংহার

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সে-সব যুক্তির অবতারণা করা হয় তাদের অনেকগুলি ভিত্তিহীন এবং কষ্টকল্পনা-প্রসূত বলে মনে করা হয়। লর্ড ব্রাইসের মতে, গণতন্ত্র হয়তো বিশ্বমানবের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরিত করতে পারেনি, হয়তো শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত মনকে রাষ্ট্রের কার্যে নিয়োগ করতে সমর্থ হয়নি,

হয়তো রাজনীতিকে ত্রুটিমুক্ত করতেও ব্যর্থ হয়েছে, তথাপি একথা সত্য যে, অতীতের শাসনব্যবস্থাসমূহের তুলনায় গণতন্ত্র নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছে। বার্নস (Burns) অনুরূপভাবে মন্তব্য করেছেন যে, প্রচলিত প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভাগুলির ত্রুটিবিচ্যুতিসমূহ বিদূরিত করে তাকে যুগোপযোগী করে নেওয়াই সঙ্গত। দলপ্রথার কুফল দূরীকরণ, শিক্ষার সম্প্রসারণ, সংখ্যালঘুর স্বার্থসংরক্ষণ, সর্বোপরি অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই গণতন্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থায় পরিণত হবে, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

৯। আজকের দিনে বুর্জোয়া গণতন্ত্র (Bourgeois Democracy Today)

ভূমিকা

পুঁজিবাদের সমর্থক ও প্রচারক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রকৃত শ্রেণী-চরিত্রকে ঢাকবার জন্য একে 'উদারনৈতিক', 'জনপ্রিয়', 'প্রগতিশীল', 'প্রকাশ্য', এমনকি বিপ্লবী রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টা করেন। এরূপ গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য তাঁরা 'বহুমুখী গণতন্ত্র', 'পার্টি'-গণতন্ত্র', 'আপসমুখী গণতন্ত্র' ইত্যাদি তত্ত্ব খাড়া করেন। ঐসব বুর্জোয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গণতন্ত্রকে পুঁজিবাদের অবদান বলেও ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না।

গণতন্ত্র হোল একটি শ্রেণীভিত্তিক ধারণা

কিন্তু গণতন্ত্র হোল একটি শ্রেণীভিত্তিক ধারণা। মার্কসবাদীরা ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার সাহায্যে একথা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করেছেন যে, কোনকালেই শ্রেণী-চরিত্রহীন সাধারণ গণতন্ত্র অর্থাৎ নির্ভেজাল গণতন্ত্র বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব অতীতে ছিল না, বর্তমানেও নেই। "গণতন্ত্র সর্বকালেই ঐতিহাসিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত গণতন্ত্র (যেমন, ক্রীতদাস-মালিকদের গণতন্ত্র, সামন্ততান্ত্রিক, বুর্জোয়া, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র) যা অনিবার্যভাবে একের পর এক স্থান গ্রহণ করে।" বুর্জোয়া গণতন্ত্র হোল এমন এক ধরনের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা যেখানে প্রভুত্বকারী বুর্জোয়া শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নিজেদের স্বার্থে রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনা করে এবং নিজেদের শ্রেণীর ইচ্ছাকে কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আইনে পরিণত করে। লেনিন বলেছেন, "গণতন্ত্র হোল রাষ্ট্রেরই একটি রূপ ; এরই একটি ধরন। তাই প্রতিটি রাষ্ট্রের মত এতেও একদিকে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংগঠিত ধারাবাহিক বলপ্রয়োগ করা হয়ে থাকে।" বস্তুতঃ বুর্জোয়া গণতন্ত্রে প্রলেতারিয়েত এবং সমাজের অন্যান্য শোষিত অংশকে নির্বাচনের সময় ভোট দেওয়ার অধিকার সীমাবদ্ধভাবে প্রদান করা হলেও সরকার তথা রাষ্ট্র-পরিচালনার ব্যাপারে তাদের কোন অধিকারই দেওয়া হয় না। এরূপ গণতন্ত্রে প্রলেতারীয় শ্রেণী হোল রাষ্ট্রক্ষমতার শিকার ; পুঁজিপতিদের স্বার্থে তাদের শাসন ও দমন করা হয়।

আধুনিক বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রের উপর অনেকেই গভীর আস্থা প্রকাশ করেন। কিন্তু লেনিন শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থের দিক থেকে বুর্জোয়া গণভোটের মূল্যায়ন করতে গিয়ে এই মন্তব্য করেছেন যে, 'সমগ্র জাতির ইচ্ছাকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এবং ভেড়াদের সঙ্গে নেকড়েরা যাতে পাশাপাশি বসবাস করতে

পারে, যাতে শোষিতের সঙ্গে শোষকরা পাশাপাশি বসবাস করতে পারে সেজন্য এই ব্যবস্থা আবিষ্কার করা হয়েছে।" এরূপ গণভোট ব্যবস্থার দ্বারা কার্যতঃ শোষিত জনসাধারণের কোন অধিকারই প্রতিষ্ঠিত হয় না। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে বাহ্যত সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃতিলাভ করলেও ভাবাদর্শগত চাপসৃষ্টি এবং নির্বাচনী ব্যবস্থার নানারকম পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে নির্বাচকমন্ডলীর ইচ্ছাকে বানচাল করে দেওয়া হয়। ১৯৬৮ সালে ফ্রান্সের সংসদীয় নির্বাচনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য একজন কমিউনিস্টের প্রয়োজন হয়েছিল ১,৩৫,০০০ ভোট। কিন্তু ক্ষমতাসীন বুর্জোয়া দল 'দি ইউনিয়ন অব্ ডেমোক্র্যাটস্ ফর দি রিপাবলিক'-এর একজন সদস্য মাত্র ২৭,০০০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাছাড়া, জাতীয় পরিষদে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি প্রেরণের যে অধিকার থাকা উচিত নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করে সেই সংখ্যা কমিয়ে এক-পঞ্চমাংশ করা হয়েছিল। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে ফ্রান্সের ক্ষমতাসীন বুর্জোয়া দলটি কমিউনিস্ট পার্টি অপেক্ষা শতকরা ২·৬ ভাগ ভোট বেশী পেলেও কমিউনিস্ট পার্টি অপেক্ষা তারা আড়াই গুণ বেশী প্রতিনিধি জাতীয় পরিষদে পাঠিয়েছিল।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রের প্রকৃতি

সর্বোপরি, বুর্জোয়া গণতন্ত্রে পুঁজিপতিরা নিজেদের শ্রেণীর প্রতিভূদের নির্বাচনে জয়ী করার জন্য কেবলমাত্র প্রচারযন্ত্রকেই কাজে লাগায় না, সেই সঙ্গে বিরাট পরিমাণ অর্থ তাদের অনুকূলে ব্যয় করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুপঁ, ফোর্ড, ফিল্ড, হ্যারিম্যান, লেম্যান, মেলন, রকফেলার প্রভৃতি মাত্র বারোটি ধনী পরিবার ১৯৬৯ সালের নির্বাচনী প্রচারে ব্যয় করেছিল মোট ৩১,৩১,১৩৬ ডলার। ১৯৭২ সালে সেই ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৪০ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছিল।

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাগুলির হাতে আইন প্রণয়ন করার অধিকার থাকলেও সেই আইনকে কার্যকরী করার কোন ক্ষমতা থাকে না, ফলে নিজেদের স্বার্থ-বিরোধী হলে পুঁজিপতিরা ঐসব আইনকে বাস্তবে যাতে প্রয়োগ না করা হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে। তাছাড়া, বুর্জোয়া গণতন্ত্রে যুদ্ধ, শান্তি, কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুষ্টিমেয় একদল পুঁজিপতিই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। লেনিন বলেছেন, এইভাবে "তারা শুধু যে জনসাধারণকে প্রতারিত করে তা-ই নয়, প্রায়ই খোদ পার্লামেন্টকেও প্রতারিত করে।" তিনি আরো বলেছেন যে, 'পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা থেকে মুক্তির পথ প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাগুলো তুলে দেওয়া নয়, নির্বাচনের নীতিকে বিসর্জন দেওয়া নয়। মুক্তির পথ হোল, ঐ সংস্থাগুলিকে এমন সংস্থায় পরিণত করা যাতে আইন প্রণয়নের কাজ এবং প্রশাসনিক কাজ একসঙ্গে যুক্ত হবে।"

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শিল্প-পুঁজিবাদের যুগে বুর্জোয়া-শাসনের নির্দিষ্ট রূপ ছিল সাধারণতন্ত্র যা রাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে পুঁজিবাদ যতই সাম্রাজ্যবাদের আকার ধারণ করতে শুরু করল, ততই সাধারণতন্ত্র এবং রাজতন্ত্রের পার্থক্য মুছে যেতে লাগল। বর্তমান যুগে বুর্জোয়া গণতন্ত্র সাধারণতন্ত্রী কিংবা

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ফ্যাসিবাদে বা আধা-ফ্যাসিবাদে রূপান্তর

রাজতন্ত্রী উভয় ধরনের হতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালি, সুইজারল্যান্ডে পূর্বোক্ত ধরনের গণতন্ত্র এবং ব্রিটেন, সুইডেন, নরওয়ে, জাপান প্রভৃতি দেশে শেষোক্ত ধরনের গণতন্ত্র বর্তমান রয়েছে। তবে সাম্প্রতিককালে অনেক বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জঠর থেকে ফ্যাসিবাদ বা আধা-ফ্যাসিবাদ আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে। এরূপ হওয়ার অর্থ বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন। বুর্জোয়া গণতন্ত্রে বুর্জোয়াদের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে সর্বহারা শ্রেণীর প্রতিরোধ গড়ে তোলার মত সংগঠনগুলোর বৈধ অস্তিত্ব থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, এখানে কমিউনিস্ট পার্টি, ওয়ার্কার্স পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন, সর্বহারা ছাত্র, যুব ও মহিলা সংগঠনসমূহের অস্তিত্ব থাকে। কিন্তু ওইসব সংস্থাকে যে দেশে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়, সেখানকার রাজনৈতিক ব্যবস্থা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের উদারনৈতিক পথ ছেড়ে মানবতা-বিরোধী ও স্বৈরতান্ত্রিক ফ্যাসীবাদী-শাসনের পথে পা বাড়ায়। এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে জর্জি ডিমিট্রভ বলেছেন, "ফ্যাসি-বাদের ক্ষমতা-লাভ একটা বুর্জোয়া সরকারের জায়গায় আর একটা বুর্জোয়া সরকারের ক্ষমতা-লাভের মতো সাধারণ ঘটনা নয়। এটা বুর্জোয়াদের শ্রেণী-আধিপত্যের একটা রাষ্ট্রীয় রূপের জায়গায় আর একটা রাষ্ট্রীয় রূপের আবির্ভাব। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের জায়গায় বুর্জোয়াদের প্রকাশ্য সন্ত্রাসমূলক একনায়কত্বের আবির্ভাব।" ফ্যাসিবাদ কায়েম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়াদের চরম প্রতিক্রিয়াশীল অংশ সামনে এসে হাজির হয় এবং তারা প্রত্যক্ষভাবে অত্যাচার ও অরাজকতার রাজত্ব কায়েম করে। ঐতিহাসিকভাবে পুঁজিবাদের সংকটের যুগে ফ্যাসিবাদের জন্ম হয়। এটা হোল একচেটিয়া পুঁজির সর্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল, সর্বাপেক্ষা জঙ্গী জাতি-গর্বী অংশের প্রত্যক্ষ একনায়কত্ব।

এ. মিশিনের মতে, "ইতিহাস যে পুঁজিপতি শ্রেণীর পতন অনিবার্যভাবে চিহ্নিত করেছে—তাদের দুর্বলতার ফলেই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বদলে দেখা দেয় ফ্যাসিবাদ। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, পুঁজিবাদী সমস্ত দেশেই ফ্যাসিবাদের জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ইতিহাসই প্রমাণ করে যে, ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয়কে ঠেকানো সম্ভব। কমিউনিস্ট পার্টিগুলির নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিক শ্রেণী বুর্জোয়া সমাজের অন্যান্য সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করলে ফ্যাসিবাদের ক্ষমতা-দখলের চেষ্টা ব্যর্থ করতে পারে। ফ্যাসিস্ট এবং অন্যান্য অত্যাচারী সরকার কায়েম করার চেষ্টার বিরুদ্ধে এবং বর্তমানকালে যে-সব স্বৈরাচারী সরকার কায়েম রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম পুঁজিবাদকে দুর্বল করার জন্য, তাকে ধ্বংস করার জন্য বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী প্রক্রিয়ার এক এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ।"

বর্তমানে স্পেন, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি পুঁজিবাদী দেশে ফ্যাসিস্ট রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু গ্রীস, দক্ষিণ রোডেশিয়া এবং লাতিন আমেরিকার কয়েকটি দেশে আধা-ফ্যাসিস্ট বা নয়া-ফ্যাসিস্ট সরকার কার্যতঃ সামরিক-পুলিসী রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে জনসাধারণকে ভয়াবহ সন্ত্রাসের মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য করেছে। অধিকাংশ উন্নত পুঁজিবাদী দেশে নয়া ফ্যাসিস্ট দল এবং সংগঠনগুলি বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে ফ্যাসিবাদ কায়েম করতে

উদাহরণ

চাইছে। জাতীয় ক্ষেত্রের মত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তারা ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রে সাম্যের প্রকৃতি

ঐতিহাসিক বিচারবিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সামাজিক ক্ষেত্রে অসাম্য-বৈষম্য ও সামন্ততান্ত্রিক অধিকারসমূহের বিলোপ সাধন এবং উৎপাদন যন্ত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে বুর্জোয়া বিপ্লবগুলি সমস্ত নাগরিককে আইনের দৃষ্টিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সমান মর্যাদা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বুর্জোয়া শাসনতন্ত্রগুলিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সাম্যের কথা ঘোষণা করলেও বাস্তবক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। এ. মিশিন যথার্থই বলেছেন, "প্রত্যেক নাগরিককে সমান সুযোগসুবিধা দিলে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের নীতি অনুসারে, তারা ব্যক্তিগতভাবে সেই সুযোগ কাজে লাগাবার চেষ্টা করে। যার অবস্থা বেশী ভালো সে-ই বেশি করে সুযোগের সুবিধা নিতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিরই অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক উভয়ক্ষেত্রেই এইসব সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগানোর স্বাধীনতা আছে। সমাজের প্রত্যেক সদস্যের কার্যকলাপ আইনের কাঠামোর চৌহদ্দির মধ্যে রাখার জন্য যেটুকু হস্তক্ষেপ করা দরকার রাষ্ট্র তার দমনমূলক যন্ত্র নিয়ে এই প্রক্রিয়ার মধ্যে সেইটুকুই হস্তক্ষেপ করে থাকে। এই অবস্থার ফলে একটা ভ্রান্ত মোহ সৃষ্টি হয় যে, ব্যক্তিবিশেষের আর্থিক অবস্থা বা সামাজিক মর্যাদা যাই হোক না কেন, রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ব্যাপারে কোন পক্ষপাতিত্ব ঘটে না।"

সঙ্কটের যুগে পুঁজিবাদের আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা

সাম্রাজ্যবাদের যুগে চরম সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে পুঁজিবাদ নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য কিছু কিছু সুযোগসুবিধা প্রদান করতে বাধ্য হয়েছে। ঐসব 'পুঁজিবাদী রাষ্ট্র' নিজেকে 'জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র' বলে প্রচার করে জনসমর্থন অর্জনের চেষ্টা করে। কিন্তু বেকারভাতা কিংবা পেনশন দেওয়ার মত জনকল্যাণকর কাজ করলেও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মূল চরিত্রের কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না। তাই মিশিন বলেছেন, "বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক সাম্যটা আসলে আইনের মোড়কে ঢেকে প্রকৃত অসাম্য ও শোষণকে লুকোবার ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। এই শোষণের ফলে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যেকার দুস্তর ব্যবধান ক্রমাগতই বেড়ে চলে। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে অর্জিত মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা যে আজও বজায় রয়েছে তা প্রধানতঃ সর্বহারাদের প্রচেষ্টার ফলেই সম্ভব হয়েছে।" তিনি আরো বলেছেন যে, 'একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেই সমস্ত নাগরিকের জন্য সমানভাবে সংবিধান-প্রদত্ত গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করার বাস্তব সাংবিধানিক এবং কার্যকর গ্যারান্টি রয়েছে।"

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সাম্প্রতিক প্রবণতা

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সাম্প্রতিক ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, গণতন্ত্রকে বাতিল করে দিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বৈরাচারী পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়ার প্রবণতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন কোন পুঁজিবাদী দেশে প্রতিক্রিয়াশীল আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বামপন্থী দল ও সংগঠনগুলিকে বাতিল করে দিয়ে, নাগরিক-অধিকারসমূহকে খর্ব করে শিক্ষাগত ক্ষেত্রে স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করে,

প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকাকে ধ্বংস করে দিয়ে স্বৈরাচারী শাসন কায়েম করা হয়। "স্বৈরতন্ত্রী রাজনৈতিক সরকার পুরোপুরিভাবে কায়েম হওয়ার অর্থ হোল বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও তার সমস্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির ধ্বংসসাধন।" "সেখানে শাসকশ্রেণী শুধু যে জনগণকে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার, স্বাধীনতা এবং সেগুলির রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে বঞ্চিত করে তাই নয়; শাসকশ্রেণীর ইচ্ছাকে রূপ দেওয়ার এবং আন্তঃশ্রেণী-সম্পর্ক পরিচালনা করার পদ্ধতি হিসেবেই গণতন্ত্রকে বাতিল করে দেয়। ফ্যাসিবাদের অধীনে রাষ্ট্রক্ষমতা চরমভাবে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে।" বর্তমান সময়ের স্বৈরতন্ত্রী তথা ফ্যাসিবাদী বা নয়া-ফ্যাসিবাদী সরকারগুলির নেতারা কার্যতঃ গণতন্ত্রকে ধ্বংস করলেও সরকারের প্রকৃত স্বরূপকে চাপা দেওয়ার জন্য পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থা, বহুদলীয় ব্যবস্থা ইত্যাদি চালু রেখে জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করে। মিশিনের মতে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে যতই স্বৈরতন্ত্র ছড়িয়ে পড়বে, ততই তারা গণতন্ত্রকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতির মত যেসব সাম্রাজ্যবাদী দেশ রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের স্তরে পৌঁছেছে, কেবলমাত্র সেই সব দেশেই পুঁজি-একনায়কতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় রূপ ও রাজনৈতিক শাসন হিসেবে বুর্জোয়া গণতন্ত্র টিকে রয়েছে।

কিন্তু পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণী এবং তার রাজনৈতিক দলগুলি বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য, সম্প্রসারিত করার জন্য এবং উন্নত করার জন্য প্রতিনিয়তই সংগ্রাম চালিয়ে যায়, কারণ "বুর্জোয়া গণতন্ত্র তার সবকিছু দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও, পুঁজিবাদের আমলে মেহনতী জনগণের কাছে সহজলভ্য, সবচেয়ে উত্তম একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা। সাম্রাজ্যবাদের আমলে সরকারের আরও বেশী প্রতিক্রিয়াশীল হওয়ার দিকে যে স্বাভাবিক ঝোঁক থাকে, তা সর্বহারারা প্রতিহত ও নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে। সর্বহারা শ্রেণী প্রচলিত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে শুধু যে ভালভাবে কাজে লাগাবার জন্যে আগ্রহী তাই নয়, জনগণের রাজনৈতিক মুক্তি অর্জন ও বিপ্লবের চূড়ান্ত জয়লাভের জন্যে সেগুলোকে উৎকৃষ্টতর ও উন্নততর করে তুলতেও আগ্রহী।" বস্তুতঃ উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে একচেটিয়া পুঁজির প্রতিক্রিয়াশীল ঝোঁককে প্রতিহত করার কাজে সর্বহারাশ্রেণী এবং তার মিত্ররা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সর্বোপরি হিংসা, রাজনৈতিক চাপ এবং স্বৈরতান্ত্রিক শাসন কায়েম করে পুঁজিপতি শ্রেণী নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় যতই প্রয়াস পাক না কেন, জাতীয় ক্ষেত্রের মত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা

১০। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তাবলী (Conditions for the Success of Liberal Democracy)

উদারনৈতিক গণতন্ত্রকে সমালোচনা করে যে সব যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হয় সেগুলি অসার এবং কষ্টকল্পিত বলে নস্যাৎ করে দেওয়া যায় না। জন স্টুয়ার্ট মিল, লর্ড ব্রাইস, বার্নস প্রমুখ গণতন্ত্রের সমর্থক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এরূপ শাসনব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন।

ভূমিকা

তাই তাঁরা গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য কতকগুলি শর্ত পূরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য : প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র আদর্শগতভাবে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা হলেও জন স্টুয়ার্ট মিল তার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। তাই তিনি গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য তিনটি শর্তের উল্লেখ করেন। শর্তগুলি হোল : ক. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করার ইচ্ছা ও সামর্থ্য জনগণের থাকা প্রয়োজন ; খ. ব্যক্তিগত অধিকার সংরক্ষণের জন্য জনগণকে সদা-সতর্ক থাকতে হবে ; এবং গ. নিজ নিজ নাগরিক কর্তব্য পালন এবং অধিকার রক্ষার সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছা ও সামর্থ্য জনগণের থাকতে হবে।

জন স্টুয়ার্ট মিলের অভিমত

(১) মিলের অভিমত ব্যাখ্যা করলে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, 'গণতান্ত্রিক জনগণের' (Democratic People) উপর গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে। বস্তুতঃ জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা ও ভাবধারা যতই বিস্তারলাভ করবে, গণতন্ত্র ততই সাফল্যের পথে এগিয়ে যাবে। গণতান্ত্রিক চেতনা বৃদ্ধির ফলে জনগণ সক্রিয় এবং সচেতনভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করবে এবং সরকারের ভুলত্রুটির সমালোচনা করে সরকারকে সংযত রেখে জনস্বার্থ সংরক্ষণে ব্রতী হতে বাধ্য করবে।

গণতান্ত্রিক জনগণ

(২) গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সুনাগরিকের প্রয়োজন। কিন্তু সুনাগরিকতার প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধক হোল নির্লিপ্ততা, ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণ দলীয় মনোভাব। এইসব প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন প্রকৃত গণতান্ত্রিক শিক্ষার। গণতান্ত্রিক শিক্ষা বলতে কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার্জন বোঝায় না। এই শিক্ষাই হবে যথার্থ 'নাগরিকতার জন্য শিক্ষা' (education for citizenship)। এরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর অপেক্ষা দেশের সামগ্রিক স্বার্থকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। তারা নিজ নিজ অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সমভাবে সচেতন থাকে।

গণতান্ত্রিক শিক্ষার প্রসার

(৩) গণতন্ত্রে সকলেই যাতে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ মতাদর্শ প্রচার করতে পারে, ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন আদর্শকে সমর্থন করতে পারে, সেজন্য অনুকূল পরিবেশের প্রয়োজন। এই পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন আত্মসংযম এবং সহিষ্ণুতার। গণতন্ত্রে সরকার ও বিরোধী পক্ষকে সহিষ্ণু হতে হয়। সরকারকে মান্য করা বিরোধী পক্ষের যেমন কর্তব্য, তেমনি বিরোধী পক্ষের মতামতকে যথাযোগ্য মূল্য দেওয়াও সরকারের কর্তব্য। এই পরমতসহিষ্ণুতা এবং বোঝাপড়া না থাকলে গণতন্ত্র কখনই সফল হতে পারে না।

সহিষ্ণুতা

(৪) অনেকের মতে, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ছাড়া গণতন্ত্রের সাফল্য আসতে পারে না। গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য না থাকলে দেশের মানুষ গণতন্ত্রের স্বরূপ ও স্বার্থকতা যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। ফলে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে তারা ভয় পায়।

গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য

(৫) লেকী, হেনরী মেইন প্রমুখ লেখকরা গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য লিখিত সংবিধানের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। সংবিধান লিখিত হলে সাধারণ মানুষ নিজেদের অধিকার ও কর্তব্য, সরকারী ক্ষমতার সীমা প্রভৃতি সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত থাকে। ফলে সরকার সহজে স্বৈরাচারী হতে পারে না।

লিখিত সংবিধান

(৬) ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণকে অনেকে গণতন্ত্রের সাফল্যের অন্যতম শর্ত বলে মনে করেন। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হলে জনগণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। ফলে তাদের রাজনৈতিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। তাই লর্ড ব্রাইস মন্তব্য করেছেন, গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন একান্ত প্রয়োজন।

ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণ

(৭) শাসনকার্য সুদক্ষভাবে পরিচালনার জন্য যে শিক্ষা এবং বিশেষীকৃত জ্ঞানের প্রয়োজন গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধিদের তা থাকে না। তাই শাসনকার্য পরিচালনার জন্য সরকারী কর্মচারীদের ওপর তাঁদের বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয়। কিন্তু সরকারী কর্মচারীরা যদি সৎ, সুদক্ষ, কর্তব্য-পরায়ণ এবং জনকল্যাণকামী মনোভাবাপন্ন না হন, তাহলে গণতন্ত্র তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে না।

সৎ, সুদক্ষ ও কর্তব্য-পরায়ণ সরকারী কর্মচারী

(৮) সুম্পিটার (Schumpeter)-এর মতে গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন ন্যায়পরায়ণ, যুক্তিবাদী এবং বিবেকবান নেতৃত্ব। মনের সঙ্কীর্ণতা দূর করে জনগণকে সুস্থ পথে পরিচালিত করার জন্য সৎ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রয়োজন। কিন্তু জনপ্রতিনিধিবর্গ যদি দুর্নীতি-গ্রস্ত, বিবেকহীন এবং স্বার্থপর হন তাহলে কখনই তাঁরা জনগণকে আকর্ষণ করতে পারবেন না।

সুযোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব

(৯) গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য নাগরিকদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারসমূহের শুধু তত্ত্বগত স্বীকৃতিই যথেষ্ট নয়, সেগুলিকে বাস্তবে কার্যকরী করা প্রয়োজন। তার জন্য আবশ্যক বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, চলাফেরা করার স্বাধীনতা, সংঘ ও সমিতি গঠনের স্বাধীনতা, সর্বোপরি অবাধ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি। সেই সঙ্গে প্রয়োজন জীবনের অধিকার, ধর্মের অধিকার, সামাজিক সাম্যের অধিকার ইত্যাদি।

রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার

(১০) ল্যাস্কি প্রমুখের মতে, কেবলমাত্র রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারসমূহ স্বীকৃত হলেই গণতন্ত্রের সাফল্য আসে না। তার জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা। যে সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য বৈষম্য বিদ্যমান, দেশের সম্পদ মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির নিয়ন্ত্রণাধীন, সেখানে মানুষ কখনই সুস্থ গণতান্ত্রিক জীবন-যাপন করতে পারে না। উৎপাদন ও বন্টনের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন প্রভৃতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাই ল্যাস্কি মন্তব্য করেছেন যে, সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন ছাড়া গণতন্ত্র পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

অর্থনৈতিক সাম্য

১১। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র (Socialist Democracy)

উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ হিসেবে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ভিত্তি হোল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। অনেক-সময় সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে 'বৈপ্লবিক গণতন্ত্র' (Revolutionary Democracy), 'প্রকৃত গণতন্ত্র' (Real Democracy) ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়।

(১) সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সমর্থকদের মতে গণতন্ত্র হোল এমন একটি সমাজব্যবস্থা যেখানে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক আদর্শে আস্থাশীল ব্যক্তিদের মত সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা কেবলমাত্র রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে প্রকৃত গণতন্ত্র বলে স্বীকার করে নিতে সম্মত নন। তাঁদের মতে,

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্যের প্রতিষ্ঠা

যে-সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকে সেখানে রাজনৈতিক ও সামাজিক সাম্য কখনই যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাই তারা উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার উপর ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ সাধন করে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করতে চান। অন্যভাবে বলা যায়, সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে, শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেই কেবলমাত্র গণতন্ত্র বাস্তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের শাসনব্যবস্থায় পরিণত হতে পারে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, অতীতের সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থাতেই উৎপাদন ব্যবস্থা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত থাকার ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সেই শ্রেণী প্রভুত্ব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে। ধনবৈষম্যমূলক সমাজে বিত্তবান শ্রেণীর স্বার্থেই রাষ্ট্রযন্ত্র কাজ করেছে এবং এখনও করছে। এরূপ সমাজে গণতন্ত্র হোল মুষ্টিমেয়ের গণতন্ত্র, কারণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা না থাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র শ্রেণী কখনই রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পায় না। তাই শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের বিলোপ সাধন করে সম্পত্তির উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করেই কেবলমাত্র প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

(২) সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মত একাধিক দলপ্রথায় আস্থাশীল নয়। এরূপ গণতন্ত্রের সমর্থকেরা মনে করেন, যে-সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্ব থাকে সেই সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটে। প্রতিটি রাজনৈতিক দল বিশেষ একটি শ্রেণীর অধিক-সচেতন ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক

এক-দলীয় ব্যবস্থায় আস্থাশীল

রাষ্ট্রে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব (Dictatorship of the Proletariat) প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সমাজে সর্বপ্রকার শ্রেণী-শোষণের অবসান ঘটে। এই সমাজে শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থে একটিমাত্র রাজনৈতিক দলই যথেষ্ট ; অন্য কোন রাজনৈতিক দল থাকার প্রশ্নই উঠে না। 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার' (Democratic Centralism) নীতি অনুসরণের মাধ্যমে সর্বহারা শ্রেণী রাষ্ট্র-পরিচালনা বিষয়ে তাদের সুচিন্তিত অভিমত জ্ঞাপন করতে পারে। এইভাবে একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণ-সার্বভৌমিকতা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে।

(৩) উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রেও সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের

ভোটাধিকার স্বীকৃত। তবে উদারনৈতিক গণতন্ত্রে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকায় এই রাজনৈতিক অধিকারটি তাত্ত্বিক পর্যায়ে থেকে যায়! কিন্তু সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে তা বাস্তবে কার্যকরী হয়। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বের তত্ত্ব কার্যতঃ ধনশালী ব্যক্তিদের স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার মাত্র। এই প্রতিনিধিত্ব শ্রেণী-প্রতিনিধিত্ব মাত্র। এরূপ প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে 'বাছাই-করা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির শাসন' (Elite rule) কায়েম করা হয়। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে লেনিন বলেছেন, বুর্জোয়া গণতন্ত্র হোল সংখ্যালঘুর গণতন্ত্র মাত্র। তাই লেনিনের নেতৃত্বাধীন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি কিংবা মাও সে-তুঙ-এর নেতৃত্বাধীন চীনা কমিউনিস্ট পার্টি যথাক্রমে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণসাধারণতন্ত্রী চীনে সমষ্টিবাচক প্রতিনিধিত্বের তত্ত্ব গ্রহণ করে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে যাবতীয় ক্ষমতা জনগণের হস্তে ন্যস্ত থাকায় এবং রাষ্ট্রের সব সংস্থাই জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হওয়ায় গণ-সার্বভৌমিকতা ও সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন বাস্তবে রূপায়িত হয়।

সমষ্টিবাচক প্রতিনিধিত্বের তত্ত্ব

(৪) সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র মানুষের অর্থনৈতিক অধিকারের উপর যেমন গুরুত্ব আরোপ করে, তেমনি সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারকেও অস্বীকার করে না। সোভিয়েত ইউনিয়ন, গণসাধারণতন্ত্রী চীন প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সংবিধানে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারগুলি স্বীকৃতিলাভ করেছে। ঐ সব দেশে প্রত্যেকের কাজ পাবার অধিকার, কাজের পরিমাণ ও গুণানুযায়ী বেতন ও চাকরির গ্যারান্টি, নাগরিকদের বিশ্রাম ও অবসর যাপনের অধিকার, বার্ধক্যে, পীড়িতাবস্থায় ও সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অক্ষম হলে কিংবা প্রধান উপার্জনকারীর মৃত্যু ঘটলে ভরণ-পোষণ পাবার অধিকার ইত্যাদি অর্থনৈতিক অধিকার যেমন স্বীকৃতিলাভ করেছে, তেমনি বাসস্থানের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, বাক্-স্বাধীনতার অধিকার, সভা-সমিতির অধিকার, বিক্ষোভ প্রদর্শনের অধিকার, নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, নির্বাচন করার অধিকার ইত্যাদিও স্বীকৃত।

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি

(৫) সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে ব্যক্তিকে সমাজের অপরিহার্য এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করা হয়। এই সমাজে প্রত্যেককেই সামাজিক অগ্রগতির জন্য কাজ করতে হবে। 'যে কাজ করবে না, সে খেতেও পাবে না'—এই নীতিটি বাস্তবে কার্যকরী হওয়ায় এরূপ সমাজতান্ত্রিক সমাজে পরশ্রমভোগী কোন শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকে না। এখানে "প্রত্যেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করবে, প্রত্যেকে তার কাজ অনুসারে বেতন পাবে"—সমাজতন্ত্রের এই নীতি অনুসারে রাষ্ট্র শ্রম ও ভোগের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

রাষ্ট্র শ্রম ও ভোগের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে

(৬) উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতার কথা বলা হয় না। এরূপ সমাজে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শোষণহীন মুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মুক্ত সমাজে বিচার বিভাগ সমাজতন্ত্রকে সুদৃঢ় করার কাজে আত্মনিয়োগ করে, সমাজতন্ত্রের শত্রুদের শাস্তিবিধান করে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সমাজে প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।

বিচার বিভাগ সমাজতন্ত্রকে সুদৃঢ় করে

(৭) সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে রাষ্ট্র মুষ্টিমেয়ের স্বার্থে কাজ করে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষা করাই হোল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাজ। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে দমন করে সর্বহারা শ্রেণীর গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করার জন্য রাষ্ট্র কাজ করে। সর্বহারা শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশেই রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রাষ্ট্র রক্ষা করে

(৮) সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে সর্বক্ষেত্রেই জনগণ এবং কমিউনিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত থাকে বলে সরকারী কর্মচারীরা জনস্বার্থ-বিরোধী কোন কাজ করতে পারে না। এরূপ গণতান্ত্রিক সমাজে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমিত।

গণ-নিয়ন্ত্রণের প্রাধান্য

(৯) সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে সুস্থ, স্বাভাবিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রগতিশীল গণ-সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জারজ সন্তান অপসংস্কৃতির কোন প্রকার অস্তিত্ব সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে থাকে না।

গণ-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা

সুতরাং বলা যেতে পারে যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সর্বক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আদর্শ গণতন্ত্রের তোরণদ্বার উন্মোচিত করে। এরূপ গণতন্ত্রে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার সুমহান্ আদর্শগুলি তত্ত্বসর্বস্ব নীতিকথার উর্ধ্বে উঠে নিজেদের বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করে। তাই উদারনৈতিক গণতন্ত্র অপেক্ষা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়।

১২। গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ (Future of Democracy)

১৬৮৮ সালে ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লবের সময় থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত উদারনৈতিক গণতন্ত্রের জয়যাত্রা অব্যাহত ছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এই গণতন্ত্রের সংকট শুরু হয়। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি রাষ্ট্রে তখনও উদারনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর রাশিয়াতে 'সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র' (Socialist Democracy) প্রতিষ্ঠিত হোল উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ হিসেবে। সেইসঙ্গে গণতন্ত্রের মৃত্যুবাণ হাতে নিয়ে বিশ্বের রাজনৈতিক আকাশে মৃত্যুদূতের মত আবির্ভূত হোল জার্মানি ও ইতালীর নাৎসীবাদী ও ফ্যাসীবাদী একনায়কতন্ত্র। সৌভাগ্যের বিষয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি ও ইতালী সামরিক দিক থেকে পরাজিত হয়। কিন্তু জার্মানি ও ইতালী পরাজিত হলেও নয়া-ফ্যাসীবাদ ও নয়া-নাৎসীবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে সামরিক ও সাম্রাজ্যবাদী একনায়কতন্ত্র নতুনভাবে নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে। স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর একনায়কতন্ত্র, দক্ষিণ রোডেশিয়ায় স্মিথের স্বৈরাচারী শাসন, তাইওয়ানে চিয়াং কাই-শেকের শাসন তথাকথিত মার্কিন গণতন্ত্রের 'আণবিক অস্ত্রের ছত্রচ্ছায়া'য় শক্তিবৃদ্ধি করে গণতন্ত্রের ধ্বংসসাধনে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এমন কি, গণতন্ত্রের তথাকথিত পীঠস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং অন্যান্য উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নয়া ফ্যাসীবাদ আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে। সে সব দেশে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ পদদলিত। উদাহরণস্বরূপ মার্কিন

উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সংকট

যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫০ সালে গৃহীত 'ম্যাকক্যারান আইন' (MacCarran Law)-এর উল্লেখ করা যেতে পারে ; এই আইনের সাহায্যে টেলিফোনে কথোপকথন এবং ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের যোগাযোগের উপর পুলিসী নিয়ন্ত্রণ বৈধ করা হয়। তাছাড়া, ঐ দেশে ফ্যাসীবাদী 'জন বার্চ সোসাইটি' (John Brich Society) গঠনের কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সমর্থকগণ গণতন্ত্রের এই সংকটের কারণ ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সমাজতন্ত্রের সমর্থকগণ এবং ল্যাস্কি প্রমুখ আধুনিক প্রগতিশীল লেখকগণের মতে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার অভাবে উদারনৈতিক বা ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সংকট ঘনীভূত হয়েছে ; এইসব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দেশের সম্পদ মুষ্টিমেয় ধনশালীর হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকার ফলে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার পদদলিত হচ্ছে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্যের অভাব সংকটের কারণ

বস্তুতঃ ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রে রাষ্ট্র জনগণের স্বার্থে পরিচালিত না হয়ে ধনিক-বণিক শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত হয়। কিন্তু ধনতন্ত্র আজ সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। তাই ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা, জনগণের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মানুষকে সামাজিক শক্তিগুলির পুনর্বিন্যাসের কথা ভাবতে বাধ্য করেছে। জনসাধারণ উত্তরোত্তর সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। বর্তমানে ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য শাসকগোষ্ঠীর সামনে দুটি পথ উন্মুক্ত রয়েছে। প্রথমটি হোল শ্রেণী-সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসকে স্বীকার করে নিয়ে পুঁজিবাদী শ্রেণী হিসেবে নিজেদের অস্তিত্বকে বিনষ্ট করা এবং দ্বিতীয়টি হোল—রাজনৈতিক গণতন্ত্রের কন্ঠরোধ করে সমাজের পুনর্বিন্যাসে জনগণকে বাধা দেওয়া। আত্মহননের পথে না গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই ধনিক শ্রেণী দ্বিতীয় পথই বেছে নেয়। ইতালী ও জার্মানির ধনিক-বণিক শ্রেণী একদিন রাজনৈতিক গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করলেও শেষ পর্যন্ত গণ-অভ্যুত্থানের ভয়ে তাদেরই সৃষ্ট রাজনৈতিক গণতন্ত্রের কন্ঠরোধ করে তাকে হত্যা করে। ধনতান্ত্রিক বা উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লয়েড বলেছেন, "গণতন্ত্র যদি মানুষের মনে এই বিশ্বাস জাগাতে না পারে যে এটি এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে মানুষ দুঃখ-দারিদ্র্য ও অত্যাচারের হাত থেকে নিস্কৃতি পাবে এবং স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে স্বকীয় ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হবে, তাহলে গণতন্ত্র টিকে থাকতে পারবে না।"

রাজনৈতিক গণতন্ত্রের কন্ঠরোধ

তাহলে কি আমরা গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস হারাবো ? কিন্তু গণতন্ত্র যেহেতু জনগণের শাসন সেহেতু গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস হারানোর অর্থ জনগণের প্রতি বিশ্বাস হারানো। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ…মনুষ্যত্বের অন্তহীন, প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ বলে মনে করি।" তাই আমরা কখনই জনগণ এবং জনগণের শাসনের উপর বিশ্বাস হারাবো না। "মানুষ নিজের

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল

জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে।" মানুষের শুভবুদ্ধি ও নিষ্ঠা একদিন তাকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা তথা সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবেই।

১৩। একনায়কতন্ত্র (Dictatorship)

একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের বিপরীত শাসনব্যবস্থা। নিউম্যান (Neumann)-এর মতে, একজন বা কয়েকজন ব্যক্তি যখন দেশের যাবতীয় শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করে অপ্রতিহতভাবে প্রয়োগ করে তখন সেই শাসনব্যবস্থাকে আমরা একনায়কতন্ত্র বলে অভিহিত করি। সাধারণতঃ বিশেষ কোন ব্যক্তি বা সমরনায়ক জনগণের নামে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বলপূর্বক ক্ষমতা অধিকার করেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁদের শাসন জনগণের কল্যাণে পরিচালিত না হয়ে বিশেষ একটি শ্রেণীর (Class) স্বার্থে পরিচালিত হয়। যে-শ্রেণীর স্বার্থ একনায়ক রক্ষা করেন স্বাভাবিকভাবেই তিনি সেই শ্রেণীর প্রত্যক্ষ সাহায্য ও সমর্থন লাভ করেন। যেহেতু একনায়কতন্ত্র জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সেহেতু সমস্ত বিরোধী মতামতকে শক্তি বা বলপ্রয়োগের দ্বারা দমন করতে একনায়ক দ্বিধাবোধ করেন না।

একনায়কতন্ত্রের সংজ্ঞা

১৪। একনায়কতন্ত্রের উদ্ভবের কারণ (Causes of the growth of Dictatorship)

একনায়কতন্ত্রের উদ্ভবের প্রধান কারণগুলি হোল ঃ

(১) তত্ত্বগতভাবে গণতন্ত্র রাজনৈতিক ও সামাজিক সাম্য-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও বাস্তবে তা হয় না। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে ধনবৈষম্য থাকায় দুঃখ-দারিদ্র্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। দেশের সম্পদের অসম-বন্টন, সম্পদের উপর একচেটিয়া পুঁজিপতিদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য ইত্যাদি অর্থনৈতিক সঙ্কটকে তীব্রতর করে তোলে। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ বিকল্প অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন কামনা করে। একে রোধ করার জন্যই অনেক সময় একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে।

রাজনৈতিক ও সামাজিক সাম্যনীতির অকার্যকারিতা

(২) গণতন্ত্র সমাজের পরিবর্তন চায় সত্য, কিন্তু দ্রুত পরিবর্তন গণতন্ত্রের প্রকৃতিবিরোধী। অনেক সময় গণতন্ত্রের 'ধীরে চলার নীতি'র ফলে একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে।

গণতন্ত্রের বৈপ্লবিক পরিবর্তন অসম্ভব

(৩) গণতন্ত্র হোল দলীয় শাসনব্যবস্থা। দলীয় শাসনের ফলে অনেক সময় দলীয় সংঘর্ষ, দলীয় স্বার্থসংরক্ষণ, সরকারের স্থায়িত্বহীনতা প্রভৃতি দেখা দেয়। ফলে একনায়কতন্ত্রের প্রবর্তন ঘটতে পারে।

দলীয় শাসনের কুফল

(৪) সৎ, সুদক্ষ ও কর্তব্যপরায়ণ সরকারী কর্মচারীর একান্ত অভাব গণতন্ত্রের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। সরকারী কর্মচারীরা জনগণের সেবক হলেও কার্যতঃ তাঁরা জনগণের প্রভু হয়ে উঠে। আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল এরূপ গণতন্ত্র একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাবের পথ প্রশস্ত করে দেয়।

সৎ ও সুদক্ষ সরকারী কর্মচারীর অভাব

(৫) জনকল্যাণের জন্য প্রয়োজন সৎ, কর্তব্যনিষ্ঠ, বিবেকবান এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্ব কিন্তু গণতন্ত্রে নেতৃবৃন্দ নিজ গোষ্ঠী বা দলের স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে জনস্বার্থকে উপেক্ষা করতেও দ্বিধাবোধ করেন না। আদর্শ-ভ্রষ্ট, দুর্নীতিপরায়ণ এবং ব্যক্তিত্বহীন নেতৃত্ব গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা বিনষ্ট করে।

সৎ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাব

(৬) সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি অনেক সময় সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে অনুন্নত দেশ-সমূহে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিরোধিতা করে একনায়ক-তান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করে এবং ঐ সব পুতুল সরকারকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে।

সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত

৯৫। একনায়কতন্ত্রের প্রকারভেদ (Different Types of Dictatorship)

একনায়কতন্ত্রকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা—ক. ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক একনায়কতন্ত্র, খ. দলগত একনায়কতন্ত্র এবং গ. শ্রেণীগত একনায়কতন্ত্র। কেউ কেউ অবশ্য একনায়কতন্ত্রকে সামাজিক, সাম্যবাদী এবং ফ্যাসীবাদী—এই তিন ভাগে বিভক্ত করার পক্ষপাতী। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্র একই সঙ্গে দলগত ও শ্রেণীগত একনায়কতন্ত্র। অনেকের মতে ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্র চূড়ান্তভাবে ব্যক্তিগত একনায়কতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

তিন প্রকার একনায়কতন্ত্র

[ক] **ব্যক্তিগত একনায়কতন্ত্র (Individual Dictatorship):** যখন একজন ব্যক্তি ও সামরিক নেতার হস্তে দেশের যাবতীয় ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে কেন্দ্রীভূত থাকে তখন তাকে ব্যক্তিগত একনায়কতন্ত্র বলে। এরূপ একনায়কতন্ত্রে একজন ব্যক্তি দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হলেও তাঁর পশ্চাতে বিশেষ একটি রাজনৈতিক দল বা সামরিক বাহিনীর সক্রিয় সমর্থন থাকে। যে ক্ষেত্রে সমরনায়ক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন তাকে সামরিক একনায়কতন্ত্র (Military Dictatorship) বলা হয়। সাধারণতঃ সংবিধান-বহির্ভূতভাবে ক্ষমতা দখল করে ব্যক্তিগত একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা হয়। পাকিস্তানে আয়ুব খান, মিশরে কর্নেল নাসের এবং ইন্দোনেশিয়ায় জেনারেল সুহার্তো সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আইনানুমোদিত সরকারের উচ্ছেদ সাধন করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিলেন। অবশ্য অনেক সময় আইনানুমোদিত পদ্ধতিতে রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করে নায়ক সম্পূর্ণ স্বৈরাচারী শাসনের প্রবর্তন করতে পারেন। জার্মানীতে হিলটার, ইতালীতে মুসোলিনী এরূপ একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ব্যক্তিগত একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ

[খ] **দলগত একনায়কতন্ত্র (Party Dictatorship):** একটি দলের হস্তে যখন রাষ্ট্রক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীভূত থাকে এবং সেই দল ছাড়া অন্য কোন দলের অস্তিত্ব সেই দেশে থাকে না তখন তাকে দলগত একনায়কতন্ত্র বলা হয়। অনেকের মতে দলগত একনায়কতন্ত্র কার্যক্ষেত্রে পর্যবসিত হয় ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক একনায়কতন্ত্রে। উদাহরণস্বরূপ

দলগত একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ

বলা যায় যে, হিটলার ও মুসোলিনী যথাক্রমে নাৎসী ও ফ্যাসিস্ট দলের একনায়কত্বের ছত্রচ্ছায়ায় কার্যতঃ ব্যক্তিগত একনায়কত্ব চালিয়েছিলেন।

[গ] **শ্রেণীগত একনায়কতন্ত্র (Class Dictatorship)** : শ্রেণীগত একনায়কতন্ত্র বলতে একটি বিশেষ শ্রেণীর একনায়কত্ব বোঝায়। রাষ্ট্র উক্ত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অনেকের মতে বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র শ্রেণীগত একনায়কতন্ত্রের অধীন। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের নামে কার্যতঃ ধনিক-বণিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে 'সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব' (Dictatorship of the Proletariat) প্রতিষ্ঠিত হয়। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পার্থক্য হোল—পূর্ববর্তী শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্র সংখ্যালঘিষ্ঠ ধনিক-বণিক শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত হয়; কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সংখ্যাগরিষ্ঠ সর্বহারা শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত হয়। সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রে আদর্শ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কারণ এখানে শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। গণসাধারণতন্ত্রী চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি রাষ্ট্রে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শ্রেণীগত একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ

প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে, সাধারণতঃ যে অর্থে একনায়কতন্ত্রকে গণতন্ত্রের বিপরীত এবং বিরোধী বলে অভিহিত করা হয় সে অর্থে সাম্যবাদী একনায়কতন্ত্রের মূল্যায়ন করা অর্থহীন। কারণ, সাম্যবাদী একনায়কতন্ত্র আদর্শ গণতন্ত্রের বিরোধী নয়; বরং শোষণ ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে তা প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ও দোষ-গুণ আলোচনার সময় আমাদের মনে রাখতে হয় যে, আমরা সাম্যবাদী একনায়কতন্ত্রকে নিয়ে আলোচনা করছি না। গণতন্ত্রবিরোধী একনায়কতন্ত্রই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

সাম্যবাদী একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্র-বিরোধী নয়

১৬। একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Dictatorship)

অগণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্রের (সাম্যবাদী একনায়কত্ব নয়) কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যথা :

(১) একনায়কতন্ত্রের শ্লোগান হোল—'এক জাতি, এক রাষ্ট্র এবং এক নায়ক।' এখানে একজন মাত্র শাসকের প্রাধান্য সর্বত্রই বিদ্যমান থাকে। অবশ্য তাঁর শাসনের পশ্চাতে থাকে একটি বিশেষ দল, একটি বিশেষ শ্রেণী কিংবা সামরিক শক্তির সক্রিয় সমর্থন।

এক জাতি, এক রাষ্ট্র এবং এক নায়ক

(২) একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তির স্বাধীন সত্তা স্বীকার করা হয় না। তার পরিবর্তে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বের কথা বলা হয়। একনায়কতন্ত্রে প্রচার করা হয় যে, জন্ম থেকেই ব্যক্তি রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত। মুসোলিনী বলতেন, সকলেই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে, কেউ রাষ্ট্রের বাইরে বা বিরুদ্ধে নয়।

রাষ্ট্রই প্রধান : ব্যক্তি নয়

(৩) সংবিধান-বিরোধী উপায়ে নায়ক যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন তার পর নিজ ক্ষমতার অধিষ্ঠানকে আইনসিদ্ধ করার জন্য তিনি বন্দুকের নলের সাহায্যে প্রহসনমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন।

নায়ক ক্ষমতার অধিষ্ঠানকে আইনসিদ্ধ করেন

(৪) একনায়কতন্ত্রে নায়কের দল ছাড়া অন্য সব দলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করা হয়। সমস্ত বিরোধী সমালোচনার কণ্ঠরোধ করার জন্য নায়ক প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা ও সমাজদ্রোহিতার অভিযোগ এনে বিচারের নামে প্রহসন করে তাঁদের কারাদণ্ড অথবা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। অনেক সময় গুপ্তহত্যার মাধ্যমে বিরোধী নেতাদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে একনায়ক নিজের অত্যাচারী শাসন নিরঙ্কুশ করার ব্যবস্থা করেন।

বিরোধী পক্ষের কণ্ঠরোধ

(৫) একনায়ক নিজ শাসনব্যবস্থাকে স্থায়িত্ব প্রদানের জন্য সুনিপুণ গুপ্তচর ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। জনগণ কিংবা নিজ দলের নেতৃবৃন্দ নায়কের বিরোধিতা করছে কিনা বা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত কিনা সে সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করাই হোল গুপ্তচরদের প্রধান কাজ। মুসোলিনীর 'কালো কোর্তা বাহিনী' (Black Shirt) এবং হিটলারের কুখ্যাত 'গেস্টাপো (Gestapo) বাহিনী'র কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গুপ্তচর ব্যবস্থা

(৬) একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সর্বক্ষেত্রে, বিশেষতঃ রাষ্ট্র-পরিচালনা, সামরিক, আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপ, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

গোপনীয়তা

(৭) মিথ্যা প্রচার একনায়কতন্ত্রের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। নিজের অত্যাচারী শাসনকে সুন্দর ও জনকল্যাণকর বলে নায়ক জনগণকে বিভ্রান্ত করেন। অনেক সময় বিরোধী দল বা নেতার ভাবমূর্তি নষ্ট করে জনসমর্থন লাভের জন্য মিথ্যা প্রচারের আশ্রয় নেওয়া হয়। রাইখস্ট্যাগে (জার্মানির আইনসভা) অগ্নিসংযোগ করে কমিউনিস্টদের উপর মিথ্যা দোষারোপ করে হিটলার কমিউনিস্ট নিধনে আত্মনিয়োগ করলে মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে জনসাধারণ তার কোন প্রতিবাদ করেনি।

মিথ্যা প্রচার

(৮) একনায়কতন্ত্র যুদ্ধবাজ নীতির সমর্থক। একনায়কতন্ত্রের তাত্ত্বিক নীট্‌সে (Neizsche) প্রচার করেন, শান্তির পথ দুর্বলের পথ। পৃথিবীতে বাঁচবার অধিকার কেবলমাত্র শক্তিমানদেরই আছে। মুসোলিনী বলতেন, "আন্তর্জাতিক শান্তি কাপুরুষের স্বপ্ন—সাম্রাজ্যবাদ হোল জীবনের শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয় নিয়ম।" তাঁর মতে "স্ত্রীলোকের নিকট মাতৃত্ব যেমন কাম্য, পুরুষের নিকট যুদ্ধও তেমনি কা. '।"

যুদ্ধবাজ নীতি

(৯) একনায়কতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতার চরম বিরোধী। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার কোন স্থান একনায়কতন্ত্রে নেই। ব্যক্তির দেহ ও মনের উপর সম্পূর্ণ সামরিকীকরণ চলে।

ব্যক্তিস্বাধীনতার বিরোধী

(১০) একনায়কতন্ত্রে সরকারী পরিকল্পনা ও নীতিসমূহকে কার্যকরী করার জন্য অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করা হয়। ফলে অতি সহজেই সরকার ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে।

কঠোরতা অবলম্বনে সহায়ক

একনায়কতন্ত্রের উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলে একথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের চরম বিরোধী, শুধু তাই নয় আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও প্রগতির বিরোধী বলে একনায়কতন্ত্র মানবসভ্যতার চিরশত্রু রূপে বিবেচিত হয়।

১৭। একনায়কতন্ত্রের গুণাগুণ (Merits and Defects of Dictatorship)

গুণ ঃ একনায়কতন্ত্রের সমর্থকেরা তাঁদের সমর্থিত শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ প্রমাণ করার জন্য নানাপ্রকার যুক্তির অবতারণা করেন। এই যুক্তিগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হোল ঃ

(১) একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রকৃতিগতভাবে সুদক্ষ হয়। কারণ সুযোগ্য নায়কের একক নির্দেশে শাসনকার্যাদি পরিচালিত হয়। একনায়ক সুযোগ্য ও সুদক্ষ হওয়ার জন্য দেশের ভিন্নমুখী জটিল সমস্যাসমূহের দ্রুত সমাধান সম্ভব। ওয়েমার শাসনতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা জার্মান জাতির নানাবিধ সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হলে হিটলার ক্ষমতালাভ করে সেই সব দুরূহ সমস্যার সমাধান করেছিলেন।

সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা

(২) যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ, আভ্যন্তরীণ গোলযোগ প্রভৃতি জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেগুলি কার্যকরী করার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। একনায়কতন্ত্রে নায়কের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তাই জরুরী অবস্থার পক্ষে একনায়কতন্ত্র বিশেষ উপযোগী বলে মনে করা হয়।

জরুরী অবস্থার পক্ষে বিশেষ উপযোগী

(৩) একনায়কতন্ত্রে একটিমাত্র দল থাকায় দলীয় সংঘর্ষ, নির্বাচনে জয়লাভের জন্য প্রচুর অর্থের অপচয় প্রভৃতি দলীয় শাসনের কুফলগুলি প্রত্যক্ষ করা যায় না।

দলীয় শাসনের কুফলমুক্ত

(৪) এরূপ শাসনব্যবস্থায় দেশশাসনের জন্য নায়ক সুযোগ্য ব্যক্তিগণের উপর সরকারী কার্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। ফলে সরকারী কার্যে সাফল্য আসে। তাছাড়া, একনায়কতন্ত্রে একটি দল থাকায় দলত্যাগ, রাজনৈতিক দলাদলি, বিভিন্ন স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকে না। ফলে একনায়কতন্ত্র স্থায়িত্ব লাভ করে।

স্থায়িত্ব

(৫) একনায়কতন্ত্রের মূল নীতি হোল এক জাতি, এক রাষ্ট্র এবং এক নায়ক। নায়ক দেশের জনগণের মধ্যে জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের কথা প্রচার করে জাতীয় ঐক্যবোধ জাগরিত করেন। জনগণ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়। হিটলার জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্বের কথা প্রচার করে জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাবাদ

সৃষ্টি করতে সমর্থ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি হলে জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের পথ প্রশস্ত হয়।

(৬) অনেকের মতে, এরূপ শাসনব্যবস্থায় নায়কের ইচ্ছাই চূড়ান্ত বলে তিনি যদি শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রভৃতির অনুরাগী হন তাহলে ঐ সব ক্ষেত্রে প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হতে পারে।

শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির উন্নতি

দোষ : [ক] একনায়কতন্ত্রে আলাপ-আলোচনা ও ভাববিনিময়ের কোন সুযোগ নেই বলে এখানে ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। এরূপ শাসনব্যবস্থায় জনগণের স্বাধীনতার কোন মূল্য নেই। এখানে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটে না; আত্মসম্মান ও আত্মপ্রত্যয়বোধ জাগ্রত হয় না।

স্বাধীনতার পরিপন্থী

[খ] এরূপ শাসনব্যবস্থায় একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকায় জনগণ অন্য কোন দলের প্রতি তাদের সমর্থন জানাবার সুযোগ পায় না। অন্য সব দলের কার্যকলাপ নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে দেশের সমস্যাবলী সম্পর্কে পরস্পর-বিরোধী আলোচনার কোন সুযোগ থাকে না। ফলে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে না।

রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে না

[গ] একনায়কতন্ত্র সাম্য ও সমানাধিকারের নীতিতে আস্থাশীল নয়। তাই এরূপ শাসনব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় ব্যক্তি দেশ শাসন করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে বিনা প্রতিবাদে তাদের সেই স্বৈরাচারী জনস্বার্থ-বিরোধী শাসন অবনত মস্তকে মেনে নিতে হয়।

সাম্য-বিরোধী

[ঘ] একনায়কতন্ত্রের ভিত্তি হোল পশুবল। শক্তির জোরে, বলপ্রয়োগের দ্বারা নায়ক তাঁর শাসনকে স্থায়িত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেন। বিরোধী নেতাদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য নির্বাসন, কারাদণ্ড, এমনকি গুপ্তহত্যার আশ্রয় নিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন না। এইভাবে পুলিস ও মিলিটারীর সাহায্যে বলপূর্বক জনগণকে তাঁর অত্যাচারী, জনবিরোধী শাসন মেনে নিতে বাধ্য করেন।

পশুবলের উপর নির্ভরশীল

[ঙ] এরূপ শাসনব্যবস্থায় জনমতের কোন মূল্য থাকে না। শাসিতের সম্মতির উপর শাসকের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় না। ন্যায়বিচারের বাণী এখানে 'নীরবে নিভৃতে কাঁদে'; মানুষের মনুষ্যত্ব এখানে পদদলিত। কিন্তু সুদীর্ঘকাল এরূপ শাসনব্যবস্থা জনগণ কখনই মাথা পেতে মেনে নিতে পারে না। তাদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ একদিন বিপ্লবের আকার ধারণ করে এরূপ শাসনব্যবস্থার ধ্বংসসাধন করে।

বিপ্লবের সমূহ সম্ভাবনা থাকে

[চ] একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রই প্রধান; মানুষের কোন মূল্য নেই। একনায়কতন্ত্র প্রচার করে যে, জন্ম থেকেই ব্যক্তি রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তি নয়; ব্যক্তির জন্যই রাষ্ট্র। উপলক্ষকে 'আসল' বলে বর্ণনা করে একনায়কতন্ত্র সত্যোপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে সমালোচনা করা হয়।

মানুষ উপেক্ষিত

[ছ] একনায়কতন্ত্র মানুষের স্বায়ত্তশাসনকে উপেক্ষা করে বলে তা কখনই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। একনায়কতন্ত্র যতই সু-শাসন-ব্যবস্থা হোক্ না কেন, তা কখনই স্বায়ত্তশাসনের বিকল্প হতে পারে না।

স্বায়ত্তশাসন অস্বীকৃত

[জ] একনায়কতন্ত্রের অন্যতম তত্ত্ব হোল পৃথিবীতে বাঁচবার অধিকার কেবল শক্তিমানেরই আছে। একনায়কতন্ত্রের পূজারীরা বলেন, স্ত্রীলোকের নিকট মাতৃত্ব যেমন কাম্য, পুরুষের নিকট যুদ্ধও তেমনি কাম্য। মুসোলিনীর মতে, আন্তর্জাতিক শান্তি হোল কাপুরুষের স্বপ্ন—সাম্রাজ্যবাদ হোল 'জীবনের শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয় নিয়ম।' তাই একনায়কগণ জনগণকে চমৎকৃত করার জন্য উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রচার করেন। এই উগ্র জাতীয়তাবাদেরই সন্তান হোল সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের যুগে যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী আদর্শকে কোনমতেই সমর্থন করা যায় না।

বিশ্বশান্তির পরিপন্থী

[ঝ] বিশেষ কোন একজন নায়ক সৎ, সুদক্ষ ও জনকল্যাণকামী হলেও তাঁর মৃত্যুর পর যিনি ক্ষমতার অধিকারী হবেন তিনিও যে অনুরূপ গুণসম্পন্ন হবেন এমন কোন কথা নেই। একনায়কতন্ত্রের ইতিহাসই এই যুক্তির প্রধান সাক্ষী।

সুযোগ্য নায়কের মৃত্যুর পর অনুরূপ নায়ক পাওয়া কষ্টকর

[ঞ] একনায়কতন্ত্রে শাসনক্ষমতা একজনমাত্র লোকের হস্তে ন্যস্ত থাকে। কিন্তু বৃহদায়তন রাষ্ট্রের এক প্রান্তে বসে তাঁর পক্ষে সমগ্র দেশের শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা অসম্ভব।

বৃহদায়তন রাষ্ট্রের পক্ষে অনুপযোগী

পরিশেষে বলা যায় যে, একনায়কতন্ত্রে শাসকগোষ্ঠী একটি বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীতে পরিণত হয় এবং কালক্রমে নিজেদের জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক অভিজাত শ্রেণীতে উন্নীত করে। জনসাধারণের প্রতি কোন দায়িত্ব না থাকায় জনস্বার্থ উপেক্ষিত হয় এবং শাসকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থ ভিন্ন অন্য কোন স্বার্থ রক্ষা করে না। নিজেদের বিশেষ সুবিধা রক্ষার জন্য জনগণের ন্যূনতম সামাজিক ও অন্যান্য অধিকারকে পদদলিত করতে তারা দ্বিধাবোধ করে না। এইসব কারণে গণতন্ত্র-বিরোধী একনায়কতন্ত্রকে বর্তমান শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা বড় অভিশাপ বলে গ্রহণ করাই সমীচীন।

উপসংহার

৮। উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য (**Distinction between Liberal Democracy and Dictatorship**)

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র দুটি পরস্পর-বিরোধী রাজনৈতিক আদর্শ। স্বাভাবিক-ভাবেই উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মধ্যে সর্বক্ষেত্রেই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পার্থক্যগুলিকে বৈশিষ্ট্য এবং গুণগত দিক থেকে আলোচনা করা যেতে পারে।

(১) উদারনৈতিক গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত। তাই গণতন্ত্রকে

জনমত-পরিচালিত শাসনব্যবস্থা বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে জনমতের কোন মূল্য নেই। জনগণ শাসনকার্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না। এখানে একজনমাত্র শাসকের অপ্রতিহত প্রাধান্য সর্বত্রই বিদ্যমান থাকে।

গণতন্ত্র জনগণের, কিন্তু একনায়কতন্ত্র একজনের শাসন

(২) উদারনৈতিক গণতন্ত্রে জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজন বলে মনে করা হয় কিন্তু একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তির পরিবর্তে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বের কথা বলা হয়। এরূপ শাসনে জন্ম থেকেই ব্যক্তি রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত বলে প্রচার করা হয়।

গণতন্ত্রে ব্যক্তি, কিন্তু একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্র বড়

(৩) উদারনৈতিক গণতন্ত্রে একাধিক রাজনৈতিক দল অপরিহার্য। এরূপ শাসনব্যবস্থায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। সরকারের ভুলত্রুটির সমালোচনা করে বিরোধী দল নিজ অনুকূলে জনমত গঠন করতে পারে। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে নায়কের দল ছাড়া অন্য সব দলের অস্তিত্ব বলপূর্বক বিলুপ্ত করা হয়। কারাদন্ড, মৃত্যুদন্ড, গুপ্তহত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে বিরোধী নেতৃবৃন্দের কণ্ঠরোধ করে একনায়ক নিজের অত্যাচারী শাসনকে নিরঙ্কুশ করার ব্যবস্থা করেন।

গণতন্ত্রে একাধিক দল কিন্তু একনায়কতন্ত্রে একটি মাত্র দল থাকে

(৪) জনগণের রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার স্বীকৃতি গণতন্ত্রের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে মানুষের সকল প্রকার স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা হয়। এরূপ শাসনব্যবস্থায় মানুষের দেহ ও মনের উপর সম্পূর্ণ সামরিকীকরণ চলে।

গণতন্ত্র ব্যক্তি-স্বাধীনতার অনুপন্থী, একনায়কতন্ত্র পরিপন্থী

(৫) গণতন্ত্র বিশ্বশান্তিতে বিশ্বাসী। সর্বপ্রকার বলপ্রয়োগ গণতন্ত্রের নীতি-বিরুদ্ধ। কিন্তু একনায়কতন্ত্র উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রচারের মাধ্যমে বিশ্বে অশান্তিকে আহ্বান করে। মুসোলিনী বলতেন, "স্ত্রীলোকের নিকট মাতৃত্ব যেমন কাম্য, পুরুষের নিকট যুদ্ধও তেমনি কাম্য।"

গণতন্ত্র বিশ্ব-শান্তিতে বিশ্বাসী, কিন্তু একনায়কতন্ত্র তা নয়

(৬) উদারনৈতিক গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে তাদের প্রতিনিধিরাও অনুরূপ চরিত্রবিশিষ্ট হন। ফলে শাসনব্যবস্থা কার্যতঃ অক্ষম ও অশিক্ষিতের শাসনে পর্যবসিত হয়। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে সুযোগ্য ও সুদক্ষ নায়কের একক নেতৃত্বে শাসনকার্য পরিচালিত হয় বলে তা দেশের ভিন্নমুখী সমস্যার দ্রুত সমাধানের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলে মনে করা হয়।

গণতন্ত্র অদক্ষ শাসন, কিন্তু ঐকনায়কতন্ত্র সুদক্ষ শাসন

(৭) উদারনৈতিক গণতন্ত্রে আলাপ-আলোচনা, ভোটাভুটি প্রভৃতির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বলে যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ, অভ্যন্তরীণ গোলযোগ প্রভৃতি জরুরী অবস্থার পক্ষে এরূপ শাসনব্যবস্থা অনুপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে নায়কের একক সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং সেখানে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় না বলে এরূপ শাসনব্যবস্থা জরুরী অবস্থার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

গণতন্ত্র জরুরী অবস্থার পক্ষে অনুপযোগী, কিন্তু একনায়কতন্ত্র উপযোগী

(৮) উদারনৈতিক গণতন্ত্র দলীয় শাসন বলে এরূপ শাসনব্যবস্থায় দলীয় সংঘর্ষ, ভোট ক্রয়-বিক্রয়, নির্বাচনে অর্থের অপচয় প্রভৃতি দলীয় শাসনের কুফলগুলি দেখা যায়। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকায় এরূপ শাসনব্যবস্থায় দলীয় শাসনের কুফল প্রত্যক্ষ করা যায় না।

দলীয় শাসনের কুফল গণতন্ত্রে আছে, কিন্তু একনায়কতন্ত্রে নেই

(৯) উদারনৈতিক গণতন্ত্র সাম্য সমানাধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার নীতিসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। এরূপ শাসনব্যবস্থায় ধর্ম, বর্ণ, জাতি, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সমান। রাষ্ট্র মানুষে মানুষে কোন ভেদবিচার করে না। প্রত্যেকের ব্যক্তিস্বাধীনতা এখানে স্বীকৃত। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে এইসব গণতান্ত্রিক নীতি সম্পূর্ণভাবেই উপেক্ষিত হয়। এই শাসনব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠরা বিনা প্রতিবাদে নিজেদের স্বার্থের পরিপন্থী শাসন মেনে নিতে বাধ্য।

গণতন্ত্র সাম্য ও স্বাধীনতার নীতিতে বিশ্বাসী, কিন্তু একনায়কতন্ত্র এতে বিশ্বাসী নয়

(১০) উদারনৈতিক গণতন্ত্র দলীয় শাসনব্যবস্থা বলে পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের সংঘাত, দলত্যাগ প্রভৃতির ফলে বারংবার সরকারের পরিবর্তন হয়। স্থায়িত্বের অভাব গণতন্ত্রের অন্যতম ত্রুটি। কিন্তু একনায়কতন্ত্র একদলীয় শাসন বলে দলত্যাগ, রাজনৈতিক দলাদলি, পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রভৃতি এখানে থাকে না। সুযোগ ও সুদক্ষ নায়কের বজ্রকঠিন নেতৃত্ব এরূপ শাসনব্যবস্থার স্থায়িত্বকে নিশ্চিত করে তোলে।

গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব নেই: একনায়কতন্ত্রের আছে

(১১) উদারনৈতিক গণতন্ত্র জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা। জনগণ ইচ্ছা করলেই সরকারের পরিবর্তন করতে পারে। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে জনসম্মতির পরিবর্তে পশুবলের উপর শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। পুলিস, মিলিটারী প্রভৃতির সাহায্যে নায়ক বলপূর্বক জনগণকে তাঁর অত্যাচারী শাসন মেনে নিতে বাধ্য করেন।

গণতন্ত্র গণসম্মতির এবং একনায়কতন্ত্র পশুবলের উপর নির্ভরশীল

(১২) উদারনৈতিক গণতন্ত্রে জনগণের স্বায়ত্তশাসন স্বীকৃত; কিন্তু একনায়কতন্ত্রে জনগণের এই অধিকার সম্পূর্ণভাবে অস্বীকৃত। তাই বলা হয়, একনায়কতন্ত্র যতই সুশাসন হোক না কেন, তা কখনই স্বায়ত্তশাসনের বিকল্প বলে বিবেচিত হতে পারে না। জেমস্ মিল তাই গণতন্ত্রকে 'আধুনিক কালের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার' বলে বর্ণনা করেছেন।

স্বায়ত্তশাসন গণতন্ত্রে স্বীকৃত, একনায়কতন্ত্রে অস্বীকৃত

(১৩) উদারনৈতিক গণতন্ত্রে জনগণ ব্যালটের সাহায্যে শান্তিপূর্ণভাবে সহজেই সরকারের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। তাই এরূপ শাসনব্যবস্থা অনেকাংশে বিপ্লবের সম্ভাবনামুক্ত বলা যেতে পারে। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে শান্তিপূর্ণভাবে কখনই সরকারের পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাই জনগণের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ একদিন বিপ্লবের আকার ধারণ করে এরূপ শাসনব্যবস্থার ধ্বংসসাধন করে।

গণতন্ত্র বিপ্লবের সম্ভাবনামুক্ত কিন্তু একনায়কতন্ত্র তা নয়

(১৪) উদারনৈতিক গণতন্ত্র জনগণের শাসন বলে বৃহদায়তন রাষ্ট্রের পক্ষে তা বিশেষ উপযোগী। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে জনগণের কোন ভূমিকা নেই। একজনমাত্র শাসকের পক্ষে সমগ্র দেশের শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা অসম্ভব। তাই বৃহদায়তন রাষ্ট্রের পক্ষে একনায়কতন্ত্র বিশেষ অনুপযোগী বলে মনে করা হয়।

বৃহদায়তন রাষ্ট্রের পক্ষে গণতন্ত্র উপযোগী কিন্তু একনায়কতন্ত্র নয়

উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে মন্তব্য করা যায় যে, গণতন্ত্র নিঃসন্দেহে একনায়কতন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা। কিন্তু উদারনৈতিক গণতন্ত্র কার্যক্ষেত্রে ধনিক-বণিক শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত হয়ে জনস্বার্থ উপেক্ষা করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কার্যতঃ এখানে বিশেষ কোন ভূমিকা থাকে না। সেদিক থেকে বিচার করে বলা যেতে পারে যে, জনগণের প্রকৃত সার্বভৌমত্ব কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এরূপ সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের উপর জনগণের নিয়ন্ত্রণ থাকে। তাই রাজনৈতিক ব্যবস্থাও জনগণের দ্বারা পরিচালিত হয়।

১৯। ফ্যাসিবাদ (Fascism)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গর্ভ থেকে পরস্পর-বিরোধী দুটি সন্তান জন্মলাভ করে। একটি হোল বহুত্ববাদ (Pluralism)—যা চরম রাষ্ট্রের (Absolutist State) ধারণার বিরোধী এবং অপরটি হোল ফ্যাসিবাদ (Fascism)—যা সর্বাত্মক ও সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের ধারণায় আস্থাশীল। মানব-ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা কলঙ্কময় অধ্যায়ের সূচনা করেছিল ফ্যাসিবাদ। ফ্যাসিবাদের জন্মরহস্য জটিল। ইতালীতে আত্মপ্রকাশের পূর্বে ফিনল্যান্ড, হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড, জার্মানি প্রভৃতি দেশে ফ্যাসিবাদের অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল। কিন্তু ইতালীতেই সর্বপ্রথম ফ্যাসিবাদ একটি পাল্টা সমাজ-রাজনীতি হিসেবে আদর্শগত কাঠামো উপস্থিত করতে সক্ষম হয়। কারণ সেখানে দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ পচা-গলা সমাজব্যবস্থার পরিবর্তে মেহনতী জনতার রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। "কিন্তু সংশোধনবাদী নেতৃত্ব সেই সম্ভাবনাকে পেছনের দিকে ঠেলে দেয় এবং অগ্রগতিকে বাধা দেয়। এই দুর্বলতা ফ্যাসিবাদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দেয়।" ইতালীয় ফ্যাসিবাদ বিপ্লব প্রতিরোধকারী প্রতিবিপ্লবী শক্তির নমুনারূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছে। ১৯১৯ সালে ফ্যাসিবাদের জন্ম। সোশালিস্ট পার্টির একদা-উগ্র সমর্থক হিসেবে পরিচিত বেনিটো মুসোলিনী (Benito Mussolini) ছিলেন ইতালীয় ফ্যাসিবাদের জনক। ১৯১৯ সালে তিনি মিলানে 'ফ্যাসিও ডি কমবাস্টিমেন্টো' (Fascio di Combanttimento) নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। ইতালীতে এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফ্যাসিবাদের সূত্রপাত হয়। ১৯২০ সালের শেষার্ধ থেকে ফ্যাসীবাদের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইতালীয় কমিউনিস্টদের ঠেকাবার জন্য পুলিস, মিলিটারী ও সরকারের বিচার বিভাগ ফ্যাসিস্টদের নানাভাবে সহায়তা করতে থাকে। জি. প্রেজোলিনী তাঁর 'লা ফ্যাসিজম' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিখেছেন "তারা (ফ্যাসিস্টরা) সশস্ত্র বাহিনীরূপে চলাফেরা করতে পারতো, খুশিমত হত্যা করতে পারতো। তারা নিশ্চিত ছিল যে, তাদের

ইতালীতে ফ্যাসিবাদের উদ্ভবের পটভূমি

বিরুদ্ধে পুলিস কিছু করবে না।" এককথায়, ফ্যাসিস্টরা সমগ্র ইতালীতে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। ১৯২২ সালের ২৮শে অক্টোবর ফ্যাসিস্টদের 'রোম অভিযান' (March on Rome) শুরু হয়। ৩০শে অক্টোবর মুসোলিনী রোমে গিয়ে উপস্থিত হন। ইতিমধ্যে দেশে মার্শাল আইন (Martial Law) জারি করা হয়। মন্ত্রিসভা আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে এই অজুহাতে মার্শাল আইন ঘোষিত হয়। ফ্যাসিস্ট বাহিনী অফিস, আদালত, রেল, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি দখল করে নেবার পর মার্শাল আইন প্রত্যাহৃত হয়। মুসোলিনী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অভিষিক্ত হলেন। সংক্ষেপে এই হোল ইতালীতে ফ্যাসিবাদী অভ্যুত্থানের ইতিবৃত্ত।

জর্জি ডিমিট্রভের মতে, "ফ্যাসিবাদ এমন কোন রাষ্ট্রশক্তি নয় যা বুর্জোয়া ও শ্রমিক শ্রেণীর ঊর্ধ্বে, অথবা পেটি-বুর্জোয়াদের বিদ্রোহ নয়।...নিম্ন মধ্যবিত্ত অথবা লুম্পেন প্রলেতারিয়েতের সরকার নয়। ফ্যাসিবাদ হচ্ছে লগ্নী পুঁজির কর্তৃত্ব। এ হচ্ছে শোষিত শ্রেণীর বিরুদ্ধে লগ্নী পুঁজিবাদীদের সন্ত্রাসবাদী প্রতিশোধ। পররাষ্ট্র নীতিতে ফ্যাসিবাদ উগ্র জাতীয়তাবাদ, জাতি-বিদ্বেষ ও অন্য রাষ্ট্রের প্রতি বৈরী মনোভাব জাগিয়ে তোলে। ফ্যাসিবাদ লগ্নী পুঁজিবাদের এমন এক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন যা শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক এবং বুদ্ধিজীবীদের বিপ্লবী অংশের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।" রজনী পাম দত্ত (R. P. Dutta)-র মতে, ফ্যাসিবাদ শোধনবাদের সন্তান। বুর্জোয়া শাসনযন্ত্রের অপব্যবহার, শ্রমিক শ্রেণী ও গণতান্ত্রিক শক্তির অধিকারগুলি খর্ব করার জন্য জরুরী অবস্থা ইত্যাদির দোহাই দিয়ে এবং জরুরী অবস্থার পরিস্থিতি তৈরি করে শোষণবাদের দ্বারা যখন শ্রমিক শ্রেণীকে দুর্বল করে দেওয়া সম্ভব হয়, যখন তার সংগ্রাম ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং নিয়মতন্ত্রের পথে বিভ্রান্ত করা সম্ভব হয়, অর্থাৎ যখন উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়, তখন নাটকীয়ভাবে শেষ আক্রমণের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্র ক্ষমতায় আসে। ১৯২৮ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যসূচীতে ফ্যাসিবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলা হয়, "ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা হচ্ছে সরাসরি একনায়কতন্ত্র। তার আদর্শবাদের মুখোশ হোল 'জাতীয় ভাবধারা' এবং বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধিত্ব (আসলে বুর্জোয়াদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব)। এ এমন এক ব্যবস্থা, যার উদ্দেশ্য হোল বিশেষ ধরনের সামাজিক বাগাড়ম্বরের রূপ গ্রহণ করে (জাতি-বিরোধিতা, কখনো সুদের কারবারীদের বিরোধিতা এবং পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার প্রতি অসহিষ্ণুতা দেখিয়ে 'টকিং শপ' বলা), নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং বুদ্ধিজীবীদের অসন্তোষকে কাজে লাগানো এবং দুর্নীতির সুযোগ নিয়ে ভাল বেতনে ফ্যাসিস্টদের মন্ত্রশিষ্যদের ইউনিট গড়ে তোলা এবং আমলাতন্ত্রকে দলীয় কাজে ব্যবহার করা। একই সময়ে ফ্যাসিবাদ শ্রমিকদের পিছিয়ে-পড়া অংশকে দলে টেনে তাদের অসন্তোষকে খেলিয়ে এবং সোশ্যাল ডেমোক্রেসীর নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করতে থাকে। আর. পি. দত্তের মতে, "বাস্তবিকপক্ষে ফ্যাসিবাদ ধনতন্ত্রের বিকল্প ও স্বতন্ত্র পথ নয় এবং বর্তমান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধিতা থেকে উদ্ভূত হচ্ছে না। পরন্তু ধনতন্ত্রের অনিবার্য পরিণতি ও পূর্ণতা এবং চরম সঙ্কটের রূপ আধুনিক ধনতন্ত্রের বিশেষ ধরন।" কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসের প্রস্তাবে বলা

ফ্যাসিবাদের সংজ্ঞা

হয়েছিল যে, কম বেশী মাত্রায় ফ্যাসিবাদের বীজানু প্রায় সব ধনতান্ত্রিক দেশেই প্রত্যক্ষ করা যায়। ফ্যাসিবাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে জর্জি ডিমিট্রভ বলেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদীচক্র তাদের সঙ্কটের সব বোঝা শোষিত মানুষের ঘাড়ের উপর চাপাতে চায় বলেই তাদের দরকার ফ্যাসিবাদ। তারা তাদের বাজার সম্প্রসারণ-সমস্যার সমাধান করতে চায় দুর্বল দেশসমূহকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বেঁধে, ঔপনিবেশিক নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি করে এবং যুদ্ধের দ্বারা দুনিয়াকে পুনর্বিভক্ত করে। এসব কাজের জন্যই প্রয়োজন হয় ফ্যাসিবাদের। যাতে বিপ্লবী শক্তিগুলির বৃদ্ধি না হয় সেজন্য তারা সাধ্যমতো চেষ্টা করে। শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলনকে ধ্বংস করে দেবার জন্য ওরা উঠে পড়ে লেগে যায়।

ফ্যাসিবাদকে একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ রাজনৈতিক তত্ত্ব বলে অভিহিত করলে ভুল করা হবে। ইতালীর রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করার সমর্থনে মুসোলিনী একটি রাজনৈতিক দর্শনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই জেনটিলে (Giovanni Gentile) নামে জনৈক হেগেলীয় দার্শনিকের সহায়তায় তিনি জোড়াতালি দিয়ে ফ্যাসিবাদী দর্শন প্রচার করেন। ফ্যাসিবাদী মতবাদের দুর্বলতা সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন বলেই সম্ভবতঃ তিনি বলেছিলেন, "আমি কাজে বিশ্বাস করি—কথায় নয়" (My programme is action, not talk.)।

ফ্যাসিবাদ সামঞ্জস্যপূর্ণ রাজনৈতিক তত্ত্ব নয়

রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করেই সমগ্র ফ্যাসিবাদী তত্ত্ব গড়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, প্রকৃতি ও কর্তব্যই হোল ফ্যাসিবাদের কেন্দ্রবিন্দু। ফ্যাসিবাদীরা সমাজ বলতে জাতি (nation), এবং জাতি বলতে রাষ্ট্র বোঝাতেন। ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র হোল এমন একটি স্বাধীন সত্তা যার নিজস্ব প্রকৃত ইচ্ছা (real will) আছে। রাষ্ট্রের প্রকৃত ইচ্ছা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনগণের ইচ্ছার (popular) থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র নিজেই নিজের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন; তার নিজস্ব ইচ্ছা এবং ব্যক্তিত্ব দুই-ই বর্তমান। এই রাষ্ট্র জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ প্রতীক। জাতির আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রই হোল জনগণের নৈতিকতার পূর্ণ প্রকাশস্থল। এই রাষ্ট্র প্রকৃতিগতভাবে চরম সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তাই ব্যক্তি-জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তার অপ্রতিহত প্রাধান্য বর্তমান থাকা স্বাভাবিক। ব্যক্তিগত স্বার্থ রাষ্ট্রের উচ্চ-স্বার্থের (highest interest) অধীন। যেহেতু রাষ্ট্রই চরম লক্ষ্য সেহেতু রাষ্ট্রের অধীনে ব্যক্তিসত্তাকে স্থাপন করা প্রতিটি ব্যক্তির পবিত্র কর্তব্য। মুসোলিনী বলতেন, "রাষ্ট্রের মধ্যেই সবকিছু, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কিছু হতে পারে না; রাষ্ট্রের বাইরেও কিছু হতে পারে না. (Everything within the state, nothing against the state; nothing outside the state.)। অন্যভাবে বলা যায়, রাষ্ট্রের কার্যে সকলকেই আত্মনিয়োগ করতে হবে। রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য শ্রমিক, পুঁজিপতি সকলকেই সহযোগিতা করতে হবে। এইভাবে শ্রেণীদ্বন্দ্বের তত্ত্ব অপেক্ষা শ্রেণী-সমন্বয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করা সম্ভব বলে ফ্যাসিবাদ বিশ্বাস করত।

ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্রের স্বরূপ

ফ্যাসিবাদ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অপেক্ষা রাষ্ট্রশক্তির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করত। জাতির শক্তি-সামর্থ্যের উপর জনগণের স্বাধীনতা নির্ভরশীল বলে ফ্যাসিস্টরা মনে করত। তাদের মতে, স্বাধীনতা জনগণের অধিকার নয়, কর্তব্য (Liberty is not right, but a duty.)। আইন এবং রাষ্ট্রই হোল স্বাধীনতার সর্বপ্রধান প্রকাশস্থল। রাষ্ট্রের ইচ্ছার সঙ্গে একাত্মতা স্থাপনের মাধ্যমেই কেবলমাত্র ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব। রাষ্ট্রের দাসত্ব মান্য করাকেই ফ্যাসিস্টরা স্বাধীনতা বলে মনে করে। এইভাবে ফ্যাসিবাদ স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বকে কর্তব্য, শৃঙ্খলা এবং আত্মবলিদানের সঙ্গে অভিন্ন বলে বর্ণনা করে।

ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতার স্থান

ফ্যাসিবাদ মনে করে যে, জনসাধারণ কখনই সার্বভৌমিকতার অধিকারী হতে পারে না। জাতীয় রাষ্ট্রই হোল সার্বভৌম কর্তৃত্বের প্রকৃত অধিকারী। জাতির উন্নতিবিধানের জন্য জাতীয় রাষ্ট্রের হাতে অপ্রতিহত কর্তৃত্ব থাকা একান্তভাবেই বাঞ্ছনীয়। জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য বাছাই-করা কয়েকজন ব্যক্তিকে নিয়ে সরকার গঠিত হবে। কারণ জাতীয় স্বার্থ কিভাবে সংরক্ষিত হতে পারে সে বিষয়ে আপামর জনসাধারণের কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নেই। স্বাভাবিকভাবেই এই দায়িত্ব ন্যস্ত হয় কয়েকজন মাত্র অভিজাত ব্যক্তির হস্তে। তাঁরাই জাতির সর্বোচ্চ ভাগ্যনিয়ন্তা। তাদের ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন দলের সর্বোচ্চ নেতা। তিনি দেবতুল্য ব্যক্তি—তাঁর মাধ্যমে রাষ্ট্রের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয়। তিনি কখনই কোন ভুল করতে পারেন না। 'মুসোলিনী সর্বদাই সঠিক কাজ করেন' (Mussolini is always right.)—এটি ছিল ফ্যাসিস্টদের বিচিত্র শ্লোগান। এইভাবে এক জাতি, এক রাষ্ট্র, এক দল এবং এক নেতা—এই আদর্শের ভিত্তিতে ফ্যাসিবাদ গড়ে উঠে।

ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে সরকারের স্বরূপ

জাতীয় রাষ্ট্রের উন্নতি সাধনের জন্য তার বিস্তারসাধন প্রয়োজন। এই বিস্তার-সাধনের জন্য যুদ্ধকে ফ্যাসিবাদ সাদরে আহ্বান জানিয়েছে। মুসোলিনীর ভাষায়, "ইতালীকে অবশ্যই সম্প্রসারিত করতে হবে, নইলে তার অপমৃত্যু অনিবার্য" (Italy must expand or perish.)। তাই ফ্যাসিস্টরা শান্তিবাদের বিরোধী। মুসোলিনী বলতেন, "স্ত্রী-লোকের নিকট মাতৃত্ব যেমন স্বাভাবিক, পুরুষের নিকট যুদ্ধও তেমনি স্বাভাবিক।" মুসোলিনীর চোখে 'আন্তর্জাতিক শান্তি হোল পুরুষের স্বপ্ন'। তাই সাম্রাজ্যবাদকে তিনি 'মানবজীবনের শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয় নিয়ম' (eternal and immutable law of life) বলে বর্ণনা করেছেন।

জাতীয় রাষ্ট্রের প্রয়োজনে যুদ্ধ অপরিহার্য

এইভাবে ফ্যাসীবাদ একটিমাত্র দলকে—ফ্যাসিস্ট দলকে—রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নিয়ামকের পদে স্থাপন করে বলপূর্বক অন্যান্য রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করার চেষ্টা করে। কেবলমাত্র ফ্যাসিস্ট দলই রাষ্ট্রের বিবেক হিসেবে কাজ করতে পারে বলে প্রচার করে ফ্যাসিবাদ সর্বাত্মক একদলীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। ফ্যাসিবাদী যৌথ রাষ্ট্রের (Corporate State) ধারণা প্রচারের মাধ্যমে একদিকে যেমন ব্যক্তি-জীবনের সর্বক্ষেত্রেই সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের কর্মপরিধিকে

যৌথ রাষ্ট্রের ধারণা

পরিব্যাপ্ত করেছে, অন্যদিকে তেমনি ফ্যাসিবাদী দলকে সেই রাষ্ট্রের প্রধান কর্ণধার বলে প্রচার করে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করেছে।

উদাহরণ

হিটলারের নেতৃত্বাধীন নাৎসী জার্মানি, ফালাঞ্জিস্ট (Falangist)-শাসিত স্পেন, কুয়োমিনটাং (Kuomintang) দলের অধীনে চীন, পেরোনিস্ট (Peronist)-কবলিত আর্জেন্টিনা ইত্যাদি হোল ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের উদাহরণ।

সমালোচনা : নানাদিক থেকে ফ্যাসিবাদের সমালোচনা করা হয়।

গণ-সার্বভৌমিকতা উপেক্ষিত

(১) ফ্যাসিবাদ রাষ্ট্রকে চরম, অভ্রান্ত ও সর্বশক্তিমান বলে বর্ণনা করে কার্যক্ষেত্রে জনগণের সার্বভৌমিকতাকে উপেক্ষা করেছে। রাষ্ট্রশাসনের ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কয়েকটি ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করে ফ্যাসিবাদ জনগণের সার্বভৌমিকতাকে উপেক্ষা করেছে। সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র ফ্যাসিবাদী দল ছাড়া অন্য সব রাজনৈতিক দলকে সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে ধ্বংস করার জঘন্য প্রচেষ্টাকে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী কোন মানুষ সমর্থন করতে পারেন না। বস্তুতঃ এক জাতি, এক রাষ্ট্র, এক দল এবং এক নেতা—এই শ্লোগানের মধ্যেই আত্মগোপন করে আছে ফ্যাসিবাদের অগণতান্ত্রিক হিংস্র রূপ।

স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণা ভ্রান্ত

(২) ফ্যাসিবাদী তত্ত্ব অনুসারে, রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে আত্ম-বলিদান করলেই মানুষ তার স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে। হেগেলীয় দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এই মতবাদ স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর প্রতি বিনম্রচিত্তে আত্মসমর্পণ করাকে স্বাধীনতা বলে বর্ণনা করে কার্যক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে ধ্বংস করেছে। বস্তুতঃ স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বকে এরা কর্তব্য, শৃঙ্খলাবোধ ও আত্মবলিদানের পরিবর্তে বলে বর্ণনা করে ব্যক্তিস্বাধীনতার হন্তারক এবং গণতন্ত্রের ধ্বংসকারী হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়েছে।

যুদ্ধবাজ ও সাম্রাজ্যবাদী আদর্শ

(৩) ফ্যাসিবাদী জাতীয় রাষ্ট্রের সম্প্রসারণের জন্য যুদ্ধকে মানবজীবনের স্বাভাবিক ও শাশ্বত নিয়ম বলে ঘোষণা করে যুদ্ধবাজ ও সাম্রাজ্যবাদী আদর্শ হিসেবে পরিচিত হয়েছে। এইভাবে ফ্যাসিবাদ আন্তর্জাতিকতার শত্রু হিসেবে, মানবসভ্যতার বিধ্বংসকারী হিসেবে বিশ্ব-বিবেকের কাছে ধিকৃত হচ্ছে।

লগ্নীপুঁজির সন্ত্রাস-বাদী একনায়কতন্ত্র

(৪) সর্বোপরি, মার্কসবাদীদের মতে, ফ্যাসিবাদ হোল লগ্নী পুঁজির সন্ত্রাসবাদী একনায়কতন্ত্র (terrorist dictatorship of monopoly capital)। ধনতন্ত্রবাদের সঙ্কটময় অবস্থা যখন চরমতম আকার ধারণ করে তখনই তা নগ্নভাবে ফ্যাসিবাদ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ধনতান্ত্রিক সমাজে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য ফ্যাসিবাদীদের সর্বপ্রকার সাহায্য করে যাতে দেশে শ্রমিক আন্দোলন জয়লাভ করতে না পারে। সুতরাং ফ্যাসিবাদ হোল ধনতন্ত্রবাদের সর্বাপেক্ষা হিংস্র ও ভয়ঙ্কর স্তর—যা প্রকৃতিগত-ভাবে চরম প্রতিক্রিয়াশীল এবং প্রতি-বিপ্লবী একটি আন্দোলন।

"বিশ থেকে ত্রিশ দশকে হিটলার, মুসোলিনী, ডলফাস, পিলসুডস্কি উগ্র জাতীয়তা, জাতি-বিদ্বেষ, অঞ্চল পুনরুদ্ধারের কথা বলে সমাজতন্ত্রকে ঠেকাবার চেষ্টা

করে কেবল লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তপাত ঘটিয়েছে। কিন্তু শেষ পরিণতি হিসেবে তাদের বিদায় নিতে হয়েছে এবং ইতিহাসের একটি কালো অধ্যায়রূপে ঘৃণার পাত্র হয়ে রয়েছে। চীনে চিয়াং কাইশেক একই হিংস্রতা নিয়ে কমিউনিস্ট উৎসাদনে নেমেছিল। লক্ষ লক্ষ কমিউনিস্টের কঙ্কালের স্তূপ সে রচনা করেছিল। কিন্তু ইতিহাস কি বলে? চিয়াং কাইশেক মার্কিনীদের ভিক্ষার পাত্র হয়ে তাইওয়ান দ্বীপে পুতুল সেজে তাদের দয়ায় জীবনের বাকি দিনগুলি গুণেছিল।...” ফাইন্যান্স ক্যাপিটালিস্টরা তাদের পরিচালিত করবে, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারবে না। গুয়াতেমালার ফ্যাসিস্ট আক্রমণে নিহত অধ্যাপক মিজোঙ্গোস লোপেজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় সান কর্লোস বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর রাফেল কুয়েফাস দেল সিড যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন আজ তা ঐতিহাসিক সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, “চরম দক্ষিণপন্থীরা আজ যেভাবে রক্তপাত করছে তার প্রতিদান ওদের মিলবে, ন্যায়নীতি বিজয়ী হবেই। আমাদের সকলের মৃত্যু হতে পারে, কিন্তু ঘড়ির কাঁটা উল্টো মুখে চলে না। ইতিহাস একদিন এই হত্যাকারীদের আবর্জনা স্তূপে নিক্ষেপ করবে।”

ফ্যাসিবাদের ভবিষ্যৎ

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

রাজনৈতিক দল এবং স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী

[Political Parties and Interest Groups]

১। রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য (Difinition and Characteristics of Political Party)

আধুনিক গণতন্ত্র হোল পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। বিশালায়তন আধুনিক রাষ্ট্রের বিপুল পরিমাণ জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের মাধ্যমে তারা শাসনকার্য পরিচালনায় পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হোল রাজনৈতিক দল (Political Party)। তাই এরূপ শাসনব্যবস্থাকে অনেকে দলীয় শাসনব্যবস্থা বলে অভিহিত করার পক্ষপাতী।

বিভিন্ন সংজ্ঞা

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ ঐকমত্যে উপনীত হতে পারেন নি। দৃষ্টিভঙ্গীর ভিন্নতা হেতু বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাজনৈতিক দলের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। প্রখ্যাত ইংরেজ বাগ্মী এডমন্ড বার্ক (Edmund Burke) রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন, যখন কোন নির্দিষ্ট স্বীকৃত নীতির ভিত্তিতে একটি সংগঠিত জনসমষ্টি যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট হয় তখন তাকে রাজনৈতিক দল বলে অভিহিত করা যায়। অধ্যাপক গিলক্রিস্টের মতে, রাজনৈতিক দল হোল সম-রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী নাগরিকগণের সেই সংগঠিত অংশ যা একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। অধ্যাপক গেটেল বলেছেন, রাজনৈতিক দল বলতে মোটামুটিভাবে সংগঠিত এমন একটি নাগরিক সম্প্রদায়কে বোঝায় যারা একটি রাজনৈতিক সংস্থা হিসেবে কার্য করে এবং যারা তাদের ভোটদান ক্ষমতার দ্বারা সরকারকে নিয়ন্ত্রণ ও সাধারণ নীতিগুলিকে কার্যকর করতে চেষ্টা করে। বার্কারের মতে, রাজনৈতিক দল হোল 'বিশেষ একটি মতাদর্শের দ্বারা পরিচালিত এমন একটি দল' (a particular body of opinion) যা জাতীয় স্বার্থের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে নির্বাচকমণ্ডলীর সমর্থন লাভ করতে চেষ্টা করে। অধ্যাপক সুলজ (Schulz) রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, রাজনৈতিক দল হোল ব্যক্তিসমূহের কিংবা নির্দিষ্ট স্বার্থগোষ্ঠীর এমন একটি সুসংবদ্ধ ও অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সংগঠন যার উদ্দেশ্য হোল নিজ সদস্যদের সরকারী ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে ঈপ্সিত নীতি অনুসরণ ও কার্যকরী করা। আবার লাসওয়েল প্রমুখ আধুনিক লেখকগণ মনে করেন যে, রাজনৈতিক দল হোল এমন একটি সংগঠন যা নির্বাচনে প্রার্থী দাঁড় করায় এবং কর্মসূচী উপস্থাপিত করে। নিউম্যান (Neuman) রাজনৈতিক দলকে সামাজিক ক্ষমতাকে রাজনৈতিক ক্ষমতায় পরিণত করার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ একটি হাতিয়ার বলে বর্ণনা করেছেন। মরিস দ্যুভারজারের মতে,

রাজনৈতিক দল হোল এমন একটি সংঘ, যার একটি নির্দিষ্ট কাঠামো আছে ; অ্যাভেরী লিজারসন আধুনিক রাজনৈতিক দলকে সামাজিক গোষ্ঠী ও সামাজিক শ্রেণীর বে-সরকারী ও পরোক্ষ প্রতিনিধিত্বের 'এজেন্সী' বলে বর্ণনা করেছেন।

পূর্বোক্ত সংজ্ঞাগুলির ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলের একটি সংজ্ঞা প্রদান করা যেতে পারে : যখন কোন নির্দিষ্ট স্বীকৃত নীতির ভিত্তিতে সম-মতাদর্শে বিশ্বাসী নাগরিকদের একটি সুসংগঠিত অংশ যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ ও দলীয় নীতিসমূহের বাস্তবায়নের চেষ্টা করে তখন তাকে রাজনৈতিক দল বলা হয়।

রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য

পূর্বোক্ত সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করলে রাজনৈতিক দলের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়, যথা :

(ক) রাজনৈতিক দলের সভ্যগণ সম-মতাদর্শে বিশ্বাসী এবং সেই মতাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন।

(খ) বিশেষ একটি মতাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও প্রতিটি রাজনৈতিক দল সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করে।

(গ) জনগণের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি নিয়ে অবিরত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রতিটি রাজনৈতিক দল আপন মতাদর্শের সমর্থনে জনমত গঠনের জন্য সচেষ্ট হয়।

(ঘ) উপযুক্ত পরিমাণ জনসমর্থন লাভ করলে দলীয় কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে সরকার গঠনের দায়িত্ব গ্রহণে প্রস্তুত থাকতে হয়।

(ঙ) গণতান্ত্রিক উপায়ে এবং সংবিধানসম্মতভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের জন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে চেষ্টা করতে হয়। বৈপ্লবিক পন্থায় ক্ষমতা দখলের কর্মসূচী যে দল গ্রহণ করে তাকে রাজনৈতিক দল বলে অনেকে মনে করেন না।

কিন্তু রাজনৈতিক দলের সনাতন সংজ্ঞাগুলির সমালোচনা করা যেতে পারে। প্রথমতঃ বলা হয় যে, প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সুস্পষ্ট মতাদর্শ ও কর্মসূচী থাকে।

রাজনৈতিক দলের সনাতন সংজ্ঞাগুলির সমালোচনা

কিন্তু সর্বক্ষেত্রে একথা প্রযুক্ত হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক দল (Democratic Party) এবং সাধারণতন্ত্রী দলের (Republican Party) মতাদর্শ ও কর্মসূচীর ক্ষেত্রে কার্যতঃ কোন পার্থক্য নেই। দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক দলগুলির অন্যতম উদ্দেশ্য হোল জনকল্যাণ সাধন। কিন্তু বৈষম্যমূলক সমাজে প্রতিটি রাজনৈতিক দল সামগ্রিকভাবে জনস্বার্থ সংরক্ষণকে তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য বলে জনসমক্ষে প্রচার করলেও কার্যক্ষেত্রে তা বিশেষ একটি শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় ব্রতী হয়। তৃতীয়তঃ লাসওয়েল প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এই অভিমত পোষণ করেন যে, সর্বাত্মক একদলীয় রাষ্ট্রে কোন রাজনৈতিক দল থাকতে পারে না। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন, গণ-সাধারণতন্ত্রী চীন প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কমিউনিস্ট পার্টি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক দল অপেক্ষা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চতুর্থতঃ গণতান্ত্রিক উপায়ে এবং সংবিধানসম্মতভাবে যে দলগুলি রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের চেষ্টা করে তাদেরই কেবল রাজনৈতিক দল বলা যায় বলে কোন কোন পশ্চিমী লেখক

অভিমত পোষণ করেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংবিধানসম্মতভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারে জনগণকে বাধা দেয়। ফলে জনগণের পক্ষে শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করা সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে বৈপ্লবিক উপায় অবলম্বন অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এই সব কারণে মার্কসবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ পশ্চিমী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের প্রদত্ত রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করেন।

মার্কসবাদী সংজ্ঞা

তাঁরা সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। তাঁদের মতে, রাজনৈতিক দল হোল একটি বিশেষ শ্রেণীর অধিক সচেতন ব্যক্তিদের সমষ্টি। তাই দলীয় ব্যবস্থাকে কখনই শ্রেণী-নিরপেক্ষ বলা যায় না। যে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী-স্বার্থের অস্তিত্ব থাকে সেই সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্ব থাকতে বাধ্য। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রতিটি শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। স্বাভাবিকভাবে এরূপ সমাজে শ্রেণী-স্বার্থের ভিন্নতাহেতু বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজে সর্বহারা শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য কেবলমাত্র একটি রাজনৈতিক দল থাকে।

২। উদারনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উদ্ভবের কারণ (Reasons for the growth of different Political Parties in Liberal Political Systems)

জনকল্যাণ সাধন করা রাজনৈতিক দলগুলির সর্বপ্রধান লক্ষ্য হলেও আদর্শ এবং কর্মপন্থার ভিন্নতা হেতু উদারনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটতে পারে।

জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক দল

(১) বহু জাতি-অধ্যুষিত রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতি থাকার ফলে প্রতিটি জাতি আপন আপন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাষা ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য পৃথক পৃথক রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে এরূপ জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল

(২) অনেক সময় ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠিত হতে পারে। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা নিজ ধর্মের প্রচার ও প্রসার-কল্পে আশানুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করার চেষ্টা করে। ফলে একটি রাষ্ট্রে একাধিক ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল থাকতে পারে।

অর্থনৈতিক স্বার্থ-ভিত্তিক রাজনৈতিক দল

(৩) অধ্যাপক ল্যাস্কি প্রমুখ লেখকগণ অর্থনৈতিক স্বার্থকে রাজনৈতিক দল-গঠনের ভিত্তি বলে বর্ণনা করেছেন। সমাজতন্ত্রবাদীরাও অনুরূপ মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, প্রতিটি রাজনৈতিক দল একটি বিশেষ শ্রেণী-স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। বিশ্লেষণ করে বলা যায়, ধনবৈষম্যমূলক সমাজে প্রধানতঃ দুটি শ্রেণী দেখা যায়, যথা—শোষক শ্রেণী এবং শোষিত শ্রেণী। ধনতান্ত্রিক সমাজে শোষক শ্রেণী নিজেদের

শ্রেণী-স্বার্থকে সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। অপরদিকে শোষিত শ্রেণী সমাজের অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থার উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে শোষণহীন সমাজ গঠনের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করতে সচেষ্ট হয়। অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলিকে মূলতঃ বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী—এই দুভাগে বিভক্ত করা যায়।

(৪) অনেক সময় আদর্শগত ক্ষেত্রে লক্ষণীয় পার্থক্য না থাকলেও কেবলমাত্র কর্মপন্থার পার্থক্যহেতু বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ডেমোক্রেটিক পার্টি' ও 'রিপাবলিকান পার্টি'র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতি আস্থাবান হওয়া সত্ত্বেও উভয় দলের মধ্যে কর্মপন্থা নির্ধারণের প্রশ্নে মতপার্থক্য থাকার জন্য তারা দুটি পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

কর্মপন্থার ভিন্নতা হেতু বিভিন্ন দলের সৃষ্টি

৩। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী এবং ভূমিকা (Functions and Role of the Political Parties in Liberal Democracies)

তত্ত্বগতভাবে গণতন্ত্র হোল জনগণ কর্তৃক পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। কিন্তু বিশালায়তন আধুনিক রাষ্ট্রে বিপুল পরিমাণ জনগণের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করা অসম্ভব। তাই জনসাধারণ তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে। এজন্য আধুনিক গণতন্ত্রকে পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র বলে অভিহিত করা হয়। রাজনৈতিক দল এরূপ শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী ও ভূমিকাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে:

(১) আধুনিক রাষ্ট্রের আয়তন যেমন বিশাল, জনসংখ্যাও তেমনি বিপুল। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অসংখ্য সমস্যা বিদ্যমান। এই সব অগণিত সমস্যার মধ্যে কোনগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং কোনগুলির আশু সমাধান প্রয়োজন সে সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সাধারণতঃ কোন সঠিক ধারণা থাকে না। অগণিত সমস্যাবলীর মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলী নির্বাচন করা রাজনৈতিক দলগুলির প্রাথমিক কার্য। এই সব সমস্যার-প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে সেগুলির সম্ভাব্য সমাধানের জন্য তারা পথ অন্বেষণ করে।

সমস্যা নির্বাচন

(২) সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলীর প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আপন আপন দলীয় মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে সেই সব সমস্যার সমাধানকল্পে নীতি ও কর্মসূচী নির্ধারণ করে। প্রতিটি রাজনৈতিক দল বিশ্বাস করে যে, তার অনুসৃত নীতি ও কর্মসূচী অনুসারেই কেবলমাত্র জটিল সমস্যাবলীর সমাধান সম্ভব।

নীতি নির্ধারণ

(৩) নির্ধারিত নীতি এবং কর্মসূচীর সপক্ষে জনমত গঠন করা রাজনৈতিক দলের উল্লেখযোগ্য কার্য। প্রতিটি দলের নেতৃবৃন্দ এবং কর্মিগণ সভা-সমিতি, পত্রপত্রিকা, পুস্তকপুস্তিকা প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারকার্য চালিয়ে নিজ দলীয় নীতি ও কর্মসূচীর সমর্থনে জনমত গঠনের চেষ্টা করে। নির্দিষ্ট কোন একটি সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য ও কর্মসূচীর মাধ্যমে জনসাধারণ সেই সমস্যা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে; তাদের রাজনৈতিক জ্ঞান বা চেতনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

জনমত গঠন

(৪) উদারনৈতিক গণতন্ত্রে প্রতিটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের প্রাথমিক কাজ হোল নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করা। তাই নির্বাচনের সময় তারা যোগ্য প্রার্থী মনোনয়ন করে এবং সেই সব প্রার্থীর সমর্থনে ব্যাপকভাবে নির্বাচনী প্রচারকার্য চালায়। এর ফলে নির্বাচক-মন্ডলী নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপযুক্ত প্রার্থীকে ভোটদান করতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলির অস্তিত্ব না থাকলে বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে কোন্ প্রার্থীর কি অভিমত সে সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত থাকা নির্বাচকমন্ডলীর পক্ষে সম্ভব হোত না। তাছাড়া, রাজনৈতিক দল না থাকলে এত অধিক সংখ্যক প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যে সাধারণ ভোটদাতা তাদের ব্যক্তিগত গুণাগুণ বিচার করতে সক্ষম হয় না। ফলে অনেক সময় কাম্য প্রার্থীর সপক্ষে ভোটদান না করে তারা ভুলবশতঃ অন্য প্রার্থীকে ভোটদান করতে পারে। রাজনৈতিক দল থাকলে নির্বাচকমন্ডলী প্রার্থীর ব্যক্তিগত গুণাগুণ বিচার না করে দলের গুণাগুণ অতি সহজেই বিচার করতে পারে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, দলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে নির্বাচকমন্ডলীর নিকট নির্বাচন সমস্যার জটিলতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

প্রার্থী মনোনয়ন ও নির্বাচনী প্রচার

(৫) আধুনিক গণতন্ত্রে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত হওয়ার ফলে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক ভোটদান করতে পারে। অনেক সময় ভুলবশতঃ কিংবা স্বেচ্ছাকৃতভাবে অনেক ভোটদাতার নাম তালিকাভুক্ত হয় না। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলি প্রতিটি ভোটদাতার নাম তালিকাভুক্ত করার ব্যবস্থা করে। তাছাড়া, ভোটগ্রহণ ও ভোট-গণনা কেন্দ্রে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ ভোটগ্রহণ ও গণনার কার্য যথাযথভাবে সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য রাখেন। এইভাবে রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচকদের রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের কর্তব্য পালন করে।

নির্বাচকদের রাজ-নৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণ

(৬) প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হোল সরকারী ক্ষমতা করায়ত্ত করে আপন নীতি ও আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করা। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সমর্থন লাভ করলে এই উদ্দেশ্যকে সফল করে তোলার সুযোগ উপস্থিত হয়। এমতাবস্থায় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের কার্য হোল সরকার গঠন করা এবং নির্বাচনের পূর্বে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরকার পরিচালনা করা। বলা বাহুল্য, যে দল সরকার গঠনের পর নির্বাচনের প্রাক্কালে জনগণের নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে পালন করতে পারে সেই দল, পরবর্তী নির্বাচনেও অকুণ্ঠ জনসমর্থন লাভ করতে সমর্থ হয়।

সরকার গঠন

(৭) নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সমর্থনপুষ্ট রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করে এবং অন্যান্যরা বিরোধী দল হিসেবে কাজ করে। গণতন্ত্রে বিরোধী দলগুলিকেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। সরকারী দল যাতে স্বৈরাচারী ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে গণতন্ত্রের ধ্বংসসাধনে উদ্যোগী হতে না পারে সেজন্য বিরোধী দলগুলিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। সরকারী ভুলত্রুটির সমালোচনা করে তারা সরকারকে সংযত থাকতে বাধ্য করে। এইভাবে বিরোধী দলগুলি গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে।

সরকারী দলের স্বৈরাচারিতা রোধ

(৮) সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতার বন্ধন সুদৃঢ় না হলে শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হতে পারে না। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতার বন্ধন সুদৃঢ়করণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থায় আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলই সহযোগিতার সেতু রচনা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসনব্যবস্থায় দলীয় প্রথা প্রবর্তিত না হলে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হোত না। ফলে শাসনকার্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হোত।

সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সহযোগিতার বৃদ্ধিসাধন

(৯) উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের সঙ্গে জনসাধারণের সংযোগ রক্ষা করে রাজনৈতিক দলগুলি। সরকারী নীতির সপক্ষে ও বিপক্ষে প্রচারকার্য চালিয়ে জনমত গঠন করা রাজনৈতিক দলগুলির কাজ। সরকারী দল ও বিরোধী দলের পরস্পর-বিরোধী বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে জনসাধারণ সরকারের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সম্যকভাবে অবহিত হয়। আবার রাজনৈতিক দলগুলি জনসাধারণের অভাব-অভিযোগের ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এবং সেইসব অভাব-অভিযোগের প্রতিবিধানের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে সরকারকে বাধ্য করে।

সরকার ও জনগণের মধ্যে সংযোগ রক্ষা

(১০) জনসাধারণের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগ্রত না হলে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। রাজনৈতিক দলগুলি বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে আপন আপন মতাদর্শ অনুযায়ী নীতি নির্ধারণ ও কর্মসূচী প্রণয়ন করে। রাজনৈতিক দলের সমর্থকগণ বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থকেই বড় বলে মনে করার ফলে তাদের ধর্ম, বর্ণ ও জাতিগত সংকীর্ণ স্বার্থপর মনোবৃত্তি গড়ে উঠার সুযোগ পায় না। এইভাবে জনসাধারণের মধ্যে ঐক্যবোধ বৃদ্ধি করে রাজনৈতিক দলগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জনসাধারণের মধ্যে ঐক্যবোধ বৃদ্ধি

(১১) অ্যালমন্ড এবং পাওয়েলের মতে, স্বার্থের গ্রন্থিকরণ (Interest articulation) রাজনৈতিক দলের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রকার স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী (Iuterest Groups) রাজনৈতিক দলগুলির মাধ্যমে নিজেদের দাবি সরকারের নিকট উপস্থাপিত করে। এইসব দাবিকে বিকল্প কার্যপদ্ধতিতে রূপান্তরিত

স্বার্থের গ্রন্থিকরণ

করাকে স্বার্থের গ্রন্থিকরণ বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীসমূহের প্রভাব এতই প্রবল যে, সরকারী দল বা বিরোধী দল কেউই তাদের দাবিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করতে পারে না। কিন্তু বহু-দলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলি সংখ্যায় এতই অধিক যে, তাদের দাবি অতি সহজেই রাজনৈতিক দলগুলি উপেক্ষা করতে পারে।

দরিদ্রতম ব্যক্তিকে শাসনকার্য পরিচালনায় সুযোগ দান

(১২) অনেক সময় সমাজের সুযোগ্য, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও সৎ ব্যক্তিরা অর্থের অভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সাহস পায় না, কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও অযোগ্য ধনশালী প্রার্থীদের নিকট পরাজিত হন। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করে বলে সুযোগ্য দরিদ্র ব্যক্তিরা সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। ফলে শাসনকার্যে গুণগত উৎকর্ষ সাধিত হয়।

উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলগুলি উপরি-উক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে গণতন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ বজায় রাখে বলে অনেকে মনে করেন। তাই বলা হয়,

উপসংহার

আধুনিক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হোল দলীয় ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক দল হোল তার প্রাণ। তবে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমস্ত রাজনৈতিক দল স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রযন্ত্র ধনিক-বণিকদের কুক্ষিগত থাকায় তারা তাদের স্বার্থ-বিরোধী কোন দলকে সরকারী ক্ষমতা দখলের সুযোগ দেয় না। এইভাবে বামপন্থী দলের কোন ব্যাপক প্রাধান্য না থাকায় দক্ষিণপন্থী দলগুলির মধ্যে আদর্শগত ঐক্য হেতু তাদের কার্যাবলীর কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকে না। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে কমিউনিস্ট দলের কার্যাবলী অত্যন্ত সুস্পষ্ট। পুঁজিবাদের অবসান ঘটিয়ে শ্রেণীহীন ও শোষণহীন সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন করাই এই দলের সর্বপ্রধান কাজ। সুতরাং রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রকৃতি অনুযায়ী রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী স্থিরীকৃত হয়

৪। রাজনৈতিক দলের গুণাগুণ (Merits and Demerits of Political Party)

উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী ও গুরুত্ব অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এরূপ শাসনব্যবস্থাকে দলীয় শাসনব্যবস্থা বলে অভিহিত করা হয়। রাজনৈতিক দলের সম্পাদিত কার্যাবলীর মধ্যেই তার গুণাবলী প্রত্যক্ষ করা যায়।

গুণাবলী (Merits): রাজনৈতিক দলের সপক্ষে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করা হয়:

সমস্যার সমাধান

(১) রাষ্ট্রের আয়তন ও অর্থনৈতিক সমস্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সমস্যাবলীও ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। জীবনসংগ্রামে জর্জরিত সাধারণ মানুষের পক্ষে রাজনীতি-বিবর্জিত হয়ে এইসব সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি করা যেমন সহজ নয়, তেমনি সেগুলির সমাধানের জন্য পথ

অন্বেষণ করাও সম্ভব নয়। রাজনৈতিক দলগুলি অগণিত সমস্যাবলীর মধ্যেও যেগুলির আশু সমাধান একান্ত প্রয়োজন সেগুলি সম্পর্কে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সেগুলির সমাধানকল্পে পথের নির্দেশ দেয়। সুতরাং রাজনৈতিক দল ছাড়া ব্যক্তির রাজনৈতিক জীবন কখনই সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে না। তাছাড়া, রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ লাভ করে সাধারণ মানুষ সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে।

শাসনকার্যে উৎকর্ষ সাধিত হয়

(২) অনেক সময় দেখা যায়, সমাজের সুযোগ্য ব্যক্তি আর্থিক অনটনের জন্য নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারেন না। অপদার্থ স্বার্থপর ব্যক্তিরা অর্থের জোরে নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। এরূপ সরকার প্রকৃতিগতভাবে স্বার্থপর এবং অকর্মণ্য হতে বাধ্য। রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনের প্রাক্কালে সুযোগ্য ব্যক্তিদের প্রার্থী মনোনয়ন করে তাদের জয়লাভের জন্য দলীয় অর্থ ও সংগঠনকে কাজে লাগায়। এরূপ-ক্ষেত্রে যোগ্যতা থাকলে দরিদ্রতম ব্যক্তিও নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার গঠনে অংশ-গ্রহণ করতে পারে। এই সরকার নিঃসন্দেহে যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে আপন দলীয় নীতি অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারে।

রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার

(৩) গণতন্ত্রে একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকায় জনসাধারণের মধ্যে অতি সহজেই রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার ঘটতে পারে। আপন আপন দলীয় নীতি ও কর্মসূচীকে সঠিক বলে প্রমাণ করে প্রতিটি দল ব্যাপকভাবে দলীয় প্রচারকার্যের মাধ্যমে নিজ অনুকূলে জনমত গঠন করতে চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দলগুলি সভা-সমিতির আয়োজন করে এবং সংবাদপত্র, পুস্তকপুস্তিকা প্রভৃতিতে আপন আপন মতাদর্শ ও কর্মসূচী প্রচারের মাধ্যমে নিজ দলের উৎকর্ষ ও অন্যান্য দলের ত্রুটির প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর ফলে নির্লিপ্ত জনগণ উত্তরোত্তর রাজনীতি-সচেতন হয়ে উঠে। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার ঘটে। সামাজিক কল্যাণ সাধনের জন্য তারা শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে অংশগ্রহণে আগ্রহী হয়।

ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী সরকারের প্রতিষ্ঠা সম্ভব

(৪) রাজনৈতিক দল না থাকলে প্রার্থিগণ ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ফলে প্রার্থী সংখ্যার বিপুলতার জন্য প্রতিটি প্রার্থীর ব্যক্তিগত গুণাগুণ বা যোগ্যতা বিচার করার ক্ষমতা জনসাধারণের থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অযোগ্য এবং সংকীর্ণমনা প্রার্থীরা অর্থের বলে নির্বাচিত হন। সরকার গঠনের সময় নির্বাচিত প্রার্থিগণ ঐকমত্যে উপনীত হতে পারেন না। কোন রকমে তাঁরা সরকার গঠন করলেও পরবর্তী সময়ে পারস্পরিক স্বার্থদ্বন্দ্ব অন্তর্বিরোধ সৃষ্টি করে। কিন্তু দলীয় শাসন প্রবর্তিত হলে নির্দিষ্ট মতাদর্শের ভিত্তিতে গঠিত রাজনৈতিক দলের নীতি ও কার্যসূচীকেই জনগণ ভোটদান করে। দলীয় ব্যবস্থায় প্রার্থীদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা অপেক্ষা তাদের দলীয় নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি লক্ষ্য রেখে জনসাধারণ সহজেই নিজেদের মনোমত প্রার্থী নির্বাচন করতে পারে। যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সমর্থন লাভ করে সেই দল সরকার গঠন করে। বলা বাহুল্য, দলীয় নিয়মানুবর্তিতা

ও শৃঙ্খলার মধ্যে প্রতিটি দলের সদস্যরা আবদ্ধ থাকেন বলে সরকার স্থায়িত্ব লাভ করে ; শাসনকার্য সুদক্ষভাবে পরিচালিত হতে পারে।

(৫) নির্বাচনে যে দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দল সরকার গঠন করে। সরকারী দল ক্ষমতাসীন হয়ে যাতে জনস্বার্থ-বিরোধী কার্যকলাপ চালাতে না পারে কিংবা স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে না পারে সেজন্য বিরোধী দলগুলি সদাসতর্ক প্রহরী হিসাবে কাজ করে। অনেক সময় তারা ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারী ত্রুটিবিচ্যুতির সমালোচনা করে সরকারকে সংযত থাকতে বাধ্য করে। এইভাবে রাজনৈতিক দলগুলি গণতন্ত্রের যথার্থ স্বরূপ রক্ষায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

সরকারী স্বৈরাচারিতা রোধ করে

(৬) মন্ত্রিপরিষদ পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় আইনসভার সদস্যগণই মন্ত্রী হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। সরকারের সাফল্যের জন্য উভয় বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। রাজনৈতিক দলগুলি এই সহযোগিতার বন্ধন সুদৃঢ় করে। বস্তুতঃ দলীয় ব্যবস্থা না থাকলে উভয় বিভাগের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা সম্ভব হোত না। আবার ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থায় দলীয় সংহতির মাধ্যমে উভয় বিভাগের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়-সাধন করা সম্ভব। অন্যথায় আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ পারস্পরিক সহযোগিতার অভাবে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়তে বাধ্য। ফলে সরকারী কার্যাবলী সুসংহতভাবে পরিচালিত হতে পারে না।

সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি

(৭) দলীয় ব্যবস্থা থাকলে শান্তিপূর্ণভাবে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকারের পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দলীয় রাজনীতির বৈশিষ্ট্য হোল সংবিধানের গণ্ডির মধ্যে থেকে গণতন্ত্রের প্রসার-সাধন। তাই দলীয় ব্যবস্থা এবং নিয়মতান্ত্রিকতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলে মনে করা হয়। নির্বাচনে যে-দল সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করে সেই দল সরকার গঠন করে। আবার জনসাধারণের আস্থা হারালে সরকারী দলকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়। এইভাবে জনগণ নিজেদের পছন্দমত রাজনৈতিক দলকে সরকার গঠনের দায়িত্ব অর্পণ করতে পারে। তার ফলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সরকারের পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। ম্যাকআইভার (MacIver)-এর মতে, দলপ্রথা না থাকলে সামরিক অভ্যুত্থান বা সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া অন্য কোন উপায়ে সরকারের পরিবর্তন সম্ভব হোত না। অনেকে অবশ্য মনে করেন যে, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা-বিরোধী কোন রাজনৈতিক দলকেই শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতায় আসতে দেওয়া হয় না। জনগণের সমর্থন লাভ করলেও অগণতান্ত্রিকভাবে তাদের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা হয়। ফলে শান্তিপূর্ণভাবে সরকার পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে না।

শান্তিপূর্ণভাবে সরকার পরিবর্তন

(৮) গণতন্ত্রকে 'জনমত-পরিচালিত শাসনব্যবস্থা' বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু রাজনৈতিক দল না থাকলে জনমতের গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করা যায় না। রাজনৈতিক দলগুলির মাধ্যমেই জনমত গঠিত ও

গণতন্ত্রের স্বরূপ রক্ষা করে

প্রচারিত হয়। তাই দলীয় ব্যবস্থাকে গণতন্ত্রের যথার্থ স্বরূপ রক্ষার সহায়ক বলে মনে করা হয়।

(৯) দলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে জনসাধারণ আপন আপন ধর্ম, বর্ণ, জাতি প্রভৃতি অপেক্ষা জাতীয় স্বার্থকেই বড় বলে মনে করতে শিক্ষালাভ করে। জনসাধারণের মধ্যে ঐক্যবোধ বৃদ্ধি পায়। বলা বাহুল্য, জনসাধারণের মধ্যে ঐক্যবোধ না থাকলে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব বিঘ্নিত হতে পারে।

জনসাধারণের মধ্যে ঐক্যবোধ সুদৃঢ় করে

দোষ (Demerits) : দলপ্রথা গণতন্ত্রের অপরিহার্য অঙ্গ বলে বিবেচিত হলেও নিম্নলিখিত কারণে তার বিরোধিতা করা হয় :

(ক) দলীয় ব্যবস্থায় প্রতিটি দলের সভ্যদের দলীয় নীতি ও কর্মসূচী অনুসারে কাজ করতে হয়। আপন আপন বিচারবুদ্ধি অনুসারে কাজ করার স্বাধীনতা তাদের থাকে না। ব্যক্তিগত মতামত বিসর্জন দিয়ে দলীয় নেতৃবৃন্দের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে সদস্যরা বাধ্য থাকে। অন্যথায় দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ কিংবা দলীয় স্বার্থ-বিরোধী কার্যে লিপ্ত থাকার অভিযোগে তাদের দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। দল থেকে বহিষ্কারের অর্থ সংশ্লিষ্ট সদস্যদের রাজনৈতিক জীবনের অপমৃত্যু। তাই দলীয় ব্যবস্থা ব্যক্তিত্বের বিনাশ সাধন করে বলে অনেকের অভিযোগ।

ব্যক্তিত্বের বিনাশ সাধন

(খ) উদারনৈতিক গণতন্ত্রে দলের মাধ্যমে জনগণের মত প্রকাশ সম্বন্ধে যে কথা বলা হয় তা ঠিক নয়। কারণ কয়েকটিমাত্র রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে জনগণের সব অংশের মতামত যথার্থভাবে কখনই প্রকাশিত হতে পারে না। অনেক সময় নিজেদের মনোমত রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব না থাকায় জনগণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করতে বাধ্য হয়। উদাহরণস্বরূপ ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাম করা যায়।

জনমত সঠিকভাবে প্রকাশিত হয় না

(গ) তত্ত্বগতভাবে সর্বাঙ্গীণ জনকল্যাণ সাধন করা রাজনৈতিক দলগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হলেও কার্যক্ষেত্রে অনেক সময় তারা দলীয় স্বার্থসিদ্ধিকেই প্রাধান্য দেয়। দলীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য সরকারী দল অনেক সময় সরকারী প্রশাসনকে ব্যবহার করে। ফলে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষিত হয়। এই অবস্থা গণতন্ত্রের পক্ষে আদৌ কাম্য নয়।

দলীয় স্বার্থের প্রাধান্য

(ঘ) দলীয় ব্যবস্থায় যে দল নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সমর্থন লাভ করে সেই দল সরকার গঠন করে। সরকার গঠনের সময় অনেকক্ষেত্রে যোগ্যতা ও দক্ষতা অপেক্ষা দলীয় মনোবৃত্তিই প্রাধান্যলাভ করে। ফলে অযোগ্য ও অপদার্থ ব্যক্তিরা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়। সুযোগ্য ব্যক্তিরা অন্য রাজনৈতিক দলভুক্ত বলে সরকার গঠনের সুযোগলাভে বঞ্চিত হন। তাছাড়া, অনেক সময় শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও সমাজসেবী ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক দলাদলির সঙ্গে নিজেদের জড়াতে চান না বলে সরকার পরিচালনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। কারণ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে

শাসনকার্যে উৎকর্ষ সাধিত হয় না

যুক্ত না থাকলে শাসনকার্য পরিচালনার সুযোগ লাভ করা সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য, সুযোগ্য ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে যে সরকার গঠিত হয় সেই সরকার কখনই সুদক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারে না।

নৈতিক মানের অবনতি

(ঙ) অনেকের মতে, দলীয় ব্যবস্থা জনগণের নৈতিক মানের অবনতি ঘটায়। নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য কিংবা ক্ষমতায় সমাসীন থাকার জন্য রাজনৈতিক দলগুলি উৎকোচ গ্রহণ, উৎকোচ প্রদান, স্বজনপোষণ ইত্যাদি নীতিবিবর্জিত কার্যে লিপ্ত থাকতে পারে। অনেক সময় সরকারী দল কেবলমাত্র দলীয় সদস্য বা সমর্থকদের সন্তুষ্ট করার জন্য সরকারী চাকরি, উপাধি কিংবা অন্যান্য সুযোগসুবিধা প্রদান করে। এগুলি সুস্থ গণতান্ত্রিক সমাজ-গঠনের বিরোধী।

রাজনৈতিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায় না

(চ) রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য একে অপরের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে প্রচারকার্য চালায়। অনেকক্ষেত্রে তাদের প্রচারকার্য উদ্দেশ্য-প্রণোদিত মিথ্যা বা অর্ধ-মিথ্যা প্রচার ছাড়া আর কিছুই নয়। এরূপ মিথ্যা প্রচারে জনগণ বিভ্রান্ত হয়। প্রকৃত সত্য তাদের কাছে অজ্ঞাত থেকে যায়। অনেক সময় প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ কিংবা গোষ্ঠীস্বার্থকে জনস্বার্থ বলে প্রচার করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে। এইভাবে মিথ্যা প্রচারকার্যের ফলে জনসাধারণের প্রকৃত স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তারা রাজনৈতিক শিক্ষালাভে বঞ্চিত হয়।

পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাব

(ছ) গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সরকারী দল ও বিরোধী দলগুলির মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকারী দল যেমন বিরোধী পক্ষের ন্যায়সঙ্গত দাবি বা মতামতের কোন মূল্য দেয় না বা বিরোধী দলকে দাবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, তেমনি বিরোধী দলগুলিও অনেক সময় অন্যায়ভাবে সরকারী দলের সমালোচনা করে। এই অবস্থা গণতন্ত্র, বিশেষতঃ সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য আদৌ কাম্য নয়।

জনজীবনে অশান্তি বৃদ্ধি পায়

(জ) রাজনৈতিক দলগুলি ক্ষমতার মোহে অনেক সময় এতই অন্ধ হয়ে পড়ে যে, নির্বাচনে জয়লাভের জন্য তারা অকারণে উত্তেজনা ও উন্মাদনা সৃষ্টি করে।

সংকীর্ণ গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষিত হয়

(ঝ) দলীয় প্রথা প্রবর্তিত হলে রাজনৈতিক দলগুলি কার্যতঃ মুষ্টিমেয় নেতৃবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত হয়। এরাই রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে দলকে ব্যবহার করে। দলের অন্যান্য সদস্য সুযোগসুবিধা লাভে বঞ্চিত হয়।

ভিন্নধর্মী সমালোচনা

(ঞ) মার্কসবাদী লেখকদের মতে, উদারনৈতিক গণতন্ত্রে সেইসব রাজনৈতিক দল স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালাতে পারে যারা রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল ধনিক-বণিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য কাজ করে। শ্রমিক-কৃষকের প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলি স্বাধীনভাবে তাদের নীতি, আদর্শ ও কর্মসূচী অনুসারে কাজ করতে পারে। "অতএব একথা বলা যায় না

যে, নির্বাচকমণ্ডলী স্বাধীনভাবে সকল দল ও প্রার্থীর বক্তব্য বিচার করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।" বস্তুতঃ "ধনতান্ত্রিক সমাজে সর্বজনীন ভোটাধিকার এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা সত্ত্বেও শোষিত জনসাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে না। এটাই যে নিয়ম—গণতন্ত্রের ইতিহাস সেই সাক্ষ্যই দেয়।" তাই বলা যেতে পারে যে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দলীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখতে সমর্থ হয় না।

উপসংহার

দলীয় ব্যবস্থার নানাপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও উদারনৈতিক গণতন্ত্রে এর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অপর নাম হোল স্বাধীন রাজনৈতিক দল কর্তৃক পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। রাজনৈতিক দল ছাড়া উদারনৈতিক গণতন্ত্রের অস্তিত্বের কথা কল্পনাই করা যায় না।

৫। দলীয় ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাজন (Classification of Party System)

ব্যাপক অর্থে শ্রেণীবিভাজন

দলীয় ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাজনের প্রশ্নে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রবল মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অনেকে দলীয় ব্যবস্থাকে মূলতঃ প্রতিযোগিতামূলক (Competitive) এবং অ-প্রতিযোগিতামূলক (Non-competitive)—এই দুভাগে বিভক্ত করেন। কেউ কেউ আবার দলীয় ব্যবস্থাকে উদারনৈতিক দলীয় ব্যবস্থা (Liberal Democratic Party System) এবং সর্বাত্মক দলীয় ব্যবস্থা (Totalitarian Party System)-এই দুভাগে ভাগ করার পক্ষপাতী। কিন্তু এ ধরনের শ্রেণীবিভাজন অত্যন্ত ব্যাপক এবং আপেক্ষিক।

সংখ্যার ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাজন ও তার অসুবিধা

অনেকে রাজনৈতিক দলের সংখ্যার ভিত্তিতে দলীয় ব্যবস্থাকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, যথা—ক. এক-দলীয় ব্যবস্থা (One-Party System), খ. দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা (Bi-party System) এবং গ. বহু-দলীয় ব্যবস্থা (Multi-party System)। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ দলীয় ব্যবস্থার এরূপ শ্রেণীবিভাজনকে অবৈজ্ঞানিক ও অসম্পূর্ণ বলে সমালোচনা করেন। দলীয় ব্যবস্থার এরূপ শ্রেণীবিভাজনের অর্থ কেবলমাত্র দলের সংখ্যার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা। দলের প্রতি জনসমর্থন, দলের গঠনপদ্ধতি, মতাদর্শ, কর্মপন্থা প্রভৃতি এক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়। তৎছাড়া, দলের সংখ্যার ভিত্তিতে দলীয় ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাজন করা হলে মিশর, তানজানিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্যাসিবাদী ইতালী প্রভৃতিকে এক-দলীয় ব্যবস্থা; ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতিকে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা এবং ফ্রান্স, ইতালি, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশকে বহুদলীয় ব্যবস্থা বলে অভিহিত করা যায়। কিন্তু মিশর, স্পেন প্রভৃতি দেশের এক-দলীয় ব্যবস্থার সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন কিংবা ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের এক-দলীয় ব্যবস্থার কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এমন কি সাম্যবাদী একদলীয় ব্যবস্থা এবং ফ্যাসিবাদী এক-দলীয় ব্যবস্থার মধ্যেও আকৃতি ও প্রকৃতিগত ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান। ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বি-দলীয়

ব্যবস্থার মধ্যেও প্রকৃতিগত ক্ষেত্রে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ব্রিটেনে শ্রমিক দল (Labour Party) ও রক্ষণশীল দলের (Conservative Party) মধ্যে আদর্শগত ক্ষেত্রে যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান দল (Republican Party) ও ডেমোক্র্যাটিক দলের (Democratic Party) মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য নেই। তাছাড়া, ১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর লিবারেল দলের (Liberal Party) প্রভাব বৃদ্ধির ফলে গ্রেট ব্রিটেনে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা আদৌ আছে কিনা তা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। আবার ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশের বহু-দলীয় ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতবর্ষের বহু-দলীয় ব্যবস্থার পার্থক্য অনেক। ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে জাতীয় কংগ্রেসের এতই অপ্রতিহত প্রাধান্য ছিল যে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির কার্যক্ষেত্রে কোনপ্রকার অস্তিত্ব ছিল না বললেই চলে।

সুতরাং দলীয় ব্যবস্থার চিরাচরিত সংখ্যা-ভিত্তিক শ্রেণীবিভাজন বর্তমানে গ্রহণ-যোগ্য নয় বলে মনে করা হয়। অধ্যাপক অ্যালমন্ড দলীয় ব্যবস্থাকে সাত ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা—১. অস্পষ্ট দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা, ২. সুস্পষ্ট দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা, ৩. কার্যকরী বহু-দলীয় ব্যবস্থা, ৪ অস্থায়ী বহু-দলীয় ব্যবস্থা, ৫. প্রভুত্বকারী দলীয় ব্যবস্থা, ৬. এক-দলীয় ব্যবস্থা এবং ৭ সর্বাত্মক দলীয় ব্যবস্থা। আমরা দলীয় ব্যবস্থাকে প্রধানতঃ চার ভাগে বিভক্ত করতে পারি, যথা—ক. এক-দলীয় ব্যবস্থা, খ. প্রভুত্বকারী দলীয় ব্যবস্থা, গ. দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা এবং ঘ. বহু-দলীয় ব্যবস্থা। তবে এরূপ প্রতিটি দলীয় ব্যবস্থার মধ্যেও শ্রেণীবিভাজন করা যেতে পারে।

৬। রাজনৈতিক দলের প্রকৃতি ও কার্যাবলী সম্পর্কে মার্কসবাদীদের অভিমত (Marxist views about the nature and functions of Political Parties)

বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা রাজনৈতিক দলের প্রকৃতি ও কার্যাবলী সম্বন্ধে যে-অভিমত ব্যক্ত করেন, মার্কসবাদীরা তার বিরোধিতা করে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জনক কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস এবং পরবর্তী সময়ে লেনিন, স্তালিন ও মাও সেতুঙ্‌ সমাজ-পরিবর্তনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা সম্পর্কে যে-বিশ্লেষণমুখী আলোচনা করেছেন, বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের আলোচনায় সেই ভূমিকাকে উপেক্ষা করা হয়েছে।

রাজনৈতিক দল সম্পর্কে বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গী বনাম মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী

বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা রাজনৈতিক দলের আভ্যন্তরীণ কাঠামোর উপরেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। ফলে দলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণী-চরিত্র, রাজনৈতিক লক্ষ্য ও মতাদর্শ ইত্যাদি বুর্জোয়া তত্ত্বে উপেক্ষিত হয়। অপরদিকে রাজনৈতিক দলের মার্কসীয় তত্ত্বে দলের প্রকৃতি আলোচনার সময় তাদের সামাজিক ও শ্রেণীগত বিন্যাস, মতাদর্শ, কর্মসূচী রাজনৈতিক লক্ষ্য প্রভৃতি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিশ্লেষণ করা হয়।

অনেক সময় বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা একথা প্রচার করেন যে, মার্কসবাদের স্রষ্টারা

শ্রমিক শ্রেণীর স্বতন্ত্র পার্টি গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। তাই তাঁদের রচনার মধ্যে এ বিষয়ে কোন আলোচনা করা হয়নি। কিন্তু এই অভিযোগ সত্য নয়। মার্কস-এঙ্গেলস একথা বলেছিলেন যে, পুঁজিবাদের ধ্বংস অনিবার্য হলেও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আপনা থেকে কখনই ভেঙ্গে পড়বে না কিংবা বুর্জোয়ারা কখনই স্বেচ্ছায় শ্রমিক শ্রেণীর হাতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্পণ করবে না। তাঁরা একথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, শোষক শ্রেণীর সঙ্গে আপসহীন সংগ্রাম চালাতে হবে শ্রমিক শ্রেণীকে। আর এই সংগ্রাম চালাতে হলে এবং কমিউনিস্ট সমাজ গঠন করতে হলে শ্রমিক শ্রেণীর প্রয়োজন একটি জঙ্গী ও পোড়-খাওয়া রাজনৈতিক দল। যতদিন শ্রমিক-শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি ছিল না, ততদিন তারা সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। ফলে বিদ্যমান সমাজের পরিবর্তন সাধনের সব প্রচেষ্টাই তাদের বারংবার ব্যর্থ হয়ে গেছে। ১৮৭১ সালে প্যারী-কমিউনের ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মার্কস তাঁর 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' (The Civil War in France) নাম পুস্তিকায় দেখালেন যে, প্যারিস শহরে নির্ভীক শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কোন বিপ্লবী রাজনৈতিক দল না থাকায় ঐ গণ-অভ্যুত্থান শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। প্রতিবিপ্লবীদের আক্রমণে বিপ্লবীদের পর্যুদস্ত হতে হয়। প্যারী-কমিউনের অভিজ্ঞতা থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করার কথা বলে মার্কস-এঙ্গেলস্ বলেছেন যে, প্রলেতারীয় সংগ্রামকে সুষ্ঠুভাবে সঠিকপথে পরিচালনা করার জন্য বিপ্লবী পার্টির অবস্থিতি অপরিহার্য। তাঁরা এই অভিমত পোষণ করেন যে, যেহেতু শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য হোল বিপ্লব সম্পাদন করা, সেহেতু এই ধরনের দলের সাংগঠনিক চরিত্র হবে বুর্জোয়া সংসদীয় দলগুলির চরিত্র থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক দলের মধ্যে একদিকে যেমন কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা থাকবে, অন্যদিকে তেমনি থাকবে পূর্ণ গণতন্ত্র। এই দুটি নীতি পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে। অন্যভাবে বলা যায়, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির মধ্যে প্রতিটি সদস্য স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারবে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তকে সংখ্যালঘিষ্ঠদের বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে হবে; এক্ষেত্রে কোনরূপ প্রশ্ন তোলা যাবে না। অর্থাৎ-শ্রমিক-শ্রেণীর পার্টির মধ্যে পার্টি-শৃঙ্খলা ও পার্টি-গণতন্ত্রের উভয়ের দ্বান্দ্বিক সমন্বয়ের উপর মার্কস-এঙ্গেলস বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

শ্রমিক-শ্রেণীর পার্টি সম্বন্ধে মার্কস-এঙ্গেলস

বিপ্লবী পার্টি সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলসের ধারণার সৃষ্টিশীল বিকাশ ঘটিয়ে তাকে পরিপূর্ণতা দান করেন লেনিন। ১৯২০ সালে লিখিত 'কী করতে হবে?' (What is to be done?) নামক প্রবন্ধে তিনি আসন্ন ১৯০৫ সালের রুশ-বিপ্লবের পটভূমিতে বিপ্লবী আদর্শের ভিত্তিতে একটি বিপ্লবী রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা এবং সেই দলের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেছিলেন, "আমি জোর দিয়ে বলছি যে, (এক) ধারাবাহিকতা বজার রাখার উপযোগী নেতাদের কোন স্থিতিশীল সংগঠন না থাকলে কোন বিপ্লবী আন্দোলনই স্থায়ী হতে পারে না; (দুই) জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যতো বেশী সংখ্যায় সংগ্রামের জন্য এগিয়ে আসে,

শ্রমিক-শ্রেণীর পার্টি সম্পর্কে লেনিন

আন্দোলনের ভিত্তি তৈরি করে এবং তাতে অংশগ্রহণ করে, ততোই এরকম সংগঠন আরো বেশী দরকার হয়ে পড়ে, এবং ততোই একে বেশী পাকাপোক্ত করে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়…; (তিন) যেসব লোক বিপ্লবী কাজকে তাদের পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে, প্রধানতঃ তাদের নিয়েই এই সংগঠন গড়ে উঠবে ; (চার) একটি স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক পুলিসকে প্রতিহত করার কৌশলে দক্ষ পেশাদার বিপ্লবীদের মধ্যে এই সংগঠনের সদস্য সংখ্যা যতো বেশী সীমাবদ্ধ রাখা যাবে, ততোই এই সংগঠনকে ধ্বংস করা অসম্ভব হয়ে পড়বে, এবং (পাঁচ) ততোই শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য সামাজিক শ্রেণীর লোকেরা বেশী বেশী সংখ্যায় এই আন্দোলনে যোগ দিতে ও সক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারবে। 'কী করতে হবে ?' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর রাশিয়ার বৈপ্লবিক অবস্থার পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে। এই সময় লেনিন একই সঙ্গে গোপনে ও প্রকাশ্যে পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার উপর বিশেষ জোর দেন। এর পর 'এক পা আগে, দু'পা পিছে' (One Step Forward, Two Steps Back), 'বামপন্থী কমিউনিজম—শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা' (Left wing Communism—An Infantile Disorder), 'জনৈক প্রচারকের মন্তব্য' (Notes of a Publicist) প্রভৃতি প্রবন্ধে লেনিন তাঁর রাজনৈতিক দল সম্পর্কিত নীতিগুলি ব্যাখ্যা করেন। তিনি এই অভিমত পোষণ করেছিলেন যে, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত পার্টিগুলি লড়াই-এর হাতিয়ার ছিল না ; ছিল শান্তির উপকরণ। তাই যুদ্ধের সময় কিংবা শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী কার্যকলাপের যুগে কোন গুরুতর কার্যক্রম অবলম্বন করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এমতাবস্থায় ঐ ধরনের পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব ছিল অসম্ভব। কারণ ঐসব পার্টি যে কেবলমাত্র সংস্কারপন্থী ছিল তা-ই নয়, সেই সঙ্গে তারা ছিল বিপ্লব-বিরোধী। তাই শ্রমিকশ্রেণীর একটি প্রকৃত বিপ্লবী পার্টি গড়তে গিয়ে লেনিনকে যেমন কাউৎস্কি, শাইডেমান্ প্রমুখের সংস্কারবাদী ঝোঁকের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছিল, তেমনি রুখে দাঁড়াতে হয়েছিল রুশ-নারদনিকদের সন্ত্রাসবাদী ধ্যানধারণা ও ক্রিয়া-কলাপের বিরুদ্ধে। এই দুই বিপরীতমুখী ঝোঁকের বিরোধিতা করেই লেনিনকে বিপ্লবী বলশেভিক পার্টি গঠনের তাত্ত্বিক ভিত্তি রচনার কাজ করতে হয়েছিল। লেনিন কি ধরনের পার্টি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে স্তালিন বলেছেন, "তাই প্রয়োজন এক নতুন পার্টি, জঙ্গী পার্টি, বিপ্লবী পার্টি, এমন এক পার্টি যা রাষ্ট্রশক্তি দখলে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব করার সাহস রাখে ; যা বিপ্লবী পরিস্থিতির জটিলতার মধ্যে নিজের স্থান বেছে নেবার মতো যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রাখে, যা লক্ষ্যস্থলে পেঁছিবার জন্য পথের বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে চলার মতো যথেষ্ট নমনীয়তা দেখাতে পারে। এই ধরনের পার্টি না থাকলে সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ আর শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার কথা ভাবাই বৃথা।"

লেনিন-নির্দেশিত পার্টির প্রকৃতি ও কার্যাবলীকে নিম্ন-লিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে ঃ

[১] লেনিনের মতে, সর্বপ্রথম পার্টিকে হতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী। পার্টি যাতে অগ্রগামী বাহিনীতে পরিণত হতে পারে সেজন্য তাকে বিপ্লবী মতবাদে উদ্বুদ্ধ হতে হবে এবং বিপ্লবের নিয়মকানুন ও আন্দোলনের নিয়মকানুন

সম্বন্ধে তার জ্ঞান থাকতে হবে। তা না থাকলে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন পরিচালনার সময় সে নেতৃত্ব দিতে পারবে না। লেনিন চেয়েছিলেন, পার্টি শ্রমিক-শ্রেণীর পুরোভাগে দাঁড়াবে, শ্রমিক শ্রেণীকে পরিচালিত করবে এবং স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের লেজুড়ে পরিণত হবে না। পার্টিকে শুধু শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী হলেই চলবে না, সেই-সঙ্গে পার্টিকে সমগ্র শ্রেণীর অংশ ও বাহিনী হতে হবে এবং শ্রেণীর সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হবে। পার্টির বাইরের জনসাধারণের সঙ্গে যদি পার্টির যোগাযোগ না থাকে, জনসাধারণ যদি এর নেতৃত্ব স্বীকার করে না নেয়, তাদের কাছে যদি পার্টির কোন নৈতিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা না থাকে, তাহলে সেই পার্টি নিজ শ্রেণীকে কখনই পরিচালিত করতে পারবে না।

শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে পার্টি

[২] লেনিনের মতে, পার্টি শুধু শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনীই নয়, তা হোল শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত বাহিনী। পার্টি যদি সত্য সত্যই শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালনা করতে চায়, তাহলে তাকে নিজ শ্রেণীর সংগঠিত বাহিনী হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে পার্টির কর্তব্যকর্ম পরিচালনা করা খুবই কঠিন। অত্যন্ত কণ্টকর আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থার মধ্যে পার্টিকে শ্রমিকশ্রেণীর লড়াই পরিচালনা করতে হবে। অনুকূল পরিবেশ থাকলে বুর্জোয়াদের আক্রমণ করার জন্য পার্টি শ্রমিক-শ্রেণীকে পরিচালিত করবে। আবার প্রতিকূল পরিবেশে শক্তিশালী শত্রুর আঘাত থেকে বাঁচাবার জন্য সে শ্রমিকশ্রেণীকে পিছু হটার নির্দেশ দেবে। পার্টির বাইরেকার লক্ষ লক্ষ বিক্ষিপ্ত শ্রমিককে লড়াই-এর সময় শৃঙ্খলাবোধে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদের মধ্যে সংগঠন ও সহ্যশক্তি জাগিয়ে তোলা হোল পার্টির গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অবশ্য পার্টি যদি নিজে সংগঠন ও শৃঙ্খলাবোধের মূর্ত প্রতীক হয়, নিজে যদি শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত বাহিনী হয়, তবেই সে এই সব কর্তব্য পালন করতে পারবে। লেনিন শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকে তার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত সংগঠনের সমষ্টি হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এবং পার্টি-সভ্যকে এইসব সংগঠনের কোন-না-কোনটির সভ্য হতে হবে বলেও ঘোষণা করেছিলেন। তবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, লেনিনের কাছে পার্টি শুধু পার্টি-সংগঠনগুলিরই সমষ্টি নয়, তা হোল এইসব সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ ব্যবস্থা। এখানে উচ্চতর সংগঠন ও নিম্নতর সংগঠন যেমন রয়েছে, তেমনি সংখ্যালঘুরা সংখ্যা-গরিষ্ঠের অধীন, পার্টির কার্যকরী সিদ্ধান্তগুলি সমস্ত সভ্যের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য প্রভৃতি শর্ত সকলকেই মেনে চলতে হয়। এইসব শর্ত পালন করা না হলে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে সংগঠিত ও ধারাবাহিক নেতৃত্ব দানের উপযোগী সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পার্টি কাজ করতে পারবে না।

শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠিত বাহিনী হিসেবে পার্টি

[৩] পার্টি হোল শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত বাহিনী। কিন্তু পার্টি ছাড়াও শ্রমিক-শ্রেণীর অন্যান্য সংগঠন রয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় সমিতি, কারখানা সংগঠন, আইনসভার দল, পার্টির বাইরেকার মহিলা সমিতি, সংস্কৃতি ও শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, যুব সঙ্ঘ ইত্যাদি হোল এই ধরনের সংগঠন। এই সব সংগঠনের বেশীর ভাগ হোল পার্টির বাইরেকার

শ্রমিক শ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণীসংগঠন হিসেবে পার্টি

সংগঠন। এদের একটি অংশ প্রত্যক্ষভাবে পার্টির অন্তর্ভুক্ত কিংবা পার্টির শাখা হিসেবে কাজ করে। এগুলি না থাকলে সংগ্রামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমিকদের শ্রেণী-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। এগুলি ছাড়া বুর্জোয়া সমাজের পরিবর্তে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীকে মজবুত করে গড়ে তোলা অসম্ভব। তাই পার্টির যেসব সভ্য এইসব সংগঠনে কাজ করে তারা পার্টির বাইরেকার সংগঠনকে এমনভাবে বোঝাবে যাতে তারা নিজেদের কাজকর্মে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির কাছাকাছি চলে আসে এবং স্বেচ্ছায় তার রাজনৈতিক নেতৃত্ব মেনে নেয়। এই সব কারণে লেনিন পার্টিকে 'শ্রমিকদের শ্রেণী-সংগঠনের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ' বলে বর্ণনা করেছেন।

শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের হাতিয়ার হিসেবে পার্টি

[৪] লেনিন এই অভিমত পোষণ করেছেন যে, পার্টি শুধুমাত্র শ্রমিকদের সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণী-সংগঠনই নয়, যেখানে শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেখানে তা প্রতিষ্ঠার কাজে, যেখানে শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে তাকে সুদৃঢ় করার কাজে পার্টি হোল শ্রমিক-শ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেনিন বলেছেন, "শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্ব হোল পুরানো সমাজের শক্তি আর ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে কখনও রক্তাক্ত, কখনও রক্তপাতহীন; কখনও জবরদস্তিমূলক, কখনও শান্তিপূর্ণ; কখনও সামরিক, কখনও অর্থনৈতিক; কখনও শিক্ষামূলক, কখনও শাসনমূলক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষের অভ্যাসের শক্তিটা খুবই সাংঘাতিক শক্তি। লড়াই-এর ময়দানে মজবুত এক কঠোর পার্টি ছাড়া, শ্রমিক-শ্রেণীর বিশ্বাসভাজন পার্টি ছাড়া, জনসাধারণের মনোভাব লক্ষ্য করে তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম এমন পার্টি ছাড়া—এই ধরনের সংগ্রাম সাফল্যের সঙ্গে চালানো অসম্ভব।" সুতরাং বলা যায়, পার্টি হোল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সর্বপ্রধান হাতিয়ার।

ঐক্যবদ্ধ ইচ্ছাশক্তির প্রতীক হিসেবে পার্টি

[৫] লেনিনের মতে, সংহতি ও কঠোর শৃঙ্খলা না থাকলে পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব কায়েম করতে কিংবা তাকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে না। সব পার্টি সভ্যের মধ্যে ইচ্ছার ঐক্য এবং কার্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ঐক্য না থাকলে পার্টির মধ্যে কঠোর শৃঙ্খলার কথা ভাবাই যায় না। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে পার্টির মধ্যে বিভিন্ন মতের সংঘাতের সম্ভাবনা থাকবে না। আসলে বিভিন্ন মতামতের সংঘাতের পর যখন একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তখন সমস্ত পার্টি সভ্যকে সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করতে হবে। অন্যভাবে বলা যায়, পার্টির মধ্যে কোনরূপ উপদল থাকবে না। যদি কোনও পার্টি সভ্য পার্টির মধ্যে উপদল সৃষ্টির চেষ্টা করে, তবে অবিলম্বে তাকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করতে হবে।

[৬] লেনিন একথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, পার্টির মধ্যে দলাদলির উৎস হোল সুবিধাবাদীরা। শ্রমিকশ্রেণী সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কোন শ্রেণী নয়। ধনতন্ত্রের বিকাশের ফলে যেসব কৃষক, পেটি-বুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবীরা সর্বহারায় পরিণত হয়, তারা শ্রমিকদের দল ভারী করে। আবার একই সঙ্গে বুর্জোয়াদের উপনিবেশ-

শোষণ করা বাড়তি মুনাফায় পরিপুষ্ট শ্রমিকদের উপরতলার কিছু কিছু ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও আইনসভার শ্রমিক-সদস্যদের অধঃপতন ঘটতে থাকে। কোন-না কোনভাবে এই সব পেটি বুর্জোয়ারা পার্টির মধ্যে ঢুকে সেখানে অনৈক্য, বিশৃঙ্খলা ও দলাদলির সৃষ্টি করে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে লড়তে হলে এই ধরনের লোকদের বিরুদ্ধে নির্মম-ভাবে লড়াই চালানো এবং এদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করা একান্তভাবেই প্রয়োজন বলে লেনিন মনে করতেন।

সুবিধাবাদীদের বিতাড়ন করে পার্টিকে শক্তিশালী করা

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উদারনৈতিক তত্ত্বে রাজনৈতিক দলের প্রকৃতি ও কার্যাবলী সম্পর্কে যেসব কথা বলা হয়, মার্কসবাদী তত্ত্বে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

৭। এক-দলীয় ব্যবস্থা (One-Party System)

দ্যুভারজার এক-দলীয় ব্যবস্থাকে 'বিংশ শতাব্দীর বৃহৎ রাজনৈতিক আবিষ্কার' বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এক-দলীয় ব্যবস্থার সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ করা কঠিন। তবে সাধারণভাবে বলা যায়, যখন কোন রাষ্ট্রে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল আপন আদর্শ, নীতি ও কর্মসূচী অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করে তখন তাকে একদলীয় ব্যবস্থা বলা হয়। অধ্যাপক অ্যালমণ্ড এক-দলীয় ব্যবস্থাকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন, যথা—ক. এক-দলীয় ব্যবস্থা এবং খ. সর্বাত্মক এক-দলীয় ব্যবস্থা (Totalitarian One-party System)।

এক-দলীয় রাষ্ট্রে শাসনকার্য পরিচালনায় একটিমাত্র দলের সর্বময় কর্তৃত্ব স্বীকৃত হলেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং নির্বাচনের সময় একটিমাত্র দলের প্রার্থিগণ পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, 'তানজানিয়ার আফ্রিকান জাতীয় ইউনিয়ন' (The Tanzanian African National Union) তানজানিয়ার একমাত্র রাজনৈতিক দল হলেও নির্বাচনের সময় একই নির্বাচনী এলাকায় এই দলের একাধিক প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। এরূপ দলীয় ব্যবস্থায় একটি মাত্র রাজনৈতিক দল শাসনকার্য পরিচালনা করলেও সেই দল জনগণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে চরমভাবে নিয়ন্ত্রণ করে না।

এক-দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

কিন্তু সর্বাত্মক এক-দলীয় ব্যবস্থায় একটি মাত্র রাজনৈতিক দল জনগণের অর্থ-নৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপকে চরমভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। এরূপ দলীয় ব্যবস্থায় একটিমাত্র রাজনৈতিক দলকে এবং সেই দলের আদর্শকে চরম, অভ্রান্ত ও শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়। সর্বপ্রকার বিরোধী দল ও বিরোধী মতাদর্শকে কঠোর হস্তে দমন করা হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণের কর্তৃত্ব ঐ একটিমাত্র দলের হস্তে চূড়ান্তভাবে অর্পিত থাকে। কোন কোন সর্বাত্মক এক-দলীয় ব্যবস্থায় সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নিরূপণ করা যায় না। দলীয় শৃঙ্খলা ও নিয়মানু-বর্তিতা কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়। দলীয় আদর্শ-বিরোধী আচরণের জন্য

সর্বাত্মক এক-দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

সদস্যদের কঠোর শাস্তি পেতে হয়। নাৎসীবাদী জার্মানি ও ফ্যাসীবাদী ইতালী সর্বাত্মক এক-দলীয় ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণ-সাধারণ-তন্ত্রী চীন-সহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এক-দলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে। সর্বাত্মক এক-দলীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি লক্ষ্য করে বার্কার প্রমুখ উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সমর্থকগণ মন্তব্য করেছেন যে, এক-দলীয় ব্যবস্থা চরিত্রগতভাবে অগণতান্ত্রিক। কিন্তু নাৎসীবাদী ও ফ্যাসীবাদী এক-দলীয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য হলেও সাম্যবাদী এক-দলীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে এরূপ উক্তি সত্য নয়। কারণ প্রতিটি রাজনৈতিক দল বিশেষ একটি শ্রেণীর অধিক সচেতন ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়। সুতরাং দলীয় ব্যবস্থাকে কখনই শ্রেণী-নিরপেক্ষ বলা যায় না। যে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের অস্তিত্ব থাকে সেই সমাজে শ্রেণী-দ্বন্দ্ব থাকতে বাধ্য। শ্রেণী-দ্বন্দ্বের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের সংরক্ষক হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। কিন্তু শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একাধিক রাজনৈতিক দলের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন, গণসাধারণতন্ত্রী চীন প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সর্বহারা শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থ এক ও অভিন্ন বলে সেখানে সাম্যবাদী দল (Communist Party) নামে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল আছে। তাছাড়া, সাম্যবাদী দল 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ' (Democratic Centralism) নীতির দ্বারা পরিচালিত হয় বলে গণতন্ত্র নীতিসর্বস্ব তত্ত্বকথার ঊর্ধ্বে উঠে নিজেকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছে। নাৎসীবাদী ও ফ্যাসীবাদী সর্বাত্মক একদলীয় ব্যবস্থার মত সাম্যবাদী সর্বাত্মক এক-দলীয় ব্যবস্থায় ব্যক্তিপূজার কোন স্থান নেই। সর্বোপরি, মুমূর্ষু ধনতন্ত্রবাদকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য জার্মানি ও ইতালিতে যথাক্রমে নাৎসী দল ও ফ্যাসিস্ট দলের অভ্যুত্থান ঘটেছিল। মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির অবাধ লুণ্ঠন ও দুনিয়াব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য এই দলগুলি গণতন্ত্রকে হত্যা করে নির্মম ও অমানুষিক নির্যাতন ব্যবস্থা কায়েম করে। অন্যদিকে ধনতন্ত্রবাদের সমাধি রচনা করে সর্বহারার রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য রাশিয়া ও চীনে সাম্যবাদী দল প্রতিষ্ঠিত হয়।

৮। প্রভুত্বকারী দলীয় ব্যবস্থা (Dominant Party System)

যখন কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একাধিক রাজনৈতিক দল থাকলেও সরকার গঠন ও পরিচালনা ব্যাপারে একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের প্রভুত্ব বা কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে, তখন তাকে 'প্রভুত্বকারী দলীয় ব্যবস্থা' বলে অভিহিত করা হয়।

সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

এরূপ দলীয় ব্যবস্থায় অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হলেও কার্যক্ষেত্রে তাদের প্রভাব অত্যন্ত কম। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় অনেক সময় রাজ্যগুলিতে অন্য রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন হতে পারে কিংবা কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দল অন্য কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত করে অন্যান্য দলের বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে পারে। ১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে ভারতবর্ষের দলীয় ব্যবস্থাকে প্রভুত্ব-কারী দলীয় ব্যবস্থা বলে অভিহিত করা যায়। স্বাধীনতার পর থেকে শুরু করে ১৯৭৭

সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে একাদিক্রমে ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেস দলের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অনুরূপভাবে জাপানেও বর্তমান 'লিবারেল ডেমোক্রেটিক দল' (Liberal Democratic Party) জাপানী আইনসভায় (Diet) এবং জাপানী রাজনীতিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার অধিকারী। তবে প্রভুত্বকারী দলীয় ব্যবস্থার সঠিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা কষ্টকর। তাছাড়া, অবাধ, নিরপেক্ষ ও দুর্নীতি-মুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে প্রভুত্বকারী দলের প্রভুত্বের মাত্রা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় অবাধ, নিরপেক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল যে-কোন উপায়েই হোক্, তার প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়।

৯। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা (Bi-party System)

সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ

কোন রাষ্ট্রে দুটির বেশী রাজনৈতিক দল থাকলেও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা যখন দুটি মাত্র প্রধান ও প্রায়-সম-ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তখন তাকে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বলা হয়। দুটি দলের মধ্যে নির্বাচনে বিজয়ী অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী দলটি সরকার গঠন করে এবং অন্যটি বিরোধী দল হিসেবে কার্য সম্পাদন করে। এইভাবে সুদীর্ঘকাল ধরে দুটি দলই কেবলমাত্র পর্যায়ক্রমে শাসনকার্য পরিচালনা করে। অন্যান্য দলগুলি সরকারের উপর নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারে সক্ষম হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন প্রভৃতি দেশে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করা যায়। অ্যালমন্ড দ্বি-দলীয় ব্যবস্থাকে 'অস্পষ্ট দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা' (Indistinct Bi-party System) এবং 'সুস্পষ্ট দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা' (Distinct Bi-party System)—এই দুভাগে বিভক্ত করেছেন।

অস্পষ্ট দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা

যে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ ও কর্মসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য থাকে না তাকে 'অস্পষ্ট দ্বি-দলীয়' ব্যবস্থা বলা হয়। গণভিত্তিক দলের অনুপস্থিতি, নির্বাচনভিত্তিক কার্যাবলী, দলীয় নিয়মশৃঙ্খলার অভাব, দলীয় সংগঠনের স্তরবিন্যাসের অভাব ইত্যাদি হোল এরূপ দলীয় ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সেখানে রিপাবলিকান দল (Republican Party) ও গণতন্ত্রী দলের (Democratic Party) আদর্শ ও কর্মসূচীর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। জাতীয় এবং পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে উভয় দলই চরম কমিউনিস্ট-বিরোধী আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়।

কিন্তু সুস্পষ্ট দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় দুটি দলের আদর্শ ও কর্মসূচীর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। দলীয় সংগঠনের এককেন্দ্রিক প্রবণতা ও স্তরবিন্যাস, সুদৃঢ় নিয়মশৃঙ্খলা, শ্রেণীভিত্তিক দলীয় গঠন ইত্যাদি এরূপ দলীয় ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তবে প্রধানতঃ শ্রেণী-স্বার্থের ভিত্তিতে প্রধান দুটি দল গঠিত হলেও অনেক ক্ষেত্রে দলগঠনের সময় ধর্মীয় প্রভাবও কাজ করতে পারে। গ্রেট ব্রিটেনের

দলীয় ব্যবস্থা সুস্পষ্ট দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রক্ষণশীল দল (Conservative Party) ও শ্রমিক দলের (Labour Party) মধ্যে মতাদর্শগত ও কর্মসূচীগত পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। তবে সূক্ষ্মভাবে বিচারবিশ্লেষণ করলে উভয় দলের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায় না। উভয় দলই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধারক এবং বাহক।

১০। বহু-দলীয় ব্যবস্থা (Multy-party System)

সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ

যে দেশে দুটির বেশী সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকে তাকে বহু-দলীয় ব্যবস্থা বলা হয়। এরূপ দলীয় ব্যবস্থায় শ্রেণী, বর্ণ, জাতি, ধর্ম ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক দলগুলি গঠিত হতে পারে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আপন আপন মতাদর্শ, নীতি ও কর্মপন্থার উপর ভিত্তি করে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সমর্থনপুষ্ট দল সরকার গঠন করে এবং অন্যান্য দল বিরোধী পক্ষের ভূমিকা পালন করে। বহু-দলীয় ব্যবস্থায় কোন দল এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে ব্যর্থ হলে 'সম্মিলিত সরকার' গঠিত হয়। এই ধরনের সরকার প্রকৃতিগতভাবে দুর্বল ও অস্থায়ী হয়। অনেক সময় বিরোধী দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাস করে সরকারের পতন ঘটাতে পারে। তবে আদর্শ-ভিত্তিক হলে এবং কিছুটা কর্মসূচীগত মিল থাকলে এরূপ সরকার স্থায়ী ও মঙ্গলদায়ক হতে পারে। ফ্রান্স, ইতালী, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি রাষ্ট্রে এরূপ দলীয় ব্যবস্থা বর্তমান রয়েছে।

অ্যালমন্ড, অ্যালান বল (Alan R. Ball) প্রমুখ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ বহু-দলীয় ব্যবস্থাকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন, যথা—ক. কার্যকরী বহুদলীয় ব্যবস্থা (Working Multy-party System) এবং খ. অস্থায়ী বহুদলীয় ব্যবস্থা (Unstable Multy-party System)।

কার্যকরী বহু-দলীয় ব্যবস্থা

কার্যকরী বহুদলীয় ব্যবস্থায় অনেকগুলি দলের অস্তিত্ব থাকে। ঐ দলগুলি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সত্য, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সরকার গঠন ও পরিচালনার ব্যাপারে দুটি মাত্র শক্তিশালী দলের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি রাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

অস্থায়ী বহু-দলীয় ব্যবস্থা

অস্থায়ী বহু-দলীয় ব্যবস্থায় অনেকগুলি রাজনৈতিক দল থাকলেও কার্যক্ষেত্রে কোন দলই যথেষ্ট ক্ষমতাশালী নয়। সাধারণতঃ বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী দলগুলিকে বাদ দিয়ে মধ্যপন্থী দলগুলি নির্বাচনী আঁতাত গড়ে তোলে এবং নির্বাচনে জয়লাভ করলে 'সম্মিলিত সরকার' (Coalition Government) গঠন করে। বলা বাহুল্য, প্রকৃতিগতভাবে এই সরকার দুর্বল ও স্বল্পস্থায়ী হয়। ইতালী ও ফ্রান্সে অস্থায়ী বহু-দলীয় ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করা যায়।

কার্যকরী বহু-দলীয় ব্যবস্থা ও অস্থায়ী বহু-দলীয় ব্যবস্থা ছাড়াও অন্য এক

প্রকার বহু-দলীয় ব্যবস্থা রয়েছে। এ ধরনের বহু-দলীয় ব্যবস্থার নাম সাম্যবাদী বহু-দলীয় ব্যবস্থা (Communist Multy-party System)। পূর্ব ইউরোপের সাম্যবাদী দেশগুলিতে এ ধরনের দলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত রয়েছে। এইসব দেশে সাম্যবাদী ও শ্রমিক দলগুলি অন্যান্য দলের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে সরকার গঠন করে। কিন্তু এরূপ দলীয় ব্যবস্থায় নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কারণ কেবলমাত্র সাম্যবাদী দল (Communist Party) নির্বাচনে সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের তালিকা প্রস্তুত করে। অন্যভাবে বলা যায়, সাম্যবাদী বহু-দলীয় ব্যবস্থায় সাম্যবাদী দলের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব সর্বক্ষেত্রেই বিরাজমান। অনেকে তাই এরূপ দলীয় ব্যবস্থাকে প্রভুত্বকারী দলীয় ব্যবস্থা ব'লে অভিহিত করার পক্ষপাতী, কিন্তু এল্যান বল প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ এই প্রকার দলীয় ব্যবস্থাকে সর্বাত্মক দলীয় ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন। পূর্ব-জার্মানিতেও এই প্রকার দলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত রয়েছে।

সাম্যবাদী বহুদলীয় ব্যবস্থা

১১। এক-দলীয় ব্যবস্থার গুণাগুণ (Merits and Demerits of One-party System)

একদলীয় ব্যবস্থার গুণাগুণকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মত-পার্থক্য রয়েছে।

সপক্ষে যুক্তি (Arguments for) : এক দলীয় ব্যবস্থার সপক্ষে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদর্শন করা হয় :

(১) এক-দলীয় ব্যবস্থায় একটি মাত্র রাজনৈতিক দল জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করতে সমর্থ বলে সহজেই জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সাধন এবং বলিষ্ঠ শাসন প্রবর্তন করা অনেক বেশী সহজ। একাধিক দলীয় ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলি কাজ করে বলে পারস্পরিক ঘৃণা, দ্বন্দ্ব, বিভেদ প্রভৃতি জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করে।

জাতীয় ঐক্য, সংহতি প্রভৃতির সংরক্ষণ

(২) এক-দলীয় ব্যবস্থায় একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকায় সেই দল একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শের উপর ভিত্তি করে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য সুস্পষ্ট নীতি ও কর্মসূচী নির্ধারণ করে সহজেই জনকল্যাণ সাধন করতে পারে। একাধিক দলীয় ব্যবস্থায় বিভিন্ন দলের নীতি ও কর্মসূচীর মধ্যে কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকার ফলে জনগণ বিভ্রান্ত হয়। আবার শাসনকার্য পরিচালনার সময় নানারূপ জটিলতার সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

সুস্পষ্ট নীতি ও কর্মপন্থা নির্ধারণ সম্ভব

(৩) একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকলে সেই দলকে অন্যান্য বিরোধী দলের সম্মুখীন হতে হয় না। নিজ কর্মসূচী অতি দ্রুত বাস্তবে রূপায়িত করে সেই দল দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করতে পারে।

দেশেরর দ্রুত উন্নতি সাধন

(৪) একাধিক দলীয় ব্যবস্থায় নির্বাচনী প্রচার, দলীয় সংগঠন প্রভৃতির জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থের অপচয় হয় এক-দলীয় ব্যবস্থায় তা লক্ষ্য করা যায় না।

তাছাড়া, একাধিক দলীয় ব্যবস্থায় আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক ও ভোটাভুটির জন্য বহু মূল্যবান সময় ব্যয়িত হয়। এর ফলে অনেক সময় জাতীয় প্রয়োজনে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত ও ব্যাহত হয়। একদলীয় ব্যবস্থা এ দিক থেকে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত।

অপচয়মূলক নয়

(৫) অনেক সময় বহু-দলীয় ব্যবস্থায় কোন একটি দল এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে ব্যর্থ হলে 'সম্মিলিত সরকার' (Coalition Government) গঠিত হয়। কিন্তু সরকারগঠনকারী দলগুলির পারস্পরিক স্বার্থ-দ্বন্দ্ব সরকারকে অস্থায়ী করে তোলে। এক-দলীয় ব্যবস্থায় একটিমাত্র রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করতে পারে বলে তা প্রকৃতিগতভাবে অনেক বেশী সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুদৃঢ় সরকারের প্রতিষ্ঠা

(৬) সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শের উপর গণতন্ত্রের ইমারত দাঁড়িয়ে থাকে। যে-সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি সে সমাজে রাষ্ট্র ধনিক-বণিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার যন্ত্র হিসেবে কাজ করে। এরূপ সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র জনগণের রাজনৈতিক অধিকারসমূহ মূল্যহীন হয়ে পড়তে বাধ্য। উদারনৈতিক পশ্চিমী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধন-বৈষম্য ব্যাপকভাবে বিদ্যমান থাকায় সেখানে প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অদ্যাবধি সম্ভব হয়নি। গণতন্ত্রের মহান্ আদর্শের আড়ালে ধনিক-বণিক শ্রেণীর প্রাধান্য ও শোষণ অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন, গণসাধারণতন্ত্রী চীন প্রভৃতি একদলীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের পরিবর্তে শাসনকার্য পরিচালনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা থাকায় জনসাধারণ রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। সুতরাং গণতন্ত্র বলতে যদি 'জনগণের দ্বারা জনগণের শাসন' বোঝায়, তাহলে কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহেই তা সম্ভব। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধনবৈষম্য হেতু প্রকৃত গণতন্ত্রের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করা যায় না। সর্বোপরি বলা যায়, যেহেতু প্রতিটি রাজনৈতিক দল শ্রেণী-স্বার্থের বাহক সেহেতু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রমিক-কৃষকের এক অভিন্ন শ্রেণী-স্বার্থ থাকায় সেখানে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকাই স্বাভাবিক। সুতরাং এক দলীয় রাষ্ট্রে গণতন্ত্র থাকে না—এই অভিযোগ সত্য নয়। তবে ফ্যাসিবাদী ও নাৎসীবাদী এক-দলীয় ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের কোন অস্তিত্ব থাকে না—এ কথা সত্য।

প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

বিপক্ষে যুক্তি (**Arguments Against**): শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে এক-দলীয় রাষ্ট্রের মারাত্মক ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি উপেক্ষণীয় নয়। বার্কার প্রমুখ উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সমর্থক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ এক-দলীয় ব্যবস্থাকে 'গণতন্ত্রের অস্বীকার' বলে বর্ণনা করেছেন, কারণ:

[ক] গণতন্ত্রের মূল কথা হোল 'জনগণের শাসন' প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে এক-দলীয় ব্যবস্থা থাকলে একটি মাত্র আদর্শ, একটি মাত্র দল ও একজন মাত্র নেতাকে স্বীকার করে নিতে জনগণকে বাধ্য করা হয়। জনসাধারণ স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে কিংবা ভোটদান করতে পারে না। ব্যক্তি-স্বাধীনতা না

থাকায় প্রতিটি ব্যক্তি নিষ্ক্রিয়ভাবে যন্ত্রবৎ কাজ করে। শাসনকার্য পরিচালনায় তাদের সুচিন্তিত মতামত স্থাপনের অবকাশ না থাকায় এবং সক্রিয় অংশ-গ্রহণের সুযোগের অভাবে এক-দলীয় শাসন 'জনগণের শাসনে' রূপান্তরিত হতে পারে না।

শাসনকার্যে জনগণের ভূমিকা অস্বীকৃত

[খ] শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে এক-দলীয় ব্যবস্থায় কোন বিরোধী দলের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না বলে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল অতি সহজেই স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু একাধিক দলীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দল থাকার ফলে সরকারকে সংযতভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে হয়। অন্যথায়, পরবর্তী নির্বাচনে জনসাধারণ তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে। কিন্তু একদলীয় ব্যবস্থায় একটি মাত্র রাজনৈতিক দল স্বৈরাচারী হয়ে উঠলেও জনসাধারণ সরকার পরিবর্তনের কোন সুযোগ পায় না।

স্বৈরাচারিতার নামান্তর

[গ] শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে একদলীয় ব্যবস্থায় সমস্ত বিরোধী মতাদর্শ ও রাজ-নৈতিক দলকে কঠোর হস্তে দমন করে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল নিজ ক্ষমতা ও প্রাধান্যকে সর্বব্যাপী করে তোলে। জনসাধারণ সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত জীবন-যাপন করে। তাই জেনিংস (Jennings) মন্তব্য করেছেন, "বিরোধিতা না থাকলে গণতন্ত্রও থাকতে পারে না।"

দমনমূলক শাসন

[ঘ] এক-দলীয় ব্যবস্থায় জনমত উপেক্ষিত হয় বলে অনেক সময় জনগণের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ বিপ্লবের আকারে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। কারণ শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে একাধিক রাজনৈতিক দল না থাকায় একটিমাত্র দলের দ্বারা সর্বশ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষিত হয় না। উপেক্ষিত জনগণ তাই বিপ্লবের মাধ্যমে স্বৈরাচারী ও দমনমূলক শাসনের অবসান ঘটাতে বদ্ধপরিকর হয়।

বিপ্লবের সম্ভাবনা প্রবল

'গণতন্ত্রের হন্তারক' বলে এক-দলীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তা নাৎসীবাদী ও ফ্যাসিবাদী সর্বাত্মক একদলীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই কেবলমাত্র আনীত হতে পারে। সাম্যবাদী সর্বাত্মক এক-দলীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনয়ন করা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত এবং বিভ্রান্তিকর বলে মনে করা হয়। কারণ অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এরূপ সমাজব্যবস্থায় 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা'র নীতি অনুসরণ করে জনমতকে যথাযোগ্য মূল্য দেওয়া হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন, গণসাধারণতন্ত্রী চীন প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারী কার্যাবলীর চরম সমালোচনা করার অধিকার জনসাধারণের আছে। একথা সত্য যে, দৃষ্টিভঙ্গীর ভিন্নতা হেতু এক-দলীয় রাষ্ট্রে গণতন্ত্র থাকা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়। তবে সর্বাধিক সংখ্যক জনগণের কল্যাণসাধন যদি গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য হয় তাহলে সমাজতান্ত্রিক একদলীয় রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব বর্তমান—এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

উপসংহার

১২। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার গুণাগুণ (Merits and Demerits of Bi-party System)

সপক্ষে যুক্তি (Arguments for) : ল্যাস্কি (Laski), বার্কার প্রমুখ রাষ্ট্র-

বিজ্ঞানিগণ দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার উৎকর্ষ প্রমাণ করার জন্য সাধারণতঃ নিম্নলিখিত যুক্তির অবতারণা করেন ঃ

(১) গণতন্ত্র হোল জনমত পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। দেশে দুটি মাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল থাকলে জনসাধারণ উভয় দলের মতাদর্শ, নীতি ও কর্মপন্থা সহজেই উপলব্ধি করতে পারে। উভয় দলের গুণাগুণ বিচার করা সহজসাধ্য বলে জনসাধারণ অতি সহজেই নিজেদের মনোমত প্রার্থী নির্বাচন করতে পারে। এর ফলে সুষ্ঠু ও সবল জনমত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

সুষ্ঠু ও সবল জনমতের প্রকাশ

(২) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় যে দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দল এককভাবে সরকার গঠন করতে সমর্থ হয়। সরকারী দলের সদস্যরা সম-আদর্শ, অভিন্ন কর্মপন্থা ও সুসংহত দলীয় শৃঙ্খলায় আবদ্ধ বলে সরকার স্বাভাবিকভাবেই স্থায়িত্বলাভ করে। তাছাড়া, সরকারী দলের পশ্চাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সুস্পষ্ট সমর্থন থাকে বলে সরকারী দল নিশ্চিন্ত মনে একাগ্রচিত্তে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারে।

সরকার স্থায়িত্বলাভ করে

(৩) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় দুটিমাত্র দল থাকায় দলীয় সদস্যদের মধ্যে সংকীর্ণ স্বার্থপর মনোবৃত্তি প্রসারিত হওয়ার সুযোগ পায় না। সরকারী ও বিরোধী দলকে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য সুস্পষ্টভাবে জনগণের নিকট দায়িত্বশীল থাকতে হয় বলে প্রতিটি দল জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যস্ত থাকে। ফলে ব্যক্তি-স্বার্থ, গোষ্ঠী-স্বার্থ প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে উপদল বা কুচক্রী দল গঠনের সম্ভাবনা এক রকম দেখা যায় না বললেই চলে।

জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষিত হয়

(৪) সম-ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি রাজনৈতিক দল থাকলে সরকারী দল স্বৈরাচারী হয়ে গণতন্ত্রের ধ্বংস সাধনে আত্মনিয়োগ করতে পারে না। কারণ এরূপ দলীয় ব্যবস্থায় শক্তিশালী বিরোধী দল সরকারের প্রতিটি ত্রুটিবিচ্যুতির সমালোচনা করে সরকারী কাজকর্ম সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত রাখে। সরকার পক্ষ বিরোধী দলের সমালোচনার ভয়ে সংযতভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে। তাছাড়া, ব্যাপক জনকল্যাণ সাধনের মাধ্যমে সরকারী দল তার প্রতি জনসমর্থন অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করে, ফলে স্বল্প সময়ে দেশের আশাতীত উন্নতি সাধিত হয়।

স্বৈরাচারিতার সম্ভাবনা কম

বিপক্ষে যুক্তি (Arguments Against) ঃ দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। যথা ঃ

[ক] প্রতিটি সমাজে জনসাধারণের মতামত বহুমুখী এবং ভিন্ন ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। দুটি মাত্র রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সেই সব মতামত যথার্থভাবে কখনই প্রকাশিত হতে পারে না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও জনসাধারণ যে-কোন একটি দলকে সমর্থন করতে বাধ্য হয়। আপামর জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা দুটিমাত্র দলের মাধ্যমে পূর্ণভাবে প্রকাশিত হতে পারে না। বিশেষতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত সম-আদর্শে বিশ্বাসী দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একথা বিশেষ-

অগণতান্ত্রিক

ভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং সুষ্ঠু জনমত প্রকাশের ব্যবস্থা না থাকায় দ্বি-দলীয় ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র-বিরোধী বলে মনে করা হয়।

[খ] দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় দুটি দল থাকার ফলে যে দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দল সরকার গঠন করে। দলীয় আদর্শ ও নিয়মানুবর্তিতার শৃঙ্খলে সদস্যগণের মধ্যে সংহতি রক্ষা করা হয় বলে শাসক দল অতি সহজেই স্বার্থপর ও সংকীর্ণ নীতি অনুসরণ করে স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে। সংখ্যালঘু বিরোধী পক্ষের সমালোচনায় সরকারী দল কর্ণপাত করে না। ফলে গণতন্ত্র আদর্শভ্রষ্ট হয়ে পড়ে।

স্বৈরাচারিতার সম্ভাবনা প্রবল

[গ] অধ্যাপক রামসে মুর (Ramsay Muir) এর মতে, দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় সরকারের যাবতীয় কার্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নির্দেশে পরিচালিত হয় বলে পার্লামেন্টের উপর অনেক সময় ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভার প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। অনেকে মন্ত্রিসভার এই সর্বব্যাপী প্রাধান্যকে 'নয়া স্বৈরাচার' (New despotism) বলে অভিহিত করেছেন। এ বিষয়ে গ্রেট ব্রিটেনে 'ক্যাবিনেট একনায়কত্বে'র (Cabinet dictatorship) কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মন্ত্রিসভার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়

[ঘ] দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় একবার কোন রকমে প্রচার-কৌশলে জনগণকে বিভ্রান্ত করে সরকার গঠন করা সম্ভব হলে সরকারী দল ছলে-বলে-কৌশলে আপন প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করে। এইভাবে কায়েমী স্বার্থের ব্যাপক সম্প্রসারণের ফলে জনস্বার্থ উপেক্ষিত হতে পারে।

কায়েমী স্বার্থ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা প্রবল

পরিশেষে বলা যায় যে, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে ধনতন্ত্রে বিশ্বাসী দুটি দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ব্যবস্থা ধনিক-বণিক-শ্রেণীর দুটি দলের মধ্যে নির্বাচনী লড়াই সীমাবদ্ধ রেখে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে স্থায়িত্ব প্রদান করে বলে অনেকে মনে করেন।

১৩। বহু-দলীয় ব্যবস্থার গুণাগুণ (Merits and Demerits of Multi-Party System)

বহু-দলীয় ব্যবস্থার গুণাগুণকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

গুণ (Merits) : এরূপ দলীয় ব্যবস্থার সপক্ষে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শিত হয় :

(১) দেশের মধ্যে অনেকগুলি রাজনৈতিক দল থাকলে প্রতিটি ব্যক্তি নিজের পছন্দমত প্রতিনিধিকে ভোট দিতে পারে। ফলে ব্যক্তিত্বের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ যথাযথভাবে ঘটতে পারে ; সমাজের স্বাভাবিক বিকাশ অব্যাহত থাকে। আর্থার হোলকম্ব (Arthur Holeombe)-এর মতে, যে-সমাজে মতামতের ভিন্নতা এবং বিশ্বাসের গভীরতা প্রাধান্যলাভ করে, সেখানে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থাকে জনমত প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম বলে গ্রহণ করা যায় না।

জনমতের প্রকাশ সম্ভব

বস্তুতঃ বহু-দলীয় ব্যবস্থাকে সমাজের ভিন্নমুখী জনমত প্রকাশের প্রকৃত বাহন বলে বর্ণনা করা যেতে পারে।

(২) বহু-দলীয় ব্যবস্থায় কোন একটি রাজনৈতিক দল অপ্রতিহত প্রাধান্য বিস্তার করে শাসন ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে পারে না। ফলে এরূপ দলীয় ব্যবস্থায় কায়েমী স্বার্থের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় না।

কায়েমী স্বার্থের প্রকাশ ঘটে না

(৩) এরূপ দলীয় ব্যবস্থায় কোন একটি রাজনৈতিক দল নিরঙ্কুশ এবং অপ্রতিহত প্রাধান্যলাভ করতে সমর্থ হয় না বলে স্বৈরাচারিতার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। এইভাবে একটি দলের স্বৈরাচারিতার হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করে বহুদলীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ বজায় রাখে।

স্বৈরাচারিতার সম্ভাবনা কম

(৪) বহু-দলীয় ব্যবস্থার আইনসভায় বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিবৃন্দ প্রেরিত হন। তাই ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভার বশংবদ হয়ে আইনসভা কার্য সম্পাদন করে না। বরং ক্যাবিনেটের উপর আইনসভার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক্যাবিনেটে এক-নায়কত্বের সুযোগ কম

(৫) দেশের মধ্যে অনেকগুলি দলের অস্তিত্ব থাকলে সমাজের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হতে পারে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজ নিজ মতাদর্শ ও কর্মসূচী অনুযায়ী সেই সব সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করে। একই সমস্যা সম্বন্ধে ভিন্নমুখী আলোচনা জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার ঘটায়। বলা বাহুল্য, রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত জনগণই কেবলমাত্র সুনাগরিক হিসেবে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকল্পে যথার্থভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারে।

রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার

দোষ (Demerits) : বহু-দলীয় ব্যবস্থার সপক্ষে নানাপ্রকার যুক্তি-তর্কের অবতারণা করা হলেও এর ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিকে উপেক্ষা করা যায় না।

(ক) বহু-দলীয় ব্যবস্থায় অনেকগুলি দল থাকার ফলে নির্বাচনে একটিমাত্র দলের পক্ষে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সব সময় সম্ভব হয় না। বিভিন্ন দলের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতে একাধিক দল নিয়ে 'সম্মিলিত সরকার' (Coalition Government) গঠিত হয়। কিন্তু পারস্পরিক স্বার্থ-দ্বন্দ্ব এবং আদর্শগত সংঘাত এরূপ সরকারকে দুর্বল ও স্বল্পস্থায়ী করে তোলে। অনেক সময় একটি দল আপেক্ষিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করলেও যে-কোন সময় বিরোধী দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাস করে সেই সরকারের পতন ঘটাতে পারে। তাই বহুদলীয় ব্যবস্থায় সুদৃঢ় ও স্থায়ী সরকারের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন।

সরকারের স্থায়িত্বহীনতা

(খ) উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সাফল্যের অন্যতম অপরিহার্য শর্ত হোল শক্তিশালী বিরোধী দলের অবস্থিতি। কিন্তু বহু-দলীয় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে আদর্শগত ও স্বার্থগত দ্বন্দ্ব বর্তমান থাকায় বিরোধী দলগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে পারে না। দুর্বল বিরোধী দলগুলির অনৈক্যের সুযোগে সরকারী দল স্বৈরাচারী হয়ে জনস্বার্থ উপেক্ষা করতে পারে।

শক্তিশালী বিরোধী দলের অভাব

(গ) বহু-দলীয় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলি ব্যাপকভাবে প্রচারকার্য চালিয়ে আপন আপন আদর্শ ও কর্মসূচীর সমর্থনে জনমত গঠনের চেষ্টা করে। পরস্পর-বিরোধী নানা প্রকার বক্তব্যে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। অনেক সময় ধনিক শ্রেণীর সমর্থন-পুষ্ট রাজনৈতিক দলগুলি অর্থের জোরে ব্যাপক প্রচারকার্যের মাধ্যমে মিথ্যাকেও সত্য বলে প্রমাণ করে। বিভ্রান্ত জনগণ অনেক সময় যোগ্য প্রার্থীকে ভোট না দিয়ে অযোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে। তাই বহু-দলীয় ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু জনমত গঠন ও প্রকাশের মাধ্যম বলে মনে করার কোন সংগত কারণ নেই।

সুষ্ঠু জনমত গঠিত হয় না

(ঘ) দেশে অনেকগুলি রাজনৈতিক দল থাকলে নির্বাচনের সময় অকারণ উত্তেজনা ও অশান্ত পরিবেশ সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে পারে। এই অবস্থা গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পক্ষে আদৌ কাম্য নয়।

সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়

(ঙ) অনেকের মতে বহুদলীয় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলি জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা সঙ্কীর্ণ ব্যক্তি-স্বার্থ ও দলীয় স্বার্থকে বড় বলে মনে করে। প্রচার-কৌশলে এবং দুর্নীতিমূলক কার্যের মাধ্যমে জনগণকে বিভ্রান্ত করে কোন-রকমে একবার ক্ষমতা দখল করতে পারলে সরকারী দল সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে দ্বিধাবোধ করে না। বলা বাহুল্য, এর ফলে সামগ্রিকভাবে জাতীয় স্বার্থ বিনষ্ট হয়; গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটে।

জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষিত হয়

পরিশেষে বলা যায় যে, বহু-দলীয় ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য হলেও অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এর ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলির উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক ল্যাস্কি (Laski)-র মতে, "যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা দুটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের পারস্পরিক বিরোধিতার ভিত্তিতে গড়ে উঠে তা অধিকতর সন্তোষজনক।" কিন্তু মার্কসবাদী লেখকদের মতে বৈষম্যমূলক সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হয়। যে-সমাজে শ্রেণী-দ্বন্দ্ব থাকে সেখানে একাধিক রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ অবশ্যম্ভাবী।

উপসংহার

১৪। এক-দলীয় ব্যবস্থা ও গণতন্ত্র (One-party System and Democracy)

বার্কার প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, এক-দলীয় ব্যবস্থা প্রকৃতিগতভাবে অগণতান্ত্রিক। তাঁরা একদলীয় ব্যবস্থাকে একনায়কতন্ত্রের নামান্তর বলে মনে করেন। এরূপ দলীয় ব্যবস্থায় একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের মতাদর্শকে চরম ও অভ্রান্ত বলে প্রচার করা হয়। অন্য কোন রাজনৈতিক দলকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। স্বাধীন চিন্তার অধিকার, স্বাধীন-ভাবে মতামত প্রকাশের অধিকার প্রভৃতি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা হয়। অথচ স্বাধীনতাই হোল গণতন্ত্রের প্রাণ। একাধিক রাজনৈতিক দলের অবস্থিতি না থাকলে জনমত যথার্থভাবে প্রকাশিত হতে পারে না। জনসাধারণের দৈহিক অপমৃত্যু না ঘটলেও মানসিক অপমৃত্যু ঘটে। নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে

এক-দলীয় ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটে

উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সমর্থকবৃন্দ নাৎসী জার্মানি, ফ্যাসিস্ট ইতালী, সাম্যবাদী সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণ-সাধারণতন্ত্রী চীন প্রভৃতি দেশের দলীয় ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেন। ঐ সব রাষ্ট্রে সমস্ত বিরোধী দলকে নিষিদ্ধ করে, সর্বপ্রকার বিরোধী সমালোচনার কণ্ঠরোধ করে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে। সমালোচকদের মতে, ঐ সব দেশের রাষ্ট্র একটি বিশেষ দলের নিষ্পেষণযন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, এক দলীয় ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটে।

শোষণহীন রাষ্ট্রে এক-দলীয় শাসনেও প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব

কিন্তু মার্কসবাদী লেখকেরা ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, প্রতিটি রাজনৈতিক দল বিশেষ একটি শ্রেণীর অধিক শ্রেণী-সচেতন ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়। তাই দলীয় ব্যবস্থাকে কখনই শ্রেণী-নিরপেক্ষ বলা যায় না। যে-সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী-স্বার্থের অস্তিত্ব থাকে সেই সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্ব থাকতে বাধ্য। শ্রেণী-দ্বন্দ্বে জয়লাভ করার জন্য প্রতিটি শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে চায়। এরূপ ক্ষেত্রে একাধিক রাজনৈতিক দলের অবস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় তাই একাধিক দলের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একাধিক রাজনৈতিক দলের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বহারা শ্রমিক-কৃষকদের স্বার্থ এক ও অভিন্ন বলে সেখানে সাম্যবাদী দল (Communist Party) নামে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল আছে। তাছাড়া, সাম্যবাদী দল গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ (Democratic Centralism) নীতির দ্বারা পরিচালিত হয় বলে গণতন্ত্র নীতিসর্বস্ব তত্ত্বকথার ঊর্ধ্বে উঠে নিজেকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছে। সর্বোপরি, সোভিয়েত ইউনিয়নে দেশের যাবতীয় ক্ষমতা জনগণের হস্তে অর্পিত থাকায়, সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রবর্তিত হওয়ায়, অবাধ ও স্বাধীনভাবে নির্বাচন করার ও নির্বাচিত হওয়ার স্বাধীনতা থাকায়, অযোগ্য ও অপদার্থ জনপ্রতিনিধিদের প্রত্যাহার করার ব্যবস্থা থাকায়, সরকারকে সমালোচনা করার অধিকার থাকায়, গণভোটের ব্যবস্থা থাকায় এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ স্বীকৃতিলাভ করায় গণতন্ত্র বাস্তবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু তথাকথিত পশ্চিমী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে গণতন্ত্র বলে চিহ্নিত করে কার্যক্ষেত্রে গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করা হয়েছে। বস্তুতঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য-বৈষম্য বজায় রেখে জনগণকে রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করা প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। এরূপ সমাজব্যবস্থায় রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভুত্বকারী সংখ্যালঘু ধনিক-বণিক শ্রেণীর কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। সংখ্যালঘু শ্রেণী নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থে পরিচালিত শাসনব্যবস্থাকে গণতন্ত্র বলে চিহ্নিত করে। কার্যক্ষেত্রে এরূপ শাসনব্যবস্থা গণতন্ত্রের অস্বীকার মাত্র। এইসব উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সর্বহারা শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত কোন বামপন্থী দলকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া হয় না। লেনিনের মতে, এই সব রাষ্ট্রে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তা বুর্জোয়া স্বার্থের পরিপন্থী না হয়। সুতরাং বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলিতে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকলেও কার্যক্ষেত্রে সেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না।

তবে এ কথা সত্য যে, নাৎসীবাদী ও ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করা যায় না। হিটলারের নাৎসী দল বা মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট দল হতাশাগ্রস্ত মধ্যবিত্ত পুঁজিপতিদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এই দলগুলি একদিকে যেমন উগ্র জাতীয়তাবাদ, বর্ণ-বিদ্বেষ, যুদ্ধবাজ আদর্শ প্রভৃতি প্রচার করেছে, অন্যদিকে তেমনি ব্যক্তিপূজা, পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা, মুষ্টিমেয়ের শাসন প্রবর্তন; চূড়ান্ত দমননীতি অনুসরণ প্রভৃতির মাধ্যমে গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করেছে। মুমূর্ষু ধনতন্ত্রবাদ পুনরুজ্জীবিত করার জন্যই জার্মানি ও ইতালীতে যথাক্রমে নাৎসী দল ও ফ্যাসিস্ট দলের অভ্যুত্থান ঘটেছিল। মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির অবাধ লুণ্ঠন ও দুনিয়াব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য এই দলগুলি সর্বপ্রকার বিরোধী দলের বিলোপ সাধন করে গণতন্ত্রকে টুঁটি টিপে হত্যা করেছে। কিন্তু ধনতন্ত্রবাদের সমাধি রচনা করে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য রাশিয়া এবং চীনে সাম্যবাদী দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, কার্যাবলী ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই সাম্যবাদী দলের সঙ্গে ফ্যাসিবাদী ও নাৎসীবাদী দলগুলির পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সমর্থকদের চোখে এইসব অগণতান্ত্রিক দলগুলির সঙ্গে সাম্যবাদী দলের কোন পার্থক্য নেই। তাঁরা কেবলমাত্র দলের সংখ্যার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক এবং অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী যে অবৈজ্ঞানিক এবং পক্ষপাত-দোষে দুষ্ট সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বস্তুতঃ রাজনৈতিক দলের সংখ্যা অপেক্ষা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রেণী-বিন্যাস, রাজনৈতিক দলের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, কার্যাবলী প্রভৃতি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গণতন্ত্রের ইমারত দাঁড়িয়ে থাকে।

নাৎসীবাদী ও ফ্যাসিবাদী এক-দলীয় ব্যবস্থায় গণতন্ত্র থাকে না

১৫। স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী (Interest Groups)

স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী উদারনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়। তবে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর নামকরণকে কেন্দ্র করে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। তাই অনেকে এরূপ গোষ্ঠীকে 'স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী' (Interest Group), 'চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী' (Pressure Group), 'মনোবৃত্তিবাহী গোষ্ঠী' (Attitude Group), 'রাজনৈতিক গোষ্ঠী' (Political Group), 'সংগঠিত গোষ্ঠী' (Organised Group), 'লবি' (Lobby) ইত্যাদি নামে অভিহিত করেন। অ্যালমন্ড ও পাওয়েল, ডেভিড ট্রুম্যান, জি. উটন (G. Wootton) প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ 'স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী' নামটি ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত বলে অভিমত পোষণ করেন। অ্যালমন্ড ও পাওয়েলের মতে, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বলতে আমরা নির্দিষ্ট স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ অথবা সুযোগসুবিধা দ্বারা সংযুক্ত এমন একটি ব্যক্তি-সমষ্টিকে বুঝি যারা এরূপ বন্ধন সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। এল. আর্ল. শ এবং জন সি. পিয়ার্স বলেন, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী হোল এমন একটি ব্যক্তিসমষ্টি যা রাজনৈতিক ব্যবস্থার

সংজ্ঞা ও নামকরণ

উপর দাবি উপস্থিত করে তার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। এইচ. জিগলার (H. Zeigler)-কে অনুসরণ করে বলা যায় যে, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলতে এমন একটি সংগঠিত ব্যক্তিসমষ্টিকে বোঝায় যার সদস্যবর্গ সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ না করেও সরকারী সিদ্ধান্তগ্রহণ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার জন্য সচেষ্ট হয়। অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, বৃত্তিগত প্রভৃতি স্বার্থের উপর ভিত্তি করে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি গড়ে উঠে। গোষ্ঠীগত স্বার্থ রক্ষা করাই এইসব গোষ্ঠীর মুখ্য উদ্দেশ্য। শ্রমিক সংঘ, শিক্ষক সংঘ, কৃষক সমিতি, বণিক সভা প্রভৃতি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর উদাহরণ।

১৬। শ্রেণীবিভাজন (Classification)

স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ

অ্যালমন্ড এবং পাওয়েল স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীকে চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা—১. স্বতঃস্ফূর্ত স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী (spontaneous interest group), ২. সাংগঠনিক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী (associational interest group), ৩. অ-সাংগঠনিক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী (non-associational interest group) এবং ৪. প্রতিষ্ঠানিক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী (institutional interest group)। দাঙ্গা-হাঙ্গামা, বিক্ষোভ প্রদর্শন, গুপ্তহত্যার প্রচেষ্টা ইত্যাদির সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জড়িত গোষ্ঠীকে স্বতঃস্ফূর্ত স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বলা হয়। অবশ্য এ কথা সত্য যে, অনেক সময় স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ বলে যা মনে হয় তার পশ্চাতে সুসংগঠিত গোষ্ঠীর হাত থাকে। কিন্তু যে সব স্বতঃস্ফূর্ত আচরণের পশ্চাতে কোন সংগঠিত গোষ্ঠী থাকে না সে সব ক্ষেত্রে কোন একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে, অথবা কোন একজন নেতার আবির্ভাবের ফলে সুপ্ত অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ চরমভাবে ঘটতে পারে। ফ্রান্সে চতুর্থ প্রজাতন্ত্রের সময় 'কৃষকদের পথ অবরোধের' (the peasant roadblocks) ঘটনা স্বতঃস্ফূর্ত আচরণের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। সাংগঠনিক স্বার্থান্বেষী গাষ্ঠী স্বার্থের গ্রন্থনের (interst articulation) উদ্দেশ্যে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়। শ্রমিক সংঘ, ব্যবসায়ীদের সংগঠন, শিল্পপতিদের সংগঠন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি হোল এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ একটি গোষ্ঠীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকরণ, সর্বক্ষণের জন্য নিযুক্ত পেশাদার কর্মী নিয়োগ এবং স্বার্থযুক্ত দাবি পেশের জন্য পর্যায়ক্রমে পদ্ধতিগত ব্যবস্থা অবলম্বন হোল সাংগঠনিক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এরূপ গোষ্ঠীর কর্মপদ্ধতি ও লক্ষ্যের প্রতি সমাজের কিছু অংশের সমর্থন ও স্বীকৃতি থাকে। অসাংগঠনিক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বলতে জ্ঞাতিত্বব্যঞ্জক ও বংশগত গোষ্ঠী kinship and lineage group), এবং জাতিগত (ethnic), আঞ্চলিক, মর্যাদাভিত্তিক, শ্রেণীভিত্তিক (class) গোষ্ঠীকে বোঝায় যারা ব্যক্তি, পরিবার, ধর্মীয় প্রধান প্রভৃতির মাধ্যমে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে। কিন্তু এরূপ গোষ্ঠীর স্বার্থের গ্রন্থনের জন্য কোন সংগঠিত পদ্ধতি না থাকায় স্বাভাবিকভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থাকে এরা যথেষ্ট প্রভাবিত করতে পারে না। কোন পেশা বা বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে প্রতিষ্ঠানিক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী গঠিত হয়। রাজনৈতিক দল, আইন

সভা, সৈন্যবাহিনী, আমলাতন্ত্র এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এরূপ গোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যায়। এইসব গোষ্ঠী নিজ সদস্যদের জন্য কিংবা সমাজস্থ অন্য যে কোন গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার জন্য চেষ্টা করতে পারে। প্রতিষ্ঠানিক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীসমূহ নিজেদের সাংগঠনিক ক্ষমতার জোরে সমাজে বিশেষ পদমর্যাদার অধিকারী বলে বিবেচিত হয়। উন্নতিকামী দেশসমূহে সাংগঠনিক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রভাব সীমিত হওয়ার জন্য সামরিক চক্র (military cliques), আমলাতান্ত্রিক গোষ্ঠী এবং রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানিক গোষ্ঠীগুলির প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়।

১৭। সরকারী সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার বিভিন্ন পদ্ধতি (Different Methods to influence the decisions of a Government)

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারী সিদ্ধান্তকে নিজেদের অনুকূলে প্রভাবিত করাই হোল স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর সর্বপ্রধান কাজ। রাজনৈতিক দলের মতো স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী সরকার গঠন করতে চায় না। কেবলমাত্র চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে গোষ্ঠী-স্বার্থের অনুকূলে সরকারকে কার্য করতে বাধ্য করার প্রচেষ্টার মধ্যেই এরূপ গোষ্ঠীর কার্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ থাকে। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত উপায়ে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী নিজ উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করে:

(১) জনসংযোগের সমস্ত মাধ্যম, যেমন—বেতার, দূরদর্শন, সংবাদপত্র ইত্যাদি ব্যবহার করে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলি নিজেদের দাবিদাওয়ার সমর্থনে জনমত গঠনের চেষ্টা করে। এই কার্যে সাফল্যলাভ করলে তারা সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থাকে অতি সহজেই প্রভাবিত করতে পারে। তবে একথা সত্য যে, কেবলমাত্র সুসংগঠিত ও শক্তিশালী গোষ্ঠীগুলিই জনমত গঠনের মাধ্যমে তাদের ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, গ্রেট ব্রিটেনের 'দি ব্রিটিশ রোড হলেজ অ্যাসোসিয়েশন' (The British Road Haulage Association) ভারী মালবাহী গাড়ী রাষ্ট্রায়ত্তকরণের বিরোধিতা করে যে আন্দোলন শুরু করে ১৯৫১ সালে রক্ষণশীল দল জনমতের চাপে তা মেনে নেয়।

জনমত গঠনের মাধ্যমে সরকারকে প্রভাবিত করে

(২) নির্বাচনের সময় তারা রাজনৈতিক দলের সপক্ষে প্রচারকার্য চালিয়ে কিংবা ঐ সব দলকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করে নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করতে সচেষ্ট হয়। ঐ কাজে সাফল্যলাভ করলে অর্থাৎ যে রাজনৈতিক দলের সপক্ষে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলি কাজ করে সেই দল সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে উক্ত দলের সমর্থক গোষ্ঠীগুলি অতি সহজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সরকারকে প্রভাবিত করে

(৩) অনেক সময় রাজনৈতিক দলগুলির মাধ্যমে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলি সরকারের নিকট নিজেদের দাবিদাওয়া পেশ করে সরকারকে প্রভাবিত করতে সচেষ্ট হয়। বিশ্লেষণ করে বলা যায়, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলি অনেকক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত না

রাজনৈতিক শাখার মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার

করেও তাদের রাজনৈতিক শাখার মাধ্যমে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ব্রিটেনে রাজনৈতিক দলগুলির যে সংসদীয় কমিটি (Parliamentary Committee) আছে সেগুলির মাধ্যমে ঐ সব গোষ্ঠী সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থাকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করতে পারে।

(৪) আইনসভার সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে প্রতিটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী নিজের স্বার্থের প্রয়োজনে কাম্য আইন প্রণয়নের যেমন ব্যবস্থা করে, তেমনি অকাম্য আইনের বিরোধিতা করার জন্য সচেষ্ট হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'লবী' ব্যবস্থার কথা সর্বজনবিদিত। উল্লেখযোগ্য যে, উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির আইনসভার সদস্যরা তাঁদের নির্বাচনের সময় স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলির উপর যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভরশীল থাকেন বলে নির্বাচিত হওয়ার পর ঐ সব গোষ্ঠীর অনুকূলে কাজ করাকে তাঁরা নিজেদের পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করেন। অনেক সময় ঐসব গোষ্ঠী আইনসভার সদস্যদের প্রয়োজনীয় তথ্য, সংবাদ ইত্যাদি সরবরাহের মাধ্যমে সাহায্য-সহায়তা করে। এগুলি সরবরাহ করার সময় স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলি নিজেদের স্বার্থের কথা একেবারে বিস্মৃত হয় না। তাই নিজেদের স্বার্থ-বিরোধী কোন তথ্য বা সংবাদ তারা আইন-সভার সদস্যদের হাতে তুলে দেয় না। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলি আইনসভার বিভিন্ন কমিটির সামনে উপস্থিত হয়ে নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই ঐ সব গোষ্ঠী কমিটির সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে নিজেদের অনুকূলে আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করতে পারে। অনেক সময় আবার উৎকোচ প্রদানের মাধ্যমে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলি আইনসভার সদস্য কিংবা আইনসভার কমিটিগুলির সদস্যদের সিদ্ধান্তকে নিজেদের অনুকূলে প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়। ১৯৫৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ উঠলে সিনেট জাতীয় গ্যাস বিলটি প্রত্যাখ্যান করে। বস্তুতঃ উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভার সদস্যরা কোন-না-কোনভাবে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে জড়িত থাকেন বলে আইন প্রণয়নের সময় তাঁরা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন।

আইনসভার মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার

(৫) বর্তমানে প্রায় প্রতিটি দেশেই আইনসভার পরিবর্তে শাসন বিভাগের প্রভাব-প্রতিপত্তি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলি আইনসভার সদস্যদের অপেক্ষা শাসন বিভাগকে প্রভাবিত করার জন্য অধিক পরিমাণে সচেষ্ট হয়। তাছাড়া, উদারনৈতিক গণতন্ত্রে আমলা-তন্ত্রের প্রাধান্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলি সরকারী আমলাদের প্রভাবিত করে ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য চেষ্টা করে। বস্তুতঃ বর্তমানে আইনসভার কার্যাবলী ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং আইন প্রণয়নের মতো জটিল ব্যাপারে আইনসভার সদস্যরা অনভিজ্ঞ থাকায় আইনসভা কেবলমাত্র আইনের মূল কাঠামো তৈরি করে সেগুলিকে পরিপূর্ণতা দানের ক্ষমতা শাসন বিভাগের হস্তে অর্পণ করে। বলা বাহুল্য, শাসন বিভাগের রাজনৈতিক অংশ অর্থাৎ মন্ত্রীরা সদাসর্বদা রাজনৈতিক কার্যে ব্যাপৃত থাকায় সংশ্লিষ্ট বিভাগের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব আমলাদের উপর ন্যস্ত হয়। স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী-

শাসন বিভাগের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার

গুলি প্রত্যক্ষভাবে মন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেও তারা নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য আমলাদের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। ব্রিটেনের 'হাওয়ার্ড লীগ ফর পেনাল রিফর্ম" (Howard League for Penal Reform) যেমন মন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে, তেমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী-গুলি সরকারী আমলাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে। তাছাড়া, গ্রেট ব্রিটেনের মত দেশে সরকারের বিভিন্ন স্থায়ী উপদেষ্টা কমিটির মধ্যে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা থাকেন বলে ঐ সব গোষ্ঠী অতি সহজেই সরকারী সিদ্ধান্ত ও কার্যাবলীকে প্রভাবিত করতে পারে। এ বিষয়ে ব্রিটেনের 'ন্যাশনাল এডভাইসারী কাউন্সিল অন দি ট্রেনিং অ্যান্ড সাপ্লাই অব টিচার্স" (The National Advisory Council on the Training and Supply of Teachers)-এর ভূমিকার কথা উল্লেখ করা যায়।

(৬) অনেক সময় বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয়। প্রধানতঃ দুটি উপায়ে গোষ্ঠীগুলি বিচার-পতিদের প্রভাবিত করে। প্রথমতঃ বিচারপতিদের নিয়োগের সময় প্রতিটি গোষ্ঠী নিজেদের সমর্থকদের মধ্য থেকে বিচারপতিরা যাতে নিযুক্ত হন সেজন্য চেষ্টা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'আমেরিকান বার অ্যাসোসিয়েশন' (The American Bar Association)-এর ভূমিকার কথা এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয়তঃ অনেক সময় আইনের প্রশাসনিক ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে আদালতে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে বক্তব্য রেখে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলি বিচারপতিদের রায়দানকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

বিচার বিভাগের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার

(৭) অনেক সময় বিক্ষোভ প্রদর্শন কিংবা হিংসাত্মক কার্যকলাপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলি সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির চেষ্টা করে। ভারতবর্ষ, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশের ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র-সংগঠন ইত্যাদি বিক্ষোভ প্রদর্শনের মাধ্যমে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য সচেষ্ট হয়। কিন্তু পেরুতে হিংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলি নিজেদের অনুকূলে কাজ করতে সরকারকে বাধ্য করে। অনেক সময় সাম্প্রদায়িক, ভাষাগত ইত্যাদি গোষ্ঠীগুলি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য একই সঙ্গে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের আশ্রয় গ্রহণ করে। ভারতবর্ষের অন্যতম রাজ্য অসমে তথাকথিত বিদেশী বিতাড়নের জন্য 'আসু'-র নেতৃত্বে যে আন্দোলন শুরু হয় সেখানে সরকারের উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য উভয় প্রকার পদ্ধতিরই আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে।

বিক্ষোভ প্রদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা

১৮। স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর কার্য-নির্ধারক বিষয়সমূহ
(Determinants of Interest Group activity)

সর্বপ্রকার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলির প্রভাব সমান নয়।

অ্যালান বলের মতে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কাঠামো (political institutional structure), দলীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি (the nature of the party system) এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতি (the political culture) প্রভৃতির উপর স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর কার্যের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভর করে।

স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর সাফল্য তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল

(১) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কাঠামো অনুসারে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী সরকারী সিদ্ধান্তগ্রহণ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারে। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, ভারতবর্ষ প্রভৃতি সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় আইনসভা অপেক্ষা মন্ত্রিপরিষদ ও শীর্ষ-স্থানীয় কতিপয় প্রশাসক আমলার হস্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকায় স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলি এঁদের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। অনুরূপভাবে গ্রেট ব্রিটেনের মত এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের যাবতীয় ক্ষমতা আইনসভা অপেক্ষা মন্ত্রিপরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকে বলে এই সব গোষ্ঠীর দৃষ্টি তাঁদের দিকেই নিবদ্ধ থাকে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ থাকার ফলে সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আইন বিভাগ এবং শাসন বিভাগ সমভাবেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরূপ ক্ষেত্রে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলি উভয় বিভাগকেই সমভাবে প্রভাবিত করে নিজ নিজ গোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে, যেখানে আইনসভার দুটি কক্ষ প্রায় সমক্ষমতা-সম্পন্ন এবং আইন প্রণয়নে কমিটিগুলি যেখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করে, সেখানে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলি অতি সহজেই সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারে।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কাঠামো

(২) দলীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি অনুসারে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রভাব বিস্তারের ব্যাপকতা কম বা বেশী হতে পারে। প্রধানতঃ দলীয় ব্যবস্থার গঠামো (structure), রাজনৈতিক দলের আদর্শগত ভিত্তি ও দলীয় শৃঙ্খলার উপর স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রভাব নির্ভর করে। যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দলীয় শৃঙ্খলা অত্যন্ত কঠোরভাবে রক্ষিত হয় এবং রাজনৈতিক দলগুলির সাংগঠনিক ও আদর্শগত ভিত্তি অত্যন্ত সুদৃঢ় সেখানে এই সব গোষ্ঠী সহজে দলীয় সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে না। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্যের অভাব, দলীয় কাঠামোর দুর্বলতা, দলীয় শৃঙ্খলার অভাব ইত্যাদির ফলে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রভাব অতি সহজেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত গ্রেট ব্রিটেনে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও সেখানে দুটি প্রভুত্বকারী রাজনৈতিক দলের মধ্যে আদর্শগত ভিন্নতা, সুকঠোর দলীয় শৃঙ্খলা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকায় এই সব গোষ্ঠীর প্রভাব কম বলে অনেকে মন্তব্য করেন। কিন্তু একথা সর্বাংশে সত্য নয়। কারণ ব্রিটেনেও এই গোষ্ঠীগুলি বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টা করে। অধ্যাপক বল মনে করেন যে, বহু-দলীয় ব্যবস্থা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলির প্রভাব বিস্তারের স্বর্গরাজ্য বলে বিবেচিত

দলীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি

হয়। উদাহরণস্বরূপ চতুর্থ প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্সের কথা উল্লেখ করা যায়। বর্তমানে ইতালীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ উক্তি প্রযোজ্য।

(৩) স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর কার্যের সাফল্য বা ব্যর্থতা অনেকাংশে রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণের বৃহৎ অংশ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলির কার্যকলাপের কোন বিরোধিতা করে না। কিন্তু ব্রিটেন বা পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির জনসাধারণ এরূপ গোষ্ঠীকে আদৌ সুনজরে দেখে না। ফলে এইসব রাষ্ট্রে জনগণের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুকূল না হওয়ায় স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রভাব বিস্তারের পরিধি ব্যাপকতা লাভ করতে পারে না। আবার, ভারতবর্ষ, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রে ছাত্রসমাজ ও শ্রমিক সংঘের নেতৃবৃন্দ অনেক সময় নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। সুতরাং জনসাধারণের রাজনৈতিক মনোবৃত্তি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর কার্যের সহায়ক হলে স্বাভাবিকভাবে এদের প্রভাব-বিস্তারের মাত্রা পরিব্যাপ্ত হয়।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, সরকারের আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলি নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয়। উদারনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এই সব গোষ্ঠীর প্রভাব অত্যন্ত বেশী। সে তুলনায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় এই সব গোষ্ঠীর প্রভাব থাকে না বললেই চলে। শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাম্যবাদী দলের সুশৃঙ্খল ও বজ্রকঠোর নেতৃত্বের সর্বব্যাপী প্রাধান্য স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীকে অপ্রয়োজনীয় করে তোলে। সর্বোপরি, রাজনীতি-সচেতন জনগণের আদর্শের প্রতি অনুরক্তি এই সব গোষ্ঠীর অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলে। বস্তুতঃ যতদিন পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ধনবৈষম্যের অবসান না ঘটবে ততদিন পর্যন্ত স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর অবলুপ্তির কোন সম্ভাবনা নেই বলে মনে করা হয়।

উদারনৈতিক ব্যবস্থায় স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর কর্মক্ষেত্রের পরিধি ব্যাপক

তবে মজার ব্যাপার হোল—উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থকেরা মনে করেন যে, গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রয়োজন। কারণ এইসব গোষ্ঠী সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে সংযোগ সাধনের সেতু হিসেবে কাজ করে। জনসাধারণের ধ্যানধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা ইত্যাদি সম্পর্কে এইসব গোষ্ঠী সরকারকে অবহিত রাখে। স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলির দাবির অনুকূলে সরকারী সিদ্ধান্তকে পরিচালিত করে সরকার কার্যতঃ জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকেই মর্যাদা প্রদান করে। এইভাবে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শ্রমিকদের স্বার্থ-জড়িত কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার পূর্বে শ্রমিক সংস্থাগুলির সঙ্গে আলোচনা করাই গণতন্ত্র-সম্মত বলে অনেকে যুক্তি প্রদর্শন করেন। কিন্তু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলি পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কার্যক্ষেত্রে পুঁজিবাদীদের স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া, ধনতান্ত্রিক বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ভূমিকা

দিক থেকে প্রভুত্বকারী শ্রেণীর সৃষ্ট স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলির চাপের কাছে সম-শ্রেণী-স্বার্থের রক্ষক সরকার সহজেই নতিস্বীকার করে। সর্বহারা শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য গঠিত কোন গোষ্ঠী স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না এবং সরকার দমন-পীড়নের দ্বারা সেই সব গোষ্ঠীর দাবিকে পুঞ্জীভূত হতে দেয় না।

১৯। রাজনৈতিক দল এবং স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর পার্থক্য
(Difference between Political Parties and Interest Groups)

অনেক সময় রাজনৈতিক দল এবং স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা সহজসাধ্য না হলেও উভয়ের মধ্যে কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান বলে অ্যালান বল, নিউম্যান (Neumann) প্রমুখ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ অভিমত পোষণ করেন। পার্থক্যগুলি হোল :

উদ্দেশ্যগত পার্থক্য

(১) উদ্দেশ্যের দিক থেকে রাজনৈতিক দল এবং স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। রাজনৈতিক দলের প্রধান উদ্দেশ্য হোল রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করে নিজের নীতি, আদর্শ ইত্যাদি বাস্তবে রূপায়িত করা। এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দল সুযোগ্য ও জনপ্রিয় ব্যক্তিকে নির্বাচনে নিজ নিজ প্রার্থী হিসেবে জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করে। নির্বাচনে উপযুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে রাজনৈতিক দলকে সরকার গঠন ও পরিচালনার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়।

কিন্তু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রধান উদ্দেশ্য হোল সরকারী সিদ্ধান্তগ্রহণ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে নিজ অনুকূলে নিয়ে আসা। সরকার গঠন বা পরিচালনার কোন দায়দায়িত্ব গ্রহণে এরূপ গোষ্ঠী সম্মত থাকে না। তাই নির্বাচনের সময় প্রার্থী মনোনয়ন বা অন্যান্য নির্বাচনী দায়দায়িত্ব তাদের পালন করতে হয় না।

জনকল্যাণ সাধন রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য ; কিন্তু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর তা নয়

(২) রাজনৈতিক দলগুলি বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে গঠিত হয় বলে অনেকে মনে করেন। আবার কারো কারো মতে, শ্রেণী-স্বার্থের ভিত্তিতেই রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি। সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীস্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া বা রক্ষা করা রাজনৈতিক দলের নীতি-বিরোধী। বিভিন্ন প্রকার গোষ্ঠী এবং স্বার্থের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলি সর্বাধিক পরিমাণ মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য সচেষ্ট হয়।

কিন্তু সমজাতীয় অথচ সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী-গুলির উদ্ভব হয়। বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণ সাধনের কোন মহৎ উদ্দেশ্য তাদের থাকে না। বলা বাহুল্য, বিশেষ একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর কার্যক্ষেত্রে সাফল্যের অর্থ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বার্থের সংরক্ষণ।

রাজনৈতিক দলের ভিত্তি মতাদর্শগত, কিন্তু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর তা নেই

(৩) রাজনৈতিক দল বিশেষ একটি রাজনৈতিক মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। দলীয় নীতি ও কর্মসূচী সেই মতাদর্শের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। মতাদর্শগত ভিন্নতা হেতু রাজনৈতিক দলের কার্যাবলীর ক্ষেত্রেও ভিন্নতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর রাজনৈতিক মতাদর্শগত কোন ভিত্তি নেই। বিশেষ একটি গোষ্ঠীর সঙ্কীর্ণ স্বার্থরক্ষা করাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অনেক সময় দেখা যায় যে, একটি পুঁজিবাদী রাজনৈতিক দলের মধ্যে অনেকগুলি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বিদ্যমান রয়েছে।

(৪) সাংগঠনিক দিক থেকেও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। রাজনৈতিক দলের একটি মতাদর্শগত ভিত্তি থাকার জন্য সাধারণতঃ তা প্রকৃতিগতভাবে সুসংগঠিত হয়। সম-মতাদর্শে বিশ্বাসী না হলে কেউ রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে পারে না। দলীয় সদস্যদের মধ্যে সুকঠোর নিয়মশৃঙ্খলার মাধ্যমে সংহতি রক্ষা করা হয়।

সাংগঠনিক ক্ষেত্রে পার্থক্য

কিন্তু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলির মতাদর্শগত কোন ভিত্তি না থাকায় সাংগঠনিক দিক থেকে তা অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতির হয়। সদস্য তালিকাভুক্ত না হয়েও কোন ব্যক্তি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর নেতা বা নেতৃস্থানীয় হতে পারে। কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভব নয়।

রাজনৈতিক দল মোর্চা গঠন করে; স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী তা করে না

(৫) অনেক সময় সম-মনোভাবাপন্ন রাজনৈতিক দলগুলি রাজনৈতিক মোর্চা গঠন করে সরকারী ক্ষমতা অধিকারের কিংবা সরকার পরিচালনার চেষ্টা করতে পারে।

কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলির উদ্দেশ্য না হওয়ায় এরূপ মোর্চা গঠনের কোন প্রয়োজনীয়তাও দেখা যায় না। তাছাড়া, প্রতিটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বিশেষ একটি স্বার্থের প্রতিভূ বলে পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব।

(৬) রাজনৈতিক দলগুলি সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তাই প্রতিটি রাজনৈতিক দলকেই প্রকাশ্যে কাজ করতে হয়। জনসাধারণের নিকট সুস্পষ্ট বক্তব্য উপস্থিত করে তাদের জনমত গঠন করতে হয়।

নির্বাচনে অংশগ্রহণ বিষয়ে পার্থক্য

কিন্তু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনে অবতীর্ণ হতে হয় না বলে প্রকাশ্যে কাজ করার পরিবর্তে গোপনে কাজ করতেই তারা অধিক পছন্দ করে। তাই তাদের উদ্দেশ্য, কর্মপদ্ধতি প্রভৃতি সম্পর্কে জনসাধারণের কোন সুস্পষ্ট ধারণা থাকে না। অবশ্য স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সদস্যরা অনেক সময় রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এ ক্ষেত্রে নিজেদের প্রার্থীকে জয়ী করার জন্য সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রচার কার্যে অংশগ্রহণ করে।

(৭) একটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব থাকতে পারে। দলীয় নীতি ও কর্মপন্থাকে প্রভাবিত করার জন্য এইসব গোষ্ঠী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অনেক সময় একই দলের অভ্যন্তরে চরম গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে দলীয় সংহতি বিনষ্ট হতে দেখা যায় এবং দলের মধ্যে উপদল সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে অনেকক্ষেত্রে দলের ভাঙ্গন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে।

স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী অপেক্ষা রাজনৈতিক দলের পরিধি ব্যাপক

কিন্তু সম-স্বার্থের ভিত্তিতে সংকীর্ণ মনোভাবের দ্বারা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলি গড়ে উঠে বলে সদস্যদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিরোধের সম্ভাবনা কম।

(৮) রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল ও সময়সাপেক্ষ। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় প্রতিটি দলকে জনমতের দিকে সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হয়। তাছাড়া, দলীয় আদর্শ, সংহতি ও দলের অভ্যন্তরে অবস্থিত বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ভারসাম্য সংরক্ষণ ইত্যাদির দিকে নজর রেখেই রাজনৈতিক দলকে যে-কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পার্থক্য

কিন্তু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর সদস্যরা যেহেতু সম-স্বার্থের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ, সেহেতু যে-কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অনেক সহজ। গোষ্ঠীর সদস্যসংখ্যা সীমিত হওয়ায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব।

(৯) রাজনৈতিক দল প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সমস্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী থাকে না। সাধারণতঃ ধনতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এরূপ গোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রেণীশোষণ না থাকায় এরূপ গোষ্ঠীর প্রভাবও থাকে না।

রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক ব্যবস্থার অঙ্গ ; কিন্তু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী তা নয়

তবে একথা সত্য যে, অনেক সময় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর পার্থক্য নিরূপণ করা সহজসাধ্য হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন বার্চ সোসাইটি (John Birch Society) কিংবা ভারতবর্ষে ঝাড়খন্ড দলকে রাজনৈতিক দল অথবা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বলা হবে কি না তা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। অ্যালান বলের মতে, অর্ধোন্নত দেশে দলীয় ব্যবস্থার দুর্বলতার জন্য উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা কষ্টকর।

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের সমস্যা

চতুর্বিংশ অধ্যায়

নির্বাচকমণ্ডলী এবং প্রতিনিধিত্ব
[Electorate and Representation]

১। প্রতিনিধিত্বের ইতিহাস (History of Representation]

আধুনিক যুগের গণতন্ত্র হোল পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। প্রাচীন রোম ও গ্রীসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকায় তখন অভিজাত শ্রেণী প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করত। দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রের আয়তন ও জনসংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় জনগণের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাই তারা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিজেদের মনোমত প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং সেই সব প্রতিনিধির মাধ্যমে দেশ শাসনে পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে ভোটাধিকার নাগরিকদের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার।

প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র

কিন্তু কখন এবং কোথায় সর্বপ্রথম প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, মধ্যযুগে প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়। সেই যুগে বিভিন্ন নামে এই ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে। ইংল্যান্ডে পার্লামেন্ট, ফ্রান্সে এস্টেটস্ জেনারেল, স্পেনে করটেস (Cortes), জার্মানীতে ডায়েট (Diet) ইত্যাদিতে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ঐসব রাষ্ট্রের আইনসভাগুলি কোন অর্থেই গণতান্ত্রিক চরিত্রসম্পন্ন ছিল না। কারণ ঐসব আইনসভার প্রতিনিধি নির্বাচনে কেবলমাত্র অভিজাত সম্প্রদায়, ভূস্বামী, ধনশালী ব্যবসায়ী প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের মুষ্টিমেয় ব্যক্তিরাই অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করত। মধ্যযুগের পরিসমাপ্তির পর জাতীয় রাষ্ট্রের (Nation States) আবির্ভাবের সংগে সংগে রাজতন্ত্র অত্যাধিক শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ফলে আইনসভার প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি খর্বিত হয়। কর্তৃত্বের প্রশ্নে ইংল্যান্ডে রাজতন্ত্র বনাম পার্লামেন্টের সুদীর্ঘ সংগ্রাম শুরু হয়। ১৬৮৮ সালে ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লবের (Glorious Revolution) সাফল্যের ফলে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পার্লামেন্ট গণতান্ত্রিক প্রকৃতিসম্পন্ন হতে পারেনি। ১৮৩২ সালের পূর্ব পর্যন্ত ব্রিটিশ পার্লামেন্টে জনপ্রতিনিধিত্বের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ঐ বৎসরেই সর্বপ্রথম মধ্যযুগীয় প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার সামান্য কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ পার্লামেন্ট গণ-পার্লামেন্টের পদবাচ্য হতে পারেনি। ১৮৩২ থেকে ১৯২৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ে নির্বাচন সংক্রান্ত কতকগুলি সংস্কারমূলক আইন প্রণীত হওয়ার ফলে

প্রতিনিধিত্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বর্তমানে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কমন্স সভায় (House of Commons) আঠারো বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত ব্রিটিশ নাগরিকদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রেও বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃতিলাভ করেছে। তবে কোন অ-সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই জনপ্রতিনিধিদের দাবি সহজে মেনে নেওয়া হয়নি। শত শত শতাব্দীর সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও সহস্র সহস্র মানুষের রক্তের বিনিময়ে আইনসভায় জন-প্রতিনিধিত্বের দাবি স্বীকৃতিলাভ করেছে। বিশ্ব-ইতিহাস মানুষের এই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার রক্ত-ঝরা সংগ্রামের কাহিনীর সাক্ষ্য বহন করে।

২। সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার (Universal Adult Franchise)

আধুনিক গণতন্ত্রকে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র বলা হোলেও ভোটাধিকারের ভিত্তি কি হবে অর্থাৎ ভোটাধিকার কাদের থাকবে—তা নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। এ বিষয়ে দুটি পরস্পর-বিরোধী মতের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম মত অনুসারে, প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকার করে নেওয়া উচিত। দ্বিতীয় মতের সমর্থকগণ কেবলমাত্র যোগ্য ব্যক্তিদের ভোটাধিকার প্রদান করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন।

ভোটাধিকার প্রদানের প্রশ্নে মতবিরোধ

কিন্তু প্রশ্ন হোল—সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার বলতে কি বোঝায়? জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী, পুরুষ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত নির্বিশেষে যখন দেশের সকল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে তখন তাকে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার বলা হয়। এই নীতি অনুসারে কেবলমাত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক ছাড়া অন্য কোন কারণে জনগণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না। তবে বর্তমানে প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ছাড়াও বিকৃতমস্তিষ্ক, অথবা বিশেষ গুরুতর অপরাধের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তিদের এবং বিদেশীদের এই অধিকার প্রদান করা হয় না। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভোটাধিকার প্রদানের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র সর্বনিম্ন বয়ঃসীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করে, যেমন—ভারতবর্ষে ২১ বৎসর বয়স্ক সকল নাগরিক ভোটদানের অধিকারী। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইংল্যাণ্ডে ১৮ বৎসর বয়স্ক প্রতিটি নাগরিক ভোটদানের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়।

সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার বলতে কি বোঝায়

সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের সপক্ষে যুক্তি (Arguments for Universal Adult Franchise): সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির অবতারণা করা হয়:

(১) জনগণই হোল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র। পরোক্ষ গণতন্ত্রে এই গণ-সার্বভৌমিকতা সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের মাধ্যমে বাস্তবে রূপায়িত হয়। এই অর্থে গণতন্ত্রে ভোটাধিকার প্রতিটি নাগরিকের জন্মগত অধিকার।

গণ-সার্বভৌমিকতা বাস্তবে রূপায়িত হয়

(২) গণতন্ত্র বলতে সকল স্তরের জনগণের শাসন বোঝায়। পরোক্ষ গণতন্ত্রে জনগণের ভোটাধিকার না থাকলে তারা শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে সমর্থ হয় না। ফলে গণতন্ত্র অলীক-তত্ত্বে পর্যবসিত হয়। তাই জন স্টুয়ার্ট মিল মন্তব্য করেছেন, যা সকলকে স্পর্শ করে তা সকলের দ্বারা নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় আইন ও শাসন নীতির ফলাফল যেহেতু জনগণের সকলকে সমানভাবে ভোগ করতে হয়, সেহেতু আইন প্রণয়নে বা শাসননীতি নির্ধারণে সকলের সমান অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়; অন্যভাবে বলা যায়, সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের স্বীকৃতির উপর গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে।

গণতন্ত্রের সাফল্য আনে

(৩) জনগণের সাম্য ও সমানাধিকার—এই দুটি নীতির উপর ভিত্তি করে গণতন্ত্রের ইমারত নির্মিত। তাই জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী, পুরুষ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই রাজনৈতিক অধিকারকে স্বীকার করে নিলে গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। তা না করা হলে সাম্যের অধিকার অস্বীকৃত বা উপেক্ষিত হয়।

সাম্য ও সমানাধিকারের নীতির যুক্তি

(৪) প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত হলে শাসকগোষ্ঠী স্বৈরাচারী হতে সাহস পায় না। কারণ জনস্বার্থ-বিরোধী কোন কাজ করলে নির্বাচনের সময় জনসাধারণ উক্ত গোষ্ঠী বা দলের পরিবর্তে অন্য কোন গোষ্ঠী বা দলকে ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে।

শাসক গোষ্ঠীর স্বৈরাচারিতা রোধ করে

(৫) যাদের ভোটাধিকার থাকে না আইনসভায় তারা তাদের মনোনীত প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই তাদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে আইনসভায় কোনরূপ আলোচনা হয় না। ফলে তাদের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়। তাই ল্যাস্কি মন্তব্য করেছেন, শাসনক্ষমতায় অংশগ্রহণের অধিকার থেকে যারা বঞ্চিত তারা শাসনক্ষমতার সুফল কখনই ভোগ করতে পারে না। সুতরাং সর্বসাধারণের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকার করে নেওয়া উচিত।

সর্বসাধারণের স্বার্থরক্ষার অনুকূল

(৬) ভোটাধিকার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। সর্বসাধারণের এই অধিকার না থাকার অর্থ সরকার কোন একটি শ্রেণী বা গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার যন্ত্রস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। অন্যান্য শ্রেণী বা গোষ্ঠীর স্বার্থ এক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়। বলা বাহুল্য, উপেক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে সরকার-বিরোধী মনোভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই মনোভাব কখনো বিক্ষোভ, এমন কি বিদ্রোহের আকার ধারণ করতে পারে। ফলে দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব বিনষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা যায়। তাই সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকার করে নেওয়া প্রতিটি গণতান্ত্রিক সরকারের প্রাথমিক কর্তব্য।

রাষ্ট্রের শান্তিশৃঙ্খলা ও স্থায়িত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে

(৭) রাজনৈতিকভাবে সচেতন জনগণের উপর গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে। বলা বাহুল্য, জনগণের রাজনৈতিক চেতনার পরিপূর্ণ বিকাশ সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের স্বীকৃতির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটায়

সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের বিপক্ষে যুক্তি (Arguments against Universal Adult Franchise) : জন স্টুয়ার্ট মিল, লেকী, হেনরী মেইন, মেকলে (Macaulay) প্রমুখ মনীষিগণ সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করেন :

অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগণ যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচনে অক্ষম

(ক) গণতন্ত্র হোল জনগণের শাসন। কিন্তু জনগণের অধিকাংশ অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে তাদের দ্বারা নির্বাচিত সরকারও অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়। ফলে কোন প্রগতিশীল আইন প্রণীত হতে পারে না। আবার, দরিদ্র ও রাজনৈতিক চেতনাশূন্য জনগণের হাতে ভোটদানের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করার অর্থ তার অপব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়া। কারণ অর্থের লোভে কিংবা অজ্ঞতা-বশে জনগণ যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচন না করে অযোগ্য প্রতিনিধিকে সরকার গঠনের দায়িত্ব অর্পণ করে। এর দ্বারা গণতন্ত্র কার্যতঃ অক্ষম ও অশিক্ষিতের শাসনে পর্যবসিত হয়। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে ব্লুন্টস্‌লি বলেছিলেন, অক্ষম ও অযোগ্যদের হাতে দেশের শাসক নির্বাচনের ক্ষমতা অর্পণ করা রাষ্ট্রের পক্ষে আত্মহত্যার সমান। তাই সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নহে।

শিক্ষাগত যোগ্যতার যুক্তি

(খ) জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে, শিক্ষাগত যোগ্যতার মাপকাঠিতে বিচার করে নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রদান করা উচিত। কারণ শিক্ষা না থাকলে সমকালীন জটিল সমস্যাবলীর প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা এবং সেগুলির সমাধানের যথাযথ ব্যবস্থা করা জনগণের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। তাই সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রদানের পূর্বে সার্বিক শিক্ষাবিস্তার একান্ত প্রয়োজন। এই শিক্ষা বলতে তিনি লেখাপড়া ও সাধারণ অঙ্ক-শাস্ত্রে জ্ঞানার্জনের কথাই বলেছেন।

এই যুক্তির বিরুদ্ধ-সমালোচনা

তবে ভোটাধিকার প্রদানের মানদণ্ড হিসেবে শিক্ষাকে গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ শিক্ষার সঙ্গে রাজনৈতিক চেতনার সম্পর্ক সব সময় থাকে না। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই যে রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন হবেন এমন কোন কথা নেই। বরং দেখা যায় যে, অশিক্ষিত হলেও জীবনসংগ্রামে যারা জর্জরিত তারা রাজনৈতিকভাবে অনেক বেশী সচেতন। অধিকন্তু, পরস্পর-বিরোধী অনেকগুলি রাজনৈতিক মতবাদের ঘূর্ণিপাকে পড়ে শিক্ষিত ব্যক্তিও বিপথে চালিত হতে পারে। সর্বোপরি, অশিক্ষিত বলে জনগণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হলে কায়েমী স্বার্থের সমর্থক সরকারগুলি কখনই দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য সচেষ্ট হবে না। বস্তুতঃ এশিয়া, আফ্রিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, এই সকল রাষ্ট্রের জনগণ অশিক্ষিত হলেও নিজেদের ভোটাধিকার যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম। তবে একথাও সত্য যে, ভোটাধিকার যথাযথ প্রয়োগের জন্য শিক্ষা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। অভিজ্ঞতা থেকে এ-ও দেখা গেছে যে, শিক্ষিত ব্যক্তিরা অশিক্ষিতের চেয়ে অনেক সহজে সমকালীন সমস্যাবলীর স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে এবং সেগুলি সমাধানের জন্য যোগ্য

প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য অশিক্ষিত 'জনগণকে' ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত না করে তাদের দ্রুত শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করা উচিত।

(গ) তবে অনেকের মতে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও কর প্রদানকে ভোটাধিকারের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা সমীচীন। যাদের সম্পত্তি নেই বা যারা রাষ্ট্রকে কর প্রদান করে না তাদের ভোটাধিকার থাকা সমীচীন নয়। কারণ এরূপ ব্যক্তিরা সরকারী অর্থের অপচয় করে। জনসাধারণের অর্থের প্রতি তাদের কোনরূপ মায়ামমতা থাকে না। তাছাড়া, রাষ্ট্রীয় ব্যয়নির্বাহের জন্য সরকারকে কর প্রদান করা জনগণের কর্তব্য। কিন্তু যাদের সম্পত্তি নেই তাদের কর প্রদানের কোন প্রশ্নই আসে না। বলা বাহুল্য, যারা করপ্রদানের দায়িত্ব পালন করে না, সরকারী কার্যে অংশগ্রহণ করার কোন অধিকার তারা সঙ্গতভাবেই দাবি করতে পারে না। তাই ব্যক্তিগত সম্পত্তিহীন ব্যক্তিদের ভোটাধিকারও প্রদান করা সঙ্গত নয়।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির যুক্তি

কিন্তু সম্পত্তিকে ভোটাধিকারের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করার অর্থ সম্পত্তির মালিকদের শাসন সমর্থন করা। বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার লোপ করা হয়েছে এবং জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রগুলিতে এই অধিকার সঙ্কুচিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, তখন ভোটাধিকারের ভিত্তি হিসেবে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে গ্রহণ করার কথা প্রচার করা গণতন্ত্রের বিরোধিতা করা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য আনয়ন করে। বলা বাহুল্য যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাছাড়া, সম্পত্তিহীন ব্যক্তিরা অমিতব্যয়ী হয়ে সরকারী অর্থের অপচয় করে—এ যুক্তির সত্যতা সাম্প্রতিক বিশ্ব-ইতিহাস সমর্থন করে না। সর্বোপরি, বর্তমানে প্রতিটি রাষ্ট্রে আপামর জনসাধারণকে পরোক্ষ কর প্রদান করতে হয়। তাই কর প্রদান না করার অজুহাতে কোন সম্পত্তিহীন ব্যক্তিকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা সমীচীন নয়।

এই যুক্তির বিরুদ্ধ-সমালোচনা

(ঘ) সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার তত্ত্বের বিরোধীরা অনেক সময় ভোটাধিকার প্রদানের জন্য স্থায়ী বাসিন্দার শর্ত আরোপ করেন। তাঁরা একথা প্রচার করেন যে, ভোটদাতা যদি কোনও একটি অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা না হন, তাহলে কোন অঞ্চলের সঙ্গেই তাঁর আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। এর ফলে ভোটদানের সময় তিনি যথেচ্ছভাবে এই মূল্যবান অধিকারটি প্রয়োগ করে এর মর্যাদা হানি করেন। কিন্তু এই যুক্তির মধ্যে বিশেষ কোন সারবত্তা খুঁজে পাওয়া কঠিন। কারণ একটি অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা হলেই যে একজন ব্যক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে এমন কোন কথা নেই। বরং বলা যায়, আত্মিক সম্পর্কের বিষয়টি অপেক্ষা রাজনৈতিক সচেতনতাই এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

স্থায়ী বাসিন্দার শর্ত

(ঙ) অনেকে আবার স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার প্রদানের বিরুদ্ধে নানা যুক্তির অবতারণা করেন। তাঁদের মতে, গার্হস্থ্য জীবনকে সুন্দর ও সুখী করে তোলাই হোল স্ত্রীলোকদের প্রাথমিক কর্তব্য। তাঁদের ভোটাধিকার প্রদান করা হলে গার্হস্থ্য জীবন অবহেলিত হবে এবং পারিবারিক জীবনের শান্তি, শৃংখলা প্রভৃতি বিনষ্ট হবে।

স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার প্রদানের প্রশ্নে মতবিরোধ

দ্বিতীয়তঃ পুরুষদের মত স্ত্রীলোকদের মানসিক উৎকর্ষ থাকে না। স্বভাবতই তারা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি অনুসারে ভোটাধিকার যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে অক্ষম। তাই তারা পুরুষ অভিভাবকদের নির্দেশে পরিচালিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকারটির অপব্যবহার করে।

তৃতীয়তঃ দেশরক্ষা এবং শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সমকক্ষ নয় বলে অনেকে তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার সপক্ষে মত প্রকাশ করেন।

এই যুক্তির বিরুদ্ধ-সমালোচনা

স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার প্রদানের বিরুদ্ধে যে সব যুক্তির অবতারণা করা হয় সেগুলি নিতান্তই ভিত্তিহীন। কারণ ভোটদানের অধিকার থাকলেই যে গার্হস্থ্য জীবনে অশান্তি আসবে এমন কোন কথা নেই। তাছাড়া, উপযুক্ত পরিবেশে রেখে উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করা হলে স্ত্রীলোকেরা সর্বক্ষেত্রেই পুরুষদের সমকক্ষ হতে পারে। দেশরক্ষা এবং শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে বর্তমানে স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের মতই পারদর্শিতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছে। সর্বোপরি, গণতন্ত্র বলতে স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকলের শাসন বোঝায়। নানা অজুহাতে স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হলে গণতন্ত্র কার্যতঃ ভিত্তিহীন হয়ে পড়ে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, পুরুষদের সঙ্গে স্ত্রীলোকদের সমানাধিকার প্রদান না করার ব্যবস্থা শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের বৈশিষ্ট্য। সর্বপ্রথম দাস-সমাজব্যবস্থায় স্ত্রীলোকদের উপর পুরুষদের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় পুরুষদের এই কর্তৃত্ব অপ্রতিহত আকার ধারণ করে। কিন্তু ধনবৈষম্যহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের মতই সর্বপ্রকার অধিকার ও মর্যাদার অধিকারী।

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, প্রভৃতির যুক্তি

(চ) অনেক সময় জাতি, ধর্ম, বর্ণ প্রভৃতি কারণে ভোটাধিকার সঙ্কুচিত করা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডেশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের সরকার কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখে গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করেছে। কারণ ধর্ম, বর্ণ, জাতি ইত্যাদির কারণে জনগণকে ভোটাধিকার প্রদান না করার অর্থ সাম্যনীতির প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করা। তাছাড়া, এরূপ করা হলে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও বর্ণভুক্ত মানুষের মধ্যে ঘৃণা, বিদ্বেষ, সংঘর্ষ প্রভৃতির ফলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে। তাই গণতন্ত্রের স্বার্থে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকার করে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত বলে প্রতিটি গণতান্ত্রিক মানুষ বিশ্বাস করে। তা না করা হলে গণতন্ত্র বাক্সর্বস্ব তত্ত্বকথার ঊর্ধ্বে কোনদিন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না।

৩। স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার (Women Suffrage)

গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার উত্তরোত্তর স্বীকৃতিলাভ করেছে। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার বলতে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ভোটদানের অধিকার বোঝায়। কিন্তু আশ্চর্যের

বিষয়, বর্তমানে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পুরুষদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হওয়ার অনেক পরে স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার স্বীকৃতিলাভ করেছে।

উদারনৈতিক গণতন্ত্রে স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার অনেক পরে স্বীকৃত

নানা প্রকার অযৌক্তিক অজুহাতে স্ত্রীলোকদের এই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। ১৮৬১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার প্রদানের জন্য আন্দোলন শুরু হয়। তারপর এই আন্দোলনের প্রভাব ক্রমশঃ সমগ্র ইউরোপে সম্প্রসারিত হয়। ইংল্যান্ডে স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকারের আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করলে ১৮৯৮ সালে ত্রিশ বৎসর বয়স্ক বা তদূর্ধ্ব স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়। এরপর ১৯১৮ সালে প্রণীত জনপ্রতিনিধিত্বমূলক আইন (The Representation of People Act, 1918) প্রণীত হওয়ার ফলে সীমিত সংখ্যক স্ত্রীলোক ভোটাধিকার অর্জন করে। ১৯২৮ সালে এই আইনের সংশোধনের ফলে স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকল ২১ বৎসর বয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। বর্তমানে অবশ্য ১৮ বৎসর বয়স্ক ব্রিটিশ নাগরিক নির্বাচকের মর্যাদা লাভ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২০ সালে, জাপানে ১৯৪৭ সালে এবং গণতন্ত্রের পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত সুইজারল্যান্ডে ১৯৭১ সালে স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার স্বীকৃতিলাভ করেছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার এখনও বিশ্বের সর্বত্র প্রসারিত হয়নি। অবশ্য এই অবস্থা পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে বর্তমান থাকলেও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের মতই সর্বক্ষেত্রে সমানাধিকার ও সমমর্যাদার অধিকারী। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় স্ত্রীলোকদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকায় স্বাভাবিকভাবেই তাদের উপর পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। নারী অপেক্ষা পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের মাধ্যমে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা স্ত্রীলোকদের সর্বপ্রকার স্বাধীনতা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। প্রকৃত গণতন্ত্রের পীঠস্থান সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সমান অধিকার ও মর্যাদা ভোগ করে। এখানে স্ত্রী-পুরুষের সমান অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকায় নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্বের অবসান ঘটেছে।

বিপক্ষে যুক্তি (Arguments against): যাঁরা স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকারের বিরোধী তাঁরা নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে নানা প্রকার যুক্তিতর্কের অবতারণা করেন।

(১) ভোটাধিকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার। এই অধিকারের মাধ্যমে ব্যক্তি রাষ্ট্র-পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা প্রকৃতিগতভাবে

গার্হস্থ্য জীবন উপেক্ষিত হয়

রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অযোগ্য। গার্হস্থ্য জীবনকে সুন্দর ও সুখী করে তোলাই হোল তাদের প্রাথমিক কর্তব্য। কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনকে অবহেলা করে তারা যদি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে তাহলে নারীর সুকুমার বৃত্তিগুলি ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হবে। নারীত্বের যথার্থ সার্থকতা মাতৃত্বে। সন্তান লালন-পালন এবং পরিবার-পরিজনের পরিচর্যা করা তাদের অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য। গৃহাভ্যন্তরই তাদের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র। কিন্তু নারীর

রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাবের অর্থই হোল তার নিজের দায়িত্বে অবহেলা প্রদর্শন করা। সুতরাং পারিবারিক কল্যাণ বিধানের জন্যই স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার থাকা সমীচীন নয়।

(২) স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার সম্প্রসারিত হলে পারিবারিক জীবনে অশান্তি দেখা দিতে পারে। কোন রাজনৈতিক বিষয়ে স্ত্রীলোক যদি তার পরিবারের পুরুষদের, বিশেষতঃ তার স্বামীর সঙ্গে একমত হতে না পারে তাহলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ভাঙ্গন অবশ্যম্ভাবী। আবার স্ত্রীলোকেরা যদি পুরুষদের নির্দেশে পুরুষদের পছন্দ-করা প্রার্থীকে ভোট দেয় তাহলে পুরুষদের ভোটের দ্বৈতকরণ ঘটে। স্ত্রী ভোটাধিকারের বিরোধীদের যুক্তি হোল, পুরুষদের মত স্ত্রীলোকদের মানসিক উৎকর্ষ না থাকায় তারা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি অনুসারে এই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকারের যথার্থ প্রয়োগ করতে পারে না। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, স্ত্রীলোকেরা প্রধানতঃ তাদের পুরুষ অভিভাবকের বিশেষতঃ স্বামীর নির্দেশানুসারে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে এই পবিত্র রাজনৈতিক অধিকারটির অপব্যবহার করে।

পারিবারিক অশান্তির সম্ভাবনা প্রবল

(৩) সমালোচকদের মতে, শারীরিক গঠনের দিক থেকে নারী জাতি পুরুষদের অপেক্ষা দুর্বল প্রকৃতির হওয়ায় তারা নাগরিক জীবনে অবশ্য-পালনীয় কার্যাদি, বিশেষতঃ দেশরক্ষার দায়িত্ব পালনে অক্ষম। সুতরাং দেশরক্ষা এবং শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সমকক্ষ নয় বলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তারা পুরুষদের সমান রাজনৈতিক অধিকার দাবি করতে পারে না।

শারীরিক অক্ষমতার যুক্তি

(৪) স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ আবেগপ্রবণ হয়। কিন্তু রাজনীতির মত জটিল বিষয়ে আবেগপ্রবণতার কোন স্থান নেই। রাজনীতিতে আবেগপ্রবণ নারীজাতির অংশগ্রহণের অর্থ শাসনকার্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি। সুতরাং স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার প্রদানের অর্থ রাজনীতিকে আবেগ-ভিত্তিক করে তোলা যা আদৌ কাম্য নয়।

আবেগপ্রবণতা

(৫) ক্যাথলিক-প্রধান রাষ্ট্রগুলিতে স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার প্রদানের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখান হয় যে, এই সব রাষ্ট্রে ক্যাথলিক চার্চের পুরোহিতগণ অতি সহজেই স্ত্রীলোকদের উপর ধর্মীয় কারণে প্রভাব বিস্তার করে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অধিকার করতে পারেন।

ধর্মীয় প্রভাব বিস্তারের সমূহ সম্ভাবনা

সপক্ষে যুক্তি (Arguments for) ঃ স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার প্রদানের বিরুদ্ধে যে সব যুক্তির অবতারণা করা হয় সেগুলি ভিত্তিহীন বলে গণতন্ত্রের সমর্থকগণ মনে করেন। স্ত্রী-ভোটাধিকারের সপক্ষে তাঁরা নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করেন ঃ

(ক) নীতি ও যুক্তির ভিত্তিতেই ভোটাধিকার প্রদান করা সমীচীন, শারীরিক কারণে নয়। শারীরিক দুর্বলতার অভিযোগে স্ত্রীলোকদের যদি ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় তাহলে নীতিগতভাবে শারীরিক দিক থেকে দুর্বল পুরুষদেরও ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে হয়। তাছাড়া, ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য শারীরিক ক্ষমতার প্রয়োজন

শারীরিক দুর্বলতার অজুহাত ভিত্তিহীন

হয় না। সর্বোপরি, উপযুক্ত পরিবেশে রেখে উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করা হলে স্ত্রীলোকেরা সর্বক্ষেত্রেই পুরুষদের সমকক্ষ হতে পারে। দেশরক্ষা এবং শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে বর্তমানে স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের মতই পারদর্শিতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছে। ভারতবর্ষে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, শ্রীলকায় শ্রীমতী বন্দরনায়েক, গণসাধারণতন্ত্রী চীনে মাদাম চিয়াং চিং প্রমুখ স্ত্রীলোকের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা পুরুষদের অপেক্ষা কোন অংশেই কম নয়। দেশরক্ষা বা দেশের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সমানই প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করছে। ভারতবর্ষে ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাঈ, মাতঙ্গিনী হাজরা, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার প্রমুখ বীরাঙ্গনার স্বদেশপ্রেম এবং স্বাধীনতাসংগ্রামে অংশগ্রহণ স্ত্রী-ভোটাধিকারের বিরোধীদের যুক্তির অসারতা প্রমাণ করেছে। ভিয়েতনামের মুক্তি-সংগ্রামে নারী জাতির প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এবং বিজয়লাভের ইতিহাস আজ কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং দেশরক্ষায় বা রাজনীতিতে স্ত্রীলোকেরা অযোগ্য—এই যুক্তিতেও তাদের আর ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা যায় না। যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া যায় যে, স্ত্রীলোকেরা প্রকৃতিগতভাবে দুর্বল, তাহলেও বলা যায় যে, দুর্বলদের যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা না হলে গণতন্ত্র মিথ্যা তত্ত্বে পর্যবসিত হবে। তাই স্ত্রীলোকদের রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করে তাদের 'আপন ভাগ্য' নির্ধারণের সুযোগ দেওয়া সমীচীন।

(খ) রাষ্ট্রীয় আইনের ফলাফল যেহেতু নারী-পুরুষ সকলকেই সমানভাবে স্পর্শ করে সেহেতু এই আইন নির্ধারণে পুরুষদের মতই স্ত্রীলোকদের অধিকার থাকা উচিত।

ন্যায়বিচারের যুক্তি

ন্যায়বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে সরকার কেবলমাত্র পুরুষের সরকার নয়, নারীদেরও বটে। তাই সরকারী নীতি নির্ধারণে পুরুষদের মত স্ত্রীলোকদেরও সম-অধিকার থাকা প্রয়োজন। তা না হলে সাম্যের নীতি উপেক্ষিত হবে। বলা বাহুল্য, গণতন্ত্র সাম্যের নীতির উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকে।

(গ) অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, আইনসভায় যাদের প্রতিনিধি থাকে না তাদের স্বার্থ সাধারণতঃ উপেক্ষিত হয়। স্ত্রীলোকেরা যদি নিজেদের মনোমত

অভিজ্ঞতার যুক্তি

প্রতিনিধি নির্বাচন করার সুযোগ না পায় তাহলে ক্রমাগতই তাদের স্বার্থ উপেক্ষিত হতে থাকে। সমাজের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক স্ত্রীলোক হওয়ায় তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার না থাকলে আইন-সভা যে-সব আইন প্রণয়ন করবে তা সমাজের সকলের স্বার্থরক্ষা নাও করতে পারে। এরূপ সমাজে বৈষম্যমূলক আইন প্রণীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগে নারী-জাতির ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আইন ও সামাজিক কু-প্রথা জন্ স্টুয়ার্ট মিলের মতো দার্শনিকদের স্ত্রী-ভোটাধিকারের সপক্ষে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য করেছিল।

(ঘ) স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার প্রদান করা হলে তাদের নারীসুলভ সুকুমার

নারীর সুকুমার বৃত্তির বিকাশের জন্য ভোটাধিকার প্রয়োজন

বৃত্তিগুলি বিনষ্ট হয় না; বরং তাদের সেই সমস্ত গুণাবলী সমাজজীবনে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে সুষ্ঠু ও সুন্দর সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে।

(ঙ) স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার সম্প্রসারিত হলে পারিবারিক জীবনের প্রশান্তি বিনষ্ট হবে—এই যুক্তিও মেনে নেওয়া যায় না। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, স্ত্রীলোকেরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠে। তার ফলে তারা দায়িত্বশীল পত্নী ও স্নেহময়ী মাতা হিসেবে নিজেদের সামাজিক দায়িত্ব পালনে অনেক বেশী তৎপর হয়ে উঠে। বস্তুতঃ ভোটাধিকার প্রদত্ত হলেই যে সব সময় নারীকে পুরুষদের মতই সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে হবে এমন কোন কথা নেই। বরং তারা গৃহাভ্যন্তরে থেকেই সন্তান-সন্ততির রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

পারিবারিক অশান্তির অজুহাত অসত্য

(চ) অনেক সময় যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, স্ত্রীলোকেরা তাদের পুরুষ অভিভাবকের নির্দেশেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। কিন্তু এই অভিযোগও সত্য নয়। বর্তমানে রাজনৈতিকভাবে সচেতন স্ত্রীলোকেরা নিজেদের মনোমত নির্বাচন প্রার্থীকে ভোট দিয়ে তাদের ভোটাধিকারের সদ্ব্যবহার করে। বর্তমানে গোপন নির্বাচন-ব্যবস্থা জনপ্রিয়তা অর্জনের ফলে স্ত্রীলোকেরা স্বাধীনভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। কা'কে ভোট দিয়েছে তা কেবলমাত্র ভোটদাতা ছাড়া অন্য কেউ জানতে পারে না। ফলে স্ত্রীলোকেরা প্রার্থী নির্বাচনের জন্য স্বাধীনভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে।

স্ত্রীলোকেরা রাজনৈতিকভাবে সচেতন নয়—এই যুক্তিও অসমর্থনযোগ্য

বর্তমান গণতান্ত্রিক বিশ্বে উত্তরোত্তর স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার স্বীকৃতিলাভ করছে। গণতন্ত্রপ্রিয় প্রতিটি মানুষ আজ নারীজাতিকে তার পবিত্র অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করছে। এই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফলে বর্তমান বিশ্বের প্রায় প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

৪। নির্বাচন পদ্ধতি (Modes of Election)

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচকমন্ডলীর গঠনের মতোই নির্বাচন পদ্ধতিরও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কারণ নির্বাচকমন্ডলীর আয়তনের উপর যেমন গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে তেমনি নির্বাচন পদ্ধতির উপর তা নির্ভরশীল। প্রতিনিধি নির্বাচনের দুটি প্রচলিত পদ্ধতি রয়েছে, যথা—ক. প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি এবং খ. পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি।

প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি

যখন জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে ভোটদানের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে, তখন সেই পদ্ধতিকে প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতি বর্তমান গণতান্ত্রিক বিশ্বে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ব্রিটেনের কমন্স সভার প্রতিনিধিগণ ব্রিটিশ জনগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। ভারতীয় পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ অর্থাৎ লোকসভার এবং রাজ্য-বিধানসভাগুলির প্রতিনিধি নির্বাচনে অনুরূপ পদ্ধতি অনুসৃত হয়। অবশ্য ভারতীয় লোকসভায় সামান্য কয়েকজন প্রতিনিধি মনোনয়নের ব্যবস্থাও রয়েছে।

কিন্তু পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে তাদের প্রতিনিধি

নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারে না। এই পদ্ধতিতে নির্বাচকমণ্ডলী প্রথমে একটি নির্বাচক সংস্থার (Electoral College) সদস্যদের নির্বাচন করে। এই নির্বাচন সংস্থাই চূড়ান্তভাবে প্রতিনিধি নির্বাচনের কার্য সম্পাদন করে। অনেক রাষ্ট্রে অবশ্য প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য কোন নির্বাচক সংস্থা গঠিত হয় না। আইনসভার সদস্যগণই নির্বাচক সংস্থা হিসেবে কাজ করে। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভার উচ্চকক্ষের সদস্যগণ পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। ভারতবর্ষ, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রে আইনসভার উচ্চকক্ষের সদস্যগণ এই পদ্ধতি অনুসারে নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি

৫। প্রত্যক্ষ নির্বাচনের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Direct Election)

সুবিধা ঃ প্রত্যক্ষ নির্বাচনের সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শিত হয় ঃ

(১) প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ফলে জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে অর্থাৎ সক্রিয়ভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। তাই তাদের সরকারী নীতি এবং কার্যাবলী সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত থাকতে হয়, সমকালীন সমস্যাবলীর সম্পর্কে তাদের চিন্তাভাবনা করতে হয় এবং নাগরিক হিসেবে কর্তব্য পালনের জন্য তাদের সচেষ্ট থাকতে হয়। এর ফলে নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায়। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল জনস্বার্থ-বিরোধী কোন কাজ করলে কিংবা কাজ করার চেষ্টা করলে নির্বাচকমণ্ডলী সেই দলকে ক্ষমতাচ্যুত করে অন্য একটি দলের হাতে শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করে। সুতরাং প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে।

রাজনৈতিক চেতনার বৃদ্ধি সাধন

(২) প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ফলে নির্বাচকমণ্ডলীর সঙ্গে জনপ্রতিনিধিদের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। প্রতিনিধিগণ জনসমর্থন লাভের জন্য জনসাধারণের বিপদে-আপদে তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। সহজে তারা নিজেদের কর্তব্য-কর্মে অবহেলা প্রদর্শন করতে সাহস পায় না। জনগণের প্রতিনিধিদের এই নিবিড় সম্পর্ক গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে তোলে।

নির্বাচকমণ্ডলীর সঙ্গে জনপ্রতিনিধির সম্পর্ক নিবিড় হয়

(৩) প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকলে নির্বাচনে দুর্নীতির আশঙ্কা অপেক্ষাকৃত কম থাকে। কারণ বিপুল সংখ্যক নির্বাচকমণ্ডলীকে উৎকোচ প্রদান বা ভীতি প্রদর্শন কিংবা অন্য কোন অসদুপায়ে প্রভাবিত করা নির্বাচন-প্রার্থীদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

দুর্নীতির আশঙ্কা কম

(৪) প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকলে জনসাধারণ নির্বাচিত সরকারকে নিজেদের সরকার বলে ভাবতে পারে। এই সরকার যে-কোন সমস্যার মুখোমুখী হলে জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের পাশে এসে দাঁড়ায়। এইভাবে জনগণের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা, সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ করে সরকার নিজেকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

সরকারের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়

অসুবিধা : (ক) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রবর্তিত থাকায় ধনী-দরিদ্র, অভিজাত-অভাজন, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু জনসাধারণের অধিকাংশই অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হওয়ায় তারা সুযোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্বাচকমণ্ডলী আবেগতাড়িত হয়ে কিংবা বাগ্মী নেতৃবৃন্দের প্রচারকৌশলে বিভ্রান্ত হয়ে অযোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করে। ফলে আইনসভা কার্যতঃ অযোগ্য ব্যক্তিদের লীলাভূমি হয়ে দাঁড়ায়। এই আইনসভা কখনই যথাযোগ্য আইনপ্রণয়ন করতে পারে না।

অযোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের যথেষ্ট সম্ভাবনা

(খ) প্রত্যক্ষ নির্বাচনব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকলে নির্বাচনের সময় নির্বাচন প্রার্থীগণ অসদুপায় অবলম্বন করে নির্বাচন-বৈতরণী উত্তরণের চেষ্টা করে। এর ফলে সামগ্রিকভাবে জাতির নৈতিক অধঃপতন ঘটে।

জাতির নৈতিক অধঃপতনের সম্ভাবনা

(গ) অনেক সময় সুযোগ্য এবং জনকল্যাণকামী মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা ব্যয়-বহুল প্রত্যক্ষ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন না। প্রত্যক্ষ নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক নির্বাচক-মণ্ডলীকে প্রভাবিত করার জন্য সাংগঠনিক খাতে যে ব্যয় হয় সুযোগ্য ব্যক্তিরা সেই ব্যয়ভার বহন করতে অক্ষম হওয়ায় তাঁরা নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান।

যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের সম্ভাবনা কম

প্রত্যক্ষ নির্বাচনের উপরি-উক্ত ত্রুটিগুলির জন্য অনেক দেশে পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থাকেই গ্রহণ করা হয়েছে।

৬। পরোক্ষ নির্বাচনের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Indirect Election)

সুবিধা : প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলির জন্য বর্তমানে কোন কোন রাষ্ট্র-বিজ্ঞানী পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থাকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন। এই নির্বাচন ব্যবস্থার সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি তাঁরা প্রদর্শন করেন :

(১) পরোক্ষ নির্বাচনে জনসাধারণ চূড়ান্তভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে না বলে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ত্রুটিগুলি থেকে এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ মুক্ত। এই ব্যবস্থায় নির্বাচক সংস্থা কিংবা জনপ্রতিনিধিদের উপর নির্বাচনের চূড়ান্ত দায়িত্ব অর্পিত থাকায় প্রাথমিক পর্যায়ে নির্বাচনের গুরুত্ব থাকে না। তাই দলীয় প্রচার, উত্তেজনা প্রভৃতি দেশের রাজনৈতিক পরিবেশকে অশান্ত করে তুলতে পারে না। তাছাড়া, অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগণের পরিবর্তে নির্বাচক সংস্থা কিংবা অধিকতর বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ জনপ্রতিনিধিদের হাতে চূড়ান্ত নির্বাচনের ক্ষমতা অর্পিত হওয়ায় সুযোগ্য ব্যক্তিদের নির্বাচিত হওয়ার পথ প্রশস্ত হয়। কারণ নির্বাচন সংস্থা কিংবা প্রতিনিধিগণ আবেগ বা উচ্ছ্বাসবশতঃ অযোগ্য ব্যক্তিকে কখনই নির্বাচিত করতে পারে না।

সুযোগ্য প্রার্থীর নির্বাচন সম্ভব

(২) পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় মূল নির্বাচকরা শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান হওয়ার জন্য নির্বাচন প্রচারে অযথা অর্থব্যয় করা হয় না। তাই এই ব্যবস্থাকে অপচয়মূলক নয় বলে মনে করা হয়।

অপচয়মূলক নয়

(৩) তাছাড়া, পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থার দুই স্তরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে চূড়ান্ত নির্বাচকমণ্ডলী ধীরস্থিরভাবে সুযোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে পারে। নির্বাচনের প্রাথমিক পর্যায়ে যে সাময়িক উচ্ছ্বাস, ভাবপ্রবণতা রাজনৈতিক পরিবেশকে প্রভাবিত করে দ্বিতীয় পর্যায়ে বেশ কিছু সময় ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হওয়ার ফলে সেই ভাবাবেগ স্তিমিত এবং নির্বাচনের অনুকূল সুস্থ পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এই পরিবেশ নিঃসন্দেহে সুযোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য একান্তভাবেই প্রয়োজন।

রাজনৈতিক উত্তেজনা, উচ্ছ্বাস ইত্যাদির সম্ভাবনা কম

অসুবিধা: কিন্তু পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থাও ত্রুটিমুক্ত নয়। পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির অবতারণা করা হয়:

(ক) পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি প্রকৃতিগতভাবে অগণতান্ত্রিক। কারণ চূড়ান্ত প্রতিনিধি নির্বাচনে জনগণের কোন কার্যকর ভূমিকা থাকে না। তাছাড়া, এরূপ নির্বাচন ব্যবস্থায় জনগণের সঙ্গে প্রতিনিধিদের কোনরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে না।

অগণতান্ত্রিক

(খ) এই নির্বাচন ব্যবস্থা জনগণকে রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন করে তুলতে পারে না। কারণ এই ব্যবস্থায় চূড়ান্ত প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা জনসাধারণের হস্তে না থাকায় তারা স্বাভাবিক কারণেই নির্বাচনের প্রতি কোন রূপ আকর্ষণ অনুভব করে না। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ নির্বাচনের সময় যেরূপ উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়, পরোক্ষ নির্বাচনে তা থাকে না। ফলে জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার ঘটে না।

রাজনৈতিক চেতনার বিস্তার হয় না

(গ) পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় থাকে না। কারণ এই ব্যবস্থায় শাসক ও শাসিতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকায় শাসকশ্রেণী জনগণের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে না। ফলে সরকার স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে।

শাসক ও শাসিতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে না

(ঘ) পরোক্ষ নির্বাচনে ব্যাপক দুর্নীতি প্রশ্রয় পায় বলে অনেকের ধারণা। কারণ মধ্যবর্তী নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা অত্যন্ত কম হওয়ায় নির্বাচন প্রার্থীর পক্ষে তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করা সহজসাধ্য হয়ে পড়ে। এই নির্বাচক-মণ্ডলীর সমর্থন লাভের জন্য উৎকোচ প্রদান, ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়।

ব্যাপক দুর্নীতির আশঙ্কা

(ঙ) পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থাকে অযৌক্তিক ব্যবস্থা বলে সমালোচনা করা হয়। জনসাধারণ যদি মধ্যবর্তী নির্বাচকমণ্ডলীর নির্বাচনের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়, তা হলে কেন তারা চূড়ান্ত প্রতিনিধি নির্বাচনের অযোগ্য তা যুক্তি দিয়ে বোঝা যায় না।

অযৌক্তিক ব্যবস্থা

(চ) পরিশেষে বলা যায় যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় দলপ্রথার গুরুত্ব-বৃদ্ধি পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থাকে কার্যক্ষেত্রে প্রহসনে পর্যবসিত করেছে। কারণ প্রাথমিক

পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় রাজনৈতিক দলগুলি নিজ নিজ প্রার্থী দাঁড় করায় এবং তাদের সমর্থনে জনমত গঠনের চেষ্টা করে। প্রাথমিক পর্যায়ে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে চূড়ান্ত নির্বাচনের সময় সেই দলের প্রার্থী যে নির্বাচিত হবেন এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এইভাবে দলপ্রথার ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা কার্যক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে রূপান্তরিত হয়েছে।

দলপ্রথা পরোক্ষ নির্বাচনকে প্রহসনে রূপান্তরিত করেছে

৭। ভোটদান পদ্ধতি (Methods of Voting)

ভোটদান পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। ভোটদান পদ্ধতিকে মোটামুটি দুটি সাধারণ ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে, যথা—১. প্রকাশ্য এবং গোপন ভোটদান পদ্ধতি এবং ২. একাধিক ভোটদান পদ্ধতি।

[১] **প্রকাশ্য বনাম গোপন পদ্ধতি (Open or Public Voting vs. Secret Voting) :**

ভোটদাতাগণ প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে ভোট দিতে পারে। এমন এক সময় ছিল যখন ভোটদাতাদের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত থাকায় প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে ভোটদানের এরূপ প্রকাশ্য পদ্ধতি প্রবর্তিত ছিল। মন্তেস্কু, জন স্টুয়ার্ট মিল, ট্রিটস্‌কে (Treitschke) প্রমুখ রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতির সমর্থক ছিলেন। তাঁরা এরূপ ভোটপদ্ধতির সপক্ষে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি প্রদর্শন করেন, যথা :

প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতির সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি

(১) ভোটাধিকার কেবলমাত্র একটি অধিকার নয়, এর সঙ্গে জনগণের সামগ্রিক কল্যাণ-অকল্যাণের প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে। নির্বাচকমণ্ডলী জনকল্যাণ সাধনের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রেখে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে এটাই গণতন্ত্রের দাবি। কিন্তু গোপন ভোটদান পদ্ধতিতে নির্বাচক অতি সহজেই ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তার আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কিংবা অন্য কোন অপদার্থ প্রার্থীকে ভোটদান করে তার পবিত্র অধিকারের অপপ্রয়োগ করে। তাই মিল দাবি করেছেন, অন্যান্য জন-কর্তব্যের মতই ভোটদানের কর্তব্য জনসমক্ষে সম্পাদিত হওয়া বাঞ্ছনীয় (The duty of voting like every other public duty, should be performed under the eye and criticism of the public.)। জনসমক্ষে অর্থাৎ প্রকাশ্য ভোটদানের ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলে চক্ষু-লজ্জা এবং সমালোচনার ভয়ে নির্বাচকমণ্ডলী অনেক সময় নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়েও যোগ্য প্রার্থীকে ভোটদান করে। এর ফলে ভোটাধিকারের সুষ্ঠু প্রয়োগ ঘটে, জনস্বার্থ সংরক্ষিত হয়।

প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতি গণতান্ত্রিক কিন্তু গোপন ভোটদান পদ্ধতি তা নয়

(২) গোপন ভোট পদ্ধতির সপক্ষে অন্যতম শক্তিশালী যুক্তি হোল, সরকারী দল,

জমিদার, নিয়োগকর্তা প্রভৃতি শক্তিশালী শক্তির বিরুদ্ধে ভোটদাতাগণ নির্ভীকভাবে ভোট দিতে পারে। কিন্তু প্রকাশ্য ভোট পদ্ধতিতে জনসমক্ষে ভোট দিতে হয় বলে ভোট প্রার্থীরা কিংবা তাঁদের সমর্থকগণ সহজেই বুঝতে পারে কোন্ ভোটদাতা কাকে ভোট দিচ্ছে। ফলে পরবর্তী সময়ে ভোটদাতাদের হয়ত অত্যাচার, উৎপীড়ন, এমনকি প্রতিহিংসা-পরায়ণতার শিকার হতে হয়। তাই এই সব অপ্রীতিকর এবং অকাম্য পরিস্থিতি এড়াবার জন্য ভোটদাতা অনেক সময় নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হয়েই প্রতিপত্তিশালী প্রার্থীদের ভোটদান করে।

গোপন ভোটদান পদ্ধতিতে ভোটদাতা নির্ভয়ে ভোট দিতে পারে কিন্তু প্রকাশ্য পদ্ধতিতে তা পারে না

কিন্তু গোপন ভোটপদ্ধতিতে এইসব অত্যাচার, উৎপীড়ন ইত্যাদির সম্ভাবনা থাকে না। কারণ কোন্ প্রার্থীকে ভোট দেওয়া হয়েছে ভোটদাতা ছাড়া অন্য কারো পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। জন স্টুয়ার্ট মিল অবশ্য মনে করেন যে, শিক্ষা এবং রাজনৈতিক চেতনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচকমণ্ডলীর মন থেকে অপ্রীতিকর পরিবেশ সৃষ্টির ভীতি ক্রমশঃ বিদূরিত হবে।

(৩) গোপন ভোটপদ্ধতি প্রচলিত থাকলে উৎকোচ গ্রহণ বা প্রদানের মত অন্যান্য দুর্নীতিমূলক আচরণ দুষ্ট ক্ষতের মত সমাজ জীবনকে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে। কিন্তু প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতিতে জনসমক্ষে ভোটদান কার্য সম্পাদিত হয় বলে নির্বাচকমণ্ডলী কিংবা প্রার্থীগণ দুর্নীতিমূলক আচরণ করতে সাহস পান না। ফলে যোগ্য প্রতিনিধির নির্বাচন সম্ভব হয়। বলা বাহুল্য, নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ যদি সুযোগ্য না হন তা হলে গণতন্ত্র কখনই সফল হতে পারে না। তাই প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতিকে গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্ত হিসেবে অনেকেই চিহ্নিত করেন।

গোপন ভোটদান পদ্ধতি দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়, কিন্তু প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতি এই ত্রুটিমুক্ত

(৪) মন্তেস্কুর মতে, প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতির প্রচলন থাকলে জনসাধারণ অনেক বেশী রাজনৈতিক সচেতন এবং দায়িত্বশীল হয়ে উঠে। কিন্তু গোপন ভোটদান পদ্ধতিতে তা সম্ভব হয় না।

প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতি রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির সহায়ক, কিন্তু গোপন পদ্ধতি তা নয়

১৯০১ সাল পর্যন্ত ডেনমার্কে, জারতন্ত্রের শাসনাধীন রাশিয়ায় এবং অন্যান্য দেশেও প্রকাশ্য ভোট পদ্ধতির প্রচলন ছিল। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বের প্রায় প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রকাশ্য ভোটপদ্ধতির পরিবর্তে গোপন ভোটপদ্ধতি অনুসৃত হয়। কারণ—

ক. বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রে নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতি অচল হয়ে পড়েছে।

খ. যে-কোন শ্রেণী-বিন্যস্ত সমাজব্যবস্থায় প্রধানতঃ প্রভুত্বকারী শ্রেণীর নির্বাচন-প্রার্থীরা যে-কোন উপায়ে নির্বাচিত হতে চায়। প্রয়োজন হলে উৎকোচ প্রদান থেকে শুরু করে জীবনহানির ভীতি প্রদর্শন পর্যন্ত সর্বপ্রকার অসদুপায় অবলম্বন করে তারা নির্বাচনযুদ্ধে জয়লাভের চেষ্টা করে। এমতাবস্থায় প্রকাশ্য ভোটপদ্ধতি প্রচলিত থাকলে বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ভোটদাতাও আপন প্রাণরক্ষার জন্য অযোগ্য ও অসৎ প্রার্থীদের ভোট দিতে বাধ্য হয়। ফলে গণতন্ত্র মিথ্যাতন্ত্রে পরিণত হয়। বস্তুতঃ গণতন্ত্রের মূল

বর্তমানে গোপনে ভোটদান পদ্ধতির প্রচলনের কারণ

ভিত্তি হোল অবাধ ও দুর্নীতিমুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা। প্রকাশ্য ভোট পদ্ধতিতে তা সম্ভব নয় বলে বর্তমানে প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রে গোপন পদ্ধতি অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠানের রীতি প্রচলিত রয়েছে।

[২] **একাধিক ভোটদান পদ্ধতি (Plural or Weighted Voting System) :**

একাধিক ভোটদান পদ্ধতির অর্থ

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃতি-লাভ করেছে। 'একজন ব্যক্তির একটি ভোট' এই নীতির ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার কার্যকর হয়। কিন্তু অতীতে বেলজিয়াম, ইংল্যান্ড, জার্মানি প্রভৃতি রাষ্ট্রে নির্বাচকমণ্ডলীর একটি অংশের হাতে একাধিক ভোটদানের অধিকার অর্পণ করা হয়েছিল। কয়েকটি বিশেষ গুণ বা যোগ্যতা থাকার জন্য যখন কোন ব্যক্তি একাধিক ভোট প্রদানের অধিকারী হয়, তখন ভোটদানের সেই পদ্ধতিকে একাধিক ভোটদান পদ্ধতি (Plural or Weighted Voting System) বলা হয়।

সপক্ষে যুক্তি : পারদর্শিতার মূল্য দেওয়া হয়

একাধিক ভোটদান পদ্ধতির সপক্ষে প্রথম যুক্তি হোল—শিক্ষা, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যেসব ব্যক্তি বিশেষ পারদর্শিতা দেখান তাঁদের সংগে সাধারণ মানুষের যথেষ্ট পার্থক্য থাকে। তাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারদর্শিতার যথাযোগ্য মূল্য প্রদানের জন্য ঐ সব ব্যক্তির একাধিক ভোটদানের অধিকার যুক্তিসংগত। কারণ সাধারণ নির্বাচক অপেক্ষা তাঁরা প্রতিনিধি নির্বাচনে অনেক বেশী যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন। তাছাড়া, এইসব বিশেষ গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিদের গুণাবলীর পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে তাঁদের বিশেষ সুযোগসুবিধা প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন। সিজউইকের মতে একাধিক ভোটদান পদ্ধতি সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের প্রকৃতিগত ত্রুটিগুলি বিদূরিত করতে সক্ষম। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ অজ্ঞ অশিক্ষিত এবং রাজনৈতিক চেতনাহীন নির্বাচকমণ্ডলীর মতামত অপেক্ষা সংখ্যালঘিষ্ঠ বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমানের মতামতকে অনেক বেশী সুচিন্তিত বলে মনে করেন।

সম্পত্তির যুক্তি

দ্বিতীয়তঃ, সিজউইক মনে করেন যে, সম্পত্তিহীন দরিদ্র ব্যক্তিদের অপেক্ষা সম্পত্তি-বান ব্যক্তিরা আত্মসংরক্ষণে অনেক বেশী উৎসাহী। তাদের আত্মসংরক্ষণ তথা স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য তাদের হাতে একাধিক ভোটদানের ক্ষমতা প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া, ধনী-নির্ধন, অভিজাত-অভাজন নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তির একটি করে মাত্র ভোটদানের ক্ষমতা থাকলে সম্পত্তিশালী ব্যক্তিরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়ায় আইনসভায় তাদের কোন প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে পারে না। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, আইনসভায় যাদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকে না তাদের স্বার্থ যথাযথভাবে রক্ষিত হয় না। তাই সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদের সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্যই আইনসভায় তাদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকা উচিত বলে অনেকে মতপ্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য, সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদের হাতে একাধিক ভোট প্রদানের ক্ষমতা না থাকলে আইনসভায় তাদের কোন প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে পারবে না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জার্মানির কতকগুলি রাজ্যে একাধিক ভোটদান প্রথা

প্রচলিত ছিল। ১৮৯৩ সালে গৃহীত বেলজিয়ামের সংবিধানে অনুরূপ ভোটপদ্ধতির কথা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু বর্তমানে বেলজিয়াম, জার্মানি প্রভৃতি রাষ্ট্রে একাধিক ভোট-পদ্ধতির বিলোপ সাধন করা হয়েছে। এর কারণগুলি হলো নিম্নরূপ :

বিপক্ষে যুক্তি

প্রথমতঃ, এরূপ ভোটপদ্ধতি সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের বিরোধী। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তির সম-অধিকারের নীতি স্বীকৃত। কিন্তু একাধিক ভোট পদ্ধতি প্রচলিত থাকার অর্থই হোল বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে মর্যাদা দান করা যা গণতান্ত্রিক রাজনীতির বিরোধী। তাই একাধিক ভোটদান পদ্ধতিকে অগণতান্ত্রিক বলে সমালোচনা করা হয়।

অগণতান্ত্রিক

দ্বিতীয়তঃ, সম্পত্তি সংরক্ষণের যুক্তিতে বিত্তশালী শ্রেণীর হাতে একাধিক ভোটাধিকার প্রদানের অর্থ সমাজের মধ্যে শ্রেণী-বৈষম্যকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করা। বর্তমান যুগে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সম্প্রসারণের সংগে সংগে শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গঠনের দাবি সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এমতাবস্থায় ধনশালী ব্যক্তিদের হাতে একাধিক ভোটদানের ক্ষমতা প্রদানের অর্থ একচেটিয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে সমর্থন করা। গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন কোন ব্যক্তি এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করতে পারেন না।

সম্পত্তি সংরক্ষণের যুক্তি অকাম্য

তৃতীয়তঃ, সম্পত্তিতে ভোটাধিকার প্রদান করা শুধু অযৌক্তিকই নয়, অমার্জনীয় অপরাধও বটে। কারণ, সম্পত্তিশালী ব্যক্তিরা অপরকে শোষণ না করে কখনই ধনবলে বলীয়ান হতে পারে না। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিতে সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইনসংগত হওয়ায় পুঁজিপতির সন্তান-সন্ততিগণ বিনা পরিশ্রমেই পিতার বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়। এক্ষেত্রে তাদের হাতে একাধিক ভোটদানের অধিকার অর্পণ করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং অগণতান্ত্রিক।

পুঁজিবাদকে সমর্থন করে, তাই অকাম্য

চতুর্থতঃ, শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে একাধিক ভোটদানের অধিকারতত্ত্বের বিরুদ্ধে বলা যায় যে, শিক্ষিত হোলেই যে-কোন ব্যক্তি অশিক্ষিতদের অপেক্ষা বেশী রাজনৈতিক সচেতন হবে, এমন কোন কথা নেই। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, অনেক সময় শিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা অশিক্ষিত ব্যক্তিরাই রাজনৈতিক দিক থেকে অনেক বেশী সচেতন। তাছাড়া, শিক্ষাকে যদি যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে ধরা হয় তাহলে কুশলী শ্রমিক, সুদক্ষ কারিগর প্রভৃতির দক্ষতাকে কোন মূল্য দেওয়া হবে না—একাধিক ভোট-পদ্ধতির সমর্থকেরা এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারেন না।

শিক্ষাগত যুক্তিও অসার

উপরি-উক্ত ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য বর্তমান গণতান্ত্রিক বিশ্বে একাধিক ভোটদান পদ্ধতি পরিত্যক্ত হয়েছে বলা যেতে পারে।

৮। প্রতিনিধিত্বের আধুনিক তত্ত্ব (Modern Theories of Representation)

আধুনিক রাষ্ট্রের ভৌগোলিক আয়তন ও জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র অকার্যকর ও অকাম্য হয়ে পড়েছে। তাই কেবলমাত্র কতিপয় রক্ষণশীল স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছাড়া প্রায় সমস্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিনিধি

নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কিন্তু প্রতিনিধিত্বের সঠিক ও সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নিরূপণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আইনসভা নিজেকে জনগণের প্রতিনিধি বলে দাবি করে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমর্থকগণ উদারনৈতিক ব্যবস্থার আইনসভাকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভুত্বকারী সংখ্যালঘু শ্রেণীর প্রতিনিধি বলে চিত্রিত করেন। শোষণহীন সমাজব্যবস্থার আইনসভাকে তাঁরা জনগণের যথার্থ প্রতিনিধি বলে মনে করেন। কিন্তু উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থকেরা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থাকে অগণতান্ত্রিক চরিত্র-সম্পন্ন বলে সমালোচনা করেন। আবার অনেক সময় হিটলার বা মুসোলিনীর মত ফ্যাসিবাদী একনায়কগণও নিজেদের জনপ্রতিনিধি বলে দাবি জানান। এইভাবে প্রতিনিধিত্বের সংজ্ঞা এবং প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতি ও প্রকৃতি নিয়ে আধুনিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞানিগণ পরস্পর-বিরোধী তত্ত্বের অবতারণা করেন। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, প্রকৃত প্রতিনিধিত্বের অর্থ হোল—সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধিগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত ও সমর্থিত হবেন এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ প্রাক্-নির্বাচনী সময়ে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জনকল্যাণ সাধনের চেষ্টা করবেন। প্রতিনিধিত্বের যাথার্থ্য নিরূপণের সর্বপ্রধান মাপকাঠি হোল জনসাধারণ এবং প্রতিনিধিদের পারস্পরিক আনুগত্য।

প্রতিনিধিত্বের সংজ্ঞা

অধিকাংশ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দুটি মৌলিক ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম ধারণা অনুসারে, জনসাধারণই যেহেতু সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, সেহেতু জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সরকারকে জনগণের নিকট দায়িত্বশীল থাকতে হয়। দ্বিতীয় ধারণা অনুসারে বলা হয় যে, সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগণের ইচ্ছা (will) অপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ইচ্ছা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অ্যালান বল মনে করেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্বের ধারণাগুলির প্রয়োগ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলি অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে না। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও 'জনগণ' (people) বলতে কি বোঝায় এবং তাদের 'ইচ্ছা' (will) কিভাবে প্রকাশিত হবে তা নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। রুশোর মতে, সার্বভৌম ক্ষমতাকে হস্তান্তরিত করা কিংবা অপরের মাধ্যমে উত্থাপিত করা যায় না। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রকে সমর্থন করতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেন যে, ব্রিটিশ জনগণের স্বাধীনতার ধারণা ভ্রান্ত। কেবলমাত্র পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচনের সময় ছাড়া অন্য কোন সময়েই তারা স্বাধীন নয়। বস্তুতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে জনগণের সার্বভৌমিকতা (Popular sovereignty) এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের মানদণ্ডে প্রতিনিধিত্বের তত্ত্ব আলোচনা করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ছিল। তাই অ্যালান বল মনে করেন যে, প্রতিনিধিত্বের আধুনিক তত্ত্বগুলিকে দুটি সাধারণ ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যায়, যথা,—ক. প্রতিনিধিত্বের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক তত্ত্ব (liberal democratic theories of representation) এবং খ. প্রতিনিধিত্বের সমষ্টিবাচক তত্ত্ব (collectivist theories of representation)।

প্রতিনিধিত্বের আধুনিক তত্ত্বের শ্রেণীবিভাগ

[ক] প্রতিনিধিত্বের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক তত্ত্ব (Liberal Democratic Theories of Representation) : প্রতিনিধিত্বের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক তত্ত্বের কতকগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে :

(১) এই তত্ত্বগুলি ব্যক্তিগত অধিকার, বিশেষতঃ ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে। এইসব অধিকার সংরক্ষণের জন্য সরকারী ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজনীয় বলে এই তত্ত্বের সমর্থকগণ প্রচার করেন। প্রাকৃতিক অধিকার তত্ত্বের (theories of natural rights) উপর ভিত্তি করে প্রতিনিধিত্বের উদারনৈতিক তত্ত্বগুলি গড়ে উঠে। ১৭৭৬ সালে 'আমেরিকার স্বাধীনতাসংক্রান্ত ঘোষণাপত্রে' (American Declaration of Independence) বলা হয় যে, সকল মানুষ জন্মগতভাবেই সমান। জীবন, স্বাধীনতা ও সুখী হওয়ার অধিকার (Life, Liberty and pursuit of Happiness)-সহ তাদের অন্যান্য অধিকারগুলি অলঙ্ঘনীয়। এইভাবে উদারনৈতিক গণতন্ত্র কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে ভোটাধিকারের সমতার উপরও গুরুত্ব আরোপ করে। প্রতিনিধিত্বের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক তত্ত্ব অনুসারে কোনও একজন প্রতিনিধি বিশেষ কোন শ্রেণী, পেশা বা স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার পরিবর্তে ভৌগোলিক দিক থেকে চিহ্নিত নির্বাচন কেন্দ্রের জনগণের এবং তাদের মতামত ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের উপর গুরুত্ব আরোপ

(২) প্রতিনিধিত্বের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক তত্ত্ব মানুষকে যুক্তিবাদী প্রাণী (creature of reason) বলে মনে করে। যুক্তিবাদী মানুষ তার নিজস্ব স্বার্থ ও মতামত এবং সামাজিক দাবি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। তাই সে যুক্তি দিয়ে সব কিছু বিচারবিবেচনা করে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। টমাস জেফারসন (Thomas Jefferson) আমেরিকার প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থার সাফল্যের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষিত নির্বাচকের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। কারণ শিক্ষা মানুষের যুক্তিপূর্ণ বিচারবিবেচনার ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করে তোলে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের উদারপন্থী ইংরেজগণও জেফারসনের অভিমতকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন।

মানুষকে যুক্তিবাদী বলে ধরে নেয়

(৩) প্রতিনিধিত্বের এই তত্ত্ব বিশ্বাস করে যে, সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের মাধ্যমে জনগণের সার্বভৌমিকতা সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হতে পারে। ব্রিটেনে সংস্কারমূলক আইনের (Reforms Acts) মাধ্যমে উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ সংস্কারবাদী ঐতিহ্যের সাফল্য এসেছিল বলে মনে করা হয়। এইসব সংস্কারমূলক আইন প্রণীত হওয়ার ফলে নির্বাচকমণ্ডলীর আয়তন বৃদ্ধি, গোপন ভোটপদ্ধতির প্রবর্তন, লর্ড সভার ক্ষমতা সঙ্কোচন ইত্যাদি ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার

(৪) প্রতিনিধিত্বের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক তত্ত্ব অনুসারে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিশেষ একটি ভূমিকা থাকে। কোন একজন প্রতিনিধি তার নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট দায়িত্বশীল থাকলেও তিনি তাঁদের মনোনীত মুখপাত্র হিসেবে নির্দেশ পালনের

হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবেন না। প্রত্যেক প্রতিনিধি তাঁর নির্বাচনী এলাকার সম্মিলিত মতামতের প্রতিনিধিত্ব করেন মাত্র। জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে, পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার শর্ত হিসেবে নির্বাচকমণ্ডলীর মতামতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করে প্রতিনিধিগণ কাজ করবেন—এই ধারণা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের বিরোধী। প্রতিনিধিবর্গ নিজেদের বিবেকবুদ্ধি অনুসারে কাজ করতে পারলেও তাঁরা নির্বাচকমণ্ডলীর বিবেচ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকেও অবজ্ঞা করতে পারেন না।

প্রতিনিধির বিশেষ ভূমিকার স্বীকৃতি

(৫) প্রতিনিধিত্বের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক তত্ত্ব ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর শাসন বিভাগের অকাম্য হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাকে রোধ করার ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভার ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু আইনসভার গঠন-প্রকৃতি ও ইচ্ছার উপর এরূপ উদ্দেশ্যের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল বলে মনে করা হয়। তবে প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচকমণ্ডলীর ইচ্ছা অনুসারে পরিচালিত হয়, তাহলে সংখ্যালঘুর ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অধিকার খর্বিত হতে পারে। এই সমস্যা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আলেকজান্ডার হ্যামিলটন (Alexander Hamilton) বলেন যে, প্রকৃতিগতভাবে মানুষ ক্ষমতালোভী। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে ক্ষমতা অর্পিত হলে তারা সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার করবে। আবার সংখ্যালঘুর হাতে ক্ষমতা থাকলে সংখ্যাগরিষ্ঠরা তাদের দ্বারা অত্যাচারিত হবে। তাই উভয়ের ক্ষমতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা একান্ত প্রয়োজন; অন্যথায় ক্ষমতার অপব্যবহার অনিবার্য। জন স্টুয়ার্ট মিল অশিক্ষিত সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের কুফলের ভয়ে ভীত হয়ে কেবলমাত্র শিক্ষিত ও গুণান্বিত ব্যক্তিদের হাতে ভোটাধিকার প্রদানের সপক্ষে বক্তব্য উপস্থিত করেন। বর্তমানে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, পেশাগত প্রতিনিধিত্ব, বহুমুখী ভোটাধিকার ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রবর্তনের মাধ্যমে শক্তির ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হয়। রবার্ট ডাল (Robert Dahl)-এর মতে, ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ নীতি এবং নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য (Checks and Balance) নীতির সাংবিধানিক স্বীকৃতির মাধ্যমে রাজনৈতিক সমতা (political equality) ও গণ-সার্বভৌমিকতার (popular sovereignty) মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব।

সংখ্যালঘুর প্রতিনিধিত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ

(৬) এ ছাড়াও, প্রতিনিধিত্বের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক তত্ত্বগুলির অন্যান্য রূপ (other variations) আছে, যথা—উপযোগিতাবাদ তত্ত্ব এবং আদর্শবাদী তত্ত্ব। উপযোগিতাবাদীদের (utilitarians) মতে, নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ নির্বাচকমণ্ডলীর সামাজিক দর্পণ (social mirror) হিসেবে কাজ করবেন। জন স্টুয়ার্ট মিল তাই সংখ্যালঘুর প্রতিনিধিত্ব ও বিশেষ ভোটাধিকার (weighted voting) ব্যবস্থা প্রবর্তনের সপক্ষে প্রচার করেছিলেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে আদর্শবাদের জন্ম হয়। আদর্শবাদীদের (Idealists) মতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সাধারণ স্বার্থের (common interest) আবির্ভাবে সহায়তা করাই হোল প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার প্রধান কাজ। যাই হোক, একথা সত্য যে,

বাছাই-করা মুষ্টিমেয়ের শাসন

প্রতিনিধিত্বের এই সব তত্ত্ব সাধারণভাবে গণ-রাজনৈতিক দলের (mass party) বৃদ্ধিসাধন এবং শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে যথেষ্টভাবে সাহায্য করেছে। এইভাবে প্রতিনিধিত্বমূলক উদারনৈতিক গণতন্ত্র 'রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাছাই-করা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির' (political elites) শাসনে পরিণত হয়েছে।

[খ] **সমষ্টিবাচক প্রতিনিধিত্বের তত্ত্ব (Collectivist Theories of Representation) :** ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রবাদীরা সমষ্টিবাচক প্রতিনিধিত্বের তত্ত্বকে আধুনিক রূপদান করেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মৌলিক তত্ত্বের উপর প্রতিনিধিত্বের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক তত্ত্বের সমালোচনা করে এই তত্ত্ব সমাজের মধ্যে অবস্থিত শ্রেণী-সংগ্রামের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে এবং মনে করে যে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বের তত্ত্ব কার্যক্ষেত্রে ধনশালী ব্যক্তিদের স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার মাত্র। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ধনশালী ব্যক্তিদের স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। তাই এরূপ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা কার্যতঃ শ্রেণী-প্রতিনিধিত্ব (class-representation) মাত্র। কারণ উদারনৈতিক প্রতিনিধিত্বের তত্ত্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে বলে তার মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের পরিবর্তে সংখ্যালঘু শ্রেণীর স্বার্থই রক্ষিত হয়। তাছাড়া, উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক তত্ত্ব 'বাছাই-করা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির শাসনে'র (elite rule) উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলে কার্যক্ষেত্রে সেই শ্রেণীর হাতে প্রতিনিধিত্ব করার কিংবা প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ থাকে—যে-শ্রেণী অর্থনৈতিক দিক থেকে সমাজের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে সক্ষম। সুতরাং উদারনৈতিক প্রতিনিধিত্বের তত্ত্ব মূলতঃ বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের তত্ত্ব মাত্র। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্বের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে মহামতি লেনিন মন্তব্য করেন যে, বুর্জোয়া গণতন্ত্র হোল সংখ্যালঘুর গণতন্ত্র মাত্র। কার্ল মার্কস ও তাঁর অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ ১৮৪৮ সালে 'কমিউনিস্ট ইস্তেহারে' (Communist Manifesto) ঘোষণা করেন, "অতীত ইতিহাসে প্রতিটি আন্দোলন ছিল সংখ্যালঘুর দ্বারা অথবা সংখ্যালঘুর স্বার্থে পরিচালিত আন্দোলন। সর্বহারা শ্রেণীর আন্দোলন হোল বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের আত্মসচেতন স্বাধীন আন্দোলন।"

উদারনৈতিক প্রতিনিধিত্বের তত্ত্বের সমালোচনা

তাই সমষ্টিবাচক প্রতিনিধিত্বের তত্ত্ব সংখ্যালঘু শ্রেণীর পরিবর্তে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চায়। জনগণের সার্বভৌমিকতা (popular sovereignty) এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার উপর ভিত্তি করেই এই তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। লেনিনের নেতৃত্বাধীন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি কিংবা মাও সেতুঙ্-এর নেতৃত্বাধীন চীনা কমিউনিস্ট পার্টি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থাকে বর্জন করে গণ-সার্বভৌমিকতা ও সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন কায়েম করার জন্য যথাক্রমে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণসাধারণতন্ত্রী চীনে সমষ্টিবাচক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। বর্তমানে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতেও অনুরূপ প্রতি-

সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন কায়েমের উপর গুরুত্ব আরোপ

নিধিত্বের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। উদারনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থায় রাজনৈতিক সমতার নামে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা এবং ন্যায়বিচারকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে, এমতাবস্থায় মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান না ঘটায় প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা কার্যতঃ প্রহসনে পরিণত হয়। বুর্জোয়া সমাজে শ্রেণী-বিরোধ থাকায় বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য একাধিক রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটে। এই দলগুলির রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের লড়াই-এ সামিল হওয়ার জন্য মুষ্টিমেয় জনগণের হাতে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার প্রদান করা হয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমতা ও ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা, সর্বপ্রকার শোষণের অবসান ঘটায় পরস্পর-বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সুতরাং প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রতিযোগিতার কোন প্রশ্নই উঠে না। সর্বহারাশ্রেণীর রক্ষাকর্তা হিসেবে কেবলমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের সার্বভৌমিকতাকে বাস্তবে রূপায়িত করার কাজে আত্মনিয়োগ করে।

শ্রেণী-শোষণের অবসান

এক-দলীয় ব্যবস্থা

এইভাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যাবতীয় ক্ষমতা জনগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে এবং রাষ্ট্রের সব সংস্থাই (Organs of State) জনগণের নিকট থেকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতালাভ করে।

গণ-নির্বাচনের উপর গুরুত্ব আরোপ

দ্বিতীয়তঃ সমষ্টিবাচক প্রতিনিধিত্বের তত্ত্ব কর্মগত বা পেশাগত (Functional or Vocational) প্রতিনিধিত্বের পরিবর্তে ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্ব (Territorial representation) ব্যবস্থাকে কাম্য বলে মনে করে। এইভাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমষ্টিবাচক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে জনগণের সার্বভৌমিকতা ও সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্বের উপর গুরুত্ব প্রদান

এল. জি. চার্চওয়ার্ড (L. G. Churchward) সমষ্টিবাচক প্রতিনিধিত্বের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রথমতঃ সমষ্টিবাচক প্রতিনিধিত্বের তত্ত্ব গণতন্ত্রকে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন বলে বর্ণনা করে এবং নাগরিক অধিকারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু সংখ্যালঘুর অধিকার সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা এই প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে করা হয় না। উদাহরণ হিসেবে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব-ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু তাঁর এই মত সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সোভিয়েত ইউনিয়ন গণ-সাধারণতন্ত্রী চীন-সহ অপরাপর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জাতি, ভাষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার সম্পূর্ণ সুযোগ বর্তমান। তবে সংখ্যালঘু বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সমস্ত প্রয়াসকে এরূপ ব্যবস্থায় ব্যর্থ করে দেওয়া হয়—একথা সত্য। সেই সঙ্গে এ-ও সত্য যে বুর্জোয়া শ্রেণীর এই অধিকার খর্ব করা না হলে পুনরায় সমাজের মধ্যে ধনবৈষম্য ও শোষণ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। ফলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থ সমভাবে সংরক্ষণ

দ্বিতীয়তঃ সমষ্টিবাচক প্রতিনিধিত্বের তাত্ত্বিকেরা বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের মতো 'ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ', 'ক্ষমতা বন্টন', 'মন্ত্রিপরিষদের দায়িত্বশীলতা', 'আইনের অনুশাসন' প্রভৃতিতে আস্থাশীল নন।

ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ ইত্যাদিতে অনাস্থা

তৃতীয়তঃ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের নির্বাচন জনগণের নিকট প্রতিনিধিদের দায়িত্বশীলতা, জনগণ কর্তৃক প্রতিনিধিদের অপসারণ ব্যবস্থা ইত্যাদি এরূপ প্রতিনিধিত্বের বৈশিষ্ট্য। 'প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র' অপেক্ষা 'প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে'র উপর এই তত্ত্ব অধিক গুরুত্ব আরোপ করে।

জনগণের নিকট দায়িত্বশীলতা

৯। ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব এবং পেশাগত বা বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্ব (Geographical or Territorial Representation and Occupational or Functional Respresentation)

আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেহেতু প্রতিনিধিত্বমূলক সেহেতু প্রতিনিধিত্বের ভিত্তি নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট বিরোধ রয়েছে। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা গৃহীত ও প্রবর্তিত হয়েছে। যখন সমগ্র দেশকে মোটামুটি সমজনসংখ্যার ভিত্তিতে কতকগুলি পৃথক পৃথক নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করে প্রতিটি এলাকা থেকে একজন মাত্র প্রতিনিধিকে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নির্বাচিত করা হয়, তখন সেই ব্যবস্থাকে ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব বলে অভিহিত করা হয়। প্রতিনিধিত্বের এই ব্যবস্থায় একটি নির্বাচনী এলাকার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি নির্বাচক একটিমাত্র করে ভোটদানের অধিকারী। কিন্তু পেশাদার বা বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্ব বলতে সেই ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে প্রতিনিধিরা সমাজের বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি বা পেশা অবলম্বনকারী গোষ্ঠীগুলি কর্তৃক নির্বাচিত হন। বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্বের সমর্থকদের মধ্যে দ্যুগুই (Duguit), কোল (Cole), স্যাফ্‌ল (Shaffle) প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভৌগোলিক ও বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্বের সংজ্ঞা

[ক] **ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্বের সপক্ষে যুক্তি (Arguments for Geographical Representation):** ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের সপক্ষে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করা হয়:

(১) ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা প্রকৃতিগতভাবে অত্যন্ত সহজ ও সরল। কারণ এই ব্যবস্থায় নিজের পছন্দমত একজন মাত্র প্রার্থীর সপক্ষে ভোটদান করলেই ভোটদাতার দায়িত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সহজ ও সরল ব্যবস্থা

(২) এরূপ ব্যবস্থায় ভৌগোলিক দিক থেকে নির্বাচনী এলাকা স্থিরীকৃত হয় বলে প্রতিটি এলাকার ভোটদাতারা মোটামুটিভাবে ভোটপ্রার্থীর সঙ্গে পরিচিত থাকে। ফলে ভোটদাতা এবং প্রার্থীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। একদিকে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যাপারে ভোটদাতার দায়িত্ববোধ যেমন বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে তেমনি ভোটদাতাদের প্রতি প্রতিনিধির দায়িত্ববোধও গড়ে উঠে। তাই পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়; গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

ভোটদাতা ও প্রার্থীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

(৩) ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থার মাধ্যমে আইনসভায় একটি রাজনৈতিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সম্ভব হয়। এর ফলে স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

স্থায়ী সরকারের প্রতিষ্ঠা

বিপক্ষে যুক্তি (Arguments against) : কিন্তু ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্বের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হয়, যথা :

(ক) অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থায় প্রতিটি নির্বাচকের হাতে একটিমাত্র করে ভোটদানের অধিকার থাকায় তারা অপেক্ষাকৃত অযোগ্য এবং দুর্নীতিপরায়ণ প্রার্থীদের নির্বাচিত করে। সাধারণভাবে ভোটদাতারা অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হওয়ায় তারা প্রতিনিধি নির্বাচনের সময় অযোগ্য প্রার্থীর বাক্-জালে আচ্ছন্ন হয় কিংবা ধনশালী প্রার্থীদের প্রচারকৌশল, উৎকোচ প্রদান ইত্যাদির শিকারে পরিণত হয়।

অযোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচনের সম্ভাবনা

(খ) এরূপ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলে প্রতিনিধিরা জাতীয় স্বার্থের পরিবর্তে সঙ্কীর্ণ আঞ্চলিক স্বার্থরক্ষাকেই তাঁর পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করেন। প্রতিনিধির এই সঙ্কীর্ণ মনোভাব নিঃসন্দেহে গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার পরিপন্থী।

জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষিত হয়

(গ) নির্বাচনী এলাকার আয়তন ক্ষুদ্র হওয়ায় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল অতি সহজেই নির্বাচকমণ্ডলীকে প্রভাবিত করে পুনরায় ক্ষমতাসীন হতে পারে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির হাতে প্রচার-যন্ত্র, প্রশাসন-যন্ত্র ইত্যাদি না থাকার ফলে তারা সরকারী দলের মত সহজে জনমতকে নিজেদের পক্ষে টানতে পারে না।

সরকারী দলের প্রাধান্য বিস্তার

(ঘ) এরূপ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থায় সরকারী দল পুনরায় ক্ষমতালাভের জন্য এমনভাবে নির্বাচনী এলাকার পুনর্বিন্যাস করে যাতে উক্ত দলের প্রার্থীরা অতি সহজেই জয়লাভ করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচনী এলাকার পুনর্বিন্যস্তকরণের এই ব্যবস্থা "জেরি-ম্যান্ডারিং" (Gerrymandering) নামে পরিচিত।

জেরিম্যাণ্ডারিং-এর সম্ভাবনা

(ঙ) এই ব্যবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই নির্বাচনী এলাকায় একাধিক প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। অধিকংশ সময়ে ভোট ভাগাভাগির ফলে সংখ্যালঘিষ্ঠের সমর্থনপুষ্ট প্রার্থীও নির্বাচিত হন। তাই সমালোচকেরা এই ব্যবস্থাকে চরম অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করেন।

অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা

(চ) ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা এই ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যে, একটি এলাকার সমস্ত লোকের স্বার্থই মূলতঃ এক। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, একটি নির্বাচনী এলাকায় বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণকারী বিভিন্ন শ্রেণীর লোক থাকে। তাদের স্বার্থ কখনই এক এবং অভিন্ন হতে পারে না। অনেক সময় এ-ও দেখা গেছে যে, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক গোষ্ঠীগুলি পারস্পরিকভাবে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। এমতাবস্থায় কখনই তাদের পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের মধ্যে সমন্বয়-সাধন সম্ভব নয়। বরং পারস্পরিক স্বার্থ-দ্বন্দ্ব দেশের সংহতি ও শান্তিশৃংখলাকে বিপর্যস্ত করে তোলে।

নির্বাচনী এলাকার সকলের স্বার্থ অভিন্ন নয়

[খ] পেশাগত বা বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্বের গুণ (Merits of Occupational or Functional Representation) : পেশাগত প্রতিনিধিত্বের সপক্ষে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শিত হয় :

(১) প্রতিনিধিত্বের এই ব্যবস্থা গণতন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ বজায় রাখে। কারণ একই নির্বাচনী এলাকার মধ্যে বসবাস করলেই যে সমস্ত মানুষের স্বার্থ একই রূপ হবে এমন কোন কথা নেই। বরং অভিজ্ঞতার দর্পণে দেখা যায় যে, নির্বাচনী এলাকা অভিন্ন হলেও তার মধ্যে বিভিন্ন পেশা বা বৃত্তির লোক থাকে। বিশেষতঃ শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজে অভিন্ন নির্বাচনী এলাকার মধ্যে শ্রমিক ও মালিক, কৃষক ও জোতদার একই সঙ্গে বসবাস করলেও তাদের স্বার্থ কখনই অভিন্ন হতে পারে না। তা ছাড়া, নির্দিষ্টঅঞ্চলে বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণকারী মানুষ, যেমন—আইনজীবী, ডাক্তার, শিক্ষক, শ্রমিক ইত্যাদি পাশাপাশি বাস করে। বৃত্তিগত দিক থেকে ভিন্নতা থাকার জন্য স্বার্থের দিক থেকেও ভিন্নতা থাকতে বাধ্য। এক্ষেত্রে প্রতিটি বৃত্তিগ্রহণকারী ব্যক্তিদের নিজস্ব প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে, বিভিন্ন বৃত্তিগ্রহণকারী ব্যক্তিদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে না। কাজেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মৌলিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্য পেশাগত প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজন বলে অনেকে অভিমত পোষণ করেন। দ্যুগুই-এর মতে সমাজে সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশের জন্য সমাজস্থ বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন ; কারণ সাধারণ ইচ্ছা তাদের মতামতের ভিত্তিতে গঠিত হয়। তাঁর ভাষায় শিল্প, সম্পত্তি, ব্যবসায়, কলকারখানা, পেশা, এমনকি বিজ্ঞান ও ধর্ম ইত্যাদি জাতীয় জীবনের সমস্ত প্রধান শক্তির প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। ইংরেজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কোলের মতে, জাতীয় জীবনে যতগুলি পৃথক কাজ থাকবে আইনসভায়ও ততগুলি সংঘের স্থান সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে। আইনসভাকেও দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট করে এক কক্ষকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে এবং অন্য কক্ষকে বৃত্তির ভিত্তিতে নির্বাচন করা উচিত বলে গ্রাহাম ওয়ালেস মনে করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নে এরূপ প্রতিনিধিত্ব-ব্যবস্থা প্রবর্তিত রয়েছে।

গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় থাকে

দোষ (Demerits) : কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পেশাগত প্রতিনিধিত্বের সমালোচনা করেন।

(ক) পেশাগত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা জাতীয় সার্বভৌমিকতা নীতির বিরোধী। কারণ এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক প্রতিনিধি নিজেকে জাতীয় প্রতিনিধি বলে মনে না করে নির্বাচক গোষ্ঠীর বিশেষ স্বার্থ বা মতামতের প্রতিনিধি বলে মনে করেন। এই পেশাভিত্তিক বিভিন্ন গোষ্ঠী-স্বার্থ প্রাধান্য অর্জন করায় সামগ্রিকভাবে জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষিত হয়।

জাতীয় সার্বভৌমি-কতার নীতি-বিরোধী

(খ) এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর বিশেষ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকায় সমাজে শ্রেণী-দ্বন্দ্ব প্রবল আকার ধারণ করে। ফলে সংঘর্ষ, বিভ্রান্তি, এমনকি অরাজকতার সৃষ্টি হতে পারে। তাই ফরাসী অধ্যাপক ইর্জমি (Esmein) এরূপ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থাকে অলীক (illusion) ও অসঙ্গত নীতি বলে বর্ণনা করেছেন।

অরাজকতা সৃষ্টির সম্ভাবনা

(গ) এরূপ প্রতিনিধিত্বের ফলে আইনসভা অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কোন একটি গোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারায় পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যৌথ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বার্থবিরোধ প্রবল থাকায় যৌথ সরকার প্রকৃতিগতভাবে অস্থায়ী। আইনসভা আইন প্রণয়নের পরিবর্তে বিতর্ক ক্ষেত্রে পরিণত হয়। সুদৃঢ়ভাবে কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এরূপ সরকার প্রকৃতিগতভাবে অত্যন্ত দুর্বল হতে বাধ্য।

অস্থায়ী সরকারের প্রতিষ্ঠা

(ঘ) অনেক সময় এমন কতকগুলি গোষ্ঠীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় যাদের উদ্দেশ্যের সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। এক্ষেত্রে তাদেরও প্রতিনিধিত্বের অধিকার থাকার অর্থ রাজনৈতিকভাবে উদাসীন ব্যক্তিদের হাতে রাজনৈতিক দায়িত্ব অর্পণ করা। সমালোচকদের মতে, এরূপ ব্যবস্থা গণতন্ত্রের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর।

গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর ব্যবস্থা

(ঙ) সর্বোপরি, বিভিন্ন পেশা বা বৃত্তিমূলক গোষ্ঠীগুলির সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। অনেক সময় প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতি গোষ্ঠীর সংখ্যা পরিবর্তনের সহায়তা করে।

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা কষ্টকর

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, উভয় প্রকার প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থার কোনটিই সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত না হলেও ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থাকে অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়। কারণ এই ব্যবস্থায় সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠী-স্বার্থ অপেক্ষা বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। অবশ্য সেই সঙ্গে একথাও অনস্বীকার্য যে, সমাজের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকার পেশাগত সংঘ ও স্বার্থের পরামর্শক্রমে আইন প্রণীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেজন্য কিন্তু আইনসভায় বিভিন্ন পেশা বা স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের কোন প্রয়োজন নেই। 'পরামর্শদানকারী সংস্থা' (Advisory Bodies) মাধ্যমে বিভিন্ন পেশা বা স্বার্থগত গোষ্ঠীর সঙ্গে আইনসভার যোগসূত্র স্থাপিত হতে পারে।

উপসংহার

১০। সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব (Minority Representation)

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের সমস্যা গণতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান সমস্যা। গণতন্ত্র বলতে 'জনগণের দ্বারা', 'জনগণের জন্য', 'জনগণের শাসন' বোঝায়। কিন্তু বাস্তবে গণতন্ত্র হোল সমগ্র জনগণের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের শাসন মাত্র। সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসনকার্য পরিচালনা করবে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সেই শাসন মেনে নেবে, এটিই হোল আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তি। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনকার্য পরিচালনায় সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা না থাকলে গণতন্ত্রে জনমত যথার্থভাবে প্রকাশিত হতে পারে না। তাই গণতন্ত্রকে 'জনমত পরিচালিত শাসনব্যবস্থা' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে সংখ্যালঘিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকা একান্ত কাম্য বলে জন স্টুয়ার্ট

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনীয়তা

মিল, লেকী প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ অভিমত পোষণ করেন। তাছাড়া সরকারী সিদ্ধান্ত ও কার্যাবলীর ফলাফল যেহেতু সকলকেই স্পর্শ করে এবং প্রতিটি নাগরিককে সরকারী ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ করপ্রদান করতে হয়, সেহেতু নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে কমবেশী সকলের অধিকার থাকা প্রয়োজন। এরূপ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ থাকা আবশ্যক। সর্বোপরি, বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, অনেক সময় একটি রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শতকরা ৫০½ ভাগ জনগণের সমর্থন লাভ করে আইনসভার প্রায় সব ক'টি আসন অধিকার করে। এক্ষেত্রে শতকরা ৪৯½ ভাগ জনগণের সমর্থনপুষ্ট হয়েও সংখ্যালঘিষ্ঠ দল আইনসভায় যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করতে ব্যর্থ হয়। তাই এরূপ ব্যবস্থাকে রাজনৈতিকভাবে বা নীতিগতভাবে আদৌ সমর্থন করা যায় না। এই ব্যবস্থা রাজনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুতঃ সংখ্যালঘিষ্ঠের সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা না থাকলে সংখ্যালঘু রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর মধ্যে ক্রমশঃ অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হতে থাকবে এবং তা একদিন বিক্ষোভ বা বিপ্লবের আকারে আত্মপ্রকাশ করে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলবে।

কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের সপক্ষে নানা প্রকার যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হলেও পদ্ধতির ত্রুটিবিচ্যুতিগুলিকেও একেবারে অস্বীকার করা যায় না। বলা হয় যে, দল বা স্বার্থের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলে নির্বাচকমণ্ডলী ও প্রতিনিধিবৃন্দ বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য ও স্বার্থের পরিবর্তে সংকীর্ণ দলীয় বা গোষ্ঠীগত স্বার্থকে প্রাধান্য দিবে। তাছাড়া, আইনসভা অনেক সময় প্রায় সমক্ষমতাসম্পন্ন রাজনৈতিক দলগুলির তর্কবিতর্কের পীঠস্থানে পরিণত হয়। ফলে কাম্য আইন সহজে প্রণীত হতে পারবে না।

বিপক্ষে যুক্তি

সর্বোপরি, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা জনগণের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা, বিদ্বেষ, সংঘর্ষ ইত্যাদি গণতান্ত্রিক পরিবেশকে কলুষিত করে তোলে। দেশের স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা এর ফলে অচল হয়ে যেতে পারে। তাই সিজউইক (Sidgwick), ল্যাস্কি (Laski) প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের তীব্র বিরোধিতা করেছেন।

তবে একথা সত্য যে, গণতন্ত্রের প্রকৃত সাফল্যের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের স্বীকৃতি যেমন প্রয়োজন, তেমনি সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বেরও প্রয়োজন।

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের বিভিন্ন পদ্ধতি (Different Methods of Minority Representation) ঃ সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে ক. সীমাবদ্ধ ভোট পদ্ধতি (Limited Vote System), খ. দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতি (Second Ballot System), গ. স্তূপীকৃত ভোট-পদ্ধতি (Cumulative Vote System), ঘ. সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব (Communal Representation) এবং ঙ. সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

[ক] **সীমাবদ্ধ ভোটপদ্ধতি (Limited Vote System) ঃ** সীমাবদ্ধ ভোট-

পদ্ধতিতে প্রতিটি নির্বাচনী কেন্দ্র বহু আসন-সমন্বিত হয়। প্রতি কেন্দ্রে যতগুলি আসন থাকে অর্থাৎ যতজন প্রার্থী নির্বাচিত হবেন বলে নির্দিষ্ট থাকে, প্রত্যেক ভোটদাতা তদপেক্ষা একটি করে কম ভোট প্রদান করতে পারে। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের পক্ষে সব আসন অধিকার করা সম্ভব হয় না। একটি নির্বাচন কেন্দ্রে অন্ততঃ একটি করে আসন সংখ্যালঘিষ্ঠ দল অধিকার করতে পারে। উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। ধরা যাক্, একটি নির্বাচনী কেন্দ্রে চারটি আসন আছে। ভোটদাতারা কিন্তু চারটি আসনের জন্য চারটি ভোটের পরিবর্তে তিনটি ভোট দিতে পারবে। কিন্তু এই ব্যবস্থাতেও সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলি সংখ্যায় অনেক হলে কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠ দল অত্যধিক শক্তিশালী হলে সুচিন্তিত পরিকল্পনার সাহায্যে তাদের পক্ষে সব কটি আসন দখল করা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। বর্তমানে এই পদ্ধতির প্রচলন নেই।

সীমাবদ্ধ ভোট পদ্ধতির প্রকৃতি

[খ] **দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতি (Second Ballot System)ঃ** দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতির মাধ্যমে কোন একটি নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধি যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নির্বাচিত হতে পারেন সেই ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থায় একটি নির্বাচনী এলাকা থেকে একজন মাত্র প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে পারেন। দু'জনের অধিক প্রার্থীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যদি কোন প্রার্থী সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারেন তাহলে সর্বনিম্ন স্থানাধিকারী প্রার্থীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বাদ দিয়ে পুনরায় নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। এই নির্বাচনে যে প্রার্থী সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন তিনিই প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হন। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে। কোন একটি নির্বাচন কেন্দ্রে ক, খ ও গ—এই তিনজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর দেখা গেল যে, মোট এক লক্ষ ভোটের মধ্যে ক, খ এবং গ যথাক্রমে ৪৫ হাজার, ৪০ হাজার এবং ১৫ হাজার ভোট পেয়েছেন অর্থাৎ কেউ-ই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেননি। এক্ষেত্রে সর্বনিম্ন স্থানাধিকারী 'গ'কে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বাদ দিয়ে দ্বিতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচনে 'খ' ৫৫ হাজার এবং 'ক' ৪৫ হাজার ভোটদাতার সমর্থন লাভ করলেন। এক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনপুষ্ট 'খ' কে বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হবে। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি হোল—এই পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল এবং ব্যয়বহুল। বার বার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে জনসাধারণ বিরক্ত হয়। তাছাড়া, এই পদ্ধতির মাধ্যমে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের কোন ব্যবস্থা করা যায় না। ফ্রান্সে দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। পূর্বে বেলজিয়াম, হল্যান্ড, জার্মানী, ইতালি প্রভৃতি রাষ্ট্রে এই ব্যবস্থা থাকলেও বর্তমান শতাব্দীতে ঐ সব রাষ্ট্রে দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতির বিলোপ সাধন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতির প্রকৃতি

[গ] **স্তূপীকৃতভোট-পদ্ধতি (Cumulative Vote System)ঃ** স্তূপীকৃত ভোটদান পদ্ধতিতে প্রতিটি নির্বাচন কেন্দ্র বহু-আসনসমন্বিত হয় এবং একটি কেন্দ্রে যতগুলি আসন থাকে প্রত্যেক নির্বাচক ততগুলি করে ভোট দান করতে পারবে। নির্বাচক তার ভোটগুলি বিভিন্ন প্রার্থীর

স্তূপীকৃত ভোট-পদ্ধতির প্রকৃতি

মধ্যে বন্টন করতে পারে কিংবা একজন প্রার্থীর সপক্ষে প্রদান করতে পারে। এইভাবে স্তূপীকৃত ভোটদানের ফলে সংখ্যালঘু দল অন্ততঃ একটি আসন লাভ করতে সক্ষম হয়। কারণ সংখ্যালঘু দল বা স্বার্থের সমস্ত ভোটদাতা একজনমাত্র প্রার্থীর অনুকূলে তাদের সব ভোট প্রদান করে। কিন্তু এই পদ্ধতিও ত্রুটিমুক্ত নয়। এক্ষেত্রে বহু ভোটের অপব্যবহার হয়। তাছাড়া, এই পদ্ধতির মাধ্যমে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বা স্বার্থের সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা যায় না।

[ঘ] **সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব (Communal Representation) :** সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থায় প্রতিটি সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ভিত্তিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কিংবা যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থায় প্রতিটি সম্প্রদায়ের জন্য আসন নির্দিষ্ট করা থাকে। সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের প্রথম পদ্ধতিটি ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে প্রবর্তিত ছিল। ঐ সময় হিন্দুরা হিন্দু প্রতিনিধিকে, মুসলমানরা মুসলমান প্রতিনিধিকে এবং শিখরা শিখ প্রতিনিধিকে ভোটদান করত। বর্তমান ভারতবর্ষের লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচনের সময় সংখ্যালঘু তফসিল জাতি ও উপজাতিগুলির (Schedule Castes and Schedule Tribes) জন্য আসন সংরক্ষিত থাকে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি আইন-সভায় নির্বাচিত হতে পারেন। কিন্তু এই ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য ত্রুটি হোল—ক. এই ব্যবস্থা সুদীর্ঘকাল চালু থাকলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের পরিবর্তে তাদের সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ স্বার্থের কথাই কেবল চিন্তা করে। ফলে জাতীয় স্বার্থ সামগ্রিকভাবে উপেক্ষিত হয়। খ. এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বার্থদ্বন্দ্ব প্রবল আকার ধারণ করে গণতন্ত্রের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিতে পারে। গ. এরূপ ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্প্রদায়গুলির শক্তির আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করাও সম্ভব হয় না। তাই অনেকে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থাকে অকাম্য বলে মনে করেন।

সাম্প্রদায়িক ভোট-পদ্ধতির প্রকৃতি ও গুণাগুণ

[ঙ] **সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation) :** সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে সংখ্যালঘু দল বা স্বার্থের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা সম্ভব বলে জন স্টুয়ার্ট মিল, লেকী প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ সুদৃঢ়ভাবে অভিমত পোষণ করেন। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল বা যে-কোন গোষ্ঠী তাদের সমর্থনে প্রদত্ত ভোটের সমানুপাতিক হারে প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারে। এই ব্যবস্থায় সমগ্র দেশকে কতকগুলি বৃহৎ নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি নির্বাচন কেন্দ্র বহু-আসন-সমন্বিত হয়।

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের অর্থ

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের দুটি প্রধান পদ্ধতি রয়েছে, যথা—ক. একক-হস্তান্তরযোগ্য ভোট পদ্ধতি (Method of Single transferable Vote) এবং খ. তালিকা-পদ্ধতি (List System)। ইংরেজ লেখক টমাস হেয়ার (Thomas Hare) তাঁর 'প্রতিনিধি নির্বাচন' (Election of Representatives) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে একক-হস্তান্তরযোগ্য

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের দুটি প্রধান পদ্ধতি

ভোট পদ্ধতির কথা প্রচার করেন। তাঁর নামানুসারে এই পদ্ধতি 'হেয়ার পদ্ধতি' (Hare-System) নামে পরবর্তী সময়ে পরিচিত হয়। তারপর ডেনমার্কের অ্যান্ড্রি (Andry) নামে জনৈক মন্ত্রী এই পদ্ধতিকে বাস্তবে প্রয়োগ করেন। তাই অনেকে এই পদ্ধতিকে 'অ্যান্ড্রি পদ্ধতি' বলে অভিহিত করেন।

হেয়ার পদ্ধতি

হেয়ার পদ্ধতি অনুসারে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকা থেকে অন্যূন তিনজন প্রতিনিধিকে নির্বাচিত হতে হবে। নির্বাচনী এলাকায় আসন সংখ্যা যাই হোক না কেন, প্রতিটি ভোটদাতার প্রকৃত কার্যকরী ভোটের সংখ্যা একের বেশী হবে না।

নির্বাচককে তার ভোটপত্রে (Ballot Paper) উল্লিখিত প্রার্থীর নামের পাশে ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি সংখ্যা লিখে নিজের পছন্দ প্রকাশ করতে হবে। নির্বাচনী এলাকায় যতগুলি আসন আছে প্রতিটি নির্বাচক ততগুলি পর্যন্ত পছন্দ প্রকাশ করতে পারে। তবে ইচ্ছা করলে নির্বাচক তার প্রথম পছন্দ ছাড়া অন্য পছন্দ নাও জানাতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক নির্বাচককে তার প্রথম পছন্দ প্রকাশ করতেই হবে; তা না হলে তার ভোটপত্র বাতিল বলে পরিগণিত হবে।

'কোটা' নির্ধারণের উপায়

নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রার্থীদের একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট পেতে হয়। এই নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোটকে 'কোটা' (Quota) বলা হয়। 'কোটা' নির্ধারণে দুটি পদ্ধতি আছে। প্রথম পদ্ধতি অনুসারে, প্রদত্ত ভোটের সংখ্যাকে প্রার্থীর সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে ভাগফলে যে সংখ্যা দাঁড়াবে তাই হোল 'কোটা'। কোন একটি নির্বাচন কেন্দ্র যদি ৫টি আসনবিশিষ্ট হয় এবং ঐ কেন্দ্রে যদি প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা ৫০,০০০ হয়, তাহলে ৫০,০০০ কে ৫ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল দাঁড়ায় ১০,০০০। এই ১০,০০০ হোল 'কোটা'। কোটা নির্ধারণের এই সহজ পদ্ধতিকে এইভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে—

$$\frac{\text{নির্বাচন কেন্দ্রের মোট প্রদত্ত ভোট}}{\text{নির্বাচন কেন্দ্রের আসন সংখা}} = \text{কোটা}$$

কোটা নির্ধারণের দ্বিতীয় পদ্ধতি হোল: নির্বাচন কেন্দ্রের প্রদত্ত বৈধ ভোটসংখ্যাকে আসন সংখ্যার সঙ্গে ১ যোগ করে ভাগ দিলে যে ভাগফল দাঁড়াবে তার সঙ্গে ১ যোগ করলে কোটা পাওয়া যাবে। ধরা যাক্, কোন একটি নির্বাচনী কেন্দ্রে ৪টি আসন রয়েছে এবং ঐ কেন্দ্রের বৈধ ভোট পড়েছে মোট ৫০,০০০। এক্ষেত্রে কোটা নির্ধারিত হবে—

$$\frac{৫০,০০০}{৪+১} = ১০,০০০+১ = ১০,০০১ \text{ হল কোটা।}$$

$$\text{অন্যভাবে বলা যায়, } \frac{\text{প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা}}{\text{আসন সংখ্যা}+১} + ১ = \text{কোটা}$$

দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে নির্ধারিত কোটাকে "ড্রুপ কোটা" (Droop Quota) বলা হয়।

ভোট গণনার সময় কেবলমাত্র প্রথম পছন্দের ভোটগুলি গণনা করা হয়। প্রার্থীদের মধ্যে যাঁরা প্রথম পছন্দের ভোট পেয়ে কোটা স্পর্শ করতে পারেন তাঁদের

নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হয় অর্থাৎ যে সব প্রার্থী কোটার সম-সংখ্যক বা তার বেশী প্রথম পছন্দের ভোট পান তাঁরা প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হন। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, স্বল্প সংখ্যক প্রার্থী প্রথম পছন্দের ভোটে নির্বাচিত হতে পারেন। এক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রার্থীদের অতিরিক্ত ভোট নির্বাচকদের পছন্দ অনুসারে অন্যান্য প্রার্থীদের মধ্যে বণ্টিত হয়। অর্থাৎ নির্বাচকদের প্রথম পছন্দের ভোটে নির্বাচিত প্রার্থীদের অতিরিক্ত ভোট দ্বিতীয় পছন্দের ব্যক্তি এবং দ্বিতীয় পছন্দের প্রার্থী নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর অতিরিক্ত ভোট তৃতীয় পছন্দের প্রার্থীর নিকট হস্তান্তরিত হয়। এইভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত নির্দিষ্ট সমস্ত আসন পূর্ণ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ভোট হস্তান্তর চলতে থাকে। কিন্তু এইভাবে অতিরিক্ত ভোট হস্তান্তরের মাধ্যমেও যদি নির্দিষ্ট আসনগুলি পূর্ণ না হয় তাহলে সর্বাপেক্ষা কম সংখ্যক ভোটপ্রাপ্তদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বাদ দেওয়া হয় এবং তাদের প্রাপ্ত ভোটগুলি, পছন্দ অনুসারে পুনর্বণ্টিত হয়। হেয়ার পদ্ধতি বর্তমানে সুইজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম ইত্যাদি রাষ্ট্রে প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষে রাজ্যসভার (Rajya Sabha) সদস্যদের নির্বাচনে অনুরূপ পদ্ধতি অনুসৃত হয়।

তালিকা পদ্ধতি

তালিকা পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচন কেন্দ্রের আসন সংখ্যার সমান নিজ দলের সদস্যদের একটি তালিকা প্রস্তুত করে জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করে; নির্বাচকমন্ডলী তাদের পছন্দ অনুসারে যে-কোন একটি রাজনৈতিক দলের তালিকাকে ভোটদান করে। ভোটদাতারা অবশ্য তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের নামের পাশে ১, ২, ৩, ইত্যাদি সংখ্যা লিখে তাদের পছন্দ প্রকাশ করে। প্রদত্ত বৈধ ভোটসংখ্যাকে আসন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে ভাগফলে যে সংখ্যা দাঁড়ায় তাকেই 'কোটা' বলা হয়। কোন তালিকার সপক্ষে যতগুলি ভোট প্রদত্ত হয় সেই সংখ্যাকে কোটার সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে ভাগফলে যে সংখ্যা দাঁড়াবে ততজন প্রতিনিধি সেই তালিকা থেকে আইন সভায় নির্বাচিত হবেন। কিন্তু অনেক সময় এই পদ্ধতির সাহায্যেও সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কেন্দ্রের সমস্ত আসন পূরণ করা সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলি কর্তৃক প্রদত্ত তালিকার মধ্যে যে তালিকাটি সর্বাধিক অতিরিক্ত ভগ্নাংশ (highest fractional surplus) ভোট পায় সেই রাজনৈতিক দল উক্ত আসনটি লাভ করে। অন্য একটি উপায়েও ঐ শূন্য আসনটি পূর্ণ করা যেতে পারে। অনেক সময় একটি রাজনৈতিক দলের কোটার ঘাটতি পূরণের জন্য পার্শ্ববর্তী নির্বাচনী এলাকার সেই দলের অতিরিক্ত ভগ্নাংশ ভোটগুলি গ্রহণ করা হয়। একটি ছকের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে:

নির্বাচক মণ্ডলী	প্রতিদ্বন্দ্বী দল	প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা	অতিরিক্ত ভগ্নাংশ ভোট	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
প্রদত্ত ভোট সংখ্যা—৩,৬০,০০০	ক	৩০,৭০০	০	০
নির্দিষ্ট আসন সংখ্যা—৯	খ	২,০৩,০০০	৩,০০০	
সাধারণ হিসাব অনুযায়ী জয়লাভের জন্য প্রয়োজনীয় ভোট সংখ্যা— ৪০,০০০	গ	১,২৭,০০০	৭,০০০	৩+ (সর্বাধিক ভগ্নাংশের ভিত্তিতে)

কিন্তু পার্শ্ববর্তী নির্বাচনী এলাকার অতিরিক্ত ভগ্নাংশ ভোটগুলি যদি সংযুক্তি-করণের পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হয় তা হলে শূন্য আসনটি 'গ'-এর পরিবর্তে 'ক' অথবা 'খ' পেতে পারে কিংবা 'গ'-ও পেতে পারে।

বর্তমান ইস্রায়েল, সুইডেন, ডেনমার্ক ইত্যাদি রাষ্ট্রে তালিকা-পদ্ধতি প্রবর্তিত রয়েছে।

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের সপক্ষে যুক্তি (Arguments for Proportional Representation) : সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের সপক্ষে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শিত হয় :

(১) জন স্টুয়ার্ট মিল, লেকী প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের সপক্ষে মত প্রকাশ করতে গিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থাকে চরম অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি বলে সমালোচনা করেন। কারণ, এরূপ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভোটদাতাকে কার্যতঃ ভোটাধিকারহীন করে রাখা হয়। তাছাড়া অনেক সময় দেখা যায় যে, নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্জন না করেও একটি রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করতে পারে। বহুদলীয় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ভোট বিভাজনের ফলে শতকরা ৫০ ভাগেরও কম ভোট পেয়ে একটি দল সরকারী ক্ষমতা অধিকার করতে পারে। এর ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব কার্যক্ষেত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বে পরিণত হয়। তাই সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বকে গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত বলে মিল মনে করেন। তাঁর মতে, সংখ্যালঘুর প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা ছাড়া কখনই গণতন্ত্রের সাফল্য আসতে পারে না। কারণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সকলের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকা উচিত। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকলে যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দল তার শক্তির আনুপাতিক হারে আইনসভায় আসন লাভ করতে পারে, তেমনি সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলি তাদের শক্তি অনুসারে প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ পায়। সমানুপাতিকভাবে প্রতিটি দলের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ গণতন্ত্রের বুনিয়াদকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে—এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তা না হলে গণতন্ত্র বিশেষ একটি দলের সুবিধাতন্ত্রে পরিণত হতে পারে।

গণতন্ত্রের অনুপন্থী

(২) সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থায় প্রতিটি ভোটদাতাকে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য তার পছন্দ জ্ঞাপন করতে হয়। ফলে তার রাজনৈতিক চেতনা অনেক বেশী জাগ্রত হয়। সে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারে যে, তার প্রদত্ত একটি ভোটের মূল্য অপরিসীম। সুতরাং প্রতিনিধিত্বের এই ব্যবস্থা নাগরিকদের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি করে :

রাজনৈতিক চেতনার বৃদ্ধিসাধন

(৩) একটি আসন-সম্বলিত নির্বাচন ব্যবস্থার 'জেরিম্যান্ডারিং' এর কু-সম্ভাবনার হাত থেকে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ মুক্ত।

জেরিম্যাণ্ডারিং-এর সম্ভাবনা-মুক্ত

(৪) এই পদ্ধতি নির্বাচকমণ্ডলীকে নিজের পছন্দ অনুযায়ী প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যাপক স্বাধীনতা প্রদান করে।

প্রার্থী নির্বাচনের স্বাধীনতা

(৫) মিলের মতে, সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থায় নির্বাচনী এলাকা আকৃতিগতভাবে ক্ষুদ্র হওয়ার ফলে বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলি প্রভাবশালী ও ধনশালী ব্যক্তিদের প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করায়। ফলে প্রকৃতপক্ষে সুযোগ্য ব্যক্তিরা নির্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতে চান না কিংবা অবতীর্ণ হলেও ধনশালী প্রার্থীদের নিকট সহজেই পরাজিত হন। কিন্তু সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বা গোষ্ঠী সুযোগ্য প্রার্থীকে মনোনীত করে। প্রদত্ত ভোটের সমানুপাতিক হারে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থাকায় ঐ সব গুণী ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত আইনসভার উৎকর্ষ সাধিত হয়।

আইনসভার গুণগত উৎকর্ষ সাধন

বিপক্ষে যুক্তি (**Arguments against**) : কিন্তু বর্তমানে নীতিগত দিক থেকে এবং প্রয়োগের দিক থেকে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের সুতীব্র সমালোচনা করা হয়।

(ক) সিজউইকের মতে, সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা শ্রেণীস্বার্থমূলক আইন (class legislation) প্রণয়নে উৎসাহিত করে। এরূপ আইন প্রণীত হলে ক্ষমতাসীন শ্রেণী ছাড়া অন্য শ্রেণীর স্বার্থ উপেক্ষিত হয়। কিন্তু এরূপ সমালোচনা অর্থহীন। কারণ সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা যেখানে নেই সেখানেও সমাজ শ্রেণী-বিভক্ত থাকলে প্রভুত্বকারী শ্রেণী নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে সর্বদাই আইন প্রণয়ন করে।

শ্রেণীস্বার্থমূলক আইন প্রণয়নের সম্ভাবনা

(খ) এরূপ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থায় সমাজ পরস্পর-বিরোধী বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী বা স্বার্থে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তারা জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থকে বড় বলে মনে করে। এইভাবে জাতীয় ঐক্যের পরিবর্তে অনৈক্য জাতীয় জীবনে বিপর্যয়ের সূত্রপাত করে।

জাতীয় জীবনে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা

(গ) সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থায় অনেক সময় কোন একটি রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে ব্যর্থ হলে বিভিন্ন দলের পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে সরকার গঠিত হয়। বলা বাহুল্য, এরূপ সরকার প্রকৃতিগতভাবে দুর্বল ও অস্থায়ী হতে বাধ্য।

সরকারের স্থায়িত্বের অভাব

(ঘ) এরূপ ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলির এবং তাদের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের প্রাধান্য-প্রতিপত্তি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। অনেকে এরূপ প্রভাব বৃদ্ধিকে গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক বলে মনে করেন। সমালোচকদের মতে, হেয়ার-পদ্ধতি অপেক্ষা তালিকা-পদ্ধতিতে এরূপ বিপদের সম্ভাবনা অনেক বেশী।

নেতৃত্বের প্রাধান্য বৃদ্ধি

(ঙ) তালিকা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে অন্য একটি অভিযোগ হোল—এই ব্যবস্থায় নির্বাচকমণ্ডলীর সঙ্গে প্রতিনিধিদের নিবিড় সম্পর্ক কখনই গড়ে উঠতে পারে না। কারণ নির্বাচক কোন বিশেষ প্রার্থীর গুণাগুণ বিচার না করেই একটি তালিকার অনুকূলে ভোটদান করে। তাই এই পদ্ধতিকে অকাম্য বলে মনে করা হয়।

তালিকা পদ্ধতির ত্রুটি

(চ) আপাতদৃষ্টিতে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা সহজেই কার্যকর হতে পারে বলে মনে করা হলেও বাস্তবে কিন্তু এই ব্যবস্থাকে প্রয়োগ করা অত্যন্ত কঠিন। কারণ, প্রকৃতিগতভাবে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল। যে দেশের অধিকাংশ জনগণ অজ্ঞ ও অশিক্ষিত সেখানে এরূপ পদ্ধতি অচল বলে মনে করা হয়।

এই ব্যবস্থা কার্যকর করা কঠিন

(ছ) সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা উপ-নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য নয় বলে সমালোচকদের ধারণা। অথচ উপনির্বাচন হোল জনমতের পরিবর্তিত গতি-প্রকৃতি নির্ধারণের মানদণ্ড।

উপনির্বাচনের পক্ষে অনুপযোগী

(জ) পেশাগত প্রতিনিধিত্বের সমর্থকেরা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার সমালোচনা করে বলেন যে, এই ব্যবস্থা কেবলমাত্র সংখ্যালঘু রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করে। কিন্তু রাজনৈতিক দল ছাড়াও সামাজিক, অর্থনৈতিক, পেশাগত ইত্যাদি যে সব গোষ্ঠী সমাজে থাকে তাদের প্রতিনিধিত্বের কোন সুযোগ এই ব্যবস্থায় নেই। তাই প্রতিনিধিত্বের এই ব্যবস্থাকে 'অসম্পূর্ণ' বা আংশিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা' বলে বর্ণনা করাই সমীচীন বলে তাঁরা অভিমত পোষণ করেন।

রাজনৈতিক দল ছাড়া অন্য গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের সুযোগ কম

পরিশেষে বলা যায় যে, সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নানা প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে অনেক রাষ্ট্রে এই ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। কোন কোন রাষ্ট্রে এই ব্যবস্থা কিছুটা সফল হয়েছে। আবার কোথাও এই ব্যবস্থা ব্যর্থতার পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। সুতরাং সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে রয়েছে। তবে একথা সত্য যে, সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতিগুলির মধ্যে কেবলমাত্র সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে সংখ্যালঘু দল বা গোষ্ঠী প্রকৃত অর্থে প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ লাভ করে।

উপসংহার

১১। প্রতিনিধি ও নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে সম্পর্ক (Relation between the Representative and his Constituency)

বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে জন প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা সর্বত্রই গৃহীত হয়েছে। কিন্তু প্রতিনিধিদের সঙ্গে নির্বাচকমণ্ডলীর কিরূপ সম্পর্ক হবে—এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে বাদানুবাদের অন্ত নেই। প্রতিনিধিদের সঙ্গে নির্বাচকমণ্ডলীর সম্পর্ক নির্ধারণের প্রশ্নে দুটি পরস্পর-বিরোধী মতের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রথম মত অনুসারে, প্রতিনিধি তাঁর নির্বাচকমণ্ডলীর 'এজেন্ট' (Agent) হিসেবে কাজ করতে বাধ্য থাকবেন। অর্থাৎ নির্বাচকমণ্ডলী যেরূপ নির্দেশ দিবে প্রতিনিধি সেই নির্দেশ মতোই কাজ করবেন। এই মতের সমর্থকদের যুক্তি হোল গণতন্ত্র যেহেতু 'জনগণের দ্বারা জনগণের স্বার্থে পরিচালিত জনগণের শাসন', সেহেতু জনগণ

পরস্পর-বিরোধী দুটি অভিমত

প্রতিনিধি নির্বাচকমণ্ডলীর এজেন্ট মাত্র

প্রতিনিধি অপেক্ষা নিজেদের ভালমন্দ অনেক বেশী বুঝতে পারে। তাছাড়া, গণতন্ত্রে 'জনগণের সার্বভৌমিকতা' স্বীকৃত বলে এই সার্বভৌমিকতাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য কেবলমাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা থাকাই যথেষ্ট নয়; সেই সঙ্গে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষমতা থাকাও প্রয়োজন। রুশো (Rousseau) এই মতের সমর্থক ছিলেন। তিনি এই অভিমত প্রদান করেন যে, নির্দিষ্ট সময় অন্তর ভোটদান করার স্বাধীনতা ছাড়া ইংরেজদের অন্য কোন প্রকার স্বাধীনতা নেই। কারণ দুটি নির্বাচনের মধ্যবর্তী সময়ে নির্বাচকগণ তাদের প্রতিনিধিদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনেই থাকে।

কিন্তু অপর মত অনুসারে, নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ যেহেতু দেশের সমগ্র জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্য নির্বাচিত হন, সেহেতু নির্বাচকমন্ডলীর এজেন্ট হিসেবে তাদের নির্দেশে প্রতিনিধিদের পরিচালিত হওয়া উচিত নয়। নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি অনুসারে প্রতিনিধিদের স্বাধীনভাবে কাজ করাই সমীচীন। এর ফলে যদি কোন একজন প্রতিনিধির নিজস্ব নির্বাচকমন্ডলীর স্বার্থ কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয় তাতেও কোন ক্ষতি নেই। কারণ নির্বাচিত হওয়ার পর প্রতিনিধি কেবলমাত্র তাঁর নিজের নির্বাচনী এলাকার প্রতিভূ হিসেবে কাজ করেন না; তখন তিনি সমগ্র দেশের প্রতিনিধি। এডমান্ড বার্ক (Edmund Burke) সর্বপ্রথম এই মতবাদ প্রচার করেন। ১৭৮০ সালে তিনি তাঁর ব্রিস্টলের নির্বাচকমন্ডলীর উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন যে, "পার্লামেন্টের একজন নির্বাচিত সদস্য তাঁর নির্বাচকমন্ডলীর প্রতিনিধি (representative) মাত্র, তিনি তাদের ভারপ্রাপ্ত প্রতিভূ (delegate) নন।" জন স্টুয়ার্ট মিলও অনুরূপ উক্তি করেছেন। তাঁর মতে, একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি নির্বাচকমন্ডলীর ভারপ্রাপ্ত প্রতিভূ হিসেবে কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়া তাদের নির্দেশমত সর্বদা কাজ করতে বাধ্য নয়।

প্রতিনিধি নির্বাচকমণ্ডলীর এজেন্ট মাত্র নয়

প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিনিধিগণ বিশেষ একটি শ্রেণী, গোষ্ঠী ইত্যাদির এজেন্ট হিসেবে তাদের নির্দেশ মতোই পরিচালিত হতেন। তখন নির্বাচক-গোষ্ঠীর নির্দেশমত কাজ করতে ব্যর্থ হলে প্রতিনিধিকে পদচ্যুত করা হোত। কিন্তু গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হতে থাকে। বর্তমানে ইউরোপের অনেক রাষ্ট্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিকে নিজের বিচারবুদ্ধি অনুসারে জনকল্যাণ সাধনের জন্য কাজ করার স্বাধীনতা প্রদান করে সাংবিধানিক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

আইনসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি জনগণের প্রতিনিধি অথবা ভারপ্রাপ্ত প্রতিভূ—এরূপ প্রশ্ন অবান্তর বলে ল্যাস্কি মনে করেন। যদি প্রতিনিধিকে ভারপ্রাপ্ত প্রতিভূ হিসেবে ধরা হয়, তাহলে নির্বাচনের সময় তাঁকে তাঁর সামগ্রিক মতামত জ্ঞাপন করতে হয়। কিন্তু তা কোন প্রতিনিধির পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ নির্বাচনোত্তর সময়ে এমন সব নতুন নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে পারে যা নির্বাচকমন্ডলী কিংবা প্রতিনিধি—কেউ-ই পূর্বে চিন্তা করতে পারেনি। তাছাড়া, নির্বাচকমন্ডলীর সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতিনিধির পক্ষে সর্বদা

ল্যাস্কির অভিমত

তাদের মতামত গ্রহণ করে কাজ করা অসম্ভব। অনেক সময় এমন জরুরী পরিস্থিতির আকস্মিক উদ্ভব ঘটে, যে ক্ষেত্রে অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিনিধিকে যদি সংশ্লিষ্ট সমস্যা সম্পর্কে তাঁর নির্বাচকমণ্ডলীর মতামত সংগ্রহ করতে হয়, তাহলে সমগ্র জাতির প্রভূত ক্ষতি সাধিত হতে পারে। সর্বোপরি, দেশের অধিকাংশ মানুষ যেখানে অজ্ঞ, অশিক্ষিত, সেখানে আইন প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও বুদ্ধি তাদের থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্বাচকমণ্ডলী সাময়িক আবেগ, উত্তেজনায় ব্যক্তি-স্বার্থ বা গোষ্ঠী-স্বার্থ ইত্যাদির দ্বারা পরিচালিত হয়। সুতরাং তাদের নির্দেশে প্রতিনিধিদের আইন-প্রণয়ন বা নীতি নির্ধারণ করতে হলে কখনই সু-আইন প্রণীত হতে পারে না।

তাছাড়া, নির্বাচকমণ্ডলীর এজেন্ট হিসেবে কাজ করার নীতি প্রবর্তিত থাকলে বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা আইনসভায় প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হতে চান না। কারণ এক্ষেত্রে তাঁদের বিচারবুদ্ধি, শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদির কোন মূল্যই থাকে না। এরূপ আইনসভা গুণগতভাবে কখনই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে না।

এরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলে এক একটি নির্বাচনী এলাকার নির্বাচকমণ্ডলী নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য নিজেদের স্বার্থের উপযোগী আইন-প্রণয়ন বা নীতি-নির্ধারণের জন্য প্রতিনিধিদের নির্দেশ দেয়। ফলে আইনসভায় প্রতিনিধিদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধিতা আইনসভার কৌলিন্য বিনষ্ট করে তাকে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে পরিণত করে।

তবে একথাও সত্য যে, নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের উপর যদি নির্বাচকমণ্ডলীর আদৌ কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকে তা হলে প্রতিনিধিদের মধ্যে জনকল্যাণকামী মনোভাব ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হয়। তাঁরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে তৎপর হয়ে উঠতে পারেন। ফলে গণতন্ত্র তত্ত্বকথায় পর্যবসিত হয়।

তাছাড়া, বিচার-বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ইত্যাদির দিক থেকে সব সময় প্রতিনিধিবৃন্দ যে নির্বাচকমণ্ডলীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হবে এমন কোন কথা নেই।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ যেমন সব সময় নির্বাচকমণ্ডলীর এজেন্ট হিসেবে কাজ করবেন না, তেমনি তাঁদের জনস্বার্থ-বিরোধী আচরণকে সংযত করার জন্য নির্বাচকমণ্ডলীর হাতে কিছুটা নিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়। নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রদত্ত-প্রতিশ্রুতি অনুসারে প্রতিনিধিবর্গ কাজ করছেন কিনা তা লক্ষ্য রাখা নির্বাচকমণ্ডলীর আবশ্যকীয় কর্তব্য। প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হলে প্রতিনিধিকে পদচ্যুত করার অধিকার নির্বাচকমণ্ডলীর থাকা উচিত। সোভিয়েত ইউনিয়ন, গণ-সাধারণতন্ত্রী চীন প্রভৃতি দেশে এই ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া এমন ব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকা বাঞ্ছনীয় যে, দলীয় নীতির ভিত্তিতে নির্বাচিত হওয়ার পর যদি কোন প্রতিনিধি অন্য দলে যোগদান করেন, তাহলে বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে সেই প্রতিনিধিকে অবিলম্বে পদত্যাগ করে পুনরায় জনসমর্থন যাচাই করার জন্য নির্বাচনে অবতীর্ণ হতে হবে। গ্রেট ব্রিটেনে প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ করার এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে। বস্তুতঃ প্রতিনিধিদের

উপসংহার

সর্বদা সদাজাগ্রত জনমতের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে কাজ করতে হয়। অন্যথায়, তাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত জনমত তাঁদের রাজনৈতিক ভবিষ্যতকে অনিশ্চিত করে তুলতে পারে।

১২। নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক প্রতিনিধি নিয়ন্ত্রণের আধুনিক উপায় (Modern Instruments of control over the Representative by his Electorate)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গণতন্ত্রের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা এবং আকর্ষণ দুই-ই ক্রমে ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে। কারণ প্রথমতঃ নির্বাচনের প্রাক্কালে গণদেবতা অর্থাৎ নির্বাচকমণ্ডলীকে সন্তুষ্ট করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থিগণ প্রতিশ্রুতির পাহাড় রচনা করতে দ্বিধাবোধ করেন না। কিন্তু নির্বাচন-বৈতরণী অতিক্রম করার পর জনপ্রতিনিধিবর্গ পূর্ব-প্রতিশ্রুতির কথা বিস্মৃত হয়ে ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থসিদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এমতাবস্থায় পরবর্তী নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া নির্বাচকমণ্ডলীর গত্যন্তর থাকে না।

প্রতিনিধিকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তা

দ্বিতীয়তঃ, অনেক সময় জনমানসের উৎকর্ষ সাধিত হওয়ার ফলে জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনায় আগ্রহান্বিত হয়ে উঠে। কিন্তু প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে কেবলমাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন করা ছাড়া শাসনকার্য পরিচালনায় জনগণের বিশেষ কোন ভূমিকা থাকে না। স্বাভাবিকভাবেই তারা গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়ে।

তৃতীয়তঃ, অনেক সময় দেখা যায় যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের ফলে এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যখন জনমত কি চায় তা জানা প্রতিনিধিদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় প্রতিনিধিবর্গ নিজেদের বিচারবুদ্ধি অনুসারে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন। ফলে অনেক সময় প্রতিনিধিদের সিদ্ধান্ত নির্বাচকমণ্ডলীর ইচ্ছার বিরোধী হতে পারে। সেক্ষেত্রে জনগণ স্বাভাবিকভাবেই প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে।

বর্তমানে এই সব কারণে প্রতিনিধিবর্গকে নির্বাচকমণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার দাবি সোচ্চার হয়ে উঠেছে। যাঁরা এই দাবির সমর্থক তাঁরা মনে করেন যে, প্রতিনিধিবর্গের উপর গণ-নিয়ন্ত্রণ না থাকলে তাঁরা জনস্বার্থ-বিরোধী ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হয়ে গণতন্ত্রের ভিত্তিকে দুর্বল করে তুলতে পারেন। বস্তুতঃ ক্ষমতা যেহেতু মানুষকে দুর্নীতিপরায়ণ করে তোলে সেহেতু ক্ষমতাসীন প্রতিনিধিবর্গের উপর কোন না কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকলে তাঁরা বল্গাহীনভাবে চলতে পারেন। উপরি-উক্ত কারণে বর্তমানে অনেক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে গৃহীত হয়েছে।

এই নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহের মধ্যে, ক. গণভোট বা গণ-নির্দেশ (Referendum), খ. গণ-উদ্যোগ (Initiative), গ. গণ-অভিমত

(Plebiscite) এবং ঘ. পদচ্যুতি বা প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ (Re-call) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

[ক] **গণভোট বা গণনির্দেশ** (**Referendum**): গণভোট বা গণনির্দেশ বলতে বোঝায় আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের খসড়া (Draft) প্রস্তাবকে চূড়ান্তভাবে আইনে পরিণত করার পূর্বে সেটিকে জনসম্মতির জন্য জনসাধারণের নিকট প্রেরণ করা। জনসাধারণ যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে আইনসভাপ্রণীত আইনের খসড়া প্রস্তাবটিকে অনুমোদন করে তাহলে তা আইনে পরিণত হবে; অন্যথায় সেটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

গণভোট

গণভোট দু'প্রকারের হতে পারে, যথা—১. বাধ্যতামূলক (Obligatory) এবং ২. ঐচ্ছিক (Optional)। যে সব ক্ষেত্রে আইনসভা কর্তৃক সব আইনের খসড়া প্রস্তাব জনসম্মতির জন্য প্রেরণ করতে হয় তাকে বাধ্যতামূলক গণভোট বলা হয়। কোন্ কোন্ বিষয়ে গণভোট গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক তা সংবিধান কর্তৃক নির্দিষ্ট করা থাকে। সাধারণতঃ শাসনতান্ত্রিক আইনের সংশোধন, গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ আইনপ্রণয়ন বা অর্থবিষয়ক কোন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে গণভোট বাধ্যতামূলক হতে পারে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোটদাতার আবেদনক্রমে কোন আইনের খসড়া প্রস্তাবকে গণভোটে উপস্থিত করতে হয় তাকে ঐচ্ছিক গণভোট বলে অভিহিত করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোটদাতা ছাড়াও আইনসভার একাংশ কিংবা শাসন কর্তৃপক্ষ ঐচ্ছিক গণভোটের জন্য দাবি জানাতে পারেন। সুইজারল্যাণ্ডে গণভোট গ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচকমণ্ডলী প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

গণভোটের প্রকারভেদ

[খ] **গণ-উদ্যোগ** (**Initiative**): অনেক সময় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত আইনসভা কোন একটি বিশেষ আইন প্রণয়নে অনিচ্ছুক বা উদাসীন থাকতে পারে। এমতাবস্থায় নিজেরা অগ্রণী হয়ে জনগণ যখন প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়নে অগ্রসর হয়, তখন তাকে গণ-উদ্যোগ বলা হয়। সংবিধান অনুসারে নির্দিষ্ট সংখ্যক নির্বাচক কোন একটি বিশেষ আইন প্রণয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে কিংবা আইনসভাকে উক্ত আইন প্রণয়নের জন্য অনুরোধ জানাতে পারে।

গণ-উদ্যোগ

গণ-উদ্যোগ, ১. সুগঠিত (Formulated), এবং ২. অগঠিত (Unformulated) —এই দু'প্রকার হতে পারে। যখন নির্বাচকমণ্ডলী নিজেদের উদ্যোগে কোন আইনের পূর্ণাঙ্গ খসড়া প্রস্তাব প্রস্তুত করে, তখন তাকে সুগঠিত গণ-উদ্যোগ বলা হয়। কিন্তু যখন আইনের খসড়াটি অসম্পূর্ণ বা অপূর্ণাঙ্গ হয় তখন তাকে অগঠিত গণ-উদ্যোগ বলে। এরূপ ক্ষেত্রে খসড়াটি সম্পূর্ণ করার জন্য নির্বাচকমণ্ডলী আইনসভাকে অনুরোধ করে। গণ-উদ্যোগের ফলে রচিত কোন আইনের খসড়া প্রস্তাবকে চূড়ান্তভাবে আইনে রূপান্তরিত করার জন্য আইনসভাকে গণভোটের ব্যবস্থা করতে হয়। গণভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেই কেবলমাত্র আইনটি গৃহীত হয়। তা না হলে গণ-উদ্যোগের মাধ্যমে রচিত হলেও খসড়া আইন বাতিল হয়ে যায়।

গণ-উদ্যোগের প্রকারভেদ

[গ] **গণ-অভিমত (Plebiscite) :** রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্ট্রং (C. F. Strong)-এর মতে, 'গণ-অভিমত' কথাটির অর্থ 'জনগণের আদেশ'। কোন রাজনৈতিক বিষয়ে প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে জনগণের নির্দেশ গ্রহণকেই গণ-অভিমত বলা হয়। গণভোট এবং গণ-অভিমতের মধ্যে পার্থক্য হোল এই যে, সাধারণতঃ আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব সম্পর্কে গণভোট গৃহীত হয়। অপরদিকে রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনগণের নির্দিষ্ট মতামতকে গণ-অভিমত বলা হয়। দেশ বিভাগের পূর্বে আসামের অন্তর্গত শ্রীহট্ট জেলার ভাগ্য নির্ধারণের জন্য গণ-অভিমত গ্রহণ করা হয়েছিল। ফ্রান্সে পঞ্চম প্রজাতন্ত্র গঠনের সময়ে রাষ্ট্রপতি দ্য-গল (De Gaulle) গণ-অভিমত গ্রহণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

গণ-অভিমত

[ঘ] **পদচ্যুতি বা প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ (Recall) :** প্রত্যেক গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণসমূহের মধ্যে পদচ্যুতি বা প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। কোন দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধি যদি নির্বাচনের পর ক্রমাগত তাঁর পূর্ব-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে জনমত-বিরোধী কাজ করতে থাকেন তাহলে কার্যকালের মেয়াদ পরিসমাপ্তির পূর্বেই নির্বাচকমন্ডলী তাঁর পদত্যাগ দাবি করতে পারে। সংবিধান অনুসারে নির্দিষ্ট সংখ্যক নির্বাচক ঐ প্রতিনিধির পদত্যাগ দাবি করতে পারে। এরূপ দাবি প্রস্তাবের আকারে গণ-ভোটে পেশ করতে হয়। পদত্যাগ সম্পর্কিত প্রস্তাবটি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার সংখ্যা-গরিষ্ঠ নির্বাচকের সমর্থন লাভ করলে উক্ত প্রতিনিধিকে পদত্যাগ করতে হয়। পদচ্যুতি বা প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ সুইজারল্যান্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি রাষ্ট্রে দেখা যায়।

পদচ্যুতি বা প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ

প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে-সব প্রত্যক্ষ গণ-তান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিসমূহের উল্লেখ করা হোল এগুলির কার্যকারিতা কয়েকটি শর্ত পূরণের উপর নির্ভরশীল। শর্তগুলি হোল : ১. জনগণকে যথেষ্ট পরিমাণে রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। জনগণের রাজনৈতিক জ্ঞান না থাকলে তারা নিজেদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ থাকতে পারে না। ২. রাষ্ট্রের আয়তন ক্ষুদ্র হতে হবে। ৩. জনসংখ্যার পরিমাণ অল্প হওয়া বাঞ্ছনীয়। ৪. জনগণকে প্রকৃত দেশপ্রেমিক হতে হবে এবং নিঃস্বার্থভাবে সামগ্রিক কল্যাণের জন্য কাজ করতে হবে।

প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সাফল্যে শর্তাবলী

১৩। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের গুণাগুণ (Merits and Defects of Direct Democratic Checks)

গুণ : প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের নিম্নলিখিত গুণাবলী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(১) জনগণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় বলে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়।

রাজনৈতিক চেতনার বৃদ্ধি সাধন

(২) সরকারকে জনমত অনুসারে কাজ করতে বাধ্য করা সম্ভব। জনমত-বিরোধী আচরণ করে সরকার স্বৈরাচারী হয়ে জনস্বার্থ-বিরোধী কোন কাজ করতে সাহস পায় না।

সরকারের স্বৈরাচারিতা রোধ

(৩) দলীয় রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে পড়ে অনেক সময় প্রতিনিধিবৃন্দ নিজেদের কর্তব্য বিস্মৃত হন। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনগণ প্রতিনিধিবর্গকে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ করে গণতন্ত্রের বাস্তবায়নে সাহায্য করে।

প্রতিনিধিদের সচেতন করে

(৪) অনেক সময় দ্বি-কক্ষাবিশিষ্ট আইনসভায় উভয় কক্ষের মধ্যে তীব্র মতবিরোধের ফলে কাম্য সংস্কারাদি সাধিত হয় না; পরন্তু অযথা কালহরণের সম্ভাবনা দেখা যায়। এই অবস্থায় জনগণের হস্তক্ষেপ সব দিক থেকেই বিশেষভাবে সমর্থনযোগ্য বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন।

আইনসভার দুটি কক্ষের মতবিরোধের অবসান

(৫) নির্বাচনের পর বিশেষ কোন পরিস্থিতির উদ্ভবের ফলে সরকারী নীতি পুনর্নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। এই পরিবর্তিত অবস্থায় জনগণের মতামত অনুসারে সরকার যদি নীতি নির্ধারণ করেন তাহলে সেই নীতির জন্য পরবর্তী নির্বাচনে সরকার পক্ষকে বিপদে পড়তে হয় না।

জনমতের প্রতিফলন ঘটে

বস্তুতঃ সরকারের অস্তিত্ব বিপন্ন না করে শান্তিপূর্ণভাবে জনমত অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণসমূহ একান্ত প্রয়োজন।

দোষ: কিন্তু প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণসমূহের বিরুদ্ধেও অনেক কিছু বলা যেতে পারে।

প্রথমতঃ বলা যায় যে, বিপুল জনসংখ্যাবিশিষ্ট বৃহদায়তন রাষ্ট্রে এই সব পদ্ধতির প্রয়োগ শুধু অসম্ভবই নয়, অকাম্যও বটে। কারণ নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা বিপুল হওয়ার জন্য কোন একটি প্রশ্নে তাদের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়।

বৃহদায়তন রাষ্ট্রের পক্ষে অনুপযুক্ত

দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক সমস্যাসমূহ শুধু যে সংখ্যায় বহু তা-ই নয়, চরিত্রগতভাবেও সেগুলি যথেষ্ট জটিল। ' জটিল সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য যে পরিমাণ রাজনৈতিক জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির প্রয়োজন তা জনসাধারণের সকলের মধ্যে থাকে না। এইসব প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা জনগণের হস্তে অর্পিত হলে সেগুলির সদ্ব্যবহার করে সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করতে জনগণ পারে না।

জনগণের রাজনৈতিক জ্ঞানের অভাব

তৃতীয়তঃ প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণসমূহ প্রচলিত থাকার অর্থই হোল আইনসভার প্রতি কাজে কারণে-অকারণে জনগণ অযথা হস্তক্ষেপ করে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে। এর ফলে সামগ্রিকভাবে জনস্বার্থ বিনষ্ট হতে পারে।

কাম্য আইন প্রণয়নে বাধা সৃষ্টি

চতুর্থতঃ একনায়কতন্ত্রে যেরূপ ক্ষিপ্রতা সংগে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব গণতন্ত্রে সেরূপ সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ জরুরী অবস্থার পক্ষে গণতন্ত্র বিশেষ অকার্যকর বলে সমালোচনা করা হয়। পরোক্ষ গণতন্ত্রে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণাদি প্রচলিত থাকার অর্থ জরুরী অবস্থায় কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের পথে অযথা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা।

জরুরী অবস্থার পক্ষে অনুপযোগী

পঞ্চমতঃ অনেক সময় সুযোগ-সন্ধানী কিছু দলনেতা বা বাক্‌পটু ব্যক্তি জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে তাদের কল্যাণের নামে এমন সব আইন প্রণয়ন করান যেগুলির দ্বারা প্রকৃতপক্ষে জনগণের কল্যাণ সাধিত হয় না। গণতন্ত্র তার উদ্দিষ্ট পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে আদর্শভ্রষ্ট হয়ে পড়ে।

জনকল্যাণ ব্যাহত হয়

ষষ্ঠতঃ গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণগুলি একান্ত অপরিহার্য বলে অনেকে মনে করেন না। ইংল্যান্ডের মত দেশে এই সব নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকলেও ইংরেজরা মার্কিন অথবা সুইসদের অপেক্ষা মোটেই কম স্বাধীনতা ভোগ করে না। আসল কথা হোল—গণতন্ত্রপ্রিয় সদাজাগ্রত এবং সুসংগঠিত জনমতই গণতন্ত্রের প্রধান রক্ষক। যে দেশের জনগণ গণতন্ত্রপ্রিয় নয় সে দেশে হাজার রকমের প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেও শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরাচারিতা রোধ করা সম্ভব নয়। অনেকের মতে, দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলেই কেবলমাত্র দেশের জনগণ প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ ভোগ করতে পারে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকার প্রদান করে গণতন্ত্রকে সার্থক এবং সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তোলা অসম্ভব।

গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য অপরিহার্য নয়

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

জনমত

[Public Opinion]

'জনমত' (Public Opinion) শব্দটির জন্ম-ইতিহাস তমসাবৃত। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌রা এবং মধ্যযুগীয় চিন্তানায়কেরা জনমত সম্পর্কে সজাগ থাকলেও তাঁদের রচনার মধ্যে এ বিষয়ে কোন সুগভীর বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা লক্ষ্য করা যায় নি। সর্বপ্রথম ফরাসী দার্শনিক রুশো (Rousseau)-র রচনার মধ্যে 'জনমত' কথাটির রাজনৈতিক প্রয়োগ দেখা যায়। সম্প্রতিকালে বাক্‌লে (Buckle), ব্লুন্টসলি, হেনরী মেইন, লর্ড ব্রাইস, লাওয়েল, অস্টিন রেনী (Austin Ranny), অলবিগ (Albig), ভি. ও. কী (V. O. Key), কিম্বাল ইয়ং (Kimball Young) প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জনমত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

বিভিন্ন যুগে জনমত সম্পর্কে ধারণা

১। জনমতের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Definition and Nature of Public Opinion)

জনমত হোল আধুনিক গণতন্ত্রের প্রাণ। তাই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে 'জনমত পরিচালিত শাসনব্যবস্থা' বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু জনমতের একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নিরূপণের প্রশ্নে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। 'একই সামাজিক সংগঠনের সভ্য হিসেবে জনগণের মতামত'কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ডুব (L. W. Doob) জনমত বলে অভিহিত করেছেন। কিম্বাল ইয়ং-এর মতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে জনগণ যে মতামত পোষণ করে তাকেই জনমত বলা হয়। কিন্তু লাওয়েল বলেন যে, জনমত বলে অভিহিত হওয়ার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত হওয়াই যথেষ্ট নয়, আবার সকলের ঐকমত্যেরও প্রয়োজন নেই। দেখা যায় যে, সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জনগণ পরস্পর-বিরোধী মতামত পোষণ করে। এই মতামতগুলির মধ্যে যেগুলি প্রাধান্য অর্জন করে সাধারণভাবে সেগুলিকেই জনমত বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু সংখ্যা-গরিষ্ঠের মতামতই যে সর্বদা জনমত বলে বিবেচিত হবে এমন কোন কথা নেই। বরং সংখ্যা অপেক্ষা আস্থার দৃঢ়তার উপর জনমত বহুলাংশে নির্ভরশীল বলে অনেকে মনে করেন। অনেক সময় গভীর আস্থাবান্ দৃঢ়চেতা কতিপয় ব্যক্তির মতামতকেই জনমত বলে আখ্যা দেওয়া হয়। তাই মরিস্ জিনস্‌বার্গ জনমতকে 'বিভিন্ন মতামতের ঘাত-প্রতিঘাতের সামাজিক ফলাফল' বলে বর্ণনা করেছেন। প্রখ্যাত মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ভি. ও. কী-র মতে, জনমত হোল ব্যক্তিবর্গের সেই সব মতামত যেগুলির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা সমীচীন বলে সরকার মনে করে। অস্টিন রেনী (Austin Ranny)

জনমতের সংজ্ঞা

বলেন, জনমত হোল সেই সব ব্যক্তিগত মতামতের সমষ্টি যার প্রতি সরকারী কর্মচারী-বৃন্দ কিছু পরিমাণে সজাগ থাকে এবং সরকারী কার্যাবলী নির্ধারণের সময় তারা এর গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, সরকার কেবলমাত্র সেই-সব মতামতকেই জনমত বলে গ্রহণ করে এবং গুরুত্ব দেয় যেগুলি সংগঠিত, সুদৃঢ় ও জনকল্যাণকর। জনমতের পরস্পর-বিরোধী সংজ্ঞাগুলির সমন্বয় সাধন করে আমরা জনমতের একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা প্রদান করতে পারি: জনমত হোল সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলী বা অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে সুচিন্তিত ও জনহিতকর সেই সব সুদৃঢ় মতামত, যেগুলি সরকারকে এবং জনগণকে প্রভাবিত করতে সক্ষম।

জনমতের বৈশিষ্ট্য

জনমতের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়:

(ক) অস্টিন রেনীর মতে, জনমতের প্রথম বৈশিষ্ট্য হোল মতৈক্য ও বিরোধ (concensus and conflict)। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য মতৈক্যের মধ্যে বিরোধ একান্ত প্রয়োজন। মতৈক্যহীন বিরোধ গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলে বলে তিনি অভিমত প্রদান করেন। আবার বিরোধহীন মতৈক্য থাকার অর্থ গণতন্ত্রের বন্ধ্যাকরণ। এর ফলে জনসাধারণ রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না, জনস্বার্থ যথার্থ-ভাবে রক্ষিত হয় না এবং জনসাধারণের পছন্দ-অপছন্দের মনোভাব প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ পায় না। অস্টিন রেনী এইভাবে মতৈক্য ও বিরোধের সহাবস্থানের কথা প্রচারের মাধ্যমে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত শ্রেণী-সম্পর্ককে বজায় রাখতে চেয়েছেন। বিরোধের মূল কারণসমূহকে অন্বেষণ করার কিংবা সেই সব কারণের মূলোৎপাটনের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন সে সম্পর্কে তিনি কোন উচ্চবাচ্য করেন নি।

মতৈক্য ও বিরোধ

(খ) রেনীর মতে, জনমতের দ্বিতীয়-বৈশিষ্ট্য হোল তথ্যসংগ্রহ (collection of information)। সুষ্ঠু ও সাবলীল জনমত গঠনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন। জনসাধারণ যদি প্রকৃত সংবাদ ও তথ্যাদি জানতে না পারে তাহলে কোন একটি বিষয় সম্পর্কে তারা কোন সুস্পষ্ট অভিমত জ্ঞাপন করতে পারে না। সুতরাং সুষ্ঠু জনমত গঠনের পূর্বশর্ত হোল প্রকৃত তথ্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা।

তথ্য সংগ্রহ

(গ) রাজনৈতিক কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ ও নৈপুণ্যের মনোভাব (involvement and senses of efficacy) জনমতের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। অধিকাংশ রাষ্ট্রেই বৃহৎ অংশ সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকে না। রেনীর মতে, শিক্ষিত মানুষেরাই অধিক পরিমাণে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকেন। কারণ অশিক্ষিত লোকদের তুলনায় তাদের নৈপুণ্য অনেক বেশী। উদারনৈতিক ব্যবস্থায় সর্বসাধারণের শিক্ষালাভের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত এবং শিক্ষাব্যবস্থার উপর অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রভুত্বকারী মুষ্টিমেয় ব্যক্তির প্রাধান্য সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

রাজনৈতিক কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ ও নৈপুণ্যের মনোভাব

তাই সাধারণ মানুষ সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার মত নৈপুণ্য অর্জন করতে না পারায় উদারনৈতিক ব্যবস্থায় প্রকৃত জনমত গঠিত ও প্রকাশিত হতে পারে না।

(ঘ) জনমতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হোল স্থায়িত্ব ও পরিবর্তন (Stability and change)। অনেক সময় জনমত অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হতে পারে। অনেক সময় জনমত স্থায়ী প্রকৃতি-বিশিষ্ট হয়। কোনও একটি বিষয় সম্পর্কে জনগণের সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে জনমতের দ্রুত পরিবর্তন সম্ভব। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে জনমত প্রকৃতিগতভাবে দ্রুত পরিবর্তনশীল। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকৃত তথ্য বা সংবাদাদি জনগণকে সরবরাহ করা হয় না। ফলে অনেক সময় জনসাধারণ আবেগ-তাড়িত হয়ে কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে যে অভিমত জ্ঞাপন করে পরবর্তী সময়ে সেই অভিমতের পরিবর্তন অতি সহজেই সাধিত হতে পারে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনমত অতি সহজে এবং দ্রুতলয়ে পরিবর্তিত হয় না।

স্থায়িত্ব ও পরিবর্তন

(ঙ) অবিকশিত বা সুপ্ত অবস্থা (latency) জনমতের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বলে রেনী মনে করেন। জনমতের অবিকশিত অবস্থা বলতে কোন সমস্যা সম্পর্কে তার স্পষ্টতাকেই বোঝায়। অবিকশিত অবস্থার জন্য জনমতের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হয় না। অনেক সময় ভোটাভুটির মাধ্যমেও জনমত যাচাই করা যায় না। তাই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে অত্যন্ত সতর্কভাবে এরূপ জনমতের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথা বিবেচনা করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ করতে হয়।

অবিকশিত বা সুপ্ত অবস্থা

কিন্তু জনমতের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অনেকেই সমালোচনার সুরে বলেন যে, 'জনমত জনগণেরও নয়, আবার মতও নয়' (Public opinion is neither public nor opinion)। কারণ উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমত বলে যা স্বীকৃতিলাভ করে তা কার্যক্ষেত্রে বিশেষ কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা বিশেষ একটি শ্রেণীভুক্ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মতামত ছাড়া আর কিছুই নয়। অধিকাংশ উদারনৈতিক রাষ্ট্রে জনসাধারণকে অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে রাখা হয়। ফলে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা যথার্থভাবে বিকশিত হতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই সমকালীন সমস্যাদি সম্পর্কে তাদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা থাকে না। জনগণের এই দুর্বলতার সুযোগে স্বার্থপর ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কিংবা নেতৃবৃন্দ সহজেই তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। তাই কার্লাইল জনমতকে 'বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বড় মিথ্যা' (greatest lie in the world) বলে সমালোচনা করেছেন। রবার্ট পীল (Robert Peel) জনমতের সমালোচনা করে একে মূর্খামি, দুর্বলতা, কুসংস্কার, ভ্রান্ত ও সঠিক অনুভূতি, একগুঁয়েমি ও সংবাদপত্রের মতামতের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ বলে বর্ণনা করেছেন। আবার কেউ কেউ এই অভিমত পোষণ করেন যে, জনমত অস্থিরমতি ও অজ্ঞ প্রকৃতিবিশিষ্ট হলেও এর শক্তি দৈত্যের মতোই প্রবল।

জনমত কথাটির সমালোচনা

তাছাড়া, "ধনিক রাষ্ট্রে জনসাধারণ স্বাধীন আবহাওয়ায় মতামত গঠন ও প্রকাশের সুযোগ পায় না। অতএব ধনিক স্বার্থের অনুকূলে তত্ত্ব প্রচার বা তথ্য পরিবেশন

করা এবং ধনিকের স্বার্থ-বিরোধী মত প্রচারে সহস্র অসুবিধার সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। এই অবস্থার মধ্যে সত্যকার জনমত গঠন কিংবা ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য।" বস্তুতঃ ধনবৈষম্যমূলক সমাজে জনমত গঠন ও প্রচারের মাধ্যমগুলি ধনিক-বণিক শ্রেণীর কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হওয়ার ফলে প্রকৃত জনমত গঠিত হতে পারে না। তাছাড়া, বিভ্রান্তিকর মিথ্যা প্রচারকৌশলের জালে সাধারণ মানুষের বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ধনিক শ্রেণী নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের উপযোগী মতামতকেই জনমত বলে প্রচার করে। তাই অধ্যাপক ল্যাস্কি যথার্থভাবেই মন্তব্য করেছেন, সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজেই কেবলমাত্র সত্য সংবাদ পরিবেশিত হতে পারে। অতএব একথা সঙ্গতভাবেই বলা যায় যে, কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই সুষ্ঠু সাবলীল জনমত গঠিত ও প্রকাশিত হতে পারে।

২। বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনমতের প্রকৃতি ও ভূমিকা (Nature and Role of Public Opinion in different Political System)

মনুষ্য সমাজের ক্রমবিবর্তিত ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, অতীতে রাষ্ট্র ও সরকারের উপর দেবত্ব আরোপ করে জনমতকে অস্বীকার করা হোত। বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্র সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হোত। দাস সমাজে দাস-প্রভুরা, সামন্ত সমাজে সামন্তরা নিজেদের স্বার্থে রাষ্ট্রকে ব্যবহার করত। নিজেদের শাসনকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তারা নানা প্রকার যুক্তিতর্কের অবতারণা করে জনসাধারণের মতামতকে উপেক্ষা করত। কিন্তু উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা উত্তরোত্তর স্বীকৃতিলাভ করতে শুরু করে। এরূপ সরকার জনমতের উপর নির্ভরশীল বলে প্রচার করা হতে থাকে। উদারনৈতিক ব্যবস্থার সমর্থকেরা তাঁদের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে 'জনমত-পরিচালিত শাসনব্যবস্থা' বলে অভিহিত করেন। কিন্তু মার্কসবাদী লেখকরা তাঁদের এই দাবি অযৌক্তিক বলে মনে করেন। বস্তুতঃ বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনমতের প্রকৃতি ও ভূমিকার যে ভিন্নতা রয়েছে তা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না।

[১] উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতের প্রকৃতি ও ভূমিকা (Nature and Role of Public Opinion in Liberal Democracy) : উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আস্থাশীল ব্যক্তিরা মনে করেন যে, এই ব্যবস্থা জনমতের উপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে। তাঁরা নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করেনঃ

জনমত সরকারের স্বৈরাচারিতা রোধ করে

(ক) গণতন্ত্র হোল 'জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা জনগণের শাসন।' এই ব্যবস্থায় জনগণের সম্মতিকে অর্থাৎ জনমতকে মূলধন করে সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। জনমতের বিরোধিতা করে কোন সরকার সুদীর্ঘকাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারে না। কোন গণতান্ত্রিক সরকার যদি স্বৈরাচারী হয়ে ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব করতে চেষ্টা করে কিংবা

অগণতান্ত্রিক পথে চলতে চেষ্টা করে তাহলে সদাজাগ্রত জনমত সেই সরকারের বিরোধিতা করে। পরবর্তী নির্বাচনে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতাচ্যুত করে জনমত নতুন একটি দলকে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করে। সুতরাং ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার ভয়ে সরকার সদাসর্বদাই জনমতকে যথাযোগ্য মূল্য দিতে বাধ্য হয়। অন্যভাবে বলা যায়, উদারনৈতিক গণতন্ত্রে জনমত সরকারের স্বৈরাচারিতা রোধ করে গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে।

(খ) উদারনৈতিক গণতন্ত্রে অনেক সময় সরকার এমন সব নীতি বা পরিকল্পনা গ্রহণ করে যা জনস্বার্থের পরিপন্থী। এমতাবস্থায় সুদৃঢ় ও সচেতন জনমত সরকারকে জনস্বার্থ-বিরোধী কার্যাবলী সম্পাদনে বিরত থাকতে বাধ্য করে। এইভাবে জনমত সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করে বলে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সমর্থকেরা দাবি করেন।

সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করে

(গ) জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভাব-অভিযোগ প্রভৃতি জনমতের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হতে পারে। সরকার জনকল্যাণ সাধনের জন্য যেসব নীতি-নির্ধারণ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা সাধারণতঃ জনমতের দিকে লক্ষ্য রেখেই করে। এইভাবে জনমত সমাজ ও ব্যক্তির কল্যাণের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

জনমত সমাজ ও ব্যক্তির কল্যাণের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে

(ঘ) উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শের ঘাত-প্রতিঘাত প্রতিনিয়তই চলতে থাকে। অনেক সময় সরকারী দল রক্ষণশীল মনোবৃত্তিসম্পন্ন হয়ে প্রগতিশীল নীতি নির্ধারণ করতে ভয় পায়। এমতাবস্থায় জনমত সরকারকে যুগোপযোগী ও প্রগতিশীল কার্যাদি সম্পাদন করতে বাধ্য করে। উদাহরণ স্বরূপ ভারতবর্ষে ব্যাঙ্ক জাতীয়-করণ কিংবা রাজন্য-ভাতা বিলোপের সরকারী সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে জনমতের ভূমিকার কথা উল্লেখ করা যায়।

জনমত সরকারকে গতিশীল হতে সাহায্য করে

(ঙ) গণতান্ত্রিক সরকার যেহেতু অত্যধিক পরিমাণে জনসমর্থনের উপর নির্ভরশীল সেহেতু প্রতিটি সরকারী সিদ্ধান্তের পশ্চাতে গণ-সমর্থন আছে কিনা তা জনমতের মাধ্যমে সরকার জানতে পারে। জনসমর্থন ছাড়া সরকারের কোন কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হতে পারে না। জনমত যদি সরকারের অনুকূল থাকে তাহলে সরকার ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সুদক্ষভাবে যাবতীয় কার্য সম্পাদন করতে পারে। কিন্তু জনমত বিরুদ্ধাচরণ করলে সরকারী কাজে সাফল্য যৎসামান্যই আসে। সুতরাং সরকারের সাফল্যের জন্য জনমতের সমর্থন একান্ত অপরিহার্য।

সরকারের সাফল্যের শর্ত হিসেবে জনমতের ভূমিকা

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, যে-দেশের সরকার জনমতের দ্বারা যত বেশী সমর্থিত হয় সেই দেশের সরকারকে তত বেশী গণতান্ত্রিক চরিত্রসম্পন্ন বলে মনে করা হয়। কিন্তু উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যতঃ আমরা 'জনমত-পরিচালিত শাসনব্যবস্থা' বলে অভিহিত করতে পারি না। কারণ এরূপ ব্যবস্থায় শ্রেণী-স্বার্থ ও শ্রেণী-সংঘাত অত্যন্ত তীব্রভাবে বিরাজমান থাকে। এরূপ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে তথাকথিত গণতান্ত্রিক

উদারনৈতিক ব্যবস্থায় জনমত প্রকৃত জনমত নয়

সরকার ধনিক-বণিক শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত হয়। তাই সরকার ধনশালী শ্রেণীর স্বার্থে জনমতকে প্রভাবিত করে। জনমত যখন ধনিক শ্রেণীর স্বার্থের অনুকূলে না গিয়ে তার বিরোধিতা করে তখনই সেই জনমত গঠন ও প্রকাশের সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। তাছাড়া ধনবৈষম্যমূলক উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমত গঠন ও প্রচারের মাধ্যমগুলি ধনিক শ্রেণীর কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় বলে এসবের মাধ্যমে প্রকৃত জনমত গঠিত ও প্রকাশিত হতে পারে না। ঐ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেছেন, "যে সমাজে অর্থনৈতিক অসাম্য বর্তমান থাকে সেই সমাজে জনমত তাঁর দাবিকে নৈতিক দিক থেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় না। অর্থনৈতিক অসাম্যের বিকৃত স্বার্থ-দ্বন্দ্ব তার ন্যায়ের পরিধিকে সীমাবদ্ধ করে দেয়।" সুতরাং উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমত বলে যাকে প্রচার করা হয় কার্যক্ষেত্রে তা মুষ্টিমেয় ধনশালী ব্যক্তির মতামত মাত্র। গণসংযোগের মাধ্যমগুলির সাহায্যে ধনশালী শ্রেণী এবং তাদের স্বার্থের সংরক্ষক সরকার প্রচার-কৌশলে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের অভিমতকেই জনমত বলে প্রচার করে তার পশ্চাতে জনসমর্থনের ছাপ এঁকে দেয়। এরূপ বিকৃত জনমত কখনই গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করার গুরুদায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করতে পারে না।

[২] **সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনমতের প্রকৃতি ও ভূমিকা (Nature and Role of Public Opinion in the Socialist System) :** উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থকেরা মনে করেন যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একাধিক রাজনৈতিক দল না থাকায় এবং গণসংযোগের মাধ্যমগুলির উপর কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট সরকারের অপ্রতিহত নিয়ন্ত্রণ থাকায় জনমত স্বাভাবিকভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। এরূপ সমাজে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার নামে কার্যতঃ কমিউনিস্ট মতাদর্শের বিরোধী সর্বপ্রকার মতামতকে কঠোর হস্তে দমন করা হয়। তাই বুর্জোয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, ফ্যাসিবাদী সর্বাত্মক ব্যবস্থার মতোই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতের কোন ভূমিকা বা গুরুত্ব নেই। কিন্তু একথা আদৌ সত্য নয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রকৃতি বিশ্লেষণে অক্ষমতা কিংবা প্রকৃতির বিকৃত ব্যাখ্যা থেকেই তাঁদের এরূপ ধারণার সৃষ্টি—একথা উপলব্ধি করতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না। বস্তুতঃ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমত বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থায় কিংবা স্বৈরাচারী ব্যবস্থায় একজন ব্যক্তি বা বিশেষ একটি গোষ্ঠীর মতামতকে যেমন জনমত বলে প্রচার করা হয়, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তা হয় না। এমন কি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মতো মুষ্টিমেয় ধনশালী ব্যক্তির অভিমতকে জনমত বলেও এখানে প্রচার করা হয় না। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে শোষণহীন মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ সর্বহারা শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার মাধ্যমে জনসাধারণ স্বাধীনভাবে এবং অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। অর্থনৈতিক বন্ধনমুক্তির ফলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষেরা কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকারের মাধ্যমে

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রকৃত জনমত গঠিত ও প্রকাশিত হতে পারে

শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। কমিউনিস্ট দলের অভ্যন্তরে সমালোচনা, প্রতিসমালোচনা এবং আত্মসমালোচনার মাধ্যমে জনমত সুষ্ঠুভাবে গঠিত ও প্রকাশিত হতে পারে। তবে এ কথা সত্য যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে সাম্যবাদ-বিরোধীদের মতামত প্রচারের কোন সুযোগ নেই। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, এই সমাজে জনমতের কোন মূল্য নেই। পুঁজিবাদী উদারনৈতিক ব্যবস্থার মত মুষ্টিমেয়ের মতকে এখানে জনমত বলে প্রচার করা হয় না। সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিক্রমেই এখানে সমস্ত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়ন, গণ-সাধারণতন্ত্রী চীন প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বাক্-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভা-সমিতি ও গণমিছিলের স্বাধীনতা ইত্যাদি রাজনৈতিক অধিকারগুলির মতো অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলিও স্বীকৃত হয়েছে। তাছাড়া, উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মতো এখানে বিনা বিচারে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় না। সর্বোপরি, দেশব্যাপী আলোচনা ও গণভোটের মাধ্যমে সর্ববিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সুতরাং জনমত এখানে স্বাধীনভাবে গঠিত ও প্রকাশিত হতে পারে। জনমতের বিরোধী কোন ব্যক্তি কখনই জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হতে পারে না, কিংবা সরকারের কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারে না। এইভাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমত সরকারকে শুধু নিয়ন্ত্রণ করে না, সরকারের যাবতীয় নীতি ও কার্যাবলী নির্ধারণ করে। এই ব্যবস্থায় জনমত প্রকৃত জনমত হিসেবে কাজ করতে পারে। গণসংযোগের মাধ্যমগুলির উপর সরকার ও কমিউনিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণ থাকলেও সেগুলিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করার সুযোগ ও স্বাধীনতা জনগণের থাকে। এর ফলে প্রকৃত জনমত অতি সহজেই গঠিত ও প্রকাশিত হতে পারে। বলা বাহুল্য, এরূপ জনমত সরকারকে শুধু নিয়ন্ত্রিতই করে না, ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হতেও সাহায্য করে। তাই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই প্রকৃত অর্থে জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা বলে অভিহিত করা যায়।

[৩] **স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতের প্রকৃতি ও ভূমিকা (Nature and role of Public Opinion in Autocratic System) :** স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজ শ্রেণীবিন্যস্ত হলেও বলপূর্বক সরকার-বিরোধী মতামতকে খর্ব করা হয়। এই ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন সংখ্যালঘু শ্রেণীর মতকেই জনমত বলে প্রচার করা হয়। রাজনৈতিক শাসকবর্গ রাজনৈতিক সংহতি ও আনুগত্য লাভের জন্য যেহেতু বলপ্রয়োগের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে, সেহেতু সরকার-বিরোধী জনমত সহজে ও স্বাভাবিক উপায়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার অত্যন্ত সীমিত হওয়ায় এবং গণসংযোগের মাধ্যমগুলির উপর সরকারের সুকঠোর নিয়ন্ত্রণ থাকায় প্রকৃত জনমত গঠিত ও প্রকাশিত হতে পারে না। এই ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মতামতকেই জনমত বলে আখ্যা দেওয়া হয়। তবে এ কথা সত্য যে, স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমত প্রকাশ্যভাবে কাজ করতে না পারলেও অপ্রকাশ্যে অর্থাৎ গোপনে গোপনে অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে সংগঠিত হতে থাকে। জনমত যখন পরিপূর্ণভাবে সংগঠিত হয় তখন স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তা বিদ্রোহের আকারে আত্মপ্রকাশ করে। স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সুগঠিত ও সচেতন

জনমত গঠিত হয়েছিল বলেই ১৯১৭ সালে রাশিয়ার মহান্ অক্টোবর বিপ্লব সম্পাদিত হয়েছিল। সুতরাং স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমত স্বৈরাচারী শাসনের অবসানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

[৪] **ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থায় জনমতের প্রকৃতি ও ভূমিকা (Nature and role of Public Opinion in Fascist System) :** ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রভুত্বকারী কায়েমী স্বার্থের রক্ষক বাছাই-করা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হস্তে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব কেন্দ্রীভূত থাকে। এরূপ ব্যবস্থায় শ্রেণীদ্বন্দ্ব থাকলেও ক্ষমতাসীন শ্রেণী সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে অন্যান্য রাজনৈতিক দল, বিশেষতঃ সর্বহারা শ্রেণীর প্রতিভূ কমিউনিস্ট দলকে নিশ্চিহ্ন করার কাজে আত্মনিয়োগ করে। গণসংযোগের মাধ্যমগুলিকে সরকার এমন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যে, সরকার-বিরোধী কোন মতামত প্রকাশিত হতে পারে না। তাছাড়া, মিথ্যা প্রচার ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। মিথ্যা প্রচারের দ্বারা বিভ্রান্ত করে শাসকগোষ্ঠী নিজেদের শাসনের প্রতি জনমত সংগ্রহের জন্য সচেষ্ট হয় এবং বন্দুকের নলের মুখে সাজানো নির্বাচনে জয়লাভ করে নিজেদের পশ্চাতে জনমতের বিপুল সমর্থন আছে বলে প্রচার করে। এরূপ ব্যবস্থায় জনমত বলে যাকে প্রচার করা হয় কার্যতঃ তা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অভিমত নয়। মুষ্টিমেয় শাসকের অভিমতকেই জনমত বলে প্রচার করা হয়। ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থায় জনমতের কোন মূল্য নেই। তবে স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার মতো এই ব্যবস্থাতেও জনমত অত্যন্ত সংগোপনে গঠিত হয়। সংগঠিত জনমত বিপ্লবের আকারে ফ্যাসিবাদকে ধ্বংস করার জন্য প্রকটভাবে প্রকাশিত হতে পারে। সুতরাং ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থাতেও জনমত গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। বিংশ শতাব্দীতে বিশ্ব ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই এই বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়।

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি অনুযায়ী জনমতের প্রকৃতি ও ভূমিকায় ভিন্নতা আসে।

উপসংহার

বলা বাহুল্য, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রকৃত জনমত গঠিত ও প্রকাশিত হতে পারে না। কারণ শ্রেণীবিন্যস্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু শ্রেণীর হাতে গণসংযোগের মাধ্যমগুলি কেন্দ্রীভূত থাকায় এবং সরকার এই শ্রেণীর স্বার্থে কাজ করায় তাদের স্বার্থ-বিরোধী সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত প্রকাশে নানা প্রকার বাধাবিপত্তির সৃষ্টি করা হয়। শোষণ-হীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই কেবলমাত্র জনমতকে প্রকৃত অর্থে 'জনগণের অভিমত' বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

৩। প্রকৃত জনমত গঠনের শর্তাবলী (Condition for the growth of real Public Opinion)

জনমতকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রাণ বলে বর্ণনা করা হয়। বস্তুতঃ সুষ্ঠু ও সচেতন জনমতের উপর গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে। তাই প্রকৃত জনমত

গঠনের উপর আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রকৃত জনমত গঠনের শর্তাবলীকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে :

সুশিক্ষার বিস্তার

(ক) সুষ্ঠু জনমত গঠনের জন্য প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন সুশিক্ষার বিস্তার। শিক্ষার বিস্তার না ঘটলে জনসাধারণ অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে। ফলে এদিকে যেমন তারা সঙ্কীর্ণ স্বার্থবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, অন্যদিকে তেমনি তারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও রক্ষণশীল মনোবৃত্তি-সম্পন্ন হয়ে পড়ে। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তাদের মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়। এমতাবস্থায় তারা অতি সহজেই ধনিক শ্রেণী কিংবা স্বার্থপর সুচতুর নেতৃবৃন্দের শিকারে পরিণত হয়ে তাদের মতামতকেই চূড়ান্ত বলে মনে করে এবং সেইসব মতামতের প্রতি অজ্ঞতাবশেই সমর্থন জ্ঞাপন করে। এইভাবে যে জনমত গঠিত হয় তাকে 'প্রকৃত জনমত' না বলে 'বিকৃত জনমত' বলে অভিহিত করা যায়। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি সমাজ-সচেতন হয়ে উঠে। এই সমাজ-সচেতন মানুষ ব্যক্তি-স্বার্থ অপেক্ষা সমষ্টির স্বার্থকে প্রাধান্য দেয় এবং সামাজিক কল্যাণের সপক্ষে নিজ মতামত সচেতনভাবেই জ্ঞাপন করে। তখন গণতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে জনমত-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়।

স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের ব্যবস্থা

(খ) সুষ্ঠু জনমত গঠনের জন্য স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের ব্যবস্থা না থাকলে অর্থাৎ সভা-সমিতির অধিকার, দল গঠনের অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার প্রভৃতি না থাকলে প্রকৃত জনমত কখনই গঠিত হতে পারে না। সুতরাং জনগণের গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকারগুলিকে সংবিধানে লিপিবদ্ধ করে এবং সেগুলির বাস্তবায়নের সুযোগ করে দিয়ে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের সুবন্দোবস্ত করা প্রতিটি গণতান্ত্রিক সরকারের প্রাথমিক কর্তব্য।

জনমত গঠনের মাধ্যমগুলির উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রবর্তন

(গ) সুষ্ঠু ও সবল জনমত গঠনের জন্য জনমত গঠন ও প্রকাশের মাধ্যমগুলিকে —যেমন, বেতার, চলচ্চিত্র, দূরদর্শন, সংবাদপত্র প্রভৃতি—সরকারী কিংবা বিশেষ কোন প্রভাবশালী গোষ্ঠী বা শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখা উচিত; অন্যভাবে বলা যায় যে, জনমত গঠনের মাধ্যমগুলির উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রকৃত তথ্য ও সংবাদাদি যাতে জনগণ জানতে পারে সেজন্য সব রাজনৈতিক দলের বেতার, দূরদর্শন, সংবাদপত্র প্রভৃতি ব্যবহারের সুযোগ থাকা উচিত। অন্যথায় গণতন্ত্র মিথ্যা বা অলীক বলে প্রতিপন্ন হবে।

জনসাধারণের মধ্যে ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন

(ঘ) অনেকের মতে, প্রকৃত জনমত গঠনের জন্য দেশের জনসাধারণের মধ্যে ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। জনসাধারণ যদি সঙ্কীর্ণ জাতি, ধর্ম, বর্ণ প্রভৃতি স্বার্থ নিয়ে বিরোধে লিপ্ত থাকে তাহলে সুস্থ জনমত গঠন করা অসম্ভব। জনগণের পারস্পরিক বিরোধের সুযোগ নিয়ে একদল স্বার্থপর ব্যক্তি নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের অনুপন্থী মতামতকে জনমত বলে প্রচার করে সহজেই কার্যসিদ্ধি করতে পারে।

(ঙ) প্রকৃত জনমত গঠনের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা একান্ত অপরিহার্য বলে ল্যাস্কি প্রমুখ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ মনে করেন। যে সমাজে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকে সেই সমাজে জনমত গঠন ও প্রকাশের মাধ্যমগুলি অভিজাত ও বিত্তশালী শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই তারা নিজেদের স্বার্থে এগুলিকে ব্যবহার করে। ফলে জনসাধারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকৃত তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যায়। মিথ্যাপ্রচারে তারা বিভ্রান্ত হয়। তাছাড়া, ধনবৈষম্যমূলক সমাজে রাষ্ট্র ধনিক-বণিক শ্রেণীর স্বার্থকে রক্ষা করে বলে স্বাভাবিকভাবেই ধনিক স্বার্থ-বিরোধী মত প্রচারে সহস্র অসুবিধার সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। এই অবস্থার মধ্যে সত্যকার জনমত গঠন কিংবা ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা

৪। জনমত গঠন ও প্রকাশের বিভিন্ন মাধ্যম (Different Agencies of Public Opinion)

আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনমতের সর্বব্যাপী প্রভাব লক্ষ্য করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ উদারনৈতিক গণতন্ত্রকে 'জনমত পরিচালিত শাসনব্যবস্থা' বলে অভিহিত করেছে[২]। অনেকে আবার জনমতকে গণতন্ত্রের 'প্রাণ' বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য জনমতের গুরুত্বের স্বীকৃতিই যথেষ্ট নয়। তার জন্য সুষ্ঠু, সবল, সুচিন্তিত ও সচেতন জনমত গঠন ও প্রকাশের ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে জনমত গঠন ও প্রকাশের মাধ্যমগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

[ক] **মুদ্রাযন্ত্র (The Press) :** শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমত গঠনে মুদ্রাযন্ত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে সংবাদপত্র, পত্রপত্রিকা, পুস্তকপুস্তিকা স্বল্পমূল্যে সাধারণ মানুষের জ্ঞান-পিপাসা পূরণ করতে সমর্থ হয়েছে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনসাধারণ দেশ-বিদেশের যাবতীয় সংবাদ অতি সহজেই জানতে পারে। সম্পাদকীয় মন্তব্য, পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনা প্রভৃতি থেকে জনসাধারণ দেশ-বিদেশের সমকালীন যাবতীয় সমস্যা সম্পর্কে অবহিত থাকতে পারে। তাছাড়া, সংবাদপত্রাদির মাধ্যমে জনগণ নিজেদের অভাব-অভিযোগ, দাবিদাওয়া সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ কিংবা সরকারের ত্রুটিপূর্ণ কার্যাবলীর সমালোচনা করতে পারে। আবার বিরোধী দলগুলি সংবাদপত্র, প্রচারপত্র, পুস্তক-পুস্তিকা প্রভৃতির মাধ্যমে সরকারী ক্রিয়াকলাপের সমালোচনা করে নিজেদের সপক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা করে। বস্তুতঃ বিভিন্ন সমস্যাবলী কিংবা রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে সংবাদপত্রের বিচারবিশ্লেষণ জনমত গঠনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংবাদপত্রের বিরূপ সমালোচনার ভয়ে অনেক সময় সরকারও সংযতভাবে কাজ করতে বাধ্য হয়। গণতন্ত্রে জনমত গঠনে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সংবাদপত্রের ভূমিকাকে কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। অধ্যাপক ল্যাস্কি তাই বলেছেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য সৎ ও অবিকৃত সংবাদ পরিবেশন একান্ত প্রয়োজন।

জনমত গঠন ও প্রকাশে মুদ্রাযন্ত্রের ভূমিকা

কিন্তু ধনবৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্ভীক নিরপেক্ষ সংবাদপত্রের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করা যায় না। কারণ—প্রথমতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধনশালী ব্যক্তিরা সংবাদপত্রগুলির মালিক হওয়ায় শ্রেণী-স্বার্থবিরোধী কোন সংবাদ প্রকাশ করতে তারা দেয় না কিংবা মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে সাধারণ মানুষকে তারা বিপথে পরিচালিত করে। দ্বিতীয়তঃ সংবাদপত্রের আয়ের সর্বপ্রধান উৎস হোল বিত্তশালী ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপন। সুতরাং পুঁজিপতি ব্যবসায়ীদের স্বার্থের পরিপন্থী কোন সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে পারে না। ফলে জনসাধারণ কোন একটি বিষয়ে পরস্পর-বিরোধী মতামত জানবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। তৃতীয়তঃ অনেক সময় রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও শান্তিশৃঙ্খলার নামে সরকার 'সেন্সার' আইনের প্রবর্তন করে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা অপহরণ করতে পারে। তার ফলে যে সব সংবাদ সরকারী দলের মনঃপূত হয় না সেগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে পারে না। সরকার-বিরোধী পত্রপত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকা প্রভৃতির প্রকাশনা সরকার বন্ধ করে দিতে পারে। এই সব কারণে সুষ্ঠু জনমত গঠনের জন্য মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন।

ধনবৈষম্যমূলক সমাজে সংবাদপত্রগুলি প্রকৃত জনমত গঠনের সহায়ক নয়

[খ] **সভাসমিতি বা বক্তৃতামঞ্চ (The Platform)**: সংবাদপত্র, পত্রপত্রিকা, পুস্তকপুস্তিকা প্রভৃতি জনমত গঠনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও অশিক্ষিত, নিরক্ষর ব্যক্তির নিকট এগুলির বিশেষ কোন আবেদন নেই। সেদিক থেকে বিচার করে নিরক্ষর বা স্বল্প-শিক্ষিত মানুষের মতামত গঠনে সভাসমিতি বা বক্তৃতামঞ্চের প্রভাব অনেক বেশী বলে মনে করা হয়। গণতন্ত্রে সভাসমিতি করার, তথা মতামত প্রচারের স্বাধীনতা স্বীকৃত হওয়ার ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ কিংবা পণ্ডিত ব্যক্তিগণ দেশবিদেশের নানা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলী নিয়ে আলাপ-আলোচনা বা বক্তৃতা করেন। একই সমস্যা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মতামত সভাসমিতিতে আলোচিত হওয়ার ফলে জনসাধারণ সেই সব আলোচনা বা সমালোচনার ভিত্তিতে স্বাধীনভাবেই নিজেদের মতামত গঠন করতে কিংবা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। এদিক থেকে বিচার করে সভাসমিতিকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ জনমত গঠনের একটি অপরিহার্য মাধ্যম বলে মনে করা হয়।

সভাসমিতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

তবে একথা সত্য যে, ধনতন্ত্রের সংকট যতই তীব্র আকার ধারণ করছে উদার-নৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ততই সভাসমিতি প্রভৃতির মাধ্যমে সরকারী সমালোচনার পথ রুদ্ধ করে দেওয়ার প্রচেষ্টা ব্যাপক-ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ধনতন্ত্রের সংকট ও সভাসমিতির মাধ্যমে জনমত গঠন

[গ] **বেতার, চলচ্চিত্র, দূরদর্শন প্রভৃতি (Radio, Cinema, Television etc.)**: সভাসমিতির মাধ্যমে দেশের আপামর জনসাধারণকে প্রভাবিত করা সম্ভব নয়। বর্তমানে সভাসমিতি অপেক্ষা বেতার, চলচ্চিত্র, দূরদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে অনেক সহজে জনমত গঠিত ও প্রকাশিত হতে পারে। এগুলির সাহায্যে শিক্ষিত, স্বল্প-শিক্ষিত, কিংবা অশিক্ষিত সব মানুষকেই

বেতার, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনের ভূমিকা

সহজে প্রভাবিত করা সম্ভব। বেতার ও দূরদর্শনে দেশবিদেশের নানা সংবাদ প্রচারিত হয়। সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলী সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং পণ্ডিত ব্যক্তিগণ বিস্তারিত আলোচনা করতে পারেন। ফলে জনমত গঠিত হতে পারে। আবার চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনমত গঠনে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু বেতার, চলচ্চিত্র, দূরদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমেও উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সুষ্ঠু জনমত গঠন করা সম্ভব নয় বলে মার্কসবাদীরা অভিযোগ করেন। কারণ জনমত গঠনের এই মাধ্যমগুলি সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকার ফলে সরকার-বিরোধী কোন সমালোচনা এগুলির মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। সর্বোপরি, বিত্তশালী ব্যক্তিদের হস্তে প্রেক্ষাগৃহগুলির মালিকানা থাকায় ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ-বিরোধী কোন চলচ্চিত প্রদর্শিত হতে পারে না। ধনশালী প্রযোজকগণ নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ-বিরোধী কোন চিত্র নির্মাণের জন্য সচেষ্ট হয় না। তাই বৈষম্যমূলক সমাজে বেতার, চলচ্চিত্র কিংবা দূরদর্শনকে সুষ্ঠু ও সাবলীল জনমত গঠন ও প্রকাশের মাধ্যম বলে বর্ণনা করা যায় না।

বৈষম্যমূলক সমাজে এগুলি সুষ্ঠু জনমতের বাহন নয়

[ঘ] **রাজনৈতিক দল (Political Parties):** উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলকে জনমত গঠনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম বলে মনে করা হয়। কারণ এরূপ গণতন্ত্রে একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকৃত হওয়ায় প্রতিটি দল সংবাদপত্র, সভাসমিতি, পুস্তকপুস্তিকা, প্রাচীরপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে আপন আপন দলীয় নীতি ও কর্মসূচী প্রচার করে জনসমর্থন লাভের চেষ্টা করে। সরকারী দল যেমন নিজ সাফল্যের বিস্তৃত বিবরণ প্রচার করে তেমনি বিরোধী দলগুলি সরকারী অসাফল্যের বিবরণ দিয়ে সরকারের সমালোচনা করে নিজেদের সপক্ষে জনমত গঠনের জন্য সচেষ্ট হয়। এইভাবে দলীয় প্রচারের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। তারা পরস্পর-বিরোধী মতামত বিচারবিশ্লেষণ করে নিজেদের মতামত গঠন করতে পারে।

রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

কিন্তু অনেক সময় রাজনৈতিক দলগুলি জনমতকে নিজেদের পক্ষে আনয়ন করার জন্য মিথ্যা প্রচারের আশ্রয় নেয়। এর ফলে সুস্থ জনমত গঠিত হতে পারে না। আবার রাজনৈতিক দলগুলি যদি স্বাধীন ও প্রতিবন্ধকতামুক্ত হয়ে কাজ করতে না পারে তাহলে সুষ্ঠু জনমত কখনই গঠিত হতে পারে না। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক দলগুলির রাজনৈতিক প্রচারের স্বাধীনতা।

[ঙ] **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Educational Institutions):** গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি জনমত গঠনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আজকের যারা ছাত্রছাত্রী তাদের অনেকেই আগামী দিনের রাষ্ট্রনেতা বা নেত্রী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং সুশিক্ষা দানের উপর ভবিষ্যৎ দিনের জাতীয় চরিত্র অনেকাংশে নির্ভরশীল বলা যেতে পারে। শিক্ষা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা

প্রতিষ্ঠানের শান্ত পরিবেশে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ দেশ-বিদেশের ভিন্ন ভিন্ন সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেন। অনেক সময় শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ যুক্তিতর্কের সাহায্যে যে ধ্যানধারণা বা আদর্শকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণ করেন ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই সেই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। সেই আদর্শের প্রতিফলন তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কার্যাবলীর মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

অবশ্য শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উপর অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। পাঠ্যপুস্তকগুলিতে এই শ্রেণীর ধ্যানধারণার প্রতিফলন দেখা যায়। বিরুদ্ধ মতবাদগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না বা সেগুলি পাঠ্যপুস্তকে অনুপস্থিত থাকে। ফলে ধনতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-গুলিকে জনমত গঠনের প্রকৃত মাধ্যম বলে অভিহিত করা সমীচীন নয়।

ধনতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি জনমত গঠনের প্রকৃত বাহন নয়

[চ] আইনসভা (The Legislature): গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিবৃন্দ বিতর্ক, আলোচনা, সমালোচনা, প্রশ্নোত্তর প্রভৃতির মাধ্যমে সমাজের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন, একে অপরের দোষ-ত্রুটি তুলে ধরার চেষ্টা করেন। আইনসভার যাবতীয় আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক প্রভৃতি সংবাদপত্র, বেতার ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচারিত হয়। ফলে জনগণ সত্যাসত্য নিরূপণ করে স্বাধীনভাবে মতামত গঠন করতে পারে।

আইনসভার ভূমিকা

কিন্তু উদারনৈতিক গণতন্ত্রে আইনসভায় শক্তিশালী বিরোধী দল না থাকলে সুষ্ঠু জনমত গঠনে তা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে না। তাছাড়া, বিরোধী দলের রাজনৈতিক প্রচারের পূর্ণ স্বাধীনতা না থাকলে জনমত গঠনে তারা বিশেষ কোন দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয় না।

[ছ] পেশাগত সংঘ (Professional Organisations): উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে বিভিন্ন পেশাতে নিযুক্ত ব্যক্তিরা নিজেদের পেশাগত দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য নানা প্রকার সংঘ বা ইউনিয়ন গড়ে তোলে। এই-সব সংঘ বা সংগঠন অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পেশাগত দাবি-পূরণের আন্দোলনের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ না রেখে বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত রাখে। স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তাদের গভীর যোগাযোগ থাকে এবং অনেক সময় সেগুলি রাজনৈতিক দলের গণসংগঠন হিসেবে কাজ করে। অ্যালমন্ড ও পাওয়েলের মতে, এইসব সংঘের কার্যকলাপের ফলে মানুষের রাজনৈতিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। সুতরাং জনমত গঠনে এইসব পেশাগত সংঘগুলি যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

পেশাগত সংঘের ভূমিকা

[জ] পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি (Family, Friends etc.): জনমত গঠনে পরিবারের ভূমিকার কথা অনেকে উল্লেখ করলেও সাধারণ-ভাবে পরিবারকে জনমত গঠনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বলে মনে করা হয় না। তবে একথা সত্য যে, পরিবার হোল 'রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের

পরিবার, বন্ধুবান্ধব ইত্যাদি

অন্যতম মাধ্যম।' পিতামাতার রাজনৈতিক ধ্যানধারণা বা আদর্শের দ্বারা অনেক সময় শিশুমন প্রভাবিত হয়। পরবর্তী জীবনে পরিবার কিংবা পরিজনের এই প্রভাব ব্যক্তির রাজনৈতিক জীবনকে বহুলাংশে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়।

অনেকের মতে, পরিবারের প্রভাব অপেক্ষা বন্ধুবান্ধব কিংবা ইউনিয়ন, ক্লাব ইত্যাদি জনমত গঠনে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সমাজের সমকালীন সমস্যাবলী সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক করে। এর ফলে জনমত গঠিত হতে পারে। আবার ইউনিয়ন, ক্লাব প্রভৃতির সদস্যদের মধ্যে যখন কোন সমস্যা নিয়ে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা হয় তখন সংশ্লিষ্ট সমস্যা সম্পর্কে সদস্যরা জ্ঞানার্জন করতে পারে। এইভাবে নানাবিধ সমস্যা বা প্রশ্নাবলী সম্পর্কে তাদের সুদৃঢ় মতামত গঠিত হয়।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, সুষ্ঠু জনমত গঠন ও প্রকাশের জন্য একদিকে যেমন জনমতের মাধ্যমগুলির প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমনি মতামত গঠন ও প্রকাশের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন। অন্যথায় সুষ্ঠু ও সবল জনমত গঠিত ও প্রকাশিত হতে পারবে না। বলা বাহুল্য, সুষ্ঠু জনমতের অভাবে গণতন্ত্র শূন্যগর্ভ তত্ত্বকথায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

উপসংহার

গ্রন্থ-নির্দেশিকা

1. A. Downs—*An Economic Theory of Democracy*
2. A. N. Yakovler—*Fundamentals of Political Science*
3. Alan R. Ball—*Modern Politics and Government*
4. A. Hallin—*The Soviet Union at the United Nations*
5. A. Appadoria—*The Substance of Politics*
6. A. H. Birch—*Representative and Responsible Government*
7. *An Outline of Social Development* (Progress Publishers, Moscow, Parts I & II)
8. A. V. Dicey—*Law and Public Opinion*
9. A. K. Ghoshal—*Gandhian Political Philosophy* (The Indian Journal of Political Science, January-March, 1949, April-June, 1949)
10. A. R. Desai—*State and Society in India : Essays in Dissent*
11. Buddhadeva Bhattacharyya—*Evolution of the Political Philosophy of Gandhi* (Calcutta Book House)
12. Biman Behari Majumdar—*Gandhian Concept of State*
13. B. Crick—*The Tendency of Political Studies*
14. B. Russel—*The Practice and Theory of Bolshevism*
15. B. P. Sitaramayya—*Gandhi and Gandhism*
16. B. Mussolini—*The Political and Social Doctrine of Fascism*
17. C. C. Rodee, T. J. Andernson and C. Q. Christol—*Introduction to Political Science*
18. Clark M. Eichelberger—*UN : The First Fifteen Years*
19. Charles Merriam—*New Aspects of Politics*
20. C. L. Wayper—*Political Thought*
21. C. E. Merriam—*History of the Theory of Sovereignty Since Rousseau*
22. C. E. Merriam and H. E. Barnes—*A History of Political Theories, Recent Times.*
23. C. D. Burns—*Political Ideals*
24. C. B. Hoover—*Dictatorship and Democracies*
25. C. F. Strong—*Modern Political Constitutions*

26. C. G. Hoag and G. H. Hallet—*Proportional Representation*
27. C. V. Chandrasekharan—*Political Parties*
28. C. E. H. Joad—*Introduction to Modern Political Theory*
29. Carew Hunt—*The Theory and Practice of Communism*
30. D. B. Heater—*Political Ideals in the Modern World*
31. David Easton—*A System Analysis of Political Life*
32. David Easton—*A Framework of Political Analysis*
33. D. D. Rapeael—*Problems of Political Philosophy*
34. David Easton—*The Political System*
35. Dorothy Pickles—*Introduction to Politics*
36. D. G. Ritchie—*Natural Rights*
37. D. Ryazanoff—*The Communist Manifesto of K. Marx and F. Engels*
38. D. N. Sen—*From Raj to Swaraj*
39. D. Bulter—*The Study of Political Behaviour*
40. *Everyman's United Nations*
41. E. L. Robert and O. S. David—*Public Opinion*
42. Ernest Barker—*Principles of Social and Political Theory*
43. Ernest Renan—*What is Nation*
44. E. Asirvatham—*Political Theory*
45. Emile Burns—*Introduction to Marxism*
46. Ernest Mandel—*Marxist Theory of the State*
47. Ernest Mandel—*Marxist Economic Theory*, Vol. I
48. E. M. Winslow—*The Pattern of Imperialism*
49. F. Coker—*Recent Political Thought*
50. *Fundamentals of Marxism-Leninism* (Manual) (Foreign Languages Publishing House, Moscow)
51. F. J. C. Hearnshaw—*Democracy at the Crossways*
52. F. J. C. Hearnshaw—*A Survey of Socialism*
53. F. J. Goodnow—*Social Reform and the Constitution*
54. E. F. M. Durbin—*The Politics of Democratic Socialism*
55. Giovanni Sartori—*Democratic Theory*
56. George Novack—*Democracy and Revolution*
57. George Lichtheim—*Short History of Socialism*
58. G. N. Dhawan—*The Political Philosophy of Mahatma Gandhi*
59. G. Wallas—*The Process of Government*

60. G. A. Almond and G. B. Powell—*Comparative Politics*
61. G. D. H. Cole and Margaret—*A Guide to Modern Politics*
62. G.D.H. Cole—*Socialist Thought, Marxism and Anarchism*
63. G. A. Almond and J. S. Colemen (ed.)—*The Politics of Developing Areas*
64. G. Wallas—*Human Nature in Politics*
65. G. Wootton—*Interest Groups*
66. G. C. Field—*Political Theory*
67. G. E. C. Catlin—*The Science and Method of Politics*
68. G. H. Sabine—*A History of Political Theory*
69. G. Clark and Louis B. Sohn—*World Peace Through World Law*
70. H. D. Lasswell and A. Kaplan—*Power and Society*
71. Harold Lasswell—*Politics : Who Gets What, When, How ?*
72. Herbert Aptheker—*The Nature of Democracy, Freedom and Revolution*
73. Howard Selsam—*Socialism and Ethics*
74. H. J. Laski—*The Problem of Sovereignty*
75. H. J. Laski—*Grammar of Politics*
76. H. J. Laski—*Liberty in Modern State*
77. H. Krabbe—*The Modern Idea of the State*
78. H. S. Maine—*Ancient Law*
79. H. Finer—*Mussolini's Italy*
80. H. J. Laski—*Communism*
81. H. Sidgwick—*Elements of Politics*
82. H. E. Goad—*What is Facism*
83. H. W. Laidler—*History of Socialist Thought*
84. Hans Kohn—*The Idea of Nationalism*
85. H. Zeigler—*Interest Groups of America*
86. J. D. B. Miller—*The Nature of Politics*
87. James C. Charlesworth (ed.)—*The Limits of Behaviouralism in Political Science*
88. James O. Connor—'The Meaning of Economic Imperialism' in K. T. Faun, Donald C. Hodges (ed.)—*Readings in U. S. Imperialism*
89. J. L. Brierly—*The Law of Nations*
90. J. S. Mill—*Representative Government*

91. J. A. Schumpeter—*Capitalism, Socialism and Democracy*
92. J. Blondel (ed.)—*Comparative Government*
93. J. D. B. Miller—*The Nature of Politics*
94. James Bryce—*Modern Democracies*
95. J. W. Garner—*Introduction to Political Science*
96. J. W. Garner—*Political Science and Government*
97. J. Austin—*Lectures on Jurisprudence*, Vol. I
98. J. S. Mill—*On Liberty*
99. J. A. R. Marriot—*Second Chambers*
100. J. S. Barnes—*Universal Aspects of Fascism*
101. K. G. Mashruwala—*Gandhi and Marx*
102. K. Mathew Kurian (ed.)—*State and Society : A Marxist Approach*
103. K. C. Wheare—*Federal Government*
104. Krishna Valsangkar, Marina Pinto and Louis D'silva—*Aspects of Political Theory*
105. Leslie Lipson—*The Great Issues of Politics*
106. L. Rockow—*Contemporary Political Thought in England*
107. L. Duguit—*Law in the Modern State*
108. Maurice Cornforth—*Dialectical Materialism*, Vols. I & II
109. Maurice Duverger—*Political Parties : the Organization and Activity in the Modern State*
110. N. J. Padelford and Leland M. Goodrich (ed.)—*The United Nations : Accomplishments and Prospects*
111. Norman Thomas—*Democratic Socialism : A New Appraisal*
112. N. K. Basu—*Studies in Gandhism*
113. Ralph Miliband—*Marxism and Politics*
114. R. A. Dahl—*Modern Political Analysis*
115. R. E. Jones—*The Functional Analysis of Politics*
116. Robert Michels—*Political Parties*
117. R. M. MacIver—*The Web of Government*
118. Robert A. Dahl—*A Preface to Democratic Theory*
119. R. M. MacIver and Charles H. Page—*Society*
120. R. G. Gettel—*Political Science*
121. Robert A. Dahl—*The Behavioural Approach in Political Science*, American Political Science Review, 55, Dec., 1961
122. Robert A. Dahl—*Modern Political Analysis*

123. R. H. Tawney—*Equality*
124. Sigmund Neumann—*Modern Political Parties: Approaches to Comparative Politics*
125. *The Political Economy of Capitalism* (Progress Publishers, Moscow)
126. T. H. Green—*Lectures on Principles of Political Obligation*
127. V. O. Key—*Politics, Parties and Pressure Groups*
128. V. P. Varma—*Gandhi and Marx* (The Indian Journal of Political Science, April-June, 1954)
129. V. O. Key—*Public Opinion and Democracy*
130. V. P. Verma—*The Political Philosophy of Mahatma Gandhi and Sarvodaya*
131. W. Ebenstein—*Today's Isms*
132. W. Ebenstein—*Modern Political Thought*
133. W. Ebenstein—*Political Thought in Perspective*
134. W. Ebenstein—*Great Political Thinkers*
135. অশোক মেহেতা—গণতান্ত্রিক সমাজবাদ
136. আর. উলিয়ানভস্কি—রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব ও আফ্রিকার দেশগুলিতে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া
137. এ. লিয়নটিয়েভ—মার্কসীয় অর্থনীতি
138. এমিল বার্নস—মার্কসবাদ
139. এম. ভলকভ—আজকের দিনে নয়া-উপনিবেশবাদের কৌশল
140. কল্পতরু সেনগুপ্ত—ফ্যাসিজম কিভাবে আসে
141. 'গণশক্তি'—স্তালিন জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা, ৭৯
142. জোসেফ স্তালিন—দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ
143. জোসেফ স্তালিন—লেনিনবাদের ভিত্তি
144. জোসেফ স্তালিন—লেনিনবাদের সমস্যা
145. পরিমলচন্দ্র ঘোষ—রাষ্ট্র ও গণতন্ত্র এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূলসূত্র
146. পার্থ ঘোষ—কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রসঙ্গে
147. ভ. কেল্লে ও ম. কোভালসন—মার্কসীয় সমাজতত্ত্বের রূপরেখা
148. মার্কস ও এঙ্গেলস—রচনা সংকলন
149. মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন—ঔপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে
150. মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন -বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রসঙ্গে
151. মধুসূদন চক্রবর্তী—মার্কসবাদ জানবো (১ম ও ২য়)
152. রঞ্জন চৌধুরী—মার্কসবাদের ভূমিকা

153. রাজনীতির মূলকথা—প্রগতি প্রকাশন, মস্কো
154. রাজনীতি বিজ্ঞানের মূলকথা : প্রাথমিক রাজনীতি শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক—বিংশ শতাব্দী
155. রাহুল সাংকৃত্যায়ন—মানব সমাজ
156. লেনিন—মার্কস-এঙ্গেলস-মার্কসবাদ
157. লেনিন—গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল ডেমোক্রাসীর দুই কৌশল
158. লেনিন—রাষ্ট্র
159. লেনিন—সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদীদের প্রসঙ্গে
160. লেনিন ও স্তালিন—জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন সম্পর্কে নির্বাচিত প্রবন্ধাবলী
161. শশিভূষণ দাশগুপ্ত—টলস্টয়, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ
162. শোভনলাল দত্তগুপ্ত—মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা
163. হার্বার্ট আপ্‌থেকার—গণতন্ত্র-স্বাধীনতা-বিপ্লব
(অনুবাদ—সুদর্শন রায়চৌধুরী)
164. ড. মুজিবর রহমান ও সুজিত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়—আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক সমীক্ষা : প্রতিরূপ পর্যালোচনা
165. বিপ্লব দাশগুপ্ত—সাম্রাজ্যবাদ ও তৃতীয় বিশ্ব
166. পরিমলচন্দ্র ঘোষ—রাষ্ট্রবিজ্ঞানতত্ত্ব ও পদ্ধতি
167. "গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র" কাকে বলে ? [বিংশ শতাব্দী]

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্নাবলী

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি সম্পর্কে আলোচনা কর। [পৃ. ৩-১১ দেখ]

২। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও সীমানা সম্পর্কে যা জান আলোচনা কর। [পৃ. ৫-১১ দেখ]

৩। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর সীমানা নির্ধারণের সাম্প্রতিক প্রয়াস সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। [পৃ. ৩-১১ দেখ]

৪। আন্তর্বিষয়কেন্দ্রিক প্রকৃতির উপর গুরুত্ব প্রদান করে বর্তমান দিনের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিধি সম্পর্কে আলোচনা কর। [পৃ. ৬-১১ দেখ]

৫। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। [পৃ. ১৫-২২ দেখ]

৬। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর। তুমি কোন্‌টিকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে কর এবং কেন? [পৃ. ১৫-২২ দেখ]

৭। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টিকে তুমি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে কর এবং কেন? [ক. বি., ১৯৮০] [পৃ. ১৫-২২ দেখ]

৮। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার যে কোন চারটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি এবং তাদের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে আলোচনা কর। [পৃ. ১৫-১৮ দেখ]

৯। "রাষ্ট্রবিজ্ঞান ছাড়া ইতিহাসের আলোচনা নিষ্ফল, ইতিহাস ছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান ভিত্তিহীন।"—উক্তিটির আলো[illegible] রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। [পৃ. ২৪-২৬ দেখ]

১০। অর্থবিদ্যার সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা কর। [পৃ. ২৭-২৮ দেখ]

১১। ভূগোলের সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা কর। [পৃ. ২৯-৩১ দেখ]

১২। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে ইতিহাস ও সমাজবিদ্যার সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ২৪-২৬ এবং ২৯-৩১ দেখ]

১৩। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে অর্থবিদ্যা ও ভূবিদ্যার সম্পর্ক কি? [পৃ. ২৭-২৮ এবং ৩১-৩৩ দেখ]

১৪। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার সনাতন দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে আলোচনা কর। তুমি কিভাবে এর সমালোচনা করবে. [পৃ. ৩৮-৪২ দেখ]

১৫। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে যা জান লেখ। [পৃ. ৪৪-৫০ দেখ]

১৬। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার আদর্শ স্থাপনকারী এবং অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা কর। উভয় প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীর ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি কি কি ? [পৃ. ৩৭-৪২ এবং ৪৪-৫০ দেখ]

১৭। আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য ও তার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা কর। [পৃ. ৪৫-৫০ দেখ]

১৮। আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে আলোচনা কর। কিভাবে তুমি এর সমালোচনা করবে ? [পৃ. ৪৪-৫০ দেখ]

১৯। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী বলতে কি বোঝ ? এর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং সীমাবদ্ধতা নির্দেশ কর। [পৃ. ৪৪-৫০ দেখ]

২০। ব্যবস্থাজ্ঞাপক দৃষ্টিভঙ্গী ও তার সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে যা জান আলোচনা কর। [পৃ. ৫০-৫৬ দেখ]

২১। ব্যবস্থাজ্ঞাপক দৃষ্টিভঙ্গীর স্বরূপ বিশ্লেষণ কর। কিভাবে তুমি এর সমালোচনা করবে ? [পৃ. ৫০-৫৬ দেখ]

২২। কাঠামো-কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গীর স্বরূপ বিশ্লেষণ কর। কিভাবে তুমি এর সমালোচনা করবে ? [পৃ. ৫৬-৬১ দেখ]

২৩। গোষ্ঠীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে যা জান লেখ। [পৃ. ৬১-৬৩ দেখ)

২৪। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে আলোচনা কর। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীর কি কোনও পার্থক্য আছে ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। [পৃ. ৬৫-৬৯ দেখ]

২৫। রাজনৈতিক তত্ত্ব বলতে কি বোঝায় ? রাজনৈতিক তত্ত্বের ভূমিকা কি ? [পৃ. ৭০-৭১ এবং ৭৩-৭৬ দেখ]

২৬। রাজনৈতিক তত্ত্বের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। কিভাবে তুমি এর শ্রেণীবিভাগ করবে ? [পৃ. ৭০-৭৩ দেখ]

২৭। রাজনৈতিক তত্ত্বের ভূমিকা পর্যালোচনা কর। রাজনৈতিক তত্ত্ব ও রাজনৈতিক দর্শনের মধ্যে কি কোনও পার্থক্য আছে ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। [পৃ. ৭০-৭৪ এবং ৭৭-৭৯ দেখ]

২৮। রাজনৈতিক তত্ত্ব ও রাজনৈতিক দর্শনের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর। [পৃ. ৭৬-৭৯ দেখ]

২৯। মানবের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যা জান আলোচনা কর। [পৃ. ৮০-৮১ দেখ]

৩০। সমাজের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা কর। [পৃ. ৮০-৮১ দেখ]

৩১। সমাজ বলতে কি বোঝ ? মানব-সমাজের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। [পৃ. ৮১-৮৩ দেখ]

৩২। মানুষকে সামাজিক জীব বলা হয় কেন? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। [পৃ. ৮৯-৯২ দেখ]

৩৩। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক কি তা আলোচনা কর। [পৃ. ৮৯-৯২ দেখ]

৩৪। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতবাদগুলি আলোচনা কর। কিভাবে তুমি মতবাদগুলির সমালোচনা করবে? [পৃ. ৯২-৯৬ দেখ]

৩৫। রাষ্ট্র ও সমাজের পার্থক্য নিরূপণ করে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। [পৃ. ৯৬-৯৮ দেখ]

৩৬। সমাজ-বিকাশের বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। [পৃ. ৯৯, ১০৫, ১০৮-১১০ এবং ১১২-১২৩ দেখ]

৩৭। সমাজ-বিকাশের ক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যবস্থার ভূমিকা পর্যালোচনা কর। [পৃ. ৯৯-১০৫, ১০৮-১১০ এবং ১১২-১২৩ দেখ]

৩৮। আদিম সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। [পৃ. ৯৯-১০১ দেখ]

৩৯। দাস-সমাজব্যবস্থার উদ্ভবের পটভূমি কি? দাস-সমাজব্যবস্থার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। [পৃ. ১০১-১০৫ দেখ]

৪০। বিভিন্ন দেশে দাস-ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [পৃ. ১০৫-১০৮ দেখ]

৪১। কিভাবে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে? এর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। [পৃ. ১০৮-১১০ দেখ]

৪২। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। বিভিন্ন দেশের সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বর্ণনা দাও। [পৃ. ১০৮-১১০ দেখ]

৪৩। কিভাবে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার উৎপত্তি হয়? এর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। [পৃ. ১১২-১১৫ দেখ]

৪৪। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। [ক. বি., ১৯৮০] [পৃ. ১১২-১১৫ দেখ]

৪৫। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা উদ্ভবের পূর্বশর্ত কি? এরূপ সমাজব্যবস্থার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কি সমাজ-বিবর্তনের সর্বশেষ স্তর? তোমার বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। [পৃ. ১১৫-১২১ দেখ]

৪৬। সাম্যবাদী সমাজের একটি রূপরেখা অঙ্কন কর। সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কি কোনও পার্থক্য আছে? [পৃ. ১২১-১২৩ দেখ]

৪৭। "জৈব মতবাদ রাষ্ট্রের প্রকৃতির কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নয়, রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র বিষয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্রও নয়।"—ব্যাখ্যা কর। [পৃ. ১২৪-১২৯ দেখ]

৪৮। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে জৈব মতবাদের সমালোচনামূলক মূল্যায়ন কর।
[পৃ. ১২৪-১২৯ দেখ]

৪৯। "রাষ্ট্র একটি জীবন্ত প্রাণী; তা প্রাণহীন বস্তু নয়।"—এই মন্তব্যের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আলোচনা কর। [পৃ. ১২৪-১২৯ দেখ]

৫০। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে আদর্শবাদের পর্যালোচনা কর।
[পৃ. ১২৯-১৩৪ দেখ]

৫১। রাষ্ট্র 'একটি আত্মসচেতন নৈতিক সত্তা এবং নিজের সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন ও নিজেকে উপলব্ধি করার ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ব্যক্তি'।—তুমি কি এই অভিমত সমর্থন কর? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।
[পৃ. ১২৯-১৩৪ দেখ]

৫২। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে উদারনীতিবাদীদের অভিমত ব্যক্ত কর। তুমি কিভাবে এই মতের সমালোচনা করবে? [পৃ. ১৩৪-১৩৯ দেখ]

৫৩। রাষ্ট্রকে কি সাধারণের স্বার্থরক্ষার 'এজেন্সী' বলে মেনে নেওয়া যায়? এ বিষয়ে উদারনীতিবাদীদের অভিমত পর্যালোচনা কর।
[পৃ. ১৩৪-১৩৯ দেখ]

৫৪। 'রাষ্ট্র শ্রেণী-শোষণের হাতিয়ার।'—আলোচনা কর। [পৃ. ১৩৯-১৪৩ দেখ]

৫৫। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে মার্কসীয় তত্ত্ব আলোচনা কর। তুমি কিভাবে মতবাদটির মূল্যায়ন করবে? [পৃ. ১৩৯-১৪৩ দেখ]

৫৬। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে মার্কসীয় তত্ত্ব আলোচনা কর। [ক. বি. ১৯৮০]
[পৃ. ১৩৯-১৪৩ দেখ]

৫৭। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে মার্কসীয় মতবাদের সমালোচনামূলক আলোচনা কর। [পৃ. ১৩৯-১৪৩ দেখ]

৫৮। সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ১৪৪-১৪৬ দেখ]

৫৯। সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ কর। সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি? [পৃ. ১৪৪-১৪৯ দেখ]

৬০। সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ কর। (ক) আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতা ও রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার এবং (খ) আইনানুমোদিত ও বাস্তব সার্বভৌমিকতার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। [পৃ. ১৪৪ এবং ১৫২-১৫৩ দেখ]

৬১। উদাহরণ-সহ সার্বভৌমিকতার আইনসঙ্গত ও রাজনৈতিক দিকের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। [পৃ. ১৫৩-১৫৫ দেখ]

৬২। নামসর্বস্ব সার্বভৌমিকতা ও প্রকৃত সার্বভৌমিকতা এবং আইনানুমোদিত সার্বভৌমিকতা ও বাস্তব সার্বভৌমিকতার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।
[পৃ. ১৫২-১৫৩ দেখ]

৬৩। জনগণের সার্বভৌমিকতা তত্ত্বটি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা কর। তত্ত্বটির সীমাবদ্ধতা কি কি? [পৃ. ১৫৫-১৫৭ দেখ]

৬৪। সার্বভৌমিকতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা কর। [পৃ. ১৪৯-১৫১ দেখ]

৬৫। সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে একত্ববাদের আলোচনা ও ব্যাখ্যা কর। কিভাবে আন্তর্জাতিকতাবাদী ও বহুত্ববাদীরা এর সমালোচনা করেন? [পৃ. ১৫৭-১৬০ এবং ১৬৪-১৬৭ দেখ]

৬৬। রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার উপর বহুত্ববাদী তত্ত্বটি আলোচনা কর। কিভাবে তুমি এই মতবাদের সমালোচনা করবে? [পৃ. ১৬৪-১৭০ দেখ]

৬৭। সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে অস্টিনের মতবাদটি বর্ণনা কর ও ব্যাখ্যা কর। কিভাবে তুমি এর সমালোচনা করবে? [পৃ. ১৫৯-১৬৪ দেখ]

৬৮। সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে একত্ববাদী তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। [ক. বি., ১৯৮০] [পৃ. ১৫৭-১৬৪ দেখ]

৬৯। 'আইন সার্বভৌমের আদেশ।"—আলোচনা কর। [পৃ. ১৫৯-১৬৪ দেখ]

৭০। "রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ এবং বহির্ব্যাপারেও সীমাবদ্ধ।"—উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ১৭২-১৭৫ দেখ]

৭১। সার্বভৌমিকতার অবস্থান কিরূপে নির্ণয় করা যায়? এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রশ্নটি আলোচনা কর। [পৃ. ১৭০-১৭২ দেখ]

৭২। সীমাবদ্ধ সার্বভৌমিকতা তত্ত্বটি আলোচনা কর। তুমি কিভাবে এর সমালোচনা করবে? [পৃ. ১৭২-১৭৫ দেখ]

৭৩। রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে বহুত্ববাদী তত্ত্বটি আলোচনা কর। কিভাবে তুমি এর সমালোচনা করবে? [পৃ. ১৬৪-১৭০ দেখ]

৭৪। সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে একত্ববাদী তত্ত্বটি সংক্ষেপে আলোচনা কর। [পৃ. ১৫৭-১৬০ দেখ]

৭৫। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা বিষয়ে একত্ববাদী তত্ত্বের বিরুদ্ধে বহুত্ববাদীদের আক্রমণ সম্পর্কে একটি সমালোচনামূলক টীকা লেখ। [পৃ. ১৬৪-১৭০ দেখ]

৭৬। সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে মার্কসীয় তত্ত্ব আলোচনা কর। [পৃ. ১৭৭-১৮১ দেখ]

৭৭। সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে রুশোর সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্বটি আলোচনা কর। কিভাবে তুমি এই তত্ত্বের সমালোচনা করবে? [পৃ. ১৮১-১৮৩ দেখ]

৭৮। আধুনিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব কি অচল? তোমার বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন কর। [পৃ. ১৮৩-১৮৬ দেখ]

৭৯। আধুনিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় কোন রাষ্ট্রই চরম সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নয় বলে কি তুমি মনে কর? তোমার বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দেখাও। [পৃ. ১৮৩-১৮৬ দেখ]

৮০। জাতীয়তাবাদের উৎপত্তির ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর।
[পৃ. ১৯২-১৯৪ দেখ]

৮১। 'নবজাগরণ-প্রসূত সার্বভৌমিকতার সঙ্গে বৈপ্লবিক অধিকারসমূহের সমন্বয় সাধিত হওয়ার ফলে জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি হয়'।—(বার্নস) আলোচনা কর।
[পৃ. ১৯২-১৯৪ দেখ]

৮২। জাতীয় জনসমাজ ও জাতির সংজ্ঞা নির্দেশ কর। জাতীয় জনসমাজের প্রধান উপাদানগুলি কি কি? কোন্ উপাদানটিকে তুমি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে কর এবং কেন কর?
(পৃ. ১৮৭-১৮৮ এবং ১৮৯-১৯২ দেখ]

৮৩। জাতীয় জনসমাজের অপরিহার্য উপাদানগুলি কি কি? জাতীয় জনসমাজ কি রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে গণ্য হতে পারে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।
[পৃ. ১৮৯-১৯২ দেখ]

৮৪। জাতীয়তাবাদ বলতে কি বোঝ? রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ হিসেবে জাতীয়তাবাদের মূল্য ও সীমাবন্ধতা সম্পর্কে আলোচনা কর। [পৃ. ১৯৫-১৯৯ দেখ]

৮৫। রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে জাতীয়তাবাদের মূল্য ও সীমাবন্ধতা আলোচনা কর।
[পৃ. ১৯৫-১৯৯ দেখ]

৮৬। জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলতে কি বোঝ? আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির মূল্য ও সীমাবন্ধতা আলোচনা কর।
[পৃ. ১৯৯-২০৪ দেখ]

৮৭। "রাষ্ট্রের সীমারেখা জাতীয় জনসমাজের সীমারেখার সঙ্গে সমানুপাতিক হওয়া উচিত।" তুমি কি এই মত সমর্থন কর? তোমার বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন কর।
[পৃ. ১৯৯-২০৪ দেখ]

৮৮। এক-জাতি রাষ্ট্র এবং বহুজাতি-সমন্বিত রাষ্ট্রের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য? তোমার বক্তব্যের সপক্ষে উত্তর দাও।
[পৃ. ১৯৯-২০৪ দেখ]

৮৯। আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি ও আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা কর।
[পৃ. ২০৪-২০৬ দেখ]

৯০। জাতীয়তাবাদ কিভাবে সভ্যতার শত্রু হিসেবে পরিণত হতে পারে তা আলোচনা কর।
[পৃ. ১৯৫-১৯৯ দেখ]

৯১। জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতার সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা কর। [পৃ. ১৯৫-১৯৬ এবং ২০৬-২০৯ দেখ]

৯২। "জাতীয়তাবাদের মাধ্যমেই আন্তর্জাতিকতায় পৌঁছানো যায়।"—আলোচনা কর।
[পৃ. ২০৬-২০৯ দেখ]

৯৩। "জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতার সমন্বয় সাধনের উপর সভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।"—উক্তিটির যাথার্থ্য নিরূপণ কর। [পৃ. ২০৬-২০৯ দেখ]

৯৪। "জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতা রূপায়ণের সহজ পথ।"—উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।
[পৃ. ২০৬-২০৯ দেখ]

৯৫। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার প্রকৃতি আলোচনা কর। উভয়ের মধ্যে কি কোনও পার্থক্য আছে? [পৃ. ২০৯-২১১ দেখ]

৯৬। আন্তর্জাতিকতার অর্থ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ২০৪-২০৬ দেখ]

৯৭। সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা প্রদান কর। সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ২১২-২১৭ দেখ]

৯৮। সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং উহার বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর। [ক. বি., ১৯৮০] [পৃ. ২১২-২১৭ দেখ]

৯৯। সাম্রাজ্যবাদ বলতে কি বোঝায়? সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টির উপাদানগুলি কি কি? [পৃ. ২১২ এবং ২২২-২২৪ দেখ]

৯৯ক। নয়া উপনিবেশবাদ বলতে কি বোঝ? বর্তমান বিশ্বে নয়া-উপনিবেশবাদ কিভাবে কাজ করছে? [পৃ. ২১৭-২২২ দেখ]

১০০। সাম্রাজ্যবাদ কি বিশ্বশান্তির পরিপন্থী? তোমার বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। [পৃ. ২৩০-২৩৬ দেখ]

১০১। সাম্প্রতিক বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ২২৪-২৩০ দেখ]

১০২। বিশ্বশান্তির পথে সমস্যাগুলি সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণমূলক আলোচনা কর। [পৃ. ২৩০-২৩৬ দেখ]

১০৩। বিশ্বশান্তির পথে সমস্যাগুলি কি কি? তুমি কোন্ সমস্যাটিকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে কর এবং কেন? [পৃ. ২৩০-২৩৬ দেখ]

১০৪। বিশ্বশান্তি রক্ষায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমিকা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। [পৃ. ২৩৬-২৪৩ দেখ]

১০৫। বিশ্বশান্তি রক্ষায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। [পৃ. ২৩৬-২৪৩ দেখ]

১০৬। আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। আইনের প্রকৃতি আলোচনা কর। [পৃ. ২৪৪-২৪৬ দেখ]

১০৭। প্রাকৃতিক আইনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ২৪৬-২৪৮ দেখ]

১০৮। আইনকে কি তুমি 'সাধারণ ইচ্ছার' প্রকাশ বলে মনে কর? তোমার বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। [পৃ. ২৪৮-২৫০ দেখ]

১০৯। আইনের সংজ্ঞা প্রদান কর। আইন ও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ কর। [পৃ. ২৪৪-২৪৬ এবং ২৬৫-২৬৮ দেখ]

১১০। আইন সম্পর্কিত মতবাদগুলি আলোচনা কর। তোমার মতে কোন্ মতবাদটি গ্রহণযোগ্য এবং কেন? [পৃ. ২৫০-২৫৯ দেখ]

১১১। আইন সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক ও ঐতিহাসিক মতবাদ আলোচনা কর। তুমি কিভাবে এই দুটি মতবাদের সমালোচনা করবে? তোমার মতে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য? [পৃ. ২৫০-২৫৪ দেখ]

১১২। আইন সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক তত্ত্বটি আলোচনা কর। কিভাবে তুমি এর সমালোচনা করবে? [পৃ. ২৫০-২৫২ দেখ]

১১৩। আইন সম্পর্কে ঐতিহাসিক তত্ত্বটি পর্যালোচনা কর। [পৃ. ২৫২-২৫৪ দেখ]

১১৪। আইন সম্পর্কে দার্শনিক, তুলনামূলক, সমাজবিজ্ঞানমূলক এবং মার্কসীয় মতবাদগুলি আলোচনা কর। তোমার মতে কোন্ মতবাদটি গ্রহণযোগ্য এবং কেন? [পৃ. ২৫৪-২৫৯ দেখ]

১১৫। আইন সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানমূলক মতবাদটি আলোচনা কর। কিভাবে তুমি এর মূল্যায়ণ করবে? [পৃ. ২৫৬-২৫৭ দেখ]

১১৬। আইন সম্পর্কে মার্কসীয় মতবাদটি সংক্ষেপে আলোচনা কর। [পৃ. ২৫৭-২৫৯ দেখ]

১১৭। আন্তর্জাতিক আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। আন্তর্জাতিক আইনের শ্রেণীবিভাগ কর। [পৃ. ২৬৮-২৬৯ দেখ]

১১৮। আন্তর্জাতিক আইনের শ্রেণীবিভাগ কর। এই আইনের উৎস নিরূপণ কর। [পৃ. ২৬৯ এবং ২৭১ দেখ]

১১৯। আন্তর্জাতিক আইনের শ্রেণী-চরিত্র সম্পর্কে যা জান লেখ। [পৃ. ২৬৯-২৭১ দেখ]

১২০। আন্তর্জাতিক আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। আন্তর্জাতিক আইনকে কি প্রকৃত অর্থে আইন বলে অভিহিত করা যায়?—যুক্তি প্রদর্শন কর। [পৃ. ২৬৮ এবং ২৭১-২৭৪ দেখ]

১২১। আন্তর্জাতিক আইনকে কি প্রকৃত অর্থে আইন বলিয়া গণ্য করা যায়? তোমার উত্তরের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন কর। [ক. বি. ১৯৮০] [পৃ. ২৭১-২৭৪ দেখ]

১২২। 'আন্তর্জাতিক আইন বিধিশাস্ত্রের বিলয়স্থান।'—(হল্যান্ড)।—এই উক্তিটি আলোচনা কর। [পৃ. ২৭১-২৭৪ দেখ]

১২৩। আন্তর্জাতিক আইনের পথে প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলি আলোচনা কর। [পৃ. ২৭৭-২৭৫ দেখ]

১২৪। অধিকারের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ২৭৬-২৭৭ দেখ]

১২৫। অধিকার বলতে কি বোঝায়? অধিকার কয় প্রকারের এবং কি কি? [পৃ. ২৭৬-২৮৪ দেখ]

১২৬। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। তোমার মতে কোন্ অধিকারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন? [পৃ. ২৮০-২৮১ এবং ২৮২-২৮৪ দেখ]

১২৭। উদাহরণসহ সামাজিক অধিকারের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।
[পৃ. ২৮১-২৮২ দেখ]

১২৮। 'স্বাভাবিক অধিকার তত্ত্বটি' আলোচনা কর। কিভাবে তুমি এই তত্ত্বটির সমালোচনা করবে ? [পৃ. ২৮৫-২৮৮ দেখ]

১২৯। স্বাভাবিক অধিকার বলতে কি বোঝায় ? এরূপ অধিকারের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ২৮৫-২৮৮ দেখ]

১৩০। অধিকার সম্বন্ধে আইনগত মতবাদ, ঐতিহাসিক মতবাদ ও আদর্শবাদী মতবাদ আলোচনা কর। ঐ মতবাদগুলির ত্রুটি-বিচ্যুতি কি কি ?
[পৃ. ২৮৮- ৯১ দেখ]

১৩১। অধিকারের মার্কসীয় তত্ত্বটি আলোচনা কর। [পৃ. ২৯১-২৯৩ দেখ]

১৩২। অধিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ সংক্ষেপে আলোচনা কর। কোন্ মতবাদটি গ্রহণযোগ্য বলে তুমি মনে কর ? [পৃ. ২৮৪-২৯৩ দেখ]

১৩৩। বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় অধিকারের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।
[পৃ. ২৯৩-২৯৬ দেখ]

১৩৪। বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে আলোচনা কর।
[পৃ. ২৯৭-৩০০ দেখ]

১৩৫। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের সপক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।
[পৃ. ৩০০-৩০২ দেখ]

১৩৬। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জনগণের কোনও অধিকার আছে কি ? তোমার বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। [পৃ. ৩০২-৩০৫ দেখ]

১৩৭। রাষ্ট্রের বিরোধিতা করার অধিকারের অর্থ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।
[পৃ. ৩০২-৩০৫ দেখ]

১৩৮। অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা কর।
[পৃ. ৩০৭-৩০৯ দেখ]

১৩৯। স্বাধীনতার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি আলোচনা কর। [পৃ. ৩১০-৩১১ দেখ]

১৪০। স্বাধীনতা সম্বন্ধে ধারণার ব্যাখ্যা কর।
[পৃ. ৩১০-৩১১ এবং ৩১৭-৩২১ দেখ]

১৪১। স্বাধীনতা সম্পর্কে বুর্জোয়া ধারণা এবং মার্কসবাদী ধারণা আলোচনা কর। —তোমার মতে কোন্ ধারণাটি গ্রহণযোগ্য এবং কেন ?
[পৃ. ৩১৭-৩২১ দেখ]

১৪২। আধুনিক রাষ্ট্রে স্বাধীনতার রক্ষাকবচগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।
[পৃ. ৩২১-৩২৪ দেখ]

১৪৩। "আইন স্বাধীনতার শর্ত।"—আলোচনা কর। [পৃ. ৩২৫-৩২৬ দেখ]

১৪৪। বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থায় স্বাধীনতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।
[পৃ. ৩২৬-৩৩০ দেখ]

১৪৫। "স্বাধীনতা ও সার্বভৌমিকতা পরস্পর-বিরোধী প্রতিশব্দ নয়।"—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। [পৃ. ৩২৫-৩২৬ দেখ]

১৪৬। স্বাধীনতা সম্পর্কে বুর্জোয়া ধারণা ব্যাখ্যা কর। কিভাবে তুমি এই ধারণার সমালোচনা করবে? [পৃ. ৩১৭-৩২০ দেখ]

১৪৭। স্বাধীনতা সম্পর্কে মার্কসবাদী ধারণাটির প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ৩২০-৩২১ দেখ]

১৪৮। স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণার ব্যাখ্যা কর এবং আধুনিক রাষ্ট্রে স্বাধীনতার রক্ষাকবচগুলির উল্লেখ কর। [পৃ. ৩১০-৩১১ এবং ৩২১-৩২৪ দেখ]

১৪৯। স্বাধীনতা বলতে কি বোঝ? স্বাধীনতা কয় প্রকারের এবং কি কি? [পৃ. ৩১০-৩১১ এবং ৩১৪-৩১৭ দেখ]

১৫০। সাম্যের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। তুমি কি মনে কর যে, স্বাধীনতা ও সাম্য পরস্পর-বিরোধী? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। [পৃ. ৩৩০-৩৩২ দেখ]

১৫১। "সাম্যের জন্য আগ্রহ স্বাধীনতার আশাকে নির্মূল করে।"—তুমি কি এই মত সমর্থন কর? তোমার বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। [পৃ. ৩৩১-৩৩২ দেখ]

১৫২। সাম্যের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি আলোচনা কর। সাম্য কয় প্রকার এবং কি কি? [পৃ. ৩৩০-৩৩১ এবং ৩৩৩-৩৩৫ দেখ]

১৫৩। বিভিন্ন সামাজিক-ব্যবস্থায় সাম্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ৩৩৫-৩৩৭ দেখ]

১৫৪। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে আলোচনা কর। [পৃ. ৩৩৮-৩৪০ দেখ]

১৫৫। রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। [পৃ. ৩৪২-৩৪৪ দেখ]

১৫৬। রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আলোচনা কর। [পৃ. ৩৪৪-৩৫১ দেখ]

১৫৭। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বর্ণনা কর। [পৃ. ৩৪৪-৩৫১ দেখ]

১৫৮। রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি বিষয়ে সমাজতন্ত্রবাদীদের অভিমত ব্যাখ্যা কর। [পৃ. ৩৫৩-৩৫৫ দেখ]

১৫৯। সমাজতন্ত্রবাদের অর্থ কি? সমাজতন্ত্রবাদের গুণাগুণ পর্যালোচনা কর। [পৃ. ৩৫৩-৩৬০ দেখ]

১৬০। রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্পর্কে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের পর্যালোচনা কর। এ সম্পর্কে সাম্প্রতিক গতি কি? [পৃ. ৩৪৫-৩৫১ এবং ৩৫৩-৩৬১ দেখ]

১৬১। জনকল্যাণকর রাষ্ট্র বলতে কি বোঝায় ? জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য এবং কার্যাবলী কি কি ? [পৃ. ৩৬১-৩৬২ এবং ৩৬৩-৩৬৬ দেখ]

১৬২ 'সমাজতন্ত্র ব্যতীত গণতন্ত্র অসম্পূর্ণ'' আলোচনা কর। [পৃ. ৩৬৬-৩৬৮ দেখ]

১৬৩ 'সমাজতন্ত্রবাদ উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক মতবাদের বিরোধিতা করা অপেক্ষা তাকে সম্পূর্ণ করে তুলতে চায়।'—তুমি কি এই উক্তিটির সঙ্গে একমত ? তোমার বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। [পৃ. ৩৬৬-৩৬৮ দেখ]

১৬৪। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদের কোন বিরোধ নেই। তুমি কি এই বক্তব্য সমর্থন কর ? তোমার বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। [পৃ. ৩৬৮-৩৬৯ দেখ]

১৬৫। 'আমরা যদি এমন একটি আদর্শের কথা কল্পনা করতে পারি, যা একই সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক, তাহলে সেটিই হবে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী আদর্শ।'—আলোচনা কর। [পৃ. ৩৬৮ ৩৬৯ দেখ]

১৬৬। তোমার মতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সীমারেখা কতদূর পরিব্যাপ্ত হওয়া উচিত ? [পৃ. ৩৬৯-৩৭২ দেখ]

১৬৭। মার্কসবাদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। মার্কসীয় চিন্তাধারার উৎস কি কি ? [পৃ. ৩৭৩-৩৭৫ দেখ]

১৬৮। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। এর গুরুত্বপূর্ণ যে-কোন দুটি দিকের আলোচনা কর। [পৃ. ৩৭৩-৩৭৪, ৩৭৫-৩৮০ এবং ৩৮২-৩৮৬ দেখ]

১৬৯। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলতে কি বোঝ ? মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর। পৃ. ৩৭৫-৩৮১ দেখ]

১৭০। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলতে কি বোঝায় ? মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্বটি উদাহরণ-সহ আলোচনা কর। কিভাবে তুমি এই তত্ত্বের মূল্যায়ন করবে ? [পৃ. ৩৮২-৩৮৮ দেখ]

১৭১। 'শ্রেণী'র সংজ্ঞা নির্দেশ কর। শ্রেণী-সংগ্রামের মার্কসীয় তত্ত্বটি আলোচনা কর। কিভাবে এই তত্ত্বের সমালোচনা করবে ? [পৃ. ৩৮৯-৩৯৪ দেখ]

১৭২। রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্বন্ধে উদারনৈতিক তত্ত্বটি আলোচনা কর। তুমি কিভাবে এর সমালোচনা করবে ? [পৃ. ৩৯৫-৪০০ দেখ]

১৭৩। রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্বন্ধে উদারনীতিবাদীদের অভিমত ব্যাখ্যা কর। মার্কসবাদীরা কিভাবে এই অভিমতের সমালোচনা করেন. [পৃ. ৩৯৫-৪০০ দেখ]

১৭৪। বিপ্লবের মার্কসীয় তত্ত্বটি আলোচনা কর। বিপ্লব ও হিংসার মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। [পৃ. ৪০০-৪০৬ দেখ]

১৭৫। সমাজতান্ত্রিক এবং অ-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর।
[পৃ. ৪০৬-৪১০ দেখ]

১৭৬। মার্কসবাদের বিকাশে লেনিনের অবদান সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।
[পৃ. ৪১০-৪১৬ দেখ]

১৭৭। গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বলতে কি বোঝ? গণতান্ত্রিক সমাজবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। [পৃ. ৪১৭-৪২০ দেখ]

১৭৮। গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বলতে কি বোঝ? এর সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি আলোচনা কর। [পৃ. ৪১৭-৪২২ দেখ]

১৭৯। গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বলতে কি বোঝায়? মার্কসবাদের সঙ্গে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের পার্থক্য নিরূপণ কর। [পৃ. ৪১৭ এবং ৪২২-৪২৩ দেখ]

১৮০। গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের পার্থক্য নিরূপণ কর। [পৃ. ৪১৭-৪২৩ দেখ]

১৮১। গান্ধীজীর রাষ্ট্র-তত্ত্বটি আলোচনা কর। কিভাবে তুমি এর সমালোচনা করবে? [পৃ. ৪২৫-৪৩০ দেখ]

১৮২। সর্বোদয় সম্পর্কে গান্ধীজীর ধারণা বিশ্লেষণ কর। [ক. বি. ১৯৮০]
[পৃ. ৪৩১-৪৩৪ দেখ]

১৮৩। গান্ধীজীর সর্বোদয়-তত্ত্বটি আলোচনা কর। কিভাবে এর সমালোচনা করবে? [পৃ. ৪৩১-৪৩৪]

১৮৪। গান্ধীজীর সর্বোদয় চিন্তার উৎস কি? সংক্ষেপে সর্বোদয় সম্পর্কে গান্ধী-তত্ত্বটি আলোচনা কর। [পৃ. ৪৩১-৪৩৪ দেখ]

১৮৫। রাষ্ট্র সম্পর্কে গান্ধীবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য নিরূপণ কর। [পৃ. ৪৩০-৪৩১ দেখ]

১৮৬। সংবিধানের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। কিভাবে সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ করবে?
[পৃ. ৪৩৫-৪৩৯ দেখ]

১৮৭। লিখিত ও অলিখিত সংবিধান কাকে বলে? কিভাবে তুমি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করবে? [পৃ. ৪৩৭ এবং ৪৩৯-৪৪১ দেখ]

১৮৮। লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের গুণাগুণ আলোচনা কর।
[পৃ. ৪৪১-৪৪৪ দেখ]

১৮৯। সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। উভয়ের মধ্যে কি কোনও পার্থক্য রয়েছে? [পৃ. ৪৩৭-৪৩৮ এবং ৪৪৪-৪৪৫ দেখ]

১৯০। সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের গুণাগুণ আলোচনা কর।
[পৃ. ৪৪৫-৪৪৮ দেখ]

১৯১। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ কি? বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের পার্থক্য নিরূপণ কর। [পৃ. ৩৭৩-৩৭৪ এবং ৪২২-৪২৩ দেখ]

১৯২। এককেন্দ্রিক সরকার বলতে কি বোঝ? এরূপ সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। [পৃ. ৪৫১-৪৫৩ দেখ]

১৯৩। যুক্তরাষ্ট্র কাকে বলে? যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। [পৃ. ৪৫৫-৪৫৭ দেখ]

১৯৪। এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। [পৃ. ৪৬১-৪৬৩ দেখ]

১৯৫। যুক্তরাষ্ট্রের সংজ্ঞা আলোচনা কর। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার গুণাগুণ আলোচনা কর। [পৃ. ৪৫৫ এবং ৪৬৩-৪৬৬ দেখ]

১৯৬। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পূর্ব-শর্তগুলি কি কি? [পৃ. ৪৫৭-৪৫৯ দেখ]

১৯৭। এককেন্দ্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি? এরূপ সরকারের গুণাগুণ আলোচনা কর। [পৃ. ৪৫২-৪৫৫ দেখ]

১৯৮। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। [পৃ. ৪৬৩-৪৬৬ দেখ]

১৯৯। যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের শর্তাবলী কি কি? [পৃ. ৪৬৬-৪৬৮ দেখ]

২০০। আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রপ্রবণতার কারণগুলি পর্যালোচনা কর। যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কি? [পৃ. ৪৭২-৪৭৬ দেখ]

২০১। ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণ বলতে কি বোঝ? ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা কর। ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণের সমস্যাগুলি কি কি? [পৃ. ৪৬৮-৪৭২ দেখ]

২০২। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার বলতে কি বোঝায়? এরূপ সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। [পৃ. ৪৭৬-৪৭৭ দেখ]

২০৩। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের গুণাগুণ আলোচনা কর [পৃ. ৪৭৭-৪৮০ দেখ]

২০৪। মন্ত্রিপরিষদ-পরিচালিত সরকার বলতে কি বোঝ? এরূপ সরকারের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। [পৃ. ৪৮০-৪৮২ দেখ]

২০৫। মন্ত্রিপরিষদ-পরিচালিত সরকারের গুণাগুণ আলোচনা কর। [পৃ. ৪৮২-৪৮৫ দেখ]

২০৬। মন্ত্রিপরিষদ-পরিচালিত সরকারের সাফল্যের শর্তাবলী কি কি? [পৃ. ৪৮৫-৪৮৬ দেখ]

২০৭। রাষ্ট্রপতি-শাসিত এবং মন্ত্রিপরিষদ-পরিচালিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর। [পৃ. ৪৮৬-৪৮৮ দেখ]

২০৮। রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায়? কিভাবে উহাদিগকে শ্রেণীবিভক্ত করা হইয়াছে? [কঃ বিঃ, ১৯৮০] [পৃ. ৪৮৯-৪৯১ দেখ]

২০৯। কিভাবে আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলির শ্রেণীবিভাজন করা যায় তা আলোচনা কর। [পৃ. ৪৮৯-৪৯১ দেখ]

২১০। উদারনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায়? এর বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। [পৃ. ৪৯১-৪৯৩ দেখ]

২১১। স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংজ্ঞা নির্দেশ কর। এর বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর। [পৃ. ৪৯৩ ৪৯৪ দেখ]

২১২। ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে উদারনৈতিক ব্যবস্থার পার্থক্য আলোচনা কর। [পৃ. ৪৯৪-৪৯৫ এবং ৪৯৯-৫০১ দেখ]

২১৩। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কি সর্বাত্মক ব্যবস্থা বলা সমীচীন? [পৃ. ৪৯৬-৪৯৮ দেখ]

২১৪। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার পার্থক্য নিরূপণ কর। [পৃ. ৪৯৮-৪৯৯ দেখ]

২১৫। উদারনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার পার্থক্য নিরূপণ কর। তোমার মতে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য এবং কেন? [পৃ. ৪৯৯-৫০১ দেখ]

২১৬। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কোনও পার্থক্য আছে কি? তোমার মতে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য এবং কেন? [পৃ. ৫০১-৫০৩ দেখ]

২১৭। স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার একটি তুলনামূলক আলোচনা কর। [পৃ. ৫০৩-৫০৪ দেখ]

২১৮। স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পার্থক্য নিরূপণ কর। [পৃ. ৫০৫-৫০৭ দেখ]

২১৯। ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি তুলনামূলক আলোচনা কর। তোমার মতে কোন্ ব্যবস্থা শ্রেষ্ঠ? [পৃ. ৫০৭-৫০৯ দেখ]

২২০। আধুনিক রাষ্ট্রে আইনসভার কার্যাবলী বর্ণনা কর। [পৃ. ৫১০-৫১৪ দেখ]

২২১। উদাহরণ-সহ দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। [পৃ. ৫১৪-৫১৯ দেখ]

২২২। আইনসভার ক্ষমতাহ্রাসের কারণগুলি বর্ণনা কর। আইনসভার বর্তমান অবস্থা কি? [পৃ. ৫২০-৫২৩ দেখ]

২২৩। শাসন বিভাগ বলতে কি বোঝ? শাসন বিভাগের শ্রেণীবিভাগ কর। [পৃ. ৫২৩-৫২৪ এবং ৫২৫-৫২৬ দেখ]

২২৪। আধুনিক রাষ্ট্রে শাসন বিভাগের কার্যাবলী বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ৫২৬-৫২৮ দেখ]

২২৫। আধুনিক রাষ্ট্রে শাসন বিভাগের ভূমিকা আলোচনা কর। শাসন বিভাগের প্রধান প্রধান কার্যাবলী কি কি? [পৃ. ৫২৬-৫২৮ দেখ]

২২৬। আমলাতন্ত্র বলতে কি বোঝ? আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। [পৃ. ৫২৮-৫৩০ দেখ]

২২৭। আমলাতন্ত্রের অর্থ কি? কিভাবে আমলাতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ করবে? [পৃ. ৫২৮-৫২৯ এবং ৫৩০-৫৩১ দেখ]

২২৮। আমলাতন্ত্রের অর্থ কি? বর্তমান দিনে আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব নির্দেশ কর। [পৃ. ৫২৮-৫২৯ এবং ৫৩১-৫৩২ দেখ]

২২৯। আধুনিককালে আমলাতন্ত্রের কার্যাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [পৃ. ৫৩২-৫৩৫ দেখ]

২৩০। আমলাতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। আমলাতন্ত্রের ত্রুটিগুলি কি কি? কিভাবে আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়? [পৃ. ৫২৮-৫২৯ এবং ৫৩৫-৫৩৭ দেখ]

২৩১। বিচার বিভাগ কি রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংশ? কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নির্ভর করে? [পৃ. ৫৩৭-৫৪২ দেখ]

২৩২। বিচারপতিদের নিরপেক্ষতাকে কি 'আধা-অলীক কাহিনী' বলা সঙ্গত? কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর বিচারপতিদের স্বাধীনতা নির্ভর করে? [পৃ. ৫৩৭-৫৪২ দেখ]

২৩৩। আধুনিক গণতন্ত্রে বিচার বিভাগের কার্যাবলীর বিবরণ দাও। [পৃ. ৫৪২-৫৪৫ দেখ]

২৩৪। আধুনিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের গুরুত্ব ও কার্যাবলী সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। [পৃ. ৫৪২-৫৪৫ দেখ]

২৩৫। গণতন্ত্রের অর্থ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ৫৪৭-৫৪৮ দেখ]

২৩৬। শাসনব্যবস্থার একটি রূপ হিসেবে গণতন্ত্রের প্রকৃতি আলোচনা কর। ইহা কি প্রকৃত গণতন্ত্র? [পৃ. ৫৫১-৫৫৩ দেখ]

২৩৭। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। [পৃ. ৫৫৬-৫৬১ দেখ]

২৩৮। উদারনৈতিক গণতন্ত্র কি প্রকৃত গণতন্ত্র? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। [পৃ. ৫৫৬-৫৬৪ দেখ]

২৩৯। বর্তমান দিনে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ৫৬৯-৫৭৩ দেখ]

২৪০। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। [পৃ. ৫৭৬-৫৭৮ দেখ]

২৪১। উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা কর। [পৃ. ৫৫৬-৫৬১ এবং ৫৭৬-৫৭৮ দেখ]

২৪২। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার গুণাগুণ আলোচনা কর। [পৃ. ৫৬৪-৫৬৯ দেখ]

২৪৩। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গণতন্ত্র বলতে কি বোঝায়? এদের গুণাগুণ আলোচনা কর। [পৃ. ৫৪৮-৫৫১ এবং ৫৬৪-৫৬৯ দেখ]

২৪৪। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার গুণাগুণ আলোচনা কর। [পৃ. ৫৬৪-৫৬৯ দেখ]

২৪৫। গণতন্ত্রের সাফল্যের অপরিহার্য শর্তগুলি আলোচনা কর। [পৃ. ৫৭৩-৫৭৫ দেখ]

২৪৬। গণতন্ত্র বলতে কি বোঝ? গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কি? [পৃ. ৫৪৭-৫৪৮ এবং ৫৭৮-৫৮০ দেখ]

২৪৭। 'গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ছাড়া পূর্ণ হয় না।'—আলোচনা কর। [পৃ. ৩৬৬-৩৬৮ দেখ]

২৪৮। 'সমাজতন্ত্র উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বিরোধিতা করে না, বরং তাকে পরিপূর্ণতা দান করে।'—আলোচনা কর। [পৃ. ৩৬৬-৩৬৮ দেখ]

২৪৯। একনায়কতন্ত্র বলতে কি বোঝ? বিভিন্ন প্রকার একনায়কতন্ত্র সম্পর্কে যা জান লেখ। [পৃ. ৫৮০ এবং ৫৮১-৫৮২ দেখ]

২৫০। একনায়কতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। এর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। [পৃ. ৫৮০ এবং ৫৮২-৫৮৪ দেখ]

২৫১। একনায়কতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। কিভাবে তুমি এর শ্রেণীবিভাগ করবে? [পৃ. ৫৮০ এবং ৫৮১-৫৮২ দেখ]

২৫২। একনায়কতন্ত্রের গুণাগুণ আলোচনা কর। [পৃ. ৫৮৪-৫৮৬ দেখ]

২৫৩। উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। এদের মধ্যে কোন্‌টিকে তুমি পছন্দ কর এবং কেন কর? [পৃ. ৫৮৬-৫৮৯ দেখ]

২৫৪। ফ্যাসিবাদের উদ্ভব কিভাবে হয়? ফ্যাসিবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর। কিভাবে তুমি এর সমালোচনা করবে? [পৃ. ৫৮৯-৫৯৪ দেখ]

২৫৫। রাজনীতিক দলের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনীতিক দলের ভূমিকার মূল্যায়ন কর। [ক. বি. ১৯৮০]
[পৃ. ৫৯৫-৫৯৭ এবং ৫৯৮-৬০১ দেখ]

২৫৬। রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। আধুনিক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী সম্বন্ধে যা জান লেখ।
[পৃ. ৫৯৫-৫৯৭ এবং ৫৯৮-৬০১ দেখ]

২৫৭। রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। দলীয় ব্যবস্থার গুণাগুণ আলোচনা কর। [পৃ. ৫৯৫-৫৯৭ এবং ৬০১-৬০৬ দেখ]

২৫৮। একদলীয় রাষ্ট্রে গণতন্ত্র থাকতে পারে কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। [পৃ. ৬২২-৬২৪ দেখ]

২৫৯। একদলীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। এর গুণাগুণ আলোচনা কর।
[পৃ. ৬১২-৬১৩ এবং ৬১৬-৬১৮ দেখ]

২৬০। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বলতে কি বোঝ ? এর প্রকৃতি এবং গুণাগুণ বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ৬১৪-৬১৫ এবং ৬১৮-৬২০ দেখ]

২৬১। বহুদলীয় ব্যবস্থার অর্থ কি ? এর সুবিধা-অসুবিধাগুলি আলোচনা কর। [পৃ. ৬১৫-৬১৬ এবং ৬২০-৬২২ দেখ]

২৬২। বহুদলীয় ব্যবস্থার উপযোগিতা ও অপকারিতা বর্ণনা কর। [পৃ. ৬২০-৬২২ দেখ]

২৬৩। রাজনৈতিক দলের প্রকৃতি ও কার্যাবলী সম্বন্ধে মার্কসীয় অভিমত ব্যাখ্যা কর। [পৃ. ৬০৭-৬১২ দেখ]

২৬৪। রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী সম্বন্ধে মার্কসবাদীদের অভিমত বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ৬০৭-৬১২ দেখ]

২৬৫। স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর সংজ্ঞা নির্দেশ কর। কিভাবে তুমি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ করবে ? [পৃ. ৬২৪-৬২৬ দেখ]

২৬৬। স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বলতে কি বোঝ ? স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ভূমিকা ও কার্যাবলী সম্বন্ধে যা জান লেখ। [পৃ. ৬২৪-৬২৫ এবং ৬২৬-৬২৮ দেখ]

২৬৭। স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বলতে কি বুঝায় ? কিভাবে তারা সরকারের সিদ্ধান্তসমূহকে প্রভাবিত করে ? [পৃ. ৬২৪-৬২৫ এবং ৬২৬-৬২৮ দেখ]

২৬৮। স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর সংজ্ঞা নির্দেশ কর। রাজনৈতিক দল ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর। [পৃ. ৬২৪-৬২৫ এবং ৬৩১-৬৩৩ দেখ]

২৬৯। স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রভাব কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল তা আলোচনা কর। [পৃ. ৬২৮-৬৩১ দেখ]

২৭০। সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার বলতে কি বোঝায় ? এর পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। [পৃ. ৬৩৫-৬৩৯ দেখ]

২৭১। সব নাগরিকের কি ভোটাধিকার থাকা উচিত ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। [পৃ. ৬৩৫-৬৩৯ দেখ]

২৭২। স্ত্রীলোকের ভোটাধিকারের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর। [পৃ. ৬৩৯-৬৪০ দেখ]

২৭৩। প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও পরোক্ষ নির্বাচনের গুণাগুণ আলোচনা কর। কোন্ নির্বাচন পদ্ধতিটি তোমার মতে গ্রহণযোগ্য ? [পৃ. ৬৪৩-৬৪৬ দেখ]

২৭৪। 'অন্যান্য জন-কর্তব্যের মতই ভোটদানের কর্তব্য জনসমক্ষে সম্পাদিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।'—তুমি কি এই অভিমত সমর্থন কর ? তোমার বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন কর। [পৃ. ৬৪৭-৬৪৯ দেখ]

২৭৫. প্রকাশ্য ভোট-পদ্ধতি এবং গোপন ভোট-পদ্ধতির আপেক্ষিক গুণাগুণ আলোচনা কর। তুমি কোন্‌টিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে কর এবং কেন ? [পৃ. ৬৪৭-৬৪৯ দেখ]

২৭৬। একাধিক ভোটদান পদ্ধতির সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। [পৃ. ৬৪৯-৬৫০ দেখ]

২৭৭। কিভাবে তুমি প্রতিনিধিত্বের আধুনিক তত্ত্বগুলির শ্রেণীবিভাগ করবে? আধুনিক প্রতিনিধিত্বের তত্ত্বগুলির গুণাগণ আলোচনা কর। কোনটি তোমার মতে গ্রহণযোগ্য? [পৃ. ৬৫০-৬৫৬ দেখ]

২৭৮। প্রতিনিধিত্বের উদারনৈতিক তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। তুমি কিভাবে এই তত্ত্বের সমালোচনা করবে? [পৃ. ৬৫২-৬৫৪ দেখ]

২৭৯। সমষ্টিবাচক প্রতিনিধিত্বের তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। তুমি কি এই মতবাদ সমর্থন কর? [পৃ. ৬৫৪-৬৫৬ দেখ]

২৮০। প্রতিনিধিত্বের উদারনৈতিক এবং সমষ্টিবাচক তত্ত্বের মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা কর। তোমার মতে কোনটি গ্রহণযোগ্য এবং কেন?

[পৃ. ৬৫২-৬৫৬ দেখ]

২৮১। আধুনিক রাষ্ট্রে ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্ব ও কর্মগত প্রতিনিধিত্বের পারস্পরিক গুণাগুণ আলোচনা কর। [ক. বি., ১৯৮০]

[পৃ. ৬৫৬-৬৫৯ দেখ]

২৮২। আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব ও পেশাগত প্রতিনিধিত্বের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর। এদের মধ্যে কোনটিকে তুমি পছন্দ কর এবং কেন কর?

[পৃ. ৬৫৬-৬৫৯ দেখ]

২৮৩। আইনসভায় সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনীয়তা কি? সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা কর।

[পৃ. ৬৫৯-৬৬৫ দেখ]

২৮৪। আইনসভায় সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের জন্য যে সব পদ্ধতির কথা বলা হয়ে থাকে তাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। [পৃ. ৬৫৯-৬৬৫ দেখ]

২৮৫। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতি বিশ্লেষণ কর এবং এর সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা কর। [পৃ. ৬৬২-৬৬৭ দেখ]

২৮৬। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের ব্যাখ্যা কর।

[পৃ. ৬৬২-৬৬৭ দেখ]

২৮৭। তোমার মতে নির্বাচন প্রার্থীর সঙ্গে নির্বাচন-কেন্দ্রের ভোটদাতাদের কি সম্পর্ক হওয়া উচিত? তোমার যুক্তিগুলি বিস্তারিতভাবে দাও।

[পৃ. ৬৬৭-৬৭০ দেখ]

২৮৮। নির্বাচকমণ্ডলীর সঙ্গে প্রতিনিধির সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা কর।

[পৃ. ৬৬৭-৬৭০ দেখ]

২৮৯। আধুনিক গণতন্ত্রে কি কি পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচকগণ তাদের প্রতিনিধিদের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারে? [পৃ. ৬৭০-৬৭২ দেখ]

২৯০। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের গুণাগুণ আলোচনা কর।
[পৃ. ৬৭২-৬৭৪ দেখ]

২৯১। জনমত বলতে তুমি কি বোঝ? উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনমতের প্রকৃতি ও গুরুত্ব আলোচনা কর।
[পৃ. ৬৭৫-৬৭৬ এবং ৬৭৮-৬৮০ দেখ]

২৯২। জনমতের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থায় এর গুরুত্ব কি?
[পৃ. ৬৭৫-৬৮০ দেখ]

২৯৩। জনমতের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনমতের প্রকৃতি ও ভূমিকা আলোচনা কর। [পৃ. ৬৭৫-৬৭৬ এবং ৬৭৮-৬৮২ দেখ]

২৯৪। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে কি প্রকৃত জনমত গঠিত ও প্রকাশিত হতে পারে? [পৃ. ৬৭৮-৬৮১ দেখ]

২৯৫। জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থায় জনমতের গুরুত্ব নির্দেশ কর। জনমত গঠনের মাধ্যমগুলি কি কি? [পৃ. ৬৭৮-৬৮০ এবং ৬৮৪-৬৮৮ দেখ]

২৯৬। জনমতের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। প্রকৃত জনমত গঠনের শর্তাবলী কি কি?
[পৃ. ৬৭৫-৬৭৬ এবং ৬৮২-৬৮৪ দেখ]

২৯৭। কিভাবে জনমত গঠিত ও প্রকাশিত হতে পারে? [পৃ. ৬৮৪-৬৮৮ দেখ]

২৯৮। আধুনিক গণতন্ত্রে জনমত গঠনের মাধ্যমগুলি কি কি? উদারনৈতিক গণতন্ত্রে প্রকৃত জনমত কি গঠিত ও প্রকাশিত হতে পারে?
[পৃ. ৬৮৪-৬৮৮ দেখ]

॥ সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী ॥

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। [পৃ. ৩-৫ দেখ]

২। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে কেন উদ্দেশ্যমূলক ও বাস্তব বিশ্লেষণমূলক বিজ্ঞান বলা হয় ?] [পৃ. ৮-৯ দেখ]

৩। আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কি বলা হয় ? [পৃ. ৯ দেখ]

৪। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে মার্কসবাদীদের অভিমত কি ? [পৃ. ৯-১০ দেখ]

৫। বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর শ্রেণীবিভাজন কিভাবে করা হয় ? [পৃ. ১০-১১ দেখ]

৬। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগুলি উল্লেখ কর। [পৃ. ১৫ দেখ]

৭। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার দার্শনিক পদ্ধতিটি কি ? [পৃ. ১৫-১৬ দেখ]

৮। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার দার্শনিক পদ্ধতি ও তার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা কর। [পৃ. ১৫-১৬ দেখ]

৯। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার সমাজতত্ত্বমূলক পদ্ধতির প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ২০-২১ দেখ]

১০। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার মনোবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতির স্বরূপ বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ১৯-২০ দেখ]

১১। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার তুলনামূলক পদ্ধতির স্থান নিরূপণ কর। [পৃ. ১৭-১৮ দেখ]

১২। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার ঐতিহাসিক পদ্ধতি কি ? [পৃ. ১৬-১৭ দেখ]

১৩। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার ঐতিহাসিক পদ্ধতির কি কোনও সীমাবদ্ধতা আছে ? [পৃ. ১৬-১৭ দেখ]

১৪। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতিটির স্বরূপ বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ২১-২২ দেখ]

১৫। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতির কি কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে ? [পৃ. ২১-২২ দেখ]

১৬। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীর কি কোনও সীমাবদ্ধতা আছে ? [পৃ. ৪১-৪২ দেখ]

১৭। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ? [পৃ. ৪৫-৪৭ দেখ]

১৮। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনায় আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি কি কি ? [পৃ. ৪৭-৫০ দেখ]

১৯। রাজনৈতিক ব্যবস্থার 'উপকরণ' কাঠামো কি দিয়ে গঠিত হয় ? [পৃ. ৫১ দেখ]

২০। রাজনৈতিক ব্যবস্থার 'উপপাদ' বলতে কি বোঝায় ? [পৃ. ৫২ দেখ]

২১। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় 'তথ্য ও অভিজ্ঞতা প্রেরক পথে'র কাজ কি ? [পৃ. ৫২ দেখ]

২২। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনায় কাঠামো-কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় কি ? [পৃ. ৫৭ দেখ]

২৩। রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন কাঠামোর পরিস্ফুট এবং অপরিস্ফুট কার্য বলতে কি বোঝায় ? [পৃ. ৫৯ দেখ]

২৪। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনায় গোষ্ঠীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় কি ? [পৃ. ৬২-৬৩ দেখ]

২৫। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে সমাজের 'ভিত্' এবং 'ইমারত' কাকে বলে ? [পৃ. ৬৬ দেখ]

২৬। সমাজের ক্রমবিবর্তনে অর্থনীতির কি কোনও ভূমিকা আছে ? [পৃ. ৬৬-৬৭ দেখ]

২৭। মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীর কি কোনও পার্থক্য আছে ? [পৃ. ৬৮-৬৯ দেখ]

২৮। মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর কি কোনও পার্থক্য আছে ? [পৃ. ৬৯ দেখ]

২৯। মানবের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে কি শ্রমের কোনও ভূমিকা আছে ? [পৃ. ৮১ দেখ]

৩০। মনুষ্য সমাজ ও পশু সমাজের মধ্যে কি কোনও মৌলিক পার্থক্য রয়েছে ? [পৃ. ৮১ দেখ]

৩১। 'সমাজ' বলতে কি বোঝায় ? [পৃ. ৮২ দেখ]

৩২। সমাজের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর। [পৃ. ৮২ দেখ]

৩৩। মার্কসবাদীরা সমাজকে কি দৃষ্টিতে দেখেন ? [পৃ. ৮৩ দেখ]

৩৪। সমাজের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক পরিবেশের কি কোনও প্রভাব রয়েছে ? [পৃ. ৮৪ দেখ]

৩৫। বন্যযুগের বৈশিষ্ট্য কি ? [পৃ. ৮৫-৮৬ দেখ]

৩৬। বর্বরযুগের বৈশিষ্ট্য কি ? [পৃ. ৮৬-৮৭ দেখ]

৩৭। জনযুগের বৈশিষ্ট্য কি ? [পৃ. ৮৬-৮৭ দেখ]

৩৮। পিতৃসত্তা যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ? [পৃ. ৮৭ দেখ]
৩৯। সমাজে শ্রেণীভেদের উৎপত্তি কখন ঘটে ? [পৃ. ৮৭-৮৮ দেখ]
৪০। সভ্য সমাজের বৈশিষ্ট্য কি ? [পৃ. ৮৮-৮৯ দেখ]
৪১। মার্কসবাদীরা কি ব্যক্তিকে উপেক্ষা করেন ? [পৃ. ৯১ দেখ]
৪২। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে কি কোনও সম্পর্ক আছে ? [পৃ. ৮৯-৯০ দেখ]
৪৩। সব সমাজেই কি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সমান বিকাশ ঘটে ? [পৃ. ৯০-৯১ দেখ]
৪৪। জীবদেহ ও সমাজদেহ কি অভিন্ন ? [পৃ. ৯৫ দেখ]
৪৫। রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে কি কোনও পার্থক্য আছে ? [পৃ. ৯৬-৯৭ দেখ]
৪৬। রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে কি কোনও সম্পর্ক আছে ? [পৃ. ৯৭-৯৮ দেখ]
৪৭। আদিম সাম্যবাদী সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ? [পৃ. ১০১ দেখ]
৪৮। সর্বপ্রথম কোন্ সমাজে এবং কিভাবে শ্রেণী-শোষণের সূত্রপাত ঘটে ?
[পৃ. ১০২-১০৩ দেখ]
৪৯। শ্রেণীশোষণের হাতিয়ার হিসেবে কখন এবং কিভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটে ?
[পৃ. ১০৪ দেখ]
৫০। দাস-সমাজের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ? [পৃ. ১০৫ দেখ]
৫১। সামন্ত-সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।
[পৃ. ১০৯ দেখ]
৫২। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ? [পৃ. ১১০ দেখ]
৫৩। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার উৎপাদন-সম্পর্ক কিরূপ ?
[পৃ. ১১৩-১১৪ দেখ]
৫৪। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রেণী-শোষণ কিভাবে চলে ? [পৃ. ১১৪-১১৫ দেখ]
৫৫। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ? [পৃ. ১১৫ দেখ]
৫৬। উদ্বৃত্ত মূল্য বলতে কি বোঝায় ? [পৃ. ১১৬-১১৭ দেখ]
৫৭। পুঁজিবাদী সমাজে শ্রেণী-দ্বন্দ্বের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ১১৭ দেখ]
৫৮। সমাজতান্ত্রিক সমাজে কি শ্রেণী-দ্বন্দ্বের অবস্থিতি থাকে ?
[পৃ. ১১৯-১২০ দেখ]
৫৯। সমাজতান্ত্রিক সমাজে কি রাষ্ট্রের কোনও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ?
[পৃ. ১২০-১২১ দেখ]
৬০। সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য কি ? [পৃ. ১২১ দেখ]
৬১। সাম্যবাদী সমাজের প্রকৃতি কেমন হবে ? [পৃ. ১২১-১২২ দেখ]
৬২। সমাজতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে কি সাম্যবাদী সমাজের কোনও পার্থক্য আছে ?
[পৃ. ১২২-১২৩ দেখ]
৬৩। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে জৈব মতবাদীদের প্রধান বক্তব্য কি ?
[পৃ. ১২৪-১২৫ দেখ]

৬৪। জৈব মতবাদের কি কোনও গুরুত্ব আছে ? [পৃ. ১২৮-১২৯]

৬৫। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে স্পেনসারের অভিমত ব্যাখ্যা কর। [পৃ. ১২৬ দেখ]

৬৬। কয়েকজন আদর্শবাদী দার্শনিকের নাম কর। [পৃ. ১২৯ দেখ]

৬৭। হেগেল রাষ্ট্রকে 'সর্বদোষমুক্ত বুদ্ধিমত্তা' (perfected rationality) বলে বর্ণনা করেছেন কেন ? [পৃ. ১৩০-১৩১ দেখ]

৬৮। মার্কসবাদীরা রাষ্ট্রকে শ্রেণী-শোষণের হাতিয়ার বলেছেন কেন ? [পৃ. ১৩৯-১৪০ দেখ]

৬৯। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ১৪০ দেখ]

৭০। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রকৃতি কি ? [পৃ. ১৪১ দেখ]

৭১। রাষ্ট্রের অবলুপ্তি সম্পর্কে মার্কসবাদীদের অভিমত কি ? [পৃ. ১৪১-১৪২ দেখ]

৭২। রাষ্ট্র কি প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের কল্যাণ সাধনের এজেন্ট ? [পৃ. ১৩৮-১৩৯ দেখ]

৭৩। মার্কসবাদীদের মতে রাষ্ট্রের বিলুপ্তি কখন ঘটবে ? [পৃ. ১৪১-১৪২ দেখ]

৭৪। মার্কসবাদ কি অধিবিদ্যামূলক মতবাদ ? [পৃ. ১৪২ দেখ]

৭৫। সার্বভৌমিকতা বলতে কি বোঝ ? [পৃ. ১৪৪ দেখ]

৭৬। আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা বলতে কি বোঝায় ? [পৃ. ১৪৫ দেখ]

৭৭। নামসর্বস্ব সার্বভৌমিকতা বলতে কি বোঝ ? [পৃ. ১৫২ দেখ]

৭৮। প্রকৃত সার্বভৌমিকতার অর্থ কি ? [পৃ. ১৫২ দেখ]

৭৯। আইনানুমোদিত সার্বভৌমিকতার অর্থ কি ? [পৃ. ১৫২ দেখ]

৮০। বাস্তব সার্বভৌমিকতা বলতে কি বোঝায় ? [পৃ. ১৫২-১৫৩ দেখ]

৮১। আইনসংগত সার্বভৌমিকতা বলতে কি বোঝ ? [পৃ. ১৫৩-১৫৪ দেখ]

৮২। রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা বলতে কি বোঝ ? [পৃ. ১৫৪-১৫৫ দেখ]

৮৩। রাষ্ট্রের প্রকৃতি-বিষয়ক মতবাদ হিসেবে আদর্শবাদের গুরুত্ব পর্যালোচনা কর। [পৃ. ১৩৩-১৩৪ দেখ]

৮৪। কিভাবে তুমি রাষ্ট্রের প্রকৃতি-বিষয়ক জৈব মতবাদের সমালোচনা করবে ? [পৃ. ১২৭-১২৮ দেখ]

৮৫। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে আদর্শবাদীদের অভিমত কি ? [পৃ. ১৩০-১৩১ দেখ]

৮৬। তুমি কিভাবে রাষ্ট্রের প্রকৃতি-বিষয়ক আদর্শবাদের সমালোচনা করবে ? [পৃ. ১৩১-১৩৩ দেখ]

৮৭। সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্যগুলি কি ? [পৃ. ১৪৬-১৪৯ দেখ]

৮৮। আইনসঙ্গত ও রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর।
[পৃ. ১৫৩-১৫৫ দেখ]

৮৯। আইনানুমোদিত ও বাস্তব সার্বভৌমিকতার পার্থক্য নিরূপণ কর।
[পৃ. ১৫২-১৫৩ দেখ]

৯০। জনগণের সার্বভৌমিকতার অর্থ কি? [পৃ. ১৫৫-১৫৬ দেখ]

৯১। একত্ববাদ বলতে কি বোঝ? [পৃ. ১৫৭-১৫৮ দেখ]

৯২। বোঁদার সার্বভৌমিকতা তত্ত্বটি কি? [পৃ. ১৫৮ দেখ]

৯৩। সার্বভৌমিকতার অস্টিন-প্রদত্ত সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ১৫৯-১৬০ দেখ]

৯৪। অস্টিনের মতে সার্বভৌমিকতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?
[পৃ. ১৬০ দেখ]

৯৫। অস্টিন কি রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতাকে উপেক্ষা করেছেন?
[পৃ. ১৬২ দেখ]

৯৬। অস্টিনের সার্বভৌমিকতা তত্ত্বটি আন্তর্জাতিকতাবাদীদের দ্বারা কিভাবে সমালোচিত হয়? [পৃ. ১৬৩ দেখ]

৯৭। বহুত্ববাদী দার্শনিকগণ কোন্ কোন্ দিক থেকে একত্ববাদের সমালোচনা করেন? [পৃ. ১৬৪-১৬৭ দেখ]

৯৮। সীমাবদ্ধ সার্বভৌমিকতার তত্ত্বটি আলোচনা কর। [পৃ. ১৭২-১৭৩ দেখ]

৯৯। আন্তর্জাতিকতাবাদীরা কিভাবে একত্ববাদের সমালোচনা করেন?
[পৃ. ১৬৬-১৬৭ দেখ]

১০০। সংবিধান এবং সাংবিধানিক আইন কি সার্বভৌম ক্ষমতাকে সঙ্কুচিত করে?
[পৃ. ১৭৪ দেখ]

১০১। রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা কি ধর্ম, জনমত ইত্যাদির দ্বারা সীমাবদ্ধ?
[পৃ. ১৭৩-১৭৪ দেখ]

১০২। আন্তর্জাতিক আইন কি রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে? [পৃ. ১৭৪-১৭৫ দেখ]

১০৩। মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে জনগণের সার্বভৌমিকতার প্রকৃতি কি?
[পৃ. ১৭৮-১৭৯ দেখ]

১০৪। পুঁজিবাদী সমাজে জনগণের কি কোনও সার্বভৌমিকতা থাকে?
[পৃ. ১৭৯-১৮০ দেখ]

১০৫। বুর্জোয়া যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতা কাদের হস্তে ন্যস্ত থাকে?
[পৃ. ১৮০-১৮১ দেখ]

১০৬। রুশো 'সাধারণ ইচ্ছা' বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন?
[পৃ. ১৮১-১৮২ দেখ]

১০৭। জাতীয় জনসমাজ বলতে কি বোঝায়? [পৃ. ১৮৭-১৮৮ দেখ]

১০৮। যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর করার জন্য কি রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার অবসান প্রয়োজন? [পৃ. ১৮৪-১৮৫ দেখ]
১০৯। 'জাতি'র সংজ্ঞা নির্দেশ কর। [পৃ. ১৮৮ দেখ]
১১০। রাষ্ট্র ও জাতির মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে? [পৃ. ১৮৯ দেখ]
১১১। জাতীয় জনসমাজ গঠনের উপাদানগুলি কি কি? [পৃ. ১৮৯-১৯২ দেখ]
১১২। আদর্শ জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ১৯৫-১৯৬ দেখ]
১১৩। আধুনিককালে যুদ্ধের কারণ কি একচেটিয়া পুঁজিবাদ? [পৃ. ১৯৮ দেখ]
১১৪। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ১৯৮-১৯৯ দেখ]
১১৫। জাতীয় জনসমাজের অপরিহার্য উপাদানগুলি কি? [পৃ. ১৮৯-১৯২ দেখ]
১১৬। জাতীয়তাবাদের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। [পৃ. ১৯৬-১৯৭ দেখ]
১১৭। বিকৃত জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি কি? [পৃ. ১৯৭-১৯৮ দেখ]
১১৮। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলতে কি বোঝায়? [পৃ. ১৯৯ দেখ]
১১৯ : আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। [পৃ. ১৯৯-২০০ দেখ]
১২০। আন্তর্জাতিকতার অর্থ কি? [পৃ. ২০৪ দেখ]
১২১। আন্তর্জাতিকতার কি কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে? [পৃ. ২০৪-২০৫ দেখ]
১২২। সাম্রাজ্যবাদ বলতে কি বোঝায়? [পৃ. ২১২ দেখ]
১২৩। লেনিন সাম্রাজ্যবাদকে কেন ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ বলে বর্ণনা করেছেন? [পৃ. ২১৭ দেখ]
১২৪। লেনিন সাম্রাজ্যবাদকে কেন মৃতপ্রায় পুঁজিবাদ বলে বর্ণনা করেছেন? [পৃ. ২১৭ দেখ]
১২৫। 'ডলার সাম্রাজ্যবাদ' বলতে কি বোঝ? [পৃ. ২১৭ দেখ]
১২৬। এশিয়ার বুকে কি ডলার সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব রয়ে ? [পৃ. ২২৬ দেখ]
১২৭। বিশ্বশান্তির প্রধান শত্রু কে? [পৃ. ২৩৫-২৩৬ দেখ]
১২৮। বিশ্বশান্তির পথে 'ঠান্ডা লড়াই' কি অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক? [পৃ. ২৩৪ ২৩৫ দেখ]
১২৯। 'শান্তির জন্য সম্মিলিত হচ্ছি প্রস্তাব'টি কি? [পৃ. ২৩৯ দেখ]
১৩০। উইলসন এবং বার্কার-প্রদত্ত আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। [পৃ. ২৪৫ দেখ]
১৩১। আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। [পৃ. ২৪৪-২৪৫ দেখ]
১৩২। মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে আইনের প্রকৃতি কি? [পৃ. ২৪৫-২৪৬ দেখ]
১৩৩। আইন ও নৈতিক বিধির মধ্যে পা 'ক্য কি? [পৃ. ২৬৬-২৬৭ দেখ]
১৩৪। আইন ও নৈতিক বিধির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা কর। [পৃ. ২৬৫-২৬৮ দেখ]
১৩৫। আইনের বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি? [পৃ. ২৪৫ দেখ]

১৩৬। আইন সম্পর্কে মার্কসবাদীদের অভিমত কি? [পৃ. ২৪৫-২৪৬ দেখ]
১৩৭। আইন সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য মতবাদগুলি কি কি? [পৃ. ২৫০ দেখ]
১৩৮। আইনের সমাজবিজ্ঞানমূলক মতবাদের প্রচারক কয়েকজন সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর নাম কর। [পৃ. ২৫৬ দেখ]
১৩৯। আন্তর্জাতিক আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। [পৃ. ২৬৮ দেখ]
১৪০। আন্তর্জাতিক আইনকে প্রধানতঃ কয় ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে? [পৃ. ২৬৯ দেখ]
১৪১। পুঁজিবাদী যুগে আন্তর্জাতিক আইনের প্রকৃতি কি? [পৃ. ২৭০ দেখ]
১৪২। আন্তর্জাতিক আইনের প্রধান উৎসগুলি কি কি? [পৃ. ২৭১ দেখ]
১৪৩। অধিকারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। [পৃ. ২৭৭ দেখ]
১৪৪। অধিকার সম্পর্কে ল্যাস্কির বক্তব্য কি? [পৃ. ২৭৭ দেখ]
১৪৫। অধিকার সম্বন্ধে গ্রীন ও ল্যাস্কির ধারণা বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ২৭৬-২৭৭ দেখ]
১৪৬। স্বাভাবিক অধিকারের প্রকৃতি কি? [পৃ. ২৮৫ দেখ]
১৪৭। অধিকার কি একটি আইনগত ধারণা? [পৃ. ২৭৬ দেখ]
১৪৮। অধিকার কয় প্রকারের এবং কি কি? [পৃ. ২৮৮ দেখ]
১৪৯। রাজনৈতিক অধিকার বলতে কি বোঝ? [পৃ. ২৮০ দেখ]
১৫০। রাজনৈতিক অধিকারের কয়েকটি উদাহরণ দাও। [পৃ. ২৮০-২৮১ দেখ]
১৫১। অর্থনৈতিক অধিকার বলতে কি বোঝায়? [পৃ. ২৮২-২৮৩ দেখ]
১৫২। অর্থনৈতিক অধিকারের কয়েকটি উদাহরণ দাও। [পৃ. ২৮৩-২৮৪ দেখ]
১৫৩। স্বাভাবিক অধিকার বলতে কি বোঝায়? [পৃ. ২৮৫ দেখ]
১৫৪। অধিকার সম্বন্ধে আইনগত মতবাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় কি? [পৃ. ২৮৮ দেখ]
১৫৫। সামন্ত সমাজে কারা অধিকার ভোগ করত? [পৃ. ২৯৪ দেখ]
১৫৬। পুঁজিবাদী সমাজে কারা অধিকার ভোগ করে? [পৃ. ২৯৪-২৯৬ দেখ]
১৫৭। সমাজতান্ত্রিক সমাজে কারা অধিকার ভোগ করে? [পৃ. ২৯৬ দেখ]
১৫৮। সামন্ত সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হোত কি? [পৃ. ২৯৮ দেখ]
১৫৯। পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে পবিত্র বলে মনে করা হয় কেন? [পৃ. ২৯৮-২৯৯ দেখ]
১৬০। সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের প্রকৃত স্বরূপ কি? [পৃ. ২৯৯-৩০০ দেখ]
১৬১। রাষ্ট্র কি নাগরিকদের কাছে শর্তহীন আনুগত্য দাবি করতে পারে? [পৃ. ৩০৪ দেখ]
১৬২। স্বাধীনতা বলতে কি বোঝায়? [পৃ. ৩১১ দেখ]
১৬৩। রাজনৈতিক স্বাধীনতার উদাহরণ দাও। [পৃ. ৩১৬ দেখ]

১৬৪। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উদাহরণ দাও। [পৃ. ৩১৬-৩১৭ দেখ]

১৬৫। স্বাধীনতা সম্পর্কে বুর্জোয়া মতবাদের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? [পৃ. ৩১৭ দেখ]

১৬৬। স্বাধীনতার প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। [পৃ. ৩১০-৩১১ দেখ]

১৬৭। স্বাধীনতা সম্পর্কে মার্কসবাদী ধারণা ব্যাখ্যা কর। [পৃ. ৩২০-৩২১ দেখ]

১৬৮। আধুনিক রাষ্ট্রে স্বাধীনতার রক্ষাকবচগুলি কি কি? [পৃ. ৩২২-৩২৪ দেখ]

১৬৯। আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে সম্পর্ক কি? [পৃ. ৩২৫-৩২৬ দেখ]

১৭০। মার্কসবাদীরা কি ধরনের স্বাধীনতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন? [পৃ. ৩২০ দেখ]

১৭১। বুর্জোয়া সমাজে স্বাধীনতার প্রকৃতি কি? [পৃ. ৩২৭-৩২৯ দেখ]

১৭২। সমাজতান্ত্রিক সমাজে স্বাধীনতার প্রকৃতি কি? [পৃ. ৩২৯-৩৩০ দেখ]

১৭৩। সাম্য বলতে কি বোঝ? [পৃ. ৩৩০-৩৩১ দেখ]

১৭৪। মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে সাম্য বলতে কি বোঝায়? [পৃ. ৩৩১ দেখ]

১৭৫। সাম্য ও স্বাধীনতা কি একে অপরের পরিপূরক? [পৃ. ৩৩১-৩৩২ দেখ]

১৭৬। সাম্য কয় প্রকার এবং কি কি? [পৃ. ৩৩৩-৩৩৫ দেখ]

১৭৭। সামাজিক সাম্য বলতে কি বোঝ? [পৃ. ৩৩৪ দেখ]

১৭৮। অর্থনৈতিক সাম্য বলতে কি বোঝ? [পৃ. ৩৩৫ দেখ]

১৭৯। পুঁজিবাদী সমাজে সাম্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ৩৩৬-৩৩৭ দেখ]

১৮০। সমাজতান্ত্রিক সমাজে সাম্যের প্রকৃতি কি? [পৃ. ৩৩৭ দেখ]

১৮১। রাষ্ট্রের অবশ্যপালনীয় এবং ইচ্ছাধীন কার্য বলতে কি বোঝায়? [পৃ. ৩৪২-৩৪৩ দেখ]

১৮২। শ্রেণীবৈষম্যমূলক সমাজে কি রাষ্ট্র নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে? [পৃ. ৩৪৪ দেখ]

১৮৩। রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে কি কি প্রধান মতবাদ রয়েছে? [পৃ. ৩৪৪ দেখ]

১৮৪। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থক ও প্রচারক কয়েকজন দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদের নাম কর। [পৃ. ৩৪৪-৩৪৫ দেখ]

১৮৫। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় কি? [পৃ. ৩৪৫ দেখ]

১৮৬। রাষ্ট্রের মৌলিক কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা কর। [পৃ. ৩৪৩-৩৪৪ দেখ]

১৮৭। রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে সমাজতন্ত্রীদের অভিমত কি? [পৃ. ৩৫৩-৩৫৪ দেখ]

১৮৮। সমাজতন্ত্রবাদের সপক্ষে যে কোন দুটি যুক্তি দেখাও। [পৃ. ৩৫৫-৩৫৬ দেখ]

১৮৯। আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি? [পৃ. ৩৫০ দেখ]

১৯০। আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দু'জন প্রচারকের নাম লেখ। [পৃ. ৩৫০ দেখ]

১৯১। বিভিন্ন প্রকার সমাজতন্ত্রবাদের নাম উল্লেখ কর। [পৃ. ৩৫৩ দেখ]

১৯২। সমাজতন্ত্রবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ? [পৃ. ৩৫৪-৩৫৫ দেখ]

১৯৩। সমাজতন্ত্রবাদ কি ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ চায়? [পৃ. ৩৫৫ দেখ]

১৯৪। জনকল্যাণকর রাষ্ট্র বলতে কি বোঝায় ? [পৃ. ৩৬১-৩৬২ দেখ]

১৯৫। উদারনৈতিক গণতন্ত্র কি সমাজতন্ত্রের পরিপূরক বলে বিবেচিত হতে পারে ? [পৃ. ৩৬৮ দেখ]

১৯৬। মার্কস ও এঙ্গেলসের উপর ফরাসী সমাজতন্ত্রীদের কি কোনও প্রভাব পড়েছিল ? [পৃ. ৩৭৪-৩৭৫ দেখ]

১৯৭। মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ কি ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রী ও অর্থনীতিবিদ্দের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন ? [পৃ. ৩৭৫ দেখ]

১৯৮। 'পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন' বলতে মার্কসবাদীরা কি বোঝাতে চান ? [পৃ. ৩৭৮ দেখ]

১৯৯। 'অস্বীকৃতির অস্বীকৃতি' বলতে কি বোঝায় ? [পৃ. ৩৭৮-৩৭৯ দেখ]

২০০। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের অর্থ কি ? [পৃ. ৩৮২ দেখ]

২০১। উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক বলতে কি বোঝায় ? [পৃ. ৩৮৩ দেখ]

২০২। 'শ্রেণী' বলতে কি বোঝ ? [পৃ. ৩৮৯ দেখ]

২০৩। 'বিপ্লব' বলতে কি বোঝায় ? [পৃ. ৪০০ দেখ]

২০৪। ইতিহাসে বুর্জোয়া বিপ্লবের কি কোনও গুরুত্ব আছে ? [পৃ. ৪০১ দেখ]

২০৫। বিপ্লবের বিষয়গত অবস্থা (objective conditions) বলতে কি বোঝ ? [পৃ. ৪০৩ দেখ]

২০৬। বিপ্লবের বিষয়ীগত অবস্থা (subjective conditions) বলতে কি বোঝায় ? [পৃ. ৪০৩-৪০৪ দেখ]

২০৭। বিপ্লব ও হিংসার মধ্যে কি কোনও পার্থক্য আছে ? [পৃ. ৪০৫-৪০৬ দেখ]

২০৮। লেনিনবাদ বলতে কি বোঝায় ? [পৃ. ৪১০-৪১১ দেখ]

২০৯। শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পর্কে লেনিন কি বলেছেন ? [পৃ. ৪১২ দেখ]

২১০। রাজনৈতিক দল সম্পর্কে লেনিনের অভিমত কি ? [পৃ. ৪১২ দেখ]

২১১। বিপ্লব সম্পর্কে লেনিনের অভিমত কি ? [পৃ. ৪১২-৪১৩ দেখ]

২১২। গণতন্ত্র সম্পর্কে লেনিন কি বলেছেন ? [পৃ. ৪১৩ দেখ]

২১৩। গণতান্ত্রিক সমাজবাদের সমর্থকরা কি উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চান ? [পৃ. ৪১৮ দেখ]

২১৪। রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী সম্পর্কে গান্ধীজীর অভিমত কি ? [পৃ. ৪২৭-৪২৮ দেখ]

২১৫। গান্ধীজীর কল্পিত 'রাষ্ট্রহীন গণতন্ত্রে'র স্বরূপ বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ৪২৮ দেখ]

২১৬। গান্ধীজী কি নৈরাজ্যবাদী ছিলেন ? [পৃ. ৪২৮-৪২৯ দেখ]
২১৭। গান্ধীজীর সর্বোদয়ের অর্থ কি ? [পৃ. ৪৩১ দেখ]
২১৮। গান্ধীজীর সর্বোদয় সমাজের ভিত্তি কি ? [পৃ. ৪৩২-৪৩৩ দেখ]
২১৯। ব্যাপক ও সংকীর্ণ অর্থে সংবিধান বলতে কি বোঝ ? [পৃ. ৪৩৬ দেখ]
২২০। লিখিত ও অলিখিত সংবিধান বলতে কি বোঝায় ? [পৃ. ৪৩৭ দেখ]
২২১। সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলতে কি বোঝ ?
[পৃ. ৪৩৭-৪৩৮ দেখ]
২২২। মৌলিক সংবিধান ও মৌলিকতা-বিহীন সংবিধান কাকে বলে ?
[পৃ. ৪৩৮ দেখ]
২২৩। নীতিসংবন্ধ ও নিরপেক্ষ সংবিধানের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর।
[পৃ. ৪৩৮ দেখ]
২২৪। বুর্জোয়া সংবিধান ও শ্রমিক শ্রেণীর সংবিধানের মধ্যে পার্থক্য কি ?
[পৃ. ৪৩৯ দেখ]
২২৫। লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।
[পৃ. ৪৩৯-৪৪০ দেখ]
২২৬। দুষ্পরিবর্তনীয় ও সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।
[পৃ. ৪৪৪-৪৪৫ দেখ]
২২৭। নমনীয় সংবিধান বলতে কি বোঝ ? [পৃ. ৪৩৭-৪৩৮ দেখ]
২২৮। রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায় ? [পৃ. ৪৮৯ দেখ]
২২৯। অ্যালমন্ড ও পাওয়েল রাজনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাজন কিভাবে করেছেন ?
[পৃ. ৪৮৯-৪৯০ দেখ]
২৩০। মোটামুটিভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে কয়টি ভাগে বিভক্ত করা যায় এবং কি কি ? [পৃ. ৪৯০-৫৯১ দেখ]
২৩১। উদারনৈতিক ব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর।
[পৃ. ৪৯১-৪৯২ দেখ]
২৩২। স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার চারটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর।
[পৃ. ৪৯৩ দেখ]
২৩৩। অ্যালান বল ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থার কি কি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন ? [পৃ. ৪৯৪-৪৯৫ দেখ]
২৩৪। সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর।
[পৃ. ৪৯৬-৪৯৭ দেখ]
২৩৫। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে-সব পার্থক্য রয়েছে সেগুলির মধ্যে যে-কোন দুটি পার্থক্যের উল্লেখ কর।
[পৃ. ৫০১-৫০২ দেখ]

২৩৬। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা বলতে কি বোঝায় ? [পৃ. ৪৫৫ দেখ]
২৩৭। রাষ্ট্র-সমবায় বলতে কি বোঝ ? [পৃ. ৪৫৯-৪৬০ দেখ]
২৩৮। যুক্তরাষ্ট্রে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের অবস্থিতি কি একান্ত অপরিহার্য ? [পৃ. ৪৫৭ দেখ]
২৩৯। ডাইসির মতে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দুটি অপরিহার্য শর্ত কি কি ? [পৃ. ৪৫৭-৪৫৮ দেখ]
২৪০। কয়েকটি রাষ্ট্র-সমবায়ের উদাহরণ দাও। [পৃ. ৪৫৯-৪৬০ দেখ]
২৪১। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বলতে কি বোঝায় ? [পৃ. ৪৫১-৪৫২ দেখ]
২৪২। ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ কি ? [পৃ. ৪৬৯ দেখ]
২৪৩। কেন্দ্রপ্রবণতা বলতে কি বোঝ ? [পৃ. ৪৭২ দেখ]
২৪৪। হোয়ারের মতে আধুনিক রাষ্ট্রে কেন্দ্রপ্রবণতার কারণগুলি কি ? [পৃ. ৪৭৩ দেখ]
২৪৫। এককেন্দ্রিক সরকার বলতে কি বোঝায় ? [পৃ. ৪৫১-৪৫২ দেখ]
২৪৬। এককেন্দ্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ? [পৃ. ৪৫২-৪৫৩ দেখ]
২৪৭। যুক্তরাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। [পৃ. ৪৫৫ দেখ]
২৪৮। এককেন্দ্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ? [পৃ. ৪৫২-৪৫৩ দেখ]
২৪৯। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয় শর্তাবলী কি কি ? [পৃ. ৪৫৭-৪৫৯ দেখ]
২৫০। এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। [পৃ. ৪৬১-৪৬৩ দেখ]
২৫১। আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রপ্রবণতার কারণ কি ? [পৃ. ৪৭৩ দেখ]
২৫২। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার বলতে কি বোঝ ? [পৃ. ৪৭৬ দেখ]
২৫৩। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ? [পৃ. ৪৭৬-৪৭৭ দেখ]
২৫৪। মন্ত্রিপরিষদ-পরিচালিত সরকারের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। [পৃ. ৪৮০-৪৮১ দেখ]
২৫৫। মন্ত্রিপরিষদ-পরিচালিত সরকারের সাফল্যের শর্তাবলী কি কি ? [পৃ. ৪৮৫-৪৮৬ দেখ]
২৫৬। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার এবং মন্ত্রিপরিষদ-পরিচালিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর। [পৃ. ৪৮৬-৪৮৮ দেখ]
২৫৭। আধুনিক আইনসভাগুলির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ কি ? [পৃ. ৫১১-৫১২ দেখ]
২৫৮। শাসনবিভাগের রাজনৈতিক অংশকে কয় ভাগে বিভক্ত করা যায় এবং কি কি ? [পৃ. ৫২৩ দেখ]
২৫৯। একক-পরিচালক বলতে কি বোঝায় ? [পৃ. ৫২৩-৫২৪ দেখ]
২৬০। বহু-পরিচালক বলতে কি বোঝায় ? [পৃ. ৫২৪-৫২৫ দেখ]

২৬১। একক-পরিচালকের ও বহু-পরিচালকের উদাহরণ দাও। [পৃ. ৫২৩-৫২৪ দেখ]

২৬২। নাম-সর্বস্ব শাসক বলতে কি বোঝ? উদাহরণসহ আলোচনা কর। [পৃ. ৫২৫ দেখ]

২৬৩। প্রকৃত শাসক বলতে কি বোঝায়? প্রকৃত শাসকের উদাহরণ দাও। [পৃ. ৫২৫ দেখ]

২৬৪। আমলাতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। [পৃ. ৫২৮-৫২৯ দেখ]

২৬৫। আমলাতন্ত্রের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর। [পৃ. ৫২৯ দেখ]

২৬৬। আমলাতন্ত্রকে প্রধানতঃ কয় ভাগে বিভক্ত করা যায় এবং কি কি? [পৃ. ৫৩০-৫৩১ দেখ]

২৬৭। আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার ক'টি উপায় রয়েছে এবং কি কি? [পৃ. ৫৩৬-৫৩৭ দেখ]

২৬৮। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে বিচারপতিরা কি প্রকৃতপক্ষে নিরপেক্ষ থাকেন? [পৃ. ৫৩৭-৫৩৮ দেখ]

২৬৯। বিচার-বিভাগীয় পর্যালোচনা বলতে কি বোঝ? [পৃ. ৫৪২-৫৪৩ দেখ]

২৭০। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলতে কি বোঝ? [পৃ. ৫৪৮ দেখ]

২৭১। পরোক্ষ গণতন্ত্রের অর্থ কি? [পৃ. ৫৫০ দেখ]

২৭২। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সাম্প্রতিক প্রবণতা কি? [পৃ. ৫৭২-৫৭৩ দেখ]

২৭৩। একনায়কতন্ত্র বলতে কি বোঝায়? [পৃ. ৫৮০ দেখ]

২৭৪। একনায়কতন্ত্রকে ক'ভাগে বিভক্ত করা যায় এবং কি কি? [পৃ. ৫৮১ দেখ]

২৭৫। ব্যক্তিগত একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য কি? [পৃ. ৫৮১ দেখ]

২৭৬। দলগত একনায়কতন্ত্রের অর্থ কি? [পৃ. ৫৮১-৫৮২ দেখ]

২৭৭। শ্রেণীগত একনায়কতন্ত্র বলতে কি বোঝ? [পৃ. ৫৮২ দেখ]

২৭৮। গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। [পৃ. ৫৪৭-৫৪৮ দেখ]

২৭৯। গণতন্ত্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ৫৪৭-৫৪৮ দেখ]

২৮০। সরকারের একটি রূপ হিসেবে গণতন্ত্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ৫৫১-৫৫৩ দেখ]

২৮১। ঐতিহ্যগত উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রধান নীতিগুলি কি? [পৃ. ৫৫৭-৫৫৮ দেখ]

২৮২। আধুনিক উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ৫৫৮-৫৬১ দেখ]

২৮৩। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি কি? [পৃ. ৫৭৬-৫৭৮ দেখ]

২৮৪। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। [পৃ. ৫৪৮ দেখ]

২৮৫। পরোক্ষ গণতন্ত্রের অর্থ ও প্রকৃতি আলোচনা কর। [পৃ. ৫৫০ দেখ]

২৮৬। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তগুলি কি ? [পৃ. ৫৭৩-৫৭৫ দেখ]

২৮৭। গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কি ? [পৃ. ৫৭৮-৫৮০ দেখ]

২৮৮। একনায়কতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। [পৃ. ৫৮০ দেখ]

২৮৯। একনায়কতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ কর। [পৃ. ৫৮১-৫৮২ দেখ]

২৯০। শ্রেণীগত একনায়কতন্ত্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ৫৮২ দেখ]

২৯১। একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ? [পৃ. ৫৮২-৫৮৪ দেখ]

২৯২। উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।
[পৃ. ৫৮৬-৫৮৯ দেখ]

২৯৩। দলীয় ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাজন কর। [পৃ. ৬০৬-৬০৭ দেখ]

২৯৪। সর্বাত্মক একদলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ? [পৃ. ৬১২-৬১৩ দেখ]

২৯৫। প্রভুত্বকারী দলীয় ব্যবস্থার অর্থ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।
[পৃ. ৬১৩-৬১৪ দেখ]

২৯৬। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাজন কর। [পৃ. ৬১৪-৬১৫ দেখ]

২৯৭। বহুদলীয় ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাজন কর। [পৃ. ৬১৫-৬১৬ দেখ]

২৯৮। একদলীয় রাষ্ট্রে কি গণতন্ত্র থাকতে পারে ? [পৃ. ৬২২-৬২৪ দেখ]

২৯৯। রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী সম্বন্ধে মার্কসবাদীদের অভিমত কি ?
[পৃ. ৬০৯-৬১২ দেখ]

৩০০। সর্বাত্মক একদলীয় ব্যবস্থা বলতে কি বোঝ ? [পৃ. ৬১২-৬১৩ দেখ]

৩০১। প্রভুত্বকারী দলীয় ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায় ? উদাহরণসহ আলোচনা কর। [পৃ. ৬১৩-৬১৪ দেখ]

৩০২। অস্পষ্ট দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা কাকে বলে ? অস্পষ্ট দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার উদাহরণ দাও। [পৃ. ৬১৪ দেখ]

৩০৩। সুস্পষ্ট দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায় ? উদাহরণসহ আলোচনা কর।
[পৃ. ৬১৪-৬১৫ দেখ]

৩০৪। বহুদলীয় ব্যবস্থা কাকে বলে ? [পৃ. ৬১৫ দেখ]

৩০৫। কার্যকরী বহুদলীয় ব্যবস্থা বলতে কি বোঝ ? [পৃ. ৬১৫ দেখ]

৩০৬। অস্থায়ী বহুদলীয় ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায় ? [পৃ. ৬১৫ দেখ]

৩০৭। সাম্যবাদী বহুদলীয় ব্যবস্থা কাকে বলে ? [পৃ. ৬১৫-৬১৬ দেখ]

৩০৮। স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর সংজ্ঞা নির্দেশ কর। [পৃ. ৬২৪-৬২৫ দেখ]

৩০৯। স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীকে ক'ভাগে বিভক্ত করা যায় এবং কি কি ?
[পৃ. ৬২৫-৬২৬ দেখ]

৩১০। রাজনৈতিক দল ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য নির্দেশ কর। [পৃ. ৬০১ দেখ]

৩১১। সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার বলতে কি বোঝ ? [পৃ. ৬৩৫ দেখ]

৩১২। স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ। [পৃ: ৬৩৯-৬৪০ দেখ]

৩১৩। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতি বলতে কি বোঝ? [পৃ: ৬৪৩-৬৪৪ দেখ]

৩১৪। সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনীয়তা কি? [পৃ: ৬৫৯-৬৬০ দেখ]

৩১৫। সীমাবদ্ধ ভোট-পদ্ধতি বলতে কি বোঝ? [পৃ: ৬৬০-৬৬১ দেখ]

৩১৬। দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা কর: [পৃ: ৬৬১ দেখ]

৩১৭। সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর। [পৃ: ৬৬২ দেখ]

৩১৮। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের অর্থ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। [পৃ: ৬৬২-৬৬৩ দেখ]

৩১৯। হেয়ার পদ্ধতির প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। [পৃ: ৬৬৩ দেখ]

৩২০। তালিক-পদ্ধতির প্রকৃতি আলোচনা কর। [পৃ: ৬৬৪ দেখ]

৩২১। জনপ্রতিনিধি এবং তাঁর নির্বাচকমন্ডলীর মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ কর। [পৃ: ৬৬৭-৬৭০ দেখ]

৩২২। একাধিক ভোটদান পদ্ধতির অর্থ কি? [পৃ: ৬৪৯ দেখ]

৩২৩। প্রতিনিধিত্বের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। [পৃ: ৬৫০-৬৫১ দেখ]

৩২৪। ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্বের অর্থ কি? [পৃ: ৬৫৬ দেখ]

৩২৫। বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্ব বলতে কি বোঝায়? [পৃ: ৬৫৬ দেখ]

৩২৬। জেরিম্যান্ডারিং কি? [পৃ: ৬৫৭ দেখ]

৩২৭। সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের বিভিন্ন পদ্ধতির নাম লেখ। [পৃ: ৬৬০ দেখ]

৩২৮। সীমাবদ্ধ ভোটপদ্ধতির প্রকৃতি কি? [পৃ: ৬৬০-৬৬১ দেখ]

৩২৯। দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতির প্রকৃতি কি? [পৃ: ৬৬১ দেখ]

৩৩০। স্তূপীকৃত ভোটপদ্ধতির প্রকৃতি কি? [পৃ: ৬৬১-৬৬২ দেখ]

৩৩১। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের অর্থ কি? [পৃ: ৬৬২ দেখ]

৩৩২। হেয়ার পদ্ধতি বলতে কি বোঝ? [পৃ: ৬৬৩ দেখ]

৩৩৩। তালিকা পদ্ধতি বলতে কি বোঝ? [পৃ: ৬৬৪ দেখ]

৩৩৪। প্রতিনিধি ও নির্বাচকমন্ডলীর সম্পর্ক বিষয়ে ল্যাস্কির অভিমত কি? [পৃ: ৬৬৮-৬৬৯ দেখ]

৩৩৫। প্রতিনিধি ও নির্বাচকমন্ডলীর সম্পর্ক বিষয়ে এডমান্ড বার্কের অভিমত কি? [পৃ: ৬৬৮ দেখ]

৩৩৬। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলি কি কি? [পৃ: ৬৭০-৬৭১ দেখ]

৩৩৭। গণভোট কয় প্রকার এবং কি কি? [পৃ: ৬৭১ দেখ]

৩৩৮। গণ-উদ্যোগ বলতে কি বোঝায়? গণ-উদ্যোগ কয় প্রকারের এবং কি কি? [পৃ: ৬৭১ দেখ]

৩৩৯। গণ-অভিমত বলতে কি বোঝায় ? [পৃঃ ৬৭২ দেখ]

৩৪০। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সাফল্যের শর্তাবলী কি কি ? [পৃঃ ৬৭২ দেখ]

৩৪১। জনমতের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। [পৃঃ ৬৭৫-৬৭৬ দেখ]

৩৪২। 'জনমত জনগণেরও নয়, আবার মতও নয়।'—কেন কথাগুলি বলা হয় ? [পৃঃ ৬৭৭-৬৭৮ দেখ]

৩৪৩। জনমতের বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ? [পৃঃ ৬৭৬-৬৭৭ দেখ]

৩৪৪। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। [পৃঃ ৬৭৮-৬৮০ দেখ]

৩৪৫। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। [পৃঃ ৬৮০-৬৮১ দেখ]

৩৪৬। স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। [পৃঃ ৬৮১-৬৮২ দেখ]

৩৪৭। ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থায় জনমতের প্রকৃতি কিরূপ হয় ? [পৃঃ ৬৮২ দেখ]

৩৪৮। প্রকৃত জনমত গঠনের শর্তগুলি কি কি ? [পৃঃ ৬৮২-৬৮৪ দেখ]

৩৪৯। জনমত গঠন ও প্রকাশের মাধ্যমগুলির মধ্যে যে কোন তিনটি সম্বন্ধে আলোচনা কর। [পৃঃ ৬৮৪-৬৮৬ দেখ]

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রাবলী

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

1980

POLITICAL SCIENCE (PASS)—PAPER I

Full Marks—100

Answer any *five* questions

The questions are of equal value

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ইহাদের মধ্যে কোনটিকে তুমি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে কর এবং কেন? [পৃ. ১৫-২২ দেখ]

২। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। [পৃ. ১১২-১১৫ দেখ]

৩। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে মার্কসীয় তত্ত্ব আলোচনা কর। [পৃ. ১৩৯-১৪৩ দেখ]

৪। সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে একত্ববাদী তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। [পৃ. ১৫৭-১৬৪ দেখ]

৫। সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং উহার বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর। [পৃ. ২১২-২১৭ দেখ]

৬। আন্তর্জাতিক আইনকে কি প্রকৃত অর্থে আইন বলিয়া গণ্য করা যায়? তোমার উত্তরের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন কর। [পৃ. ২৭১-২৭৪ দেখ]

৭। নিম্নলিখিত দুইটি ব্যবস্থার মধ্যে যে-কোন একটিতে স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর:

(ক) উদারনৈতিক গণতন্ত্র; (খ) সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। [পৃ. ৩২৭-৩৩০ এবং ৩৩৬-৩৩৭ দেখ]

৮। সর্বোদয় সম্পর্কে গান্ধীজীর ধারণা বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ৪০১-৪০৪ দেখ]

৯। রাজনীতিক ব্যবস্থা বলিতে কি বোঝায়? কিভাবে উহাদিগকে শ্রেণীবিভক্ত করা হইয়াছে? [পৃ. ৪৮৯-৪৯১ দেখ]

১০। আধুনিক রাষ্ট্রে আইনসভার কার্যাবলী বর্ণনা কর। [পৃ. ৫১০-৫১৪ দেখ]

১১। রাজনীতিক দলের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনীতিক দলের ভূমিকার মূল্যায়ন কর। [পৃ. ৫৯৫ এবং ৫৯৮-৬০১ দেখ]

১২। স্বার্থগোষ্ঠীসমূহ বলিতে কি বোঝায় ? কিভাবে তাহারা সরকারের সিদ্ধান্তসমূহকে প্রভাবিত করে ? [পৃ. ৬২৪-৬২৫ এবং ৬২৬-৬২৮ দেখ]

১৩। আধুনিক রাষ্ট্রে ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্ব ও কর্মগত প্রতিনিধিত্বের পারস্পরিক গুণাগুণ আলোচনা কর। [পৃ. ৬৫৬-৬৫৯ দেখ]

1981

Answer any *five* questions

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার পরম্পরাগত পদ্ধতি ও আধুনিক পদ্ধতির মধ্যে মূল পার্থক্যসমূহ নির্দেশ কর। [পৃ. ৩৮-৪১ এবং ৪৫-৪৭ দেখ]

২। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক কি তাহা আলোচনা কর। [পৃ. ৮৯-৯২ দেখ]

৩। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে আদর্শবাদের (ভাববাদের) পর্যালোচনা কর। [পৃ. ১২৯-১৩৪ দেখ]

৪। সীমাবদ্ধ সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব আলোচনা কর। [পৃ. ১৭২-১৭৫ দেখ]

৫। আইন সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব সংক্ষেপে আলোচনা কর। [পৃ. ২৫০-২৫৯ দেখ]

৬। বিপ্লব সম্পর্কে মার্কসীয় তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। [পৃ. ৪০০-৪০৬ দেখ]

৭। গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বলিতে কি বোঝ ? গণতান্ত্রিক সমাজবাদের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। [পৃ. ৪১৭-৪২০ দেখ]

৮। আধুনিক রাষ্ট্রে শাসন বিভাগের কার্যাবলী বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ৫২৬-৫২৮ দেখ]

৯। একনায়কতন্ত্র কাহাকে বলে ? একনায়কতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা কর। [পৃ. ৫৮০ এবং ৫৮১-৫৮২ দেখ]

১০। জনমতের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় উহার ভূমিকা নির্দেশ কর। [পৃ. ৬৭৫-৬৮০ দেখ]

1982

১। যে কোন **চারটি** প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কাহাকে বলে। অন্যান্য সমাজব্যবস্থার সহিত ইহার পার্থক্য কি ? [পৃ. ৪৯৬-৪৯৮, ৫০১-৫০৩ এবং ৫০৫-৫০৭ দেখ]

(খ) জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের সম্পর্ক আলোচনা কর। [পৃ. ২০৬-২০৯ দেখ]

(গ) রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাগরিকের কোন অধিকার আছে কি ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। [পৃ. ৩০২-৩০৫ দেখ]

(ঙ) বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রসমূহে কেন্দ্রপ্রবণতার কারণ সংক্ষেপে আলোচনা কর। [পৃ. ৪৭২-৪৭৫ দেখ]

(চ) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কিভাবে নিশ্চিত করা যায় ? [পৃ. ৫৩৮-৫৪২ দেখ]

(ছ) উদারনৈতিক গণতন্ত্র বলিতে কি বোঝায় ? ইহার বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ কর। [পৃ. ৪৯১-৪৯৩ দেখ]

২। যে কোন **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে দুইটি মৌলিক পার্থক্য নির্দেশ কর। [পৃ. ৯৬-৯৭ দেখ]

(খ) পাঁচজন আদর্শবাদী রাজনীতিক চিন্তাবিদের নাম কর। [পৃ. ১৩০ দেখ]

(গ) সার্বভৌমিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ? [পৃ. ১৪৬-১৪৯ দেখ]

(ঘ) "সাম্রাজ্যবাদ হইল মুমূর্ষু পুঁজিবাদ।"—একথা কে বলিয়াছিলেন এবং কেন ? [পৃ. ২১৭ দেখ]

(ঙ) অস্টিন-প্রদত্ত আইনের সংজ্ঞা লিখ। [পৃ. ১৫৯ দেখ]

(চ) বিকেন্দ্রীকরণ কি ? [পৃ. ৪৬৯ দেখ]

(ছ) বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্ব বলিতে কে বোঝ ? [পৃ. ৫৫৬ দেখ]

৩। বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত একাধিক বিকল্প উত্তর হইতে সঠিক উত্তরটি বাছিয়া যে কোন **পাঁচটির** উত্তর সাজাইয়া লিখ :

(ক) 'সাধারণ ইচ্ছা' তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা হইলেন (হবস্/রুশো/হেগেল)।

(খ) আইনের সামাজিক মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা হইলেন (দ্যুগুই / বোঁদা / মেইন)।

(গ) (ওপেনহাইম / হল্যান্ড) আন্তর্জাতিক আইনকে আইন বলিয়া স্বীকার করেন।

(ঘ) সমাজতান্ত্রিক সমাজে কাজের অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য (হয় / হয় না)।

(ঙ) গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন (এডওয়ার্ড বার্নস্টাইন / সিডনি ওয়েব / বেনিটো মুসোলিনী / জন স্টুয়ার্ট মিল)।

(চ) (টকভিল / লর্ড অ্যাক্টন / কার্ল মার্কস্ / আর. এইচ. টনী) বলিয়াছেন, "সাম্য স্বাধীনতার পরিপন্থী নহে, স্বাধীনতার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।"

(ছ) জনমতের অর্থই হইল, (রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিকের / সমগ্র সম্প্রদায়ের কল্যাণের উদ্দেশ্যে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সংখ্যাগরিষ্ঠের / যুক্তির উপরে বা অন্যভাবে প্রতিষ্ঠিত জনসাধারণের) মতামত।

৪। শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসাইয়া যে-কোন **পাঁচটির** উত্তর দাও ঃ

(ক) —— ব্যতীত, —— উত্তরাধিকার ব্যতীত, মানুষের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটে না, ঘটিতে পারে না। [সম্পত্তির অধিকার, সম্পত্তির]

(খ) জৈব মতবাদ —— প্রকৃতি সম্পর্কে কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারে না, —— সম্পর্কেও কোন নির্ভরযোগ্য নির্দেশ দান করতে পারে না। [রাষ্ট্রের, কর্মক্ষেত্র]

(গ) সার্বভৌমিকতা "সীমাবদ্ধ হইল ইহার নিজস্ব —— এবং ইহার নিজস্ব —— জন্য।" [আভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক ব্যাপারের জন্য]

(ঘ) —— বলিতে আমরা ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির শাসন বুঝি যাহারা রাষ্ট্রে অপ্রতিহত কর্তৃত্ব স্থাপন করে এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতাকে প্রয়োগ করে।

(ঙ) "কোন বিষয় সম্পর্কে সমস্বার্থসম্পন্ন জনসমষ্টিকে ——" বলা হয়। [জনসমাজ]

(চ) জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে, —— ভোটাধিকারের পূর্বে —— প্রবর্তন হওয়া উচিত। [সার্বিক, সার্বিক শিক্ষার]

Group A

১। যে-কোনও **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

(ক) আচরণবাদের প্রবক্তা দুইজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর নাম কর। [পৃ. ৪৩ দেখ]

(খ) কোন্ অর্থে মানুষ সামাজিক জীব ? [পৃ. ৮৯-৯০ দেখ]

(গ) উৎপাদন-সম্পর্ক কাহাকে বলে ? [পৃ. ৩৮৩ দেখ]

(ঘ) আইনের উৎসমূহ কি কি ? [পৃ. ২৬২ দেখ]

(ঙ) আন্তর্জাতিক আইনকে আইন বলিয়া গণ্য করেন এইরূপ তিনজন পন্ডিতের নাম কর। [পৃ. ২৭২ দেখ]

(চ) আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দুইজন প্রবক্তার নাম লেখ। [পৃ. ৩৫০ দেখ]

(ছ) চার ধরনের সমাজতন্ত্রের নাম লেখ। [পৃ. ৩৫৩ দেখ]

(জ) বিপ্লব কাহাকে বলে ? [পৃ. ৪০০-৪০১ দেখ]

(ঝ) গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বলিতে কি বোঝায় ? [পৃ. ৪১৭ দেখ]

(ঞ) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। [পৃ. ৪৫৫-৪৫৬ দেখ]

(ট) স্থায়ী বা অরাজনীতিক প্রশাসন বলিতে কাহাদের বোঝায় ? [পৃ. ৫২৮-৫২৯ দেখ]

(ঠ) ফ্যাসিবাদের দুইটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। [পৃ. ৫৯১-৫৯২ দেখ]

(ড) কর্মগত বা পেশাগত প্রতিনিধিত্ব বলিতে কি বোঝায় ? [পৃ. ৬৫৬ দেখ]

২। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি হইতে যে-কোনও পাঁচটি বাছিয়া লও :

'ক' স্তম্ভের প্রত্যেকটি নাম বা উক্তি 'খ' স্তম্ভের একটি নাম বা উক্তির সহিত সম্পর্কিত। এই সম্পর্কযুক্ত নাম বা উক্তি দুইটি কি তাহা লেখ।

স্তম্ভ 'ক'	স্তম্ভ 'খ'
ক. যে সরকার সর্বাপেক্ষা কম শাসন করে সেই সরকারই শ্রেষ্ঠ	১. ক্র্যাব
খ. হেনরী মেইন	২. আইনের ঐতিহাসিক তত্ত্ব
গ. আইনের সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব	৩. থোরো
ঘ. হার্বার্ট স্পেন্সার	৪. উদ্বৃত্ত মূল্য
ঙ. সাধারণ ইচ্ছা	৫. রুশো
চ. কার্ল মার্কস	৬. সদাসতর্কতাই স্বাধীনতার মূল্য
ছ. পেরিক্লিস	৭. জৈব মতবাদ

[ক+৩, খ+২, গ+১, ঘ+৭, ঙ+৫, চ+৪, ছ+৬]

Group B

যে-কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও

৩। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে ভাববাদের (আদর্শবাদ) পর্যালোচনা কর : [পৃ. ১২৯-১৩৪ দেখ]

৪। রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে বহুত্ববাদী তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। [পৃ. ১৬৪-১৭০ দেখ]

৫। বিশ্বশান্তি রক্ষায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (ইউনাইটেড নেশনস্) ভূমিকা আলোচনা কর। [পৃ. ২৩৮-২৪১ এবং ২৪২-২৪৩ দেখ]

৬। মার্কসবাদের বিকাশে লেনিনের অবদান আলোচনা কর। [পৃ. ৪১০-৪১৬ দেখ]

৭। রাজনীতিক ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ৪৮৮-৪৯১ দেখ]

৮। আধুনিক রাষ্ট্রে আইনসভার কার্যাবলী বর্ণনা কর। [পৃ. ৫১০-৫১৪ দেখ]

৯। স্বার্থগোষ্ঠীসমূহ কিভাবে সরকারের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে ? [পৃ. ৬২৬-৬২৮ দেখ]

Group A

১। যে-কোনো পনেরটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় যে-কোনো দুইটি ঐতিহ্যগত (পরম্পরাগত) দৃষ্টিভঙ্গীর উল্লেখ কর। [পৃ. ৩৮ দেখ]

(খ) সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত কর। [পৃ. ১১০ দেখ]

(গ) রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে চারটি পার্থক্য নির্দেশ কর। [পৃ. ৯৬-৯৭ দেখ]

(ঘ) চারজন ভাববাদী (আদর্শবাদী) দার্শনিকের নাম উল্লেখ কর। [পৃ. ১২৯ দেখ]

(ঙ) স্বাধীনতার যে-কোনো একটি সংজ্ঞা লেখ। [পৃ. ৩১১ দেখ]

(চ) সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব কোন্ সময়ে উদ্ভূত হয় ? [পৃ. ১৫০ দেখ]

(ছ) আইন সম্পর্কে সমাজতত্ত্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবক্তাদের মধ্যে যে কোনো দুইজনের নাম উল্লেখ কর। [পৃ. ২৫৬ দেখ]

(জ) কি কি বিষয় সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক সমাজে নাগরিকেরা ব্যক্তির সম্পত্তি সম্পর্কিত অধিকার ভোগ করেন ? [পৃ. ২৯৯-৩০০ দেখ]

(ঝ) স্বাভাবিক অধিকার তত্ত্বের ঐতিহাসিক ভূমিকা কি ছিল ? [পৃ. ২৮৫ দেখ]

(ঞ) সাম্যের বিভিন্ন রূপগুলি লেখ। [পৃ. ৩৩৩ দেখ]

(ট) উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাজনীতিক ব্যবস্থার চারিটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর। [পৃ. ৪১১ দেখ]

(ঠ) গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র বলিতে কি বোঝায় ? [পৃ. ৪২৭ দেখ]

(ড) কর্তৃত্বমূলক রাজনীতিক ব্যবস্থার মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি কি ? [পৃ. ৪১৩ দেখ]

(ঢ) এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা কাহাকে বলে ? [পৃ. ৪৫১-৪৫২ দেখ]

(ণ) ফ্যাসিবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কি ? [পৃ. ৫৯১-৫৯২ দেখ]

(ত) নামসর্বস্ব প্রধান বলিতে কি বোঝায় ? [পৃ. ৫২৫ দেখ]

(থ) আইনসভার প্রশাসনিক কাজের একটি দৃষ্টান্ত দাও। [পৃ. ৫১২ দেখ]

(দ) কর্মগত (পেশাগত) প্রতিনিধিত্বের উদ্দেশ্য কি ? [পৃ. ৬৫৮ দেখ]

(ধ) জনমতের চারিটি প্রধান মাধ্যমের নাম কর। [পৃ. ৬৮৪-৬৮৬-র শুধু নামগুলি দেখ]

(ন) রাজনীতিক দল কাহাকে বলে ? [পৃ. ৫৯৫ এবং ৫৯৬ দেখ]

Group B

যে-কোনো চারিটি প্রশ্নের উত্তর দাও

২। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ মন্তব্যসহ আলোচনা কর। [পৃ. ৪৫-৫০ দেখ]

৩। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে জৈব মতবাদ ব্যাখ্যা কর। [পৃ. ১২৪-১২৯ দেখ]

৪। কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কার্যাবলী আলোচনা কর। [পৃ. ৩৬৪-৩৬৬ দেখ]

৫। বিপ্লব সম্পর্কে মার্কসীয় তত্ত্ব আলোচনা কর। [পৃ. ৪০০-৪০৬ দেখ]

৬। রাষ্ট্র সম্পর্কে গান্ধীজীর ধারণা বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ৪২৫-৪৩০ দেখ]

৭। সমাজবাদী গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

[পৃ. ৪১৭-৪২০ দেখ]

৮। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রিত করিবার বিভিন্ন পদ্ধতির কার্যকারিতা নির্ধারণ কর। [পৃ. ৬৭০-৬৭২ দেখ]

Group A

১। যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান বলিতে কি বোঝায়? (উ. রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকার, শাসনতান্ত্রিক আইন, স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান, জনপ্রশাসন, শাসনব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা প্রভৃতিকে বোঝায়।)

(খ) ব্যবস্থামূলক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে পুনরাবর্তন কাহাকে বলে?

[পৃ. ৫২ দেখ]

(গ) কোন্ সমাজব্যবস্থায় প্রথম শোষণের উদ্ভব হয় ... ? কেন?

[পৃ. ১০২-১০৩ দেখ]

(ঘ) রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে ভাববাদী (আদর্শবাদী) তত্ত্বকে কেন ধনতন্ত্রের কলাকৌশলের অংশ বলা হয়? [পৃ. ১৩৩ দেখ]

(ঙ) অস্টিন কিভাবে সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছিলেন?

[পৃ. ১৫৯-১৬০ দেখ]

(চ) বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার পথে দুইটি অন্তরায় কি তাহা উল্লেখ কর।

[পৃ. ২৩৪-২৩৫ দেখ]

(ছ) আন্তর্জাতিক আইন কাহাকে বলে? [পৃ. ২৬৮ দেখ]

(জ) 'আংশিক অধিকার' বলিতে কি বোঝায়?

(ঝ) একটি রাষ্ট্রকে কি কি কারণে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করা হয়?

[পৃ. ৩৬৩-৩৬৫ দেখ]

Group A

১। যে-কোনো পনেরটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় যে-কোনো দুইটি ঐতিহ্যগত (পরম্পরাগত) দৃষ্টিভঙ্গীর উল্লেখ কর। [পৃ. ৩৮ দেখ]

(খ) সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত কর। [পৃ. ১১০ দেখ]

(গ) রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে চারটি পার্থক্য নির্দেশ কর। [পৃ. ৯৬-৯৭ দেখ]

(ঘ) চারজন ভাববাদী (আদর্শবাদী) দার্শনিকের নাম উল্লেখ কর। [পৃ. ১২৯ দেখ]

(ঙ) স্বাধীনতার যে-কোনো একটি সংজ্ঞা লেখ। [পৃ. ৩১১ দেখ]

(চ) সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব কোন্ সময়ে উদ্ভূত হয় ? [পৃ. ১৫০ দেখ]

(ছ) আইন সম্পর্কে সমাজতত্ত্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবক্তাদের মধ্যে যে কোনো দুইজনের নাম উল্লেখ কর। [পৃ. ২৫৬ দেখ]

(জ) কি কি বিষয় সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক সমাজে নাগরিকেরা ব্যক্তির সম্পত্তি সম্পর্কিত অধিকার ভোগ করেন ? [পৃ. ২৯৯-৩০০ দেখ]

(ঝ) স্বাভাবিক অধিকার তত্ত্বের ঐতিহাসিক ভূমিকা কি ছিল ? [পৃ. ২৮৫ দেখ]

(ঞ) সাম্যের বিভিন্ন রূপগুলি লেখ। [পৃ. ৩৩৩ দেখ]

(ট) উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাজনীতিক ব্যবস্থার চারিটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর। [পৃ. ৪১১ দেখ]

(ঠ) গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র বলিতে কি বোঝায় ? [পৃ. ৪২৭ দেখ]

(ড) কর্তৃত্বমূলক রাজনীতিক ব্যবস্থার মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি কি ? [পৃ. ৪১৩ দেখ]

(ঢ) এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা কাহাকে বলে ? [পৃ. ৪৫১-৪৫২ দেখ]

(ণ) ফ্যাসিবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কি ? [পৃ. ৫৯১-৫৯২ দেখ]

(ত) নামসর্বস্ব প্রধান বলিতে কি বোঝায় ? [পৃ. ৫২৫ দেখ]

(থ) আইনসভার প্রশাসনিক কাজের একটি দৃষ্টান্ত দাও। [পৃ. ৫১২ দেখ]

(দ) কর্মগত (পেশাগত) প্রতিনিধিত্বের উদ্দেশ্য কি ? [পৃ. ৬৫৮ দেখ]

(ধ) জনমতের চারটি প্রধান মাধ্যমের নাম কর। [পৃ. ৬৮৪-৬৮৬-র শুধু নামগুলি দেখ]

(ন) রাজনীতিক দল কাহাকে বলে ? [পৃ. ৫৯৫ এবং ৫৯৬ দেখ]

Group B

যে-কোনো চারিটি প্রশ্নের উত্তর দাও

২। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ মন্তব্যসহ আলোচনা কর। [পৃ. ৪৫-৫০ দেখ]

৩। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে জৈব মতবাদ ব্যাখ্যা কর। [পৃ. ১২৪-১২৯ দেখ]

৪। কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কার্যাবলী আলোচনা কর। [পৃ. ৩৬৪-৩৬৬ দেখ]

৫। বিপ্লব সম্পর্কে মার্কসীয় তত্ত্ব আলোচনা কর। [পৃ. ৪০০-৪০৬ দেখ]

৬। রাষ্ট্র সম্পর্কে গান্ধীজীর ধারণা বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ৪২৫-৪৩০ দেখ]

৭। সমাজবাদী গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।
[পৃ. ৪১৭-৪২০ দেখ]

৮। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রিত করিবার বিভিন্ন পদ্ধতির কার্যকারিতা নির্ধারণ কর। [পৃ. ৬৭০-৬৭২ দেখ]

Group A

১। যে-কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান বলিতে কি বোঝায় ? (উ. রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকার, শাসনতান্ত্রিক আইন, স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান, জনপ্রশাসন, শাসনব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা প্রভৃতিকে বোঝায়।)

(খ) ব্যবস্থামূলক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে পুনরাবর্তন কাহাকে বলে ?
[পৃ. ৫২ দেখ]

(গ) কোন্ সমাজব্যবস্থায় প্রথম শোষণের উদ্ভব হয় এবং কেন ?
[পৃ. ১০২-১০৩ দেখ]

(ঘ) রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে ভাববাদী (আদর্শবাদী) তত্ত্বকে কেন ধনতন্ত্রের কলাকৌশলের অংশ বলা হয় ? [পৃ. ১৩৩ দেখ]

(ঙ) অস্টিন কিভাবে সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছিলেন ?
[পৃ. ১৫৯-১৬০ দেখ]

(চ) বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার পথে দুইটি অন্তরায় কি তাহা উল্লেখ কর।
[পৃ. ২৩৪-২৩৫ দেখ]

(ছ) আন্তর্জাতিক আইন কাহাকে বলে ? [পৃ. ২৬৮ দেখ]

(জ) 'আংশিক অধিকার' বলিতে কি বোঝায় ?

(ঝ) একটি রাষ্ট্রকে কি কি কারণে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করা হয় ?
[পৃ. ৩৬৩-৩৬৫ দেখ]

(ঞ) ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকে 'বস্তুবাদী' বলা হয় কেন ? [পৃ. ৩৮২ দেখ]
(ট) সর্বোদয় বলিতে কি বোঝ ? [পৃ. ৪০১ দেখ]
(ঠ) এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের দুইটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। [পৃ. ৪৫২ দেখ]
(ড) অরাজনীতিক শাসক বলিতে কি বোঝায় ? [পৃ. ৫২৮-৫২৯ দেখ]
(ঢ) অর্পিত আইন বলিতে কি বোঝায় ? [পৃ. ৫২৭ দেখ]
(ণ) সীমাবদ্ধ ভোটপদ্ধতি কাহাকে বলে ? [পৃ. ৬৬০-৬৬১ দেখ]

Group B

যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও

২। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনায় পরম্পরাগত দৃষ্টিভঙ্গীসমূহ ব্যাখ্যা কর।
[পৃ. ৩৮-৪১ দেখ]

৩। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যে মৌল পার্থক্যসমূহ নির্দেশ কর। [পৃ. ৫০১-৫০৩ দেখ]

৪। জনগণের সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের মূল্যায়ন কর। [পৃ. ১৫৫-১৫৭ দেখ]

৫। আদর্শ হিসাবে জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি সংক্ষেপে বিবৃত কর।
[পৃ. ১৯২-১৯৪ দেখ]

৬। উদারনীতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রকৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [পৃ. ৩২৭-৩২৯ এবং ৩৩৬-৩৩৭ দেখ]

৭। রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্পর্কে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর।
[পৃ. ৩৪৪-৩৫১ দেখ]

৮। শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রাম সম্পর্কে মার্ক্সীয় তত্ত্ব বিশ্লেষণ কর।
[পৃ. ৩৮৮-৩৯৪ দেখ]

৯। গণতান্ত্রিক সমাজবাদের উপর একটি টীকা লেখ।
[পৃ. ৪১৬-৪২২ দেখ]

১০। বিচার বিভাগের কার্যাবলী আলোচনা কর। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহা নির্দেশ কর।
[পৃ. ৫৪২-৫৪৫ এবং ৫৩৮-৫৪২ দেখ]

First Paper—Group A

১। যে-কোন দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও :—
(ক) সমাজ কাহাকে বলে ? [পৃ. ৮২ দেখ]
(খ) সমাজবিকাশের প্রথম দুইটি স্তর কি ? [পৃ. ৯৯ দেখ]

(গ) কোন্ রাষ্ট্রতত্ত্ব রাষ্ট্রকে সর্বশক্তিমানরূপে রূপায়িত করে ? [পৃ. ১৩১ দেখ]

(ঘ) সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য হিসাবে 'সার্বজনীনতার' অর্থ কি ? [পৃ. ১৪৭-১৪৮ দেখ]

(ঙ) জাতীয় জনসমাজ ও জাতীয়তাবাদের মধ্যে মৌল পার্থক্য কি ? [পৃ. ১৮৭-১৮৮ এবং ১৯৫ দেখ]

(চ) আইনের কোন্ মতবাদ আইনকে সার্বভৌমের আদেশ মনে করে ? [পৃ. ১৫৯ দেখ]

(ছ) অধিকারের সর্বপ্রাচীন তত্ত্বটি কি ? [পৃ. ২৮৫ দেখ]

(জ) সাম্যের মূলকথা কি ? [পৃ. ৩০১ দেখ]

(ঝ) স্বাধীনতার ধারণার বিকাশের সাথে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ কর। [পৃ. ৩১০ দেখ]

(ঞ) আত্মনিয়ন্ত্রণের তত্ত্ব কোন্ ধরনের রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ? [পৃ. ১৯৯ দেখ]

(ট) মার্ক্সের মতে, শ্রেণীসংগ্রাম কাহাকে বলে ? [পৃ. ৩৮৯ দেখ]

(ঠ) বিপ্লব সংগঠনের ক্ষেত্রে লেনিনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান কি ? [পৃ. ৪১২-৪১৩ দেখ]

(ড) বিকেন্দ্রীকরণের পথে দুইটি বড় বাধা কি ? [পৃ. ৪৭১ দেখ]

(ঢ) 'স্বার্থগোষ্ঠী' বলিতে কি বোঝায় ? [পৃ. ৬২৫ দেখ]

(ণ) এক[illegible]য়কতন্ত্রের দুইটি রূপ বল। [পৃ. ৫৮১ দেখ]

Group B

যে-কোন **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও

২। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিজ্ঞান হিসাবে পরিগণিত হইবার [illegible] বিচার কর। [পৃ. ১১-১৫ দেখ]

৩। সার্বভৌমিকতার একত্ববাদী তত্ত্ব আলোচনা কর। [পৃ. ১৫৭-১৬০ দেখ]

৪। জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের মধ্যে কোন বৈপরীত্য আছে কি ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। [পৃ. ২০৬-২০৯ দেখ]

৫। অধিকার সম্বন্ধে মার্ক্সীয় তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। [পৃ. ২৯১-২৯৩ দেখ]

৬। মার্ক্সীয় মতবাদের বিকাশে লেনিনের অবদান আলোচনা কর। [পৃ. ৪১০-৪১৬ দেখ]

৭। গান্ধীর রাষ্ট্রতত্ত্বকে নৈরাজ্যবাদী আখ্যা দেওয়া যায় কি ? তোমার বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। [পৃ. ৪২৫-৪২৯ দেখ]

৮। সমাজতান্ত্রিক রাজনীতিক ব্যবস্থা[illegible] প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ কর। [পৃ. ৪১৬-৪১৮ দেখ]

৯। এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে মুখ্য পার্থক্যগুলি নির্দেশ কর। [পৃ. ৪৬১-৪৬৩ দেখ]

১০। গণতন্ত্রের আদর্শের উৎপত্তি ও বিকাশ আলোচনা কর।
[পৃ. ৫৪৬-৫৪৭ দেখ]

First Paper—Group A

১। যে-কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) রাষ্ট্র সম্পর্কে জৈব মতবাদের দুইটি সীমাবদ্ধতা উল্লেখ কর।
[পৃ. ১২৭-১২৮ দেখ]

(খ) বাস্তব সার্বভৌমিকতা কাহাকে বলে? [পৃ. ১৫২ দেখ]

(গ) সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে অস্টিনের সংজ্ঞাটি নির্দেশ কর। [পৃ. ১৫৯ দেখ]

(ঘ) আন্তর্জাতিকতাবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য কি? [পৃ. ২০৪-২০৫ দেখ]

(ঙ) কিরূপ রাজনীতিক নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলি সংগঠিত হইয়া ছিল? [পৃ. ২২৪ দেখ]

(চ) প্রতিরোধের অধিকার প্রয়োগের সপক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি উল্লেখ কর।
[পৃ. ৩০৪ দেখ]

(ছ) একটি উদাহরণ দিয়া দেখাও কখন সাম্যের নীতি স্বাধীনতার নীতির পরিপন্থী হইতে পারে? [পৃ. ৩৩১-৩৩২ দেখ]

(জ) কল্যাণ-রাষ্ট্রের অর্থ কি? [পৃ. ৩৬১-৩৬২ দেখ]

(ঝ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে দুইটি সমালোচনার উল্লেখ কর।
[পৃ. ৩৪৭-৩৪৮ দেখ]

(ঞ) ইতিহাসের মার্কসীয় ব্যাখ্যাকে 'বস্তুবাদী' বলা হয় কেন? [পৃ. ৩৮২ দেখ]

(ট) 'সর্বোদয়'-এর অর্থ কি? [পৃ. ৪৩১ দেখ]

(ঠ) স্বৈরতান্ত্রিক রাজনীতিক ব্যবস্থার দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর।
(পৃ. ৪৯০ দেখ]

(ড) সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অর্থ কি? [পৃ. ৪৯৭ দেখ]

(ঢ) কবে এবং কোথায় ফ্যাসিবাদের জন্ম হয়? [পৃ. ৫৮৯ দেখ]

(ণ) রাজনীতিক দলের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। [পৃ. ৫৯৬]

Group—B

যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও

২। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। [পৃ. ১৫-২২ দেখ]

৩। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে আদর্শবাদ-তত্ত্বের মূল্যায়ন কর।
[পৃ. ১২৯-১৩৪ দেখ]

৪। সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। [পৃ. ২১২-২১৭ দেখ]

৫। আইনের প্রকৃতি সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক এবং ঐতিহাসিক মতবাদের মূল্যায়ন কর। [পৃ. ২৫০-২৫৪ দেখ]

৬। স্বাধীনতা সম্পর্কে ধারণার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সংক্ষেপে আলোচনা কর। [পৃ. ৩১২-৩১৪ দেখ]

৭। শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রাম সম্বন্ধে মার্কসীয় তত্ত্বের উপর একটি টীকা লেখ। [পৃ. ৩৮৮-৩৯৪ দেখ]

৮। গণতান্ত্রিক সমাজবাদের মূলকথা এবং প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ কর। [পৃ. ৪১৭-৪২০ দেখ]

৯। একনায়কতন্ত্র কাহাকে বলে ? ইহার বিভিন্ন রূপগুলি আলোচনা কর। [পৃ. ৫৮০ এবং ৫৮১-৫৮২ দেখ]

১০। রাজনীতিক দল ও স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। স্বার্থগোষ্ঠী-গুলির মুখ্য কার্যাবলী আলোচনা কর। [পৃ. ৬৩১-৬৩৩ এবং ৬২৬-৬২৮ দেখ]

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

POLITICAL SCIENCE (Pass)

(New Syllabus)

First Paper

Full Marks : 100 **Time : Three Hours**

The figures in the margin indicate full marks. Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

৭নং প্রশ্ন এবং অন্য যে কোন **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর দাও

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞান পর্যালোচনার বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা কর। [পৃ. ১৫-২২ দেখ]

২। রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণার পর্যালোচনা কর। [পৃ. ১৩৯-১৪৩ দেখ]

৩। আইনের সংজ্ঞা প্রদান কর। আইন ও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ কর। [পৃ. ২৪৪-২৪৬ এবং ২৬৫-২৬৮ দেখ]

৪। জনপ্রিয় সরকারে জনমতের গুরুত্ব নির্দেশ কর। জনমত গঠনের মাধ্যমগুলি কি.? [পৃ. ৬৭৮-৬৮০ এবং ৬৮৪-৬৮৮ দেখ]

৫। গণতন্ত্রের সাফল্যের অপরিহার্য শর্তগুলি আলোচনা কর। [পৃ. ৫৭৩-৫৭৫ দেখ]

৬। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। ইহার সুবিধা ও অসুবিধা কি কি ? [পৃ. ৪৫৫-৪৫৭ এবং ৪৬৩-৪৬৬ দেখ]

৭। নিম্নলিখিত যে কোন **চারটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। (প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দশটি বাক্যের মধ্যে লিখিতে হইবে।)

(ক) রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। [পৃ. ৯৬-৯৭ দেখ]

(খ) বাস্তব সার্বভৌমিকতা বলিতে কি বুঝায় ? [পৃ. ১৫২-১৫৩ দেখ]

(গ) জাতীয় জনসমাজের অপরিহার্য উপাদানগুলি কি ? [পৃ. ১৮৯-১৯২ দেখ]

(ঘ) নমনীয় সংবিধান বলতে কি বুঝায় ? [পৃ. ৪০৭-৪০৮ দেখ]

(ঙ) সাম্য কয় প্রকার ও কি কি ? [পৃ. ৩০৩-৩০৫ দেখ]

(চ) জনপ্রতিনিধি এবং তাঁহার নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যের সম্পর্ক নির্দেশ কর। [পৃ. ৬৬৭-৬৭০ দেখ]

৭নং প্রশ্ন এবং যে কোন **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি আলোচনা কর। [পৃ. ৫-১১ দেখ]

২। রাষ্ট্র সম্পর্কিত আদর্শবাদের আলোচনা কর। [পৃ. ১২৯-১৩৪ দেখ]

৩। সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে বহুত্ববাদীদের মূল বক্তব্য আলোচনা কর এবং ইহার সীমাবদ্ধতাসমূহ উল্লেখ কর। [পৃ. ১৬৪-১৭০ দেখ]

৪। স্বাধীনতা বলতে কি বুঝায়? আধুনিক রাষ্ট্রে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ কি কি? [পৃ. ৩১০-৩১১ এবং ৩২১-৩২৪ দেখ]

৫। মন্ত্রিপরিষদ-শাসিত সরকারের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর। ইহার সীমাবদ্ধতা কি কি? [পৃ. ৪৮০-৪৮১ এবং ৪৮৩-৪৮৫ দেখ]

৬। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা বর্ণনা কর। [পৃ. ৫৯৮-৬০১ দেখ]

৭। নিম্নলিখিত যে কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও। (প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দশটি বাক্যের মধ্যে লিখিতে হইবে।)

(ক) জনগণের সার্বভৌমিকতার মূল বক্তব্য কি? [পৃ. ১৫৫-১৫৬ দেখ]

(খ) লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। [পৃ. ৪৩৯-৪৪০ দেখ]

(গ) সার্বিক (sic) অধিকার বলতে কি বোঝায়? [পৃ. ২৮৫-২৮৬ দেখ]

(ঘ) সার্বিক ভোটাধিকারের বিপক্ষে দুইটি যুক্তির উল্লেখ কর। [পৃ. ৬৩৭ দেখ]

(ঙ) প্রত্যক্ষ নির্বাচনের অসুবিধা কি কি? [পৃ. ৬৪৫ দেখ]

(চ) আইনকে স্বাধীনতার শর্ত বলা হয় কেন? [পৃ. ৩২৫-৩২৬ দেখ]

৭নং প্রশ্ন এবং যে কোন **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।

১। রাষ্ট্রের সহিত সমাজের পার্থক্য কোথায়? বিশদভাবে আলোচনা কর। [পৃ. ৯৬-৯৮ দেখ]

২। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে জৈব মতবাদ আলোচনা কর। রাষ্ট্রের প্রকৃতি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এই মতবাদ কতটা সন্তোষজনক? [পৃ. ১২৪-১২৯ দেখ]

৩। সমালোচনাসহ সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে অস্টিনের মতবাদ ব্যাখ্যা কর। [পৃ. ১৫৯-১৬৪ দেখ]

৪। রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্পর্কে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ পর্যালোচনা কর। [পৃ. ৩৪৪-৩৫১ দেখ]

৫। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার দোষ-গুণ আলোচনা কর। [পৃ. ৪৬৩-৪৬৬ দেখ]

৬। সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্বের বিভিন্ন পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [পৃ. ৬৫৯-৬৬৫ দেখ]

৭। যে-কোন **চারিটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দশটি বাক্যের মধ্যে লিখিতে হইবে :

(ক) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তুলনামূলক পদ্ধতি আলোচনা কর। [পৃ. ১৭-১৮ দেখ]

(খ) আইনসিদ্ধ এবং বাস্তব সার্বভৌমিকতার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।
[পৃঃ ১৫২-১৫৩ দেখ]

(গ) দুষ্পরিবর্তনীয় এবং সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। [পৃঃ ৪৪৪-৪৪৫ দেখ]

(ঘ) জাতি গঠনের আবশ্যকীয় উপাদানগুলি বর্ণনা কর।
[পৃঃ ১৮৯-১৯২ দেখ]

(ঙ) আইন ও নৈতিকতার মধ্যে পার্থক্য কি ? [পৃঃ ২৬৬-২৬৭ দেখ]

(চ) একনায়কতন্ত্রের ত্রুটিগুলি কি কি ? [পৃঃ ৫৮৫-৫৮৬ দেখ]

৭ নং প্রশ্ন এবং যে কোন **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে কি বিজ্ঞান বলিয়া গণ্য করা চলে ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। [পৃঃ ৩-৫ এবং ১১-১৫ দেখ]

২। রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্ক্সীয় ধারণার বিশ্লেষণ কর। [পৃঃ ১৩৯-১৪৩ দেখ]

৩। রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্পর্কে সমাজতন্ত্রবাদ আলোচনা কর।
[পৃঃ ৩৫৩-৩৫৫ দেখ]

৪। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য অপরিহার্য শর্তগুলির পর্যালোচনা কর।
[পৃঃ ৫৭৩-৫৭৫ দেখ]

৫। পার্লামেন্টীয় সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ কর এবং এই শাসনব্যবস্থার গুণাগুণ নির্দেশ কর। [পৃঃ ৪৮০-৪৮৫ দেখ]

৬। জনমতের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় উহার ভূমিকা নির্দেশ কর। [পৃঃ ৬৭৫-৬৭৬ এবং ৬৭৮-৬৮২ দেখ]

৭। যে কোন **চারিটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। (প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দশটি বাক্যের মধ্যে লিখিতে হইবে)।

(ক) রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা কি ? [পৃঃ ১৫৪-১৫৫ দেখ]

(খ) আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক বিষয়ে একটি টীকা লিখ।
[পৃঃ ৩২৫-৩২৬ দেখ]

(গ) জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।
[পৃঃ ২০৬-২০৯ দেখ]

(ঘ) এককেন্দ্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ? [পৃঃ ৪৫২-৪৫৩ দেখ]

(ঙ) একদলীয় ব্যবস্থার উপর একটি টীকা লিখ।
[পৃঃ ৬১২-৬১৩ এবং ৬২২-৬২৪ দেখ]

(চ) জনপ্রতিনিধি ও তাহার নির্বাচন কেন্দ্রের মধ্যে সম্পর্ক কি তাহা দেখাও। [পৃঃ ৬৬৭-৬৭০ দেখ]

৭নং প্রশ্ন এবং অন্য যে কোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

১। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে আদর্শবাদের পর্যালোচনা কর।
[পৃ. ১২৯-১৩৪ দেখ]

২। সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে একত্ববাদের বিরুদ্ধে বহুত্ববাদী আক্রমণধারার উপর সমালোচনামূলক টীকা রচনা কর। [পৃ. ১৬৪-১৭০ দেখ]

৩। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। এই শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ নির্দেশ কর। [পৃ. ৪৭৬-৪৮১ দেখ]

৪। স্বাধীনতা কি? আধুনিক রাষ্ট্রে স্বাধীনতার রক্ষাকবচগুলির আলোচনা কর। [পৃ. ৩১০-৩১১ এবং ৩২১-৩২৪ দেখ]

৫। যুক্তরাষ্ট্রের সংজ্ঞা দাও এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণাগুণ নির্দেশ কর।
[পৃ. ৪৫৫ এবং ৪৬৩-৪৬৬ দেখ]

৬। আধুনিক গণতন্ত্রে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের বিভিন্ন পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা কর। [পৃ. ৬৫৯-৬৬৫ দেখ]

৭। যে কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও। (প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দশটি বাক্যের মধ্যে লিখতে হবে।)

(ক) রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। [পৃ. ৯৬-৯৭ দেখ]

(খ) আইন এবং নৈতিক বিধির মধ্যে সম্বন্ধ বিবৃত কর।
[পৃ. ২৬৬-২৬৭ দেখ]

(গ) প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কে ধারণাটি আলোচনা কর।
[পৃ. ২৪৬-২৪৭ দেখ]

(ঘ) জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।
[পৃ. ২০১-২০২ দেখ]

(ঙ) গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।
[পৃ. ৫৮৬-৫৮৯ দেখ]

(চ) পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির গুণাগুণ নির্দেশ কর।
[পৃ. ৬৪৫-৬৪৭ দেখ]

৭নং প্রশ্ন এবং অন্য তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ তিনটি পদ্ধতি বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ৩-৫ এবং ১৫-১৭ দেখ]

২। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তিগুলি আলোচনা কর।
[পৃ. ৩৪৫-৩৪৯ দেখ]

৩। রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। [পৃ. ১৩৯-১৪৩ দেখ]

৪। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের তত্ত্বটি বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ১৯৯-২০৪ দেখ]

৫। জনমত বলতে কি বোঝায়? গণতন্ত্রে জনমতের গুরুত্ব আলোচনা কর।
[পৃ. ৪৭৫-৪৭৬ এবং ৬৭৮-৬৮০ দেখ]

৬। সংসদীয় সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। ইহার গুণ কি কি?
[পৃ. ৪৮০-৪৮৫ দেখ]

৭। যে-কোন **চারটি** প্রশ্নের উত্তর দাও:
(প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর **দশটি** বাক্যের মধ্যে লিখতে হবে)

(ক) আইনগত ও রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার পার্থক্য নির্দেশ কর।
[পৃ. ১৫০-১৫৫ দেখ]

(খ) সাম্য সম্পর্কে টীকা লেখ। [পৃ. ৩৩০-৩৩১ এবং ৩৩৩-৩৩৫ দেখ]

(গ) জনপ্রতিনিধি ও তাঁর নির্বাচকমন্ডলীর মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ কর।
[পৃ. ৬৬৭-৬৭০ দেখ]

(ঘ) যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। [পৃ. ৪৫৫-৪৫৭ দেখ]

(ঙ) নমনীয় এবং অনমনীয় সংবিধানের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।
[পৃ. ৪৪৪-৪৪৫ দেখ]

(চ) আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক আলোচনা কর। [পৃ. ৩২৫-৩২৬ দেখ]

৭নং প্রশ্ন এবং অন্য যে-কোনো **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।

১। রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে পার্থক্যগুলি নির্ণয় কর। [পৃ. ১৬-১৭ দেখ]

২। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে ভাববাদী তত্ত্বটি পর্যালোচনা কর।
[পৃ. ১২৯ ১৩৪ দেখ]

৩। অস্টিনের সার্বভৌমিকতার তত্ত্বটি বর্ণনা কর। সংক্ষেপে বিচার-বিশ্লেষণসহ তত্ত্বটির মূল্যায়ন কর। [পৃ. ১৫৯-১৬৪ দেখ]

৪। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর। [পৃ. ৩৫৩-৩৬০ দেখ]

৫। আধুনিক রাষ্ট্রে স্বাধীনতার রক্ষাকবচগুলি কি কি? [পৃ. ৩২১-৩২৪ দেখ]

৬। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।
[পৃ. ৪৫৫-৪৫৭ দেখ]

৭। নিচের যে-কোনো **চারটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দশটি বাক্যের মধ্যে লিখতে হবে।

(ক) জাতীয় জনসমাজের প্রধান প্রধান উপাদানগুলি কি?
[পৃ. ১৮৯-১৯২ দেখ]

(খ) রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় বক্তব্য কি? [পৃ. ১৩৯-১৪২ দেখ]

(গ) জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার বলতে কি বোঝ ?
[পৃ. ১৯৯-২০১ দেখ]

(ঘ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তত্ত্বের প্রধান বক্তব্য কি কি ? [পৃ. ৩৪৫ দেখ]

(ঙ) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতের গুরুত্ব আলোচনা কর।
[পৃ. ৬৭৮-৬৭৯ দেখ]

(চ) রাষ্ট্রপতি চালিত সরকারের ত্রুটিগুলি কি কি ? [পৃ. ৪৭৯-৪৮০ দেখ]

(ছ) সংসদীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি কি ? [পৃ. ৪৮০-৪৮২ দেখ]

৭নং প্রশ্ন এবং অন্য যে কোন **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ তিনটি পদ্ধতি আলোচনা কর। [পৃ. ৩-৫ এবং ১৫-১৭ দেখ]

২। রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্কসীয় ধারণার সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ কর।
[পৃ. ১৩৯-১৪৩ দেখ]

৩। সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে একত্ববাদের বিরুদ্ধে বহুত্ববাদী আক্রমণ-ধারার উপর সমালোচনামূলক টীকা লেখ। [পৃ. ১৬৪-১৭০ দেখ]

৪। রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্পর্কে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দাও।
[পৃ. ৩৪৫-৩৪৯ দেখ]

৫। সংসদীয় শাসনব্যবস্থার সংজ্ঞা দাও। এই শাসনব্যবস্থার গুণ ও দোষগুলি বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ৪৮০ এবং ৪৮২-৪৮৫ দেখ]

৬। আধুনিক গণতন্ত্রে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের বিভিন্ন পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [পৃ. ৬৫৯-৬৬৫ দেখ]

৭। যে কোন **চারটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। (প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর **দশটি** বাক্যের মধ্যে লিখতে হবে।)

(ক) 'জনগণের সার্বভৌমিকতা' বলতে কি বোঝায় ? [পৃ. ১৫৫-১৫৬ দেখ]

(খ) স্বাভাবিক অধিকারের ধারণার উপর একটি টীকা লিখ।
[পৃ. ২৮৫-২৮৬ দেখ]

(গ) আইন ও নৈতিক বিধির মধ্যে সম্বন্ধ বিবৃত কর। [পৃ. ২৬৫-২৬৮ দেখ]

(ঘ) একনায়কতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রকে কিভাবে পৃথক করা যায় ?
[পৃ. ৫৮৬-৫৮৯ দেখ]

(ঙ) জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।
[পৃ. ২০৬-২০৯ দেখ]

(চ) জনপ্রতিনিধি ও তার নির্বাচন. এলাকার মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।
[পৃ. ৬৬৭-৬৭০ দেখ]

(ছ) গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা আলোচনা কর।
[পৃ. ৫৯৮-৬০১ দেখ]

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

POLITICAL SCIENCE (PASS)

FIRST PAPER

Answer any FIVE questions.

1. **Discuss the nature and dimensions of Political Science as it stands today, with emphasis on its interdisciplinary character.**
   [পৃ. ৫-১১ এবং ২৩-২৪ দেখ]

   Or,

   What do you understand by the behavioural approach to the study of Political Science ? Point out its major characteristics and limitations. **[পৃ. ৪৪-৫০ দেখ]**

2. **Critically discuss the Marxian theory regarding the nature of the state.** **[পৃ. ১৩৯-১৪৩ দেখ]**

3. **Write a critical note on the pluralistic attacks on the monistic theory of state sovereignty.** **[পৃ. ১৬৪-১৭০ দেখ]**

4. **Explain the concept of 'liberty' and point out the safeguards of liberty in the modern state.**
   [পৃ. ৩১০-৩১১ এবং ৩২১-৩২৪ দেখ]

5. **Define nationalism. How far is it a menace to civilisation ?**
   [পৃ. ১৯৫-১৯৯ দেখ]

6. **Bring out the salient features of the Parliamentary form of government and point out its merits and demerits.**
   [পৃ. ৪৮০-৪৮৫ দেখ]

7. **Examine the case for and against bicameralism. Discuss the nature of 'interest groups'.** **[পৃ. ৫১৪-৫১৯ এবং ৬২৪-৬২৫ দেখ]**

8. **Define and distinguish between Interest groups and Political Parties.** **[পৃ. ৫১৫-৫১৭ এবং ৬০১-৬০৩ দেখ]**

9. **What is scientific socialism ? Distinguish between scientific socialism and democratic socialism.**
   [পৃ. ৩৭৩-৩৭৪ এবং ৪২২-৪২৩ দেখ]

10. **Discuss the different methods of minority representation.**
[পৃ. ৬৫৯-৬৬৫ দেখ]

1. **Discuss the nature of the relation of Political Science with Sociology.** [পৃ. ২৯-৩১ দেখ]
2. **Examine the characteristics of the normative approach to the study of Political Science. What are its limitations ?**
[পৃ. ৩৮-৪২ দেখ]

Or,

What do you understand by political theory ? How would you distinguish between political theory and political philosophy ? [পৃ. ৭০-৭১ এবং ৭৭-৭৯ দেখ]
3. **Make an estimate of the Idealist Theory as an explanation of the nature of the state.** [পৃ. ১২৯-১৩৪ দেখ]
4. **Explain the Analytical and Historical theories regarding the nature of Law. Which of them do you prefer and why ?**
[পৃ. ২৫০-২৫৪ দেখ]
5. **Critically discuss the individualistic theory of the functions of the state.** [পৃ. ৩৪৪-৩৫১ দেখ]
6. **Examine the nature of Democracy as a major political ideal. Point out its limitations.** [পৃ. ৫৫৬-৫৬৪ দেখ]
7. **What is a federation ? Discuss the chief features of the Federal form of Government.** [পৃ. ৪৫৫-৪৫৭ দেখ]
8. **What are the salient features of the Presidential form of government ? Examine its value and limitations ?**
[পৃ. ৪৭৬-৪৮০ দেখ]
9. **Explain the significance of the independence of Judiciary in a Federation. How can such independence be insured ?**
[পৃ. ৫৩৮-৫৪২ দেখ]
10. **Define bureaucray and explain its role in a modern democracy.** [পৃ. ৫২৮-৫২৯ এবং ৫৩২-৫৩৫ দেখ]

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

1. **Discuss the nature and scope of modern Political Science with reference to its inter-disciplinary perspective.**
[পৃ. ৫-১১ এবং ২৩-২৪ দেখ]
2. **Explain the main features of the Behavioural approach to the study of Political Science. What, in your view, are its limitations ?** [পৃ. ৪৫-৫০ দেখ]
3. **'The State is an instrument of class-exploitation.'—Discuss.**
[পৃ. ১৩৯ ১৪০ দেখ]
4. **State and explain the monistic theory of sovereignty. How do the pluralists criticise the theory ?**
[পৃ. ১৫৭-১৬০ এবং ১৬৪-১৬৭ দেখ]
5. **What is the meaning of Equality ? Do you think that there can be no conflict between Equality and Liberty ?**
[পৃ. ৩৩০-৩৩২ দেখ]
6. **Write a note on the concept of Welfare State.**
[পৃ. ৩৬৩-৩৬৬ দেখ]

Or,

What do you mean by Democratic Socialism ? Discuss its main features. [পৃ. ৪১৭-৪২০ দেখ]
7. **What are the basic principles of Parliamentary Government ? Answer with suitable illustrations.** [পৃ. ৪৮০-৪৮২ দেখ]
8. **Analyse the cause of the decline of the powers of the Legislature in recent times.** [পৃ. ৫২০-৫২২ দেখ]
9. **Define Interest Groups. How would you distinguish them from Political Parties ?** [পৃ. ৬২৪-৬২৫ এবং ৬৩১-৬৩৩ দেখ]
10. **Briefly discuss the arguments for and against Proportional Representation.** [পৃ. ৬৬৫-৬৬৭ দেখ]

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত (ক) ধনবিজ্ঞান এবং (খ) সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা কর। [পৃ. ২৭-৩১ দেখ]

২। রাষ্ট্রনীতি আলোচনার ক্ষেত্রে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা কর। এ বিষয়ে তোমার মন্তব্য ব্যক্ত কর। [পৃ. ৬৫-৬৮ দেখ]

৩। রাষ্ট্রতত্ত্ব এবং রাষ্ট্রদর্শনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। [পৃ. ৭৬-৭৯ দেখ]

৪। আদর্শবাদী তত্ত্ব অনুসরণ করিয়া রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। [পৃ. ১২৯-১৩৪ দেখ]

৫। তুমি কি স্বীকার কর যে জাতীয়তাবাদ সভ্যতার পক্ষে বিপজ্জনক? তোমার উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দাও। [পৃ. ১৯৫-১৯৯ দেখ]

৬। আইনের সংজ্ঞা নির্ধারণ কর। আইন সম্পর্কে সমাজতন্ত্রমূলক মতবাদের সমালোচনা কর। [পৃ. ২৪৪-২৪৫ এবং ২৫৬-২৫৭ দেখ]

৭। রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের উপর একটি নিবন্ধ রচনা কর। [পৃ. ৩৫০-৩৬০ দেখ]

অথবা, রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে ফ্যাসীবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা কর। [পৃ. ৫৮৯-৫৯৩ দেখ]

৮। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের আবশ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলি কি? এই ধরনের সরকারের কেন্দ্র-প্রবণতার কারণ দর্শাও। [পৃ. ৪৫৫-৪৫৭ এবং ৪৭২-৪৭৫ দেখ]

৯। আধুনিক রাষ্ট্রে বিচারব্যবস্থার গুরুত্ব নির্দেশ কর। বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা কিরূপে নিশ্চিত হইতে পারে? [পৃ. ৫৪২-৫৪৫ এবং ৫৩৮-৫৪২ দেখ]

১০। বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক দলব্যবস্থাগুলির একটি বিবরণ দাও। [পৃ. ৬০৬-৬০৭ এবং ৬১২-৬১৬ দেখ]

১। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি ও বিষয়বস্তুর আলোচনা কর। [পৃ. ৫-১১ দেখ]

২। রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য আন্তঃবৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গী কিভাবে অনুসৃত হচ্ছে তার একটি সমীক্ষা দাও। [পৃ. ২০-২৪ ও ৪৯ পৃ., ৭নং পয়েন্ট এবং ৬৭ দেখ]

৩। রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নের আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা কর। এই দৃষ্টিভঙ্গীর ত্রুটিগুলি কি কি? [পৃ. ৪৪-৫০ দেখ]

৪। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে মার্ক্সীয় তত্ত্বের সমালোচনা কর। [পৃ. ১৩৯-১৪০ দেখ]

৫। সার্বভৌমিকত্ব সম্পর্কে একত্ববাদী তত্ত্বের বিরুদ্ধে যে সমালোচনা করা হয়ে থাকে তার উপর একটি পর্যালোচনামূলক নিবন্ধ রচনা কর। [পৃ. ১৬৪-১৭০ দেখ]

৬। স্বাধীনতার সংজ্ঞা নির্ধারণ কর ও স্বরূপ বর্ণনা কর। স্বাধীনতার রক্ষাকবচ কি কি? [পৃ. ৩১০-৩১১ এবং ৩২১-৩২৪ দেখ]

৭। গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বলতে কি বোঝায়? এর বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। [পৃ. ৪১৭-৪২০ দেখ]

অথবা, রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তত্ত্ব পর্যালোচনা কর। [পৃ. ৩৪৪-৩৫১ দেখ]

৮। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় শাসনবিভাগের ভূমিকা ও কার্যাবলী ব্যাখ্যা কর। [পৃ. ৫২৬-৫২৮ দেখ]

৯। স্বার্থগোষ্ঠী কারা? রাজনৈতিক দল ও স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। [পৃ. ৬২৪-৬২৫ এবং ৬৩১-৬৩৩ দেখ]

১০। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর। [পৃ. ৬৬৫-৬৬৭ দেখ]

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাথে (ক) ইতিহাস এবং (খ) সমাজ বিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা কর। [পৃ. ২৪-২৬ এবং ২৯-৩১ দেখ]

২। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আদর্শস্থাপনকারী এবং অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য নির্দেশ করে আলোচনা কর। [পৃ. ৩৮-৪১ এবং ৪৫-৪৭ দেখ]

৩। রাষ্ট্রতত্ত্ব বলতে কি বোঝায়? রাষ্ট্রতত্ত্ব ও রাষ্ট্রদর্শনের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। [পৃ. ৭০-৭১ এবং ৭৭-৭৯ দেখ]

৪। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে আদর্শবাদের পর্যালোচনা কর। [পৃ. ১২৯-১৩৪ দেখ]

৫। জাতি বলতে কি বোঝায়? জাতীয়তাবাদের মূল্য ও সীমা সম্বন্ধে আলোচনা কর। [পৃ. ১৮৮ এবং ১৯৫-১৯৯ দেখ]

৬। আইনের প্রকৃতি বিচার কর। এ-বিষয়ে বিভিন্ন মতধারার পার্থক্য উল্লেখ কর। [পৃ. ২৪৪-২৪৬ এবং ২৫০-২৫৮-র সমালোচনা অংশগুলি বাদ দিয়ে দেখ]

৭। ফ্যাসিবাদের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করে দেখাও। [পৃ. ৫১০-৫১৪ দেখ]

অথবা

রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের উপর একটি নিবন্ধ রচনা কর। [পৃ. ৩৫৩-৩৬০ দেখ]

৮। গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর এবং গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তগুলি ব্যাখ্যা কর। [পৃ. ৫৬৩-৫৬৯ এবং ৫৭৩-৫৭৫ দেখ]

৯। আমলাতন্ত্রের সংজ্ঞা দাও। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা আলোচনা কর। [পৃ. ৫২৮-৫২৯ এবং ৫৩২-৫৩৫ দেখ]

১০। একদলীয়, দ্বিদলীয় এবং বহুদলীয় ব্যবস্থা বলতে কি বোঝ? একদলীয় ব্যবস্থার দোষগুণ আলোচনা কর।

[পৃ. ৬১২, ৬১৩-৬১৪, ৬১৫ এবং ৬১৬-৬১৮ দেখ]

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিধি আলোচনা কর। রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য আন্তঃবৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গী কতদূর অনুসৃত হতে পারে?

[পৃ. ৫-১১ এবং ২৩-২৪ দেখ]

২। রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নের আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং সীমাবদ্ধতা উল্লেখ কর। [পৃ. ৪১-৫০ দেখ]

৩। 'রাষ্ট্র শ্রেণী-শোষণের হাতিয়ার'—এই মতবাদটি তুমি কতদূর গ্রহণ কর?

[পৃ. ১৩৯-১৪৩ দেখ]

৪। সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে একত্ববাদী তত্ত্বের বিরুদ্ধে বহুত্ববাদী সমালোচনাগুলির একটি সংক্ষিপ্তসার দাও। [পৃ. ১৬৪-১৬৭ দেখ]

৫। স্বাধীনতার ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। সাম্য ব্যতিরেকে স্বাধীনতা কি 'প্রকৃত' হতে পারে? [পৃ. ৩১০-৩১১, ৩১৭-৩১৯, ৩২০-৩২১ এবং ৩৩১-৩৩২ দেখ]

৬। রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসাবে গণতন্ত্রের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।

[পৃ. ৫৫৬-৫৬৪ দেখ]

৭। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ কর এবং আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্র-প্রবণতার পিছনে কারণগুলি পর্যালোচনা কর।

[পৃ. ৪৫৫-৪৫৭ এবং ৪৭২-৪৭৫ দেখ]

৮। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার সমর্থনে কি কি যুক্তি আছে? এই যুক্তিগুলির যাথার্থ্য পর্যালোচনা কর।

[পৃ. ৫১৪-৫১৯ দেখ]

৯। স্বার্থগোষ্ঠী বলতে কি বোঝায়? আধুনিক রাষ্ট্রে এদের প্রকৃতি এবং ভূমিকা নির্দেশ কর। যথাযোগ্য উদাহরণ দাও।

[পৃ. ৬২৪ এবং ৬২৬-৬২৮ দেখ]

১০। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের বিভিন্ন ব্যবস্থাগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। [পৃ. ৬৬০-৬৬৫ দেখ]

First Paper

১। তোমার মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি একটি বিজ্ঞান ? যুক্তিসহ উত্তর দাও।
[পৃ. ১১-১৫ দেখ]

২। রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নের মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গীকে ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা কর।
[পৃ. ৬৫-৬৮ দেখ]

৩। রাষ্ট্রের প্রকৃতির ব্যাখ্যা হিসাবে আদর্শবাদী তত্ত্বটিকে বিচারসহ পরীক্ষা কর।
[পৃ. ১২৯-১৩৪ দেখ]

৪। রাজনৈতিক আদর্শরূপে জাতীয়তাবাদের মূল্য ও ত্রুটি আলোচনা কর। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা উদ্ভাবনের উপর জাতীয়তাবাদের প্রভাব নির্দেশ কর।
[পৃ. ১৯৫-১৯৯ এবং ২০৪-২০৬ দেখ]

৫। আইনের সংজ্ঞা দাও। আইন সম্বন্ধে সমাজবিদ্যামূলক তত্ত্বটির পর্যালোচনা কর। [পৃ. ২৪৫-২৪৬ এবং ২৫৬-২৫৭ দেখ]

৬। গণতান্ত্রিক সমাজবাদের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ থেকে এর স্বাতন্ত্র্য কিভাবে নির্দেশ করবে ?
[পৃ. ৪১৭-৪২০ এবং ৪২২-৪২৩ দেখ]

৭। সরকারের প্রকারভেদ রূপে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে সমালোচনা করা হয় তার বর্ণনা দাও এবং পরীক্ষা কর। [পৃ. ৫৬৬-৫৬৯ দেখ]

৮। আমলাতন্ত্র কথাটির সংজ্ঞা দাও। আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর ও আধুনিক রাষ্ট্রে এর ভূমিকা নির্দেশ কর।
[পৃ. ৫২৮-৫৩০ এবং ৫৩২-৫৩৫ দেখ]

৯। বর্তমান পৃথিবীতে কি কি ধরনের রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা আছে ? উদাহরণসহ উত্তর দাও। [পৃ. ৬০৬-৬০৭ এবং ৬১২-৬১৬ দেখ]

১০। 'সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচন' পদ্ধতির প্রকৃতি ও ত্রুটি আলোচনা কর।
[পৃ. ৬৫৬ এবং ৬৫৭ দেখ]